মানসী

ও

মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১২শ বর্ষ—২য় খণ্ড

(ভাদ্র ১৩২৭—মাঘ ১৩২৭)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-ল

কলিকাতা

[illegible] [illegible] বসুর লেন "মানসী প্রেস"

শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৭

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ভাদ্র ১৩২৭—মাঘ ১৩২৭)

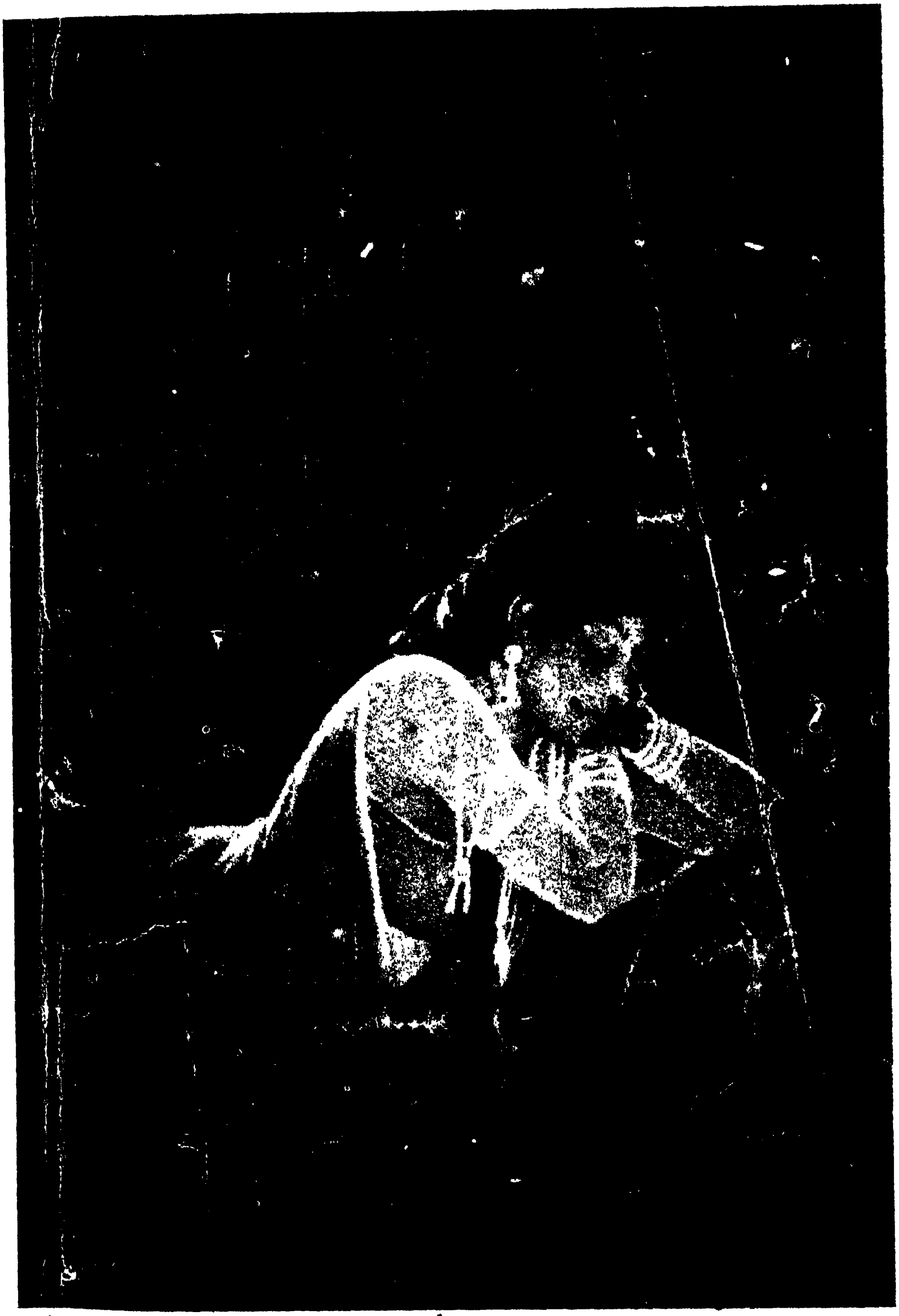
বিষয়-সূচী

* ভ্রম সংশোধন—এই প্রবন্ধে যেখানে যেখানে "কাপ্তেনগঞ্জ" ষ্টেশনের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে "ব্রিজম্যানগঞ্জ" হইবে।

লেখক-সূচী

* ভ্রমসংশোধন—এই প্রবন্ধে যেখানে যেখানে "কাপ্তেনগঞ্জ ষ্টেশনের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে "ত্রিজমানগঞ্জ" হইবে।

চিত্র-সূচী (পূর্ণপৃষ্ঠা)



"প্রাণ-বিহগী আজি বরষায়
উড়ে যেতে চায় ভেদি তমসায়
প্রিয়ের পাশে অধীর আশায়
লুটাতে সে বাহুর বন্ধনে,
গম্ভীর গুরু গরজে ঘনে

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৭

২য় খণ্ড
১ম সংখ্যা

স্ত্রীশিক্ষা ও কার্বের বিশ্ববিদ্যালয়

আদর্শের হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই একই প্রকারের শিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু সাংসারিক ও সমাজিক সকল কাযই স্ত্রী ও পুরুষ বহুদিন হইতে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। এই জন্যই এখন সকল দেশেই স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। তা ছাড়া কেবল একটা অনধিগম্য আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কায করা চলে না। আদর্শের ও বাস্তবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা প্রয়োজন।

সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীর আলোচনা কালে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, আমাদের প্রস্তাবিত প্রণালী আধুনিক সমাজের অধিকাংশ মহিলার উপযোগী হইবে কি না। অবশ্য একথা মানিতেই হইবে যে, আধুনিক বঙ্গসমাজের বহু বিভাগে বহুবিধ সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন ব্যতীত এই সকল সংস্কার কেবল আয়াসসাধ্য নহে, অসম্ভব। সুতরাং আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের অধিকাংশ মহিলা অন্তঃপুরবাসিনী। তাহাদের অধিকাংশেরই প্রধান কায গৃহকর্ম্ম এবং সন্তান-পালন। তাহাদের অধিকাংশেরই বিবাহ হয় ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে এবং বিবাহের পর জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহারা স্বামী বা অপর কোন পুরুষের সাহায্য সাধারণতঃ পান না। এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ব্বের মত নারীজাতিকে চিরকাল পুরুষের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। আমাদিগের মাতা ভগিনী ও পত্নীর নিকট কেবল সহকারিত্ব দাবী করিলে চলিবে না, সকল বিষয়েই তাহাদিগের সহযোগিতা প্রয়োজন। অধিকাংশ বঙ্গমহিলা যাহাতে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়াও বাঙ্গালী পুরুষের প্রকৃত সহযোগিনী হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জন্য এমন শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকে করিতে হইবে—এমন শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে।

সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে

—সবল দেহ গঠন ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরাও যাহাতে সুস্থ সন্তানের জনক-জননী হইবার উপযোগী দেহ লাভ করিতে পারে এবং পরের মুখে ঝাল না খাইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নের বিচার স্বাধীনভাবে করিতে পারে, তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই এই—চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনটাকে সজাগ করিয়া দেওয়া, ছাত্র বা ছাত্রীর অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া দেওয়া। তৎসঙ্গে লিখিবার পড়িবার সাধারণ জ্ঞান জন্মিলেই সেই ছাত্র বা ছাত্রীর সম্মুখে জ্ঞানরাজ্যের রাজমার্গ উন্মুক্ত হইয়া গেলে, সেখানে বিচরণের জন্ম তাহার আর পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন নাই। মোটের উপর চাই অনুসন্ধিৎসা এবং একটা সাধারণ culture, তৎসঙ্গে জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার উপযোগী কিছু শিক্ষা। বাঙালী ছেলে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই শিক্ষার জন্ম সময় পায়। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগকে এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে বাঙ্গালীর মেয়েরা চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই ঐরূপ একটা সাধারণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই, আমাদের ছেলে মেয়েদের পুঁথিগত বিদ্যা যতই হউক না কেন, তাহাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি প্রায়ই তেমন সতেজ থাকে না। বেড়াইবার সময় গাছপালা ঘাস লতা প্রভৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে না, বিভিন্ন পাখীর সঙ্গীতের দিকে কাণ থাকে না সুতরাং আমাদের এই বিচিত্র পৃথিবী আমাদের মনে কোন অনুসন্ধিৎসা জাগায় না। মোটের উপর আমরাও নিউটনের কুকুর ডায়মণ্ডের মত প্রত্যহই আতার পতন দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার কারণ সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনও কোন প্রশ্ন জাগে না। ইহার একটা কারণ আমাদের শিক্ষার বাহন বা medium বিদেশী ভাষা। কবিবর রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, বালক River এর ইংরাজী definition প্রাণপণে মুখস্থ করে কিন্তু তাহার বাড়ীর কাছের গঙ্গাই যে একটা River তাহা সে জানে না। প্রকৃতপক্ষে বস্তু অপেক্ষা শব্দের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে বেশী। শিক্ষকও ঐ শব্দের সহিতই তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। বস্তু সম্বন্ধে সে বরাবর মনে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। আবার এই বিদেশী ভাষাটি আর ব্যাকরণের সূত্র শিখিতে তাহার জীবনের সেই আট বৎসর কাটিয়া যায়, যখন ছাড়া পাইলে তাহার মনটা তাহার নিত্য প্রত্যক্ষ প্রত্যেক জিনিসের খবর তন্ন তন্ন করিয়া লইতে পারিত। ছেলেরা কখন কখন এই অসুবিধা কাটাইয়া উঠিতে পারে, মেয়েরা পারে না, কারণ বিদেশী ভাষার এবং স্বদেশী গুরু মহাশয়ের তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে না পাইতেই সংসারের পাঁচ রকম কায আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপে, আর ছোট একটি সুন্দর খোকা তাহার অশেষবিধ প্রয়োজন লইয়া তাহার কোল জুড়িয়া বসে। এই খোকাটিকে মানুষ করিবার মত বুদ্ধি ও জ্ঞান কিন্তু তখনও তাহার হয় নাই। শিক্ষার বিদেশী বাহনের প্রধান অসুবিধা হইল এই। কিন্তু এই বিদেশী বাহনটাকে একেবারে বাদ দিলেও চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বঙ্গভাষাকে একদিকে যতই সমৃদ্ধ করুক না কেন, তাহার অন্য দিকের দৈন্ম আমাদের অতি উৎকট একদেশদর্শী স্বদেশ প্রেমিকও ঢাকিয়া রাখিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের ভাল গ্রন্থ বেশী নাই, এমন কি নাই বলিলেও চলে। সুতরাং ছাত্রীর মনের রাক্ষসী ক্ষুধা জাগাইয়া দিয়া, তাহার হাত হইতে ভাঁড়ারের চাবি কাড়িয়া লইলে তাহাকে ঠিক তান্তালাসের অবস্থায় ফেলা হইবে। সুতরাং আমাদের মেয়েদিগকে কায চলার মত ইংরাজীও শিখাইতে হইবে, যেন তাহারা ইংরেজী বই পড়িয়া বুঝিতে পারে, বলিবার বা লিখিবার মত বিদ্যা হউক বা না হউক কিছু যায় আসে না। ছেলেদেরও cultureএর হিসাবে ঐটুকু হইলেই চলিত, কিন্তু তাহাদের নাকি ইংরাজী সওদাগরের আফিসে কেরাণীগিরি করিতে হয়, ইংরাজী হাকিমের কাছে

ওকালতি করিতে হয়, তাই তাহাদের ইংরাজী বলিতে এবং লিখিতে পারা দরকার। মেয়েদের যখন সে বালাই নাই তখন তাহাদের উপর আমরা আর সে বোঝাটা না হয় নাই চাপাইলাম। কিন্তু আমরা যদি তাহাদিগকে মোটামুটি ইংরাজী শিখাইয়া দিতে পারি, তবে প্রতিভা থাকিলে তাহাদের তরু দত্ত বা সরোজিনী নাইডু হইতেও কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য হইল এমন একটা শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবন করা যাহাতে আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলা বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষের প্রকৃত সহযোগিতা করিবার উপযোগী জ্ঞানলাভ করিবেন এবং ভাগাভাগির হিসাবে তাঁহারা বহুদিন হইল যে সকল কাযের ভার বিশেষভাবে গছিয়া লইয়াছেন তাহাও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। যাঁহাদের বিশেষ কোন দিকে প্রতিভা থাকিলে আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালী তাহার বিকাশের সহায়তা করিবে এবং সাধারণ দশজনের মনে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিয়া তাহা নিবারণের উপযোগী একটা general culture দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।

আমার মনে হয় এই চতুর্ব্বিধ আয়োজনই অধ্যাপক কার্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন। তথাকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য বিষয় হইতেছে—ইংরাজী, মাতৃভাষা, স্বাস্থ্য নীতি ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং তৎসঙ্গে পরীক্ষার্থিনীর নিজের পছন্দ মত সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ভূগোল, সূচী-শিল্প, চিত্রাঙ্কন, গীত, বাদ্য প্রভৃতি শিখাইবার ব্যবস্থাও আছে। আমার মনে হয়, নীচের শ্রেণীতে আমরা যদি বালিকাদিগকে বহিঃপ্রকৃতির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় করাইয়া দিয়া তার পর তাহাদিগকে গীত বাদ্য চিত্রাঙ্কন ও সূচী শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করি, তবে তাঁহাদের একসঙ্গে চক্ষু কর্ণ হস্ত ও গলার training হইবে। তৎসঙ্গে তাহারা মাতৃভাষার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবে, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবে।

আমি কার্বের পাঠ্যতালিকা বিনা বিচারে আমাদের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিতে চাহি না। ইংরাজী শিখিতে হইবে, সেই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে একেবারে Tennysonএর Enoch Ardenই পড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ইংরেজী পড়াইব বলিয়া আমরা যেমন আমাদের মেয়েদের একেবারে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতে চাহি না, সেইরূপ কার্বের অনুষ্ঠানের সহিত সহানুভূতি থাকিলেও আমরা একেবারে মহারাষ্ট্রের হুবহু অনুকরণ করিতে চাহি না। কারণ খুব সরল—বঙ্গদেশ বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র নহে। আশা করি কার্বের বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনের পার্থক্য স্বীকার করিবেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দিবেন।

কার্বের বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে কলমে রন্ধন ও গৃহকার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তও আছে, কারণ সেখানকার অধিকাংশ বিদ্যার্থিনীই বিদ্যালয়বাসিনী। এখানে ঠিক সেইভাবে না হইলেও ঐ কাযগুলি শিখাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য আমি একথা বলিতে চাহিনা যে পাচিকা বা ভৃত্যের কার্য্য করাই রমণীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। কিন্তু আজকালকার প্রবল জীবন সংগ্রামের দিনে যখন অনেকের মতে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তখন বঙ্গদেশের অধিকাংশ মহিলাকেই যে কাযটা করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের একেবারে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। বিশেষতঃ খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের যখন অতি নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, রন্ধন সম্পর্কে শিশুর ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্য, রোগীর পথ্য খাদ্য ও পানীয়ে সাধারণতঃ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির যে বীজাণু থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে সকল কথা শিক্ষার্থিনীদিগকে বলিয়া দিতে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে।

কার্বের প্রণালীতে ১১ বৎসরের একটি বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিতে পারিবে এবং একটা general culture লাভ করিতে পারিবে, যাহার বলে

ইচ্ছা থাকিলে কাহারও বিনা সাহায্যেই উত্তর জীবনে তাহার পক্ষে বিদ্যাচর্চ্চা অনায়াসসাধ্য হইবে। কিন্তু কার্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের কায এইখানেই শেষ হয় নাই। সংখ্যায় অল্প হইলেও আমাদের দেশে এমন একশ্রেণীর মহিলা আছেন, যাঁহারা ১৪ বৎসরের পরেও অবিবাহিত থাকিয়া বিদ্যালয়েই বিদ্যাচর্চ্চা করিতে চাহেন এবং করিয়াও থাকেন। ইঁহাদের অপেক্ষাও অল্প সংখ্যক আর একদল মহিলা আছেন যাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। এই উভয় শ্রেণীর পক্ষেই কার্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে শিক্ষিত হইলে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, সুতরাং অধ্যাপক কার্বে ইহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশে অনুরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়েও আমাদিগকে এই দুই শ্রেণীর মহিলার কথা ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং আমার মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে কার্বের বিদ্যালয়ের আদর্শে এক একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলিকাতায় একটি কলেজ স্থাপিত করিতে পারিলে, বাঙ্গালা দেশের স্ত্রীশিক্ষা সমস্যার মোটের উপর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে।

এই সঙ্গে আরও দুইটি কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। এক দল লোক আছেন যাঁহারা পরীক্ষার একেবারে বিরোধী। পরীক্ষা-প্রথার যে ত্রুটি নাই তাহা নহে। কিন্তু এই প্রথার স্বপক্ষে আরও একটা কথা হইতেছে এই যে, নরনারী উভয়েরই চিত্তই যশোলোলুপ। তাহারা উভয়েই কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসার প্রত্যাশা করে। মানুষ বৃদ্ধ বয়সেও একটা লাল বা নীল ফিতা পরিবার অথবা নামের শেষে দুই একটা অক্ষর যোগ করিবার লোভে বহু পরিশ্রম করে। এবং এই উপাধি ও প্রশংসা লোলুপতার ফলে মানব জাতির অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীরই কৃতিত্ব দেখাইবার একটা প্রবল আগ্রহ আছে। এই আগ্রহটাকে কাযে লাগাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট। পরীক্ষার জন্য তাহারা সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে সত্য, কিন্তু পরীক্ষা তুলিয়া দিলে বিদ্যার্থিনীর উৎসাহ যে অনেক কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেটের জন্যই আমরা প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টিকে পুনার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিতে চাই। কারণ একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাদের সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মহিলাদিগের পাঠ্য তালিকা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই মহিলাদিগের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে কতকটা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছে। এবং মহিলা বিদ্যালয় ও কন্যাপাঠশালার আদর্শে স্কুল ও কলেজ স্থাপন বহু ব্যয়সাধ্য হইবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের প্রস্তাবিত এই বিদ্যালয় বোধ হয় আদর্শের হিসাবে একেবারে নিখুঁত হইবে না। কিন্তু আদর্শ বিদ্যালয় কোন দেশেই বেশী থাকে না, এবং দেশের শিক্ষার অভাব ঘুচাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন যে একটি আদর্শ বিদ্যালয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তিনিকেতন একটির বেশী নাই। এবং ভারতবর্ষ ত দূরের কথা, বঙ্গদেশের একটা ছোট মহকুমার শিক্ষার সম্পূর্ণ ভারও শান্তিনিকেতন লইতে পারেন কি না সন্দেহ। এই ভার লইয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সাত শত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। ইহাদের শিক্ষা-প্রণালীতে নানাবিধ ত্রুটি রহিয়াছে সন্দেহ নাই তথাপি এই স্কুলগুলিকে আজ তুলিয়া দেওয়া চলে না। আমার বিশ্বাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলগুলি বাঙ্গালী বালকদের শিক্ষার জন্য যাহা করিতেছে, কার্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি স্কুল ও কলেজ বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য

তদপেক্ষা অনেক বেশী কায করিতে পারিবে। আদর্শ বিদ্যালয় যাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কার সমিতি এই বিরাট দেশের দশটি বা বিশটি বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; বাঙ্গালা দেশের ৪ কোটি মহিলার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং এই ৪ কোটির মধ্যে অধিকাংশের পক্ষে যে শিক্ষাপ্রণালী অনুকূল হইবে, বঙ্গীয় সমাজ-সমিতির সেই প্রণালীর অনুসরণ করাই সঙ্গত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ভাঙ্গা আয়না

আমি একখানা ভাঙ্গা আয়না। আমার সর্ব্বাঙ্গই বক্ষ ও হৃদয়। বুকখানা আমার যত বড়, হৃদয়টুকুও আমার ঠিক ততটা; এক চুলও কম বেশী নয়। আর আমার চতুর্দ্দিকের যে বেষ্টনী আমার ভাঙ্গা বুকের টুকরাগুলিকে ঘন সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমার বক্ষ ও হৃদয়ের রক্ষক আবরণী মাত্র।

আমার যে এই এত বড় বুক, তাহা একদিন ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমি এই ভাঙ্গা বুক, এই ভাঙ্গা হৃদয় লইয়া কি করিব? এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে এড়াইবার তো কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিয়া তিলে তিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরার চেয়ে, ভগবান আমার এই ব্যর্থ জীবনটাকে একেবারে শেষ করিয়া দিলেন না কেন? তোমরা তো মানুষ, তোমরা কি এত কষ্ট সহ্য করিতে পার? তোমরা মুখে বল বটে "অমুকের বুকখানা শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে; অমুকের বুকের পাঁজরা একেবারে ঝাঁঝরার মত হয়ে গিয়েছে" ইত্যাদি—কিন্তু সত্যই কি তাই? না তোমাদের নিজকৃত কল্পনার ব্যাধি ও মনের বিকার? তবুও তো তোমাদের সে সব মনোবিকার-জনিত যন্ত্রণা নিবারণের অনেক উপায় আছে এবং ভগ্ন অস্থি জোড়া দিবার ও তজ্জনিত যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত মেডিকেল কলেজ আছে, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল আছে, ক্লোরো-ফরম্, মরফিয়া, ব্রিষ্টার, কোকেন ইত্যাদি কত কি আছে। কিন্তু হায় হায়, আমার এ যন্ত্রণা নিবারণের কোন ভিষক নাই, কোন ভেষজ নাই, কোন ভৈষজ্যা-লয়ও নাই। আজীবন আমাকে এই অসুহ্য যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেই হইবে। কেন? কি অপরাধ করিয়াছি আমি যে, আমার এই শাস্তি?

ভাল কথা,—একটা উপায় আমার মনে পড়িয়াছে। তোমরা যদি কেহ দয়া করিয়া আমাকে একটা কোন গ্লাস ফ্যাক্টরীতে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে এই ভগ্ন ও জীর্ণ দেহখানা ত্যাগ করিয়া পুনরায় নবকলেবরে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" গীতার এই বাক্যের সার্থকতা তোমাদের হাতে হাতে দেখাইয়া দিয়া নূতন জীবনের সূত্রপাত করি।

আমার এই ভাঙ্গা বুকের কাহিনী তোমরা শুনিবে? আমার এই যে শোচনীয় পরিণাম, ইহা খালি পরের জন্য। পরকে ভালবাসিয়া, পরকে বুকে ধরিয়া যে এত কষ্ট তাহা কে জানিত! কলিকাতার কোন ক্ষুদ্র মনোহারীর দোকানে আমার প্রথম অবস্থিতির কথা মনে পড়ে। তখন কোন জ্বালা ছিল না, আপন বশে থাকিয়া দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত। দোকানী আমাকে বেশ যত্ন করিত। প্রত্যেক দিন দোকান খুলিয়া তাহার প্রধান কার্য্য ছিল, দোকানে বিক্রয়ার্থ সজ্জিত জিনিষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। তৎসঙ্গে

সে আমার প্রসাধনটা বেশ একটু মনোযোগ দিয়াই করিত। কারণ দোকানে যে কয়খানি আয়না সুসজ্জিত থাকিত, তাহার মধ্যে আমিই ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সব চেয়ে পটু ছিলাম। তবু ইহাও জানিতাম যে, আমার উপর দোকানীর এই যে যত্ন ও ভালবাসা, ইহা কোন মতেই নিঃস্বার্থ নয়। দোকানী প্রত্যেক দিনই আমার অঙ্গসেবা শেষ করিয়া, যখন তাহার সেই শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখখানির স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, আমার সঙ্গে বেয়াদপি জুড়িয়া দিত, তখন আর আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতাম না।

এই রকম ভাবে কতদিন যে সেই দোকানে দোকানীর নজরবন্দী অবস্থায় ছিলাম, তাহা আমার ঠিক মনে নাই। সহসা একদিন দেখি, একটী সুন্দর যুবা ব্যস্ত ভাবে দোকানে প্রবেশ করিয়া, আমাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল ও দোকানীকে আমার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল। যুবকটি কলেজের একজন ছাত্র। সম্মুখে শারদীয়া পূজা; পূজার ছুটিতে যুবক বাড়ী যাইবে। সেদিন চতুর্থী কি পঞ্চমী,—অনেক দিনের কথা কি না, ঠিক স্মরণ হয় না। যুবকের চোখে ও মুখে ব্যস্ততার লক্ষণ দেখিয়া তাহার তখনকার মানসিক অবস্থাটাও আমি বেশ বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইলাম। কারণ আমার বুকের উপর কাহারও আকৃতির প্রতিবিম্ব পড়িলে, আমি তাহার মনোগত ভাবটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। ঐটুকুই আমার বিশেষত্ব। একটি লাজনম্রা বধূর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তখন তাহার হৃদয়টি পরিপূর্ণ। স্নেহময়ী জননীর মঙ্গলাশীষ-মাখা হস্ত যে তাহার মস্তকোপরি উদ্যত হইয়া আছে, তাহা যেন সে পলকে পলকে দেখিতে পাইতেছিল। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত বৈঠকখানার আনন্দ, কোলাহল, থাকিয়া থাকিয়া যেন তাহার কর্ণে আসিয়া মধু বর্ষণ করিতেছিল। তার উপর, আনন্দময়ীর আগমনোদ্দেশে দেশ তখন আনন্দকোলাহলে ভরপুর। সে সময়ে প্রবাসী বাঙ্গালী যে যেখানেই থাক, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে কাহার প্রাণ কাঁদিয়া না উঠে? সম্বৎসর পরে জন্মভূমির কোলের সে আনন্দ মেলায় যোগ দিতে যে না পারে, সে প্রকৃতই হতভাগ্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যুবক আমাকে কিনিল; তার পর আরও গুটিকয়েক সৌখীন দ্রব্য কিনিয়া লইয়া, তাড়াতাড়ি কলিকাতার সেই জন-সংক্ষুব্ধ রাজপথের কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা ঠিক মনে নাই।

* * *

যুবক বাটী আসিয়াছে। তাহাকে লইয়া সকলেই আনন্দ করিতেছে, বধূ-লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে আজ আর আনন্দ ধরে না। আমি কিন্তু তখনও পোর্টম্যাণ্টোর মধ্যে বন্দী। বাহিরের এত আনন্দ কোলাহল শুনিয়া, সেই স্বল্পপরিসর ক্ষুদ্র পোর্টম্যাণ্টোরূপ কারাগারে তিষ্ঠান আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম, আমার সেই কলিকাতার মনোহারীর দোকানে পড়িয়া থাকা যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল! সেখানে প্রতিদিন কত কাঁচা পাকা মুখ দেখিতে পাইতাম, আর দোকানীর দৈনন্দিন শুশ্রূষা ও যত্নে দিনগুলা কাটিয়াও যাইত বেশ। এ লোকটারই বা কি আক্কেল দেখ ত। আমাকে কত যত্নে কত আগ্রহে লইয়া আসিল, এখনও পর্য্যন্ত কি একবার আমার খোঁজটাও লইতে নাই?

এই রকম কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছি এমন সময়ে যেন সেই ঘরে দুইটি মানুষের সদ্য আগমন বুঝিতে পারিলাম। মৃদু মধুর অস্ফুট কলহাস্য ও বলয় নিক্কণের শব্দে, আমার হৃদয়খানা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজনের স্বর পরিচিত, আর, একজন যে কে, তাহা অনুমানে বুঝিয়া লইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কট্ কট্ শব্দে পোর্টম্যান্টোর চাবি খুলিয়া গেল—ডালাটি উঠিয়া পড়িল—বাহিরের বাতাসে আমি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

তার পর যুবক স্ত্রীর জন্য যে সব প্রীতি উপহারগুলি লইয়া আসিয়াছিল, সেগুলি একে একে পোর্টম্যাণ্টো হইতে বাহির করিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিল। সে যে কি বলিয়া স্বামীর সেই সাত-রাজার-ধন অমূল্য

দানগুলি গ্রহণ করিয়া স্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, সে ভাষাই সে তখন খুজিয়া পাইতেছিল না। তাহাকে এতদিন মনে রাখিয়া, তাহার প্রেমময় স্বামী যে এই অযাচিত প্রণয়-নিদর্শন সহ, তাহার স্নিগ্ধ অঞ্চল তলে ছুটিয়া আসিয়াছে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সেই কিশলয়দল-সন্নিভ সুন্দর গণ্ডস্থল, আনন্দে লজ্জায় ও গৌরবে আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সুদূর প্রবাস হইতে তাহার দেবতা যে তাহারই জন্য এত কষ্ট করিয়া এই জিনিষগুলি লইয়া আসিয়াছেন, সেগুলি সে কি করিবে?—যদি কখনো মরিতে হয়, তো সেই স্মৃতির দানগুলি মরণান্তকাল পর্য্যন্ত বুকে করিয়া রাখিয়া, তবে সে মরিবে!

বালিকা যখন এই রূপ অন্যমনস্ক ভাবে জাগিয়া জাগিয়াই সুখস্বপ্নে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিল, তখন যুবক আমাকে বাহির করিয়া তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "দেখ ত আয়নাখানি কেমন হয়েছে।"

"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু"—এই বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বালিকা, তাহার হাত হইতে আমাকে বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত কাড়িয়া লইয়া, সেই কুসুমিত বক্ষে আমায় আবৃত করিয়া চাপিয়া ধরিল। আমি তখন সেই কোমল বক্ষের কোমল স্পর্শ ও কোমল স্পন্দন অনুভব করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, যদি চিরজীবনটা এই হৃদয়-কারায় আবদ্ধ হইয়া, এই নূতন প্রাণে মিশিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে আয়না জন্মটা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি আছি।

বালিকা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল কি না জানি না, আমি কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তেই তাহার সেই টুকটুকে সুন্দর মুখখানি আমার বুকের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া, আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে টানিয়া লইয়াছিলাম।

বালিকার ঐরূপ ব্যবহারে যুবক একটু অপ্রস্তুত হইয়া ওরকম ভাবে আয়নাখানা কাড়িয়া লইবার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, বালিকা লজ্জায় চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল,—"না থাক্ তা বল্‌তে নেই।"

কিন্তু যুবকের পীড়াপীড়িতে মরমে মরিয়া তাহাকে বলিতেই হইল, "স্ত্রীলোকে রাত্রিতে আয়নায় মুখ দেখ্‌লে কলঙ্কিনী হয়।" এই বলিয়া সে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

"ও একটা কথার কথা; এরই জন্য এত"—এই বলিয়া যুবক তাহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া, সেই কুঙ্কুমপরাগরঞ্জিত রাঙা ওষ্ঠপুটে একটি গাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তাহাকে জানাইয়া দিল যে, ওরূপ ভাবে আয়না কাড়িয়া লইওয়ার শাস্তি এই।

বালিকা আমাকে পাইয়া তাহার সেই পুরাতন আয়নাখানির কথা যেন একেবারেই ভুলিয়া গেল। আমিও নূতন, বালিকাও নূতন, নূতনে নূতনে আমাদের বেশ মিল হইয়া গেল! নূতনের সঙ্গে নূতন বুঝি এমনি করিয়াই মজে। তবে ভয়, একটু পুরাতন হইলে একটু রঙের জেলুস কমিলেই, যদি বালিকা আমাকেও তাহার সেই পুরাতন খানির সামিল করিয়া ফেলে! তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? আমি যে তাঁহার রূপ বুকের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়াছি—সে বুক যদি খালি হইয়া যায়, তবে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?

আজকাল রূপজ মোহ পুড়িয়া কতজনার যে কত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। মধুর যৌবন সমাগমে এই ব্যাধিগুলি মানবদেহে আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। কতকগুলি লক্ষণ (symptoms) দেখিয়া এই ব্যাধিগুলির আক্রমণ ঠাহর করিয়া লইতে হয়। কেহ কেহ গেরুয়া বস্ত্র পড়িয়া যৌবনে যোগী সাজিয়া বসে,—আবার কেহ চোখে চশমা পরিয়া এবং গোঁফে তা দিয়াও চোখের জলে নাকের জলে সিল্কের উড়ানী ও সাধের পাঞ্জাবী ভিজাইয়া আকুল হইয়া বেড়ায়। কেহ কেহ সন্তরণে নদী পার হয়, উল্লম্ফনে প্রাচীর লঙ্ঘন করে, চাঁদের জোছনায় মূর্চ্ছা যায়, নির্জ্জনে কবিতা লেখে, হাঁসে, কাঁদে হাহুতাশ করে, ইত্যাদি। এইগুলির উপর আর একমাত্রা উঠিলেই উদ্বন্ধন আছে, বিষ আছে, খুন জখম আছে; আর নিরাশ প্রণয়ের শেষের সম্বল আছে—দড়ী আর আর কলসী!

যাক্, আর পরচর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করিব না; যাঁহার কথা বলিতে বলিতে এতটা অপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি, তাহারি শেষ কথা কয়টি বলিয়া হৃদয়ভার একটু লঘু করিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বালিকা আমায় পাইয়া পুরাতন আয়না খানি আর স্পর্শও করিত না। সেদিন স্বামীর হাত হইতে যাহাকে কাড়িয়া লইয়া বুকে ধরিয়াছিল, তাহাকে কেমন করিয়া সে সঙ্গছাড়া করিবে? বালিকা প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণে প্রসাধনার্থে আমাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার একরাশ খোলা চুল লইয়া অন্তঃপুরের নির্জ্জন বারান্দার ধারে তাহার অলক্তক-রাগরঞ্জিত পা দুখানি ছড়াইয়া দিয়া, লক্ষ্মী প্রতিমার মত বসিয়া পড়িত, তখনকার সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। বারান্দার নীচে ফুলে ভরা জুঁই ও চামেলী ফুলের গাছগুলা, বৈকালিক স্নিগ্ধ সমীরণে যেন শিহরিয়া উঠিয়া, সেই রাঙা পায়ে তাহাদের মাথা নোয়াইয়া দিতে চাহিত, আর ফুলগুলি স্পন্দিত পাপড়ি লইয়া, তাহাদেরই মত কোমল কপোলের স্পর্শসুখ অনুভব করিবার জন্য যেন অধীর হইয়া উঠিত। শতদলবাসিনী বীণাপাণির মত সেই পত্র-পুষ্প-স্তবকে খচিত সুন্দর মুখখানি, যখন আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আমাকে সুখস্বপ্নে বিভোর করিয়া রাখিত, তখন বুঝিতে পারি নাই যে, ঐ মুখের সহিত আমার জীবন মরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কতখানি।

এই ভাবে কতদিন যে আমি কাটাইয়াছি, তাহার হিসাব এখনও পর্য্যন্ত জপমালা হইয়া আছে। কিছু দিন পরে দেখি, বিধাতা আমার সুখে বাদ সাধিলেন। অতটা সুখ সহিবে কেন? বিধাতার বিধান যে অন্যরূপ! আমার সুখস্বপ্ন বুঝি সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া যায়—বালিকাকে আর দেখিতে পাই না। একদিন দুই দিন করিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তবুও বালিকার দেখা পাই না। এ-কি হইল, বালিকা কোথায় গেল, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় মাঝে মাঝে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিত, আবার মনকে প্রবোধ দিয়া আশার মোহে বুক বাঁধিয়া, অযত্নরক্ষিত ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় গৃহকুট্টিমে পড়িয়া পড়িয়া থাকিতাম। কতদিন কত মাস এইরূপভাবে কাটিয়া গেল, বর্ষ ফিরিয়া আসিল, তবুও তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। কতজনার কত রকমের পায়ের শব্দ, নূপুরের শিঞ্জিত, গলার স্বর শুনিতে পাই, কিন্তু বালিকার সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া সমস্তই যেন বেসুরো ঠেকে। তাহার চারুচরণের মৃদুল গতি যে হাওয়ার চেয়েও লঘু, তাহার পদ-নূপুরের মধুর শিঞ্জন যে সেতারের বাদ্যের চেয়েও মিষ্ট, তার অমিয়বর্ষী কমকণ্ঠে যে এস্রাজের ঝঙ্কারও স্থান পায় না! আমাকে ভুলিয়া যে সে এই বাড়ীতে থাকিতে পারে, তাহার কোন লক্ষণ আমি দেখিতে পাইলাম না, তবে তার কি হইল?

এইরূপ অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় যে আমার কতদিন গিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। সহসা একদিন সেই পরিচিত হস্তের মৃদু স্পর্শে আমি চমকিয়া উঠিলাম। কত দীর্ঘকালের পর, আবার আমার বক্ষ তেমনি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। স্বামীর হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া সেই দিন, যেমন করিয়া আমায় বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তেমনি করিয়াই সে প্রথমে আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু বক্ষ-স্পর্শে সে কোমলতার লেশমাত্রও আজ অনুভূত হইল না, সে কোমল স্পন্দন যেন বেতালা ঠেকিল। কম্পিত প্রাণে সে যখন আমার বক্ষে চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন তাহার সীমন্তে সিন্দুরের কোন চিহ্নই দেখিতে না পাইয়া বুঝিলাম, হতভাগিনীর নিশ্চয়ই কপাল ভাঙ্গিয়াছে!

সে তাহার মুখ দেখিয়া প্রথমে যেন নিজেকেই চিনিতে পারিল না। দুই ফোঁটা তপ্তাশ্রু আমার উত্তপ্ত বক্ষে টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল, আর সেই সঙ্গে তাহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি আর সেই বিষাদ-প্রতিমার শোচনীয় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, তাহার ক্ষীণ কম্পিত হস্ত হইতে ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িলাম।

সে গুরুতর আঘাত আমি সহ্য করিতে পারিলাম

না। বুকখানা ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল। এক নিমেষের মধ্যে আমার যত কিছু সাধ, সম্বল, আশা, আকাঙ্ক্ষা —সমস্তই চিরদিনের জন্ম অবসান হইয়া গেল। এখন আমার আছে কেবল সেই পুরাণো দিনের স্মৃতিমাখা এই ভাঙ্গা বুক। সেই স্মৃতি বুকে ধরিয়া রাখিয়া আজও আমার অস্তিত্ব, আজও আমি ভাঙ্গা আয়না।

শ্রীপিণাকীলাল রায়।

অহঙ্কারের অভিমান

১। সাংখ্যের অপবর্গ।

পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া কপিল-দর্শন যে তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম আমরা যথাসাধ্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন এইটুকু মাত্র দেখিতে বাকী আছে, কিরূপে মুক্তি বা অপবর্গ সেই তত্ত্ব-আলোচনার সহজ ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

এই অপবর্গের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গোড়াতেই একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় প্রধান দর্শন সকলের অপবর্গই হইতেছে চরম প্রতিপাদ্য। ঐ সকল দর্শনের পক্ষে তাহা কোন এক অবান্তর সিদ্ধান্ত বা গৌণ কল্পের মতবাদ মাত্র নহে। তাহাদের সমস্ত বিচারণা-তন্ত্রের ইহাই মূর্দ্ধা প্রাণ। এবং অপরাপর দর্শনের মধ্যে, সাংখ্য এই অপবর্গের মুখ্য সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে গিয়া, শুধুই অপৌরুষেয় শ্রুতি, কিংবা অলৌকিক দৈবাদেশেরই উপর নির্ভর করেন নাই। তিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপকে জন্ম তন্ময়রূপে বিভাগ ও বিশ্লেষণ করিয়া, ইহার গতি ও প্রকৃতির মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ইহার পরিণাম ও অভিব্যক্তির অভিসন্ধিতে-গূঢ় প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার "নব-দ্বার নিবিদ্ধ-বৃত্তি" চিত্তকে যোগের সমুচ্চ পদবীতে উপরুদ্ধ করিয়া, তবে এই অপবর্গের গরীয়সী তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, 'আদি বিদ্বান্', জগতের সেই যে অজানা 'সকালবেলায়', তাঁহার বিচারণা ও তত্ত্ব আলোচনার তরণীকে অকূল জ্ঞান-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা শুধুই কৌতূহলের 'জল-খেলার' জন্য নহে। তিনি এই অপবর্গের বাণিজ্যেই, নিবিড় বিচারের পা'ল তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, আলোচনার 'বি-জ্ঞান' বা 'বিশিষ্ট জ্ঞান' দ্বারাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ-স্বরূপ অপবর্গ সিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে।

দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ স হি অবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্, ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ॥

—দুঃখ বিনাশের ঔষধাদি লৌকিক উপায় আছে, এবং যজ্ঞাদি বৈদিক উপায়ও বিদ্যমান। কিন্তু এই দুই প্রকার উপায়, পশুহিংসা প্রভৃতি বশতঃ অবিশুদ্ধ, এবং দুঃখের পুনরাবৃত্তি সম্ভাবনা বশতঃ অতিশয় ক্ষয়যুক্ত উপায়। এই জন্ম এই দুই প্রকার উপায়ের দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। ইহার বিপরীত যে উপায়, যে উপায় দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে,—তাহা হইতেছে অব্যক্ত প্রকৃতি, ব্যক্ত জগৎ, এবং জ্ঞাতা পুরুষ সম্বন্ধে 'বি-জ্ঞান' বা 'বিশিষ্ট জ্ঞান'। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, সাংখ্য বিচারণা, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-আলোচনার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বনে অপবর্গকেই লক্ষ্য করিয়াছিল, কেন না ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অপবর্গ।

কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই, এই যে অপবর্গ— যাহাকে পাইবার জন্ম সাংখ্য ও যোগের জ্ঞান ও কর্ম্ম

মার্গে যুগান্তব্যাপিনী কৃচ্ছ্রসাধনা চলিয়াছিল, যে জন্য হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সাংখ্যযোগী সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্যের বিবিক্ত যোগাসনে বসিয়াছিলেন, সেই অপবর্গ, বেদবাদের স্বর্গলোক নহে, কামনার কল্পদ্রুম সমাচ্ছন্ন অমরাবতী নহে, ইহলোকের ধনৈশ্বর্য্যের পরমা ঋদ্ধি নহে,—কিন্তু তাহা শুধুই কৈবল্য বা কেবল-ভাব মাত্র, যাহাতে এই 'দ্রষ্টা' আত্মা, 'দৃশ্য' বিশ্বজগতের মধ্যে এক অনাসক্ত, উদাসীন, নির্ব্বিকার রূপে অবস্থিত মাত্র হয়েন। সেখানে লাভ বা উপচয় বলিয়া এতটুকুও সুখলেশ নাই, সেখানে দুঃখের অনন্ত অপচয় মাত্র বিদ্যমান। আমরা জানি, উপনিষদের ঋষি, স্বর্গ হইতেও তাঁহার 'অমৃতত্বকে' বড় করিয়াছিলেন। তাহা স্বর্গের ভোগসুখ না হইলেও, ঋষি তাঁহার অমৃত মুক্তিকে এক বিপুল, উদার ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাংখ্যের নির্দ্দয় দার্শনিক তর্ক করিয়াছিলেন যে মুক্ত আত্মা চিদ্রূপ ও আনন্দরূপ হইতে পারে না,—'দ্বয়োর্ভেদাৎ' (সাং দঃ—৫।৬৬)। তাঁহার মুক্তি কোনই আনন্দময় মুক্তি ছিল না,—তাহা ছিল কেবল "অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা।" (৬।৫)

আবার এই যে মুক্তি, ইহা শুধু কোন বিশেষ দেশ কালের বিশিষ্ট সাধনার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ কৃতকৃত্যতা বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। ইহা শুধুই শাস্ত্রের বিধি নিষেধ কিংবা জ্ঞান ও কর্ম্মের কোন বিধিবদ্ধ সাধন-তন্ত্রের মধ্যেই সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। বিশাল সৃষ্টির অনাদি বিধানেও ইহা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ও পরম কৃতকৃত্যতা বলিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বিদেশের পণ্ডিতেরা নাও বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু সাংখ্যের বৈজ্ঞানিক একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবের এই অপবর্গ-বিধানকে সার্থক করিবার জন্যই সৃষ্টির এই বিশাল পরিক্রম-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন বিজ্ঞান বাস্তবিকই অনুভব করিয়াছিল, জগতে এই যে রূপ হইতে রূপান্তরের এবং রস হইতে রসান্তরের উৎপত্তি হইতেছে,—এই যে ইহার জন্ম ও মৃত্যুর সহযোগের বিচিত্র লীলা চলিয়াছে, ইহার আশ্চর্য্য গতি ও বিচিত্র পরিণতির এই যে অপার রহস্য প্রকটিত হইতেছে,—এই সকলেরই চরম উদ্দেশ্য ও অর্থ ঐ অপবর্গের মধ্যেই নিহিত আছে।

"ইত্যেষঃ প্রকৃতিকৃতঃ মহদাদি-বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ।
প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থঃ আরম্ভঃ॥

—এই যে প্রকৃতকৃত মহদাদি ক্রমে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সৃষ্টি, ইহা প্রতি পুরুষের বিমুক্তির জন্যই সৃষ্টি। সৃষ্টিতে প্রকৃতির সে স্বার্থবৎ প্রযত্ন দেখা যাইতেছে, তাহা প্রকৃতির পক্ষে স্বার্থ নহে, পরার্থ প্রযত্ন। অপিচ—"পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদব্যক্তম্"—পুরুষের বিমুক্তির জন্যই সৃষ্টিতে অব্যক্ত প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সাংখ্য তাঁহার মুক্তিকে এইরূপে বিপুল ও অনন্ত বিশ্ববিধানের সহিত অভিসম্বদ্ধ রূপে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সে মুক্তি কোন ধর্ম্মবিশেষ বা মত-বিশেষের ক্ষুদ্র মুক্তি হইতে পায় নাই। তিনি জগৎরূপকে যেমন ব্যাপক বিপুলতার মধ্যে প্রণিধান করিয়াছিলেন, তাঁহার কৈবল্যকেও তেমনি মহাকালের বিপুল ব্যাপ্তির মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন মুক্তিবাদের সুদুর-অবগাহী রাগ, কোনই পরিমিত আয়ুষ্কাল কিংবা নিয়মিত ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাহার অনন্ত-প্রসারিণী মূর্চ্ছনা সৃষ্টি ও প্রলয়ের উদার ও ব্যাপক রাগের সহিত সংমূর্চ্ছিত হইয়াছিল। তাহা সুদূরতম গ্রহতারকাতেও গুঞ্জরিত হইয়াছিল, উদধির কলকল্লোলেও উদ্গীত হইয়াছিল। তাহা অনন্তকোটি জীবের, অনাদি কালের জন্ম ও কর্ম্মের মধ্যে পরিস্পন্দিত হইয়াছিল।

এই জন্যই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, বিশ্ব প্রকৃতির পক্ষে যাহা বিশ্ব-লীলা, জীবের পক্ষে তাহাই সংসার। এবং সৃষ্টির পক্ষে যাহা প্রলয়, জীবের পক্ষে তাহাই মুক্তি। বিশ্বই তাহার বন্ধন এবং প্রলয়ই তাহার মুক্তি। তাঁহার মতে মুক্ত পুরুষ তিনিই, যাঁহার বিশ্ব প্রপঞ্চ নষ্ট হইয়াছে, বিশ্বলীলা চির-অবসান লাভ করিয়াছে। "কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টং তৎ অন্য

সাধারণত্বাৎ" (পাঃ দং—২।২২) একজন কৃতার্থ পুরুষের প্রতি জগৎ নষ্ট হইলেও, তাহা অনষ্টই থাকিয়া যায়, কারণ অন্যান্য অকৃতার্থ পুরুষেরও তাহা সাধারণ বিষয়। কিন্তু তথাপি কোন একজন পুরুষের মুক্তিকে সিদ্ধ হইতে হইলে, সেই পুরুষের পক্ষে বিশ্বের বিলয় এবং সৃষ্টির বিরতি না হইলে, সে মুক্তি সিদ্ধ হয় না। ইহাই সাংখ্য মুক্তির ব্যাপক বিধান। এবং বোধ হয় এই বিধান হইতেই বুদ্ধদেব তাঁহার নির্ব্বাণের বিধান লাভ করিয়াছিলেন।

নবীন শিক্ষা ও বিপরীত সংস্কারের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া আমরা আমাদের এই নিজস্ব মুক্তিবাদকে সহজ শ্রদ্ধার মধ্যে দেখিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্য মুক্তি প্রসঙ্গে একদিকে যেমন অসঙ্গত ভাবোচ্ছ্বাসের সুবিরাম আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি স্বয়ং সন্তুষ্ট-বিজ্ঞতার অথবা সুলভ রহস্যের অবাধ প্রসারও লক্ষিত হয়। কিন্তু তত্ত্ব আলোচনার যাহা ঐতিহাসিক রাজ্য, তাহা অপরিমিত ভক্তি, অতিশয় বিজ্ঞতা ও চর্ম্ম-স্পর্শী রহস্যের দ্বারা সর্ব্বদাই অপরাহত। তাহা অতি-ভক্তির স্বর্গলোকও নহে, এবং অনাস্থার মর্ত্ত্যলোকও নহে, তাহা মধ্য প্রদেশের এক ত্রিশঙ্কুর রাজ্য। সেখানে স্বর্গের পারিজাত গন্ধও পশে না, কিম্বা মর্ত্ত্যের ধূম-উৎপাত (smoke nuisance) দ্বারা ও তাহা পরামৃষ্ট হয় না। সেই ত্রিশঙ্কুর রাজ্য হইতে সাংখ্যের মুক্তিবাদকে না পাঠ করিলে, ইহার স্বাভাবিক সহজ রাগ ধরা পড়ে না।

সেই জন্য এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, প্রাচীন মুক্তিবাদী এই বিশ্বরূপকে কোন্ স্বাভাবিক রূপে ও সহজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মুক্তি তাঁহার পক্ষে এক স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্তরূপে বিবেচিত হইয়াছিল।

২। বিশ্বরূপের বিপরীত প্রতীতি।

জগতের এই অশেষ বৈচিত্র্য ও অনন্ত পরিণামকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র বিশ্বরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "তথৈব বহু-রূপত্বাৎ বিশ্বরূপ ইতি স্মৃতঃ" (ইতি মোক্ষধর্ম্মে)। এই বিশ্ব প্রকৃতির বহুরূপ বলিয়া ইহা বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবীন ও প্রাচীন বিজ্ঞান দুই বিপরীত দিক্ (points of view) হইতে এই বিশ্বরূপকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান, বিশ্বরূপের এক যে জ্ঞানরূপও আছে, তাহা উপেক্ষা করাই সমীচীন বিবেচনা করিয়া থাকেন। Metaphysics নামে যে এক সুবিদিত দৈত্য আছে, তাহাকে আধুনিক "অপহতা রক্ষাংসি" মন্ত্রে সর্ব্বাগ্রে নিবারণ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকের জগৎ শুধুই 'The world as it is'। সেই জগৎই তাঁহার পরীক্ষা ও বিচারের আরম্ভ-ভূমি। কিন্তু বিড়ম্বিত প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান যখনই সেই পরীক্ষা ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনই এ কথা ভুলিতে পারে নাই যে, যে আন্তর ও বাহিররূপ লইয়া এই বিশ্বরূপ, তাহা স্বরূপতঃ এক জ্ঞাতার জ্ঞানরূপও বটে।

এই জন্য বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, চেতন ও জড় লইয়াই তাহার বিচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, আমাদের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রায় সমস্ত বিভাগেই, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য পুরুষ এবং প্রকৃতি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অথচ এই স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত ফল-স্বরূপে এমন কোনই দার্শনিক সন্দেহ-বাদ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন সনাতন প্রতারণার ব্যবস্থাও সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজকালকার দার্শনিক বিজ্ঞানের প্রধান সন্দেহ হইতেছে, "আমাদের চিত্ত-বিধান (psychical system) আমাদিগকে ঠকাইয়া কোনও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দেখাইতেছে না ত?" "The question to which the whole of our modern system of philosophy addresses itself is, how do the mind and universe communicate with each other, and what security we have

that they really find each other out ?" *—ইহা অবশ্যই প্রাচ্যদর্শনের সন্দেহ নহে। সে দর্শনের বিচারণা স্বতঃসিদ্ধ রূপে মানিয়া লইয়াছে, জগৎকে সত্যরূপে জানিবার অধিকার অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট জীবেরই, অন্য কাহারও নহে। অদ্বৈতবাদও এ কথা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার জগৎ-মিথ্যাবাদের আপত্তি ইহা নহে যে, জগৎকে সত্যরূপে জানিবার পক্ষে সৃষ্টির বিধানে এক অক্ষয্য ও চিরন্তন বাধা আছে। মায়াবাদের ইহা যুক্তি নহে। কিন্তু একটু খোলসা করিয়া এ কথা বলা প্রয়োজন।

মায়াবাদ এ কথা বলেন না যে, জগতের সত্যরূপ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বথাই অনবধার্য্য। ইহা তাঁহার যুক্তির ব্যথা নহে। সে ব্যথা হইতেছে এই—অভ্রান্ত ও আপ্তশ্রুতির নিদর্শন অনুসারে এই 'নামরূপে' গঠিত জগৎ, ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সাধারণতঃ অবধারণা হয় না, নাৎ-রূপ আকারেই প্রতিপন্ন হয়। ইহা অবিদ্যাবশে জগতের বিরূপ ধারণা। এবং শুধু শ্রুতি নহে, যুক্তি বশেও আমরা দেখিতে পাই, জীব বিষয়ীতে বিষয়-ধর্ম্ম, এবং বিষয়ে বিষয়ী ধর্ম্ম মিথ্যা আরোপ করিয়া লোক-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই আরোপ বা 'অধ্যাস' ইহাও অবিদ্যা। কিন্তু ইহা অবার্ধ্য অবিদ্যা নহে। সাধনার দ্বারা জীব যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তখন সে বিশ্বের সত্যরূপও দেখিতে পায়। অতএব মানিতে হইবে, শঙ্কর-বাদের মধ্যেও জগৎরূপ অজ্ঞের বলিয়া কোনই হতাশের দীর্ঘশ্বাস নাই। তাহার মর্ম্ম ইহা নহে যে অনাদি প্রতারণার মধ্যেই এই অভিশপ্ত জীব, অনন্তকাল ভ্রান্ত দর্শন করিতেই সৃষ্টির নিয়মে বাধ্য হইয়াছে।

সাংখ্য কোনই চিহ্নিত মায়াবাদী নহেন। তথাপি তাঁহার তন্ত্রেও অবিদ্যা বা ভ্রান্ত দর্শনের পরিসর বড় কম নহে। তিনি স্পষ্ট বাক্যে, অবিদ্যার মধ্য দিয়া বিরূপ বিশ্বদর্শন স্বীকার করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি এই বিরূপ জগৎরূপ দর্শনের নাম দিয়াছিলেন—'অদর্শন' কিন্তু তাহা কোনই চিরস্থায়ী ও অন্তহীন 'অদর্শন' নহে। "দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্য অদর্শনস্য নাশঃ"—দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হইলে বন্ধকারণ অদর্শনের নাশ হয়। অতএব এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন বিধিবদ্ধ সনাতন প্রতারণার ব্যবস্থা নাই।

সে জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের যাহা যাচিয়া-লওয়া সন্দেহ—জ্ঞান হয়ত বা এক চিরভ্রান্ত বিশ্ব-দ্রষ্টা—তাহা আমাদের কোন সন্দেহের মধ্যেই নহে। সত্যার্থ দ্রষ্টা-রূপেও জ্ঞানকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলাম।

কিন্তু জ্ঞান সত্যদ্রষ্টা রূপে স্বীকৃত হইলেও, বিশ্বের এই বিচিত্ররূপ বা বিশ্বরূপকে, জ্ঞানে প্রতিপন্ন করিবার জন্য সৃষ্টির অভিসন্ধি বশে এক ইন্দ্রিয় বা করণ উৎপন্ন হইয়াছিল,—তাহার নাম অন্তঃকরণ। আমাদের যাহা চিত্ত বিধান (mental system), তাহাই হইতেছে সৃষ্টির সেই কৌশল, যদ্দ্বারা জগৎরূপ জ্ঞানে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই অন্তঃকরণ বা মনের মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ভারতবর্ষীয় দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞার সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞার যে আভ্যন্তরীণ প্রভেদ, তাহা বড়ই গুরুতর প্রভেদ। সেই প্রভেদকে উপেক্ষা করিয়া আমরা কোনক্রমেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিককে সৌভ্রাত্র সূত্রে এক সংসারভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনকে অন্য দেশীয় দর্শনের 'কোটেসন' দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাইলে অনেক সময়ে 'অন্ধপরম্পরার' প্রসঙ্গ আসিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রভেদটা যে কত বড় প্রভেদ তাহা দেখাইতেছি।

৩। চিত্তসত্ত্ব।

সাংখ্যের দর্শনকার যাহাকে 'বুদ্ধি' বা 'অন্তঃকরণ' বলিয়াছেন, যোগশাস্ত্রে তাহাকেই অধিকন্তু ভাবে 'চিত্ত', 'চিত্ত-সত্ত্ব', 'দর্শন', 'মনঃ' প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে।

* Dr. Martineau's Types of Ethical Theory, Vol. I. p. 24.

তাহাদের উভয়েরই মতে এই মন হইতেছে এক দ্রব্য (substance), এবং সেই দ্রব্য, মহৎ প্রভৃতি বিশ্বের সূক্ষ্ম এবং ত্রিগুণবিশিষ্ট ধাতুতে নির্ম্মিত। আবার তাহা শুধুই দ্রব্য নহে, তাহা কুঠারবৎ এক বিশেষ প্রয়োজন-সাধক দ্রব্য বা করণ। অর্থাৎ কুঠার-রূপ 'করণের' দ্বারা যেমন ছেদন-রূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তেমনি এই অন্তঃকরণের দ্বারা বিশ্বজ্ঞানরূপ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু মনের সত্তা বা 'দ্রব্যত্ব' সম্বন্ধে ও-দেশের দর্শন বলেন—

"We know nothing about the substance of mind, and can never know anything about it......No amount of that which we call intelligence, however transcendent it may be, can grasp such a knowledge." *

তাহার পরে আমাদের সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দর্শন সকলের সিদ্ধান্ত এই যে, চিত্ত হইতেছে স্বরূপতঃ অচেতন, এবং বুদ্ধিই চৈতন্য নহে। Sir W. Hamilton প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও দেখাইয়াছিলেন যে, কোন এক অচেতন মনকে (unconscious mind) স্বীকার না করিলে মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান অনেক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। কিন্তু ও-দেশের প্রশস্ত দার্শনিক-পক্ষ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—

Dr. W. Hamilton and others urge from a strictly psychological point of view that we must postulate unconscious mental modifications, but it is open to the grave objection that the idea of a mental phenomenon existing out of all relations to conscious life, is self-contradictory." †

অতএব মনের চৈতন্যভাব সম্বন্ধেও ও-দেশের এবং এ-দেশের মধ্যে কোনই সংযোগের সেতু নাই!

সেই জন্য এ-দেশের মনস্তত্ত্ব বিদ্যা পাঠ করিতে হইলে এ দেশের মাটির প্রদীপের আলোতেই পড়িতে হইবে, ও-দেশের লণ্ঠনের আলোতে পড়িতে চাহিলে হয়ত আমরা এককে আর বলিয়া দেখিব। সেটা অবস্থা বিশেষে যে কত বড় শক্ত কথা, তাহা আমরা জানি। কিন্তু এ দেশের পুরাতন জল ও মাটিতে গঠিত হইয়াও, আমরা নবীন গুরুগণের আদেশক্রমে যদি পৃথক চৈতন্য-বাদের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে একেবারেই অক্ষম হইয়া গিয়া থাকি, তবে সে লজ্জা ত, আমাদের কোট প্যান্টা-লুনেও ঢাকা পড়িবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক।

প্রাচীনগণ এইরূপে মনকে সূক্ষ্ম ধাতু নির্ম্মিত এক সত্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া, ইহার কার্য্যপ্রণালীকে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহার মোটামুটি ভাব এইরূপ। অন্তঃকরণ মন, ইন্দ্রিয় প্রণালীর দ্বারা গৃহীত অর্থ দ্বারা উপরঞ্জিত হয়। মন অতিশয় ক্ষিপ্র পরিণামী সত্তা, তাহার বাহ্য উপরঞ্জনার দ্বারা উপরঞ্জিত হইবামাত্রই চক্ষের নিমেষে নিজকেই ঐ অর্থাকারে পরিণত করে। বিষয় সকলের তাহাই অর্থাকার মানসরূপ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহ্য বিষয় নহে, বাহ্য বিষয়ের এই এই মানসরূপই চৈতন্য-পুরুষের জ্ঞেয়। পুরুষ মনঃ প্রভৃতি তাবৎ বিষয় হইতে নির্লিপ্ত,—"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ।" অথচ জ্ঞান কিরূপে চিত্তস্থিত বিষয় সকল বিদিত হয়েন ইহা বুঝাইবার জন্য যোগ-ভাষ্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, "চিত্তং অয়স্কান্ত মণিকল্পং, সন্নিধি-মাত্রেণ পুরুষস্য উপকারি"—এই চিত্ত অয়স্কান্ত মণির ন্যায়, সন্নিধিমাত্র দ্বারাই পুরুষের উপকারী হইয়া থাকে। অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণি (Loadstone) যেমন লৌহর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ব্যতিরেকেও, কেবলমাত্র লৌহের নৈকট্যে অবস্থিত হইয়াই, মণির চুম্বক শক্তির অনুরূপ চুম্বক শক্তিকে লৌহের মধ্যে জাগাইয়া তুলে, সেইরূপ চিত্ত, পুরুষের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ বশতঃ প্রত্যক্ষ সংযোগ ব্যতিরেকেও, সান্নিধ্য মাত্রে উপকারী হইয়া পুরুষের মধ্যে চিত্তাকার জ্ঞান-রূপকে জাগাইয়া তুলে।

কিন্তু সেই জাগাইয়া তোলাতে তাহার দ্বারা জ্ঞান-

---

* Herbert Spencer's Principles of Psychology, Part II, p. 145.

† Prof. Sully's Psychology, p. 98.

সত্তার কোনই 'পরিণাম' সূচিত হয় না। স্ফটিকের শুদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিবিম্বন-শক্তি, জবারাগে উপরঞ্জিত হইলেও স্ফটিক যেমন স্বপতঃ শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিকই থাকিয়া যায়, তেমনি পৌরুষের জ্ঞান বিষয়রাগে রঞ্জিত হইলেও তাহা স্বচ্ছ শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপেই থাকিয়া যায়। এই জন্য অপরিণামী জ্ঞানের সহিত পরিণামশীল চিত্তের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য বিম্ব প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তও বহুধা গৃহীত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও সংযোগ ব্যতিরেকে বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। "জবা-স্ফটিকয়োঃ ইব ন উপরাগঃ, কিন্তু অভিমানঃ।" (সাং দঃ—৬।২৮)—জবা ও স্ফটিকের মধ্যে যেমন কোন বাস্তবিক কিংবা সংসর্গজ বা সংযোগ-ক্রমের (by intermixture) উপরঞ্জনা হয় না, কিন্তু শুধু এক 'অভিমান' বা 'মনে করা মাত্রেরই' উপরঞ্জনা হয়, সেইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পুরুষের যে উপরঞ্জনা তাহা সংসর্গজ ও পরিণাম ক্রমের উপরঞ্জনা নহে, তাহা অভিমানাত্মক প্রতিবিম্বিত উপরঞ্জনা মাত্র।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতীয় চিন্তাশক্তি এতই নির্জীব ও নিরীহ ছিল যে তাহা এই সকল উপমা ও দৃষ্টান্তে ভুলিয়া গিয়া পৃথক চৈতন্যবাদকে একেবারে সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। পশ্চিম দেশের দার্শনিকের ন্যায় এদেশেরও প্রাচীন তার্কিক তর্ক করিতে ছাড়েন নাই যে, মনই চৈতন্যময় (conscious), এবং পৃথক চৈতন্য-সত্তা কল্পনা করা একান্তই অনাবশ্যক। সাংখ্যপক্ষ এই সকল বিরুদ্ধ তর্কের প্রতি কখনই বিজ্ঞতার উপেক্ষা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই,—সত্যানুসন্ধী তাহা কখনই করিতে পারেন না। তিনি যে আগ্রহের সহিত এই সকল তর্ককে তাঁহার 'বিচারের 'আমলে' আনিয়াছিলেন, তাহা এই বিজ্ঞতা-ভুয়িষ্ঠ যুগে স্মরণে করিতে পারিলেও আনন্দ হয়। আমরা তাহা হইতে বুঝিতে পারি, যিনি সত্যের যথার্থরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি বিরোধীকে অগণ্য বলিয়াই জয়ী হইতে চাহেন নাই।

বিরোধী পক্ষ, আধুনিক পণ্ডিতের ন্যায় বলিয়াছিল মনই 'স্বভাস' (self-conscious), তাহা নিজেকে নিজে প্রকাশিত করে। পতঞ্জলি উত্তরে বলিতেছেন—"ন তৎ স্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ।" (১।৪৯) তাহা স্বভাস হইতে পারে না, কারণ তাহা দৃশ্যরূপেও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাস এই যুক্তির সূক্ষ্ম মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাব এই—যাহাকে আমরা 'স্বভাস' বলি, তাহাকেই আমরা আবার 'ভাস্য' বা 'প্রকাশ্য'ও বলিতে পারি না। কেন না তাহাকে প্রকাশ্য বলিলেই বলিতে হয়, তাহার অন্য কোন প্রকাশক আছে। অতএব যাহা চরম প্রকাশক, যাহাকে কোনক্রমেই প্রকাশ্য বলিয়া উপলব্ধি হয় না, তাহাই স্বভাস বা স্বয়ং-প্রকাশ হইতে পারে। যদি তাহা প্রকাশ্য বা জ্ঞেয় রূপেও অনুভূত হয় তবে, তাহা আর স্বভাস বা জ্ঞান স্বরূপ হয় না। মন কি এইরূপে জ্ঞেয় ও প্রকাশ্য বলিয়া অনুভূত হয় না? তাহা যদি হইত, তবে 'আমি ভীত' 'আমি ক্রুদ্ধ' প্রভৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয় কোথা হইতে? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মন ও মনোগত বিষয় সকল জ্ঞেয়। কাহার জ্ঞেয়? যাহা স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞানময়, স্বভাস, তাহার আবার জ্ঞাতা কে হইবে?

কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, আগুন নিজের আলোতেই নিজকে আগুন বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যাস এই দৃষ্টান্তের ভুল ধরিয়া বলিয়াছেন—"ন হি অগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ। ন হি অগ্নিঃ আত্মস্বরূপং অপ্রকাশং প্রকাশয়তি। প্রকাশশ্চ অয়ং প্রকাশ্য-প্রকাশ-সংযোগে দৃষ্টঃ। ন চ স্বরূপ-মাত্রে অস্তি সংযোগঃ।"—অগ্নি এখানে দৃষ্টান্ত হইতেছে না। অগ্নির যাহা প্রকাশরূপ বা স্বরূপ, যাহার দ্বারা শুধু অগ্নি নহে—সমস্ত আলোকিত ঘট পটই প্রকাশিত হয়, সেই আত্ম-স্বরূপকে অগ্নি প্রকাশ করিতেছে না, তাহা অপ্রকাশই থাকিয়া যাইতেছে। যাহাকে অগ্নির প্রকাশ বলিতেছ তাহা প্রকাশ নহে, তাহা প্রকাশ্যের সহিত প্রকাশের সংযোগ। যাহা অগ্নি-স্বরূপ মাত্র তাহাতে কোনই প্রকাশ্য সংযোগ নাই।"

বলাই বাহুল্য, যে এদেশের শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যেও এই যুক্তির অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে। বৃহৎ আরণ্যকে (২।৪।১৪) আছে—"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারমরে! কেন বিজানীয়াৎ"—যাহার দ্বারা এই সমস্তকে জানা যাইতেছে, কিসের দ্বারা তাহাকে জানা যাইবে? অরে! বিজ্ঞাতাকে আবার কে জানিবে? শ্রুতি বলিয়াছেন—"তৎ ইদম্ ইতি নির্দ্দেষ্টুম্ গুরুণাঽপি ন শক্যতে"—সেই পুরুষকে 'ইহা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও অশক্ত হয়েন। অর্থাৎ যে জ্ঞান সকলকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাকে কেহই প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে।

অতএব আলোচ্য মতে পুরুষই সেই স্বয়ং-প্রকাশ, স্ব-ভাস প্রকাশজ্যোতিঃ, চিত্ত কিংবা চিত্তবৃত্তি নহে। "সাংখ্যযোগাদয়স্ত প্রবাদাঃ, স্ব শব্দেন পুরুষমেব স্বামিনম্ চিত্তস্য ভোক্তারম্ উপযন্তি।" (৪।২১ যোগভাষ্যে ব্যাস) সাংখ্যযোগ প্রভৃতি প্রকৃষ্টবাদ সকল (স্বভাস প্রভৃতি পদের) স্ব-শব্দ দ্বারা চিত্তকে নহে, চিত্তের ভোক্তা ও দ্রষ্টা স্বামী পুরুষকেই বুঝিয়া থাকেন।

বুদ্ধ্যাত্মবাদের নিরাসন কল্পে এ যুক্তি যথেষ্ট কি না তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। কিন্তু কোন্ যুক্তি দ্বারা তাঁহারা ঐ বাদ নিরস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহাই আমাদের বিবেচ্য।

৪। চিত্তসত্তার অহঙ্কার।

তাহার পর কথা উঠিয়াছে, পুরুষ যদি স্বয়ং-প্রকাশ অজ্ঞেয় ও অনবধার্য্য জ্ঞানস্বরূপ হইলেন, তবে এই "প্রথম পুরুষ" অহং, যিনি প্রত্যক্ষ অনুভব ক্রমে অহর্নিশি জ্ঞাতা ও ভোক্তা রূপে বিদিত হইতেছেন, ইনি কে? তাঁহাকেও ত আমরা জ্ঞানসম্পন্ন চেতন বলিয়া জানিতেছি, তিনি জ্ঞাতা হইয়াও ত জ্ঞেয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন?

দর্শনশাস্ত্র বলেন, ইনি ব্যবহার জগতে 'প্রথম পুরুষ' বলিয়া অভিমান করিলেও, এবং জগতের খাতায় সর্ব্বত্রই জ্ঞাতা পুরুষের বকলমে নাম দস্তখৎ করিলেও ইনি আদত মালেক পুরুষ নহেন, ইনি অহংকৃত চিত্ত মাত্র। অবিদ্যার সিংহাসনে বসিয়া, ইনিই পুরুষের প্রতিনিধি বলিয়া, সংসারে রাজত্ব করিতেছেন সত্য। কিন্তু যেদিন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে ইহাঁর নিজমূর্ত্তি ধরা পড়িবে, সেদিন তিনি জানিতে পারিবেন তিনি কোনই জ্ঞাতা ও ভোক্তা নহেন, তিনি পুরুষের ক্রীতদাস হইয়াও ছদ্মবেশে রাজত্বের অভিনয় করিয়াছেন মাত্র।

বলা বাহুল্য এ তত্ত্বজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আমাদের আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক দর্শনের কোনই আকাঙ্ক্ষা নহে। কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানের অভিসন্ধানেই আমরা ফকির সাজিয়া, তরুতল সার করিয়াছিলাম। যুক্তিবাদ কি করিয়া এই অহমিকার মোহ-জাল অপসারিত করিতে চাহিয়াছিল, এখন সেইটুকু দেখিতে পারিলেই ছুটি।

অহং জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যে দুইটি প্রধান অঙ্গ আমরা দেখিতে পাই। তাহার প্রথম অঙ্গ হইতেছে 'অহং' চেতন বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ অনুভবক্রমে অহংকেই আমরা জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলিয়া বিদিত হই।

অহঙ্কারের চৈতন্য প্রতীতির এক কারণ এই হইতে পারে, চিত্তে চৈতন্যশক্তি সংযোগক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়া চিত্তকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সাংখ্য যুক্তি দ্বারা চৈতন্য শক্তিকে অপরিণামী শক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা সর্ব্বথাই "অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়ং অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।" অতএব জ্ঞান-সত্তা চিত্তের সহিত মিশ্রিত হইতেছে বলিলে, ইহাও বলিতে হয়, জ্ঞান, পরিণামী চিত্তের সহিত বিবিধ পরিণামকে লাভ করিতেছে। সেই জন্য এ কথা বলা খাটে না।

এই জন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, চিত্ত যখন চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন চৈতন্য-রশ্মি সমুজ্জ্বল চিত্তরূপেই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ইহাকেই দর্শন শাস্ত্র, বুদ্ধিতে চৈতন্যের ছায়াপ্রতিমা চৈতন্যের "উপগ্রহ" বলিয়া

থাকেন। সাংখ্যদর্শন ইহাকেই বুদ্ধিতে "চৈতন্যের উপরাগ" (১।১৬৪) এবং বুদ্ধির "লোহবৎ চিদুজ্জলতা" (১।৯৯) বলিয়াছেন। এই চিদুজ্জলিত চিত্ত পুরুষে তদাকারে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই, বুদ্ধিতে চৈতন্যভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভোজরাজ দেখাইয়াছেন, সাংখ্য ও পাতঞ্জলশাস্ত্র বুদ্ধিতে চৈতন্যপাত স্বীকার করায় একই চিৎশক্তিকে দ্বিবিধ রূপে প্রণিধান করিয়াছেন। একবিধ চিৎশক্তি হইতেছে "নিত্য উদিত" চিৎশক্তি, যাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সমস্ত বিষয়-জ্ঞান এবং অহং-জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যবিধ চিৎশক্তি হইতেছে আলোকবৎ "অভিব্যঙ্গ" চিৎশক্তি, যাহা দ্বারা বিষয় সকল ব্যঞ্জনা লাভ করিয়া চিদুজ্জল হইতেছে। যোগ বার্ত্তিকে বিজ্ঞান-ভিক্ষু বিশদ যুক্তি অবলম্বনে দেখাইয়াছেন, চৈতন্য-উপরঞ্জিত বিষয় সকল চৈতন্যেই প্রতিবিম্বিত হইয়া বিদিত হইতেছে বলাতে কোনই 'কর্ম্মকর্ত্তৃ' বিরোধ উপস্থিত হয় নাই; কারণ এখানে চৈতন্য নিজেই চৈতন্য স্বরূপকে জানিতেছে না, কিন্তু ব্যাসদেব যাহাকে 'প্রকাশ্য-প্রকাশ-সংযোগ' বলিয়া অগ্নি দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন, তাহাকেই চৈতন্য জানিতেছে।

অহং জ্ঞানের মধ্যে আর একটি মিথ্যা প্রতীতি হইতেছে, "আমিই জ্ঞাতা এবং ভোক্তা পুরুষ"। সাংখ্য শাস্ত্র এই অবিদ্যার নিদান তত্ত্বেও অবগাহন করিয়াছিলেন।

তাহা প্রথমে অভিজ্ঞান বলে অবধারণ করিয়াছেন যে বুদ্ধি হইতে জ্ঞানকে সাধারণতঃ প্রভেদ করা যায় না। "বুদ্ধিবৃত্তি অবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তি"—বুদ্ধিবৃত্তি হইতে জ্ঞান বৃত্তিকে বিশেষ করিতে পারা যায় না। চিত্তের সহিত জ্ঞানের বৃত্তি-সারূপ্য। অতএব পুরুষ বুদ্ধির অনুকারী মাত্র। বুদ্ধির যাহা মুখভঙ্গিমা, জ্ঞানের তাহাই মুখভঙ্গিমা। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" দ্রষ্টা পুরুষ জ্ঞানশক্তি মাত্র, তাহা বুদ্ধি-প্রত্যয়ের অনুকারী। এই অনুকারি—মাত্রা-দ্বারা বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ সাধারণ ধারণায় সর্ব্বথাই অবলুপ্ত হয়। সুতরাং বুদ্ধি নিজকেই পুরুষের সহিত একাত্মরূপে প্রতিপন্ন করিবার পথ পায়।

শুধু এ কারণেই নহে, অন্য কারণেও বুদ্ধিতে পুরুষ ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয় সকলও বুদ্ধির অস্তিত্ব ও স্বরূপকে ব্যাখ্যা করিয়া যোগদর্শন বলিয়াছেন—"তদর্থ এব দৃশ্যস্য আত্মা" (২।১২)—পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন-রূপতাই হইতেছে বুদ্ধ্যাদি 'দৃশ্যের' স্বরূপ। যতক্ষণ পুরুষের প্রয়োজনরূপে তাহারা আছে, ততক্ষণই তাহারা 'সৎ' বা 'অস্তি' এবং যখন পুরুষের প্রয়োজনকে তাহারা আর সিদ্ধ করে না, তখন তাহারা 'অসৎ' ও 'নষ্ট'। এই জন্য বুদ্ধি পুরুষের "কর্ম্মরূপতা আপন্ন" এক সত্তা। পুরুষ যেন দেখিয়া থাকেন,—ইহাই হইতেছে পুরুষের কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দ্বারাই অর্জ্জিত অর্থ হইতেছে চিত্তের অস্তিত্ব। "তৎ কর্ম্ম অর্জ্জিতত্বাৎ তদর্থমেব অভিচেষ্টা লোকবৎ।" (সাং দঃ—১।৪৬) পুরুষের কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়াই তাহার লোকবৎ যেন পুরুষ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিচেষ্টা। অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত অর্থ যেমন, উপার্জ্জন কর্ত্তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অভিচেষ্টিত বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি, সেইরূপ বুদ্ধির-বৃত্তি কর্ম্মের অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই, স্বরূপ নাই, অস্তিত্ব নাই, তাহা শুধুই পুরুষের প্রয়োজন-কর্ম্ম। এই জন্যই তাহা পুরুষের 'কর্ম্মরূপতা আপন্ন।' এবং পরার্থ-সাধিকা চিত্তবৃত্তির কোনই স্বতন্ত্র স্বার্থ না থাকায়, তাহা পুরুষের কর্ম্মরূপে পুরুষেই আরোপিত হয়। এই কথা যোগভাষ্যকার এইরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"বুদ্ধিস্থিত পরার্থকার্য্য কিরূপে পুরুষে আরোপিত হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, যোদ্ধৃবর্গের পরার্থ জয় পরাজয় যেমন স্বামীতেই ব্যপদিষ্ট হয়, তেমনি বুদ্ধির পরার্থ বৃত্তি স্বামী পুরুষেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।"

ইহাই অহঙ্কারের নিদানতত্ত্ব। এবং অহংজ্ঞান অবিদ্যাত্মক জ্ঞান। যাঁহারা দর্শনের মধ্যে অহমিকার এই অবিদ্যাকে, অবিদ্যা বলিয়া মানেন নাই, তাঁহাদের দর্শনের উন্মার্গবাহিনী গতিকে, প্রাচীন আচার্য্যও সম্যক্ প্রণিধান করিয়াছিলেন। আমরা ব্যাসোক্তি

উদ্ধার করিতেছি, পাশ্চাত্য দর্শনের বিশেষতঃ Berkeley সাহেবের ভক্তগণ মার্জ্জনা করিবেন।

—"চিত্তের সহিত চৈতন্তের সারূপ্য বশতঃ ভ্রান্ত হইয়া কেহ বলিয়াছেন চিত্তই চৈতন্যময়। কেহ বলিয়াছেন, চিত্তই সব এবং এই গবাদি ও ঘটাদি সকারণ লোক নাই। ইহারা অনুকম্পনীয়। তাঁহাদের ভ্রান্তির বীজ হইতেছে এই যে, চিত্তই চেতন অচেতন অর্থরূপে নির্ভাস হইতে সক্ষম। যখন 'সমাধি প্রজ্ঞা' উৎপন্ন হয়, তখন প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়া থাকে যাহা প্রজ্ঞের অর্থ তাহা প্রতিবিম্বীভূত চিত্তরূপ মাত্র, এবং সেই যে চিত্তরূপ, তাহা তাহার আলম্বনীভূত বাহ্য বিষয় হইতে অন্য ও স্বতন্ত্র।" (পাং দং ৪।২৩ ভাষ্য)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

প্রথম ভাগ—ঐশ্বর্য্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডেপুটি বাবুর দাড়ি।

"দাদা মশাই!"

"কেন দিদিমণি?"

সৌদামিনীকে ডেপুটি বাবু দিদিমণি বলিতেন। সৌদামিনী ডেপুটি বাবুর নাতিনী,—কন্তার কন্যা; তাহার বয়স তের বৎসর। তের বৎসরের নাতিনী চার তেরং বাহান্ন বৎসরের মাতামহের গলা ধরিয়া বলিল—"দাদা মশাই!"

দাদা মহাশয় তখন চোখে চশমা সংযোগ করিয়া, একটা দাঙ্গার মামলার রায় লিখিতেছিলেন; তিন দিন পূর্ব্বে মকর্দ্দমার শুনানি হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার রায় দিতেই হইবে। কিন্তু বুঝি, আর রায় লেখা হয় না। প্রিয়তমা প্রাণাধিকা সৌদামিনী আসিয়াছে; আসিয়া, গলা ধরিয়া দাদা মহাশয় বলিয়াছে; আর কিরূপে রায় লিখিবেন? তিনি কলম রাখিয়া, চশমা খুলিয়া বলিলেন, "কেন দিদিমণি?"

সৌদামিনী তাহার দাদা মহাশয়ের শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রুতে তাহার চম্পক-কোরকসদৃশ অঙ্গুলি সকল সঞ্চালিত করিয়া বলিল—"তোমার এই দাড়িগুলো বড় পেকে গেছে।"

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তা, গেছে। আমি বুড়ো হয়েছি কি না, তাই আমার দাড়ি পেকে গেছে।"

সৌদামিনী বলিল—"না, তুমি বুড়ো হওনি।"

কাহার সাধ্য সৌদামিনীর কথার প্রতিবাদ করে? ডেপুটি বাবু সৌদামিনী হাত ধরিয়া বলিলেন—"না দিদিমণি, আমি বুড়ো হইনি।"

সৌদামিনীর কোমল ও স্নিগ্ধ করস্পর্শে সত্যই বুঝি ডেপুটী বাবুর বার্দ্ধক্য অপনীত হইত। বুঝি সেই কনকপ্রভ করপল্লবে, সেই পুরাতন কাহিনী কথিত কনক দণ্ডের মৃতসঞ্জীবনীশক্তি বিদ্যমান ছিল।

সৌদামিনী আবার বলিল—"না দাদা মশায় তুমি বুড়া হও নি। বালাই!—তুমি বুড়ো হবে কেন? কিন্তু তবু তোমার দাড়িগুলি পেকে গেছে।"

ডেপুটী বাবু। হাঁ, দাড়িগুলি পেকে গেছে।"

সৌদামিনী। এই পাকা দাড়ি তোমায় কেটে ফেলতে হবে।

ডেপুটী বাবু। সর্ব্বনাশ !

সৌদামিনী। নীচে হরি নাপিত আছে।

ডেপুটী বাবু। হরি নাপিত কেন? সে কি করবে?

সৌদামিনী। আমি তাকে ডেকে আনব। সে তোমার দাড়িগুলি কেটে, তোমাকে কামিয়ে দিবে।

ডেপুটী বাবু। না, না, আজ নয়; আর একদিন কামাব।

সৌদামিনী। না, আজই, এখনই তোমার দাড়ি কাটতে হবে। আমি হরি নাপিতকে ডেকে আনি।

এই বলিয়া, সৌদামিনী অঞ্চল লুটাইয়া চঞ্চলপদে নাপিতকে ডাকিতে গেল। ডেপুটীবাবু প্রমাদ গণিলেন। এ পাগলীর হস্ত হইতে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত শ্মশ্রুরাশি কিরূপে রক্ষা করিবেন? কিরূপে শ্মশ্রুহীন মুখে আজ সহসা লোকালয়ে বাহির হইবেন? তথাপি সৌদামিনীর কথা অবহেলা করা চলিবে না। সৌদামিনী যে তাঁহার সব! পত্নী বিয়োগের পর, ডেপুটী বাবু যে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতৃনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সৌদামিনী যে তাঁহারই কন্যা।

ডেপুটী বাবুর পুত্র ছিল না; কেবল একটি মাতৃহীনা কন্যা ছিল। হায়! আজ কোথায় সে? ডেপুটী বাবু উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া, যথাসময়ে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; যথাসময়ে অলঙ্কার ভারে সজ্জিত করিয়া কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন; যথাসময়ে কন্যার গর্ভে সুকুমারী সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ কোথায় সেই কন্যা?

পিতৃঋণের দায়ে জামাতা সর্ব্বস্বান্ত হইল। নিঃস্ব অবস্থায় কঠিন রোগে তাহার মৃত্যু ঘটিল। নিরাভরণা সজলনয়না কন্যা, সৌদামিনীকে ক্রোড়ে লইয়া, পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল। অশ্রুনিষিক্তার সেই বিষাদময় মুখখানি আজিও লক্ষ্মীর চরণাশ্রিত সজল পঙ্কজের ন্যায় ডেপুটী বাবুর হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে।

সেই কন্যা মাতৃস্তন্য ব্যতীত জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বামীর বিরহ সহ্য করিতে পারিল না। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই তাহার শোকময় জীবন তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নিবিয়া গেল। মৃত্যুকালে সে আপন শিশু-দুহিতাকে পিতার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিয়াছিল—"বাবা! আমি চল্লাম, আমার মেয়েকে দেখো।"

তদবধি সৌদামিনী ডেপুটী বাবুর প্রাণাধিক প্রিয়তমা হইয়াছিল। তদবধি ডেপুটী বাবু মুগ্ধা মাতার ন্যায় তাহার সমস্ত আব্দার হাস্যমুখে সহ্য করিয়াছেন; আজ্ঞাবহের ন্যায় তাহার প্রত্যেক অভিলাষটি পূর্ণ করিয়াছেন।

এইরূপ স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয়ে প্রতিপালিতা হওয়ায় সৌদামিনীর স্বভাবটা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। সে যখন যাহা ধরিত, তখনই তাহা সম্পাদিত না হইলে, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। আজ তাহার মস্তকে যে নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হইয়াছে, কিরূপে ডেপুটী বাবুর শ্মশ্রুগুলি তাহা হইতে রক্ষা লাভ করিবে? ডেপুটী বাবু ভাবিয়া আকুল হইলেন। পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে যা'ক এ দাড়ি!—দাড়ি ত তুচ্ছ কথা; সৌদামিনীর কনিষ্ঠাঙ্গুলির ইঙ্গিতে ডেপুটী বাবু হাস্যমুখে জীবনদান করিতে পারিতেন।

হরি নাপিতের উত্তরীয়াঞ্চল ধরিয়া, অসুর-কেশধারিণী ভগবতীর ন্যায় হাস্যমুখী সৌদামিনী কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দাদা মহাশয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—"ঐ দাদামশায়। দাদা মশায়ের দাড়ি কামিয়ে দাও।"

হরি নাপিত ভূমিষ্ঠ হইয়া ডেপুটী বাবুকে প্রণাম করিল। ডেপুটী বাবু সভয়ে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দীর্ঘ দাড়িতে আকুলভাবে হাত বুলাইলেন। —হায় কতকালের কত যত্নের এই নিরপরাধ দাড়ি; আজ বেচারা ধরণীর ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইবে!

ডেপুটী বাবু একটা টুলের উপর উপবেশন করিলে, হরি নাপিত কচ্ কচ্ শব্দে তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। কিয়ৎকাল মধ্যে ডেপুটী বাবুর দাড়ি সত্যই ধূলায় লুটাইল ;—সৌদামিনীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

হরি নাপিত কার্য্য সমাধান্তে চলিয়া গেলে, চিবুকচ্যুত দাড়িগুলি কি জানি কেন, সৌদামিনী আপন অঞ্চল মধ্যে লইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

ডেপুটী বাবু ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে স্নান ও আহার সম্পন্ন করিয়া, যে কক্ষে সৌদামিনী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, যে উহা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ হইয়াছে। তিনি দ্বার ঠেলিয়া সৌদামিনীকে ডাকিলেন। সৌদামিনী দ্বার না খুলিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দাদা মশায় ?"

দাদা মহাশয় দ্বারের বাহিরে থাকিয়া বলিলেন—"আমি আপিসে যাচ্ছি।" ডেপুটী বাবু সৌদামিনীর অনুমতি ব্যতীত কোন দিন কখনও বাটীর বাহিরে যাইতেন না।

সৌদামিনী অনুমতি দিল—"যাও; আজ কিন্তু একটু সকালে সকালে এস। সন্ধ্যার আগেই আসতে হবে।"

"আসবো" বলিয়া, ডেপুটী বাবু প্রস্থান করিলেন।

ডেপুটী বাবু প্রথমশ্রেণীর পুরাতন ডেপুটী। এক্ষণে তিনি কলিকাতায় আসিয়া, পুলিস আদালতে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। কোন এক পল্লীগ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। সেই পৈত্রিক বাড়ীর অংশ তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে বিক্রয় করিয়া, তিনি এক্ষণে কলিকাতাতে বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতেই নাতিনীকে লইয়া বাস করিতেছিলেন; আর পল্লীগ্রামে যাইতেন না। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তাঁহার নিকট আসিয়া এই কলিকাতার বাটীতে বাস করিত না।

একটি পুরাতন ঝিয়ের উপর সৌদামিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। সে সৌদামিনীকে ভালবাসিত এবং তাহার অশেষ দৌরাত্ম্য সহ্য করিত। ডেপুটী বাবু আপিসে প্রস্থান করিলে, ঝি আহারাদি সমাধা করিয়া যখন একটু দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিত, তখন সৌদামিনী অশেষ বিধানে তাহার তন্দ্রাভঙ্গের জন্য যত্নবতী হইত। কোন দিন তাহার সদ্যঃস্নানসিক্ত পক্ককেশগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া বলিত, "আয় ঝি তোর চুল বেঁধে দিই।" কিন্তু সৌদামিনী চুল বাঁধিতে জানিত না; কেবল তাহা আকর্ষণ করিয়া তার নিদ্রার বাধা জন্মাইত। কোন দিন তাহার নিদ্রাতপ্ত অঙ্গে বরফের জল ঢালিয়া দিত;—দাদা মহাশয়ের আহার কালে যে বরফ আসিত, এই সাধুকার্য্যের জন্য সৌদামিনী তাহা হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কোনদিন সে তাহার কর্ণের নিকট একখানা কাঁসর বাজাইত; তাহার আদেশ মত, তাহার দাদা মহাশয়, তাহাকে একখানা ছোট কাঁসর কিনিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ সৌদামিনী ঝির প্রতি কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করে নাই। আজ তাহার উপরোক্ত প্রকার শুভকার্য্যের অবসর ছিল না। দাদা মহাশয় আপিসে যাইলে, সে তাড়াতাড়ি রন্ধন গৃহের নিকট আসিয়া, ঠাকুরকে বলিল, "এখনও ভাত দাও নি কেন? কত বেলা হয়েছে, কোন জন্মে খাব?"

ঠাকুর বহুবার এই উচ্ছৃঙ্খল বালিকার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে; কাযেই সে সভয়ে সত্বর ভাত বাড়িতে গেল। ঝি সৌদামিনীকে রান্নাঘরের নিকটে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ও দিদিমণি আজ যে তোমায় নাইতে হবে! আজ যে মঙ্গলবার, তোমার নাইবার পালা।"

সৌদামিনী বলিল, "আজ তোমার পিণ্ডির পালা।"

ঝি ও ঠাকুরের সহিত এইরূপ মধুর আলাপ করিয়া এবং কোনক্রমে কতকটা অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া ও স্থালীর চারি পার্শ্বে আহারদ্রব্য সকল ছড়াইয়া, সৌদামিনী পুনরায় আপন শয়নকক্ষে যাইয়া, তাহা অর্গলবদ্ধ করিল। তথায় সে দীর্ঘকাল যাবৎ এমন একটা মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিল যে, ঝিয়ের বিপ্রাহ-

রিক নিদ্রাভঙ্গ করাটা যে, একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা ভুলিয়া গেল।

দিবাবসানকালে সূর্য্যের রথ পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু ডেপুটী বাবুর রথ লালবাজার পুলিশ আদালত হইতে পূর্ব্বমুখে অর্থাৎ বউবাজারের রাস্তা দিয়া শেয়ালদহ অভিমুখে ধাবিত হইত;—শেয়ালদহের নিকট কোন্ এক রাস্তার ধারে ডেপুটী বাবুর বাড়ী। কথিত আছে, সূর্য্যের রথের একচক্র;—কিন্তু ডেপুটী বাবুর রথের দুই চক্র, অর্থাৎ সেটা একখানা বগী গাড়ি। সূর্য্যের একচক্র রথের সারথি, বড়লাটের কোচম্যানের মত লাল উর্দ্দী 'পরা অরুণ দেবতা;—ডেপুটী বাবুর রথের সারথি, ডেপুটী বাবু স্বয়ং;—অর্থাৎ ডেপুটী বাবু কোচম্যান রাখেন নাই; এবং বগী গাড়ীর জন্য কোচম্যানের আবশ্যকও ছিল না। ইহাতে ডেপুটী বাবুর দুইটা সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম কোচম্যানের বেতনটা বাঁচিয়া যাইত; দ্বিতীয় ঘোড়াটা আপন প্রাপ্য আহার পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইত,—গরিব সহিস্ বেচারা যে সামান্য গ্রহণ করিত, সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

উপরি-উক্ত বগী গাড়ী ছাড়া, ডেপুটী বাবুর অন্য কোন গাড়ী ছিল না। তাঁহার গৃহিনীর অস্তিত্ব থাকিলে হয়ত তিনি একখানা 'ব্রাউনবেরী' রাখিতেন, তাহাতে নিজের আপিস যাওয়া এবং স্ত্রীর গঙ্গাস্নান দুই-ই চলিত। কিন্তু স্ত্রীর অবর্ত্তমানে এবং কোচম্যানের বেতন বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহা রাখেন নাই। কাযেই সৌদামিনী এই বগী গাড়ীতে চড়িয়াই প্রত্যহ সকালে বেড়াইতে যাইত। তাহার সঙ্গে থাকিত প্রভাকর কর্ম্মকার;—সেই গাড়ী চালাইত।

প্রভাকর কর্ম্মকার কে? তাহার সম্বন্ধে দু'কথা বলা দরকার; এই খানেই বলিয়া রাখি। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনাদিকাল হইতে ঐক পল্লীগ্রামের শীতল শ্যামল ছায়ায় বসিয়া, কর্ম্মকারের কার্য্য করিয়া নীরোগে জীবনধারণ করিত; পল্লীতে প্রাপ্ত সামান্য আহারে তাহাদের বলিষ্ঠ দেহ পুষ্টিলাভ করিত। তাহাদের যশও ছিল; প্রভাকরের ঠাকুরদাদা, ঠাকুর বিশ্বকর্ম্মার কৃপায়, এমন মহিষমর্দ্দিনী খাঁড়া প্রস্তুত করিতে পারিত যে, অনেক বড়লোক রঘো কামারের হাতের তৈয়ারী একখানা খাঁড়া বাড়ীতে রাখা স্পর্দ্ধার কথা মনে করিতেন। রঘোর দুর্ভাগ্য, সে পুত্রকে অর্থাৎ প্রভাকরের পিতাকে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইল। সে ইংরাজী পড়িয়া, জুতা জামা পরিল; টেরি কাটিল এবং আপন পৈতৃক স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাবু বনিল।—সমাজ একটি কর্ম্মঠ কারিগরের পরিবর্ত্তে একটি রুগ্ন কেরাণী পাইল। প্রভাকর এই বাবুর পুত্র; সুতরাং ব্রাহ্মণ ডেপুটী বাবু যে তক্তাপোষে উপবেশন করিতেন, সেও সেই তক্তাপোষে উপবেশন করিতে পারিত। প্রভাকর বাল্যকালে কিছুকাল ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল; তাহার ফলে, সে এক আড়গরায় এক সরকারের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য অপেক্ষা সে সতরঞ্চ খেলাতে অধিক সময় অতিবাহিত করিত বলিয়া, কয়েক বৎসর মধ্যেই তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কর্ম্মহীন হইয়া, কর্ম্মকার পুত্র আর একটি কর্ম্মের প্রত্যাশায় ডেপুটী বাবুর শরণাপন্ন হইল। ঘোড়া ও বগী ক্রয় কালে, আট বৎসর পূর্ব্বে, ডেপুটী বাবুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ডেপুটী বাবু বাল্যকালে যখন তাঁহার পল্লীগ্রামের আবাস বাটীতে বাস করিতেন, তখন, তিনি তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের রঘো কামারের সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, পাঁচ বৎসরের বালিকা সৌদামিনী হঠাৎ প্রভাকরের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া, বালিকা সৌদামিনী ঘুমাইয়া পড়িলে, দীর্ঘ ও নির্জ্জন সন্ধ্যাকালটি অতিবাহিত করিবার জন্য ডেপুটী বাবু সতরঞ্চ খেলার জন্য একটি সমবয়স্ক সাথী পাইলেন। তিনি কিন্তু শত চেষ্টাতেও সতরঞ্চ খেলাতে প্রভাকরের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। প্রভাকর মহা পারদর্শী খেলোয়াড়।

এইরূপে প্রভাকর ডেপুটি বাবুর বাটীতে স্থানলাভ করিয়াছিল। ডেপুটী বাবু তাহার ভদ্রব্যবহারে

চিত আহার ও পরিধেয় সরবরাহ করিতেন এবং হাত খরচের জন্য মাসিক দশটি করিয়া টাকা দিতেন। কিন্তু সে কখন এই দশটি টাকা নিজের জন্য ব্যয় করিত না, বা সঞ্চয় করিত না—সৌদামিনীর বদ্ ফরমাইশেই তাহা নিঃশেষিত হইত;—সৌদামিনী আর সতরঞ্চ ছাড়া সংসারে তাহার অপর কোন বন্ধন ছিল না। এই আট বৎসরের মধ্যে সে একবার সৌদামিনীকে বিদ্যাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একবৎসর কাল বিদ্যাদানের পরই তাহার ভাণ্ডার ফুরাইয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে মেধাবিনী সৌদামিনী বাঙ্গালা ও ইংরাজি বর্ণ শিক্ষা করিয়া প্রভাকরের পরিচিত সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিল। সৌদামিনী প্রভাকরের নিকট সতরঞ্চ খেলাও শিক্ষা করিয়াছিল; এবং সম্প্রতি সে আরও একটা বিদ্যা গ্রহণ করিতেছিল; কিন্তু সে কথা পরে যথাসময়ে বলিব।

সন্ধ্যাকালে দাড়িহীন ডেপুটী বাবু পূর্ব্বোক্ত শকটারোহণ করিয়া, আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সৌদামিনী তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। বেলা তিনটার পর হইতে, ডেপুটী বাবুর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, সৌদামিনী যে কতবার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাহা বোধ হয় গণকচূড়ামণি স্বয়ং মিহিরাচার্য্যও গণনা করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহাকে গৃহদ্বারে আগত দেখিয়া সৌদামিনী চীৎকার করিয়া, হাসিয়া ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিল—"দাদা মশায়, দাদা-মশায়! তোমার জন্যে আমি এক মজার সামগ্রী রেখেছি; এস তোমাকে দিই।"

ডেপুটী বাবু শকট হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন—"কি রেখেছ দিদিমণি?"

বিজ্ঞতাভারে মুখ ভারি করিয়া সৌদামিনী বলিল—"তুমি আগে পোষাক ছাড়, হাতমুখ ধোও, জলখাবার খাও, তাহার পর দেখাব।"

ডেপুটী বাবু উপরে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার জলখাবার খাওয়া হয়েছে, দিদিমণি?"

সৌদামিনী বলিল—"হ্যাঁ, আমি দুধ আর রসগোল্লা খেয়েছি। তোমার সঙ্গে চা আর বিস্কুট খাব। গোপালকে বলি—শীঘ্র শীঘ্র তোমার চা এনে দিক।"

গোপাল ডেপুটী বাবুর পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য; সে খানসামার কার্য্য করিত। সে ছাড়া গৃহকর্ম্মের জন্য ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে একজন উড়িয়া চাকর ছিল, তাহার নাম চিন্তামণি।

গোপালের সন্ধানে সৌদামিনী প্রধাবিতা হইলে, ডেপুটী বাবু দ্বিতলে আপন কক্ষে যাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর মুখ হাত ধুইয়া, সৌদামিনীর কক্ষে যাইয়া ডাকিলেন—"দিদিমণি!"

সৌদামিনী সেখানে পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল—"এস, দাদা মশায়, এইখানে ব'স। আমি গোপালকে এইখানেই চা আনতে বলেছি। সে এখনই আসবে; চায়ে জল দেওয়া আমি দেখে এসেছি।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার জন্যে কি রেখেছ, দেখাও?"

সৌদামিনী তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল—"তুমি বড় অধৈর্য্য! দাঁড়াও না, আগে চা খাওয়া হোক, তার পর দেখাব।"

অল্পকাল মধ্যে গোপাল চা লইয়া আসিল। সৌদামিনীর সহিত, ডেপুটী বাবু চা পান করিলেন। তখন সৌদামিনী উঠিয়া, একটি আলমারী খুলিল; উহাতে তাহার বস্ত্রাদি থাকিত। ঐ আলমারীর ভিতর হইতে, সে একটি স্বচ্ছ রঙের বোতল বাহির করিল। এই বোতলের উপর একখানি চৌকা সাদা কাগজ আঁটা ছিল। ঐ কাগজের চারি পার্শ্বে রঙ্গিন পেন্‌সিল দিয়া, সৌদামিনী বহু পরিশ্রমে আপন পারদর্শিতা অনুযায়ী, লতাপাতা ও ফুল অঙ্কিত করিয়াছিল; এবং এই কারুকার্য্যের বেষ্টনীর মধ্যে বিচিত্র অক্ষরে লিখিয়াছিল—

দাদা মহাশয়ের দাড়ি

সন ১৩১৮ সাল

১২ই ভাদ্র।

বোতলের ভিতরে ডেপুটি বাবুর চিবুকচ্যুত কাঁচা পাকা দাড়িগুলি ছিল।

দেখিয়া ডেপুটী বাবু হাসিলেন। সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"এই বোতল তোমার কাছে থাক্‌বে। আমি যখন মরে' যাব, তুমি বড় হবে, তখন এই বোতল দেখে, আমাকে তোমার মনে পড়্‌বে।"

সৌদামিনী। বোতল না দেখলেও তোমাকে আমার মনে থাকবে। কিন্তু তোমার এখন মরবার দরকার নেই। ও খারাপ কথা মুখে আনবারও দরকার নেই। আজ আদালতে কি মকৰ্দ্দমা করলে, তাই এখন বল। আমি বোতলটা তুলে রাখি।

ডেপুটী বাবু আদালতে যে মকৰ্দ্দমা করিতেন, তাহা প্রায় প্রত্যহ সৌদামিনীর নিকট বিবৃত করিতেন। তিনি বলিতেন যে, সৌদামিনীর সহিত মকৰ্দ্দমাগুলির আলোচনা করিলে, সে সময় সময় এমন একটা সুযুক্তির কথা বলে, যে তাঁহার পক্ষে সত্য নির্দ্ধারণ সহজ হইয়া পড়ে। অতএব তিনি বলিলেন—"আজ আদালতে ভারি একটা মজার মামলা হয়েছিল।"

সৌদামিনী। কি মজার মামলা?

ডেপুটী বাবু। এক মাগী বুড়ী, তার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে' রাগে নিজের নাকটি কেটে...

সৌদামিনী। নিজের নাক নিজে কেটে ফেল্লে? ভারি মজা ত!

ডেপুটী বাবু। নাক নিজে কাটল বটে, কিন্তু আদালতে এসে খোনা সুরে বল্লে...

সৌদামিনী। খোনা সুরে বল্লে কেন?

ডেপুটী বাবু। নাক কাটলে সুর খোনা হয়ে যায়।

সৌদামিনী। খোনা সুরে কি বল্লে?

ডেপুটী বাবু। বল্লে, আমার ছেলে আমার নাক কেটে দিয়েছে।

ডেপুটী বাবুর শ্মশ্রুহীন নূতন মুখের ভঙ্গিমা দেখিয়া ও খোনা বুড়ীর অনুনাসিক বাক্যের অনুকরণধ্বনি শুনিয়া সৌদামিনী মহাকলরবে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তার পর?"

ডেপুটী বাবু। তার পর, আমি যখন তাকে ভয় দেখিয়ে মিছামিছি বল্লাম—"তোর নাক কেটেছে বলে' তোর ছেলের ফাঁসী হবে", তখন বুড়ী ছেলের প্রাণের ভয়ে কাঁদতে লাগিল। হাজার হোক, মায়ের প্রাণ ত, থাকতে পারবে কেন? ছেলের ফাঁসী হবে শুনে, বুড়ীর আর রাগ রইল না, কাঁদতে কাঁদতে আপনিই সব সত্য কথা বলে ফেল্লে। আর অপরাপর সাক্ষীরাও বল্লে যে বুড়ী বড় রাগী, ছেলের সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে, আর ছেলেকে জব্দ করবে বলে' রাগে নিজের নাক নিজে কেটে আদালতে এসেছে।

সৌদামিনী। তখন সব শুনে' তুমি কি হুকুম দিলে?

ডেপুটী বাবু। আমি ছেলেটাকে ছেড়ে দিলাম। আর বুড়ীকে ধমক দিয়ে বাড়ী চলে যেতে বল্লাম।

সৌদামিনী। আমি হলে, তার কাণ দুইটিও কেটে, তবে ছেড়ে দিতাম। বুড়ী চলে' যাবার সময় কি বলে' গেল?

ডেপুটী বাবু। সে হাঁউ মাঁউ করে' খোনা সুরে কত কথা বল্লে, তা কি আমার মনে আছে?

সৌদামিনী। দাদা মশায়!

ডেপুটী বাবু। কেন দিদিমণি?

সৌদামিনী। তুমি একবার বুড়ীর মত খোনা সুরে কথা কও না।

প্রাণাধিকা নাত্নীর অনুরোধক্রমে ডেপুটী বাবু বুড়ীর কতকটা বাক্য মনে করিয়া লইলেন এবং তাহা অনুনাসিক স্বরে এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করিলেন। ডেপুটী বাবুর খোনা স্বর শুনিয়া ও বিকৃত মুখভঙ্গী দেখিয়া, অট্টহাস্যে সৌদামিনী সন্ধ্যাকাশ মুখরিত করিয়া তুলিল। আনন্দবেগে অধীর হইয়া, কখনও শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া, কখনও গবাক্ষের লৌহদণ্ড ধরিয়া, কখনও ডেপুটী বাবুর বক্ষে মুখ লুকাইয়া

হাসিতে লাগিল। সেই অপূর্ব্বা বালিকার সেই হাস্য-দীপ্ত মুখ ডেপুটী বাবু মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, পৃথিবীতে এমন আর কি আছে? ইহাই বুঝি পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিবিম্ব! ইহাই বুঝি পরম আনন্দময়ের আত্মপ্রকাশ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একাদশী চক্রবর্ত্তী।

রাস্তার পরপারে বৃহৎ অট্টালিকা। অট্টালিকা-প্রান্তে এক পরিচ্ছন্ন মর্ম্মর মণ্ডিত কক্ষে, এক বহুমূল্য খট্টাঙ্গের উপর রুগ্ন শয্যায় ক্ষুদ্র দেহ একাদশী চক্রবর্ত্তী শয়ান ছিলেন। পার্শ্বে সুদৃশ্য বস্ত্রাবৃত দুইখানি সুদৃশ্য চেয়ারে দুইটি ভদ্র ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন—একজন ডাক্তার, অপর ব্যক্তি প্রবীণ এটর্ণি। মুক্ত বাতায়ন পথে এই কক্ষ মধ্যে সৌদামিনীর উচ্চ হাস্যধ্বনি প্রবেশ করিল। একাদশী চক্রবর্ত্তী মুদিত নয়নে কহিলেন—"ঐ দেখ ডাক্তার, ডেপুটি বাবুর নাতনী হাসছে। কি আনন্দময় হাসি! এমন সরল সুমিষ্ট হাসি আমি জীবনে কখনও হাসিনি।"

একাদশী চক্রবর্ত্তীর প্রকৃত নাম কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী, কিন্তু লোকে তাঁহার কেদারেশ্বর নাম মুখে আনিতে সাহস করিত না। বলিত, কোন দিন দৈবক্রমে ঐ নাম মুখে আনিলে, সেই দিন সেই মুখে অন্ন জুটে না; যে ও নাম উচ্চারণ করে, তাহাকে উপবাসী থাকিতে হয়। এজন্য লোকে তাঁহাকে কেদারেশ্বর না বলিয়া একাদশী বলিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও জানিতেন যে লোকে তাঁহার অর্থযুক্ত দ্বিতীয় নামকরণ করিয়াছে 'একাদশী।'

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া, ডাক্তার বাবু ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন; পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ডেপুটী বাবু বা তাঁর নাতনী কে? তাঁরা কি আপনার পরিচিত?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্তিমিত নেত্রে বলিলেন—"তাঁরা আমার কোন পরিচয়ই জানেন না; আমি কিন্তু তাঁদিকে বিলক্ষণ চিনি। তাঁদের সমস্ত পরিচয় অথবা কেবল ডেপুটী বাবুর নাতনীর পরিচয় আমি তোমাদের কাছে দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এক কথায় সে পরিচয় দিতে পারা যায় না। এই পরিচয়ের সঙ্গে আমার জীবন কাহিনী জড়িত বলে', তা তোমাদের জানা আবশ্যক। তোমার ঘড়িতে কত সময় দেখলে ডাক্তার?"

ডাক্তার বাবু আবার তাঁহার ঘড়ি বাহির করিয়া, তাহা দেখিয়া বলিলেন—"ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "বেশ! পর্দ্দা খুলে' দেখ, এই পাশের ঘরে আমার খানসামা যদু ঘুমোচ্চে। তাকে একবার ডেকে দাও।"

ডাক্তার বাবু পর্দ্দা খুলিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই পার্শ্বের ঘরে যদু খানসামা নিদ্রিত রহিয়াছে। শয্যাশায়ী উত্থানশক্তি রহিত বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিরূপে ভৃত্যের নিদ্রার কথা জানিতে পারিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার বাবু ডাকিলেন—"যদু।" যদু তাকাইল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—"চক্রবর্ত্তী মশায় তোমাকে ডাকছেন।"

যদু মুহূর্ত্ত মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে আলো জ্বালব?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদিত নয়নেই বলিলেন—"হ্যাঁ, আর—"

'আর' বলিয়া তিনি একটি মাত্র চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ডাক্তার ও এটর্ণি বাবুর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সে দৃষ্টির অর্থ যদু বুঝিল। বুঝিয়া সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার চক্ষুদুটি নিমীলিত করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার, বস।"

ডাক্তার। আজ্ঞে—

চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞে বল্লে চলবে না, বস। ডেপুটী-বাবুর নাতনীর কথা শুনতে হবে; আর তার সঙ্গে আমার জীবনেরও অনেক কথা শুনতে হবে। দাঁড়াও, একটা কথা আছে। মিথ্যা বোল না, আজ তোমার অন্যত্র রোগী দেখতে যেতে হবে না, তা আমি জানি; যদু তোমার সরকারের কাছে খবর নিয়েছিল। তবু একটা ভাববার কথা আছে। যদি নূতন রোগীর সংবাদ নিয়ে, তোমার বাড়ীতে কেউ ডাকতে আসে, তা হলে, দুই একটা 'ভিজিট' তোমার লোকসান হতে পারে।

ডাক্তার। তা, তা—তার জন্যে নয়।

চক্রবর্ত্তী। শোন, আজ আমার বাড়ীতে রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে। আমার প্রয়োজন আছে। তুমি ত জান, বিনা প্রয়োজনে আমি জীবনে কখনও অর্থ ব্যয় করিনি; আমি তোমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমার বাড়ীতে রেখে অর্থ ব্যয় করব। ধর, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার কাছে বসে থাকলে, তোমার ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচটা ভিজিট মারা যেতে পারে?

চীনদেশীয় প্রস্তর নির্ম্মিত বিচিত্র টেবিলের উপর অবস্থিত বিচিত্র স্ফটিক দীপাধার সহসা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নীরব হইয়া তাঁহার অঞ্জলি-বদ্ধ হস্ত মস্তকে রাখিয়া, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিলেন। বুঝি তাঁহার কোটরগত চক্ষুতে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। এক খণ্ড অমল বস্ত্রাঞ্চলে তাহা সম্বরণ করিয়া, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "পাঁচটা ভিজিটে পাঁচ আটে চল্লিশ টাকা তুমি পেতে; আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দেব; রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তোমায় থাকতে হবে।"

ডাক্তার। আপনি আমার স্বর্গগত পিতার বন্ধু, আপনি অনুমতি করছেন, আমি রাত্রি দশটা পর্য্যন্তই থাকব। কিন্তু তার জন্যে আমি আপনার কাছে টাকা নিতে পারব না।

চক্রবর্ত্তী। দ্বিরুক্তি কোর না, ডাক্তার; এই যৌবন কালে, অর্থোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ হোয়ো না। তুমি আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা নিলে, আমি গরীব হয়ে যাব না। কিন্তু না নিলে, তোমাকে নির্ব্বোধ মনে করব। আমি জানি, লোকের হিতের জন্যে ডাক্তারেরা ডাক্তারী করে না। আপনার হিতের জন্যে তারা ডাক্তারী করে। যারা অন্যরকম বলে, তারা প্রতারক, বা প্রতারিত। তুমি প্রাপ্য অর্থ ত্যাগ করে', স্বার্থহীন ডাক্তার সেজে, প্রতারণা শিক্ষা কোর না! তোমাকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকতে হবে; আর তোমার এই কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিতে হবে। দ্বিরুক্তি কোর না। তুমি আমার বন্ধুপুত্র; তুমি নির্ব্বোধ হোয়ো না।

এটর্ণি বাবুর নাম তারকনাথ ভট্টাচার্য্য। যদু আসিয়া, কারুকার্য্য শোভিত একটি ক্ষুদ্র 'টিপয়' তাঁহার পার্শ্বে রাখিল; এবং তদুপরি অমল ধবল বস্ত্রখণ্ড বিস্তৃত করিল। পর মুহূর্ত্তে আর এক ব্যক্তি আসিয়া, তাহার উপর রজতপাত্রে নানারূপ ভোজ্যদ্রব্য সকল সংস্থাপিত করিল। তাহার পর, ডাক্তারের নিমিত্ত 'টিপয়' ও খাদ্যদ্রব্য আনিবার জন্য তাহারা ছায়ার ন্যায় নীরবে অন্তর্হিত হইল। ডাক্তারের জন্য খাদ্যদ্রব্য আনীত হইলে, মাথার উপর আর একটি বৈদ্যুতিক আলোকের সুদৃশ্য ঝাড় জ্বলিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্ববৎ নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "ডাক্তার, খাও। তারক, কিছু জলযোগ কর; তোমাকেও রাত দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর—"

তারক। আর, পারিশ্রমিক নিতে হবে?

চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ, পারিশ্রমিক নিতে হবে।

তারক। কেন? তুমি ত জান, আমরা এটর্ণি মানুষ; সন্ধ্যার সময় আমাদের কিছুমাত্র রোজগার নেই। বাড়ীতে থাকলে, কেবল খরচ;—লে আও তামাক, লে আও সোডা, লে আও বরফ, খালি এই। তার পর, মাত্রা একটু চড়ে গেলে, 'চল, অমুকের বাড়ীতে গান শুনতে যাই।' এ তোমার

বাড়ীতে এসে নিরাপদে সময় অতিবাহিত করছি; বিনা খরচে সন্ধ্যা যাপন হচ্চে। অধিকন্তু লাভ, এই উপাদেয় জলখাবার! সত্যি, কেদার, তুমি এমন জলখাবার কোথা পাও?

চক্রবর্ত্তী। আমার বাড়ীর জিনিষে জল খাবার আমার বাড়ীতেই তৈরি হয়। কিন্তু তোমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের কথা হচ্ছিল। তা কত হবে, তা কার্য্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী পরে নির্দ্ধারিত করব। আপাততঃ বিনা বাক্য ব্যয়ে, জেনে রাখ, সে পারিশ্রমিক নিতে হবে। আমি জানি, তোমরা অনেক সময় কাষ না করেও লোকের কাছে পারিশ্রমিক আদায় কর; আমার বেলায় কাযের জন্যে পারিশ্রমিক নিতে ইতস্ততঃ করছ কেন?

তারক। তা হলে বুঝছি যে, আমাদিকে কেবল মাত্র তোমার জীবন কাহিনী আর তোমার ডেপুটীবাবুর নাতনীর জীবন কাহিনী শুনতে হবে না। এ ছাড়া, আমাদিকে কিছু কাযও করতে হবে। সে কাযটা কি?

চক্রবর্ত্তী। ঐ কাহিনী শোনাই কায, প্রয়োজনীয় কায; এত প্রয়োজনীয় যে, আমার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের তিন চার ঘণ্টার সময়, এ জন্যে ব্যয় করতে আমি প্রস্তুত হয়েছি। কি বল ডাক্তার, তুমি কি মনে কর, বাহাত্তর ঘণ্টার বেশী আমি এই পৃথিবীতে থাকতে পারব?

ডাক্তার। আপনার পীড়া কঠিন বটে, কিন্তু আপনার জীবনের কোন আশঙ্কা নেই। রোগটা আপনাকে কিছুদিন ভোগাবে; তার পর আপনি আবার আরোগ্য লাভ করতে পারবেন, আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবেন।

চক্রবর্ত্তী। এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। আপাততঃ তুমি একটা কায কর। যে ঘরে আমার খানসামা বড় শুয়ে ছিল, সেই ঘরের ভিতর দিয়ে, পূর্ব্বদিকের ঘরে যাও; ঐ ঘরে দশমিনিট কাল বিশ্রাম করে' আবার আমার কাহিনী শোনবার জন্যে এই ঘরে আসবে। আসবার সময়, ঐ ঘরের পশ্চিম দেওয়ালের কাছে একটি কষ্টী পাথরের 'সাইড বোর্ড' দেখবে; ঐ সাইড বোর্ডের দ্বিতীয় থাকে, একটি হলদে রঙের 'ডীড্' বাক্স দেখবে; সেটা নিয়ে এস। বুঝেছ?

ডাক্তারের জলযোগ শেষ হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' তৎপরে ভাবিলেন, কেন তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য কক্ষান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে ইহা ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার বাবু কথিত ঘরে প্রস্থান করিলেন।

সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় একটি সুকোমল কোচের পার্শ্বে একটি নিম্ন 'টিপয়ে' একটি রূপার সালবোটের উপর উৎকৃষ্ট সিগারেট, ও দেশালাই পূর্ণ রূপার কৌটা সকল সজ্জিত রহিয়াছে, অন্য একটি সালবোটের উপর পাণ ও নানাবিধ মসলা রহিয়াছে; এবং একটি কলিকা, এক রজত নির্ম্মিত গড়গড়ার মাথায় সুগন্ধি তামাকুর মনোমদ ধূম বিনির্গত করিতেছে। তাঁহার ন্যায় অতিথির সুবিধার জন্য, এই অভ্রান্ত বন্দোবস্ত দেখিয়া, ডাক্তার বাবু মনে মনে বৃদ্ধের অদ্ভুত বিবেচনা শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, কিছুক্ষণ সুখে ধূম পান করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ডীড্ বাক্স লইয়া, রোগীর শয্যার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

ভোজ্যদ্রব্যের পাত্র সকল অপসারিত হইয়াছিল, কিন্তু টিপয় দুইটি যথাস্থানেই স্থাপিত ছিল। ডাক্তার বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে, ডীড্‌বাক্সটি, তারক বাবুর নিকটবর্ত্তী টিপয়ের উপর সংস্থাপন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন উপাধান তল হইতে এক গুচ্ছ চাবি বাহির করিয়া, তাহার মধ্য হইতে মুদিত নয়নেই, একটি ক্ষুদ্র চাবি বাছিয়া লইলেন। পরে তাহা এটর্ণি বাবুর হস্তে দিয়া কহিলেন,— "তারক, এই চাবিটি নিয়ে বাক্সটি খোল; আর ওর

মধ্যে থেকে, আমার কোষ্ঠী বের করে, পড়ে দেখ, কত বৎসর, কত মাস, কত দিন, কত দণ্ড ও কত পল বয়ঃক্রমে আমার মৃত্যু ঘটবে।"

তারক বাবু বাক্স খুলিয়া কোষ্ঠী লইয়া, নাকে চশমা সংযোগ করিয়া দেখিলেন যে, বাষট্টি বৎসর, চারি মাস, সাতদিন, তেত্রিশ দণ্ড ও চারি পল গতে কেদারেশ্বর বাবুর মৃত্যু ঘটিবে। দেখিয়া তিনি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেদার, তোমার এখন কত বয়স হয়েছে?"

চক্রবর্ত্তী। ১২৫৬ সালের ৮ই বৈশাখ আমার জন্ম। আজ ১৩১৮ সালের ১২ই ভাদ্র। কাযেই আজ আমার বয়স হয়েছে, বাষট্টি বৎসর, চার মাস, ও চার দিন। আমার জন্মপত্রী অনুযায়ী আর তিন দিন পরে আমার মৃত্যু ঘটবে।

ডাক্তার। ও সব আপনি বিশ্বাস করবেন না।

চক্রবর্ত্তী। আমি যদি বলি, 'বিস্মথে' উদরাময় ভাল হয় না, কিম্বা কুইনিনে ম্যালেরিয়া সারে না, তুমি কি তা বিশ্বাস করবে?

ডাক্তার। না, কারণ বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির হয়েছে যে, ঐ দুটি ওষুধে ঐ ঐ রোগ আরোগ্য হয়ে থাকে।

চক্রবর্ত্তী। এই জ্যোতিষ তত্ত্বেও বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির হয়েছে, মানুষ যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারা জাতকের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। লগ্নের ফলাফল জেনে, কোন্ দশায় জাতকের মৃত্যু হবে জ্যোতিষীরা তা নির্ণয় করে' দেন। এই সময় অষ্টম রাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতি দেখে, তাঁরা নির্ণয় করে দিয়েছেন যে এই সময় আমার মৃত্যু হবে।

ডাক্তার। আমি অনেক সময় দেখেছি যে, জ্যোতিষীরা যা নির্ণয় করেন, বাস্তবিক তা ঘটে না।

চক্রবর্ত্তী। আমিও অনেক সময় দেখেছি যে, কুইনিনে ম্যালেরিয়া, আর বিস্মথে উদরাময় ভাল হচ্ছে না। কোনও স্থলে জ্যোতিষতত্ত্ব বিফল হল বলে', জ্যোতিষ বিদ্যাটাকে আমি ভ্রান্ত বলতে পারি নে। কোন কোন জ্যোতিষী জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করে' মানুষের জীবনদশা গণনা করতে গিয়ে ভুল করে থাকেন। কিন্তু ঐ বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা প্রায় ভুল করেন না। আমার কোষ্ঠী যিনি প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি জ্যোতিষ বিদ্যায় অভ্রান্ত পণ্ডিত। তা ছাড়া, আমার রোগের অবস্থা আর শরীরের ক্ষীণতা দেখেও, আমি অনুমান করছি যে আমার জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে। এই জন্যেই তোমাদের দু' জনের কাছে আমার জীবন কাহিনী বলে', আমি আমার শেষ উইল বা চরমপত্র প্রস্তুত করতে চাই। এই জন্যেই তোমাদিকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকতে বলেছি। বুঝলে তারক, আজ রাত্রে তুমি আমার জীবন কাহিনী শুনে আমার উপদেশ মত একখানি উইল, কাল তোমার অপিসে তৈরী করাবে, আর বেলা তিনটের সময়, সেটা আমার স্বাক্ষরের জন্যে নিয়ে আসবে। ডাক্তার, কাল ঐ সময় তুমিও আসবে। আমি তোমাদের, আর অপর দুই এক ভদ্রলোকের সমুখে দস্তখত করব।

ডাক্তার। না, না, এখন আপনি উইল তৈরী করবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। রোগটা সেরে যাক, তার পর সুস্থ শরীরে এই গুরুতর কাযে হাত দেবেন।

তারক। উইল করছ, কর; কিন্তু মনে করো না যে কোষ্ঠীতে লেখা আছে বলে' তিন দিন পরে তোমাকে মরতে হবে। তুমি এখনও অনেক কাল বাঁচবে; বেঁচে, আমাদিকে জলখাবার খাওয়াবে, আর পারিশ্রমিক দেবে।

চক্রবর্ত্তী। এইবার যে শয্যায় শুয়েছি, তা থেকে আমাকে আর উঠতে হবে না। আমি ত মরবই, কিন্তু যথা সময়ে মরতে পারলে, জ্যোতিষ বিদ্যার দিকে তোমাদের আস্থা জন্মাবে। জ্যোতিষ বিদ্যা সফল হোক; আমার জীবনে আর প্রয়োজন নেই। এই দীর্ঘ জীবন উপভোগ করে' বুঝেছি, এটা বহুপূর্ব্বে

গত হলেই পৃথিবীর কল্যাণ হত। না, আর নয়; আমার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে; বৃদ্ধ হয়েছি; আর বেঁচে কি হবে? বেঁচে কেন আমার উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত রাখব?

তারক। না, না, তোমায় মরতে হবে না; বেঁচে থেকে জগতের কল্যাণ কর।

চক্রবর্ত্তী। তোমার কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলাম।

তারক। কেন?

চক্রবর্ত্তী। তুমি কি কখনও দেখেছ যে, আমি জগতের একটি প্রাণীর এতটুকু উপকার করেছি? তবে তুমি কি করে' বুঝলে যে, আমি বেঁচে জগতের কল্যাণ করব? না, তারক, বিধাতা আমাকে জগতের কল্যাণ করবার জন্যে সৃষ্টি করেন নি। আমি জীবন ভোর কেবল আপনাকে বুঝেছি; আর বুঝেছি, জগৎকে খণ্ডিত করে' অর্থরাশির উপর অর্থরাশি সঞ্চিত করতে। এই অর্থের ভার এই মৃত্যুকালে আমাকে নিষ্পেষিত করছে; যত দিন জীবিত থাকব, এই নিষ্পেষণ থেকে অব্যাহতি পাব না।

তারক। যাক, ও সব কথায় আর কায নেই। তোমার জীবন-কাহিনী শোনবার জন্যে আমাদিকে জলখাবার খাইয়ে বসিয়ে রেখেছ; এখন সেই জীবন-কাহিনী কি বলবে বল।

চক্রবর্ত্তী। কেবল আমার জীবন কাহিনী নয়, এই কাহিনীর সঙ্গে ডেপুটি বাবুর নাতনীর জীবন-কথাও তোমাদিকে বলব। কিন্তু এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে কথা কয়ে, আমার মুখ কিছু শুকিয়ে গেছে।

ডাক্তার। আপনি এখনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আরও কথা কইলে আরও বেশী ক্লান্ত হবেন। আপনার যা বলবার আছে, তা অন্য সময় বলবেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।

চক্র। সময় নেই, ডাক্তার, সময় নেই। এ জীবনে আর অবসর নেই। যা বলবার আছে, তা আজই বলতে হবে।

তারক। তবে বলতে আরম্ভ করে' দাও। সাতটা বেজে গেছে।

চক্র। আর দেরী করব না, এখনই বলব। ডাক্তার, তোমার অনুমতি নিয়ে আমি একপাত্র সরবত খেতে ইচ্ছে করি।

ডাক্তার। তা খেতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, একখানি রূপার রেকাবির উপর, রূপার ঢাকনিদার একটি ছোট গেলাসে শীতল সরবত ও একখানি ক্ষুদ্র ন্যাপ্‌কিন লইয়া বদ্ধ খানসামা দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া, তারক বাবু ও ডাক্তার উভয়েই বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

আসফ-উ-দৌলা

দিল্লীর সাধের নন্দনবনগুলি যখন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন লক্ষ্ণৌ যেন দিল্লীর আসন অধিকার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। লক্ষ্ণৌ নগরীকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অযোধ্যার অন্যতম নবাব আসফ-উ-দৌলা একজন। এই বিলাসপরায়ণ অত্যাচারী নবাবের রাজত্বকালে অযোধ্যার প্রজাবর্গ শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিত। আসফ-উ-দৌলা একজন স্বার্থপর

এবং অত্যাচারী নবাব ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক আবু তালেব, আসফ-উ-দৌলার যে জীবনী লিখিয়াছেন, উহা অত্যন্ত মূল্যবান ও অভ্রান্ত। ইনি নবাব এবং তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দের অত্যাচার, বিলাসিতা প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই সকলের গুণাগুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সকলকেই ইনি অত্যাচারী ও বিলাসপরায়ণ বলেন নাই, কোন কোন কর্ম্মচারীর প্রশংসাও করিয়াছেন।

শুজা-উ-দৌলার শাসনকালে ফয়জাবাদই অযোধ্যার রাজধানী ছিল, কিন্তু আসফ-উ-দৌলা সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই উহা লক্ষ্ণৌয়ে স্থানান্তরিত করেন। নবাব শুজা-উ-দৌলার মৃত্যুর সময় তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন—প্রথম মির্জা অমানী, দ্বিতীয় মির্জা সাদতালী ও তৃতীয় মির্জা জঙলী। পিতার মৃত্যুর পর মির্জা অমানী অযোধ্যার নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হন, ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে * ইনি আসফ-উ-দৌলা নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। মৃত নবাবের শবাধার কবরস্থ হইবার পূর্ব্বেই, নবীন নবাব আমীর ওমরাহগণকে আহ্বান করিয়া, সভা সুসজ্জিত করিবার এবং নগরবাসিগণকে তাঁহার নবাবী প্রাপ্তির জন্য আনন্দোৎসব করিবার আজ্ঞা দেন। সিংহাসনে বসিয়াই আসফ-উ-দৌলা তাঁহার পিতার আমলের দেওয়ানকে কোন কার্য্যের অছিলায় দিল্লী প্রেরণ করিয়া, তাঁহার স্থানে মীর মুর্ত্তিজা খাঁকে দেওয়ানী পদে বরণ করেন এবং ফয়জাবাদ-নিবাসী ভাউলাল নামক এক ব্যক্তিকে খাজাঞ্চি নিযুক্ত করেন। কতকগুলি অত্যাচারী ও অযোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া, খিলাইৎ (সম্মান) স্বরূপ অর্থ, জায়গীর প্রভৃতি দান করেন। নবীন নবাবের ব্যবহারে শুজা-উ-দৌলার সমকালীন পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত হীন ও নগণ্য অবস্থায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

আসফ-উ-দৌলা যখন নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার পিতামহী বর্ত্তমান ছিলেন। নবীন নবাবের এই অপ্রত্যাশিত নীতি-বিরুদ্ধ আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং নানাপ্রকারে নবাবের কার্য্যের প্রতিকূলতাচরণ করিতে থাকেন। পিতামহীর প্রভুত্ব আসফের অসহ্য হইল। তিনি ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌয়ে রাজধানী উঠাইয়া আনিলেন এবং তদবধি লক্ষ্ণৌয়েই বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর রাজত্বকালেই লক্ষ্ণৌ দেখিতে দেখিতে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। দেখিবার উপযুক্ত বিশাল হর্ম্ম্যরাজি, সুদৃশ্য উদ্যান, জলাশয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া ইনি শীঘ্র লক্ষ্ণৌকে রাজধানীর উপযুক্ত নগরে পরিবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতেই লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার রাজধানীতে পরিণত হয়।

এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ভারতবর্ষে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন; ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন কলিকাতায় গভর্ণর জেনারেলের পদে সমাসীন। হেষ্টিংস সাহেবের বক্রদৃষ্টি অযোধ্যার উপর পড়িল। ইহার ফলে অযোধ্যায় যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, শাহজাদি ও বেগমগণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচারের স্রোত বহিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বক্তা এডমণ্ড বর্ক হেষ্টিংসের স্কন্ধে যে সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অযোধ্যা ঘটিত ব্যাপার সর্ব্বপ্রধান। অতএব যতদিন গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন হেষ্টিংস সাহেবের কুটিল নীতির কথা লোকে ভুলিবে না।

আসফ-উ-দৌলার নবাবী প্রাপ্তির পরই হেষ্টিংস সাহেব পূর্ব্ব-সন্ধিপত্রখানি রদ করিয়া নবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্তে সন্ধি করিলেন। এই নূতন সন্ধিপত্রে দেখা হইল যে, "নবাব ইংরাজ বাহাদুরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। কোম্পানীর অনুমতি না পাইলে, য়ুরোপ-নিবাসী কোন ব্যক্তিকেই নবাব কর্ম্মচারী নিযুক্ত

* কোন কোন ইতিহাসকারের মতে ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে শুজা-উ-দৌলার মৃত্যু হয় এবং আসফ-উ-দৌলাও ঐ বৎসর সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। শুজা-উ-দৌলার মৃত্যু এবং আসফ-উ-দৌলার রাজ্যাভিষেক ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল।—লেখক।



নবাব আসফ-উ-দৌলা

করিতে পারিবেন না। কোড়া ও এলাহাবাদ নবাবের অধিকারে থাকিবে এবং জৌনপুর, গাজীপুর ও রাজা চেতসিংহের জমীদারী আজ হইতে কোম্পানীর হইল। বৃটিশ সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নবাব বাহাদুর কোম্পানীকে ২,৬০,০০০ টাকা দিবেন।" ইত্যাদি। নবাব আসফ-উ-দৌলা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর (২১শে মে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দ) করিবার পর অযোধ্যায় কোম্পানী সৈন্য-সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন। সৈন্যগণের ব্যয়ভার সমস্তই নবাবকে বহন করিতে হইত। রেসিডেণ্ট ব্যতীত আর একজন এজেণ্ট লক্ষ্ণৌয়ের জন্য কোম্পানী বাহাদুর নিযুক্ত করিলেন। এই নবাব নিযুক্ত এজেণ্ট সাহেবের বার্ষিক বেতন ২,২০,০০০ টাকাও নবাবকে দিতে হইত।

আসফ ভাবিয়াছিলেন, আমি নবাব হইলে রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি পাইব, কিন্তু রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেব সমস্ত সম্পত্তি এবং অর্দ্ধ রাজ্য অধিক আয়ের একটি জমীদারী নবাবের মাতার অধিকারে করিয়া দিলেন। ইহা নবাবের মনঃপূত হইল না। আসফ মাতার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ৬২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। নবাব-জননী

পুত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে অর্থ প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের নামে রেসিডেণ্টের নিকট তৎক্ষণাৎ অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অনুসন্ধান করিয়া রেসিডেণ্ট যখন জানিতে পারিলেন যে অভিযোগ সত্য, তখন তিনি নবাবের নিকট হইতে লিখাইয়া লইলেন—"এখন হইতে আমি বেগমের সম্পত্তি ও জমীদারীতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না।" নবাবের এই প্রতিজ্ঞাপত্রদ্বারা লোকে বুঝিল যে, মাতা পুত্রের সন্ধি হইয়া গেল। কিন্তু মনে মনে উভয়ে উভয়কে শত্রু ভাবিতে লাগিলেন। আসফ-উ-দৌলা ফয়জাবাদ ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌয়ে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু নবাব-জননী ফয়জাবাদেই রহিয়া গেলেন এবং নিজের জমীদারীর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া, নিজের নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। বেগমের আশ্রয়ে প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি ছিল।

অনুপ গিরি ও উমরাও গিরি নামক দুই ব্যক্তি শুজা-উ-দৌলার সময় সম্মানিত পদে আরূঢ় ছিলেন। ইঁহারা দুই জনেই বিশ হাজারী মনসবদার ছিলেন। কোন কারণবশতঃ আসফ-উ-দৌলার সহিত ইঁহাদের মনোমালিন্য হয় এবং নবাব ইঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। এইরূপ আচরণে উভয়েই নবাবের ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলেন। নবাবের প্রাণনাশের জন্য উভয়েই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খোজা বসন্ত আলী খাঁ নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে ইঁহারা হস্তগত করিলেন। তিন জনের মধ্যে দিন কয়েক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, দেওয়ান মুর্ত্তিজা খাঁ ও নবাব আসফ-উ-দৌলাকে হত্যা করিয়া, আসফ-উ-দৌলার ভ্রাতা সাদত আলী খাঁকে সিংহাসনে বসাইতে হইবে। এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া, ইঁহারা নবাবের নিকট অবিশ্রাম মুর্ত্তিজা খাঁর নিন্দা করিতে লাগিলেন। বসন্ত আলী খাঁ নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইংরাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মুর্ত্তিজা খাঁ কাশী, জৌনপুর প্রভৃতি বড় বড় জমীদারী তাঁহাদের অর্পণ করিয়াছেন এবং কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অযোধ্যায় ইংরাজ সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ নানাপ্রকারে নবাবকে মুর্ত্তিজা খাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, বসন্ত খাঁ নবাবের নিকট হইতে মুর্ত্তিজা খাঁকে হত্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মুর্ত্তিজা খাঁর উপর বিরক্ত হইয়া নবাব অবশেষে তাহাকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দেন। অতঃপর বসন্ত খাঁ, নবাব এবং মুর্ত্তিজা খাঁকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বসন্তের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে মুর্ত্তিজা খাঁ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু আসফ-উ-দৌলা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান নাই। বসন্ত খাঁ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, নিমন্ত্রণের ছলে দেওয়ান ও নবাব উভয়কেই হত্যা করিয়া, সাদত আলীকে নবাব করতঃ নিজে তাঁহার দেওয়ান হইবেন। কিন্তু নবাবের মনে সন্দেহ হইল; বিচক্ষণ আসফ-উ-দৌলা বুঝিতে পারিলেন এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি! বসন্ত খাঁর বিস্তর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন না, অসুস্থতার ভান করিয়া মহলের ভিতর হইতে বাহিরই হইলেন না।

বসন্তর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। অন্য কোন সময়ে নবাবকে হত্যা করিবেন ভাবিয়া বসন্ত খাঁ দেওয়ান মীর মুর্ত্তিজা খাঁকেই আপাততঃ হত্যা করা স্থির করিলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। নিমন্ত্রিত মুর্ত্তিজা খাঁ এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া, কোন মুসলমানী নর্ত্তকীর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ছায়াবাজির মত নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল। পানোন্মত্ত দেওয়ান সভয়ে দেখিলেন, মৃত্যু তাঁহার শিয়রে! মুর্ত্তিজা খাঁ যখন এই সুরা ও সঙ্গীত প্রবাহে নিশ্চিন্ত মনে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় ফজল আলী নামক জনৈক সৈনিক, বসন্ত খাঁর আজ্ঞায় তাঁহাকে হত্যা করে।

মুর্ত্তিজা খাঁকে হত্যা করিয়া বসন্ত সাদত আলীর নিকট সংবাদ পাঠান যে, আপনি সসৈন্যে আসিয়া আমার সাহায্য করিলে, নবাবকেও ইহলোক হইতে সরাইয়া দিয়া, আপনার সিংহাসন

নিষ্কণ্টক করিব। বসন্ত, সাদত আলীর উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন। মুর্ত্তিজা খাঁর মৃত্যুসংবাদে নবাব অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ দেওয়ানের হত্যাকারী জীবিত থাকিলে, মুর্ত্তিজা খাঁকে কি অপরাধে হত্যা করা হইল, তাহার কৈফিয়ত নবাবকে রেসিডেণ্টের নিকট দিতে হইবে; আর বসন্ত খাঁ জীবিত থাকিলে, সে রেসিডেণ্টকে জানাইয়া দিবে যে নবাব বাহাদুরের আজ্ঞানুযায়ী দেওয়ান মুর্ত্তিজা খাঁকে হত্যা করা হইয়াছে। নবাব, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া বসন্ত খাঁকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইতিমধ্যে বসন্ত খাঁ একদিন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, নবাবের আদেশানুসারে কেবল মাত্র দুইজন শরীর-রক্ষীসহ তিনি ভিতরে যাইবার অনুমতি পাইলেন। কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, দুইজন শরীর-রক্ষী সহই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বসন্ত যখন নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন নবাব বাহাদুর ও নেবাজ সিংহের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। বসন্তকে দেখিয়াই আসফ-উ-দৌলা রাজা নেবাজ সিংহকে ইঙ্গিত করিলেন। নেবাজ সিংহের অস্ত্রাঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে বসন্ত খাঁর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। ইহাতেই নেবাজ সিংহ সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বসন্তর মস্তকহীন দেহে আরও কয়েকবার অস্ত্রাঘাত করিবার পর তাহার ছিন্ন মুণ্ডের উপর পাদুকা সমেত পদদ্বয় স্থাপন করিলেন।

মৃত প্রভুর এই অপমানে বসন্তের শরীর-রক্ষীদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; বড় মির্জা নামক অন্যতম শরীর-রক্ষী তরবারির আঘাতে নেবাজ সিংহের মস্তক ধূলিবিলুণ্ঠিত করিয়া দিল। নবাবের জনকয়েক শরীররক্ষী এই ব্যক্তিকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু এই মুসলমান বীর অক্ষত অবস্থায় রাজপ্রাসাদ হইতে পলাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর, পুরাতন দেওয়ান হয়জ খাঁকে নবাব পুনরায় দেওয়ান নিযুক্ত করেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময় পুরাতন সৈন্যগণকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়; যথাসময়ে বেতন না পাইয়া, ইহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজ্যময় লুট মার করিয়া প্রজাগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিল। ইহারা কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া, তাঁহাদের লাঞ্ছিত, এমন কি দু একজনকে হত্যাও করিয়াছিল। অনেক সাধ্যসাধনায় বিদ্রোহী সৈন্যদল শান্ত হয় এবং তখন হইতে কর্ণেল সোবরে ইহাদের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন।

হয়জ খাঁর মৃত্যুর পর হায়দার বেগ খাঁ অযোধ্যার দেওয়ান হন। রাজা টিকোৎ রায় নামক এক কায়স্থ, খাজাঞ্চির পদ প্রাপ্ত হন। হায়দার বেগ অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, নির্দ্দয় এবং ঘোরতর বিলাসী ছিলেন। ইহাঁর সহিত যাঁহারা সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, হায়দার তাঁহাদের সহিতও কৃতঘ্নতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টোর আজ্ঞানুসারেই হায়দার অযোধ্যার দেওয়ান হইয়াছিলেন। এই উপকারের বিনিময়ে ব্রিষ্টোর সহিত তিনি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। আসফ-উ-দৌলার শাসনকালে প্রজা সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচারের ঢেউ বহিয়া যাইত, তাহার কারণ এই পরস্বাপহারী দেওয়ানের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রজাগণের উপর বল প্রয়োগ। হায়দার যেমন অত্যাচারী তেমনি চতুর ছিল। সে লাট সাহেবের কাউন্সিলের সমস্ত মেম্বর এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবর্গকে এমনি বশীভূত করিয়াছিল যে, তাঁহার এই ঘোরতর অত্যাচারের কথা কোন গভর্ণর জেনারলই জানিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক কুটিলতায় হেষ্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিসও হায়দারের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন।

স্বর্গগত নবাব সুজা-উ-দ্দৌলার পুত্র-কন্যা ও বেগমগণের উপরও হায়দার ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল। মৃত নবাবের পুত্র ও কন্যা প্রত্যেকের জন্য, রাজকোষ হইতে মাসিক একসহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল। নবাবজাদাগণ লক্ষ্ণৌয়েই থাকিতেন। ইহাঁদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বাসঘাতক হায়দার

বেগের জন্য তাঁহারা উপবাসে দিন যাপন করিতেন। নবাব বেগমগণ ফয়জাবাদেই থাকিতেন, ইঁহাদের দুঃখ ও দারিদ্র্যের অন্ত ছিল না। পেটের জ্বালায় বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে বেগম ও নবাবজাদিগণ দলবদ্ধ হইয়া, হারেম হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন এবং বাজার-হাট লুঠ করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা লইয়া পুনরায় হারেমে ফিরিয়া যাইতেন। বেগম ও বাদশাজাদি-গণের জন্য যে মাসিক বৃত্তি ধার্য্য হইয়াছিল, নৃশংস হায়দার বেগের কুটিলতায়, বেগমগণ যথাসময়ে ঐ অর্থ পাইতেন না, কোন কোন মাসে বা একেবারেই পাই-তেন না। শুজা-উ-দৌলার পূর্ণযুবতী কন্যাগণের বিবাহের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, ইহার প্রধান কারণ অর্থাভাব। ফলে হারেমে ব্যভিচারের প্রবল বন্যা বহিতে আরম্ভ হইল। শাহজাদি ও বেগমগণের চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠিল। অগণিত পরপুরুষের সমাগমে হারেম পূর্ণ হইয়া গেল। নবাব আসফ-উ-দৌলার চরম নৃশংসতার ইহাই অকাট্য প্রমাণ! হারেমের কয়েকজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী নবাবজাদি নাকি আসফ-উ-দৌলার বিলাস-লালসা তৃপ্ত করিতে বাধ্য হন! শুজা-উ-দৌলার মাতা নবাব আলিয়া বেগম যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি আপনার সাধ্যানুসারে বেগম ও শাহ-জাদিগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন এবং তাঁহাদের সৎপথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। শাহজাদি ও বেগমগণের সম্মান ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার মৃত্যুর পর হারেমের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া পড়িল। নবাব আসফ-উ-দৌলার মাতার নিকট প্রভূত অর্থ ও জমীদারী থাকিলেও, সময়াভাবে তিনি এই অত্যাচার-পীড়িত বেগম ও শাহজাদিগণের কোন সন্ধানই রাখিতেন না।* পৈশাচিক লীলায় ও হাহাকারে হারেম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

একবার সুজা-উ-দৌলার এক পুত্র অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। কিছুদিন অনাহার ও অর্দ্ধাহারে থাকিবার পর, সে আর এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, কলিকাতায় গিয়া গবর্ণর জেনারেলের নিকট নিজের দুঃখময় কাহিনী বর্ণনা করিয়া, তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিল। গভর্ণর বাহাদুর নবাবের নিকট হইতে ইহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। নবাব সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। আসফ-উ-দৌলা হায়দার বেগের পরামর্শানুযায়ী গবর্ণর জেনারেলকে জানাইলেন যে, "আমার ভ্রাতা অত্যন্ত বিলাসী। এক যুবতীর প্রেমাসক্ত হইয়া সে কলিকাতায় গিয়াছে এবং তথায় অর্থাভাববশতঃ আপনাকে প্রবঞ্চিত করিয়া নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছে। উহার কোন অভাবই নাই। দয়া করিয়া আপনি যদি তাহাকে লক্ষ্ণৌয়ে পাঠাইয়া দেন ত বিশেষ বাধিত হইব।"

রাজ্যের সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় এবং সৈন্যগণের ব্যয়ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, নবাব সরকারে অর্থের নিতান্ত টানাটানি পড়িয়া গেল। নবাবের বিলাসিতায় ও কর্ম্মচারিগণের অপহরণে ভাণ্ডার শূন্য হইতে লাগিল। নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে বার্ষিক কর দিতেন, অর্থাভাবে ঐ কর দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। নবাবের কর্ম্মচারিগণ আপন ইচ্ছামত অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক দশ টাকা বেতন পাইত, তাহারা প্রতিমাসে পঞ্চাশ বা ততোধিক টাকা আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করিত। উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চারিগণের বাটীতে নবাব বাহাদুর মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে ও নৃত্যগীতাদি শুনিতে যাইতেন। গৃহস্বামীকে নবাবের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইত, ইহাতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইত। আসফ-উ-দৌলা এই জলের মত অর্থ ব্যয় স্বচক্ষে

* নবাব-বেগম অর্থাৎ আসফ-উ-দৌলার মাতা এমন কি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেন যাহার জন্য তাঁহার নিতান্ত সময়া-ভাব ছিল? ইহার উত্তরে ইতিহাসকার আবুতালেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অনুপযুক্ত। তিনি নবাব-বেগমের যে সকল অশ্লীলতাচরণ ও ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অকথ্য ও অশ্রাব্য।—লেখক।

দেখিতেন, কিন্তু তিনি কোনদিন এ কথা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, এই অল্প বেতনভোগী ভৃত্যদের দল কোথা হইতে এরূপ অজস্র অর্থ ব্যয় করে। যেখানে প্রভু এমন অত্যাচারী ও বিলাসপরায়ণ, সে স্থলে তাঁহার ভৃত্যগণ যে ঘোরতর অত্যাচারী কৃতঘ্ন ও পরস্বাপহারী হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পূর্ব্বে সৈন্য-বিভাগের কর স্বরূপ ২৫ লক্ষ টাকা নবাব কোম্পানীকে দিতেন, কিন্তু আসফ-উ-দৌলার নবাবী প্রাপ্তির পর হইতে ৩২ লক্ষ টাকা সামরিক বিভাগের কর ধার্য্য হইয়াছিল। সাত আট বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর পাওনা দুইকোটির টাকার অধিক হইল। ইহাতে নবাব অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাজে খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন; কর্ম্মচারিগণের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইল, এই অল্প বেতনেও কর্ম্মচারিগণ অতি কষ্ট পাইত, ফলে রাজ্যময় অরাজকতা ও বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিল। কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল। নবাবকে বঞ্চিত করিয়া সকলেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। সুবাদার কর্ণেল হেনা তিন চারি বৎসরের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়াছিলেন। নবাবকে খাজানা দিয়া হেনা এই টাকা 'উপরি' উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন কাশী নরেশ চেৎসিংহের সহিত হেষ্টিংসের যুদ্ধ হয়, কর্ণেল হেনা ঐ সময় হেষ্টিংসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাতে হেষ্টিংস তাঁহার উপর চটিয়া যান, এই জন্য বা অন্য কোন কারণে বাধ্য হইয়া হেনাকে কলিকাতায় যাইতে হয় এবং কোন বিশেষ কারণে ইনি তথায় আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রাজ্যে ঘোর অরাজকতার লক্ষণ দেখিয়া নবাব চিন্তিত হইয়া হেষ্টিংসকে জানাইলেন যে, বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা দয়া করিয়া কিছু কম করিয়া দিলে এবং অযোধ্যা হইতে ইংরাজ কর্ম্মচারিবৃন্দকে সরাইয়া দিলে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। এই বিষয়ের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য আসফ-উ-দৌলা ১৭৮১ খৃঃঅব্দে চুনারে গিয়া হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য অযোধ্যায় রাখিয়া, বাকি সৈন্যগণকে হেষ্টিংস অন্যস্থানে পাঠাইয়া দিলেন এবং যে সকল প্রবলপরাক্রান্ত জমীদার নবাবকে চৌথ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জমীদারী বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিলেন। নবাবের প্রার্থনানুসারে হেষ্টিংস সাহেব অযোধ্যা রাজ-সরকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। কর্ণেল হেনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ব্রেন, মেজার ম্যাকডোনাল্ড, ক্যাপ্‌টেন ফ্র্যাঙ্ক, ক্যাপ্‌টেন গর্ডন, মেজর ল্যান্সডাউন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করা হইল। কতকগুলি ব্রিগেড স্থানান্তরিত হইল। কর্ণেল হেনার স্থানে প্রথমে আবদুল বেগ নিযুক্ত হন; তাঁহাকে হত্যা করিবার পর রাজা সুরত সিংহ ঐ পদে নিযুক্ত হন। রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেবের পরিবর্ত্তে মিডলটন সাহেব নিযুক্ত হইয়া আসেন। অর্থাৎ নবাবের প্রার্থনানুযায়ী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করা হয় এবং পুরাতন কর্ম্মচারীর স্থানে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়।

কাশীরাজ চেৎসিংহের সহিত ইংরাজ বাহাদুরের যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে নবাব বেগমগণ কোম্পানীর কোনরূপ সাহায্য না করায়, হেষ্টিংস বেগমগণের জমীদারী বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাবের নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা চাহিলেন, কারণ এই সময় কোম্পানী বাহাদুরের নিতান্ত অর্থাভাব হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া হায়দার বেগ বলিল যে, এই ৭৫ লক্ষ টাকা বেগমের নিকট হইতে আদায় করা হউক। প্রথমে নবাব এ নীচকার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে নবাবকে বেগমগণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত করা হইল এবং গভর্ণর জেনারেলের আদেশানুযায়ী হায়দার ও রেসিডেণ্ট সাহেব, নবাবকে এই কার্য্য করাইতে বাধ্য করেন। বেগমগণ কিন্তু অর্থ দিতে সম্মত হইলেন না, ইহাতে নবাব বেগমগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অর্থ লওয়াই স্থির নিশ্চয় করিলেন। অসংখ্য সৈন্যসহ

হায়দার বেগ খাঁ, রেসিডেণ্ট মিড্‌ল্‌টন ও তাঁহার সহকারী জনসন সাহেব, বেগমগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ফয়জাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।*

বেগমগণের নিকট প্রায় চারি সহস্র সৈনিক ছিল। ইহারা নবাব সৈন্যের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল এবং বেগম, নবাবজাদি ও তাঁহাদের ভৃত্যগণকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেওয়া হইতে লাগিল। বেগম ও সাহাজাদিগণকে এরূপ অপমান ও অসম্ভ্রম করা হইয়াছিল, তাঁহাদের এতদূর মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, যাহা শুনিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়। হায়দার বেগের কামাগ্নি হইতে সুন্দরী সাহজাদি ও বেগমগণ কেহই রক্ষা পান নাই; হায়দার ইহাদের সহিত এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নবাব বহুদিন হইতেই জননীর উপর বিরক্ত ছিলেন, অবসর বুঝিয়া হায়দার নবাব-বেগমের মহল অনুসন্ধান করিয়া, নগদ ৫০ লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ ও অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লন। নবাবকন্যা ও বেগমকে বিবস্ত্রা করিয়া, তাঁহাদের দেহ হইতে অলঙ্কারাদি গ্রহণ করা হয়।

দেওয়ান হায়দার বেগের ঘোরতর অত্যাচারে দেশ হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। রেসিডেণ্ট মিডলটন সাহেবও হায়দারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হইল। সমস্ত দেখিয়া হেষ্টিংস পুনরায় ব্রিষ্টো সাহেবকে রেসিডেণ্ট করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। রাজ্য যুড়িয়া অরাজকতা; সমস্ত জমীদার সুবাদার স্বাধীনভাবে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; ইহাঁদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। এই সকল প্রবলপরাক্রান্ত জমীদারগণের যথেচ্ছাচারে প্রজাগণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। সুজা-উ-দৌলার সময়ে অযোধ্যা যেমন সুখ শান্তি পূর্ণ ছিল, আসফ-উ-দৌলার শাসনকালে ইহা তেমনি অবিচার, অত্যাচার ও অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া গেল। সৈন্যবিভাগের ব্যয়, কর্ম্মচারিগণের অর্থাপহরণ এবং নবাবের অত্যধিক বিলাসিতায় চতুর্দ্দিকে মহামারী পড়িয়া গেল। ব্রিষ্টোর পর পামর সাহেব রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁর কার্য্যাবলীও হেষ্টিংসের মনোনীত হইল না। কিছুদিন পরে ইহাঁর স্থানে কর্ণেল হেয়ার রেসিডেণ্ট হইয়া আসিলেন। এইরূপ বিস্তর পরিবর্ত্তন হওয়ায়, সমস্ত বিপ্লবের মূল হায়দার বেগ হিমালয়ের মত অচল ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব লক্ষ্ণৌয়ে আসিলেন; খুব জাঁকজমকের সহিত নবাব ইহাঁর অভ্যর্থনা করিলেন। নবাবের বিস্তর অনুরোধে হেষ্টিংস সৈন্যবিভাগের ব্যয় কিছু কমাইয়া দিলেন, কিন্তু ইহাতে নবাব সন্তুষ্ট হইলেন না এবং এ সম্বন্ধে নবাব ও গভর্ণর জেনারেলের মধ্যে পত্রব্যবহার হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে হেষ্টিংস বিলাত যাত্রা করিলেন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ইনি অত্যন্ত দয়ালু এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে কর্ণওয়ালিস নবাবের সহিত নূতন ভাবে সন্ধি করিলেন। এই নূতন সন্ধির সর্ত্তানুসারে অন্যান্য সমস্ত কর বন্ধ হইয়া, কেবলমাত্র ৫০ লক্ষ টাকা নবাব বাহাদুর কোম্পানীকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনে হায়দারের প্রভুত্ব আরও বাড়িয়া উঠিল এবং অত্যাচারের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। রাজ্যের এই সকল পরিবর্ত্তনার্থে এবং নূতনভাবে সন্ধি করাইবার জন্য, হায়দার বেগ স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

* কোন কোন ইতিহাসিকগণ বলেন, বেগমগণকে আক্রমণ করিবার জন্য যে সৈন্য গিয়াছিল, উহার সহিত নবাব সাহেবও ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, আসফ-উ-দৌলা স্বয়ং এই নীচ কার্য্যে সহযোগী হন নাই। আমার ধারণা, নবাব বেগমগণকে আক্রমণ করিবার আজ্ঞা দান করেন, আক্রমণকালে নিজে উপস্থিত ছিলেন না।—লেখক।

হায়দার বেগ কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিবার দুই মাস পরে, কর্ণেল হেঁয়ারের স্থানে অন্য এক ইংরাজ যুবক রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে কর্ণওয়ালিস স্বয়ং লক্ষ্ণৌয়ে আসিলেন। উঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য হায়দার বেগ কাশী পর্য্যন্ত এবং আসফ-উ-দৌলা এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বিস্তর বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দানে নবাব কর্ণওয়ালিসকে সম্মানিত করিলেন; কিন্তু গভর্ণর সাহেব তাঁহার প্রদত্ত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। কর্ণওয়ালিস নবাবকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুদিন অবস্থান করিবার পর, হায়দারের কুটিলতা ও অত্যাচারের বিষয় এবং অযোগ্য নবাবের সমস্ত কথাই তিনি জানিতে পারিলেন। ইহাতে গভর্ণর জেনারেল অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। পর-স্ত্রী হরণ হায়দার বেগের অন্যান্য অত্যাচারের মধ্যে প্রধান ছিল; কোন প্রজার সুন্দরী স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী বা অন্য কোন আত্মীয়া তাঁহার পাপ-দৃষ্টির সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা পাইত না; হায়দার বেগের বিলাস-ভবন অসংখ্য সুন্দরী যুবতীতে পূর্ণ ছিল।

নবাব আসফ-উ-দৌলার বাজে খরচ অত্যধিক পরিমাণে ছিল। মহরম ও ফাগুয়ায় (দোলে), বিবাহ এবং অন্যান্য উৎসবাদিতে, নৃত্য-গীতে প্রতি বৎসর নবাব সাহেব ছয় সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। হাতী, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি পালিত জীবজন্তুগণের জন্য, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। নবাব সাহেবের ১২০০ শত পালিত হস্তী, ৩০০০ ঘোড়া ও ১০০০ কুকুর ছিল; কখনও কোন কুকুর মরিলে, তৎক্ষণাৎ শহরের যে কোন পথ হইতে একটা কুকুর ধরিয়া আনিয়া, মৃত কুকুরের স্থান পূরণ করা হইত। নবাব অগণিত পায়রা পুষিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত অসংখ্য মুর্গী, ছাগল, হরিণ, বাঁদর, সাপ এবং অন্যান্য জন্তুও ছিল। যদি সুশৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইত, তাহা হইলে মৃত নবাব সুজা-উ-দৌলার বেগম ও পুত্র-কন্যাগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও এই সকল জীবজন্তু অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারিত। নবাবের পালিত কোন কোন সাপ একমণ পর্য্যন্ত মাংসাহার করিত। পালিত জন্তুগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি নবাবের তীব্র দৃষ্টি থাকিত, কিন্তু আত্মীয় স্বজন ও পরিবারবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি কোনদিন তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। নবাবের কার্য্য করিবার জন্য, অসংখ্য ভৃত্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। দুই সহস্র ভৃত্য সর্ব্বদা নবাবের সঙ্গে থাকিত। আশা ও বল্লমধারী ভৃত্যের সংখ্যা একশত ছিল; বিভিন্ন উদ্যানে সর্ব্বসমেত চারি সহস্র মালী কার্য্য করিত, এতদতিরিক্ত রন্ধন করিবার জন শত শত ভৃত্য ছিল। নবাবের রন্ধনালয়ের দৈনিক খরচ দুই হইতে তিন সহস্র টাকা ছিল। আসফ-উ-দৌলা যখন ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন সহস্র সহস্র ভৃত্য তাঁহার দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইত, ইহারা সকলে নবাব-সরকার হইতে বেতন পাইত। নানাপ্রকারে নবাব অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেন। নবাবের ন্যায় হায়দার বেগ, টিকৈৎ রায়, হাসন রেজা খাঁ প্রভৃতি নবাব-কর্ম্মচারিবৃন্দেরও বাজে-খরচ অধিক পরিমাণে হইত। বাজে খরচের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা ইঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা, চুরী, ঘুস ও লুটপাট করিয়া সংগ্রহ করিতেন, ফলে প্রজাগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইত।

১৭৯৬ খৃঃ অব্দে আসফ-উ-দৌলার পুত্র উজীর আলীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে নবাব ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বার শত সুসজ্জিত হাতী এবং অসংখ্য ঘোড়া বিবাহ-উৎসবের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। উজীর আলি বস্তুতঃপক্ষে কোনও নীচ জাতীয় ভৃত্যের পুত্র ছিল। নবাব কোন সময় তাঁহার এক ভৃত্যের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হন; তিনি মূল্য দানে ভৃত্যের নিকট হইতে এই সুন্দরীকে গ্রহণ করেন; এই সময় এই যুবতী গর্ভবতী ছিল; উজীর আলি এই রমণীরই গর্ভজাত পুত্র। নবাবের অধিকাংশ পুত্র-কন্যাই এইরূপ। আসফ-উ-দৌলার বন্ধুবর্গও

অধিকাংশ নীচ বংশোদ্ভব ছিল; ইহাদের মধ্যে অনেকের গতি নবাব-হারেম পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ছিল।

সুখ স্বচ্ছন্দতায় কোন ব্যক্তির সময়াতিবাহিত হইতে দেখিলে নবাব তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। বরফ এবং অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্য নবাবের আজ্ঞায় কেহই ব্যবহার করিতে পাইত না। পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত। কোন ব্যক্তি পুষ্প বিক্রয় করিতে পাইত না। লক্ষ্ণৌ-নিবাসী কোন তাঁতির প্রস্তুত এক প্রকার কাপড় নবাবের মনোনীত হয়। তাঁতির নিকট হইতে নবাব বাহাদুর সমস্ত কাপড় ক্রয় করেন। একদিন নবাব কোন ব্যক্তিকে ঐ কাপড়েরই শেরবানী (কোটবিশেষ) পরিয়া বেড়াইতে দেখিলেন। ইহাতে নবাব অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং তাঁতিকে তৎক্ষণাৎ গর্দ্দভে বসাইয়া, নগর প্রদক্ষিণ করাইবার আজ্ঞা দেন। নবাবের ভৃত্যগণ স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতে পাইত না, এমন কি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিতও ইহাদের দেখাসাক্ষাৎ করিতে পাইত না। নবাবের এই আদেশ যদি কেহ অমান্য করিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত। এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য, নবাব বাহাদুর গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নবাবের অবিচার ও অত্যাচারের সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম।

আসফ-উদ্দৌলা বৎসরে দুই বার ভ্রমণে বাহির হইতেন; একবার বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে; অন্যবার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে। ইনি প্রায়ই আলমোড়া, নৈনীতাল প্রভৃতি শীতপ্রধান প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। কার্ত্তিক মাসে ঐরূপ স্থানে ভ্রমণ করিতে যাওয়া যে কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শত শত মনুষ্য এবং জীবজন্তু আসফের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, অকালে প্রাণ ত্যাগ করিত। একবার নবাব আশ্বিন মাসের শেষে আলমোড়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রেসিডেন্ট চেরী সাহেব নবাবকে কিছু দিন পরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কারণ তখনও বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল। নবাব চেরী সাহেবের কোন কথাই গ্রাহ্য করিলেন না; দলবল সমেত গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। পথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। নবাবের সঙ্গে বিস্তর কামান ও প্রায় এক হাজার হাতী ছিল। ইহাদের গমনাগমনে পথ কর্দ্দমে ভরিয়া উঠিল, অল্প সময়ের মধ্যে জানু পর্য্যন্ত কাদায় সকলকে চলিতে হইল। পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় যে কিরূপ কষ্ট সকলে পাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। দরিয়াবাদ হইতে ফয়জাবাদের প্রশস্ত পথের উপর যেন ঘোড়া, উট, মানুষ প্রোথিত করা হইয়াছে। ফয়জাবাদে নবাবের আসফ বাগান নামক উদ্যানে সমস্ত লোকের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, বিস্তর লোক উন্মুক্ত প্রান্তরে আপন আপন তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এই স্থানে দেড় ফুট গভীর কর্দ্দম ছিল। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায়, সকলে প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। এই কর্দ্দমাক্ত স্থানে তাঁবুর দড়ী ধরিয়া সকলে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়। ১৫ দিন পর্য্যন্ত এই শোচনীয় অবস্থায় সকলের দিন কাটিল।

নবাব বিচলিত হইলেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আর ফয়জাবাদে থাকিতে পারিলেন না। সকলকে পুনরায় লক্ষ্ণৌয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল। ঘাঘরা নদীর বিশাল বক্ষে সেতু নির্ম্মিত হইল, কিন্তু সেতু রাত্রের মধ্যে ঘাঘরার অতল জলে লীন হইয়া গেল। নবাব কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি নিজে গিয়া সমস্ত দেখিয়া, যে প্রকারেই হউক নদী পার করিবার আজ্ঞা দিলেন।

পাঁচ দিন অবিশ্রান্ত বারিপাতের ভিতর দিয়া নৌকায় মানুষ, ঘোড়া, গরু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরপারে যাইতে লাগিল। নদী পার করিবার সময় বিস্তর হাতী, ঘোড়া ও অসংখ্য মানুষ ঘাঘরায় অতল জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। পাঁচদিন পরে অর্দ্ধেক মনুষ্য ও জীব-জন্তু পরপারে পৌছিল এবং অর্দ্ধেক ঘাঘ-

রায় বিশাল বক্ষে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিল। ষষ্ঠ দিনে নবাব পরপারে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু রাত্রে প্রবল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এমন ঝড় উঠিল যে, নবাবের তাঁবু উল্টাইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি ভীষণ দুর্যোগে নবাবের তাঁবু ধরিয়া ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া রহিল। পর দিন নবাব তাঁহার তাঁবু স্থানান্তরে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু চতুর্দ্দিক কর্দ্দমে পূর্ণ, তাঁবু খাটাইবার জন্য সামান্য স্থানও শুষ্ক পাওয়া গেল না। নবাবের আর লক্ষ্ণৌয়ে যাওয়া হইল না, নদীতীর হইতে পুনরায় ফয়জাবাদেই ফিরিয়া গেলেন। যাহারা নদীর পরপারে চলিয়া গিয়াছিল, জীবজন্তু ও সমস্ত দ্রব্যাদিসহ তাহাদের পুনরায় ফয়জাবাদে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। এই রূপে সকলকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। *

ভ্রমণকালে যাহারা নবাবের সঙ্গে থাকিত, তাহারা ঘোড়ার জন্য ঘাস এবং নিজের অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য কাষ্ঠ ও জল আনিবার জন্য ঘড়া এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিত। ইহা ব্যতীত অর্থ ও আহার্য্য সামগ্রী জোর করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিত; এত অধিক পরিমাণে ইহারা অর্থ ও অন্য দ্রব্য লইত যে, লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত তাহাদের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ ঐ অর্থ ও দ্রব্য দ্বারা হইয়া যাইত। নবাব-বাহিনী যে স্থানে অবস্থান করিত, তাহার চতুর্দ্দিকের গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাইত; অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে প্রজাগণ আপন আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিত। প্রজাবর্গের শূন্যগৃহে নবাবের লোক আগুন লাগাইয়া পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করিত। নবাবের সহিত এত অধিক লোক থাকিত যে, রন্ধন করিবার জন্য কাষ্ঠের অত্যন্ত প্রয়োজন হইত। ফলে ইহারা প্রজাগণের গৃহ ধূলিসাৎ করিয়া, ঐ সকল গৃহের কাষ্ঠে রন্ধন কার্য্য সমাধা করিত। একবার টিকৈৎ রায় নবাবের নিকট এই পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলে, নবাব তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে দু চার মাস যদি নবাবের কর্ম্মচারিবৃন্দ লুটপাট না করিতে পায় ত নবাব সরকারে চাকরি বা করিবে কেন? তাহাদের এই সকল অত্যাচার বন্ধ করিলে, আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য তিনি যে ভ্রমণে বাহির হন তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। নবাব-বাহিনী কেবল পুরুষগণের উপরই অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা নারীর সম্মান সম্ভ্রমের উপরও হস্তক্ষেপ করিত।

নবাব আসফ-উ-দৌলার শাসন কালে সুবিচার কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানিত না। বলবান দুর্ব্বলের উপর ইচ্ছামত অত্যাচার করিত। কেহই তাহাকে বাধা দিত না। রাজা ভবানী সিংহ এই সময় কাজী বা প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না। প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি নবাবের মোটেই দৃষ্টি ছিল না, প্রজার মৃত্যু ও তাহাদের অপরিসীম কষ্টে নবাবের কোন ক্ষতি হইত না। সঙ্গীমণ্ডিতে কোন ব্যক্তি বাস করিত। † এই ব্যক্তি মন্ত্রসাধনেচ্ছায় নানা স্থান হইতে সুন্দর সুকুমার বালক ধরিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিত। ক্রমে এই কথা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইল। কয়েকজন প্রতিবেশী একত্র হইয়া, ঐ ব্যক্তির গৃহ খনন করিয়া অনেকগুলি বালকের মস্তকহীন মৃত দেহ বাহির করিল; বুক চিরিয়া এই সকল দেহ হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই মস্তকশূন্য দেহ লইয়া বালকগণের পিতামাতা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে নবাবের বিলাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বালকগণের হত্যাকারীকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করিল; কিন্তু

---

* তফজী হল গাফিলীন।

† আসফ-উ-দৌলার জীবনী ও তাঁহার শাসনকালের ইতিহাস রচয়িতা আবু তালেবের বাটী উক্ত ব্যক্তির বাটীর নিকট ছিল।—লেখক।

নবাব একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে, তোমরা কেন ক্রন্দন করিতেছ ? সমস্তদিন পথের ধারে দাঁড়াইয়া পুত্রহীন পিতামাতাগণ অশ্রুর অজস্রধারায় বুক ভাসাইয়া আপন আপন গৃহে ফিরিল। বালকগণের হত্যাকারী কিছুদিন গুপ্তভাবে থাকিয়া, আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই আপনার বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইহার গুরুতর অপরাধের দণ্ড কেহই দিল না। ভাউলালের কোন আত্মীয়,মৃত নবাব সুজা-উ-দৌলার আত্মীয় রজাবেগ খাঁকে হত্যা করেন। রাজবেগের মাতা, তাঁহার পুত্রের হত্যাকারীকে দণ্ড দেওয়াইবার বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, রাজাবেগের হত্যাকারী পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। এই হত্যাকাণ্ডের কোন সুবিচার হইল না দেখিয়া রজাবেগের ভাগিনেয় তাহার মাতুলের হত্যাকারীকে নবাব-কাছারীর সম্মুখে হত্যা করিয়া, তাহার মাতুলের হত্যার প্রতিশোধ লইল। এইরূপ ব্যাপার প্রায় প্রত্যহই হইত। শক্তিমান, দুর্ব্বল ও দরিদ্রের প্রতি অত্যার করিত। বলবান নিজের শত্রুকে নিজেই দণ্ড দিত—নবাব বা বিচারকের আজ্ঞার কোন প্রয়োজন ছিল না।

১৭৮৩—৮৪ খৃঃ অব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রত্যহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। লক্ষ্ণৌয়ের পথে ঘাটে এত মৃতদেহ একত্র হইয়াছিল যে, দুর্গন্ধে নগরে বাস করা ত দূরের কথা, মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে যে সকল ইংরাজ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়াছিলেন, গভর্ণর জেনারেলের অনুরোধে নবাব দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রত্যহ এক সহস্র মুদ্রা দান করিবার আজ্ঞা দেন। কিন্তু যাঁহাদের উপর এই অর্থ বিতরণের ভার প্রদত্ত হয়, তাহারা উহার অর্দ্ধেক অর্থ আত্মসাৎ করিত। অসাবধানতার সহিত অর্থ বণ্টনের ফলে, অনাহারে দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের মাথা কাটিয়া যাইত, কাহারও বা হস্তপদ ভাঙ্গিয়া যাইত, কেহ কেহ পদদলিত হইয়া, ভবযন্ত্রণা হইতে চিরমুক্তিলাভ করিত। এই সংখ্যাতীত ক্ষুধাশীর্ণ নর-নারীর মধ্যে সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নবাবের হারেমে না হয় হায়দার বেগের বাটীতে প্রেরণ করা হইত।

হায়দার ৭০ বৎসর বয়সে কামোদ্দীপক ঔষধ সেবনেচ্ছায় হকিম শুফি খাঁ নামক এক বৈদ্যেরশরণাপন্ন হন, এবং তাঁহারই প্রদত্ত কোন বিষাক্ত ঔষধে হায়দারের মৃত্যু হয়।

হায়দারের মৃত্যুর পর টিকৌৎ রায় অযোধ্যার দেওয়ান হন এবং হাসন রজা খাঁ খাজাঞ্চি পদে নিযুক্ত হন। দেওয়ান হইয়া টিকৌৎ রায় রাজ্যের যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং প্রজাগণের উপর যাহাতে কোন অত্যাচার না হয় সে বিষয়ে ইনি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। ইহাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে প্রজাগণ যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। টিকৌৎ রায়ের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও এই ভীষণ অত্যাচার ও অবিচার রাজ্য হইতে দূর হইল না। কাযেই টিকৌৎও অবশেষে এই প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিলেন। ইনি স্বয়ং কোন অত্যাচার করিতেন না, বা কাহারও উপর কাহাকেও অত্যাচার করিবার আজ্ঞাও দিতেন না; তবে কাহারও কোন অন্যায় অত্যাচারে এখন হইতে ইনি আর কোন আপত্তি করিতেন না। পূর্ব্বেই টিকৌৎ তাঁহার আত্মীয় ও স্বজাতিবর্গকে নবাব সরকারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এখন নবাবের দেওয়ান হইয়া ইহাঁর প্রভুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। টিকৌতের জ্যেষ্ঠ সহোদর নির্ম্মল দাস সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন, বৈজনাথ ও ধনপত রায় নামক দুই ব্যক্তি খাজাঞ্চি নিযুক্ত হইলেন; হুলাস রায় টিকৌতের পেশকার হইলেন। ইহাঁরা নবাব সরকার হইতে যে কত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। অল্প দিনের মধ্যেই ইহাঁরা লক্ষপতি হইয়াছিলেন। নিজের নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য টিকৌৎ রায় আপনার নামানুযায়ী টিকৌৎ

গঞ্জ ও টিকৌৎ নগর নামক দুইখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই নবাব-দরবারের অন্যান্য নেতাগণের সহিত টিকৌতের মনোমালিন্য হয়, ফলে নবাব ইহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ইহার পর ভাউলাল দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন, ইনিও অত্যন্ত অত্যাচারী ও নির্দ্দয় ব্যক্তি ছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর সার জন শোর ভারতে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ইনি লক্ষ্ণৌয়ে উপস্থিত হইয়া এখানকার অত্যাচার পীড়িত প্রজা-বর্গের অবস্থা দেখিয়া এবং নবাব কর্ম্মচারিগণের ঘোর-তর অত্যাচার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ভাউলালের আচরণে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তফজ-উল-হোসেন নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। যদিও এই এই সকল পরিবর্ত্তন বিনা বাক্যব্যয়ে নবাব মানিয়া লইলেন, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। কিছু দিনের মধ্যে তফজ-উল-হোসেন নবাবের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। তফাজ-উল-হোসেনকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য নবাব বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যে যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, যাহাতে প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে সার জন শোর, অযো-ধ্যার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং সৈন্যবিভা-গের কর ছয় লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে নবাব অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই ব্যয় বৃদ্ধিতে তাহার প্রাণে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন।

পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, বিলাসপরায়ণ অত্যাচারী নবাব আসফ-উ-দৌলা অযোধ্যার রাজসিংহাসনের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোকে প্রস্থান করেন। নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উজীর আলী অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন; কিন্তু দেওয়ান তফজ-উল হোসেন ও রেসিডেণ্ট চেরী সাহেবের মন্ত্রণায় উজীর আলী পদচ্যুত হন এবং তাঁহাকে কাশীতে নির্ব্বাসিত করা হয়। উজীর আলীকে নির্ব্বাসিত করিয়া সাদত আলীকে অযোধ্যার নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, উজীর আলী কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন; এই কারণে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে বিলোরের কারাগারে উজীরের মৃত্যু হয়। ইহাঁকে সমাহিত করিবার জন্য শবাধার প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত ৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল! যাঁহার শুভ-বিবাহে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তাঁহারই মৃতদেহের সদ্‌গতির জন্য কেবল মাত্র ৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

আসফ-উ-দৌলা উদ্যান ও ভবন নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই কার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা তিনি ব্যয় করিতেন। আয়েশ বাগ, চার বাগ, হাসেন বাগ প্রভৃতি সুবৃহৎ নয়নরঞ্জন উদ্যান এবং দৌলৎখানা, বিবিয়াপুর, চিনহুট, মচ্ছীভবন, ইমাম বাড়ী প্রভৃতি বিশাল সৌধ নবাব আসফ-উ-দৌলা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, অনাবশ্যক বিবেচনায় এই সকল সৌধ ও উদ্যানাদির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম না।

নবাব আসফ-উ-দৌলার এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল ছিল যে, প্রজাগণ যেন তাহাকে বিশেষভাবে ভক্তি ও মান্য করে; সমস্ত অবিচার অত্যাচার তাহারা যেন নত মস্তকে সহ্য করিয়া যায়, মৃত্যু অপেক্ষা ঘোরতর অত্যা-চার ও অন্যায় হইতে দেখিয়াও তাহারা যেন চোখ বন্ধ করিয়া লয়। কোন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য কাহারও ওষ্ঠ যেন না কাঁপে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, আসফ-উ-দৌলা প্রজা-গণের উপর যে ঘোর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

প্রমাণ পঞ্জী

(১) History of Oudh.

(২) Traveller's Guide to Lucknow, 1859.

(৩) Kaye's, Vol III.

(৪) The Private Life of an Eastern King.

(৫) তার-এ-আখতর (মূল উর্দ্দু গ্রন্থ)।

(৬) তফজী হুল গাফিলীন, আবুতালেব রচিত রচিত মূল ফারসী গ্রন্থ। নবাব আসফ-উ-দৌলার জীবনী ও শাসনকাল সম্বন্ধে এই ইতিহাসখানি অত্যন্ত মূল্যবান এবং অভ্রান্ত। বর্ত্তমান "আসফ-উ-দৌলা" প্রবন্ধটি প্রধানতঃ এই পুস্তকের সাহায্যে রচিত। সুজা-উ-দৌলার শাসন কালে তালেবের পিতা মহম্মদ বেগ অযোধ্যার কাজি বা বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুজা-উ-দৌলার সময় হইতেই, বালক আবু তালেবের সর্ব্বত্র অবাধ গতি ছিল, নবাব এই বালককে ভালও বাসিতেন। সুজা-উ-দৌলার অনুগ্রহে আবু তালেব বেশ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আবু তালেব অযোধ্যার অশ্বারোহী সৈন্যগণের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হন এবং বহুদিন যাবৎ এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা-উ-দৌলার মৃত্যুর পর আসফ-উ-দৌলা সিংহাসনে উপবেশন করেন, আবু তালেবও তাঁহার নবাবী প্রাপ্তির দিন হইতে নবাবের প্রাত্যহিক কার্য্য ও আচরণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। নবাবের হারেম এবং অন্যান্য স্থানে ইঁহার অবাধ গতি ছিল। সুতরাং ইঁহার রচিত ইতিহাসখানি যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য ও অভ্রান্ত তাহা নিঃসন্দেহ। ইনি ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে য়ুরোপেও গিয়াছিলেন, এবং প্রায় সমগ্র য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া, খ্রীঃ অব্দে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে আসফ-উ-দৌলার মৃত্যু হয় এবং এই বৎসরই আবু তালেব, তাঁহার ইতিহাসখানি রচনা করেন। মূল গ্রন্থখানি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আছে।

(৭) কসরুল তবারীখ—মূল উর্দ্দু পুস্তক।

(৮) বহরিস্থান আওঅধ—মূল গ্রন্থ।

(৯) শবাবে লখনউ উর্দ্দু গ্রন্থ।

(১০) মুস্তাক জোহরা—দুষ্প্রাপ্য উর্দ্দু পুস্তক।

বিদায়—না পুনরাহ্বান ?

চোখে জল ? না-না প্রিয়ে মুছ মুছ ত্বরা
বিদায়ের ক্ষণে মোরে কোর না চঞ্চল !
করুণ ভিখারী আঁখি বড় দৈন্য ভরা
সর্ব্বনেশে যাত্রাভঙ্গ করিবার ছল।
অই তপ্ত অশ্রুধারা—তরল হৃদয়
পিচ্ছিল করিবে মোর সারা পথ হায় !
সমগ্র প্রবাস হবে বিড়ম্বনাময়
সর্ব্ব কর্ম্ম কণ্টকিত লাঞ্ছনা লজ্জায়।

যদি শুভ মাগ প্রিয়ে, কৃপা করি তবে
নিঠুর কঠোর ভঙ্গি ফুটাও বয়ানে
নিরাপদ হবে পন্থা যাত্রা শুভ হবে
ফিরিতে মাথার দিব্য করো না নয়ানে।
সর্ব্বনাশ ! মাগিতেছ বিদায় চুম্বন ?
এই কি বিদায় ? এ যে পুনরাবহন ?

শ্রীকালিদাস রায়।

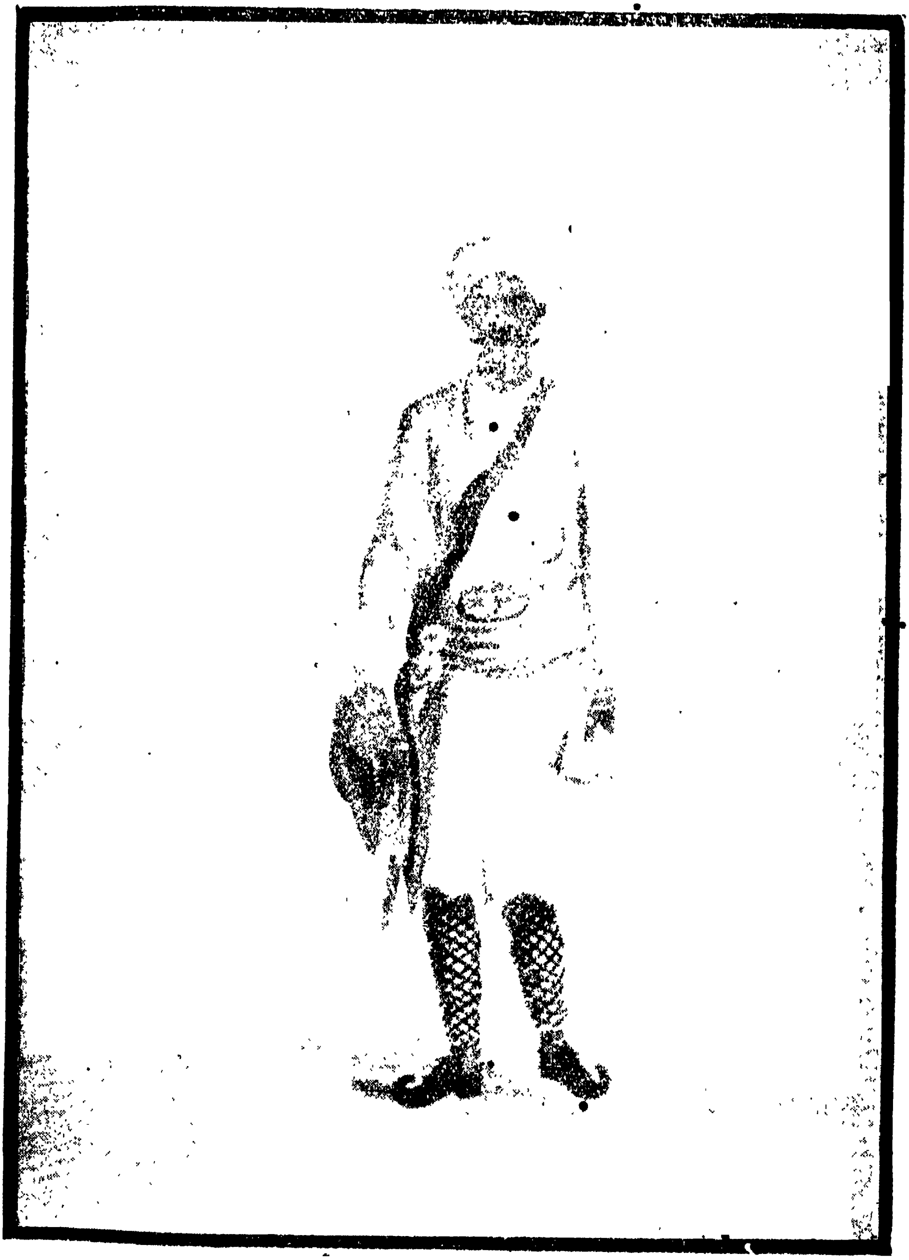
ভারতীয় চিত্রাবলী

(১৮০৭ খৃঃ প্রকাশিত Balt. Solvyns কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রগ্রন্থ The Costume of Hindostan হইতে)



ব্রজবাসী

(সওদাগর ও ধনী ব্যক্তিরা ইহাদিগকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিতেন।
সাহস ও বিশ্বস্ততার জন্য ইহারা প্রসিদ্ধ ছিল)



সরকারী পিয়াদা বা চাপরাশি



পক্ষীসার

(নলগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া, শেষ নলের মুখে আঠা লাগাইয়া, গাছের পাখীকে ইহারা আবদ্ধ করে)



কেওরা

(সাহেবদের আহারের জন্য শূকর বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছে).

আঁধারের শিউলি

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুকুলের মামীশাশুড়ী বলিলেন—"ও কি একখানা বিচ্ছিরী শাড়ী বের করলে!—কেন, তোমার আর শাড়ী নেই?"

মুকুল মৃদু হাসিয়া বলিল—"কেন, এখানা ভাল নয়?"

"আহা, কি পছন্দ, মরে যাই! নাও, ও-রেখে দাও—ট্রাঙ্কটা খোল ফের"—এই বলিয়া ট্রাঙ্ক খোলাইয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা জরিপাড় নীলাম্বরী শাড়ী বাছিয়া বলিলেন—"নাও, এইখানা পর!"

মুকুল একটু আপত্তির সুরে বলিল, "নীলাম্বরী!"

মামীশাশুড়ী নিজের উক্তিতে জোর দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ। দেবী নীলাম্বরী পরা দেখতে ভালবাসে—ঐখানাই পর।"

মুকুলের মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, "মামীমা দেখছি ভাগনের মনটির সব অলিগলির খোঁজ রাখেন!"

পরিধেয় নির্ব্বাচন শেষ হইলে, বধূর বেশবিন্যাসের উপর খাশুড়ীর নজর পড়িল—"ও মা! ও কি চুল বাঁধা হয়েচে! অমন টেনে-টেনে চুল বাঁধলে ভারি বিচ্ছিরী দেখায়! নাও, চুল খোল।"

তখন তেল জল আর কস্‌মেটিকের শ্রাদ্ধ করিয়া, পাতা কাটিয়া বৌয়ের চুল বাঁধা আরম্ভ হইল। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বৌয়ের রংটায় এক পুরু ময়লা পড়িয়াছে মনে হইতে লাগিল—"বাগো কি নোংরা তুমি! সাবান দিয়ে মুখ হাত পা পরিষ্কার করে এস!"

প্রসাধনের এইরূপ উৎকট সংস্কারের ব্যবস্থায় মুকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল—"কি হবে মামীমা এত লোকেরাজে? আমার বড্ড লজ্জা করে।

"ঈ—স! লজ্জা করে! লজ্জাটা কিসের? এখন পরবে-টরবে না তো পরবে কবে? নাও—ওসব রাখ, সাবান দিয়ে মুখটুখগুলো 'পরিষ্কার' করে এস।"

মুখ হাত পরিষ্কার করা হইলে মামীশাশুড়ী বধূর কেশ রচনায় মন দিলেন। কপালের কাঁচপোকার টিপ বরখাস্ত করিয়া গুলপোকার টিপের ব্যবস্থা করিলেন। মুকুলের মুখের চাঁপা ফুলের রঙের উপরেও হেজলিন স্নোর কলি ফিরাইতে ছাড়িলেন না। মুকুল একটা সাদাসিদা সেমিজ পরিতে যাইতেছিল, খাশুড়ী সেটা টানিয়া লইয়া একটা গোলাপী সেমিজ হাতে তুলিয়া দিলেন। মামীশাশুড়ীর এই সব কাণ্ড দেখিয়া মুকুলের শুধু যে হাসি পাইতেছিল তাহা নহে, লজ্জায় তাহার হেজলিন-তুষারাচ্ছন্ন মুখের চম্পক বর্ণটুকুও থাকিয়া থাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিতেছিল!

অবশেষে আল্‌তা পরিবার পালা। মুকুল নিজে পরিলে আল্‌তা মোটা করিয়া টানা হইয়া যাইবে, সুতরাং মামী সে ভার নিজে লইতে চাহিলেন। মুকুল এবার ঘোর আপত্তি তুলিল। কিন্তু খাশুড়ীর ঘোরতর জেদের নিকট তাহা টিকিল না। অলক্তরাগে মুকুলের সমস্ত লজ্জা যেন তাহার চরণপ্রান্তে ঘনীভূত হইয়া উঠিল! আল্‌তা পরান শেষ হইলে মুকুল মামীশাশুড়ীকে প্রণাম করিল।

এইরূপে প্রসাধনক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, পরিতৃপ্ত স্নেহের স্বরে খাশুড়ী বধূকে কহিলেন—"প্রতিমার মত চেহারাখানা কি বিচ্ছিরী করে রেখেছিলে!" এই বলিয়া অতৃপ্ত নয়নে বারবার বধূর মুখখানির দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার ট্রেণে দেবকুমার মধুপুরে পৌছিল। প্রথমেই মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেবকুমারকে

দেখিয়া বলিলেন, "অসুখ বিসুখ হয়েছিল না কি? রোগা রোগা দেখাচ্চে?"

দেবকুমার পথশ্রমের দোহাই দিল। অন্দরে ঢুকিতেই মামী বলিলেন—"তীর্থ করা হ'ল? দু'দিনে যে দেখচি শরীর চুপসে গেছে! খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হত বুঝি?" দেবকুমার তাহার উত্তরে হাঁ-না করিয়া কাটাইয়া দিল।

মামী বলিলেন—"তা যা হোক, তোমার খুব নেমন্তন্নের বরাত—তীর্থ করতে গেলে, সেখানেও নেমন্তন্ন!"

দেবকুমারের বুকের রক্ত ধক্ করিয়া উঠিল। সে জোর করিয়া একটু হাসিল।

মামী বলিলেন—"ভাত তৈরী। মুখ হাত ধুয়ে দুটি খেয়ে শুয়ে পড়গে—কাল সব শুনব।"

দেবকুমার বলিল—"স্নান করলে হ'ত, শরীরটা ঝাঁ ঝাঁ করচে।"

"তা যা করবে হয় শীগ্‌গির করে নাও"—বলিয়া মামী ভৃত্য রামকিষণকে স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন।

স্বামীকে নিরালা পাইয়া মুকুল বলিল—"খেয়ে তোমাকে ঘুমুতে দিচ্চিনে কিন্তু। এতদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে না পেয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেচে; কাশীর গল্প আজ রাত্রে শোনাতে হবে।"

দেবকুমার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা।"

মুকুল রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখিল, দেবকুমার পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। পূর্ব্বে কিন্তু দেবকুমার এরূপ করিত না। সে মুকুলের অপেক্ষায় জাগিয়া থাকিত এবং যদি কখনও নিদ্রার আবেশ আসিত, তবে একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিত।

মুকুল স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—"হ্যাঁ গো, ঘুমুলে?"

দেবকুমার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল—"ঘুম আসছিল।"

"গল্প করবে না—কাশীর?"

"আজ থাক—বড় ক্লান্ত।"

মুকুল হতাশভাবে বলিল—"ও মা! আজ থা—ক। না না, একটুখানি গল্প করতে হবে, পাশ ফিরে শুলে কেন—এদিকে মুখ করো না।"

অগত্যা দেবকুমার মুকুলের দিকে ফিরিয়া শুইল। মুকুল স্বামীর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"আজ যখন এলে, তখন আমার সাজগোজ দেখে তোমার হাসি পায়নি? আমি কিন্তু নিজে ওসব কিচ্ছু করিনি, মামীমাই জোর করে অমন সাজিয়ে দিয়েছিলেন।" এই বলিয়া মুকুল প্রসাধন-পর্ব্ব একে একে বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল।

শুনিয়া দেবকুমার অন্যমনস্কভাবে বলিল—"তাতে আর হয়েচে কি?"

এরূপ উত্তরে মুকুল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ও মা, আমি ভেবেছিলুম তুমি খুব হাসবে, ঠাট্টা করবে!"

দেবকুমার স্থির গম্ভীরভাবে বলিল—"তাতে আর হাসব কেন? মামীমা ভালই করেছিলেন!"

স্বামীর এরূপ গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাবটা কিন্তু মুকুলের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে বলিল—"তোমার কি হয়েচে? এমন শুক্‌নো শুক্‌নো ভাব?"

দেবকুমারের মনের ভিতরটা ক্ষণকালের জন্য শিহরিয়া উঠিল। মনের ভাব দমন করিয়া বলিল—"না, শরীরটা বড় ক্লান্ত, তাই কিছু ভাল লাগচে না।" দেবকুমারের কণ্ঠ বাধিয়া গেল।

মুকুল যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—"তবে থাক, ঘুমোও।" দেবকুমার নিষ্কৃতি পাইল।

কিন্তু মুকুলের চোখে নিদ্রা নাই। সে কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল,—"এবারকার 'কাশীর আঁচড়' পড়েচ? ভারি সুন্দর হয়েচে!"

দেবকুমার যেমন ভাবে শুইয়া ছিল তেমনি ভাবে থাকিয়া বলিল—"তাই নাকি?—কাল পড়ব এখন!"

মুকুল বলিল—"তাতে 'সতীর দুঃখ' বলে একটা গল্প বেরিয়েচে, পড়লে কান্না পায়!" মুকুল আর স্থির থাকিতে পারিল না, বিছানা হইতে উঠিয়া 'কাশীর আঁচড়'খানা আনিয়া গল্পটা পড়িতে লাগিল। গল্পের

নারী-উপন্যাস যেখানে প্রতিমার মতন স্ত্রী সত্ত্বেও, ছেলে হয় নাই বলিয়া আবার একজনকে বিবাহ করিয়া, পূর্ব্বের স্ত্রীকে অনাদরে অবহেলায় শুকাইয়া ফেলিতেছিল, সেখানটা পড়িতে পড়িতে সমবেদনায় মুকুলের নারীহৃদয় কাঁপিয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুকুল অশ্রুসংযত কণ্ঠে স্বামীকে বলিল—"উঃ—গল্প পড়েই আমার এত কষ্ট হচ্চে—আর সত্যি যদি কারুর হয়!"

দেবকুমারের একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, তবে সে কোন্ সাহসে অমন করিয়া কাশীতে চিঠি লিখিয়াছিল? কিন্তু দেবকুমারের অপরাধী মন সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে মুকুলের মুখপানে তাকাইতেই পারিল না, নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল। মুকুল স্বামীর কোনও মতামত না পাইয়া বলিল—"কি, ঘুমুলে?"

দেবকুমার গাঢ়স্বরে এবারেও বলিল—"না, ঘুম আসছিল।"

মুকুল স্বামীকে সোহাগভরে একটা ঠেলা দিয়া বলিয়া বলিল—"এ হল কি তোমার? গল্প শুনতে শুনতেও ঘুম এল? আচ্ছা তো কাশীর ঘুম দেখছি!"

দেবকুমার একটা অতি চাপা নিশ্বাস ফেলিল।

মুকুল স্বামীর এই আশ্চর্য্য রকমের ঘুম দেখিয়া, গল্পপাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া ক্ষুণ্ণমনে শুইয়া পড়িল।

পরদিন দেবকুমার সুভদ্রাকে গোপনে এক পত্র দিল। 'পাঠ' লিখিতে গিয়া দেবকুমার গোলে পড়িল। প্রথমে কলমের মুখে বাহির হইল 'প্রাণাধিক'। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা কাটিয়া লিখিল 'স্নেহের'। এ সম্বোধনটাও যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। তখন লিখিল 'কল্যাণীয়াসু'। ইহাও দেবকুমারকে উপহাস করিতে লাগিল। লিখিল, 'ভদ্রা'।

দেবকুমারের মনে হইতে লাগিল, ইহাতেও যেন একটু স্নেহের আভাস রহিয়া গেল। ঘাতকের মুখে আহা শব্দ বড় নির্ম্মম, বড় বিকট, বিসদৃশ শোনায়। দেবকুমার লিখিল—'সুভদ্রা'। অবশেষে কি ভাবিয়া, তাহাও কাটিয়া দিয়া বিনা সম্বোধনে লিখিল—

"মানুষের শত্রুতা যেমন সময় সময় মানুষের মিত্রতার কায করে, তেমনি অনেক সময়েই মানুষের মিত্রতা মানুষের শত্রুতাই করে থাকে। আমাকে সেই শেষোক্ত মানুষের মত একজন বলে জানবে।

"আজ আমি তোমায় সম্বোধন-শূন্য এই প্রথম ও শেষ পত্র লিখলাম—এতে ভেব না আমি তোমার উপর রাগ করেছি বা তুমি আমার অপ্রিয়। তোমরা একদিন ভেবেছিলে, আমি দেবতা। কিন্তু আমি দেবতা নই, আমি মানুষ—অতি নিম্নশ্রেণীর ঘোর স্বার্থপর মানুষ! তোমরা ভেবেছিলে, তোমাদের উদ্ধার করতেই স্ত্রী বর্ত্তমানে আমি আবার বিবাহ করেছিলুম। কিন্তু তোমরা জান তো, আমার সে স্ত্রী কি স্ত্রী! বঙ্কিমের ভোমরার সব গুণ তাতে আছে, নেই কেবল সে উৎকট অভিমান, উপরন্তু আছে অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য—শরতের রবিকিরণ জ্যোৎস্নার শীতলতায় জমিয়ে নবনীর কোমলতা দিয়ে গড়া সে রূপ! তার সামনে শিশু হার মানে, তার প্রেম ভক্তির গভীরতায় সমুদ্র গোষ্পদ, তার উচ্চ মন আকাশকে ছাড়িয়ে ওঠে!—এমন স্ত্রী থাকতে আবার যে বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেছিলুম, তা পরের উপকারের জন্যে নয়—আমার সেই স্ত্রীর মঙ্গলের জন্যে!"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া দেবকুমার তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় সংক্ষেপে লিখিল—

"আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ভুলে যাও এবং আমাকেও ভুলতে দাও। কাশীর ভুল কাশীতেই থাক্। বিদায়ের পূর্ব্বে তোমাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলুম তাও ভুলে যাও। আমি দেবতা নই—মানুষ—অতি নিম্নশ্রেণীর মানুষ!—ঘোরতর স্বার্থপর। আমার ক্ষমা কোরো না, বরং অভিসম্পাত দিও। এ পত্রের উত্তর চাই না। আমি চাই শুধু তুমি আমার ভুলে যাও। ইতি—

শ্রীদেবকুমার শর্ম্মা।"

পাছে হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় চিঠি ডাকে দেওয়া না

হইয়া উঠে, তাই দেবকুমার পত্র লিখিয়াই তাড়াতাড়ি ডাকে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

সুভদ্রাকে পত্রের উত্তর দিতে একরকম বারণই করিয়াছিল, কিন্তু পত্র লিখিবার চতুর্থ দিনে দেবকুমার পোষ্ট-আফিসে খোঁজ লইল তাহার নামে কোন পত্র আছে কি না। সেদিন দেবকুমারের নামে তিনখানা পত্র আসিয়াছিল। একখানা কলিকাতা হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন; দ্বিতীয়খানা দেশ হইতে পিসী লেখাইয়াছেন, তৃতীয়খানা বীমা আফিসের তাগিদ পত্র। দেবকুমারের নিকট কিন্তু সবগুলোই বাজে পত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পঞ্চম দিনে দেবকুমার আবার পত্রের তল্লাসে পোষ্ট-আফিসে গেল, কিন্তু সেদিন কোন পত্রই আসে নাই। ছয় দিনের দিন দেবকুমার পোষ্ট-আফিসে গিয়া দেখিল, তাহার নামে কেবল একখানা পত্র আসিয়াছে। খামের উপর মেয়েলী ছাঁদের অপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা দেখিয়া দেবকুমারের সমস্ত হৃদয়খানা মুহূর্ত্তে পুলকে ভরিয়া উঠিল। খামের উপরে কোন্ ডাকঘরের ছাপ রহিয়াছে তাহাও সে দেখিয়া লইবার অবসর পাইল না। পত্রখানা সে তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিল। পত্র পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। শেষ 'ধেৎ' বলিয়া পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বর্দ্ধমানে দেবকুমারের দূর সম্পর্কের এক মাসীর মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। সে নাকি কেমন করিয়া জানিয়াছে, দেবকুমার মধুপুর আসিয়াছে। তাই বাড়ী ফিরিবার সময়ে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছে।

তার পর দেখিতে দেখিতে দশ দিন, পনের দিন, এক মাস কাটিয়া গেল—দেবকুমারের বাঞ্ছিত পত্র আসিল না। ক্রমে দেবকুমার হতাশ হইয়া পড়িল। তখন তাহার মনে আক্ষেপ হইতে লাগিল—কেন সে অমন পত্র লিখিল? মনের এক অংশ বলিল, "ফের পত্র লেখ, ক্ষমা চাও।" আর এক অংশ বলিল, "তাও কি হয়! তুমি না পুরুষ! ছিঃ!"

প্রথম অংশ বলিল, "হলেই বা পুরুষ, দোষ করেচ, স্বীকার করতে হানি কি?"

দ্বিতীয় অংশ বলিল, "যত হানি মুকুলের কাছে স্বীকার করবার বেলায়, না?"

প্রথম। সত্যিই তো মুকুলের তাতে হানি আছে—সে অসুখী হবে।

দ্বিতীয়। আর সুভদ্রার প্রেমে তলিয়ে গেলে মুকুলের ভারি মঙ্গল হবে, না?

প্রথম। তবে কি বলতে চাও, সুভদ্রা স্বামিপ্রেমে চিরবঞ্চিতা থাকবে, তাকে কি দেবকুমার বিবাহ করে নি?

দ্বিতীয়। বিয়ে করেচে বটে, কিন্তু সে বিয়ে সিদ্ধ নয়—এক ফুলে দুবার পূজা হয় না।

প্রথম। তবে ফের বিয়ে করতে গেলে কেন?

দ্বিতীয়। তার বাপের জাত রক্ষে করতে!

প্রথম। শুধু কি সেই জন্যেই? তার সঙ্গে রূপের মোহ ছিল না?

দ্বিতীয়। হাঁ ছিল, কিন্তু সে জন্যে মুকুল দায়ী নয়, সে পাপের শাস্তি অশান্তি দেবকুমারই ভোগ করুক।

প্রথম। তুমি দেখচি মুকুলের জন্যেই অস্থির হয়েচ, সুভদ্রার কথা একবারও ভাবচ না—সেও ত নির্দ্দোষী! তার অদৃষ্টে এ দুঃখ ভোগ কেন?

দ্বিতীয়। সে যদি তা ভাবত, তা হলে সে চিঠির জবাব না দিয়ে থাকতে পারত না!

প্রথম। বাঃ! তাকে জবাব দিতে বারণ করা হল—সে চিঠি দেবে কেন?

দ্বিতীয়। হাজার বারণ করা হোক্, যদি সে স্বামিপ্রেমে বঞ্চিত হওয়াটাকে দুঃখ বলে মনে করত, তবে কিছুতেই উত্তর না দিয়ে থাকতে পারত না।

প্রথম। তবে কেন কাশীতে অমন কেঁদেছিলে?

দ্বিতীয়। সে একটা মুহূর্ত্তের চঞ্চলতা; তার বেশী কিছু নয়।

প্রথম। এ তোমার অন্যায় বিচার।

দ্বিতীয়। হতে পারে, কিন্তু তোমার বিচারের চেয়ে কম অন্যায়।

দুই সরিকের মতভেদের মাঝখানে পড়িয়া দেবকুমার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ফলে সুভদ্রাকে আর চিঠি লেখা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

হারাণচন্দ্র কাশী হইতে ফিরিবার পরদিন সকালে বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় গ্রামের নাপিত মাধব পরামাণিক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে হারাণচন্দ্রকে দেখিয়া একটু থমকিয়া, পরে ঈষৎ বিমর্ষ মুখে বলিল—"প্রণাম হই ঠাকুর মশাই।" পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারাণচন্দ্র বলিলেন—"অমন করলে যে?"

মাধব বিষণ্ণভাবে বলিল—"না, ভাবচি এমন বিপদেও মানুষকে ফেলতে হয়!"

হারাণচন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিলেন—"কার কথা বলচ?"

মাধব বলিল—"এই দিদি ঠাকরুণের বিয়ের সময় যে বিপদটা—"

হারাণচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে খবর তুমি শুন্‌লে কোত্থেকে?"

মাধব উত্তর করিল—"আমি এই পাঁচজনের মুখে শুনেচি।"

হারাণচন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাঁচজনেই বা এর মধ্যে এ খবর পেলে কোত্থেকে?"

পরামাণিক চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"পাঁচজন কি ঠাকুর মশাই—দশখানা গাঁয়ে এ খবর রটে গেছে! কথায় বলে না, বিপদ কাগের মুখে রটে!" —একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাধব নিজের কাজে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রামের সনাতন চক্রবর্ত্তী আসিয়া দেখা দিয়া বলিলেন—"তাইত মুখুয্যে! তোমার ভারি বিপদ যাচ্চে দেখচি। একে জমীদার বিরূপ, তার উপর এই দুর্ঘটনা, এখন সমাজে না ঠেল্লে বাঁচি!"

হারাণচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন, সমাজে ঠেলবে কেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"সমাজ তা পারে বৈ কি! বিয়ের রাত্রে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল, ও মেয়ের কি আর বিয়ে দিতে পারবে?—এত আর যে সে সমাজ নয়! এ হচ্চে সেই মুনিঋষিদের হাতে গড়া হিন্দু সমাজ—একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই।"

হারাণচন্দ্র বলিলেন—"তা নয় হল। কিন্তু তোমরা শুন্‌লে কোথা থেকে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"এ সব কথা কি চাপা থাকে ভায়া, হাওয়ায় চড়ে আসে।"

হারাণচন্দ্র বলিলেন—"তাই আসল সংবাদ পাওনি, বিকৃত সংবাদই পেয়েচ।"

এত বড় একটা মুখরোচক সামাজিক ব্যাপার দানা বাঁধিবার পূর্ব্বেই হারাণচন্দ্র তাহাকে মিথ্যা বলিয়া পণ্ড করিতে চাহিতেছে দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি রকম?" প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল হারাণচন্দ্র তাহাই বলিলেন। শুনিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"কিন্তু ভায়া পাঁচজনে কি তা বিশ্বাস করবে? বলবে, ওসব রচা কথা।"

হারাণচন্দ্র ঈষৎ উষ্ণভাবে বলিলেন—"বিশ্বাস না করে, না হয় সমাজচ্যুত হয়ে থাক্‌ব! শেষ না হয় এদেশ থেকে উঠে যাব!"

চক্রবর্ত্তী মনে মনে বলিলেন—উঃ কি দম্ভ! প্রকাশ্যে একটু বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তা মুখুয্যে, জামায়ের নাম কি?"

"দেবকুমার রায়।"

"নিবাস?"

হারাণচন্দ্র বলিলেন—"কোন কারণে তা বল্‌তে বাধা আছে।"

চক্রবর্ত্তী অবিশ্বাসের ভরে বার দুই মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ! বাধা আছে! আচ্ছা এখন আসা যাক!"

ক্রমে পাড়ার গণেশ চাটুয্যে, বৃন্দাবন বোস, নিমাই রায়, শ্রীকণ্ঠ ঘোষাল হারাণচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ঐ একই ভাবের কথা শুনাইয়া গেল—সুভদ্রার বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়া সেই রাত্রে যে আবার পাত্র জুটিয়াছে এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

মথুর বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আক্ষেপ করিয়া বলিল—"মুখুয্যে মশাই আমিই, আপনার 'কাল' হলাম।"

"কেন, তুমি আমার কি অনিষ্ট করেচ ?"

মথুর বলিল—"আমার ঠাকুরের সেই শ্রাদ্ধ করানর জন্যেই না আপনার এই বিপদ!"

"আমি সে জন্যে এক বিন্দু দুঃখিত বা ভীত নই!"

মথুর বলিল—"ওরা নাকি আপনাকে একঘরে করবার মতলব করচে ?"

হারাণচন্দ্র বলিলেন—"করুক।"

মথুর জিজ্ঞাসা করিল—"জামাইয়ের পরিচয় বলায় দোষ কি ? তা হলে তো আর কোন গোল থাকে না।"

"না, আমি তা পারি না—আমি প্রতিশ্রুত তার কাছে।"

মথুরানাথের মনে কেমন খটকা লাগিল। বলিল—"তার এরকম করার অর্থ ? সে যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ তার সংবাদ নিয়েচেন ত ?"

ব্রাহ্মণের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে বলিলেন—"আমি তাকে ব্রাহ্মণের উপরে স্থান দিই—সে দেবতা!"

মথুর জিজ্ঞাসা করিল—"তবে সে নিজের পরিচয় জানাতে নারাজ কেন ?"

ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তার কারণ আছে।"

"সে কারণ আপনার জানা আছে ?"

"খুব আছে!"

"তবে তাঁকে এখানে আনালে দোষ কি ?"

"না, তাও আমি পারি নে। তার সঙ্গে আমার সে সর্ত্ত নয়—সে কেবল আমার মেয়েকে বিবাহ করে আমার জাত রক্ষা করবে এই মাত্র কথা তার সঙ্গে।"

"মেয়েকে নিয়ে যাবে ত ?"

"সে তার অনুগ্রহ—না নিয়ে গেলেও আমার বলবার কোন অধিকার নেই!"

"তার কি আর স্ত্রী আছে ?"

"সে খবরে আমার দরকার ?"

"কি রকম! আপনি মেয়ের বিয়ে দিলেন—"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কে বল্লে মেয়ের বিয়ে দিয়েচি—আমি মেয়ে বলি দিয়েচি, নিজের জাত রক্ষের জন্যে।"

মথুরানাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কিন্তু যে সমাজের ভয়ে এমন কল্লেন, সে সমাজ তো আপনাকে বিপদে ফেলতে ছাড়বে না।"

"তার ধর্ম্ম হয়, করুক।"

মথুরানাথ বলিল—"এতো আর সমাজ নয়, এ হচ্চে হিংসা দ্বেষ অত্যাচারের বারোয়ারী!"

হারাণচন্দ্র নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। বৈকালে সুভদ্রার নামে খামে এক পত্র আসিল। তখন হারাণচন্দ্র বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার প্রতিবেশীর পুত্র বিশু পত্রখানা লইয়া অন্দরে ঢুকিয়া বলিল—"দিদি, তোমার চিঠি।"

সুভদ্রাকে এ পর্য্যন্ত কেহ পত্র লেখে নাই, এবং লিখিবার মত কেহ বড় একটা ছিলও না। সুতরাং সুভদ্রা নিমেষে বুঝিয়া লইল পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে। সলজ্জ আনন্দে তাহার গণ্ড দুইটি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বিশ্বনাথের হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইল। বিশু সুভদ্রার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোমাকেই তো দিতে আসছিলাম! কার চিঠি, দিদি ?"

সুভদ্রা ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"চুপ কর, মা শুনতে পাবেন।"

বিশ্বনাথ পূর্ব্বের মত স্বরে বলিল—"কেন, শুনতে পেলে কি হবে? বুকবে?"

সুভদ্রা সস্নেহ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—"আবার জোরে জোরে কথা কচ্চ? চুপ কর।"

বিশ্বনাথ তখন কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিল—"কে লিখেচে বল, তা নইলে চেঁচিয়ে কথা কব!"

সুভদ্রা তখন পেয়ারার লোভ দেখাইল, কিন্তু বালকের কৌতূহলী চিত্ত আজ পেয়ারার লোভে বশীভূত হইতে চাহিল না। সে ধরিয়া বসিল, "না, বলতে হবে কে লিখেচে। বলবে না? তবে চেচিয়ে বলি—" এই বলিয়া কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চতর করিয়া বলিল—"ও গো দি—দি—কে—"। সুভদ্রা তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা বলচি বলচি—"

বিশ্বনাথ তৃপ্তভাবে কহিল—"বল তবে!"

"আমার বর।"

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সুভদ্রা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল—সে আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। খুব একটা নিরালাস্থানে গিয়া, কাপড়ের ভিতর হইতে খামখানা বাহির করিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও আসিতেছে কি না। তার পর ধীরে ধীরে পত্রখানি অতি সযত্নে খুলিল, পাছে খামখানি বেশী ছিঁড়িয়া যায়! আশা ছিল, তাহাতে প্রণয় সম্ভাষণের কোন না কোন কথা দেখিতে পাইবে। কিন্তু খাম খুলিয়া সাদা কাগজে সম্ভাষণ শূন্য কয়েক পংক্তিমাত্র লেখা দেখিয়া তাহার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল। তার পর পত্রের প্রথম ছত্র পড়িতেই তার মুখের সেই আনন্দোজ্জ্বল আভাটুকু এক নিমেষে নিবিয়া গেল। ক্রমে মুখখানা কালী হইয়া আসিল। পত্রখানা সে বারবার পড়িতে লাগিল—এ নির্ম্মম শব্দগুলার ফাঁকে যদি কোথাও একটু স্নেহের সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইতে পারে!

সুভদ্রার মনে হইতে লাগিল, ঐ কয় ছত্রের প্রতি শব্দের প্রতি অক্ষরের মাঝে যেন বিশ্বের বিরাট নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত রহিয়াছে, আর অক্ষরগুলা যেন বেদনার তপ্ত রক্ত পান করিবার উৎকট পিপাসায় সুভদ্রার পানে চাহিয়া আছে। সে দাঁড়াইয়া ছিল—বসিয়া পড়িল। তার পর সে অনাবৃত ভূমিতে লুটাইয়া, অনেকক্ষণ খুব ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সুভদ্রার মাতা কন্যাকে গৃহকর্ম্মে ডাকিলেন। সুভদ্রা চোখ মুছিয়া মার কাছে গিয়া বলিল—"ডাকচ?"

সুভদ্রার কণ্ঠস্বরে মা মেয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"গলাটা অমন ভার ভার কেন রে? চোখ দুটোও ত ছল ছল করচে। কি, অসুখ করেচে?"

সুভদ্রা বলিল—"হাঁ, মাথাটা ব্যথা করচে।"

মা মেয়ের কপালে হাত দিয়া বলিলেন—"হুঁ, গা-টাও একটু গরম গরম ঠেকচে। যা, শুগে যা।"

সুভদ্রার এখন নির্জ্জনতাই ভাল লাগিতেছিল। সে মায়ের আদেশ মত কার্য্য করিতে একটুও বিলম্ব করিল না।

পরদিন সুভদ্রা লুকাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল—

শ্রীচরণেষু—

পত্র লিখতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু না লিখে থাকতে পারচি না, এ অবাধ্যতা মাপ করবেন। আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ভুলে যেতে বলেচেন, কিন্তু প্রাণদণ্ডের অধিক এ কঠিন আদেশ দেবার সময় বোধ হয় আপনি ভুলে গেছলেন যে, নারীর মন আর পুরুষের মন এক উপাদানে গড়া নয়। আপনার আদেশ পালন করতে হলে আত্মহত্যা ছাড়া আর আমার অন্য উপায় নেই। কিন্তু আত্মহত্যা করব না। জানি না কোন্ জন্মের পাপে আজ আমার এই দশা, সুতরাং আবার এজন্মে পাপের বোঝা ভারী করতে সাহস হয় না। আপনি আমায় ভুলে যেতে চান ভুলুন, কিন্তু আমি আপনাকে না ভুলতে পারলে আপনার কোন ক্ষতি নেই, সুতরাং এ কঠিন আদেশ থেকে আমায় মুক্তি দিন। আমার বাপের জাত রক্ষার জন্যেই যে আমায় বিবাহ করেছিলেন, সে তো আমি গোড়া থেকেই জানতাম,

সুতরাং আপনি আমায় গ্রহণ না করায় আপনাকে অভিশাপ দেব কি, আপনার উপর অভিমান করবারও আমার কোন অধিকার নেই। তবে কাশীতে বিদায়ের পূর্ব্বে আমার বুকে যে আশ্বাসের আলো জ্বেলে আমার আঁধার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, সে আলো জন্মের মত নিবিয়ে দিয়ে আবার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকে বুকে নিয়ে জীবনের দিন গুণ্‌তে থাকলাম। এতেও আমার রাগ অভিমান করবার কিছু নেই। দাতা যদি ভিখারীকে পয়সা দিতে ভুলে আধুলি দিয়ে, আবার ফিরিয়ে নেন, তাতে ভিখারীর রাগ করবার কি অধিকার? জীবনের শেষ দিকে আর একবার পত্র লিখব। আশা করি, তখনকার সে অন্তিম প্রার্থনাটি পূর্ণ করতে বিমুখ হবেন না।

হতভাগিনী
সুভদ্রা।

পত্রলেখা শেষ হইলে সুভদ্রা ভাবিল, কি উপায়ে এখানি ডাকে দেওয়া যায়। এমন লোকের হাতে দিতে হইবে, যাহাতে বাটীর কেহ জানিতে না পারে। বিশ্বনাথের ভাই ফটিককে সুভদ্রার মনে পড়িল। তাহাকে পাণ খাইতে দু এক পয়সা ঘুস দিলে এ কায অনায়াসেই হইতে পারিবে। ফটিকচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিতেও সুভদ্রাকে কষ্ট পাইতে হইল না, কারণ দিবসের বেশীভাগই তার গ্রামের গাছে গাছে কাটে, আর সে সময়ে সুভদ্রাদের খিড়কীর পিছনে পেয়ারা গাছে অজস্র বড় বড় পেয়ারা ঝুলিতেছিল। সুতরাং ফটিকের সন্ধান পাইতে সুভদ্রাকে কষ্ট করিতে হইল না। ফটিককে দেখিয়া সুভদ্রা বলিল—"এ্যা, অত উঁচুতে উঠেচ?"

ফটিক তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"তাতে আর কি হয়েচে!"

সুভদ্রা বলিল—"এর্ব্বার না পড়ে গিয়ে পা ভেঙে-ছিল?" ফটিক অম্লানমুখে উত্তর করিল—"সে তো সেরে গেছে!"

সেই সময় ভিতর হইতে সুভদ্রার পিতা সুভদ্রাকে ডাকিলেন। ফটিক বলিল—"তুমি এখান থেকে যাও দিদি, এখনি কাকা এসে পড়বেন, আর আমায় বক্‌বেন।"

"আচ্ছা যাচ্চি। তুমি যাবার সময় আমাদের বাড়ীর ভিতর হয়ে যেও, আমার একটা কায করতে হবে চুপি চুপি।"

ফটিক অমনি দর যাচাই করিয়া বসিল—"কটা পাণ দেবে বল?"

"অনেকগুলো।" বলিয়া সুভদ্রা চলিয়া গেল।

পেয়ারা চর্ব্বণ পর্ব্ব শেষ করিয়া ফটিক সুভদ্রার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিল। সুভদ্রা তাহার হাতে একখানা সাদা খামে মোড়া পত্র দিয়া বলিল—"দু পয়-সার টিকিট একখানা এতে বসিয়ে, ফেলে দেবে। পারবে?"

ফটিক সগর্ব্বে বলিল—"তা আর পারব না?"

"কিন্তু কেউ যেন টের না পায়।"

"ইস্! টের পেতে আর হয় না।"

"এই নাও টিকিটের দুপয়সা, এই তোমার পাণ খাবার দরুণ!"—এই বলিয়া সুভদ্রা ফটিকের হাতে চারিটি পয়সা দিল। পয়সা পাইয়া ফটিকচন্দ্রের ভারি আনন্দ হইল। ভাবিল এক পয়সায় পাণ আর এক পয়সায় বিড়ি কেনা যাবে।

পোষ্ট আপিস মাইল খানেক দূরে। ফটিক চিঠি ফেলিতে চলিল। খানিক দূরে গিয়া ফটিক দেখিল, বারোয়ারী তলার মাঠে একখানা ছোট পাল টাঙান রহিয়াছে, আর তাহার তিন ধারে বেড়ার পাশে অনেক লোক জমা হইয়াছে। ফটিকের কৌতূহলী চিত্ত স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যাপার কি সে দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল, সামিয়ানার নীচে লাল কাপড় ঢাকা একখানা টেবিলের উপর অনেকগুলি লোহার শিক খাড়া ভাবে পোঁতা রহিয়াছে এবং মধ্যস্থলে একটি পিতলের শিক। সেইটার উপর দূর হইতে লোকেরা লোহতারের বালা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ

পারিতেছে, অনেকে পারিতেছে না। যাহারা পারিতেছে তাহারা পয়সা পাইতেছে। ফটিক একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি খেলা?"

সে বলিল—"একে বালা খেলা বলে।"

ফটিক জিজ্ঞাসা করিল—"এর নিয়ম কি?" সে সংক্ষেপে নিয়ম বুঝাইয়া দিল। ফটিক আবার জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি খুব শক্ত খেলা?"

সে ব্যক্তি বলিল—"কৈ, আমি তো যতবার ছুড়েচি ততবারই পেয়েছি।"

এই বলিয়া সে ফটিককে মোটামুটি কৌশল শিখাইয়া দিল। এই ব্যক্তি যে ঐ বালা খেলার দলের লোক এবং স্ফূর্তি খেলিবার লোক জুটাইবার উদ্দেশ্যে বেড়ায়, বাহিরে খরিদ্দার সাজিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা ফটিক বুঝে নাই, অপরেও বুঝে নাই। ফটিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কত লাভ হয়েছে?"

"আমি চার আনায় দেড়টাকা পেয়েছি।"

শুনিয়া ফটিকের মন আশায় নাচিয়া উঠিল। তখন সে এক পয়সা মূল্যের একটা বালা কিনিয়া, পিতলের শিক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। দৈবাৎ ফটিক কৃতকার্য্য হইল। তাহাতে তাহার এক পয়সায় ছপয়সা লাভ হইল। ফটিক ভাবিল, আজ তাহার সুপ্রভাত। প্রথমতঃ সুভদ্রাদের গাছের অমন সুন্দর পেয়ারা চর্ব্বণ, দ্বিতীয়তঃ সুভদ্রার নিকট হইতে দুইটা পয়সা প্রাপ্তি, তার পর বালা খেলায় এই লাভ! সে আশায় অন্ধ হইয়া, তার কাছে যে কয়টি পয়সা ছিল, সব দিয়া ছয় পয়সার একখানি বালা লইয়া, লক্ষ্য স্থির করিতে লাগিল। প্রথমবারে সে যেমন নির্ভয়ে ছুড়িয়াছিল, এবার তাহা পারিল না, হাত কাঁপিয়া উঠিল। নিক্ষিপ্ত বালা অন্যত্র গিয়া পড়িল। ফটিকের মুখখানা সাদা হইয়া গেল। হায়, তাহার সাধের বিড়ি খাওয়া আর হইল না! সুভদ্রার চিঠির জন্য সে মোটেই চিন্তিত নহে। খানিক দূরে আসিয়া, পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সুভদ্রাকে গিয়া বলিল, সে টিকিট মুড়িয়া চিঠি ফেলিয়া দিয়াছে এবং তখনি চিঠি ডাকে চলিয়া গেল দেখিয়া আসিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

রতন

(চিত্র)

তৃতীয় পর্ব্ব।

১

কাঁটোয়া-গামী রেলগাড়ীর একটি শূন্য কক্ষে কর্ত্তা গৃহিণীর বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। কর্ত্তা বলিতেছিলেন—"আর দুটো বছর কোন রকমে কাটাতে পারলেই একটু গুছিয়ে উঠতে পারতাম।

শুনিয়া গৃহিণী বিরক্তিভরে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"তোমার হোঁৎকামিতেই ত সব নষ্ট হল। একেবারে অত বাড়াবাড়ি করতে গেলে কেন? সবারই উপর অত হাঁকডাক তর্জ্জন-গর্জ্জন করবার কি দরকার ছিল? চুপচাপ আপনার কায উদ্ধার করে নিলেই হত।"

কর্ত্তা হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—"তুমি ত সব বোঝ! চুপচাপ থাকলে সুরেশ নরেশ ঘেঁসতে দিত কি না! হাঁক-ডাকে ভয় পেয়ে তবে ত সরে দাঁড়াল! ওরা ভালমানুষি করে' নিজের স্বার্থ ছাড়বার লোক কি না।"

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"হাঁ হাঁ তুমি বুদ্ধিতে বেরস্পতি কি না, তাই ছেলের বিয়ে দিয়ে অর্দ্ধেক রাজ্যি আর এক রাজকন্যে আনতে গিয়েছিলে।"

নিজের বুদ্ধিমত্তায় স্ত্রীকে এরূপ তীব্র দোষারোপ করিতে দেখিয়া কর্ত্তা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"কি! আমি বেকুব?"

গৃহিণী ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"নাও নাও, হোঁৎকা ষাঁড়ের মত আর গাঁ গাঁ করে চেঁচাতে হবে না।"

একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে প্রস্তুত হইবার জন্য কর্ত্তা ঘন ঘন হুঁকা হইতে সবেগে ধূমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গাড়ী কাঁটোয়া পৌছিল এবং একটি সুসজ্জিত বাবু, ব্যাগ হস্তে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আরে রতন যে! ভালো রে মোর বাপ!"

রতনও বন্ধুকে দেখিয়া দন্তরাজি বিকশিত করিয়া বলিল—"আরে কেও? মাইডিয়ার? এস এস!" বন্ধু গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে অপর বেঞ্চে উপবিষ্টা গৃহিণীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বন্ধু সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটি কে? দ্বিতীয় সংস্করণ না কি?"

রতন সলজ্জভাবে মৃদু হাস্য করিল।

বন্ধুবর অলঙ্কার বিমণ্ডিতা সুপরিপুষ্টদেহা বন্ধু-পত্নীকে আবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, হাসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "Bravo! three cheers for বৌদি! এ যে একেবারে revised and enlarged! বেঁচে থাক বাবা।"

বন্ধুটির নাম নিধিরাম। রতনের কর্ম্মস্থলে উভয় বন্ধুতে "হরিহরাত্মা" ছিলেন এবং সর্ব্ববিধ উৎসবে ব্যসনে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হাস্যে, রহস্যে, রসিকতায় নিধিরাম বৌ-দিদির মনোরঞ্জনে সমর্থ হইল। মাথার অবগুণ্ঠন কমাইয়া দিয়া মহামায়া ক্রমশঃ নীরব হাস্য এবং কৌতুকপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা বন্ধুদের বিশ্রম্ভালাপে যোগদান করিতে লাগিল।

অন্যান্য কথার পর বিষয়কর্ম্মের কথা উঠিল। নিধি বলিল, নবদ্বীপে একটা হোটেল খোলায় তাহার এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। ইহার উপর একটা কয়লার কারবার খুলিবার ইচ্ছা আছে। এটা চলিলে আর দেখিতে হইবে না। "টাকায় টাকা লাভ, রতন, টাকায় টাকা লাভ! হাজার খানেক টাকা যোগাড় করতে পারলে, পাঁচ বছর পরে—ব্যস্।"

লুব্ধ রতন ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"বল কি মাইডিয়ার, হাজার টাকা হলেই হয়?"

রতন সোদামিনীর সংসার হইতে গৃহিণীর অলঙ্কার বাদে প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল। বন্ধুবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া রতন অনুমতির জন্য গৃহিণীর দিকে চাহিল। গৃহিণী হাসিয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন। গৃহিণীর নিকট উৎসাহ পাইয়া রতন বলিল, যদি তাহাকে কারবারের সরিক করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে সে হাজার টাকা দিতে সম্মত আছে।

নিধিরাম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"হাত দাও বাবা, হাত দাও। তোমায় নেব না চাঁদ, ত নেব কাকে? সোণা ফেলে আঁচলে গেরো? দাঁড়াও বাবা—" বলিতে বলিতে নিধি ক্ষিপ্রহস্তে ব্যাগ খুলিয়া একটি বোতল এবং দুইটি কাঁচের গ্লাস বাহির করিয়া, গ্লাস দুইটিতে বোতল হইতে কিছু কিছু আরক্ত পানীয় ঢালিয়া তাহার উপর সোডাওয়াটার ঢালিয়া দিল। প্রিয় সমাগমে সোহাগে গলিতা তরুণীর ন্যায় সুরাসুন্দরী আনন্দে উথলিয়া উঠিল।

নিধি সাদরে একটি গ্লাস রতনের হস্তে দিয়া এবং অপরটি নিজে গ্রহণ করিয়া বলিল—"এসো দাদা, contractটা পাকা করে নেওয়া যাক। যদস্তি কারবারং মম তদস্ত কারবারং তব।"

রতন গ্লাস হস্তে লইয়া লালাসিক্ত মুখে একবার অপাঙ্গে গৃহিণীর দিকে চাহিল। দেখিয়া নিধি হাসিয়া বলিল—"আরে, কোন ভয় নেই দাদা। বোঠান সে

ধরণের লোক নন, সে আমি ওঁর চোখ দেখেই বুঝে নিয়েচি। বরং ইচ্ছে কর ত ওঁর প্রসাদ করিয়ে নাও; ফেলেবর আরও বেড়ে যাবে।"

নিধিরামের প্রতি সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বধূঠাকুরাণী মুখ নত করিলেন। সাইস পাইয়া বহুদিনের তৃষিত রতন এক নিশ্বাসে সমুদায় পানীয় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

নিধিরাম রতনের সম্মুখে হাত নাড়িয়া গাহিয়া উঠিল—

"তুমি আমাদের বঁধু
তুমি আমাদের মধু
আমরা তোমার শুধু
সকলি তোমার।"

স্থির হইল, হোটেল এবং কয়লার কারবার উভয়েই দুই বন্ধুর সমান অংশ থাকিবে। মূলধনও দুইজনেই সমান অংশে দিবে। যতদিন নিধি ব্যবসায়ে সমান টাকা না দিতে পারিবে, ততদিন রতন লাভ বাদে তাহার অংশের অতিরিক্ত টাকার জন্ত বার্ষিক শতকরা বার টাকা হিসাবে সুদ পাইবে।

ব্যবসায়ের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে নিধিরাম প্রস্তাব করিল যে, এক্ষেত্রে রতনের আর দেশে যাইবার প্রয়োজন কি? কারবার যত শীঘ্র আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায় ততই ভাল। নিধিরামের হোটেলের নিকটেই একটি সুন্দর বাসাও আছে। তাহার চাবি পর্য্যন্ত নিধিরামের হাতে। রতন ইচ্ছা করিলে এখনি সে বাসায় উঠিতে পারে।

রতনও এই কথাই ভাবিতেছিল। দেশের বাড়ী ঘর এতদিন ভূমিসাৎ হইয়া যওয়াই সম্ভব। সুতরাং এ অবস্থায় এত টাকাকড়ি এবং জিনিসপত্র লইয়া পরের বাড়ীতে ওঠা কতদুর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে রতনের মনে যথেষ্ট দ্বিধার সঞ্চার হইতেছিল।

নিধিরামের প্রস্তাবে এ সমস্যার সুমীমাংসার সম্ভাবনা দেখিয়া, গৃহিণীর অভিপ্রায় জানিবার জন্ত রতন গৃহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। গৃহিণী ইতিমধ্যে নিধিরাম এবং তাহার ব্যবসায় উভয়ের প্রতিই কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অবগুণ্ঠনের মধ্যে আলোজ্জ্বল চক্ষু ঘুরাইয়া সাগ্রহে এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ট্রেণ নবদ্বীপে পৌঁছিল। নিধিরাম জিনিসপত্রসহ বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল।

শুভদিনে উভয় কারবারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। হোটেলের ব্যবসায়ের আমূল সংস্কার করা হইল এবং কয়লার কারবার আরম্ভ হইল। শুভক্ষণে নিধিরাম বন্ধুবরকে সুদৃশ্য শাড়ী পরিহিতা, অলঙ্কার বিভূষিতা তাম্বুলরক্তাধরা হোটেলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিল। অতিক্রান্তযৌবনা সুন্দরী প্রথম দর্শনেই রতনকে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল।

হোটেলওয়ালির পূর্ব্বনাম মোক্ষেশ্বরী, কাদম্বিনী বা নয়নতারা এমনি কিছু একটা ছিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু নিধিরাম আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল "মণি"। তদবধি সে সেই নামেই "মণি হোটেলওয়ালী" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

রতনের সঙ্গে মণির পরিচয় করাইয়া দিয়া নিধি হাসিয়া বলিল—"মণি, এতদিন ছিলে শুধু মণি, এখন হলে রতন-মণি।"

শুনিয়া রতনের প্রতি সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মণি লজ্জানত মুখে বলিল—"আমরা কি বাবুর চরণ সেবার যুগ্যি!"

ভাবগদ্গদ রতন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আহা বল কি। মণি হল মাথার মণি; পায়ের কথা বললে যে অপরাধ হয়।"

মণি হাসিয়া রতনের প্রতি আর একবার তাহার তীক্ষ্ণতম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। রতনের প্রেমার্জিত চিত্ত আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, তাহার উদার পদপল্লব-তলে আশ্রয় লইবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল।

সুগভীর আলোচনার পর স্থির হইল যে কয়লার ব্যবসা নিধিরামের হাতে থাকিবে, রতন স্বয়ং হোটেলের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবেন এবং মণি তাঁহার সহকারিণী থাকিবে। রতন কয়লার কারবারে এক হাজার এবং হোটেলে পাঁচশত টাকা দিবে। কয়লার কারবারের অর্দ্ধেক লাভ রতনের এবং অর্দ্ধেক নিধিরামের হইবে এবং হোটেলের লাভের অর্দ্ধেক রতন পাইবে এবং অর্দ্ধেক মণি পাইবে।

মহাসমারোহে কারবার আরম্ভ হইল। নিধিরাম ষ্টেশনের নিকট কয়লার দোকান খুলিল এবং রতন হোটেলে আসিয়া মণির অঞ্চল আশ্রয় করিল।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর চিত্ত বিনোদনের জন্য রতনের বাসায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় সময় বৈঠক বসিতে লাগিল। নিধিরামের আর একটি গীতবাদ্যে অভিজ্ঞ বন্ধুও সভায় যোগদান করিলেন। কখনও গল্পগুজব, কখনও গীতবাদ্য এবং কখনও তাস পাশা চলিতে লাগিল।

শ্রীমতী মহামায়া সমস্ত দিন বন্দিনীর মত নির্জ্জনবাস করিয়া সন্ধ্যার আনন্দে উৎসুক চিত্তে যোগদান করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম দ্বারের অন্তরাল হইতেই তিনি সভার আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতেন। অবশেষে নিধি ও রতনের প্রবল আগ্রহে, ধীরে ধীরে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতে লাগিলেন। আনন্দস্রোতে নবজীবনের সঞ্চার হইল।

নিধিরাম বুঝাইল যে, কয়লার কারবার যেরূপ প্রবলবেগে চলিতেছে, তাহাতে পাঁচ বৎসর পরে জমিদারি খরিদ করিয়া জমিদার হইয়া বসাও আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে না।

রতন হাসিয়া জানাইল যে, হোটেলের অবস্থাও সেইরূপ। হোটেলে "রয়াল ক্লাস" খোলার পর ভোজনকারীর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে—বোধ হয় শীঘ্র চাকরবাকরের সংখ্যা দ্বিগুণ না করিলে আর কাষ সামলানো সম্ভব হইবে না।

অনাবিল আনন্দে দিবারাত্র অতিবাহিত হইতে লাগিল।

৩

মণি দিনে দিনে অচ্ছেদ্য নাগপাশে রতনকে আবদ্ধ করিতেছিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার হাস্যে, বাক্যভঙ্গীতে নব নব সৌন্দর্য্যের উন্মেষ দেখিয়া রতন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার সময় রতনের পক্ষে বাড়ী আসা কঠিন হইয়া পড়িল। আনন্দের উন্মাদনায় হোটেলেই তাহার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অতিক্রান্ত হইতে লাগিল।

অগত্যা মহামায়াকে নিধিরামের সংসর্গেই সন্ধ্যাযাপন করিতে বাধ্য হইতে হইল। হাস্যে, রসিকতায়, সঙ্গীতে নিধি ধীরে ধীরে তাহার চিত্ত হরণ করিতে লাগিলেন।

মহামায়ার শরীর ও মন মধ্যে মধ্যে অবসন্ন বোধ হওয়ায়, নিধিরাম ঔষধ বলিয়া তাহাকে অল্প অল্প সুস্বাদু সুরা পান করাইতে লাগিল। ঔষধের গুণে লজ্জা সঙ্কোচ ক্রমশঃ বিদূরিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দুইজনে "বিন্তি" খেলা আরম্ভ হইল এবং মহামায়া উপযুক্ত গুরুর নিকট কিছু কিছু সঙ্গীত শিক্ষাও করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া ছয়মাস কাটিয়া গেল। তাহার পরে, সুখস্বপ্ন অল্প অল্প করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।

সঞ্চিত মুদ্রার অধিকাংশ মণির তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহার গুরুভার অলঙ্কাররাজিতে পরিণত হওয়ায়, রতন চিন্তিত হইয়া ক্রমশঃ হাত গুটাইতে আরম্ভ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে মণির আদর যত্নও সমানুপাতে কমিতে লাগিল। কাযেই উভয়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মনোমালিন্য দেখা দিল।

শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় সেদিন রতনের মেজাজ বড় ভাল ছিল না। রাত্রি ৯টার সময়, সুসজ্জিত বেশে মণিকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রতন রুক্ষস্বরে

বলিয়া উঠিল, "সন্ধ্যে থেকে যাওয়া হয়েছিল কোথা? ডেকে এক ছিলিম তামাক পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ব্যাপারখানা কি?"

মণি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"নবাবের নাতি ত আর নও! তামাকও ছিল, টিকেও ছিল! সেজে খেলেই পারতে!"

রতন হুঙ্কার করিয়া গালি দিয়া উঠিল। মণি সে গালি মায় সুদ ফিরাইয়া দিল। ক্রোধোন্মত্ত রতন লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল।

ফলে মণি দৃঢ় হস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ করিয়া তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া, বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আসিল।

ক্রোধে রোষে উন্মত্ত বৃষভের ন্যায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে রতন আপনার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোর খোল।" কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। উত্তেজিত রতন সবেগে দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। সহসা অন্তঃপুর হইতে প্রবল হাস্য এবং সঙ্গীতধ্বনি শোনা গেল। রতন ছুটিয়া অন্তঃপুরের দিকের গলির পথে অগ্রসর হইয়া, উন্মুক্ত বাতায়নপথে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার দেহের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"খোল্ দুয়ার!" বন্ধুবরের এই ভীম রব শুনিয়া নিধিরাম সঙ্গীত বন্ধ করিয়া চকিত দৃষ্টিতে একবার বন্ধুবরের অবস্থাটা বুঝিয়া লইল।

তাহার পর, মুহূর্ত্ত মধ্যে মন স্থির করিয়া লইয়া, একটি সুদৃঢ় লগুড় হস্তে অগ্রসর হইয়া বাহিরের দ্বার খুলিয়া দিল। রতন বন্ধুবরকে সুরক্ষিত দেখিয়া; দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"আজ দুটোকেই খুন করব।" বলিয়া অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বেগে আপনার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। ব্যাপার বুঝিয়া, রতন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নিধিরাম ক্ষিপ্র হস্তে বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল।

নিরুপায় রতন রুদ্ধ মহিষের মত কক্ষ মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন ও দাপাদাপি করিতে লাগিল।

* * * *

সমস্ত রাত্রি ছুটাছুটি করিয়া রতন অবসন্নদেহে শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা প্রায় আটটা। বিস্তর চেঁচামিচির পর একজন প্রতিবেশী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। রতন দ্বার খোলা পাইয়া উন্মত্তের মত স্ত্রীর সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু "কা কস্য পরিবেদনা!" সমস্ত গৃহ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। দেখিয়া রতন মাথায় হাত পড়িল।

তার পর, নিধিরামের কথা মনে পড়ায় বিকট গর্জ্জন করিয়া সে উন্মত্তের মত কয়লার আড়তের দিকে ছুটিল। কিন্তু তথায় গিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি কৃষ্ণকায়, পুরিপুষ্ট গুম্ফ পেশী বহুল বাবু নিধিরামের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। রতন চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নিধিরাম কোথায়?"

বাবু বলিলেন—"নিধিরাম! নিধিরাম কে?"

রতন বলিল—"এই আড়তের মালিক।"

"মালিক? কি রকম? এ ত আমাদের আড়ত!"

রতন বলিল—"বলেন কি কি? আমি এই আড়তের অর্দ্ধেকের অংশীদার, নিধি অর্দ্ধেকের অংশীদার। আপনি কোথাকার কে?"

"বটে! বল কি চাঁদ? দত্ত এণ্ড ঘোষের আড়তের তুমি অর্দ্ধেকের অংশীদার, আর তোমার নিধিরাম অর্দ্ধেকের অংশীদার! আর আমরা সব ভেসে এসেচি? দেখ, এ মাতলামি করবার জায়গা নয়। যদি বেশী গোলযোগ কর, তা' হলে টুটি ধরে থানায় দিয়ে আসব!"

উদ্ধত ব্যক্তিটীকে বাক্যানুরূপ করিতে উদ্যত দেখিয়া, রতন নিধিরামের উদ্দেশে নানা অকথ্য ভাষার প্রয়োগ করিতে করিতে দ্রুতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পূর্ব্ব রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া রতন এবার

উগ্রমূর্ত্তিতে হোটেলের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল যে, হোটেলের দ্বার প্রকাণ্ড এক তালা দ্বারা আবদ্ধ। ভগ্ন হৃদয় রতন কোন প্রকারে দেহভার বহন করিয়া আনিয়া অবসন্নভাবে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার প্রবল জ্বর আসিল। কয়েকজন প্রতিবেশী কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

৪

প্রায় এক মাস পরে রোগমুক্ত হইয়া রতন হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সন্ধান লইয়া জানিল যে, মণি বহুদিন হইল হোটেল তুলিয়া দিয়া নিরুদ্দেশযাত্রা করিয়াছে এবং ছয় মাসের ভাড়া বাকী থাকায় বাড়ীওয়ালা হোটেলের অবশিষ্ট জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া, ভাড়া আদায় করিয়া লইয়াছে।

নিধিরাম এবং মহামায়ার কোনই উদ্দেশ নাই। নিরুপায় রতন কোন প্রকারে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া, সামান্য জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়কে এরূপ শীর্ণ শরীরে নিঃস্ব অবস্থায় গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গ্রামের লোকে নিতান্ত বিস্মিত হইল। গ্রামের লোকে শুনিয়াছিল যে রতন মাসিক তিন শত টাকা বেতনে কোন রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

বন্ধুবান্ধবের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে রতন সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রবল শোকোচ্ছ্বাস হইতে তাহারা বহু কষ্টে নির্দ্ধারণ করিল যে, তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি লইয়া সপরিবারে নৌকাযোগে গৃহে আসিতেছিলেন; সহসা নৌকাডুবি হইয়া তাঁহার "ভবজলধিরত্ন" গৃহিণীসহ সর্ব্বস্ব গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে; তাঁহার নিতান্ত দগ্ধ অদৃষ্ট, তাই এই দগ্ধজীবন বহন করিবার জন্য তিনিই কেবল বাঁচিয়া উঠিয়াছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের করুণ-কাহিনী শুনিয়া সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে আনাইয়া গ্রামে বাস করিবার জন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল। কিন্তু আপনার বর্ত্তমান আর্থিক ও সাংসারিক অবস্থা স্মরণ করিয়া রতনের চিত্তে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি আর কিছুতেই সংসার বন্ধনে জড়িত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করতঃ ৺কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই এক জন উপযুক্ত গুরু মিলিয়া গেল। শুভদিনে পরম রমণীয় শাক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং গৈরিক ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া রতন "স্বামী সদানন্দে" পরিণত হইলেন।

কিন্তু অল্পদিনের অভিজ্ঞতাতেই স্বামীজি বুঝিতে পারিলেন যে, এ কলিকালে ধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়ায় এখন আর ধর্ম্মসাধনের পথ আদৌ মনোরম নহে।

বহুক্ষণ চিন্তার পর স্বামীজির মনে পড়িল যে, তাঁহার এক নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রঙ্গপুরে কার্য্য করে এবং তাহার অবস্থাও বেশ উন্নত। স্বামীজির মনে হইল যে এই পাপ কলিযুগে জনসাধারণের অনিশ্চিত এবং নিতান্ত দয়াবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়া, উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুগৃহীত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কিছুকাল পরে রঙ্গপুরের উচ্চ কর্ম্মচারী যোগেন্দ্র বাবুর প্রশস্ত অট্টালিকার দ্বারদেশে গৈরিক বস্ত্রোষ্ণীষ পরিহিত এবং রুদ্রাক্ষ ও রক্ততিলক শোভিত এক সন্ন্যাসীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

যোগেন্দ্র বাবু সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিবামাত্র সন্ন্যাসী, "ওরে বাপ যোগী রে!" বলিয়া সহসা তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া শোকচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। যোগেন্দ্র বাবু বহুকালের পর পিতৃব্যকে অপ্রত্যাশিত পরিচ্ছদে আবৃত দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু অবশেষে তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাহার পরিচয় পাইয়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। "বাবা চিরজীবি হও, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বর

হও” বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যোগেন্দ্র পিতৃব্যের হাত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে জানাইয়া অবশেষে বলিলেন যে, নানা দুর্ঘটনায় সংসারের অসারতা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়া তিব্বৎ দেশে এক মহাপুরুষের কৃপালাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে তাঁহারই অনুরোধে রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের মতে এ প্রাচীন বয়সে তাঁহার আর নির্জ্জন বনমধ্যে বাস করা অকর্ত্তব্য; কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকাই কর্ত্তব্য। কাযেই গুরুর আদেশে তাঁহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কারণ, “তুই ছাড়া এ সংসারে আমার আপনার আর কে আছে বাপ?”

চৌধুরী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এই পরমাত্মীয়ের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুতরাং আজ সহসা তাঁহার অপ্রত্যাশিত বাৎসল্য-রসের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত যোগেন্দ্র বলিলেন, “বেশ ত কাকা। আমার এখানে থাকবেন, এ ত আমার সৌভাগ্য।”

*　　*　　*　　*

রতনের জন্য যোগেন্দ্র বাবুর উদ্যান মধ্যে একখানি সুপরিচ্ছন্ন আটচালা নির্ম্মিত হইল। পার্থিব কোন বিষয়ে আর তাঁহার আসক্তি ছিল না। তিনি প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ চা এবং জলযোগ সেবন করিয়া পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেন; মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত যুবতীগণের মধ্যে সন্তান হওয়ার জন্য মাদুলি বিতরণ করিতেন; এবং রাত্রে লুচি, মাংস এবং কারণ “বারি”র সাহায্যে যোড়শোপচারে জননী জগদম্বার পূজা করিতেন।

স্বামীজির এই অজ্ঞাতবাসের বিবরণ অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল। সুরসিক কবিরাজ মহাশয় অনেক দিনের পর তাঁহার প্রিয় শ্যালকের এই আধ্যাত্মিক উন্নতির সুসংবাদ পাইয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

“জান কত রঙ্গ যাদু, জান কত ঢঙ্গ।
কখনো হাস, কখনো নাচ, বাজাও মৃদঙ্গ॥”

সমাপ্ত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

আলোচনা

রামায়ণ ও মহাভারত।

গত বৈশাখের “মানসী ও মর্ম্মবাণী”তে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় এবং আষাঢ়ের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত সময়ে বহুপতিক বিবাহ হইয়াছিল দেখিয়া হেম বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, হয়ত মহাভারতের ঘটনা রামায়ণের ঘটনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু বহুপতিক বিবাহ ব্যতীতও সেরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, তাহার বিস্তারিত সমালোচনা ওয়েবর এবং হুইলর করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুই একটা মাত্র উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতে পাণ্ডবদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং অন্যত্র, বহু বনের উল্লেখ পাওয়া যায়,—কাম্যক বন, দ্বৈতবন, খাণ্ডববন ইত্যাদি। এই সকল বন বক, কির্ম্মীর, হিড়িম্ব, ভগদত্ত প্রভৃতি অসুরদিগের অর্থাৎ অনার্য্যদিগের অধ্যুষিত ছিল। ইহা হইতে অবশ্যই এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, মহাভারতের সময়ে আর্য্য সভ্যতা পঞ্জাবের বাহিরে অধিক দূর প্রসারিত হয় নাই। অন্য পক্ষে, এরূপ বিবেচনা করাও সঙ্গত যে রামায়ণের বৃত্তান্ত কেবল দক্ষিণাপথে আর্য্যসভ্যতা

বিস্তারের রূপক বর্ণনা মাত্র। আর একটা যুক্তি—ওয়েবর এবং হুইলরের গ্রন্থে আছে কি না স্মরণ হইতেছে না—তাহা এই যে, যুধিষ্ঠির ও রাম যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ছিলেন ; এই দুই বংশের প্রবর্ত্তক চন্দ্র ও সূর্য্য নামক দুই ব্যক্তি যে সমসাময়িক ছিলেন একথা মহাভারতেই আছে, কিন্তু চন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত সাতচল্লিশ পুরুষ, অথচ সূর্য্য হইতে রাম পর্য্যন্ত সাতান্ন পুরুষ। গড়ে তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরা হয়। তাহাতেও বোধ হয় যে যুধিষ্ঠিরের সময়, রামের সময়ের অন্ততঃ তিন শত বৎসরেও পূর্ব্ববর্ত্তী। শুনিয়াছি অধ্যাপক ভাণ্ডারকর এবং আরও দুই একজন পণ্ডিত ওয়েবরের যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁহাদের সমালোচনা পাঠ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। ওয়েবর এবং হুইলরের যুক্তি ও তাহার সমালোচনা বহু দিনের কথা, সুতরাং পুরাতন হইয়াছে। এখন কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি এই বিষয়ের আলোচনা করেন তাহা হইলে তাহা বহুলোকের চিত্তাকর্ষক হইবে।

লোকেন্দ্র বাবু বিশ্বাস করেন যে, যুধিষ্ঠিরেরা দ্রৌপদীকে লইয়া কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতা কুন্তীকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা নূতন একপ্রকার ভিক্ষা আনিয়াছেন এবং তাহা শুনিয়া কুন্তী বলিয়াছিলেন, "তোমরা পাঁচ জনেই উহা ভাগ করিয়া লও" এবং সেই জন্যই তাঁহাদের পাঁচজনের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হইল। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কুন্তী যদি পাঁচ পুত্রকেই ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভাগ করিয়া লইতে বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ভাবিয়াছিলেন যে সেই বস্তু কোন খাদ্যদ্রব্য হইবে। তাহা যে একটি নারী, তাহা তিনি কখনই ভাবেন নাই। তিনি সম্যক বুঝিতে না পারিয়া যে একটা অসম্ভব কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা অনুসারে তাঁহার পাঁচ পুত্রই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া তাঁহার আগ্রহ করা অথবা সেই কথা অব্যর্থ রাখিবার জন্য যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। সেই কথা অনুসারে তাঁহারা দ্রৌপদীকে পাঁচ খণ্ড করিয়া কাটিয়া খাইতেও পারিতেন। যদি দ্রৌপদী অবধ্য ও অখাদ্য বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যে এক সঙ্গে পাঁচজনের বিবাহেরও অযোগ্য এ কথাটারও বোধ তাহা-তাহাদের মনে হওয়া উচিত ছিল। কুন্তীর আদেশ ভিন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি গ্রহণের আরও কয়েকটা হাস্যকর যুক্তি মহাভারতে আছে। তাহার একটা এই যে, দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে বিবাহের তপস্যা করিতে করিতে, পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কুন্তীর ভুল আদেশে তাঁহার পাঁচ পুত্র দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথাও যেমন অশ্রদ্ধেয়, পূর্ব্ব জন্মে পাঁচবার পতি-প্রার্থনা করার ফলে জন্মান্তরে এক সঙ্গে পাঁচ পতির পত্নী হওয়াও তেমনি অশ্রদ্ধেয় কথা। প্রকৃত কথা এই যে, পাণ্ডবেরা হিমালয়-প্রান্তবাসী ছিলেন, অন্ততঃ তাঁহাদের জন্ম হিমালয়প্রান্তে হইয়াছিল এবং সেখানেই তাঁহারা বাল্যকাল অতিবাহিত করিবার সময়ে দেখিয়াছিলেন যে, তদ্দেশবাসীরা সকল ভ্রাতায় মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। এখনও তিব্বৎ এবং হিমালয়-প্রান্তের অন্য প্রদেশে সেই প্রথা প্রচলিত আছে। সেই প্রথা অনুসারেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্বশুর-কুলেরও বাড়ী পাঞ্চালদেশও হিমালয়ের প্রান্তদেশে, সুতরাং কোন পক্ষ হইতেই এই বহু-পতিক বিবাহে আপত্তি হয় নাই। পরে যখন ঐতিহাসিক মহাভারতকার এই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিলেন, তখন সেরূপ বিবাহের প্রথা অন্ততঃ হস্তিনাপুর হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অথচ লিখিতব্য ইতিহাসে সেই সত্য ঘটনার অপলাপ করাও অসম্ভব। এই জন্যই ঐতিহাসিক রাজকুলে সংঘটিত সেই অদ্ভুত ও অবৈধ বিবাহের একটা হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ অন্বেষণ করিয়া, আর কিছু না পাইয়া কুন্তীর আদেশের কথা এবং দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের কথা সৃষ্টি করিলেন। মহাভারতের কোন স্থলে এরূপও পড়িয়াছি বলিয়া যেন মনে হইতেছে যে, দুর্য্যোধন বলিতেছেন, পাণ্ডবেরা বিদেশী লোক, তাহারা কুরুবংশের কেহই নহেন, সুতরাং রাজ্যে তাহাদের কোন ন্যায্য স্বত্ব নাই। যদি বাস্তবিক এইরূপ কোন কথা মহাভারতে থাকে, তাহা হইলে কেবল দুর্য্যোধনের উক্তি বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পাণ্ডবদের যে হিমালয়প্রান্তে জন্ম তাহা মহাভারতেই উক্ত আছে।

কুন্তীর একটা ভুল কথা শুনিয়া পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন একথাও যেমন অশ্রদ্ধেয়, কৈকেয়ীকে দুইটি বরদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর প্রার্থিত দুইটি বর অনুসারে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইয়া ভরতকে রামের পরিবর্ত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, একথাও সেইরূপ অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। প্রকৃত কথা এই যে, দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ে কৈকেয়ীর পিতার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন। ইহা নন্দীগ্রামে ভরতের প্রতি রামের উক্তি হইতেই আমরা অবগত হই। কৈকেয়ী-মন্থরা সংবাদ যদি সত্য ঘটনা হয়, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অপরিহার্য্য যে, পাছে ভরতের সমক্ষে রামকে বর্জ্জন করিলে ভরত প্রতিকূল হইয়া উঠেন, এই আশঙ্কা করিয়াই দশরথ ভরতকে মাতামহের

রাজ্যে কেকয়ে—অর্থাৎ সুদূর পারস্যে বা ককেসসে—পাঠাইয়া দিয়া পরে রামের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করিয়া একটা বীভৎস অভিনয় করিয়া রামকে বনে পাঠাইলেন। ইহা নিরীহ অভিনয় হয় নাই, ইহা ঘোর পাপানুষ্ঠান। এই পাপানুষ্ঠানের ফলেই দশরথ মর্ম্মান্তিক অনুতাপগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কিন্তু কৈকেয়ী-মন্থরার সংবাদটা সত্য বলিয়া মনে হয় না। প্রচলিত রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ বাল্মীকির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে যে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ লুপ্ত হওয়ায়, অপর একজন বাল্মীকির নাম দিয়া এখনকার প্রচলিত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে বৃদ্ধ বাল্মীকির লুপ্ত অংশ রক্ষা করিয়া তাহার সহিত নব বাল্মীকির কল্পিত অংশ সংযোজিত হইয়াছিল। এই জন্যই রামায়ণের কোন কোন অংশের সহিত অপরাংশের বিরোধ দেখা যায়। দশরথ যদি শ্বশুরের কাছে এই বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহার দৌহিত্রকে রাজা করিবেন, তাহা হইলে কৈকেয়ীকে তাঁহার বর দানের কথা মিথ্যাই বলিতে হইবে। অন্ততঃ ভরত কেকয় যাত্রা করিবার পর কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা করাটা মিথ্যা কথা। বরদান ও বর প্রার্থনার কথা মিথ্যা হইলে, সত্যসন্ধ দশরথ শ্বশুরের নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিবার জন্যই ভরতকে রাজা করিয়াছিলেন এবং তাহার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই রামকে বনে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে দশরথকে প্রকৃতই সত্যসন্ধ ধার্ম্মিক এবং রামের উপযুক্ত পিতা বলিয়া ভক্তি করিতে হয়। অন্যপক্ষে, নব বাল্মীকি যে ভাবে কৈকেয়ী-মন্থরা-দশরথ সংবাদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত শ্বশুরের প্রতি দশরথের প্রতিশ্রুতির কথা মিলাইয়া পড়িলে দশরথকে অতিশয় কপটাচারী প্রতারক ও নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করা অপরিহার্য্য।

এই স্থানে বর্ত্তমান প্রসঙ্গ-বহির্ভূত একটা কথা মনে পড়িল। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের একস্থানে লিখিত আছে, যমুনা পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিয়াছে। জগদীশ বাবু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে, রামায়ণের ঘটনা এসিয়া মাইনরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঘটিয়াছিল। যদি বাস্তবিক এমন কথা রামায়ণে থাকে যে যমুনা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া সাগরে পড়িয়াছে, তাহা হইলে সে কথা বৃদ্ধ বাল্মীকিই লিখিয়াছেন। অথচ প্রচলিত রামায়ণে ইহাও দেখা যায় যে যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বদিক দিয়া সাগরে যাইতেছে। এ কথাটা তাহা হইলে নব বাল্মীকিই লিখিয়াছেন। পুরাতন ঐতিহাসিক এবং নূতন ঐতিহাসিকের উক্তিতে বিরোধ থাকিলে, বলবৎ প্রমাণের অভাবে পুরাতন ঐতিহাসিকের উক্তিই মানিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে বৃদ্ধ বাল্মীকি এমন কোন যমুনার উল্লেখ করিতেছেন যাহা পশ্চিম-বাহিনী ছিল। কিন্তু রামায়ণ সংসৃষ্ট কোন নদীই পশ্চিম বাহিনী নহে। সুতরাং তাহা ভারতের বাহিরের কোন নদী। অতএব রামায়ণের ঘটনা ভারতের বাহিরেই সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা হইলে সেই ঘটনার বৃত্তান্তের সহিত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত দ্রাবিড় রামায়ণের ঘটনার বিবরণ জুড়িয়া দিয়াই প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা কি অসঙ্গত? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কেহ যদি বিস্তারিত আলোচনা ও বিচার করেন তাহা হইলে তাহা অতি সুপাঠ্য সাহিত্য হইবে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

"গঙ্গারাঢ় নগরের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান"

গত আষাঢ়ের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে আমার "গঙ্গারাঢ় নগরের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। শ্রাবণ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় উহার কতকটা প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিতেছি।

রাখালরাজ বাবু লিখিয়াছেন যে, "প্রবন্ধ লেখকের বিশ্বাস গঙ্গারাষ্ট্র শব্দ হইতে গঙ্গা শব্দ খসিয়া গিয়া রাঢ় হইয়াছে।" এ বিশ্বাস কেবল মাত্র আমার নহে—স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর এই বিশ্বাস ছিল। তাহা আমি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি। আমি কেবল মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি মাত্র।

রাখালরাজ বাবু তাহার পর যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "গঙ্গার্ডা জঙ্গীপুর হইতে ৫ ক্রোশের কাছাকাছি। জঙ্গিপুর হইতে কান্দি দক্ষিণদিকে প্রায় ১৮ ক্রোশ দূর। সুতরাং কান্দি হইতে গঙ্গার্ডা উত্তর দিকে ১৩ ক্রোশ দূরে। কাযেই তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন গঙ্গার্ডা চাকটার নিকটেই তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।" ইহার উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, রাখালরাজ বাবু বোধ হয় আমার প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পড়েন নাই; সম্ভবতঃ প্রবন্ধটী না পড়িয়াই তাহার বিষয়টি কাহারও মুখে শুনিয়াছেন, নচেৎ এরূপ হাস্যজনক কথা তিনি লিখিতেন না। আমার প্রবন্ধে আমি গঙ্গার্ডা গ্রামের উল্লেখ মাত্রও করি নাই—উহা জঙ্গিপুরের নিকটে হইতে পারে। আমার প্রবন্ধে আমি "গাঙ্গেড্‌ডা"

গ্রামের উল্লেখ করিয়াছি—উহা কান্দি হইতে এক ক্রোশের মধ্যে ও চাকটা হইতে ৪ ক্রোশের মধ্যে। আমার প্রবন্ধে কোনও স্থানে আমি বলি নাই যে "গাঙ্গেড্ডা" গ্রাম জঙ্গিপুরের নিকট।

রাখালরাজ বাবু আর একটা বক্তব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি সম্প্রতি ক্ষান্ত হইব। তিনি বলিয়াছেন, "রাঢ়দেশ তখন যদি একটা বিখ্যাত এবং সভ্য জনপদ হইত তাহা হইলে কোনও না কোনও অনুশাসন এখানে বাহির হইত।" রাঢ়দেশ সভ্য জনপদ ছিল কিনা, তাহা রাখাল বাবু "বিশ্বকোষে" রাঢ় শব্দের বিবরণ দেখিলে জানিতে পারিবেন। আর অনুশাসনের সম্বন্ধে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, রাঢ়ে এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন অনুসন্ধান হয় নাই। একথা আমি ১৩২৪ সালের ফাল্গুনের "ভারতবর্ষে" 'রাঢ়ের বৌদ্ধধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। "বজ্রাসনের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

রাখালরাজ বাবুর প্রত্যুত্তর।

গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাঢ় শব্দের মূল, গ্রীক ভাষায় লিখিত মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ. ইহা ঠিক কি না তাহা মীমাংসা করিবার জন্য "মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ"এর গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের নাম আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, ভূদেব বাবু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন সুতরাং আমার সন্দেহের কথা শুনিলে তাঁহার কিছু কায হইতে পারে। কিন্তু দেখিলাম তিনি বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী ও বিশ্বকোষ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক পাঠে অনিচ্ছুক। কাযেই এখন আমাকেই মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইল—"গঙ্গা গাঙ্গেয়দের (Gangaridai) রাজ্যের পূর্ব্বসীমা।" (৭২ পৃঃ)

ভূদেব বাবু যে বিশ্বকোষের দোহাই দিয়াছেন, সেই বিশ্বকোষের সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি এবং তিনি "বীরভূম বিবরণ" ২য় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন। তিনিও জঙ্গিপুরের নিকটস্থ "গাঙ্গেরডা"কে সাহস করিয়া গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্রের সহিত এক বলিতে পারেন নাই, সন্দেহ মাত্র করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছি অশোকের সময়ে রাঢ়দেশ বিখ্যাত বা সভ্য ছিল না, তাই বোধ হয় কোন অনুশাসনে ইহার উল্লেখ নাই। ইহার বিরুদ্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ যদি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, ভূদেব বাবু অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় রাঢ়দেশের—বিশেষতঃ ইহার পশ্চিমাংশের—অধিকাংশ স্থান অনুর্ব্বর। ইহার অধিকাংশ স্থানে সাঁওতাল, দুলে, বাগ্দী, মাল, তিওর প্রভৃতি অসভ্য জাতিই এখন বাস করে। পূর্ব্বে সম্ভবতঃ অধিকাংশ ভূমিই ইহাদের অধিকারে ছিল, সভ্য জাতির আগমনে তাহারা ক্রমে অধিকারচ্যুত হইয়াছে। রাঢ় দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা এই রাঢ়দেশে গ্রাম পাইয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ আখ্যা পাইয়াছেন।

ভূদেব বাবুর "গাঙ্গেড্ডা", বীরভূম বিবরণের "গাঙ্গেরডা" ও আমার "গাঙ্গার্ডা" মধ্যে এমন কিছু আকাশ পাতাল প্রভেদ নাই যে তিনি হাসিয়া আকুল হইবেন এবং বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি একটু ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় দুইটি প্রায় এক রকম নামের গ্রাম আছে। তিনি যদি লিখিতেন "মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির নিকট" তাহা হইলে হয়ত আমার এ ভ্রম হইত না। কিন্তু তিনি লিখিলেন, "মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমার সন্নিকটে" ইহা হইতে এবং বীরভূম বিবরণ হইতে, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে ভূদেব বাবু বোধ হয় দূরত্ব সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন।

ভূদেব বাবুর "গাঙ্গেড্ডা" "গঙ্গারাষ্ট্রের" বিকৃত পূর্ণরূপ বজায় রাখিয়াছে, অর্থাৎ "গঙ্গা" শব্দ ছাড়ে নাই। অথচ "রাঢ়ের" বেলায় গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে ইহা কি সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়? সংস্কৃত শ্লোকে ত তাহার পূর্ণরূপই থাকিবার কথা।

আমি না হয় গাঙ্গার্ডাকে গাঙ্গেড্ডা বলিয়া ভুল করিয়া মহাপাতক করিয়াছি! কিন্তু তিনি "রাঢ় প্রদেশে শুশুনিয়া শৈল আছে কি না জানি না" লিখিলেন কেন? তিনি শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগের ৪০ পৃঃ খুলিলে দেখিতে পাইতেন, সেখানে শুশুনিয়া পাহাড়ের কথা আছে। যথা—"বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে চন্দ্র বর্ম্মার যে শিলালিপি আছে" ইত্যাদি।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

ভারতের কথিত ভাষা

দেশের সাধারণ লোককে শিখাইতে হইলে তাহাদের নিজের ভাষাই শিখাইতে হয়। দেশের চলিত ভাষাকে শিক্ষার বাহন না করিলে সে শিক্ষা সার্থক ও সফল হয় না। কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের মনকে জাগাইতে হয়; এই সাহিত্য দেশের চলিত ভাষায় লিখিত হইলে যত সবল ও সরস হয়, অন্য কিছুতে তাহা হয় না। এই জন্য দেখা যায়, ভারতবর্ষে যখনই সাধারণকে জাগাইবার চেষ্টা হইয়াছে তখনই লোকশিক্ষকেরা দেশীয় চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। আর যখন তাহাদিগকে ভুলাইয়া, তাহাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই ইহার অন্যথা হইয়াছে। বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ-জৈন যুগ, বৈষ্ণব যুগ, হিন্দুমুসলমান সম্মিলন যুগ ও পাশ্চাত্য প্রভাব যুগ, এই সব যুগেই ভারতের ভাব-ধারা দেশীয় ভাষার খাত বাহিয়া চলিয়াছে, আর কূল ছাপাইয়া উহা সকলের প্রয়োজন মিটাইয়াছে।

কিন্তু একালের পণ্ডিত মহাশয়দের মত, ভারতবাসী সেকালের পণ্ডিতেরাও দেশের চলিত ভাষাগুলিকে বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা এই সকল ভাষা হইতে বহু উপমা, বহু ব্যঞ্জনা, বহু ঐশ্বর্য্য বেমালুম গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতের অঙ্গ সাজাইয়াছেন, তবু ঋণ স্বীকার করেন নাই। মধ্যে মধ্যে কোন কোন লেখক নাটকের চরিত্রগুলির মুখে প্রাকৃত ভাষা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অনেকটা নিজেদের শক্তি দেখাইবার জন্য। নাটকীয় প্রাকৃত সত্যই কথ্য ভাষা ছিল কি না তাহাতে আধুনিক ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন।

এইখানে ইতিহাসের দিক হইতে উপরে লেখা পাঁচটি যুগের কথা কিছু বলা দরকার।

বৈদিক যুগের ভাষা যে জীবিত ভাষা ছিল তাহা ভাষাজ্ঞানীয়া খুব জোরের সহিতই বলেন। এ যুগে ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদিগকে আকুলপ্রাণে ডাকা, আর ঋষিদের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের তাজা ভাবগুলিকে অন্যলোকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া। এই দুইটি কাযেই জীবন্ত মানুষ জীবন্ত ভাষায় হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে। বেদের ভাষার নামই ছিল ছান্দস ভাষা। এই সময়কার কবিতা ও গানগুলি প্রকৃতই শক্তিসঞ্চারক মন্ত্র, কারণ উহাদের কাযই ছিল লোকদের অন্তরের সুপ্ত চিন্তাগুলিকে জাগাইয়া তোলা, আর তাহাদিগকে জীবনের নানা কর্ম্মচেষ্টায় উদ্বোধিত করা। প্রাণের আবেগ বহন করিতে পারে এমন চলিত ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাতেই প্রকৃত গান ও কবিতা ফোটে না। এই ভাষাই কালে পরিণত হইয়া উপনিষদের গভীর ভাব প্রকাশ করিয়াছিল।

ইহার পর অনেক দিন ধরিয়া ভারতবর্ষ যজ্ঞের ধূমে ও পশুর রক্তে আচ্ছন্ন হইয়া অন্য কথা ভাবিতে পারে নাই। আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের নানারকম শাসন ও বিধানে লোকে প্রাণের কোন স্পর্শ অনুভব করে নাই। লোকের মন সরস ভাব ও সরল ভাষার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে বৌদ্ধ-জৈন যুগের আরম্ভ। ভারতের ইতিহাসে এই যুগ নানা কারণেই বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে। যখন বুদ্ধদেব করুণায় গলিয়া আপনার উদার মত গুলি সকলেরই জন্য প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়-গোমুখী হইতে যে নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা গঙ্গা-স্রোতের মত যেমন পবিত্র, তেমনই প্রাকৃতজনেরও উপভোগ্য ছিল। ইহাতে বহু যুগ ধরিয়া ভারতের অন্তরের পিপাসা জুড়াইয়াছিল। বুদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া, পালি নামে পরিচিত মগধের প্রাচীন ভাষা নানা দেশের নানা জাতির মনকে উন্নত ও পবিত্র করিয়াছে।

এখন আসিল পৌরাণিক যুগ। এ যুগেও লোক শিক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল এখনও

আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে। বৌদ্ধ-জৈন যুগের সাম্য মৈত্রীর ফলে, এবং ঐ যুগের অধঃপতনের সময় সময় নানা বিকৃতির ফলে পৌরাণিকদিগকে আর্য্য ও অনার্য্যের ভাব লইয়া শাস্ত্র গড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগের প্রধান দোষ এই যে, সাধারণের ভাষাকে ঘৃণা করিয়া কথা-সাহিত্য অবধি সংস্কৃতে লেখা হইয়াছিল। সংস্কৃতের মত জটিল, মন্থর ভাষা বোধ হয় কোন দিন কোন জীবিত সমাজের ভাষা ছিল না। চার পাঁচ শত বৎসরের চেষ্টায় এই ভাষা সংস্কৃত হইতে হইতে ভবভূতিও বাণভট্টের ভাষায় যাইয়া পৌঁছাইয়াছিল। পুরাণের অনেক গল্পই বোধ হয় দেশের সাধারণের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলির আকার দেওয়া হইয়াছিল সংস্কৃতে। এই সময়েও কিন্তু শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের অন্তরালে যে কত ছড়া, গান, কত গল্প, কত কবিতা জমিয়াছিল তাহা অল্প চেষ্টাতেই তখনকার সাহিত্য হইতে ধরিতে পারা যায়। কত গ্রাম্য কালিদাস যে চির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, কে তাহাদের খবর রাখে? আর এই সকল কালিদাসের মাল-মশলা লইয়া রাজসভার শিক্ষিত কালিদাসেরা চিরযশের ইমারত গড়িয়াছেন!

আরও কয়েক শত বৎসর ইহার চেয়েও খারাপ অবস্থা চলিয়া ছিল। দেশে আবার প্রাণের অভাব, ভাষার আবার জীবনের অভাব দেখা গিয়াছিল। একদিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের নানা ডালপালা, কখন আধ ফোটা দেশ-ভাষায়, কখন আধা ভাঙ্গা সংস্কৃতে সাধারণের মধ্যে মন্ত্র ও তন্ত্র দ্বারা সহজে নির্ব্বাণের বার্ত্তা প্রচার করিত, আর অন্য দিকে নব-গঠিত হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণকে মাথায় তুলিয়া, ব্রাহ্মণের রচিত সংস্কৃত বচন ব্রাহ্মণের মুখ দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া শত শত ব্রত ও দেবতার পূজা করিত, অথবা তন্ত্র-বিহিত চক্রে অধিষ্ঠিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় নূতন রচিত মন্ত্র ও জপ, ন্যাস ও মুদ্রার সাহায্যে নূতন রকমের মুক্তির সন্ধান করিত।

ইতিমধ্যে মুসলমানেরা দেশটিকে অধিকার করিয়া দেশের লোককে কোণঠাসা করিয়া ফেলিল। নানা যুদ্ধ, অভিযান ও মারামারি কাটাকাটির মধ্যে কিছুদিন কোন ভাষাই বিশেষ সুবিধা লাভ করে নাই। এইরূপে দুই শত বৎসর গেল। এখন যে যুগের কথা বলা যাইতে পারে, তাহার নাম আমরা দিয়াছি "হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন যুগ"। এ যুগের সাহিত্য বোধ হয় বাঙ্গালাদেশের চেয়ে পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশেই বেশী বিস্তৃত দেখা যায়। মহাত্মা নানক, কবীর এবং অন্যান্য কবি সাধকদের প্রচার দ্বারা এই যুগ বিশেষ উপকারী হইয়াছিল। এ সময়ের মুসলমানেরা দেশের চলিত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করিতেন, আর সাধকেরা মুসলমান ও দেশীয় সাধারণের উপযোগী চলিত ভাষাতেই কবিতা ও গান রচনা করিতেন। তখনও এ দেশে উর্দ্দু ও পার্শীর চলন বেশী হয় নাই। এই যুগের একটি নূতন দেবতার নাম 'সত্যপীর'। ইনি হিন্দুরও দেবতা, আবার মুসলমানেরও দেবতা।

দেশের মধ্যে বৈষ্ণবত্বের একটা গূঢ় ধারা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। উহা আগে সংস্কৃতের শিকলে বাঁধা ছিল, এই জন্য উহা জীবন্ত ও চলন্ত হয় নাই। যখন দেশীয় চলিত ভাষায় বৈষ্ণবত্বের সাহিত্য লেখা হইতে থাকিল, সেই যুগকেই আমরা উপরে বৈষ্ণব যুগ বলিয়াছি। ইহা পাঠান রাজত্বের শেষের দিক হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় মোগল আমলের মাঝামাঝি আসিয়া গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করিল। এই সময়ে সাধক ও শিক্ষকেরা দেশের লোকের শত শত বৎসরের সঞ্চিত ক্ষুধায় মুখে পরম উপাদেয় অমৃতরাশি পরিবেশন করিলেন। এই অমৃতের স্পর্শে মৃত সমাজ সজাগ হইয়া উঠিল, আর সমাজ-দেহের প্রতি শিরা উপশিরায় একটা উন্মাদনা জাগাইল। যে প্রেম বৈষ্ণবের হৃদয়ে ব্রজলীলার সৃষ্টি করিল, তাহা আমাদের ভাষাকেও ব্রজবনের চিরশ্যাম-স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল। দেশের লোকের ভাষায় প্রচারের ফল এই হইল যে, বৌদ্ধ-জৈন যুগের মত এ যুগেও অতি উচ্চ ভাবগুলি একেবারে সাধারণ লোকের মনের দ্বারে যাইয়া আঘাত করিল।

ইহার পর বরাবর দেশের লোকের ভাষাই চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আগের মত প্রাণ ছিল না, এবং তাহাতে প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে এরূপ লোক ছিল না। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে মিলিয়া বৈষ্ণবেরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করায়, ব্রাহ্মণেরা আবার সমাজকে সংস্কৃতে লেখা স্মৃতির বাঁধনে বাঁধিতে বাঁধিতে নিৰ্জ্জীব করিয়া তুলিলেন। এই সময়ের সাহিত্যে মোগল আমলের ভোগ ও বিলাসের ছাপ খুব বেশী দেখা যায়। এই সময়ের রাজ-দরবারে যে ভাষা চলিয়াছিল, তাহা এই দেশের ভাষা হইলেও এবং তাহাতে নটের নাচ আর কালোয়াতের ঝঙ্কার থাকিলেও, উহা দেশের লোকের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই ভাষা বিলাসী লোকের অতিমাত্রায় কষে করা পোষাকের মত, ইহার উদ্দেশ্য শুধু লোককে তাক্ লাগাইয়া দেওয়া।

এখন পাশ্চত্য প্রভাব যুগের কথা আসিয়া পড়িল। এই যুগের কথাই আমরা বিশেষ করিয়া এই প্রবন্ধে বলিতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজদের আমল আরম্ভ হইল। ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে আমরা কতকগুলি দরকারী শব্দ পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহারা তার বেশী আর কোন প্রভাব ফলাইতে পারে নাই। ইংরেজদের রাজত্ব এদেশে কিছু পাকাপাকি হইলে, তাঁহারা নিজেরা এদেশের চলিত ভাষাগুলিকে শিখিবার চেষ্টা করিলেন, আর এদেশের লোক যাহাতে এই সকল ভাষায় লেখা বই সহজেই পাইতে পারে তাহার আয়োজন করিতে থাকিলেন। এই সময়ের খ্রীষ্টান মিশনারী ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আমাদের পরম উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সব ভাষায় বই লিখিয়াছেন, এমন কি, ছাপাখানা নিজেদের হাতে তৈরি করিয়া তাহাতে বই ছাপাইয়াছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় দেশে একটা সাড়া জাগিল, লোকে নূতন রকমে শিক্ষা পাইল। এই সময়ে একটা কাযে লাগাইবার মত গদ্যের সৃষ্টি ও প্রসার হইল।

আমাদের জাতি চারিদিকে নানা আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে মোহিত হইয়া আমাদের শিক্ষিত সমাজ একেবারে ঘর ও দেশ ত্যাগ করিতে চাহিলেন। ক্রমে শিক্ষার বিস্তার হইতে থাকিল। কিছুদিনের মধ্যেই প্রশ্ন উঠিল, এ দেশের লোককে পাশ্চাত্য মতে ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, না এ দেশীয় প্রাচীন মতে ও এদেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই দরকার? তখন কোম্পানীর আমল। তখন এদেশী লোকের ইংরেজী শিখিয়া করিয়া-খাওয়ার পথ বেশ খুলিয়াছিল। ইংরেজী জানিলে সাহেবদের ও সরকারের নিকট খুব মান হইত। আর তখন কোম্পানী অন্যান্য ইংরেজ সদাগরের কাজে এবং দেশ শাসন করিতে ইংরেজী জানা এদেশী লোকের দরকার ছিল। এই সব কারণে, (আর আমাদের তখনকার গদ্যভাষার শৈশবের জন্যও) বিদেশী ভাষাই আমাদের শিক্ষার ভাষা স্থির হইল এবং কেবল সেই সব দেশের বই পড়ান ঠিক হইল। যে দুই দলের লোক মিলিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত কিন্তু মিলিত না। রাজা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা এদেশের লোকের মনকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করা; আর মেকলের মনের ভাব ছিল, যে এদেশে পড়াইবার উপযুক্ত বই-ই নাই! তখনকার সমাজের অবস্থা ও সামাজিকদের কথা বিবেচনা করিলে, তখন এ উপায়ের দরকার ও উপকার ছিল মনে হয়। কারণ, সেই সময়ে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া ইংরেজ জাতির মানসিক সবলতা ও প্রসারের পরিচয় লাভ আমাদের পক্ষে শুভকর নিশ্চয়ই হইয়াছিল, যদিও ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে বাড়াবাড়ি হইয়াছিল কম নয়।

এদেশে একবার যাহা দাঁড়াইতে পারে তাহাকে সহজে ঠাঁইনাড়া করা যায় না। ইংরেজী একবার যখন বহু বাদানুবাদের পর শিক্ষার বাহন স্থির হইল, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে বরতরফ করে? পঞ্চাশ বৎসরের বেশী সময় চলিয়া গেল, তবু কোন কথাই উঠিল না। কর্ত্তাদের কাহারও মনে এ প্রশ্ন হইল না

যে, এত দিনের পর—আমাদের কিছু শক্তি লাভের পর—আমাদের ভাষাতেই শিক্ষার উপায় করা দরকার কি না। কিন্তু যাঁহারা জাতির ভবিষ্যৎ দেখিতে পান এবং ভবিষ্যৎ গড়িবার শক্তি রাখেন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে কোন বাধাই বাধা মনে হয় না। এখন হইতে ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্ব্বে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ও শক্তিশালী লোকের মনে আমাদের শিক্ষায় দেশী ভাষার স্থান, কায ও দাবী সম্বন্ধে একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে দেখা যায়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি দেশী ভাষার প্রতিষ্ঠাতা ও যাঁহার ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় এই বৎসর দেশী ভাষাগুলিতে প্রথমবার এম্‌-এ পরীক্ষা হইবে, বঙ্গদেশীয় শিক্ষার সেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ও নিয়ামক মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সভার (Senate) যে বিশেষ অধিবেশন (Special Convocation) হইয়াছিল, তাহতে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যাচার্য্য'(Doctor of Literature) উপাধিদান সময় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মনে করা দরকার:—"It is now nearly twenty three years ago that a young and inexperienced member of the Senate pleaded that a competent knowledge of the vernaculars should be a pre-requisite for admission to a Degree...The Senators ...rejected his proposal, on what now seems the truly astonishing ground that the Indian Vernaculars did not deserve serious study by Indian students...Fifteen years later, the young senator, repeated his effort. In the year following, he was however more fortunate. After a struggle of a quarter of a century, the elementary truth was thus recognised that if the Indian Universities are ever to be indissolubly assimilated with our national life, they must ungrudgingly accord due recognition to the irresistible claims of the Indian vernaculars."*

অনেকেই হয়ত তখন মনে মনে এরূপ ভাবিতেন, কিন্তু বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বস্তাবন্দি দপ্তর খানার মধ্য দিয়া কোন একটা কার্য্যকর প্রণালী গড়িয়া তোলা আর কাহারও সাধ্য ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু এত করিয়াও যাহা লাভ হইয়াছিল, তাহা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। আরও চেষ্টা চলিতে থাকিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ও অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্য-রথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসামান্য পরিশ্রমে, যথাযোগ্য উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকিল। এইরূপে অল্পে অল্পে আজ স্যর আশুতোষের নিদ্রিত আশা ও রায় সাহেব দীনেশচন্দ্রের জাগ্রত স্বপ্ন সফল হইতে চলিল।

এখনকার যুগকে শুধু পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ বলিলে চলে না। এ যুগকে সৃজনের যুগ, মহাজাতি গঠনের যুগ বলা যাইতে পারে। ইংরেজী শিক্ষা, বিগত যুদ্ধ, দেশের অবস্থা ও প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের ফলে একটা গণতন্ত্রের যুগ আমরা শীঘ্রই আশা করিতেছি। এ যুগের লোকশিক্ষার বাহন ভারতের চিরকালের রীতির অনুরূপ হইবে। চলিত দেশী ভাষাই এ যুগের প্রধান সহায় হইবে। হিন্দু ও মুসলমানকে এক করিতে, দেশের অজ্ঞান দূর করিতে, হিন্দুসমাজে ওলট পালট করিতে প্রধান অস্ত্রের কায করিবে। এই ভাষাযজ্ঞেই দেশের ধনী, গরীব, জ্ঞানী, অজ্ঞানী একক্ষেত্রে মিলিবার অবসর পাইবে। ইহার জন্য জ্ঞানীকে অজ্ঞানীর মুখের ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, আর অজ্ঞানী জ্ঞানীর মনের ভাবের দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীবনকে গভীরভাবে দেখিতে শিখিবে।

অনেকে বিভীষিকা দেখেন যে, যদি দেশী ভাষাগুলি

* Minutes of the Calcutta University, 1913, Pt. VIII, pp. 2984-85.

বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর বাঁধে, তবে ইংরেজীর ক্ষতি হইবে। তাহা হইবে বটে, কিন্তু ইংরেজীকে কেহ তাড়াইতে পারিবে না, আর কেহ তাড়াইতে চাহিবেও না। অনেকে আবার ভারতের বহু ভাষা দেখিয়া শঙ্কিত হন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ভারতের এক একটি প্রদেশ একটা দেশের মত বড়। এই সব প্রদেশের প্রায় ৩০ কোটি লোক কখনও একটি মাত্র ভাষায় কথা কহিতে পারে না। ভারতবর্ষের মত বড়, পুরাতন ও নানা জাতির দেশকে বহু ভাষার জন্য দোষ দিয়া কাহারও কোন লাভ নাই। এখন প্রয়োজনের তাড়নায় ভাষা সমস্যা ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে মনে হয়। ভারতে—অন্ততঃ উত্তর ভারতে—হিন্দী রাষ্ট্র-ভাষা হওয়ার উপযুক্ত, এবং হইবে বলিয়া আশা হয়। আমাদের বাঙ্গালা, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে না, কিন্তু ইহা যে ইউরোপে ফরাসী ভাষার মত ভারতের নূতন যুগের কাল্‌চারের ভাষা হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাই-তেছে। এখনকার সমগ্র ভারতের দেশীয় সাহিত্যগুলি বাঙ্গালার কাল্‌চার ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। দেশীয় ভাষাগুলির আর একটা প্রকৃত অসুবিধা আছে, তাহা বহু প্রদেশের বহু লিপি। এখন শুধু এই আশাই করা যাইতে পারে যে, ভাষা আলোচনার ফলে কালে এমন সকল লিপিজ্ঞানী আসিবেন, যাঁহাদের চেষ্টায় ভারতের লিপিগুলির মূল অংশ (elements) লইয়া ভারতবর্ষের জন্য হয়ত এক সাধারণ লিপি তৈয়ারি হইতে পারিবে।

ইংরেজের আমলে আমরা সাধারণের অক্ষরজ্ঞানের (literacy) বড়াইয়ের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে শিক্ষার হার মিলাইলে আমরা আসল খবর পাই। উচ্চশিক্ষার অবস্থা ত একেবারেই শোচনীয়। ৬০ বছরের বেশী হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, বেশী দিনই ইহা ইংরেজ অধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) দ্বারা চালিত হইয়াছে। ঐ সময়ে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষার কোন চেষ্টাই দেখিতে পাই নাই। ৫০ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরা কেবল পরীক্ষা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৌলিক গবেষণার বিশেষ কোন চেষ্টাই হয় নাই। এতদিনে স্যর্ আশুতোষের চেষ্টায় নানা বিষয়ে গবেষণার সূচনা হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি যত্নের সহিত পঠন হইয়াছে, মেধাবী ছাত্রেরা স্বাস্থ্য ব্যয় করিয়াও পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু খুব কম ছাত্র ও অধ্যাপক মৌলিক গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন। এমন কি সংস্কৃতের বিভাগেও উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রধান কারণ আমাদের কাছে মনে হয়, দেশের বস্তুকে অবজ্ঞা করা, আর দেশের ভাষাকে দূরে রাখা। এই দেশের বস্তু ও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া, অন্য দেশের বস্তু ও ভাষায় জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী (scientific methods) ও তুলনামূলক আলোচনা (comparative study) অনুসরণ করিলে, জ্ঞান আমাদের কাছে সত্য ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমাদের খুব দুরাশা হয় যে, স্যর্ আশুতোষ প্রবর্ত্তিত 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস কাল্‌চার' (Ancient Indian History and Culture) এবং 'ভারতীয় দেশীভাষা' (Indian vernaculars) এই দুইটি বিষয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত গৌরবের কারণ হইবে। আর ইহার পরোক্ষ ফল এই হইবে যে, এই দুইটি বিষয় শিখিতে হইলে, পূর্ব্বে আমাদিগকে দেশ ও দেশীয়-দের নিকটে যাইতে হইবে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহা গুপ্ত ও লুপ্ত ছিল তাহা বাহির করিতে হইবে। এই সূত্রে দেশের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান যোগ হইবে।

একটি কথা আমাদের মনে বিশেষ করিয়া জাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তুলনামূলক আলোচনা ও মৌলিক গবেষণা করিতে হইলে এক জন আচার্য্যকে লইয়া এক একটা কেন্দ্র (এখানে school অর্থে ব্যবহার করা গেল) স্থাপন করা চাই। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এই রকমের প্রথা আছে। আমাদের দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও এরূপ কেন্দ্র নাই। ইহাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি পণ্ডিতদিগকে (scholars) নিজে নিজে দেখিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের শক্তির অপব্যয় হইয়াছে। আমাদের দেশে একমাত্র স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নবিজ্ঞানের একটা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার আলোচনায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটা অতি উপযোগী কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু জানিনা কেন তিনি তাহা করেন নাই। যাহা হউক, আশা করি সার্ আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাগুলির একটা কেন্দ্র গঠিত হইবে।

এইরূপ কেন্দ্র গঠন করিতে বিদ্বান্‌কে যেমন বিদ্যা দিতে হইবে, ধনীকেও তেমনই ধনের ব্যবহার করিতে হইবে, কাহারও কার্পণ্য করিলে চলিবে না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

বাল্য সখী

(গল্প)

আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথমে কয়েক বৎসর তাঁহার ও আমার মধ্যে ক'খানা মোটা মোটা আইনের বই নিরবচ্ছিন্ন মিলনের অন্তরায় স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। শরতের লঘু মেঘখণ্ডের মতন একদিন সকল বাধাই অপসৃত হইয়া মিলনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-কিরণে আমাদের বিরহাচ্ছন্ন হৃদয় দুইটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কলিকাতা-প্রবাসী জনৈক বন্ধু তারযোগে জানাইলেন, আমার স্বামী বি-এল পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ সংবাদে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়টি হর্ষোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া গেল, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উল্লাসে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; যদিও এ আনন্দ এ গৌরব আমাদের বাঙ্গালী জাতির এক ওকালতিতেই পর্য্যবসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিবে, তবুও আজ হৃদয়-দুয়ারে ভবিষ্যতের কত সুখ-সৌভাগ্যের চিত্র সমাগত হইয়া আশার গান গাহিতেছিল।

স্বামী প্রসন্ন দীপ্তিপূর্ণ মুখে আমাকে তাঁহার বুকের নিকটে টানিয়া লইয়া প্রীতিভরা কণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমায় কি উপহার দেবে করুণা? কত কষ্ট করে', কত পরিশ্রম করে' আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছি—এর জন্যে তুমি কি আমায় পুরস্কার দেবে না?

আমি বলিলাম, "পুরস্কার তোমার বদলে আমারই যে পাবার কথা; কারণ আমারই ঐকান্তিক প্রার্থনায়, আমারই পুণ্যে তুমি পাশ করেছ বৈত নয়? নইলে তোমার ক্ষমতা ত আমার জানা আছে!"

স্বামী স্নেহভরে আমার ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথা করুণা; তোমারই পুরস্কার পাওয়া উচিত। তোমারই প্রার্থনায় ভগবান সফলতা এনে দিয়েছেন। বল তুমি আমার কাছে কি চাও?"

আমি আনন্দের আবেগে কহিলাম, "তুমি পশ্চিমে ওকালতি কর এই আমার ইচ্ছা; যেখানে চপলা আর সুরেন বাবু আছেন, সেইখানে।"

চপলা আমার বাল্যসখী। তাহাকে যে আমি কতটা ভালবাসিতাম, তা' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত ঠিক উত্তর দিতে পারিতাম না; কিন্তু আমার স্বামী অল্পদিনের মধ্যেই চপলার প্রতি আমার ভালবাসার গভীরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপহাসছলে চপলাকে তাঁহার "সতীন" আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া একটু সুখের হাসি হাসিতাম,—একটিও প্রতিবাদ করিতাম না। আমার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, আমি যে চপলাকে ভালবাসি,

সে ভালবাসায় যেন অনেকটা আমার স্বামীরই প্রাপ্য; কিন্তু এ জগতে মানুষের সব আশা আকাঙ্ক্ষা, সফলতায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দেয় না; অধিকাংশ কামনার ভ্রব্যেই নিরাশার ক্ষীণ ব্যথা নিহিত হইয়া থাকে। আজ জীবনের শান্তিপর্ব্ব-প্রারম্ভেই চপলার সন্নিকটে আমার চিরন্তন গৃহস্থালী পাতাইবার কথা শুনিয়া স্বামী সহাস্য মুখে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে করুণা, আমি পশ্চিমেই ওকালতি করব। যেখানে তোমার সইয়ের স্বামী ব্যারিষ্টারী করেন, সেইখানে আমিও শামলা এটে নথীপুঁথি খুলে বসব। তোমার সই ত বড়লোকের গৃহিণী হয়ে তোমায় একেবারেই ভুলে গেছেন; একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখেন না—অথচ তোমার ভালবাসার স্রোত যেন আরও উছলে উঠছে; আমি কি সাধ করে তাঁকে আমার সতীন বলি!"

স্বামীর কথায় আমার অন্তরের অন্তস্তলে একটি বেদনার তারে ঘা লাগিল। সত্যই চপলা আমায় ভুলিয়া গিয়াছে; একটুও স্মরণ নাই—অথচ আমি আজও সেই বাল্যের স্নেহ কৈশোরের প্রীতি-পারাবারের কল্লোল-গীতে আশাতুর হৃদয়ে তাহারই দর্শন পিপাসায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি। শত আশার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তাহারই সন্নিধানে ছুটিয়া যাইতে আকুল হইয়াছি—কিসের জন্য? যে আমাকে দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ভুলিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছে, তাহারই জন্য কি? আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "সই ভুলে গেছে শুনে রাগ হয়েছে করুণা? সইয়ের ভালবাসা বিহনে জীবন বুঝি মরুভূমি হয়ে যাবে? আমার স্নেহ-ভালবাসা—সে কি তোমার সকল অভাব পূর্ণ করতে পারবে না? তোমার সই তোমাকে যতটুকু ভালবাসতেন, সেটুকু তুমি আমার কাছ থেকেই আদায় করে নিও। নিতে পারবে না করুণা?"

আমি তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া মনে মনে বলিলাম, "আদায় করে নেবার অনেক পূর্ব্বেই তুমি যে আমায় অযাচিত অজস্র দিয়ে ফেলেছ প্রিয়তম, তাই যে আমার বুকের ভিতর স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। তার একবিন্দু এক কণিকারও যে উপমা হয় না! তোমার প্রেম-প্রবাহে আমার হৃদয়নদী কূলে কূলে ভরে' উঠেছে। কে চপলা, তার স্নেহ কতটুকু, যে তাই বিহনে আমার হৃদয় মরুভূমি হয়ে যাবে?"

২

আমরা পশ্চিমে আসিয়াছি। স্বচ্ছতোয়া নদীর কূলে ছোট্ট একটি বাংলায় আমাদের নূতন সংসার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চপলার সহিত এখনও দেখা হয় নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া চপলার সম্বন্ধে একটি সুখ-সংবাদে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার সখী মাতৃ-গৌরবে ভূষিতা হইয়াছেন, দুই মাস হইল চপলার একটি খোকা হইয়াছে। যথাসময়ে আমি এ শুভসংবাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া, সময় সময় চপলার উপর আমার খুব রাগ হইয়া উঠে; কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দেই, নব-মাতৃত্বের লজ্জায় সে বুঝি আমায় এ সংবাদটি দিতে পারে নাই।

রবিবার। আজ স্বামীর কোর্ট নাই, আহারাদির পর দুপুর বেলা আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া দিতে দিতে কহিলাম—"আজ বিকেল বেলা তুমি আমায় সঙ্গে করে সুরেন বাবুর বাংলায় চল, আমি সইকে আর তার খোকাটিকে না দেখে কিছুতেই স্থির হতে পারচি না।"

তিনি বলিলেন, "সে ত দেখ্‌তেই পাচ্চি। তাঁরা একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেন না, তোমার সই একবার এলেন না, এ অবস্থায় তোমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে করুণা?"

আমি বলিলাম, "খুব ঠিক হবে। দু' মাস হল তার ছেলে হয়েছে, সে আসবে কেমন করে? আর খবরই বা কে দেবে? আমারই ত আগে যাওয়া উচিত।"

স্বামী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া, অনিচ্ছার সহিত

চপলার ওখানে যাইবার জন্য আমাকে সম্মতি দিলেন। বলিলেন, তিনি নিজে আমার সহিত যাইতে পারিবেন না, আমি যেন গাড়ী ডাকিয়া চপলার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। বেহারা সঙ্গে থাকিবে।

কতদিনের পর চপলাকে দেখিব মনে করিয়া আনন্দে আমার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটি সন্ধ্যার দৃশ্য আমার নয়ন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—সানাইয়ের সকরুণ রাগিণী আলাপনের মধ্যে আসন্ন-বিচ্ছেদ-কাতরা একটি কিশোরীর অশ্রু-ধৌত সুকোমল মুখ, তার কাতর কণ্ঠের অস্ফুট কথা—"তুই আমায় ভুলে যাস নে সই।" আজ কে যে ভুলিয়াছে, এ কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমার প্রশ্নে তাহার রক্তিম অধর অনুতাপের বেদনায় কেমন দেখাইবে, এ চিত্রটি কল্পনা করিয়া আমি মনের মধ্যে বেশ একটু আরাম অনুভব করিলাম।

৩

চপলার বাংলার সম্মুখে যখন গাড়ী হইতে নামিলাম তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশস্পর্শী তালবৃক্ষ-শ্রেণীর উন্নত শির অস্তগামী রবির রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। আসন্ন সন্ধ্যা জলস্থল গগন আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরাহ্নের মন্দ মধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই দেখিলাম, একটি ঘাগরা-পরা আয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে আমাকে সেলাম করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আপনার কার্ড? মেম সাবকে কি বলিব?"

তাহার কথায় আমার খুব হাসি পাইতেছিল। সেই চপলার সহিত দেখা করিতে আজ কার্ডের প্রয়োজন, সে আজ "মেম সাব"—মা নয়! আমি বলিলাম, "তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সম্মুখের ঘরখানা আমাকে দেখাইয়া দিল। আমি উৎ-কণ্ঠিত হৃদয়ে সুচিত্রিত পরদা সরাইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বহুমূল্য আসবাব দিয়া ঘরখানা সুসজ্জিত। মধ্যস্থিত টেবিলের নিকটে, দুয়ারের দিকে, পিছন ফিরিয়া, একখানা চেয়ারে বসিয়া চপলা তন্ময় হইয়া কি একখানা বই লইয়া পড়িতেছে।

বহুদিনের অদর্শনের পর প্রিয়জনকে নিকটে পাইলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত অধীর হৃদয়ে তাহাকে বুকে টানিয়া লইবার জন্য যেমন হৃদয় মন উৎসুক হইয়া উঠে, কণ্ঠ নির্ব্বাক হইয়া যায়—আজ চপলাকে দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার জন্য সেই রূপ আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল। কণ্ঠের ভাষা যেন ফুটিতে চায় না। নববধূর প্রথম বাক্যালাপের মতন ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে চাহিতেছিল না।

ক্ষণকালের মধ্যে আমি হৃদয়ের চঞ্চলতা দমন করিয়া জড়িত কণ্ঠে ডাকিলাম, "সই, আমি এসেছি।" চেষ্টা করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিলাম না। আমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, হর্ষোচ্ছ্বাসে হৃদয়টি কম্পিত হইয়া উঠিল।

আমার আহ্বানে আমাকে দেখিয়া চপলা চপলারই মত সচকিত ও বিস্মিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। এত দিনের পর আমাকে দেখিয়া তাহার সুন্দর বদনে একটুও আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল না। তাহার গম্ভীর বদনের গর্ব্ব মিশ্রিত হাসি, উজ্জ্বল নয়নের স্থির দৃষ্টি দেখিয়া আমার হৃদয় যেন কি একটা অজানিত ব্যথার ভারে ম্রিয়মান হইতে লাগিল। আমি যে চপলাকে একটি নূতন মূর্ত্তিতে আমার মনের মধ্যে আঁকিয়াছিলাম, চাহিয়া দেখিলাম, এ সে মূর্ত্তি নহে। ইহাতে র‍্যাফেলের "ম্যাডোনা"র মাধুর্য্য নাই—আমাদের বাঙ্গালার জগন্মাতা "গণেশ জননী"র মাতৃত্ব-প্রভাব নাই। আছে শুধু গর্ব্বের চাকচিক্য, আর বিলাসের লালসা। কে যেন আমার কাণে কাণে বলিতে লাগিল, 'এ তোমার সে চপলা নহে, সে পাড়াগাঁয়ের হাস্যবদনা মুগ্ধ হৃদয়া স্নেহময়ী কিশোরী, ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চপলা একখানা

চেয়ারে আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দাঁড়িয়ে কেন, বস না। তুমি ভাল আছ? তোমার স্বামী ভাল আছেন?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া চপলার কথার উত্তর দিয়া, চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন চপলাকে কি কি কথা বলিব? এত দিনের অকথিত কথা একটিও স্মরণ হইতেছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পাশের ঘর হইতে কে যেন পুরুষ-কণ্ঠে ডাকিল—"চপল।"

অনুমানে বুঝিলাম, সুরেন বাবু। চপলা হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া উঠিয়া গেল।

আমি সেইখানে বসিয়াই শুনিতে লাগিলাম, প্রশ্ন হইল, "কে এসেছে চপল?"

চপলা হাসিভরা কণ্ঠে উত্তর করিল, "রাজীব উকি-স্ত্রী—আর আবার কে আসবে!"

"তুমি কি আসতে খবর দিয়েছিলে?"

"আমার ত বসে' বসে' কায নেই—যত নেংটে জুটিয়ে নেওয়া! নিজেই এসেছে।"

উচ্চ হাসির ধ্বনির মধ্যে আর কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না। শুনিবার বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। যেটুকু শুনিয়াছিলাম, তাহাই যেন তীরের ফলার মত আমার মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিলাম, স্বামী আমায় এখানে পাঠাইতে কেন আপত্তি করিয়াছিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে আমার দেহ মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আজ ভাল করিয়াই ধনী দরিদ্রের পার্থক্য উপলব্ধি করিলাম। বুঝিলাম,ধনীর নিকটে দরিদ্রের স্নেহ মমতা বড় অবজ্ঞার জিনিস, বড়ই হেয়। অপমানের বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালায় নিজের অন্তস্তলই জ্বলিয়া উঠিল।

পাণ লইয়া চপলা যখন ফিরিয়া আসিল, আমি তখন তাহার খোকাটিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। চপলার আদেশে ধাত্রী কুন্দকোরকের মত শুভ্র সুন্দর নয়ন-মন-স্নিগ্ধকর একটি ক্ষুদ্র শিশু আনিয়া আমার কোলে অর্পণ করিল; আমি তাহার সরল হাসিভরা মুখে অজস্র চুম্বন করিয়া আমার বেদনা-পূরিত তৃষিত বক্ষে তাহাকে নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। শিশুর অমৃতময় স্পর্শে আমার হৃদয়ের যত জ্বালা যত উত্তাপ এক নিমেষেই জুড়াইয়া শীতল হইয়া গেল। আমি স্থান কাল পাত্র সমস্তই বিস্মৃত হইয়া, শিশুরূপ অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে চপলার আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল, চপলা হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল—"সাড়ে পাঁচটা বাজে, ছ'টার সময় অখিল বাবুর বাংলায় আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।"

আমি বলিলাম—"অখিল বাবুর বাংলার কাছেই আমাদের বাংলা, তুমি একদিন আমাদের ওখানে যেও।"

চপলা অবজ্ঞাভরে মুখখানা ঘুরাইয়া উত্তর করিল, "যেখানে সেখানে যাওয়া উনি পছন্দ করেন না।"

সবই বুঝিলাম। এ অঞ্চলে অখিল বাবুর ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি, পুষ্পসৌরভেরই মত সুব্যাপ্ত; তাঁহার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ সকলের পক্ষেই বুঝি গৌরবের কথা! তাই বলিয়া দরিদ্রকুটীরে ধনীর পদার্পণ—সে কি সম্ভব হইতে পারে?

চপলার মহামূল্য সময় নষ্ট না করিয়া যখন উঠিয়া আসিতে যাইলাম, তখন একখানা সুবৃহৎ রেকাবীতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া চপলা আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া তাহার অতিথি-সৎকারের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিল। আমি আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিলাম। সমস্ত পথটা চপলার ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনটা যেন বিমর্ষ হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু হৃদয়-সমুদ্রের হলাহলের মধ্যেও চপলার ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষণিক পরশ, আমার বুকে সুধা বর্ষণ করিতেছিল।

এক বৈশাখের পুণ্যপ্রভাতে, শত আশা আনন্দে হৃদয় ভরিয়া, পশ্চিমে আসিয়াছিলাম। কালের অতীত গর্ভে একটি বৎসর বিলীন হইয়া, আবার বৈশাখ মাস

আসিয়াছে। এই এক বছরে কত আশালতা অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে; আবার কত আশার মুকুল ফুলে ফলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ উকীল নেওল কিশোর বাবু তাঁহার মৃত পুত্রের সাদৃশ্য আমার স্বামীর মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া, স্নেহবশে তাঁহার অধিকাংশ মামলা মোকর্দ্দমা আমার স্বামীকে দিয়া করাইতেছেন। কাযেই ওকালতিতে তাঁহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছিল। ইহারই মধ্যে উকীল মহলে বেশ একটু নাম ও প্রতিপত্তিও লাভ হইয়াছিল। আমার ক্ষুদ্র সংসারে এখন আর কোন অভাবই অনুভব করি না—শুধু একটি কচি মুখের মধুর হাসি।

ইচ্ছা সত্ত্বেও চপলার সহিত দীর্ঘ একটি বৎসর দেখা সাক্ষাৎ করি নাই। এক বৎসর পূর্ব্বের সেই অপমানের সুতীব্র জ্বালা আজিও আমার হৃদয় হইতে নির্ব্বাপিত হয় নাই। চপলাও, অবশ্য আমাকে মনে রাখিবার কোন নিদর্শন জানায় নাই।

আমাদের বাসের জন্য নদীর ধারে একটি নূতন বাংলা কেনা হইয়াছে। গৃহপ্রবেশের দিন স্থির করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করাও হইয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণে আমি তাঁহার জন্য নূতন প্যাটার্ণের এক যোড়া মোজা বুনিতেছিলাম; তিনি প্রফুল্ল মুখে আমার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "আমার ত সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, শুধু সুরেন বাবু বাকী, তাঁকে বলে এলেই আমার পালা শেষ হয়। এর পর তোমার নিমন্ত্রণ করবার পালা।"

আমি বলিলাম, "আমার আর বেশী নয়, মুন্সেফ বাবুর বাড়ী আর হেমন্ত বাবুর ওখানে।"

তিনি বলিলেন, "কেন, তোমার সই বুঝি ফাঁকি যাবেন—তাঁকেও বলতে হবে বৈকি?"

আমাদের গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে চপলাকে নিমন্ত্রণ করিবার কথা আমার যে মনে না আসিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু স্বামীর মুখে তাহার নাম শুনিয়া আমার চিত্ত নিতান্তই বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার অতীত দিনের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য আমার হৃদয়ে নূতন আঘাত করিতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, "না, তাকে বলে কি হবে? সে আসবে না, শুধু শুধু বলতে গিয়ে অপমান।"

তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "মান মর্য্যাদা ওতে যায় না করুণা। ভুল সবারি হয়। তোমার সই এক দিন ভুল করেছেন বলে', তুমিও ভুল করতে যাবে কেন? তুমি না তাকে খুব ভালবাসতে, এই কি গভীর ভালবাসার পরিচয়? স্নেহপাত্রীর নিকট থেকে এক দিনের অবহেলায় তোমার স্নেহের স্রোত শুকিয়ে যাওয়া অন্যায়, করুণা।"

তাঁহার কথায় আমি মনে মনে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলাম, "চাণক্যদেব, আর বলতে হবে না। আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু তার ওখানে যেতে পরেব না। চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দেব।"

তিনি প্রফুল্ল মুখে "যে আজ্ঞে" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

৫

নূতন বাংলায় আসিয়া, আমাদের বন্ধু-সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া চপলাকে একখানা চিঠি লিখিলাম। আশা ছিল, চপলা না আসিলেও, আমার চিঠিখানায় উত্তর না দিয়া পারিবে না; কিন্তু বেহারা যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তিনি আসতে পারবেন না, মুখেই বলে দিয়েছেন।" এই সম্ভাবিত কথা শুনিয়াও মনটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া গেল। এত উৎসব আয়োজন, এত আনন্দ উল্লাস—চপলা যেন একটিবার আসিলেই সব সার্থক হইত। তাহার অনুপস্থিতিতে আমার নিকটে সমস্তই বৃথা ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হায়, অন্ধ ভালবাসা, দুর্ব্বল মানব হৃদয়ে তুমিই জয়ী! তোমার নিকটে মান, অপমান, ঐশ্বর্য্য, দরিদ্রতা—কোন ব্যবধানই স্থান পায় না।

সমস্ত দিন বন্ধুবান্ধবদের আহারাদির গোলমালে

অতিবাহিত হইয়া গেল। জিনিসপত্র গুছাইয়া কাযকর্ম্ম সারিয়া আমি যখন শয়ন করিতে যাইব ভাবিতেছি, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। দিবসব্যাপী পরিশ্রম করিয়া তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছেন। প্রতিদিনের অভ্যাসবশতঃ আজও আমি শয়নের পূর্ব্বে বারান্দায় দাঁড়াইয়া, সুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। অদূরে অনন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র জ্যোৎস্না-কিরণে স্নাত হইয়া সমীরণে আন্দোলিত হইতেছে। সম্মুখে স্রোতোময়ী জাহ্নবীর বক্ষে আকাশের চন্দ্র, নদী পাড়ের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রহচন্দ্রতারকা খচিত নীলাকাশ ও নিস্তব্ধ ভুবন কাহার যেন মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হৃদয় আমার মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালার সৌম্য সুন্দর শান্ত শীতল পল্লীর কথা মনে হইতে লাগিল।

এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে হঠাৎ একটি গভীর আর্ত্তনাদ শব্দে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং সেইদিক হইতে উচ্চ কোলাহল বাতাসে বহিয়া আসিতেছে। এক নিমেষের মধ্যে সকলই বুঝিলাম। আমার বক্ষের ভিতর দুরুদুরু শব্দ হইতে লাগিল, শরীর বেতস-পত্রের মত কম্পিত হইল। আমি সেইখানে বসিয়া পড়িলাম।

সহরের পূর্ব্বদিকে বাজারের সন্নিকটে চপলাদের বাংলা—সেখানে যদি আগুন ধরিয়া থাকে! চপলা ধনী-গৃহিণী সেকথা আমার স্মরণ হইল না। চপলা আমার হৃদয়ে সুতীব্র যাতনার উৎস বহাইয়াছে সে কথাও আমার মনে পড়িল না। আমার নয়ন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—পল্লীর নিভৃত কোলে নদীসৈকতে আম্রকাননের ছায়াতলে বসিয়া সংসার-ভোলা আপনা-ভোলা দুইটি বালিকার অপরিসীম স্নেহোচ্ছ্বাস, আর অপূর্ব্ব কল্পনার কথা। আরও মনে পড়িল, চপলার সেই খসিয়া পড়া চাঁদের মত, এক টুকরা মাণিকের মত শুভ্র সুন্দর খোকাটি—সেই ভগবানের অমূল্য দান, সংসার-মরুর অম্লান কুসুম খোকাটুকু ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণভয়ে ভীত কাহারও দৃষ্টিপথে যদি পতিত না হয়।

আমি আর ভাবিতে পারিলাম না। আমার দেহ মনের উপর দিয়া একটা আশঙ্কার ঝটিকা ক্ষিপ্রগতিতে বহিয়া গেল। আমি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, গভীর নিদ্রামগ্ন স্বামীকে জাগাইয়া কি কথা বলিয়া যে তাঁহাকে মৃত্যু আহবে পাঠাইয়া দিলাম তাহা আমার স্মরণাতীত। তিনি যখন আমার নয়ন পথের অন্তরাল হইলেন, তখন আমার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন ভাল করিয়া বুঝিলাম, আমি এ কি করিয়া ফেলিয়াছি! চপলা আমার কে? তাহারই জন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্ত্রী হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়া দিয়াছি!

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যে কাযটি করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার জন্য স্বহস্তে হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেও আমার হৃদয়-যন্ত্রণার লাঘব হইত কি না সন্দেহ। আশঙ্কার অন্ধকারে কত বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। সহসা আমার ঝটিকাক্ষিপ্ত হৃদয়াকাশে ভগবানের অসীম করুণার কথা জাগিয়া উঠিল। আমি সেইখানে লুটাইয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ডাকিলাম—"ভগবান, আমি বিপন্নকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে বিপন্ন করিও না।"

৬

কোথায় দিয়া কি ভাবে যে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে তাঁহার আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেহে আমার প্রাণ আসিল, নয়ন আমার জুড়াইয়া গেল। তাঁহার ছিন্নভিন্ন বেশভূষা ও আরক্তিম চক্ষু দুইটি দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছিল না। তিনি চৌকির উপর বসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—"তুমি ঠিক সময় আমায় পাঠিয়েছিলে করুণা, নইলে খোকাকে বাঁচান কঠিন হত।"

আমি শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"তোমার ভয় নেই করুণা, তোমার সই, সুরেন বাবু, খোকা সবাই ভাল আছে। ওঁদের বাংলার পিছনে কয়েক ঘর দোকানী ছিল, প্রথমে সেইখানে আগুন লেগেই এ কাণ্ডটা হয়ে গেল। সুরেন বাবুদের জিনিসপত্র সব পুড়ে গেছে। আগুনের কথা শুনে ঘুমের চোখে যে যার মতন বেরিয়ে পড়ে, খোকার কথা কারুর মনেই ছিল না; যখন মনে হল তখন বাংলার দরজায় আগুন ধরে গেছে। তাই দেখে তোমার সই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আমি গিয়ে জানলা টপ্‌কে খোকাকে বের করেছি। তার কিছু হয়নি, শুধু আমার এই পা-টা যা একটু পুড়ে গেছে—তা দুদিনেই সেরে যাবে।"

আমি এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত তাঁর মুখে ভীষণ অগ্নি-কাহিনী শুনিতেছিলাম; আর মুগ্ধ হৃদয়ে স্বামীর মহত্ত্বের কথা ভাবিতেছিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলে বলিলাম—"সইরা এখন কোথায় গেছে?"

"কোথায় আর যাবেন, যে পর্য্যন্ত তাঁদের নূতন বাংলা ঠিক না হয়, সে অবধি তাঁরা এইখানেই থাক্‌বেন। আমি তাঁদের বলে এসেছি।" বলিয়া গাড়ীর শব্দে সচকিত হইয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পরে চাহিয়া দেখি, তিনি চপলার খোকাকে কোলে লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে চপলা গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। ব্যথিত রুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিল—"আজ আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর সই, তোমাদের দেওয়া প্রাণ খোকার মুখ চেয়ে আমার সব দোষ ভুলে যাও।"

আমি চপলার ভূলুণ্ঠিত মস্তকটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিলাম—"তোমার কোন অপরাধ আমার কাছে স্থান পায় না সই, তুমি ও কথা বোল না।" চেষ্টা করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিলাম না। অশ্রু সমাগমে আমার কণ্ঠস্বর নিরুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন প্রভাতের রৌদ্র শ্যামল ধরণীবক্ষে প্রসারিত হইয়া আসিতেছে। পাখীরা প্রভাতী গানে সুধাবর্ষণ করিতেছে, ফুলকুল স্নিগ্ধ সৌরভ বিতরণ করিতেছে, বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদে আবাল্যের দুইটি স্নেহাতুরা হৃদয় পুনরায় অচ্ছেদ্যসূত্রে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বারেন্দ্রে জৈন তীর্থ

(কোটিবর্ষ)

পাল ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত 'কোটিবর্ষ' বিষয় নামে একটি বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "রাজাবলীকথা" নামে কর্ণাটী ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরের উল্লেখ দেখা যায়। এই কোটিকপুর নগর হইতেই পরবর্ত্তীকালে কোটিবর্ষ নামের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শব্দরত্নাবলীতে কোটি নগর এবং বাণ রাজার রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অভিধান চিন্তামণিতে হেমচন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—"দেবীকোট উমাবনম্। কোটিবর্ষং বাণপুরং শ্চাচ্ছাদিত পুরশ্চং।" ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে পুরুষোত্তম দেবও এই পর্য্যায় প্রদান করিয়াছেন—"দেবীকোটো বাণপুরং কোটিবর্ষমুমাবনম্। শ্চাচ্ছোণিত পুরঞ্চাপ।" গরুড় পুরাণেরও

এই মত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বৃহৎ সংহিতাতে কোটি বর্ষ রাজ্যের নাম আছে।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে, চিত্রগুপ্ত এই থানে চণ্ডিকার আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুষাঙ্গপাদের ২৩শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দেবপূজিত কোটিবর্ষ নগরে মহর্ষি শাক্তির (বেদব্যাসের পিতার) সমকালে মুণ্ডীশ্বর নামে এক মহেশ্বর যোগীর আবির্ভাব হয়।

দেবভূতি নামক রাজা এই নগর স্থাপন করেন। পীঠমালায় লিখিত আছে,—

মানবং বিল্বপীঠঞ্চ দেবী কোটং তথৈব চ।
গোকর্ণং মারুতেশঞ্চ তথাট্টহাসমেব চ ॥ ১৮ *

ঐতিহাসিকগণের মতে উত্তর বঙ্গের পুনর্ভবা তীরস্থ দেবীকোটই কোটিবর্ষ। ইহাকেই আমরা কোটিকপুর বলিয়া মনে করি।

"তারানাথ-বর্ণিত পালরাজগণের মধ্যে অনেকেই প্রতাপশালী সামন্ত রাজা ছিলেন। বাণপাল পুনর্ভবা নদীতীরে দেবকোটে রাজত্ব করিতেন। দেবকোটের দুর্গবদ্ধ অংশে হিন্দু রাজত্বকালের জীব ও অমৃত নামক দুইটি কূপ দৃষ্ট হয়। দুর্গাংশ বর্গক্ষেত্রাকৃতি, প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং ইহার উত্তরে বর্গক্ষেত্রাকৃতি প্রাচীর-বেষ্টিত একটি স্থান আছে। এই স্থানের প্রত্যেক দিক ১০০০ ফুট দীর্ঘ। তাহারও উত্তরে আর একটি দুর্গবদ্ধ স্থান আছে; ইহার মধ্যে উত্তর পশ্চিমাংশে সাহ বোখারির যে সমাধি দৃষ্ট হয়, তাহা কোন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। দেবকোটের নিকটে বাণ পালের স্ত্রী কালারাণীর নামে পরিচিত একটি দীর্ঘিকা পরিদৃষ্ট হয়। তাহার দৈর্ঘ্য ৪০০০ ফুট ও প্রস্থ ৮০০ ফুট।

"দেবকোটের দুর্গপ্রাচীর রক্তবর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত ছিল বলিয়া দেবকোটকে লোকে শোণিতপুর বলিত। এ কালের লোকে অনিরুদ্ধের শ্বশুর ও উষার পিতা বাণের সঙ্গে বাণপালকে মিশাইয়া সহস্রবাহু বাণের সমস্ত বিবরণ বাণপালের প্রতি আরোপ করিয়াছে। বাস্তবিক উষার পিতা বাণ মধ্যভারতের কোন স্থানের লোক ছিলেন। কিন্তু দেবকোট বাণ রাজার পুরী বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত আধুনিক নহে। এমন কি লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রচিত ত্রিকাণ্ড-শেষ নামক সংস্কৃত কোষেও দেবীকোট দেবকোটকে শোণিতপুর ও বাণাসুরের পুরী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।" *

"আইন-ই-আকবরীতে ডিহিকোট সরকার লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত একটি মহাল রূপে লিখিত হইয়াছে। তবকাৎ-ই-নাশিরী গ্রন্থে দেওকোট একটি প্রাচীন নগর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ডাঃ বুকান হ্যামিল্টন বলিয়াছেন—দেবীকোট দমদম মৌজার নামান্তর।

"কানিংহাম দেবীকোটকে একটি মৌজা বলিয়াছেন †

ব্লকম্যান সাহেবের মতে রাজনগরের নাম গঙ্গারামপুর, রাজ দুর্গের নাম "দেবকোট" পুনর্ভবাতীরে দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। ‡

Thomas' Initial coinage of Bengal, Part II:, notes এ লিখিত হইয়াছে, "দেবকোটে বক্তিয়ার খিলিজির সেনানিবাস স্থাপনের পর দেবকোট 'দমদমা' নামে কথিত হইতে থাকে।" §

যে পুনর্ভবাতীরে দেবকোট অবস্থিত, সেই পুনর্ভবাও পুরাণে পুণ্যতীর্থ বলিয়া সুপরিচিত ছিল। করতোয়া মাহাত্ম্যে পুনর্ভবা একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পুণ্ড্রান্তর্গত কোটিকপুর বা দেবকোট যে এককালে জৈন তীর্থরূপে পূজিত হইত, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

* পীঠমালা, ৩৯ পৃষ্ঠা (শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সঙ্কলিত)

* গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৮৭—৮৮ পৃষ্ঠা।

† সাহিত্য ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ ১৬৭ পৃষ্ঠা।

‡ J. A. S. B. for 1873 and 1874

§ বঙ্গদর্শন ১৩১৪। ৩১৯ পৃষ্ঠা।

"রাজাবলীকথা" নামক কণাটী ইতিহাসে লিখিত আছে যে, মহামুনি গোবর্দ্ধন স্বামী, নন্দিমিত্র ও অপরাজিত নামক চারিজন শ্রুতকেবলী পাঁচশত শিষ্য সমভিব্যাহারে জম্বুস্বামীর সমাধি সন্দর্শনে কোটিকপুরে আগমন করেন। সুতরাং কোটিকপুরে জম্বুস্বামীর সমাধি থাকায় উহা জৈন তীর্থরূপে গণ্য এবং ভারতে সুপরিচিত ছিল।

ঐ গ্রন্থেই লিখিত আছে, জৈন ষষ্ঠ শ্রুতকেবলী বিখ্যাত জৈন শাস্ত্রকার ভদ্রবাহু স্বামী (খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন শত শতাব্দীর প্রথম ভাগে) কোটিকপুর নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং ইহা হইতেও কোটিকপুর জৈন তীর্থরূপে গণ্য হইতেছে।

ভদ্রবাহু যে কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, নিম্নলিখিত তদীয় জীবনী পাঠে তাহা প্রতিভাত হইবে।

"ইনি আবশ্যক সূত্র, দশ বৈকালিক সূত্র, উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্র, দশাশ্রুত স্কন্ধ সূত্র, কল্পসূত্র, ব্যবহার সূত্র, সূর্য্য প্রজ্ঞপ্তি সূত্র, আচারাঙ্গ সূত্র ও ঋষি ভাষিত সূত্র নামে দশ খানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করেন। জৈন গ্রন্থে ইনি শ্রুতপ্রাজ্ঞ ও যোগপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মুনিরত্নসূরি তাঁহার এই দশ নির্য্যুক্তিকে ঋগ্বেদের দশ মণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত জাতকম্ভোনিধি, ভদ্রবাহু সংহিতা ও নর্ম্মদাসুন্দরী কথা নামক কয়েকখানি গ্রন্থে তিনি জৈন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। খরতর ও তপাগচ্ছের পট্টাবলীতে তাঁহার জীবনকাল প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি প্রাচীন গোত্র-সম্ভূত ছিলেন। ৪৫ বৎসর গৃহবাসে থাকিয়া উপসর্গহর স্তোত্র, কল্পসূত্র শত্রুঞ্জয় কল্প ও দশ খানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া সতর বৎসরকাল ব্রতাচারী হইয়াছিলেন। তৎ পরে ১৪ বৎসর কাল যোগ প্রধান রূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি ১৭০ বীর গতাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যের কোটবপ্র পর্ব্বতে লোকান্তর গমন করেন।"

* * * *

রাজাবলী-কথা নামক কণাটী ইতিহাসে ভদ্রবাহুর এইরূপ জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। "ভারত খণ্ডে পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মর নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে রাজপুরোহিত সোম শর্ম্মার পত্নী সোমশ্রী একটী সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন। পিতা শুভলক্ষ সমূহ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া স্বীয় পুত্রের কোষ্ঠিফল নির্ণয় করিয়া দেখিলেন যে, কালে এই বালক জৈন ধর্ম্ম পরিরক্ষক হইবে। তদনুসারে তিনি জৈনপ্রথা মত বালকের চৌল ও উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন করাইলেন। একদিন বালক ভদ্রবাহু সঙ্গীদলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময় মহামুনি, গোবর্দ্ধন স্বামী, নন্দিমিত্র ও অপরাজিত নামক চারিজন শ্রুতকেবলী পাঁচ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে জম্বুস্বামীর সমাধি সন্দর্শনে কোটিকপুরে আগমন করেন। মহামুনি গোবর্দ্ধন বালক ভদ্রবাহুর শুভ চিহ্ন সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন যে, এই বালকই শেষে শ্রুতকেবলী হইবে। অতএব ইহার শিক্ষা বিধান আবশ্যক। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সোম শর্ম্মার নিকট উপনীত হইলেন এবং বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতা পূর্ব্ব হইতেই বালকের জিন ধর্ম্ম লাভের বিষয় অবগত ছিলেন। গোবর্দ্ধন স্বামীর শুভাগমনে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে প্রণতিপূর্ব্বক আচার্য্যবরের কথায় স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মাতা সোমশ্রী দীক্ষার পূর্ব্বে একবার পুত্রের দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উভয়ের বাক্যে এবং সম্মতিতে প্রীত হইয়া গোবর্দ্ধন স্বামী ভদ্রবাহুকে লইয়া অক্ষশ্রাবকের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহার অবস্থান, ভোজন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

স্বামীজির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তিনি শীঘ্রই যোগিনী, সঙ্গিনী, প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপ্তি নামক বেদের চারি অনুযোগ, ব্যাকরণ ও চতুর্দ্দশ বিজ্ঞান অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানমার্গে যতই তিনি অগ্রসর হইলেন, ততই তাঁহার সংসার বিষয়ে বিরাগ জন্মিতে লাগিল। দীক্ষা গ্রহণের

পর, তিনি যথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান, তপস্যা ও সংযমাদিতে অভ্যস্ত হইয়া আচার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য-পদ প্রাপ্তির পরই গোবর্দ্ধন শ্রুত কেবলীর তিরোধান হয়।

"একদা পাটলীপুত্ররাজ চন্দ্রগুপ্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রাত্রিতে নিদ্রাবেশে উপর্য্যুপরি ১৬টি স্বপ্ন দেখেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; কিছুতেই তাঁহারচিত্ত সুস্থির হইল না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক তিনি মন্ত্রণাগৃহে নীরবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, ভদ্রবাহু মুনি নানা দিগ্দেশ পরিভ্রমণ করিয়া রাজোদ্যানে উপনীত হইয়াছেন। রাজা অমাত্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া মুনি সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজার অভিবন্দনায় তুষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে উক্ত ষোলটি স্বপ্নের বিষয় অবগত করাইলেন। তিনি তাহার এইরূপ অর্থাবগতি করেন;—(১) সম্যক্ জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইবে, (২) জৈন ধর্ম্মের অবনতি হইবে এবং তোমার বংশধরগণ সিংহাসনে থাকিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। (৩) দেবতাগণ আর ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না। (৪) জৈনগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। (৫) বর্ষার মেঘে জলধারা বর্ষণ করিবে না। (৬) এবং সেই অনাবৃষ্টি হেতু শস্যাদিও অজন্মা হইবে, সত্যজ্ঞান লোপ পাইবে এবং কতকগুলি ক্ষীণ জ্যোতিঃ ইতস্তত: বিকীর্ণ হইবে। (৭) আর্য্য খণ্ডে আর জৈন ধর্ম্ম বিস্তার পাইবে না, (৮) অসত্যের প্রতিপত্তি এবং সত্যের লোপ হইবে, (৯) লক্ষ্মী নিম্নগামিনী হইবেন, (১০) রাজা রাজস্বের ষষ্ঠাংশ লাভে তৃপ্ত না হইয়া অর্থলোলুপ হইবেন এবং অধিকলাভের প্রত্যাশায় প্রজাপীড়ন করিবেন, (১১) মনিব যৌবনে ধর্ম্মগত প্রাণ হইয়া বার্দ্ধক্যে সকলই বিসর্জ্জন করিবেন। (১২) উচ্চ বংশীয় রাজা নীচ সহবাসে কলুষিত হইবেন, (১৩) নীচ উচ্চকে উৎসাদিত করিয়া সমতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইবেন, (১৪) রাজন্যবর্গ অযথা কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবেন, (১৫) নিম্ন শ্রেণীর লোকে অন্তঃসার-শূন্য বাক্যালাপ দ্বারা জ্ঞানীদিগকে উপেক্ষা করিবেন এবং (১৬) দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে বসুন্ধরা শস্যশূন্যা হইবে।

"ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বিদায় দিয়া, একদা একাকী পরিভ্রমণ কালে একটি বালকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছে। রাজা চন্দ্রগুপ্ত এই দৈব প্রকোপ শান্তির জন্য বিবিধ যাগের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, তিনি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বাণপ্রস্থাচারী ও ভদ্রবাহুর সহচর হইলেন।

"ভদ্রবাহু জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, এই মহামারি সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে কোনরূপ শস্যাদি হইবে না। অনাহারে লোকে প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং তাহাদের ধর্ম্মও কলুষিত হইবে। তখন তিনি স্বীয় দ্বাদশ সহস্র শিষ্য ও অন্যান্য লোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, তিনি একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক অন্তিমধ্যানে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই স্থানে তখনও দুর্ভিক্ষের পূর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রিয় শিষ্য বিশাল মুনিকে সদলে চোল মণ্ডলে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অনুমতি ক্রমে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তই তাঁহার সঙ্গে রহিল। তিনি স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, তথায় তাঁহার পাদপদ্ম পূজায় নিরত রহিলেন।"*

"রাজাবলী বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের স্বপ্ন বিবরণী সত্য না হইলেও, দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের শ্রবণ বেগ গোড়ের নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রগিরি-শিখরস্থ প্রাচীন কণাড়ী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে,

* বিশ্বকোষ, ১৩শ ভাগ, ২৫৮ পৃষ্ঠা।

গৌতমগণকরের শিষ্য ভদ্রবাহু স্বামী উজ্জয়িনীতে জ্ঞান-যোগে এই দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির বিষয় অবগত হন। সাধারণকে এই ভাবী বিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুলোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। নানা গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তিনি কোটবপ্র পর্ব্বতে আসিয়া আপন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। এইখানে অন্তিম সমাধিতে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে তিনি সকলকে বিদায় দিয়া একটিমাত্র শিষ্য রাখিলেন। তৎপরে সন্ন্যাস ব্রতাচরণ পূর্ব্বক তিনি সপ্তশত ঋষির অভীষ্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন।

"এই সুপ্রাচীন 'শিলালিপি-লিখিত ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্য যাত্রা রাজাবলীতেও সমর্থিত হইয়াছে। বিশাখের চোল মণ্ডলে গমন ও চন্দ্রগুপ্তের গুরুর সঙ্গে অবস্থিতিরও আভাস নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।"

"হেমাচার্য্যের স্থবিরাবলী চরিত পাঠে জানা যায়, ধার নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষের কিছু পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়, সে সময় জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীসঙ্ঘে ৫০০ শত ভিক্ষু মিলিয়া শ্রুত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না। তখন ভদ্রবাহু নেপাল দেশে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীসঙ্ঘ হইতে দুইজন মুনি তাঁহাকে আহ্বান করিতে গেলেন, কিন্তু তিনি দ্বাদশবর্ষব্যাপী ধ্যানাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীসঙ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন না। শ্রীসঙ্ঘ হইতে আরও দুই-জন মুনি গিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘবাহ্য করিবার ভয় দেখাই-লেন। ভদ্রবাহু শুনিলেন যে, স্থূলভদ্র আচার্য্য দশ পূর্ব্ব অবগত হইয়াছেন, এখন ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকেই অবশিষ্ট চারি পূর্ব্ব প্রদান করিয়া বলিলেন, যেন আর কাহাকে তিনি এই শেষ চারি পূর্ব্ব প্রদান না করেন। তদবধি স্থূলভদ্র প্রধান আচার্য্য হইলেন।"*

"মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহ ত্যাগের পর সুধর্ম্ম স্বামী আবার জম্বু স্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জম্বু প্রভবকে, প্রভব শয্যম্ভবকে, শয্যম্ভব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র সম্ভূতি বিজয়কে এবং সম্ভূতি বিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন। এই কয়জনই শ্রুত কেবলী নামে বিখ্যাত হন।

তৎপরে পাটলীপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে স্থূলভদ্র পট্টধর বা সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পট্টাবলী গ্রন্থে স্থূলভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কেবলী ও পরবর্ত্তী পট্টধরগণের পর্য্যায়ক্রমে অভিষেক কার্য্যাদি লিপিবদ্ধ আছে।"*

ভদ্রবাহু বিখ্যাত জৈন শাস্ত্রকার ও জৈনদের ষষ্ঠ শ্রুত কেবলী। জৈনগ্রন্থে তিনি শ্রুতপারগত যোগপ্রধান এবং ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহার রচিত দশখানি নির্যুক্তিকে জৈন শাস্ত্রকারেরা ঋগ্বেদের দশ মণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সে সময় সমস্ত ভারতে এক ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না। পাটলীপুত্ররাজ জগদ্বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার মানব দুর্ল্লভ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্য গমন কালে তাঁহার দ্বাদশ সহস্র শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। অন্তিমকালে তিনি সপ্তশত ঋষির অভীষ্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন।

এ হেন মহাপুরুষ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে স্থান সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই পবিত্র তীর্থ মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, এই মহাপুরুষ বাঙ্গালী; বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন। ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কোন জৈন মহাপুরুষ বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না আমরা জানিতে পারি নাই।

বক্তিয়ার খিলিজি এ প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিবার সময় পর্য্যন্ত দেবকোট সুপরিচিত ছিল। বক্তিয়ার খিলিজি দেবকোটে সেনা-নিবাস সংস্থাপিত করিয়া-

* বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

* বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, ১৬১ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। তিনি দেবকোট হইতে দশ সহস্র সেনা লইয়া আলি মেচের সঙ্গে কামরূপ ও তিব্বত বিজয়ে বহির্গত হন। কিন্তু করতোয়া নদী তাঁহাদের গমন পথের মহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। বক্তিয়ার খিলিজি বর্দ্ধন-কোটে গিয়া দেখিলেন, করতোয়া এরূপ বিস্তৃত যে তাহা পার হইবার উপায় নাই। সুতরাং দশদিন পর্য্যন্ত উত্তরাভিমুখে গিয়া, একটি প্রস্তর সেতু যোগে কোন প্রকারে করতোয়া পার হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় বিফল মনোরথ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কামরূপে ফিরিয়া দেখিলেন, তিনি যে সেতুযোগে করতোয়া পার হইয়াছিলেন, তাহা কামরূপরাজ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়াছে। সুতরাং তিনি করতোয়া পার হইবার আয়োজন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে কামরূপরাজ কর্ত্তৃক অবরোধের আয়োজন দেখিয়া, দশ সহস্র সেনাসহ নিরুপায় ভাবে করতোয়ায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুঃখের বিষয়, দশ সহস্রের মধ্যে কেবল মাত্র এক শত সেনাসহ বক্তিয়ার জীবন্মৃত অবস্থায় দেবকোটে ফিরিয়াছিলেন। ক্লান্তি ও তদুপরি চিত্তক্ষোভে দেবকোটেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

বক্তিয়ারের সমাধিস্থান বলিয়া দেবকোট মুসলমানদের নিকটেও একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

দেবকোট এক্ষণে বিজন বনে পরিণত হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রাণ স্বরূপ, জ্ঞান-গরিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহোদয় বলেন, "দেবীকোটের ধ্বংসাবশেষ বহু বিস্তৃত। এইখানে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির লিপিযুক্ত একটি কষ্টি পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায়, উক্ত গৌড়পতি এইখানে একটি বিশাল শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রথম মহীপাল দেবের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের মহারাজের প্রাসাদ বাণনগরে পুরাকীর্ত্তির অনেকগুলি নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে। এগুলির কারুকার্য্য দেখিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। ইহা ব্যতিরেকে বাণনগরেও অনেকগুলি স্তম্ভাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাণনগরের প্রকৃত প্রত্নতত্ত্বদের অনুসন্ধানকারিগণের কেবল উপরিভাগে প্রাপ্ত পুরাকীর্ত্তির নমুনা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলে চলিবে না। তাঁহাদিগকে মাটীর নীচেও নামিতে হইবে। বিশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে খনিত্র হস্তে মৃত্তিকা সরাইয়া ফেলিলে তবে সেই প্রাচীন বাণনগরের প্রাচীন কীর্ত্তি নিচয়ের সন্ধান পাইতে পারিবেন।"*

দেবকোট স্থান-মাহাত্ম্যে যে কিরূপ গরীয়ান্ ছিল, তাহা এই সকল ঘটনা হইতে প্রতিভাত হইতেছে। বাঙ্গলার অতি অল্প পল্লীর ভাগ্য এরূপ গৌরবোজ্জ্বল। সুতরাং কি হিন্দু, কি জৈন, কি মুসলমান সকলেরই এই নগরটিকে সমাদর এবং পূর্ব্বের ন্যায় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করা উচিত। আমরা কর্ম্মিগণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা ক্ষমতা লইয়া এই লুপ্ত তীর্থটির প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হউন। স্থানটি বারেন্দ্রের মধ্যে সুতরাং বারেন্দ্র অনুশাসন সমিতির সাহায্যের দাবী রাখে।

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু।

* সাহিত্য ১৩২১, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

ভাগ্যবানের উপর অস্ত্রচিকিৎসা

(গল্প)

খাঁটী হিন্দু, ব্রাহ্মণ "নিয়োগী" বংশকে উজ্জ্বল করিয়া যেদিন শ্রীমান অমরলাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন আকাশ হইতে ঠিক পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায় না; তবে প্রাচীন ব্যক্তিরা বলেন যে, সেদিন নাকি আকাশ ভরা মেঘ ও বর্ষার বৃষ্টি ধারার মধ্যেও মাঝে মাঝে রোদ উঠিয়াছিল। সকলে সেদিন নাকি একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে ছেলেটি ভাগ্যবান হইবে।

ভাগ্যবান তিনি কেমন হইয়াছিলেন, তাহা কেহ ঠিক জানিতে পারে নাই, তবে কিছু বয়স হইলেই তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কোন এক মুহূর্ত্তে তাঁহার নাম হইয়া গিয়াছে "অমলরাল"। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষোভ হয় নাই,—কারণ তিনি কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "অনন্ত-জন্মস্মৃতি" হইতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি একজন "অমর" লোকের জীব, তাই তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজন্মগুলি, কেতাবে ছাপান বংশ তালিকার মত সবটাই তিনি পড়িয়া ফেলিলেন, আর দেখিলেন তাঁহার ঠিক বিগত জীবনটি ছিল—ইংলণ্ডে।

গৃহে অনুষ্ঠিত সমস্ত হিন্দু আচার ব্যবহারের মধ্যেও অমরলাল বুঝিয়া লইলেন যে, তাঁহার ভিতরটা একেবারে ইংরেজী। শেষে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাহিরের দিকটাও বদলাইয়া ইংরেজী করিয়া লইলেন। তখন 'খোল-নলচে' বদলানো হুঁকোর মত নিজের নামটী, পৈত্রিক নাম "অমরলাল নিয়োগী" স্থলে করিয়া ফেলিলেন "মিষ্টার আমারাল্ আলন্ অগ্‌গি" (Mr. Amaral Alne Oggy) ইংরাজী অক্ষরগুলি ঠিক রাখিলেন, খালি 'নিয়োগীর' 'গ'টায় দ্বিত্ব করিয়া কঠিন করিয়া লইলেন, আর অক্ষরগুলি ভিন্নভাবে সাজাইয়া নূতন নামটা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

নামটা যখন ঠিক হইল, তখন চেহারাটি যতটা সম্ভব দোরস্ত করিয়া লইলেন, আর সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে চেহারাটি একরকম ভালই ছিল। মিষ্টার অগ্‌গি সেদিন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ভিতর বাহির সবটাই ইংরেজী। একবার না দুইবার, তাঁহার বিলাত যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু মিষ্টার অগ্‌গি দেখিলেন, সেটি অপরের পক্ষে যেমনই হোক, তাঁহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক।

তাই তাঁহার কোথাও যাওয়া হইল না—এই দেশেই থাকিয়া তিনি খাঁটী সাহেব বনিয়া গেলেন।

মিষ্টার অগ্‌গি লেখাপড়া শিখিলেন, কারণ একটা কিছু তো করা চাই; তা বোধ হয় জগদীশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাও একটু ছিল, লেখাপড়াটা ভালই শিখিলেন।

২

একটা কিছু কাযকর্ম্ম করা চাই, তাই মিষ্টার অগ্‌গি হইলেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

চাকুরীর প্রথম দিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষানবিশী করিয়া মিষ্টার অগ্‌গি সামাজিক জীবনের উপযোগী সমস্ত ইংরেজী চাল-চলনগুলি ঠিক করিয়া লইলেন। খাবার টেবিলের ধারে, এবং বাহিরে যাইবার সময়, নিজের সঙ্গে বড় বড় বিলাতী কুকুর, বসিবার ঘরে বিলাতী ছবি, ঘরের ধাপে ফুলের টব, মুখে প্রায় সর্ব্বদা (কারণ এজলাসে বসিবার সময় ও আহার নিদ্রার অবস্থার বাদ দিতে হইত) দামী ভাল চুরুট, ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পদদ্বয় রীতিমত দূরত্বে রাখিয়া চুরুটের ধূম্রোদ্গম, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে 'টাকাটা সিকেটা' বাহির করিতে হইলে, বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া বাম হস্ত ট্রাউজার্সের পকেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কুঞ্চিত বদনে "পার্স" উত্তোলন প্রভৃতি কায়দাগুলি তাঁহার

বেশ ঠিক হইয়া উঠিল। তার পর নাকি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বাড়ীতে বড় বড় ভোজ দিয়া, দোকানে অনেক টাকার 'বিল' বাকী রাখিতে লাগিলেন; ধারে জিনিষ না নিলে কখনই পুরোপুরি ষ্টাইল হয় না। গৃহিণী বেচারী আপত্তি করাতেও এ সব ষ্টাইলগুলি তিনি যত্ন সহকারে ঠিক রাখিলেন; তথাপি মিষ্টার অগ্‌গি ইংরেজ ক্লাবের মেম্বর হইতে পারিলেন না।

পৈত্রিক কিছু অর্থ ছিল। মাহিয়ানার যে কয়টা টাকা, তাহা তো মাসের পাঁচ দিন যাইতেই একটাকা সাত আনায় গিয়া দাঁড়াইত। তাই ঘর হইতে টাকা আনিয়া মিষ্টার অগ্‌গি পাঁচ বৎসর ষ্টাইল চালাইলেন।

চাকুরীতে নানাস্থানে ঘুরিলেন, পাঁচ বৎসর মধ্যে ষ্টাইল ব্যতীত আর কি কি "শিক্ষা" পাইলেন (!) সে কথায় আর কায কি?

তথাপি ক্লাবের মেম্বর না হওয়ায় তাঁহার বুকে কি একটা শেল বিঁধিয়া রহিল।

৩

ক্লাবের মেম্বর তখনো হওয়া যায় নাই। সে সময় মিষ্টার অগ্‌গি বাদলহাটী জেলায় চাকুরী করিতেছেন।

সে বৎসর "সেনসস্‌" হইতেছিল,—প্রত্যেককেই নিজের নাম, জাতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি লিখিয়া 'রিটার্ণ' দিতে হইল।

কেরাণী যখন মিষ্টার অগ্‌গির নিকট ফরম লইয়া আসিল, তখন তিনি প্রথমে চটিয়া গেলেন। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া, আইন নিয়ম ইত্যাদি দেখিয়া শেষটায় লিখিলেন,—"জাতি, Citizen of the World (জগতের নাগরিক); ধর্ম্ম, অ্যাগ্‌নষ্টিক (অজ্ঞেয়বাদী)।

তাঁহার এই রিটার্ণ নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ না হওয়ায় জেলার কালেক্টার মিষ্টার হ্যামফোর্ড সে দিন মিষ্টার অগ্‌গিকে কি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আর তিনি তদনুসারে পুনরায় কি ভাবে নূতন 'রিটার্ণ' দিয়াছিলেন, যে বিষয়ে সরকারী আফিস সংক্রান্ত কাগজের বাহিরে কোন সংবাদ প্রচারিত নাই।

এই কালেক্টারটি ছিলেন স্নেহশীল, সদাশয়। তিনি বাইশ বৎসর রাজকার্য্য করিতেছেন। মিষ্টার অগ্‌গি বেশ কার্য্যতৎপর, অথচ বয়সে নবীন; তাঁহাকে মিষ্টার হ্যামফোর্ড একটু স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন।

সেদিন মিষ্টার অগ্‌গির গৃহে কালেক্টার ও তাঁহার পত্নী চা খাইতে আসিয়াছেন।

তাঁহারা গৃহসজ্জায় ও বাড়ীর সব আদব কায়দায় দেখিলেন, মিষ্টার অগ্‌গি যেন প্রায় পুরোপুরি ইংরেজ।

কালেক্টার-পত্নী গৃহের দেওয়ালে লাগান বিলাতী ছবিগুলির খুব সুখ্যাতি করিয়া তাঁহার স্বামীকে অনবরত বলিতেছিলে—

"Look dear, how fine! That's Switzerland I'm sure!" (দেখনা কেমন চমৎকার, নিশ্চয় এটী সুইজারল্যাণ্ডের দৃশ্য!)

"Ah, there—Iceland, dreary ice, is'nt it?" (আঃ ঐ যে, এটি আইসল্যাণ্ড, খালি বরফ, নয় কি!)

"Now—that's bright and sunny,—Brighton in England,—Dear old Brighton! That's charming, is'nt it?" (আবার দেখ, কেমন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে সঞ্জীবিত, ইংলণ্ডের ব্রাইটন নগর; আহা, সেই আমাদের ব্রাইটন, কেমন সুন্দর, নয়!)

বেশ ধুমধামে সময় কাটিল। যাইবার সময় কালেক্টার মিষ্টার হ্যামফোর্ড, মিষ্টার অগ্‌গির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"Oggy, just a word." (অগ্‌গি, একটা কথা শুনবে?)

মিষ্টার অগ্‌গি বলিলেন—"Yes,right you are." (হাঁ, নিশ্চয়)।

"অগ্‌গি তোমার বয়স নিশ্চয়ই অল্প, আমার ঠিক বিশ্বাস তাই।"

"আজ্ঞে হাঁ, বোধ হয়—"

"কোন বোধ হয় নাই, তুমি নিশ্চয় ত্রিশ বৎসরের কম বয়স।"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার বয়স এই প্রায় আঠাশ বৎসর হবে।"

"আঃ, তাই, সেই জন্যই তোমার বাড়ীতে আমি একখানিও ভারতবর্ষীয় ছবি দেখলাম না। আমার কথা ভাল ভাবে গ্রহণ করছো বোধ হয়?"

"হাঁ, তাতো বটেই, তা কেন করবো না!"

* * *

তার পর তখনকার মত "গুড্ নাইট, গুড্ নাইট।"

৪

সাধনায় তো সিদ্ধিলাভ হইবারই কথা। তাহা না হইলে এতকাল জগৎ চলিল কি করিয়া?

তাই মানুষ সাধনা প্রভাবে একদিন বোধ হয় 'ক্লাবের' মেম্বর পর্য্যন্তও হইতে পারে।

* * *

আরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মিষ্টার অগ্‌গি এখন প্রসাদপুর জেলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

তাঁহার তখন "দোটান" অবস্থা। মনের মধ্যে একটা সুর বাজিয়া উঠিতেছে, "আর কেন?" আবার অপর একটা সুর আওয়াজ দিতেছে, "দেখাই যাক্ না।" তার পর মনের শেষ সুরটারই একদিন জয় হইল,—আগের সুরটা তখন একেবারে চোরের মত লুকাইয়া গেল।

* * *

বাদলহাটি হইতে আসিবার সময় তথাকার কালেক্‌টার মিষ্টার হ্যামফোর্ড প্রসাদপুরের কালেক্টার মিষ্টার ব্রান্‌সলা সাহেবের কাছে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মিষ্টার অগ্‌গির সম্বন্ধে অনেক শ্লাঘ্য কথা উল্লিখিত ছিল।

পত্রখানিতে একটা কথা ছিল এইরূপ—

"A very fine fellow, I tell you, though wants a bit of looking after, as you will see. But don't mistake me, he has the real grit in him."

(খাসা লোক, যদিও ওর উপর একটু নজর রাখা দরকার, তুমি তা নিজেই টের পাবে। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না, ওর ভিতরে খাঁটী জিনিষ আছে।)

চিঠিখানি ডাকে আসিয়াছিল। একাকী দপ্তরখানায় বসিয়া মিষ্টার ব্রান্‌সলা ডাক দেখিতেছিলেন,—তার মধ্যে সেই চিঠিখানি পড়িয়া তিনি একেলাই খুব হাসিলেন।

একাকী বসিয়া হাসিলে সেটা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ ত করেই, তাহা দেখিলে আত্মীয় স্বজনের মনে একটা আশঙ্কাও হয়।

মিসেস্ ব্রান্‌সলা আসিয়া বলিলেন—"Well, How is that?" (বটে—সে কি?)

মিষ্টার ব্রান্‌সলা বলিলেন—"ওঃ ভারি মজার কথা, আমি তোমায় বলবো; কিন্তু তুমি চুপ থেকো।"

* * * *

প্রসাদপুর আসিবার সময় বাদলহাটীর কয়েকজন ইংরেজ প্লান্টার, মিষ্টার অগ্‌গিকে কতকগুলি চিঠি দিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার ষ্টাইল এবং সামাজিক ব্যবহার-প্রণবতার বিষয়ে খুব সুখ্যাতি ছিল।

প্রসাদপুর ক্লাবে মিষ্টার অগ্‌গিকে লওয়া হইবে কি না এ বিষয়ে যখন সমালোচনা হইতেছিল, তখন ঐ চিঠিগুলি তাঁহার সমর্থন করিল।

তার উপর উদারচেতা মিষ্টার ব্রান্‌সলা বলিলেন—"Oh, a very fine fellow. Hamford speaks so well of him." (খাসা লোক। হ্যামফোর্ড ওর খুব সুখ্যাতি করেছেন।)

মিষ্টার অগ্‌গি তিন মিনিটের মধ্যে প্রসাদপুরের ইংরেজ ক্লাবের মেম্বর হইয়া গেলেন।

* * *

সেদিন কি আমোদ!

মিষ্টার অগ্‌গি ইংরেজী সুরে একটা গান গাহিতে গাহিতে কুকুর-সহ গৃহে আসিলেন।

ক্লাবের মেম্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার অগ্‌গি প্রসাদপুর আসিয়া আরও বড়রকম আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা তাঁহার জন্য পুরাতন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলাটি মেরামত করাইয়া দিলেন। সে বাড়ীর চারিধারে ফাঁকা ময়দান, মস্ত মস্ত ঝাউগাছ, বাড়ীতে বড় বড় রুম।

তখন মিষ্টার অগ্‌গির দেহবদ্ধ প্রাণটা যেন একটা scope (প্রসারণোপযোগী ক্ষেত্র) পাইল; হাঁফ ছাড়িয়া তিনি সেদিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "অনন্ত-জন্মস্মৃতি" হইতে আবৃত্তি করিলেন—

"Trailing clouds of glory do we come,
From God who is our Home."

"God" কথাটা বলিতে প্রথমে একটু বাধিলেও, তার পর তিনি সেদিন দেখিলেন যে "God"কে বিশ্বাস করাটাই ভাল। নচেৎ সহসা তাঁহার এত সৌভাগ্য হইবে কেন? বিশ্বাস করিলে ক্ষতিই বা কি? সে দিন হইতে মিষ্টার অগ্‌গি আর "অ্যাগ্‌নষ্টিক" (অজ্ঞেয়-বাদী) নন, "থীষ্টিক" (ঈশ্বরবাদী) হইলেন।

ভার্য্যা রুক্মিণী দেবী তাঁহার "From God who is our Home শুনিয়া বলিলেন—"আঃ, তবু বাঁচলুম!"

* * *

রুক্মিণীকে মিষ্টার অগ্‌গি আদর করিয়া ডাকিতেন "Rucky"—(রাকি) যদিও গৃহিণীটি শিক্ষিতা হইলেও নিতান্তই হিন্দু গেরস্ত ঘরের মেয়ে।

ক্লাবের মেম্বর হওয়ার পূর্ণ উল্লাসে মিষ্টার অগ্‌গি সেদিন গৃহে আসিয়া ইংরেজী গান গাহিতে লাগিলেন—

Tira, rara, ra,—my Rucky,
La-la, la-la, Lo?—I'm lucky!
(তায়রা, রা-রা, রা,—মোর 'র্যাকি'
লা-লা, লা-লা, দেখ আমি 'লাকি!' (ভাগ্যবান)

আনন্দে মিষ্টার অগ্‌গি 'পল্কা' নাচের 'ষ্টেপ' এ নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শেষ পদটা বারবার গাহিয়া, নিরীহ গোবেচারি স্ত্রীকে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন।

মিষ্টার অগ্‌গির সম্মানে ক্লাবে একটা খানা হইল। রাত্রিতে খানার পরবর্ত্তী মজলিসে (after-dinner function এ) মিষ্টার অগ্‌গি সেক্‌সপিয়রের বিভিন্ন চরিত্রগুলি, যথা ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, শাইলক, পোর্শিয়া, ফলষ্টাফ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর মানব চরিত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাংশ-গুলি এমন সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিলেন, প্রত্যেকটির স্বকীয়ত্ব ঠিক রাখিয়া এমন বিশুদ্ধ স্পষ্ট ইংরেজী উচ্চারণে সমস্ত কথাগুলি ব্যক্ত করিলেন যে, ক্লাবের সকলেই সেদিন এক বাক্যে বলিয়াছিলেন—মিষ্টার অগ্‌গিকে না লইলে ক্লাবের যে সামাজিক ক্ষতি হইত তাহা একেবারে irreparable (অ-সংশোধনীয়)।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা আনন্দে একটা চুরুট মুখে দিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"Oh, I'll get him through." (ওঃ, আমি ওকে ঠিক চালিয়ে নেবো)

মিসেস ব্রান্‌সলা তখন বলিতেছেন—"Nice, is'nt it? Oh, how nice! What a shame if you had shut him out!" (কেমন সুন্দর, নয় কি? বাস্তবিক কেমন সুন্দর! উহাকে তুমি প্রবেশাধিকার না দিলে কি লজ্জার বিষয় হতো!)

কয়েকদিন খুব ধুম-ধামে খানাপিনা চলিল।

মাহিয়ানার চারিশত টাকায় আর চলে না। বাড়ীর জমানো টাকা খরচ হইয়া গিয়া তখন তাহার ভূতপূর্ব্ব সংখ্যাটি আর একটা নূতন অঙ্কের হিসাবে গিয়া দাড়া-ইয়াছে। 'ধার' বলিয়া একটা অসভ্য শত্রু 'সুদ' নামক শূলের তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দ্বারা যখন তখন খোঁচা দিয়া একটা 'বে-সুরো' রাগিণী তুলিতেছে, সেটা মাঝে মাঝে যেন

সমস্ত টাইলটাই মাটী করিয়া দিতেছে। আ! 'জয়েন্ট' সাহেবের সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা, তার ঝাউ গাছ আর বিস্তীর্ণ কক্ষ এবং কম্পাউণ্ড লইয়া ঠাট্টা করিতেছিল কি না কে জানে! তাহারা তো অগ্‌গি সাহেবের পূর্ব্বে আরও কত সাহেব দেখিয়াছে!

* * * * *

রুক্মিণী দেবী কড়া ধাতের মেয়ে হইলেও, স্বামীকে ফিরাইতে পারেন নাই। তিনি ইংরেজী প্রণালীতে খান না, ... সঙ্গে বসেন। স্বামী যাহা চান, তাই দিয়াই তাঁহাকে ফেরানো যায় কি না!

হায়, যদি কেহ মিষ্টার আমারাল্ আল্‌ন অগ্‌গিকে শ্রীঅমরলাল নিয়োগী করিয়া দিতে পারিত!

মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা রুক্মিণীকে কন্যার মত দেখিতেন। তাঁহাদের একটি মাত্র মেয়ে ছিল। সেটি মারা গিয়াছে; এ-মেয়েটির মুখখানি যেন তারি মত!

একদিন মিসেস ব্রান্‌সলার কাছে রুক্মিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহারও পিতা-মাতা নাই।

* * *

মিষ্টার ব্রান্‌সলা সেদিন তাঁহার পত্নীকে বলিলেন—"এবার একটা অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক।"

মিসেস ব্রান্‌সলা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সে কি? কেন?"

৮

একদিন মিষ্টার অগ্‌গির গৃহে খানা চলিতেছে। তাঁহার একটি প্রিয় কুকুর ছিল, সেটি একটি ব্রিটিশ টেরিয়ার।

খাবার সময় মিসেস অগ্‌গি টেবিলের ধারে কুকুর আসা কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। তাই স্বামীর অলক্ষিতে মাঝে মাঝে তিনি এই ভাগ্যবান জন্তুটিকে বাঁধিয়া রাখিতেন।

তথাপি কোন কোন দিন সেটা ছাড়া থাকিত, আর সেই দিন খাবার সময় কাছে আসিবামাত্র মিষ্টার অগ্‌গি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তবে খাইতে বসিতেন। মিসেস অগ্‌গি তার পর তাঁহাকে হাত মুখ ধোয়াইয়া তবে খাইতে দিতেন।

* * * *

সেদিন রাত্রিতে মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা তাঁহাদের গৃহে খাইতে আসিয়াছেন।

খাবার সময় যাই কুকুরটি কাছে আসিল, তখনই মিষ্টার অগ্‌গি খাইতে খাইতেই হাতের ছুরি কাঁটা রাখিয়া কুকুরের মুখ চুম্বন করিলেন, আর বলিলেন, "Fine specimen of a British terrier, is'nt he?" (খাসা ব্রিটীশ টেরিয়ার, নয় কি?)

কথাটি তিনি বলিলেন মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলার দিকে মুখ ফিরাইয়া।

তার পর আবার মিষ্টার অগ্‌গি খাইতে যাইবেন, তখন রুক্মিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "You had better go and wash your mouth". (তুমি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এস) অতিথিদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে একটু উঠে যাবার জন্যে আপনাদের অনুমতি পেতে পারি কি?"

মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা এক সঙ্গে বলিলেন—"নিশ্চয়, ওঁর ওঠা উচিত।"

মিষ্টার ব্রান্‌সলা একটু হাসিয়া বলিলেন—"যদিও এটা একটা আপদের বিষয় সন্দেহ নাই।"

মিষ্টার অগ্‌গি স্ত্রীকে বলিলেন—"কি করে আমি উঠতে পারি? খানার টেবিল থেকে এখন ওঠা ভারি বে-দস্তুর কায হবে যে!"

মিষ্টার ব্রান্‌সলা তখন মনে মনে বলিলেন—"তা আরো খারাপ এবং এখন খেলে তার চেইতেও খারাপ হবার কথা।"

কিন্তু এ কথা মুখে বলিলে নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর প্রতি রূঢ় হইবে ভাবিয়া মিষ্টার ব্রানসলা তাহা প্রকাশ্যে না বলিয়া শুধু বলিলেন—"দস্তুরের কথা ছেড়ে দাও, অগ্‌গি। উনি যা বললেন তাই কর, তার পর এ বিষয়ে আমরা কথা কইব।"

* * *

মিষ্টার অগ্‌গি নির্দ্দেশমত কার্য্য করিলেন—কিন্তু একটা অস্ত্রের খোঁচা কোথায় গিয়া লাগিল।

তার পর খানার টেবিলে হাসিটাও যেন আর তেমন জমিল না।

স্বামীর হৃদয়ে কোথায় আঘাত লাগিল, মিসেস অগ্‌গি তাহা টের পাইলেন। তাঁহার চক্ষুতে তখন জল আসিতেছিল।

৯

সে রাত্রিতে খানার পর মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা অনেকক্ষণ মিষ্টার অগ্‌গির গৃহে থাকিয়া গেলেন।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা মিষ্টার অগ্‌গিকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া কি কি তাঁহাকে বলিলেন।

* * *

তার পর মিষ্টার ব্রান্‌সলা মিষ্টার অগ্‌গিকে বলিলেন—"Oh, don't be glum ; come now." (যাও, বিমর্ষ হয়ে চুপ করে থেকো না, এস)

তাঁহারা ড্রইং রুমে গেলেন।

সেখানে মিষ্টার ব্রান্‌সলা এবং তাঁহার পত্নী, মিষ্টার অগ্‌গির ইংরেজী আবৃত্তির খুব সুখ্যাতি করিয়া আবার তাঁহাকে বেশ তাজা করিয়া লইলেন।

* * * *

মিষ্টার ব্রান্‌সলা বেশ সংস্কৃত জানিতেন, অনেক শ্লোক তাঁহার মুখস্থ ছিল।

মিষ্টার অগ্‌গিও ভাল বাংলা ও সংস্কৃত জানিতেন, কিন্তু সেই ভাষাগুলি নেহাৎ "এদেশী," তাই সেগুলি যে তাঁহার জানা ছিল এ কথা প্রাণান্তেও তিনি জনসমাজে প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার কালিদাসের শ্লোক আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনেক মুখস্থ ছিল,—সেগুলি গৃহে বসিয়া মধ্যে মধ্যে সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু বহির্জগতে এ কথা কেহই জানিত না। রুক্মিণীর উপর কড়া নিষেধ ছিল, তাই তিনি এ কথা কখনও প্রকাশ করেন নাই।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা বলিলেন—"আমি ভাল বলতে পারবো না বলে' সেদিন ক্লাবে সংস্কৃত শ্লোকটা বলি নি। নইলে—তা যা হোক, আজ তো প্রাইভেট গ্যাদারিং, যদি কেউ কিছু মনে না করেন—"

মিষ্টার এবং মিসেস অগ্‌গি বলিলেন—"সে কি! কেউ আবার কি মনে করবে?"

* * *

তার পর মিষ্টার ব্রান্‌সলা আস্তে আস্তে, সযত্ন চেষ্টায়, বিশুদ্ধ উচ্চারণে রঘুবংশ হইতে আবৃত্তি করিলেন, "সঞ্চার-পূতানি দিগন্তরাণি।"

মিষ্টার অগ্‌গির তখন মনে পড়িল তার পরের পংক্তি—"কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।" কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা কুমারসম্ভব হইতে আবৃত্তি করিলেন—"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি।"

তিনি দ্বিতীয় পংক্তি সমাধা করিবার পূর্ব্বেই মিষ্টার অগ্‌গি মনে মনে পড়িয়া ফেলিলেন—"ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার" পর্য্যন্ত! মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা তখন বলিলেন—"কালিদাস কি জাঁকালো লোক ছিলেন! আজ তিনি কেবল 'কবি কালিদাস', সমস্ত যুগ এবং সমস্ত দেশমণ্ডলীর পক্ষে কেবল তাই। কেবল মাত্র স্থানীয় নরপতির সভাকে যিনি রচনা-চাতুর্য্যে সঞ্জীবিত করে' রাখতেন, আজ আর তিনি শুধু তাই নন। তুমি কি বল অগ্‌গি!

মিষ্টার অগ্‌গি বলিলেন—"তা বটেই তো।" শুধু এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু তখন মিষ্টার অগ্‌গির মনে পড়িতেছিল কালিদাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"আজ তুমি 'কবি' শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী, কোথা গেল আজ,
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ-অধিরাজ!"

মিসেস অগ্‌গি স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন, ইচ্ছা তিনি একটু বাংলা আবৃত্তি করেন। তাহা হইল না।

মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা রুক্মিণীর দিকে একটু চাহিলেন।

* * * *

মিষ্টার ব্রান্‌সলা মিষ্টার অগ্‌গিকে বলিলেন, "তোমাদের দেশে শুনছি রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। আমার দুর্ভাগ্য বাংলা কবিতা বোঝবার মতন বাংলা জ্ঞান আমার নাই; আর এ বয়সে কি নতুন করে কবিতা পড়তে শেখা যায়? এখন যেন মৃত্যুই সকলের চেয়ে বড় কবিতা।" এই বলিয়া তিনি ডাণ্টে হইতে মৃত্যু বিষয়ক একটি অংশ আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "বাংলায় এমন আছে কি না জানি না।"

মিষ্টার অগ্‌গির তখন মনে পড়িতেছিল রবীন্দ্রনাথের লিখিত মৃত্যু বিষয়ক কবিতা,—

"ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা,
যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা।

* * * *

রাত্রিদিন ধুক্ ধুক্ হৃদয় পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ।

* * * *

দিন রাত্রি নির্নিমেষ বসিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহ ভরে
রুদ্র আরাধনা।

* * *

তোর শান্ত সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেম মূর্ত্তি
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীলনেত্র বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট
নির্ব্বাক অধর;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে;
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে?"

* *

মিষ্টার অগ্‌গি মনে মনে ভাবিলেন, "হায়, পৃথিবীর যে কোন কবি এইরূপ কবিতা লিখিলে অমর হইবার কথা!" মুখে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।

অনেক রাত্রে মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা চলিয়া গেলেন। 'অস্ত্রচিকিৎসার' আর আবশ্যক ছিল না।

* * *

সে রাত্রে মিষ্টার অগ্‌গি হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন আমরা জানি না।

১০

আরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেবার আর একটা সেনসাস্ আসিল। মিষ্টার অগ্‌গি তাহাতে নিজের নাম ইত্যাদি স্বহস্তে বাংলায় লিখিয়া দিলেন—"শ্রীঅমরলাল নিয়োগী, বাঙ্গালী, হিন্দু, ব্রাহ্মণ।"

তখন মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা এদেশ হইতে বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। মিসেস হ্যামফোর্ডও তখন বিলেতে।

রুক্মিণী সেদিন বসিয়া মিষ্টার ব্রান্‌সলাকে বাংলায় একখানি পত্র লিখিতেছিলেন।

অমরলাল (এখন মিষ্টার নিয়োগী আর মিষ্টার অগ্‌গি নন) আসিয়া পুরাতন অভিনয়ের ভাণ করিয়া পশ্চাৎ হইতে রুক্মিণীকে ডাকিয়া একটি ইংরাজি গান সুরু করিলেন।

রুক্মিণী অভিমানের ভাণ করিয়া বলিলেন—"ইংরেজিটে একদিকে চালানো চাই, তাই বুঝি!" তার পর বলিলেন—"যাও, আমি এখন বাবাকে বাংলায় চিঠি লিখ্‌ছি, ইংরেজি ব'কো না।"

অমরলাল বলিলেন—"চিঠিটে দেখাবে না?"

রুক্মিণী বলিলেন—"দেখাব, সুধু এক লাইন, এই যে—" এই বলিয়া তিনি অমরলালকে দেখাইলেন পত্রের একটি পংক্তি, তাহাতে লেখা ছিল,—

"আজ পৃথিবীতে আপনার কন্যা রুক্মিণী সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী।"

অমরলাল স্বহস্তে (স্ত্রীর অনুমতি লইয়া) বাঙ্গলায় তার সঙ্গে যোগ করিলেন—

"রুক্মিণী বড় গুণবতী, আর আপনার জামাতা অমরলাল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষাই ভাগ্যবান।"

রুক্মিণী বলিলেন—"যাও!"

তখন দুজনকারই চোখে জল!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

পথের ইঙ্গিত

৫। ললিতা গোয়ালিনী।

ললিতা গোয়ালিনী আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। উপলক্ষ্য—তাহার বাড়ীতে গো-পূজা। ললিতা আমার গ্রামে বাস করে, আমারই প্রজা। প্রথমে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করে নাই; তার পর, আমার জাত্যভিমান নাই জানিয়া সাহস করিয়া আসিয়াছে। আমি সাদরে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

তাহার স্বামী সুদাম মণ্ডল রঙ্গপুর সরকারী গোশালায় কায করিত। বাড়ীতে কিছু চাষ আবাদ ছিল, সেটা তার ভাই শ্রীদাম মণ্ডলই দেখিত। সুদাম রঙ্গপুরে কায করিতে করিতে দুই একটি করিয়া গুটীকয়েক ভাল গাই ও বাছুর কিনিয়া আনিয়াছিল। একটা হিসারের ষাঁড়ও আনিয়াছিল। ললিতা গোরুগুলি ভাল করিয়াই পালন করে আর দুধ বিক্রয় করে। সুদাম বৎসরে একবার বাড়ী আসে, আর গোশালায় কায করে। দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিখিত তাহার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু উন্নতি তার নিজের গোপালন আর দুধ বিক্রয়ের ব্যবসায়ে করিবার চেষ্টা করিত। শেষে তাহার ব্যবসাটা যখন একটু ভাল করিয়া চলিতে লাগিল, তখন সুদাম চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী আসিয়া এই ব্যবসাই করিতে লাগিল। তার এখন আটটি ভাল গাই হইয়াছে, আর সেই ভাল ষাঁড়টি আছে। গোটাকতক বাছুরও হইয়াছে। একখানি গোয়ালঘর যে ভাল করিয়া তৈয়ারি করিয়াছে। ঘরখানি বেশ বড়, দরজা জানালা অনেকগুলি আছে, ঘরে আলো হাওয়া প্রচুর, মেজে পাকা, চারিদিকে নালী করিয়া দিয়াছে। দিনের অধিকাংশ সময়ই গোরুগুলি বনে চরে। এই রকম ঘরে বাহিরে মুক্ত বাতাসে থাকিয়া গোরুগুলির স্বাস্থ্য বেশ, দুধও বেশ দেয়। পল্লীগ্রামে বেশী দুধ বিক্রয় হয় না, প্রায় সকলেরই গাই আছে। সুদাম সেই জন্য দুধ হইতে মাখন তুলিয়া, সেই মাখন আসানশোলে বিক্রয় করে। আর মাখন-তোলা দুধটা জ্বাল দিয়া ক্ষীর তৈয়ারী করিয়া, রেলষ্টেশনে বিক্রয় করে। এই ব্যবসা করিয়া সে বেশ অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল। গত বৎসর হঠাৎ মারা গিয়াছে। তার ভাই শ্রীদাম তার আগেই মারা যায়। এখন ললিতাই এই সমস্ত চালায়।

পরদিন প্রাতে আমি ললিতার বাড়ী গেলাম। ললিতা যেন আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। আমাকে মহাসম্ভ্রমের সহিত চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গিয়া বসাইল। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একখানা চালা ঘরে কয়েকজন লোক বসিয়া ছিল। তাহারা ললিতার আত্মীয়। শ্রীদামের একটি বার বৎসরের ছেলে আছে, সে পড়ে। আজ সেই মুখপাত্র হইয়া ললিতার নির্দ্দেশ মত সব করিতেছে এবং করাইতেছে। আমাকে গোরুগুলি এবং গোয়াল ঘর দেখাইল। গোয়াল ঘরখানি

অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। গোয়াল ঘরের পাশে একখানা খুব লম্বা চালা আছে, আজ গোরুগুলিকে সেইখানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গোরুগুলির গায়ে গৈরিক রঙের গোল গোল ছাপ দিয়াছে, শিঙে তেল দিয়াছে, খুরগুলি ধুইয়া পুঁছিয়া দিয়াছে। বাছুরগুলিকেও সাজাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা লাফাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত দৃশুটি অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

ললিতা বলিল, মণ্ডল (অর্থাৎ তাহার স্বামী সুদাম মণ্ডল) এই গো-সেবাকেই আমাদের ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন; তাহারা সেই জন্ম তাহাদের নিজেদের থাকিবার ঘরের চেয়ে গোরুগুলির থাকিবার ঘর ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। গোরুর খাবার আগে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের জমী বেশী নাই, তাহাতে যে খড় হয় তাহাতে সম্বৎসরের খোরাক চলে না। তাই খড় আর রবিশস্তের ভুষি যথেষ্ট কিনিয়া রাখে। আর নদীর ধারে খানিকটা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, তাহাতে চাষ করে না, কেবল গোরু চরায়। সুদাম একটা মাখন তোলা কল আনাইয়াছিল, এখনও সেইটা দিয়াই মাখন তোলা হয়। ললিতা আমাকে কলটা দেখাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহিষ পোষ না কেন?"

ললিতা বলিল, "মহিষের দুধে মাখন বেশী হয় বটে, কিন্তু মহিষ পোষা বড় ব্যয়সাধ্য। বর্ষার ক' মাস বনের ঘাস খাইয়ে এক রকম চলে, কিন্তু তার পর মহিষকে খাওয়ান বড় কষ্টকর। কিনে খাওয়ানতে অনেক খরচ পড়ে।"

আমি। তেমনি মহিষের দুধের দাম বেশী, ঘি মাখন বেশী হয়, দই খুব ভাল হয়। আর খাওয়ানর জন্তে বনের ঘাস রক্ষা করতে হয়। ঘাসের চাষও করা যায়, তা ছাড়া জোয়ার, জনেরা আরও কত রকম জিনিষ আছে যা' মানুষে খায় না, অথচ গোরু মহিষে খায়, সেই সব জিনিষের চাষ করতে হয়। তা' হলে গোরু মহিষকে খাওয়াতে আর কষ্ট হয় না। তুমি যদি চাও ত আমি তোমাকে বনের কাছে নদীর ধারে খানিকটা জমি দিতে পারি। জমিটা তুমি ঘিরিয়ে নিয়ে, অন্য গোরু মহিষ চরতে দিও না। গ্রীষ্মকালে খানিক খানিক ঘাসের জমিতে জল সেচে দিও। আর বড় বড় এক রকম ঘাস আছে, তার চাষ কোরো। তুমি যদি জমি নাও, আমি এখন তিন বছর তার খাজনা নেব না। তার পরে অল্প কিছু খাজনা দিও। ঘাসের চাষ এখানকার লোকে জানে না। আমি তার বীজ এনে দেব, কেমন করে চাষ করতে হয় তা দেখিয়ে দেব।

ললিতা এ প্রস্তাবে খুব আহ্লাদের সহিত রাজী হইয়া বলিল, একদিন আসিয়া সে সব বন্দোবস্ত করিবে।

তার পরে, নন্দালয়ে বাল্য কৃষ্ণকে যশোদা যেমন খাওয়াইতেন, ললিতা আমাকে তেমনি করিয়া ক্ষীর, সর, ছানা, ননীর সঙ্গে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে প্রস্তুত লুচী, ফল মূল প্রভৃতি খাওয়াইল। আমিও পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া, ললিতার যে সকল আত্মীয় বন্ধু আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া, ললিতার কাছে বিদায় লইলাম। ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় কয়েকটি যুবক আমার কাছে আসিয়া বলিল, আর একটু থাকিতে হইবে। হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলিল, এই উপলক্ষ্যে তাহারা এবং পার্শ্ববর্ত্তী কেশবপুর গ্রামের যুবকেরা লাঠিখেলা, কুস্তীখেলা প্রভৃতি দেখাইবে, নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে লোকজন আসিবে, আমাকেও থাকিতে হবে। আমি সম্মত হইলাম। অপরাহ্ণে বাউলসঙ্গীত কীর্ত্তন, কুস্তী, লাঠি খেলা প্রভৃতি নানারকম আমোদ প্রমোদ হইল। একটা দিন বেশ আনন্দে কাটাইলাম, সন্ধ্যার সময় আমি ফিরিয়া আসিলাম।

আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম, এই গোয়ালার মেয়ে ললিতা কেমন সুন্দরভাবে এই দুধ, দই, মাখন প্রভৃতির ব্যবসাটি চালাইতেছে! বিজ্ঞাপন নাই, টেবিল-চেয়ার-ওয়ালা আপিস নাই, কোন আড়ম্বর নাই, অথচ কারবারটি বেশ চলিতেছে। আর আমরা তথা-কথিত ভদ্রলোকেরা যদি এ কায করিতাম, তাহা

হইলে প্রথমেই অন্ততঃ দশ হাজার টাকা মূলধন তুলিবার জন্ত বিজ্ঞাপন দিতাম, কার্য্যকরী সভা গড়িতাম, একজন নামজাদা লোককে সভাপতি করিতাম, একজন ধনাধ্যক্ষ হইতেন, একজন সম্পাদক হইতেন, আয়ারশায়েরের গাই, আমেরিকার ষাঁড়, অন্ততঃ পক্ষে হিসারের বা মহীসুরের গোরু মহিষ আনিবার প্রস্তাব হইত। তাহাদের বৈজ্ঞানিক আহারের ব্যবস্থা হইত, অনেক টাকা খরচ করিয়া গোয়ালঘর তৈরী হইত। তার পর ক্রমে ক্রমে গোরু মহিষের দুধ কমিয়া যাইত, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হইত, ক্রমে লাভের জায়গায় ক্ষতি হইত। কিন্তু ললিতার মত যদি ছোট করিয়া কারবার আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রায় নাই, লাভ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। আমরা কিন্তু ছোট চাকরী ছাড়া অন্য কোন ছোট কায করিতে রাজী নই! কিন্তু যদি কোন রকমে ছোট চাকরীর মোহ ত্যাগ করিয়া, এই রকম ছোট কারবার করিতে রাজী হই, তাহা হইলে পুরুষানুক্রমিক এই দুরবস্থাটা দূর হইতে পারে। ইহার উপায়ও সহজ। জনকয়েক যুবক একত্র হইয়া ছোটনাগপুর বিভাগের মত জায়গায় আসিতে হইবে। এখানে অনেক স্থানেই বন আছে, নদী আছে। ইহারই মধ্যে রেলের ধারে সুবিধামত জায়গা লইয়া, দশ পনরটা গোরু মহিষ লইয়া দুধ দই মাখনের কারবার যদি আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে, ছোট চাকরীর চেয়ে যে লাভ বেশী হইবে এ কথা প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

কিন্তু আমরা চাকরীর মোহে অভিভূত। চাকরীর জন্য আমরা বর্ম্মা হইতে মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত সকল স্থানে যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু এই রকম কারবার করিতে বাড়ী ছাড়িয়া এক পা'ও নড়িতে রাজী নই। ব্যক্তি বিশেষ যেমন কোন সময়ে কোন কোন বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়, জাতি বিশেষও তেমনি কোন কোন বিষয়ে কোন কোন সময় মোহাচ্ছন্ন হয়। আমাদের এই তথা-কথিত ভদ্রলোক জাতিটা সেই রকম চাকরীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, অভিভূত হইয়া আছে।

যত দিন না এই মোহ দূর হয়, তত দিন আমাদের দ্বারা কিছু হইবে না। যদি কেহ কিছু করিতে পারে, ত এই ললিতা-শ্রেণীর লোকেরাই পারিবে। আমরা ভদ্রলোক, গোয়ালার ব্যবসা করা আমাদের মর্য্যাদার হানিজনক! কিন্তু এই ব্যবসারই যদি ইংরেজী নামকরণ হয় "ডেয়ারি ফারম্" (Dairy farm), তাহা হইলে আমরা তাহাতে চাকরী লইতে প্রস্তুত আছি, অংশীদারও হইতে পারি।

আর একটি বিষয়ে ললিতার চরিত্র আমাদের অনুকরণীয় বলিয়া মনে হইল। সেটি ললিতার স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভরের ভাব এবং সেই ভাবে কায করিবার শক্তি ও সামর্থ্য। স্বামী মারা গিয়াছে, তাহার ভাইও মারা গিয়াছে, বাড়ীতে একটি বালক ভিন্ন আর কোন পুরুষ নাই। কিন্তু ললিতা তাহাতে আপনাকে অসহায় মনে করে নাই। কোন বিষয়ের জন্য সে পরমুখাপেক্ষী হয় নাই। তাহার কারবারটি নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু সে নিজেই তাহা চালাইবার শিক্ষা ও সামর্থ্য উপার্জ্জন করিয়াছে এবং কার্য্যতঃ চালাইতেছে। আর আমাদের মত ভদ্রলোকের মহিলা হইলে তিনি কি করিতেন? তিনি সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পিত্রালয়ে যাইতেন এবং ভাইদের হাতে কারবারটি সমর্পণ করিয়া দিতেন। এবং যে হেতু ভাইরাও ভদ্রলোক, সেই হেতু তাঁহারাও স্বহস্তে এ কায করিতেন না; একজন "বিশ্বস্ত" কর্ম্মচারীর উপর কাযের ভার পড়িত। কিন্তু সেই "বিশ্বস্ত" কর্ম্মচারীটির কর্ম্ম দেখিবার অভাবে, কিছু ক্ষতির সঙ্গে কারবারটি কিছুদিন পরে উঠিয়া যাইত। আমাদের শিক্ষা এখনও আমাদিগকে কায করিবার সামর্থ্য দিতে পারে নাই, চিন্তার স্বাধীনতা দিতে পারে নাই। যে শিক্ষায় আমাদের মন হইতে "ভদ্রতা"র অভিমান দূর করিয়া তার স্থানে শ্রমের গৌরব মুদ্রিত করিতে পারে, সেই শিক্ষাই শিক্ষা, তা স্ত্রীলোকেরই হউক, পুরুষ-লোকেরই হউক।

ললিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমাদের যতীনের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। যতীন যখন মারা যায়, তখন

তার স্ত্রীর "আমার কি হবে" বলিয়া যে কান্না, তাহা শুনিলে বাস্তবিকই বুক ফাটিয়া যায়। তখন ত সকল অবস্থার কথা বলিবার বা শুনিবার সময় নয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে শোকের বেগ কিছু কমিয়া আসিলে যতীনের স্ত্রী বলিলেন, তাঁহার স্বামী ৭০৲ টাকা মাহিনা পাইতেন; আগে কম মাহিনা ছিল, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া বছর দুই হইল ৭০৲ টাকা হইয়াছিল। তাঁর একটি মেয়ে, আর একটি ছেলে। মেয়ের বিবাহের জন্য সংস্থান করিয়াছিলেন, একটা জীবন বীমা কোম্পানীতে ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন। তাঁহার শরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নিজের জীবন বীমা করা হয় নাই। সেই যক্ষ্মা যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন চিকিৎসকেরা সমুদ্রতীরে কোনও স্থানে গিয়া জলবায়ুর পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। অর্থাভাবে তাহা হইল না। একেই ত অল্প মাহিনা, দীর্ঘ ছুটী লইয়া তাহাও অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতাতেই ভাল করিয়া চিকিৎসা করান চলিল না, ত জলবায়ুর পরিবর্ত্তন করিতে পুরী বা ওয়ালটেয়ার যাওয়া! কলিকাতাতেই একটা আলো হাওয়াওয়ালা ভাল বাড়ীতে যাওয়াও ঘটিল না। তাঁহার বড় ভাই জলপাইগুড়ির এক চা বাগানে কায করেন। তিনি কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। তাহারও বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবার অবস্থা নয়। এদিকে বাজারে কিছু ধারও হইয়া গেল। তারপর যাহা হইবার, তাহাও হইয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে যতীনের স্ত্রী মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুল কাতরতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমি কি করি? আমার মেয়েটির ছেলেটির কি হবে? আমার কি হবে? বাপের বাড়ীতে বাপ মা নেই। দুই ভাই আছেন, তাঁরাও সামান্য চাকরী করেন, নিজের নিজের পরিবার নিয়েই বিব্রত। তার উপর আমার মেয়েটি-ছেলেটি শুদ্ধ আমার সম্পূর্ণ ভার নেবার ইচ্ছা থাকলেও, সামর্থ্য নেই। এখন আমার উপায় কি?"

আমি এ প্রশ্ন শুনিতে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও সদুত্তর দিতে পারিলাম না। সময়োচিত দুইটা সান্ত্বনার কথা বলিয়া বলিলাম, "যতীনের দাদাকে আর আপনার ভাইদিকে সব অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখুন, তাঁরা কি বলেন জেনে, যাতে ভাল হয় এমন একটা পরামর্শ করা যাবে।"

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের দেশের গরীব ভদ্র যুবকদের প্রাণটা আর স্বাস্থ্যটাই একমাত্র মূলধন, একমাত্র সম্বল। এই লইয়াই তাহারা জীবনযাত্রা আরম্ভ করে আর তার অভাব হইলেই, যাহারা উদরান্নের জন্য তাহাদেরই উপর নির্ভর করে তাহারা অনাথ, অসহায়, আশ্রয়হীন, ভিক্ষুকের অধম হইয়া, সমাজের গলগ্রহ হইয়া পড়ে। দুদিনের জন্য কিছু সংস্থান আগে করিয়া তারপর বিবাহ করা, এদেশের রীতি নয়। স্বামীর অভাবে অবস্থা অনুসারে আবশ্যক হইলে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করিতে পারে, তথা কথিত ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে এমন শিক্ষা দেওয়াও রীতি-বিরুদ্ধ! দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যে এই অবস্থাপন্ন ভদ্রমহিলাদের বাড়ীতে ভিক্ষার চাউল পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হয়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

অমিয়বালার ডায়েরি

(অমিয়বালার পিতা, পশ্চিমের কোনও সহরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অমিয়কে তিনি যত্ন করিয়া ঘরে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। নিজের সাধ্যের অতীত অর্থ ব্যয় করিয়া মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন। পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন জমিদারের পুত্র, কলেজে আইন পড়িত।

কিছুদিন এই নবদম্পতী সুখশান্তিতে কালযাপন করিবার পর, একটা "তত্ত্ব" লইয়া মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। জামাতা ও তাঁহার মাতা তখন প্রস্তাব করেন যে, তিন সহস্র টাকা না দিলে তাঁহারা অমিয়কে গ্রহণ করিবেন না। এই অসঙ্গত ও অবস্থাতিরিক্ত দাবী, অমিয়র পিতা পূর্ণ করিতে না পারায়, তাঁহারা বধূকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন।

অমিয়র পিতার স্বাস্থ্য কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভাল ছিল না, এখন এই দুঃখে ও অপমানে, তিনি রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পিতার এই অবস্থায়, ১৩২৬ সালের ২৮শে শ্রাবণ, দশদিন জ্বরে ভুগিয়া, ভগ্নহৃদয়ে অমিয়র মৃত্যু হয়। অমিয়র পিতা এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া কন্যার মৃত্যুর দেড় মাস পরে পরলোক গমন করেন।

চারি বৎসর অমিয়র বিবাহ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে তিন মাস মাত্র সে "স্বামীর ঘর" করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অমিয়র আত্মীয়গণ, তাহার ডায়েরির খাতাগুলি আমাদের আফিসে দিয়া গিয়াছেন। অমিয়র এই হৃদয়ভেদী করুণ কাহিনী শুনিলে সমাজের যদি চৈতন্য হয়, এই আশায় সেই ডায়েরী হইতে, নাম ধাম গোপন রাখিয়া আমরা কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। লেখাগুলি আমরা যৎসামান্য মাত্র সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

মাঃ মঃ সঃ।)

১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসের আর আটদিন আছে, এমন সময় '—' দা আমায় কলিকাতায় লইয়া চলিলেন মেয়ে দেখাইতে। আমার ১৪ বছর বয়স, কিন্তু তখনও বিবাহের কিছুই ঠিক হয় নাই। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবা এক মাস সাত দিনের ছুটি লইয়া আমার বিবাহের ঠিক করিতে আমায় দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি ঠাকুর তখন কিছুতেই আমার গায়ে উড়িয়া আসিয়া বসিলেন না। কাযেই বাবা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া আমায় লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দেখিতাম, স্নেহময় বাবা আমার জন্য কি চিন্তার বোঝা লইয়া দিন কাটাইতেন! দিন রাত কেবল আমার কথা ভাবিতেন; কি করিয়া আমি সচ্চরিত্র বিদ্বান্ ভাললোকের হাতে পড়িব, সেই পরের ছেলে আপনার হইবে কি না, শ্বশুর শাশুড়ী মেয়ের মত করিয়া আদর করিয়া আমায় লইবেন কি না, এই সব কথাই বাবা আমার দিনরাত বলিতেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা সব ভাজা-ভাজা, সেই সময় বাবা আমার ১০টার ষ্টীমারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী ফিরিতেন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখ চোখ শুকাইয়া যাইত। তাঁহার সেই নিরাশ-কাতর মুখপানে যখন তাকাইতাম, তখন আমার বড় কষ্ট হইত। মনে হইত, কত কষ্টই বাবা আমার জন্য পাইতেছেন! আর রাগ হইত সবাইকার উপর—কেন সবাই এত করিয়া বিবাহের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত করে তোলে?

প্রিয়, তুমি কি আমার?

সঁপিয়া হৃদয়খানি তোমারি চরণে,
ভালবাসা থরে থরে রাখিয়া যতনে,
ভাবিতেছি দিবানিশি শয়নে স্বপনে
প্রিয়, তুমি কি আমার?
প্রেম ভরা প্রাণটুকু তোমারেই দিয়েছি,
ভাঙ্গাচোরা হৃদি মোর তোমা তরে রেখেছি,
তোমারেই ভেবে আমি কত দুঃখ সয়েছি,
প্রিয়, তুমি কি আমার?
আমি যে তোমার, ওগো, আমি যে তোমার,
তোমা বিনা এ জগতে কারো নহি আর,
নিশিদিন মনে রেখ—আমি গো তোমার,
প্রিয়, তুমি কি আমার?

উঠিতেছে কত কথা হৃদয়ে আমার,
মনে হয় তুমি বুঝি নহ গো আমার,
ভাবিতে হৃদয়ে ব্যথা পাই অনিবার
প্রিয়, তুমি কি আমার ?

হে আমার জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা, হে আমার সর্ব্বস্ব, তোমার চিঠি যে কি, তাহা তুমি জান না। ওগো, তুমি জান না, তাই আজ ভুলিয়া রহিয়াছ। তাই আমার জীবনের যাহা একমাত্র শান্তি, এই দগ্ধ হৃদয়ের যাহা সান্ত্বনা, নিরাশ প্রাণের আশার বাতি যে তোমার ঐ ক্ষুদ্র চিঠিখানি, তাহা বন্ধ করিয়াছ। হায় প্রিয়তম, তুমি যদি জানিতে যে তোমার চিঠিখানি আমার কি, তাহা হইলে এত দিন নির্দ্দয় হইতে কিছুতেই পারিতে না। ওগো, তোমার চিঠি কেন এত আদরের, কেন এত প্রিয়, তা জান কি ? সে যে আমার প্রিয়তমের হাতের লেখা, সে যে কত সুধা কত সমুদ্র ছেঁচিয়া তাহাতে আমারই জন্য ঢালিয়াছে, কত মধুর সম্বোধন দিয়া কত স্নেহের কথা দিয়া সেই ক্ষুদ্র চিঠিখানি ভরিয়াছে। তোমার সে চিঠিখানি স্পর্শ করিয়া আমার মনে হয়, যেন তোমাকেই স্পর্শ করিতেছি। তোমার হাতের লেখাগুলি হইতে, তোমারই কণ্ঠের ঝঙ্কার আমি শুনিতে পাই। তোমারই চিঠি পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া আমি সকল চিন্তা, এ জগতের সকল কষ্ট সকল অশান্তি ভুলিয়া যাই। কি জানি কি এক মন-মাতানো ঝঙ্কার চিঠি হইতে বাহির হইয়া আমায় বিভোর নিস্পন্দ করিয়া ফেলে। ওগো, তাই তোমার সে হাতের লেখা চিঠিখানি আমার বড় আদরের, বড় সোহাগের ধন।

সেবিকা।

শুনেছি, বুঝেছি আমি জীবনের সব কথা,
মরম মাঝারে আজ পেয়েছি বিষম ব্যথা।
বুঝেছি, ঢাকিবে হায় আঁধারেতে এ জীবন
হাহাকারে ভরে' যাবে অভাগীর প্রাণ মন।
যে ঘর আমার বলে' চিরদিন জানিতাম,
নারীর যা অধিকার মনে মনে ভাবিতাম,
সেখানে নাইক স্থান—সেস্থান আমার নয়,
সেখানে অতিথি-আমি, আর কিছু নহি হায়।
তোমারে পূজিব আমি, দেবতার মত করি
কাটাব জীবন মম তোমারি মূরতি স্মরি।
এতদিন পূজিয়াছি মানুষের মত করি
কামনা বাসনা স্বার্থ কত শত হৃদে ধরি,
হৃদয়ের ধন তুমি, প্রাণের দেবতা মম
ভালবাসি ভক্তি করি, তুমি মোর প্রিয়তম।
সংসারের কুটিলতা এতদিন বুঝি নাই,
তুমি মোর আমি তব— আর কিছু ভাবি নাই।
গাহিত মধুর সুরে মোর বীণা বারবার
"কারো নয় কারো নয়, সে আমার সে আমার।"
তব সুখে সুখী আমি, দুঃখেতে দুঃখিত প্রাণ,
তুমি যদি সুখী হও, সব সবে এ জীবন।
সুখী হও প্রাণাধিক, যাতে সুখ পাবে প্রাণে,
ভুলনাক এ দাসীরে, একটুকু রেখ মনে।
তোমার কোমল প্রাণে দিয়েছি অনেক ব্যথা,
কত দিন কত ভাবে বলেছি যে কত কথা।
ক্ষম মোর অপরাধ, ক্ষম দেব দয়া করে',
শত দোষ অপরাধ রেখনাক মনে ধরে'।
বলিবার কিছু আর ও চরণে নাহি হায়,
যোড়করে ক্ষমা চেয়ে এ দাসী বিদায় চায়।

নূতন বৎসর,

এস তোমায় প্রণাম করি। জানি না, এই হতাশ দগ্ধ মর্ম্মপীড়িত অনাদৃত জীবনের জন্য কি উপহার সাজাইয়া লইয়া এলে। এই এক বৎসরের জন্য যে কি ভবিষ্যৎ তুমি লইয়া এলে, তা তুমিই জান— আর জানেন তিনি, যিনি তোমার হাতে এই সমস্ত

জিনিষ পাঠাইবেন। নূতন বৎসর, এমনই তুমি কতবার আসিয়াছ আর কতবার গেছ, তাহার কোনও হিসাব নিকাশ নাই। কত অতীত গেল, কত বর্ত্তমান আসিল, সবই কালের কোলে আসিতেছে যাইতেছে। এই আমার জীবনেই তুমি কতবার এলে, কতবার গেলে, আবার কতবার আসিবে। তোমার আগমন কতক স্মরণে রহিয়াছে, কতক বা বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গেছে। মনে পড়ে, এমনি দিনে আর বছরে, এক জনের কাছে তোমার আগমন সংবাদ পাইয়াছিলাম। সে জানাইয়াছিল যে, তোমার আগমনে আমার আর তার কি হইবে তাহা সে জানে না, এবং তুমি যে আমার আর তার জন্য কি উপহার আনিবে তাহাও সে বলিতে পারে না। তখন বড় ভয়ে স্তব্ধ হইয়া এ কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—আর তুমি যে আমার জন্য কি আনিবে তাই ভাবিতাম। কিন্তু তোমার দেওয়া সব উপহারই এই এক বৎসর মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। দেখিতেছি, সুখ দুঃখ কিছুই ফেলি নাই, কি করিয়া এ এক বৎসর কাটিল তাহা জানি না। বুঝি ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখার মতই কাটিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যেন চাহিয়া দেখিলাম যে তুমি আবার আসিয়াছ।

নূতন বৎসর, আজ আবার প্রাণের সঙ্গে তোমায় আহ্বান করিতেছি। এস গো, একটু শীঘ্র শীঘ্র এস, এমনি করিয়া নিত্য আসিয়া জীবনের দিনগুলাকে অবসান কর। এস তোমায় প্রণাম করি; আর যিনি তোমায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকেও কোটি কোটি প্রণাম করি। যেন তোমায় নূতন আহ্বান আর আমায় বেশী দিন না করিতে হয়।

১লা বৈশাখ, ১৩২৬ সাল।

আমার ব্যথা।

আমার ব্যথা যে কি এবং কতখানি, তাহা জানি না। শুধু দিনরাত সকাল সন্ধ্যা কি এক দারুণ অভাব, কি একটা প্রচণ্ড ব্যথা যেন আমার সারা বুকটা ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমার খাওয়ায় তৃপ্তি নাই, ঘুমাইয়া শান্তি নাই, মনে সুখ নাই—জানি না কি ব্যথা দিনরাত আমার বুকে বাসা করিয়া আছে। হাঁ, মনে পড়িয়াছে। আমার ব্যথা কি, তা শুনিবে? ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিবে? তবে শুন। যদি আর না সময় পাই, তবে এই বেলা প্রাণের কাহিনী শুনাইয়া রাখি।

১৪ বৎসর বয়সের সময় যখন আমার জীবন-দেবতা, ইহপরকালের সঙ্গী, একমাত্র ভক্তি ভালবাসার ধন স্বামীকে পাইলাম, তখন বেশী খুসী হই নাই বটে, কিন্তু যখন তাঁহার কাছ হইতে স্নেহের ব্যবহার পাইতে লাগিলাম, তখন ধীরে ধীরে প্রাণের মধ্যে ভক্তি ভালবাসা ফুটিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে প্রেমের সোপানে পা দিলাম; কিন্তু অতি গোপনে—এ জগৎ সংসারের এক জন ছাড়া আর কেহই জানিত না। যখন ভালবাসিলাম, যখন তাঁহাকে চিনিলাম, তখন প্রাণের মাঝখানে যা গোপন ভাণ্ডার ছিল তা এক নিমেষেই তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিলাম, কিছু বাকী রাখি নাই। হায়, সে কি তাহা বুঝিয়াছিল? যখন মা, বাবা, ছোট ভাই বোন, আমার যোল বছরের সুখগৃহ ছাড়িয়া এক অজানা অচেনা নূতন ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম, তখন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুর্ব্বল হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার পর দুই এক দিনেই বুঝিতে পারিলাম, এ ঘর নূতন হইলেও, অপরিচিত হইলেও, যাঁহার ঘর করিতে আসিয়াছি তিনি আমার চিরপরিচিত, আজন্ম-সখা—আমার-চির আপন। তখন একজনের স্নেহ আদরে, আমি যোল বছর যেখানে যাঁদের কোলে মানুষ হইয়াছি তাঁদের ভুলিলাম। আমি স্বামীর স্নেহে ভালবাসায় এক নূতন রাজ্যে দিনরাত বেড়াইতাম, গর্ব্বে সুখে আত্মহারা হইয়া আমি যেন কি হইয়াছিলাম। দিনরাত প্রাণের মধ্যে এক নূতন রাগিণী ঝঙ্কার দিত। রুদ্ধবাক্ স্তব্ধ প্রাণে আমি আমার দেবতার দিকে চাহিয়া দেখিতাম যে, সেই দুটি আঁখি আমারই মধের

পানে নিমেষহারা হইয়া আছে, আর তাহা দিয়া স্নেহ প্রেম ঝরিয়া পড়িতেছে। সে চোখ দুটি যেন দিনরাত বলিত—ওগো, আমি তোমারই—আমি তোমারই।

হায় অন্ধ আমি, তখন বুঝিতে পারি নাই যে এমন করিয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, আমায় পথের ভিখারিণী করিয়া, তার সেই অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়া আজ সে জনমের মতই ভুলিয়া যাইবে, এমনি করিয়াই পায়ে ঠেলিবে। কে জানিত, কলেজ যাইবার সময় কিংবা এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় যে যাইতে পারিত না, কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইত, আর এক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বে চলিয়া যাইত, আবার যখন বাড়ী ফিরিত, তার ব্যাকুল আঁখি দুটি আমারই জন্য চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইত—সেই আজ—সেই মানুষই আজ এক বছরের উপর না দেখিয়া আছে, একখানি চিঠি দিয়াও আমি বাঁচিয়া আছি কি মরিয়া গেছি খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করে না! যে একদিন ৫০।৬০ পাতা করিয়া চিঠি লিখিয়াও তৃপ্তি পায় নাই বলিয়াছে, সেই আজ দুই তিন মাসেও দুই কলম লিখিয়া চিঠির জবাব দিতে পারে না। হায়রে মানুষ! এত পরিবর্ত্তন! সেই আমি, সেই জগৎ, সেই সমস্ত, সেই সে—কেবল মাঝখানে হইতে একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; তার ও আমার জীবনের মাঝখানে ঠিক একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। জানিনা, এ যবনিকা এ জীবনে কখনও উঠিবে কি না!

একদিন দুই জনের বিচ্ছেদের কল্পনা মাত্রও দুইজনের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিত, সামান্য একদিনের জন্যও দেশে যাইবার কথায় সে নানা ছলে মাকে নিরস্ত করিতে চাহিত। যে মানুষ দু'দিনের জন্য দূরে গিয়া, বারবার আমায় চিঠি লিখিতে অনুরোধ করিত, আর ফিরিয়া আসিয়া এ দুদিন আমায় না দেখিয়া যে তার কত কষ্ট হইয়াছে তাই গল্প বলিত—আর আমার এ ক্ষুদ্র বুক সুখে গর্ব্বে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত; ভাবিতাম আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে?—হায় সেই লোক, সেই আমার স্নেহময় স্বামী, নিজ হাতে আর বছর এমনি দিনে কি লিখিয়াছিল? আমার সমস্ত জীবন তোলপাড় করিয়া, সাধের আশার হার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া দিয়া, সে কি শুনাইয়াছিল? ওগো, সে লিখিয়াছিল—না না, আজ থাক, প্রাণ বড় চঞ্চল, সেই পুরাণো স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন সহস্রদিক হইতে তাড়িয়া আসিতেছে। আমি ভুলিয়া আছি, ওগো তাই থাকি। আর পারি না। আজ থাক্। যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি মনকে শান্ত করিতে পারি, তবে আবার আসিব—আমার বুকের হাহাকার, মনের কথা, কালির আঁচড়ে লিখিয়া রাখিব। আজ থাক্।

* * *

আবার আজ আসিয়াছি। প্রাণকে শক্ত করিয়াছি, মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, সে আর চঞ্চল হইবে না। কিন্তু আর পারিব না। আমি শক্তিহীন হইয়াছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন ধীরে ধীরে নিজের শরীর মন অশক্ত হইয়া পড়িতেছে। যা মনে করিয়াছি, তা হয়ত আর এ জীবনে কাযে করিতে পারিব না। ভাবিয়াছি যে আমার প্রাণের কাহিনী, আমার মনের দুঃখ হাহাকার আমারই মনের কথায় ও বনফুলে লিখিয়া রাখিব—ইহারাই আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী, আমার অবর্ত্তমানে আমার আসল সাক্ষী। সেই আমি, তেমনি করিয়াই উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াই, খাই, সবই করি, কিন্তু আমার ভিতরটা যে কি তাহা আমিই দিনরাত অনুভব করি। আমার বুকটা যেন শূন্য শুষ্ক; কেবলই যেন হাঁফ ছাড়িতেছে, যে কোনও সামান্য কারণেও এমনি বুক ধড়ফড় করে যে মনে হয় যেন এই মুহূর্ত্তেই প্রাণটা এ দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। কত সময় এ দেহের ভার আর বহিতে পারি না, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সংসারের কিছুই গ্রাহ্য করি না, তবু এক এক সময় এমনি দুর্ব্বলতা এমনি অবসাদ সমস্ত শরীরে জড়াইয়া

থাকে! যদি জোর করিয়া কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া বসিয়া লিখিতে যাই, অল্পক্ষণ পরেই পিঠের নিউর‍্যালজিক পেনের যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া শুইয়া পড়ি। সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! ১৫ মিনিট একভাবে দেওয়ালে কিংবা কিছুতে ঠেস না দিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। সমস্ত শরীরে মনে একেবারে ঘুণ ধরিয়া গিয়াছে। এই শরীর লইয়া কখনও কোন কাযে লাগিব তাহা ত বোধ হয় না। অদৃষ্টের পরিহাস দেখিয়া এক এক সময় বড় দুঃখেও হাসি পায়—আজ যদি অন্য ঘরে যাইতাম; তাহা হইলে? তাহা হইলে কি এই ভাঙ্গা শরীর লইয়া কায চলিত? না, তাঁহারাই আমার ঐ শরীরের অন্যায় আবদার বারমাস সহিতেন? নিজের মাথারও কিছু যে ঠিক নাই তাহাও বেশ বুঝিতে পারি। দিন রাত যেন ঘুমন্ত স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, স্মরণ শক্তি একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছে, কি বলি কি করি তা নিজেই সব সময় বুঝিতে পারি না। দিন দিন কেন যে এমন হইয়া যাইতেছি, তা যিনি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। ভগবানের হাতের ক্ষুদ্র খেলার জিনিষ আমি, তিনি যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনি ভাবে খেলিবেন, আমি কে যে তাঁহার কাযের মানে বুঝিব? যাক্ সে কথা।

সেদিন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই আবার বলি। হ্যাঁ—আমার স্বামী কি লিখিয়াছিল জান? আমি তার **মনের মতন** নই, সে আমার কাছ থেকে যাহা চাহিয়াছে আমি তাহাকে তা কিছুই দিই নাই, তাই সে আমায় এ জন্মে গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমায় লইয়া ঘর করিয়া তিল তিল করিয়া দগ্ধ হওয়ার চেয়ে, সে জন্মের মত আমায় ত্যাগ করাই উচিত মনে করে।

হরি হরি, শুনিলে একবার? আমি তাহার মনের মত নই! হ্যাঁগো, যদি মনের মত নই, তবে কি করিয়া তিন মাস লইয়া ঘর করিলে? যদি এত অপছন্দের আমি তোমার, তবে কেমন করিয়া অত ভালবাসিলে, অত আদর সোহাগে সমস্ত জীবন ভরাইয়া দিলে? একদিন, জানি না শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে, এ জীবনের সমস্ত ভার, আত্মার সুখ দুঃখ ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্যের ভার, অগ্নি দেবতা ব্রাহ্মণ সমস্ত সাক্ষী করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আজ হইতে আমি তোমার তুমি আমার, আমাতে সম্পূর্ণ তোমার অধিকার, তোমাতে সম্পূর্ণ আমার অধিকার, সেই দিনের কথা, সেই প্রতিজ্ঞার কথা, সে কি ভুলিয়া গেছ? এ কি গো একটা ছেলেখেলা, যে একটা নির্দ্দোষ প্রাণকে পায়ে দলিয়া, 'মনের মতন নয়' বলিয়া জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে? এ কি উচ্ছৃঙ্খল অসচ্চরিত্র যুবকের বিলাসিনী বারনারী, যে সে তোমার মনের মত না হইলে, ত্যাগ করিয়া আর এক স্থানে যাইবে, আর সেও আবার তার মনের মত আর একজনকে তার কামনাবহ্নিতে টানিয়া লইবে? পবিত্র বিবাহ বন্ধন কি এতই সহজে ছিন্ন হয়? কি আমার অপরাধ? সে কি এতই বেশী যে, জন্মের মত ত্যাগ করিবার মত?

আমার অপরাধ যে, আমি তোমার কথামত হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে, গান করিতে, ভাল রকম লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই। তা ঠিক, এ আমার অপরাধ বটে; কিন্তু জান কি, যে কেন আমি তোমার কথা মত কায করিতে পারি নাই? যে সংসারে রহিয়াছি, সে সংসারে কত বড় বড় ঝড় আমার বিবাহের পর হইতে যাইতেছে তাহা জান কি? যাক্ সে কথা। সবই সম্ভব হইত, যদি তোমার প্রাণের সহানুভূতি একটু পাইতাম। জিজ্ঞাসা করি, তোমার মনের মত হইবার একটুও সাহায্য তুমি আমায় করিয়াছিলে কি? মনের মত করিতে হইলে যে নিজেকে গুরু হইতে হয়, তাহা কি জান না? আমার বাবা, এ সংসারের সর্ব্বস্ব, এ পৃথিবীর আলো দেখিয়াই যাঁহার স্নেহ আদর ভালবাসা পাইয়াছি, যাঁহার মহৎ হৃদয়ের তলে এত বড় হইয়াছি, সেই তিনি ইহসংসার ছাড়িতে বসিয়াছেন, এখন যান তখন যান হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন, চিন্তায় ভাবনায় দিন কাটিত না, সেই সময় কি, সেই রকম মনের অবস্থায় কি, লেখাপড়া গান বাজনা বোনা সেলাই এই সব

করিতে পারা যায়? না সেই অবস্থায়, "একটা হার্ম্মোনিয়ম কিনে দাও" বলিয়া আব্দার ধরিতে পারা যায়? বাবা পড়িয়া, সংসার চলাই দুর্ঘট, সব দেখিয়া বুঝিয়া জানিয়া কি অন্যায় আব্দার করিতে পারা যায়? তুমি এ সংসারের কিছু বোঝ না, জান না, তাই ঐ কথা বলিলে। আর আমি, জানিয়া শুনিয়া, কি করিয়া হৃদয়হীনের মত কায করিব?

তোমার স্ত্রীকে মনের মত করিবার ভার তুমি নিজে নিলে না, আর দোষের ভাগ আমায় দিয়া চির-জনমের মত এমনি করিয়া রাখিলে। এই তোমার বিচার? তাই হোক—এই অন্যায় বিচারই আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। আমায় লইয়া যদি জীবনে সুখী না হও, যদি তোমার সুখের কারণ না হইয়া আমি তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিবারই কারণ হই, তবে তাই হোক, বুক পাতিয়া আছি, আমায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যাও। যাহাকে পাইলে, যাহা করিলে, সুখী হইবে, শান্তি পাইবে, তাই কর। তোমার শত উপেক্ষা অবহেলা বুকে লইয়া জীবনের দিনগুলা কাটাইয়া দিব। ইচ্ছা করিলে, আবার একজনকে এমনি করিয়া, দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া, এমনি সব প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রহণ করিও। আমাকে যাহা বলিয়াছিলে তাহাকেও বলিতে পার—"আমি তোমারই আর কারো নই।"—কিন্তু এটা অতি সত্য জানিও যে, আমার এ দেহ মন প্রাণ তোমারই, আমার এ হৃদয়-রাজ্যের দেবতা তুমিই, আমার ভালবাসার একমাত্র ধন তুমিই।

তুমি হয়ত দুইদিন পরে এ ক্ষুদ্র জীবনের স্মৃতিটুকু ভুলিয়া যাইবে. কিন্তু এ অভাগিনীর তাহা হইবে না। আমরণ এই স্মৃতি প্রাণে জাগিয়া থাকিবে ও আছে। একটি দিন একটি মুহূর্ত্ত এ স্মৃতির যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতেছি না, বুঝি সারা জীবন ধরিয়া এ স্মৃতি আমাকে এমনি করিয়াই পোড়াইবে! ইচ্ছা করিয়াই পাষাণে বুক বাঁধিয়াছি। এ যৌবনের এ জীবনের আকুল তৃষা সাধ আশা সব এ বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখিয়াছি। যত দুঃখ যত কষ্ট আসে আসুক, বুক পাতিয়া আছি, সবই সহিতে পারিব। ভগবানের রাজ্যে অসহ্য কিছুই নাই। যে জিনিষটাকে একান্ত অসহ্য মনে হয়, কল্পনার চোখে যাহা সহিতে পারা যায় না, সেইটাই ভগবান আগে সওয়ান। এত বড় দুঃখ কষ্ট বোধ হয় এ জগতে কিছুই নাই, যাহা মানুষ সহিতে পারে না।

তাই নিজে অদৃষ্টস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি, আর মা বাবাকেও এ বিষয় হইতে নিরস্ত করিয়াছি,—যেন আমার ভাগ্য ফিরাইবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা তাঁহারা না করেন। অদৃষ্টের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই এ আমি বেশ জানি। সকলে বলে, বাবা আমাকে জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া আসুন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহারা আমায় ঘরে লইবেন; কিংবা ২।৩ হাজার টাকা তাঁদের দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিন। ছিঃ ছিঃ—এ আমি একেবারেই সহিতে পারিব না। সমস্ত দেহ মন গর্জ্জিয়া উঠে, মাথায় আগুন জ্বলিয়া যায়, অসম্ভব—অসম্ভব! যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, কখনও তাহা হইতে দিব না। কেন? কি জন্য? যে আমায় চায় না, যে আমায় লইয়া জীবনে কখনও সুখী হইবে না, তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইবে বলিয়াছে, তাহাকে তবু বলিতে হইবে—"আমায় নাও; তুমি সুখী হও বা না হও আমি জানি না, আমাকে তোমায় লইতেই হবে।" এত স্বার্থপর আমি? নিজের সুখটাই কি বড়? বাঙ্গালী ঘরের, হিন্দু ঘরের মেয়ে আমি,—আমায় ত এ সব অন্যায়, অবিচার, জগতের পায়ে দলা সহিতেই হইবে! এই করিতেই ত আমাদের জন্ম! নীলকণ্ঠের মত সংসারের বিষে আকণ্ঠ পূর্ণ করিব আমরাই। তার স্ত্রী আমি, সহধর্ম্মিণী আমি, বাঙ্গালীর মেয়ে আমি, মা ভগবতীর অংশে এ স্ত্রীজাতির জন্ম—আমি তারই এক-জন, আজন্ম স্বামীর স্মৃতি স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে রাখিয়া পূজা করিব, প্রাণের ধনকে প্রাণে রাখিয়া ভক্তি করিব, ভালবাসিব—কিন্তু বড় গোপনে! কেহ জানিবে না, কেহ দেখিবে না, শুধু জানিব আমি,

আর উপরের একজন। তাহার জীবনের পথে আর পড়িব না, দূরে—বহুদূরে থাকিব। যাহার পায়ে সর্ব্বস্ব দিয়া ভিখারিণী হইলাম, সেই যদি ফিরিয়া চাহিল না, পায়ে স্থান দিল না, একটু ভালবাসিল না, তবে কিসের দাবী, কিসের আব্দার, কিসের অভিমান তাহার উপর? স্ত্রীকে যে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিল, তাহাকে আর মুখের অনুরোধ কেন? প্রাণের দেবতা প্রাণেই থাক, আর বাহিরে নয়।

সে যদি আমায় একটুও ভালবাসিত, তাহা হইলে আজ এমন করিয়া ভুলিতে পারিত না। একটু কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলেও, বুঝি এমন করিত না। নিজের স্ত্রীকে দশের কাছে এমন হীন এত অবহেলার পাত্রী করিয়া তুলিতে, তাহারও কি মানের খর্ব্ব হইতেছে না? আসল যাহা ভালবাসা, তাহা কি এমনি? সে যে বড় পবিত্র, বড় মধুর, সে যে স্বার্থগন্ধহীন, কামনায় কলুষিত নয়। প্রেমের দুকূলপ্লাবী তরঙ্গ বড় বেগবান গতিতে প্রেমিকার দিকে ছুটে, কোন বাধা কোন বিঘ্ন মানে না। সে যদি আমায় ভালবাসিত, তবে এই দুঃখ কষ্টভরা জগতের মাঝখানে, আমার প্রাণে প্রেমের আলো জ্বালিয়া দিয়া, আমায় চিরসুখী করিয়া রাখিত। সংসারের কোন বাধাই তাহার ও আমার মিলনের পথে কাঁটা হইত না। আমায় যদি সে প্রাণ দিয়া যথার্থই ভালবাসিত, তবে কোন অসুবিধা কোন কষ্টই সে মানিত না। তাহার প্রাণ কেবল আমাকেই চাহিত, সংসারের কোনও দিকই দেখিত না।

আজ বুঝিয়াছি, যাহাকে সে ভালবাসা বলিত, আমি যাহাতে আত্মহারা হইয়াছিলাম, যাহার স্মৃতি আজিও সমস্ত দেহকে কণ্টকিত করিয়া তুলে, তাহা কি। তাহা প্রথম জীবনের আকুল উন্মাদনা, তীব্র আকাঙ্ক্ষার বহ্নি। সে ত মনপ্রাণ-স্নিগ্ধকারী পবিত্র স্বর্গীয় ভালবাসা নয়! আর যদি সত্যই একদিন সে আমায় ভালবাসিয়া স্নেহ করিয়া থাকে, যদি একবিন্দু সেই স্বর্গের জিনিষ তাহার কাছে আমি পাইয়া থাকি, তবে সে কখনই আমায় ত্যাগ করিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিবে না। একদিন—যে দিনই হোক—আবার তাকে আমার কাছে আসিতে হইবে, আবার 'অমু' বলিয়া ডাকিতে হইবে, বলিতে হইবে—"যা করেছি, তা ভুল; যে পথে এতদিন ঘুরেছি, তা ভুল; আমি তোমার, তুমি আমার।"

সেই দিনের আশায় আমি বসিয়া আছি। জানি না, সোণার বসন্ত আমার জীবনে কখনও আসিবে কি না। যদি তা না হয়, এ আকুল তৃষা ব্যাকুল হাহাকার যদি আমার এ জীবনে না ঘুচে, হে নারায়ণ, তবে যেন প্রলয়ের ভীষণ ঝঞ্ঝা আমার মাথায় শত দিক হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রভু, স্বামীর চির-উপেক্ষিত এ প্রাণ যেন উন্মাদ হাহাকারে চামুণ্ডার অট্টহাস্যে সেই প্রলয়ের মাঝখানে মাতিয়া উঠে, এই ১৮ বছরের দারুণ ব্যথা বুকে লইয়া যেন সেই প্রলয়ে মিশিয়া যাই; এ জগৎসংসারে আমায় যেন আর মুখ না দেখাইতে হয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৺অমিয়বালা দেবী।

পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার

রাজসাহী জেলার স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার বসন্তকুমার রায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কুমার বসন্তকুমার তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অকাল মৃত্যুর দুঃসহ শোকে যৌবনারম্ভেই সংসার ধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন, সেই জন্য একান্ত আপনার জন ব্যতীত, সংসার তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণরাশির বিশেষ পরি-

চয় লাভ করিতে পারে নাই। অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া রাজকুমারেরা চারি ভ্রাতা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাধীনে বাল্য এবং ছাত্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন;—এই ছাত্রজীবনেই বসন্তকুমার বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও চরিত্রের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় শ্রীমন্ত ঘরের আদরের দুলালগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য না হইলেও, দুঃসাধ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এম এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত যতগুলি পরীক্ষা আছে, তাহার সকলগুলিতে তিনি কায়ক্লেশে কেবল মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নহে, কোনও পরীক্ষাতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের নিম্নে আর তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। বি-এ পরীক্ষায় সাহিত্য এবং দর্শনে 'ডবল অনার্স' লইয়াও অনায়াসে তিনি পার হইয়া গিয়াছেন; সর্ব্বাপেক্ষা নীরস যে ব্যবহার শাস্ত্র, তাহার পরীক্ষাতেও তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বান্ধব-মণ্ডলী এবং আত্মীয়স্বজন যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবলমাত্র পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য বসন্তকুমারের একান্ত পক্ষপাতী হন নাই;—যৌবনারম্ভে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান হইয়াও তিনি যে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, ইহা অনেকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও হয়ত বা নিতান্ত অসাধ্য নহে; কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং সুস্থ সুন্দর সবল ও নীরোগ এই রাজনন্দন, দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ক্রম কালে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সঙ্গসুখ হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াও, নিজের চরিত্রের নির্ম্মলতা যেরূপ ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, কেবল তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণ কেন, আপামর সাধারণ সকলকেই একান্তভাবে তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতে হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিভব, যৌবন ও প্রভুত্ব—ইহার একটিতেই যে অনর্থ উৎপাদন করে ইহা শাস্ত্র-বচন, এবং সকলগুলি একাধারে বিদ্যমান থাকিলে, উৎসন্নের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় ইহাও মহাজনেরই পরম সত্য, অভ্রান্ত ও অস্খলিত বাণী। কিন্তু বসন্তকুমারের জীবনে ইহার সকলগুলির একত্র সম্মিলন অমৃত উৎপাদন করিয়াছিল। বাইশ বৎসরের উন্মুখ যৌবন, মোহময় সংসারের অদম্য প্রলোভন এবং অফুরন্ত কুবের ভাণ্ডার—ইহারা কেহই বসন্তকুমারকে তাঁহার যোগী-জীবনের কণ্টকময় কঠোর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

স্ত্রীবিয়োগের মরণাশৌচের দিন হইতে বসন্তকুমার যে হবিষ্যান্ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বদেশে বিদেশে, রোগে স্বাস্থ্যে, কোন স্থানে বা অবস্থাতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি একদিনের জন্যও করেন নাই। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ 'ক্যান্সার' ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন চিকিৎসকের আদেশেও তাঁহার ভোজ্য ভোজনাদি যাবতীয় কার্য্যের কোন ব্যতিক্রম তিনি ঘটিতে দেন নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয়-দমন, আচার নিষ্ঠা, ধর্ম্মে আস্থা, কর্ম্মফল ও অদৃষ্টে বিশ্বাস এবং দয়া দাক্ষিণ্য পরহিতৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার চরিত্রকে সত্য সত্যই মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বোপরি, তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে সংযম এবং ইন্দ্রিয়-দমনের শক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পুরাণোক্ত ভারতীয় ঋষিগণের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। সময় ও অবস্থাবিশেষে মুনির মনও টলিয়াছে, ঋষি-চিত্তও চঞ্চল হইয়াছে, যোগিজনেও যোগপথভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু ষট্‌চত্বারিংশ-বর্ষব্যাপী বসন্তের জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই, বারেকের জন্যও তাঁহার পদস্খলন হইতে পারে নাই।

বসন্ত তাঁহার জীবনবসন্তেই প্রিয়জনের বিয়োগবেদনায় একান্ত কাতর হইয়া সংসারধর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও আভিজাত্যের বলে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা সংসারের অপরাপর কর্ম্মে যে স্থান অধিকার করিয়া যে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার যোগী-হৃদয়ে দেশপ্রীতি এবং পরহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি যে কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার একান্ত

আপনার জন ব্যতীত অপরে জানিতে পারে নাই। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তিনি সংসার হইতে সুদূরে সরিয়া নিভৃত পল্লী-নিকেতনে নিতান্ত নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বীয় জীবিকার জন্য অতি সামান্য অর্থেরই প্রয়োজন হইত। তাঁহার বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির উপস্বত্বের অধিকাংশ যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজসাহী কলেজের Chair of Agriculture-এর জন্য সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহী কলেজ কুমার বসন্তের পিতা রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের অর্থেই একরূপ স্থাপিত। সেই কলেজের প্রতি বসন্তের অকৃত্রিম প্রীতি কি পরিমাণে ছিল, তাহা এই দান হইতে বুঝিতে পারা যায়। বিপত্নীক নিঃসঙ্গ জীবনের রোগে স্বাস্থ্যে সুসময়ে অসময়ে যাহারা এই রাজকুমারের সেবা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুকালে কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিয়া যান নাই—সকলকেই যথাযোগ্য দান করিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্তও দানরূপে তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে।

এই ইন্দ্রিয়-সংযমী মহাপ্রাণ পুরুষের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ আজ যে অকৃত্রিম সুহৃৎকে হারাইল, আর কবে কে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করতঃ এই অভাবের বেদনা ভুলাইয়া দিবে তাহা তিনিই বলিতে পারেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে যাহা যায় তাহা শীঘ্র আর ফিরিয়া আইসে না; যেমনটি আমরা হারাই, তেমনটি আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না; বিয়োগের বহ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র আমাদের সম্বল—নিভৃত নিশীথের অশ্রুনিষেক। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির নিয়মে বসন্তের অভাবে তাঁহার স্বজনবর্গের যে ক্ষতি আজ হইল, দেশবাসী আমাদের ক্ষতি তদপেক্ষা কম নহে। সহানুভূতিতে যদি কোন সান্ত্বনা হয়, সেই আশায় শোকার্ত্ত রাজপরিবারকে আমরা আমাদের একান্ত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি; এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, বিয়োগ-বেদনাতুর বসন্তের বিরহী হৃদয় যেন প্রিয়-মিলনের নির্ম্মলানন্দে আনন্দ-লোকে চিরশান্তি লাভ করে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

লোকমান্য তিলকের পরলোক-গমনে

ভারত-গৌরব বীর, এ রৌরবে মন্দারের
সৌরভের প্রায়,
ক্ষণেক মাতায়ে দিক্ মিশে গেলে স্বরগের
কোন মহিমায়।
তুমি বিনা ভারতের ললাটের এ কালিমা
আর কেবা হরে?
তোমারে হারায়ে তাই হাহাকার হা হুতাশ
উঠে ঘরে ঘরে।

বনস্পতি জীর্ণশাখ দগ্ধশির দীর্ণবক্ষ
অশনি সম্পাতে,
স্বনাথে বাঁচালে তবু কোটরে, কুলায়ে রাখি
বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতে;
ধন্য তুমি ত্যাগ-বীর! ভারতের মহামন্ত্র
জেনেছিলে সার—
ফলে স্পৃহা-ভ্রান্তিমাত্র, কর্ম্মে শুধু সকলের
আছে অধিকার।

জ্ঞানহীন মূঢ় তব ভ্রাতৃগণে সাথে লয়ে
অন্ধকার হতে,
দেশ-জননীর কর সন্তর্পণে হাতে ধরি
এলে রাজপথে।
অক্লান্ত কঠোর শ্রমে আজি তুমি ক্লান্ত হলে
ওগো কর্ম্মবীর,
আজি বক্ষ শূন্য হল দেশের জীবন লাগি
ঢালিয়া রুধির।

চির-কামনার ধন যাও সে অমৃত ধামে,
লীলা সাঙ্গ করি,
হো'ক পন্থা ক্ষেমময় হরিচন্দনের গন্ধে
রো'ক তাহা ভরি;
তোমার আলোক-মূর্ত্তি সৌম্য শান্ত সুপ্রসন্ন
ভাস্বর মোহন,
উজলি আঁধার দেশ জেগে রবে বরাভয়
করি বিতরণ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থ-সমালোচনা

টীয়ামাকী।—শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত মহালানবীশ প্রণীত। হাওড়া ৪নং তেলকলঘাট রোড কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ১২ পেজী ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ বাঁধানো ৸০

ইহা একখানি উপকথা গ্রন্থ। গল্পটির আখ্যান বস্তু সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান উপাখ্যানটি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করতঃ সাধুসংসর্গে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অনতীত ষোড়শবর্ষীয় একটি বালক কিরূপে আপন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতঃ মাতৃদুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

আমাদের দেশের প্রাচীন উপকথাগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া উপন্যাসের আকারে লিখিতে পারিলে বেশ চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি লেখক সেই রকম করিয়াই লিখিয়াছেন। এ জন্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভাষাটি ঠিক গল্পেরই মত, বেশ ঝরঝরে সরল ও সুন্দর। লেখকের রচনা-নৈপুণ্য আছে। একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। গল্পটির স্থানে স্থানে কতক কতক অংশ বাদ দিলে অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বেশ কৌতূহল ও আনন্দ উপভোগ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নীতি শিক্ষাও লাভ করিবে।

গ্রন্থখানির কাগজ ও ছাপা ভাল।

"কমলাকান্ত।"

প্রধী কর্ম্মকার বা কর্ম্মার ক্ষত্রিয়—একজন Researcher সংকলিত ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায় বর্ম্মণ কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৬+১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲।

পুস্তকখানিতে জাতীয়তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কতকগুলি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সংকলয়িতা বহু প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত ও অন্য ভাষার গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমাদের আর্য্যসমাজে ক্ষত্রিয় জাতি দেশ রক্ষা ও শত্রু প্রতিরোধ কর্ম্মের সহিত, নানাপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যনিচয়-নির্ম্মাণ যথা অস্ত্রশস্ত্রাদি, স্বর্ণরৌপ্যাদি-নির্ম্মিত আভরণ, ধাতুনির্ম্মিত নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁহাদের ঐ সকল কার্য্য অধিক পরিমাণে করাতে পুরুষানুক্রমে তাহা বৃত্তিগত হইয়াছে, তাঁহারাই প্রধী কর্ম্মকার বা কর্ম্মার-ক্ষত্রিয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য যুদ্ধ-বিগ্রহের অভাবে ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে, কালে তাঁহাদের উপনয়নাদি সংস্কার রহিত হইয়া গিয়াছে। পুস্তকে পূর্ব্বাভাষ ও অন্ত্যাভাষ ব্যতীত, উৎপত্তি-রহস্য, বিরোধ-নিরসন ও বিশিষ্টতা-প্রমাণ শীর্ষক তিনটী অধ্যায় আছে। শীর্ষোক্ত বাক্যগুলি দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সূচিত হইতেছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আধুনিক কর্ম্মকার জাতীয় ব্যক্তিগণ নিজ পূর্ব্বগৌরব স্মরণে মনকে উন্নত করিতে পারিবেন। তবে যদি তাঁহারা ঐরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ব আচরিত শিল্পকার্য্যগুলির আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত প্রণালী অবলম্বনে নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তাহা হলেই তাহা দ্বারা সমগ্র দেশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বন্ধন দৃঢ় হইবে এবং তাঁহাদের সমাজের সহিত দেশেরও মুখোজ্জ্বল হইবে।

"বাণীসেবক।"



সন্ধ্যা গায়ত্রী

ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতা
ত্রিনেত্রা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবতা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া —

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড | আশ্বিন, ১৩২৭ | ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

ভারতে শ্রমশিল্পের ধারা

সম্প্রতি একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িতেছিলাম। শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তার "দেবোত্তর বিশ্বনাট্য" নানা কারণে অপূর্ব্ব। বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ বোধ হয় বেশী নাই। লেখিকা রূপকের আবরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের দরবারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শ্রমিক ও ধনিক সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ বিদেশী সাহিত্যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যা নাটকে আলোচিত হইতেছে এবং নাটকের সাহায্যে এই সকল আন্দোলন আলোচনা জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হইতেছে। ইহা অনেকাংশে জনমত গঠনের সহায়ক হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীমতী সরযূবালা সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তবে তাঁহার আলোচ্য বিষয় এখনও এদেশে এমন আকার ধারণ করে নাই যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সুতরাং সে হিসাবে এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

সে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে শিল্পব্যবসায় যেরূপ দ্রুতবেগে উন্নতির মার্গে ধাবিত হইতেছে, তাহাতে এই সমস্যাই যে ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় শ্রমিক ইউরোপীয় শ্রমিক অপেক্ষা কার্য্যপটুতায়, কষ্ট সহিষ্ণুতায় ও শিক্ষা দীক্ষায় হীন। ভারতীয় শ্রমশিল্প ইউরোপীয় প্রণালীতে চালিত হইলেও, ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাস হইতে আমরা অনেক বিষয় শিখিতে পারি। অনেক বিষয়ে ইউরোপের ভুলভ্রান্তি পরিহার করিয়া ভালটুকু ছানিয়া লইতে পারিলে আমরা বাস্তবিকই উপকৃত হইব। কিন্তু অনুকরণ-প্রিয়তা আমাদের এমন মজ্জাগত যে, অন্যান্য বিষয়ের ত কথাই নাই, এ বিষয়েও ভারত অন্ধভাবে ইউরোপের প্রদর্শিত পথে চলিতেছে।

ইংলণ্ড ও ভারতের অবস্থায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, ক্ষুদ্রায়তন ও শ্রমশিল্পের বিশেষ উপযোগী। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান, সুজল, সুফল—কৃষিপ্রধান। কৃষিই আমাদের প্রধান সম্বল। শ্রমশিল্প আমাদের আবশ্যক হইলেও, কৃষির মত অপরি-

হার্য্য নহে। কারণ প্রাণরক্ষার জন্ত খাত্ত আবশুক, তাহার পর বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি। কিন্তু এত আবশুক হইলেও, কৃষির উন্নতির প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি জনসাধারণের নাই—সরকারী চেষ্টায় কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু দেশের আয়তন হিসাবে তাহা অতি সামান্ত।

কৃষি-শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি ছাত্রাভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। যে কয়জন পড়িতেছেন, তাঁহারাও সরকারী চাকুরী-প্রার্থী। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিপ্রণালী এখনও এ দেশের অনেক স্থলে অজ্ঞাত। যেখানে যেখানে কৃষক সম্প্রদায়কে এই প্রণালীর সহিত পরিচিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেখানে হয় অজ্ঞতাবশতঃ ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে, বা দারুণ দারিদ্র্য বশতঃ নূতন প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে ভারতীয় কৃষির অবস্থা যে খুব আশা-প্রদ তাহা মনে হয় না। দেশের লোক জীবন ধারণ করে চাউল, গম, জোয়ার, বজরা ইত্যাদি খাইয়া—কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকলের চাষ কমিয়া যাইতেছে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অধিক লাভজনক পাট, ইক্ষু, তুলা, চা'য় চাষে কৃষক মনোযোগী হইয়াছে।

	১৯১৬	১৯১৭
	একর	একর
ধান	৮০,৯৮৮,১২৪	৮০,৬৬৭,৬১৯
গম	২৫,০৪৩,৬৮৬	২৬,৪[illegible]৭,৯০৪
জোয়ার	২১,৮৯১,৯৮০	২১,১১৭,৭৭১
বজরা	১৫,২২৭,৯৫৭	১২,৬৯৯,২৯৭
তুলা	১৩,৮৩৬,৬০৭	১৫,৪০৩,০৮৮
পাট	২,৬৭১,৩০২	২,৭০০,৩২৪
ইক্ষু	২,৬১৪,৭৮৮	২,৯৯২,৬১৬
চা	৬০৩,৫১০	৬১৮,৯২২

গমের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও, অনেক পরিমাণে ইহা বিদেশে চলিয়া যায়, সুতরাং দেশ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান বলিয়া, ভারতের বল ছিল বৃক্ষগুল্ম বেষ্টিত সুরম্য পল্লীতে; নগরের সংখ্যা অধিক ছিল না এবং লোকে নাগরিক হইতে ভালবাসিত না। গ্রামে দোল দুর্গোৎসব, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সদা অনুষ্ঠিত হইত। জনসাধারণ সুখাদ্য আহার করিয়া, সুপেয় পান করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিত। কিন্তু আজকাল ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতের নগরগুলি বৃহত্তর ও গ্রামগুলি ক্ষুদ্রতর হইতেছে। দেশের প্রাণের স্পন্দন নগরের নিষ্পেষণে কোনও দিন চিরতরে বন্ধ হইবে কিনা তাহা কে জানে? ভারতের নগরগুলির জনসংখ্যা ১৮৭২র পর শতকরা ৬৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। নগরগুলি জনাধিক্যবশতঃ ক্রমশই অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশের বলহীনতা ঘটিতেছে। সহরে কল কারখানা বৃদ্ধি পাওয়াতে, গ্রামে কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত লোকাভাব ঘটিয়াছে। উচ্চ হারে পারিশ্রমিকের লোভে দলে দলে লোক বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রমশিল্পের কেন্দ্র-গুলিতে আসিতেছে। গ্রামে গৃহ-সংস্কার করিতে রাজ-মিস্ত্রী, ঘরামি মেলে না, ক্ষেতে কায করিবার নিমিত্ত বিদেশী সাঁওতালের সাহায্য লইতে হয়, বাড়ীর কাযেও চাকর রাঁধুনী পাওয়া যায় না।

এই দুরবস্থা সত্ত্বেও দেশের গণ্যমান্তগণের আন্দো-লনের সীমা নাই—শ্রমশিল্পের উন্নতি-সাধন ব্যতিরেকে ভারতের আর গতি মুক্তি নাই, একথা তাঁহারা ক্রমা-গতই বলিয়া আসিতেছেন। সত্য, কেবল কৃষিদ্বারাই জাতীয় ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায় না, কেবল কৃষিই জাতির সকল অভাব নিবারণ করিতে পারে না। কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতকে কৃষিপ্রধান করি-য়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষে কৃষি উপেক্ষণীয় নহে। কৃষিকে প্রধান করিয়া অপরাপর শিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে—একটাকে মারিয়া অপরকে জীয়াইলে চলিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুকরণ-প্রিয়তা আমাদের মজ্জা-গত। তাই ইংলণ্ডের অনুকরণে আমরা চাই আমা-দের শ্রমশিল্প উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হউক। তাই শ্রমশিল্প অর্থে আমরা বুঝি, লক্ষ লক্ষ

টাকার মূলধনে নির্ম্মিত বৃহদায়তন কারখানা কলঘর, যেথানে শত শত শ্রমজীবী কতিপয় কর্ম্মচারীর তত্বাবধানে একত্র কর্ম্ম করে—যেথানে শ্রমিক ও ধনিকের সম্পর্ক ভর্ত্তা ও ভৃতিকের; এক অপরের মঙ্গল কামনা করে না, বা অপরকে প্রধান হইবার সুযোগ দিতে চাহে না। এই শ্রমীগণ আত্মীয় কুটুম্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একত্র কারখানার নিকট কদর্য্য গৃহে বাস করে। ইহাতে তাহাদের শারীরিক শক্তির হ্রাস হয় ও নৈতিক অধঃপতন হয়। অতএব এই কেন্দ্রীভূত শিল্প ভারতের উপযোগী কি না বিবেচ্য। ভারতীয় শিল্পোন্নতির ধারা ইংলণ্ডীয় ধারার অনুরূপ হইবে না—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই।

পাশ্চাত্য দেশে সকল চেষ্টার উদ্দেশ্য ধনসৃষ্টি। ইউরোপ ও আমেরিকা কেবল ধনসৃষ্টি করিয়াই চলিতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনে সৎ অসৎ সুপথ কুপথের বিচার নাই। একমাত্র ধনের মানদণ্ড দ্বারা সাফল্য নিরূপিত হইতেছে। ইহার ফলে ধন-বৈষম্য আসিয়াছে—সমাজে ধনীদরিদ্রের ব্যবধান বাড়িয়াছে। ধনী, দরিদ্রের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে পুষ্ট হইতেছে এবং দরিদ্র শ্রমী দৈন্যের নিম্নতম সোপানে নামিতেছে। ভারতের চেষ্টা চিরদিন কিন্তু অন্যবিধ। ভারত ধনসৃষ্টির জন্য কখনও লালায়িত নহে। আহৃত ধনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনে ভারত সদা মনোযোগী। যাহাতে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দূর হয়—দেশে অন্নাভাবে কেহ না মরে, পীড়িতের চিকিৎসার অভাব না হয়, ভারতীয় সকল অনুষ্ঠান এই লক্ষ্যই সম্মুখে রাখিয়াছে। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার বর্ত্তমান যুগতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বে জাতীয় জীবনের পোষক ছিল। এক একটী পরিবারে কত অনাথ অনাথা প্রতিপালিত হইত, কত নিরাশ্রয় অন্নহীনের অন্ন-সংস্থান হইত। সুতরাং ইউরোপ ও ভারতীয় ধন-বিজ্ঞানের এই মূলগত পার্থক্য উপেক্ষা করা যায় না। ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং তদনুসারে আমাদিগের শ্রমশিল্পের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন ইংলণ্ডীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির মূল। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান ছিল, শ্রমশিল্প তাদৃশ উন্নত হয় নাই। রাস্তাঘাট ভাল ছিল না। —গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। কিন্তু যখন বাষ্পীয় শক্তি উদ্ভাবিত হইল, রেল ষ্টীমার স্থানের দূরত্ব কমাইয়া দিল, তখন সমস্ত দেশ নানাবিধ কল কারখানায় আবৃত হইল,—এক উদ্ভাবনা অন্যান্য উদ্ভাবনার পথ সুগম করিয়া দিল। দেশময় ধন সৃষ্টির এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা উন্মাদনা আসিল। কৃষি আর তেমন লাভজনক না হওয়ায়, সকলে শ্রমশিল্পে মন সংযোগ করিল।

ইহার পূর্ব্বে সে দেশের শ্রমশিল্পগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে-গ্রাম গুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একটী ওস্তাদ কারিগর তাহার কুটীরে বসিয়াই কর্ম্ম করিত এবং কতিপয় শিক্ষার্থী যুবক তাহাকে কর্ম্মের সহায়তা করিত। এইসকল শিক্ষার্থী বহুবর্ষ কর্ম্ম করিবার পর নিজে ওস্তাদ হইয়া বসিত। এই প্রথায় অনেক সুবিধা ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ ছিল না, তাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হইত এবং উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ থাকিত না। শিক্ষার্থিগণ গ্রামে বাস করিত বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিত। অচিরে ওস্তাদ হইবার আশা সম্মুখে থাকায় তাহাদের কর্ম্ম শিখিবার উৎসাহ থাকিত; অসন্তোষের কোন কারণ থাকিত না।

কিন্তু শ্রমশিল্পের এই নূতন যুগে এ সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র গ্রামের উপকণ্ঠে কাঠের এক লম্বা চালা—তাহাতে অনেকগুলি তাঁত খাটান। ওস্তাদ ও তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে কায করিতেছে। কর্ম্মের শ্রম দূর করিবার মানসে কেহ কেহ গান ধরিতেছে, তাহাতে আর সকলে যোগ দিতেছে। নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষ হইতে একটি পাখী ডাকিতেছিল, একটি যুবক উৎসাহের সহিত তাহার অনুকরণ করিতে লাগিল। সকলের মুখ অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত শ্রমশীলতা ও পরিপূর্ণ

তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। মধ্যাহ্নে ওস্তাদের কন্যা সকলের জন্য খাদ্য আনিল। এই খাদ্য সকলে পরিতোষের সহিত একত্র ভোজন করিল। তাহার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কায চলিল।

এই নবযুগে এই পট পরিবর্ত্তিত হইল। এখন আমরা দেখিতেছি এক বৃহৎ সৌধ, তাহার মধ্যে অসংখ্য কল কব্জা। কারখানা চিমনী হইতে অবিরত ধূম নির্গত হইয়া স্থানটীর চারিদিকে এক বিষণ্ণভাব জাগ্রত রাখিয়াছে। অবিরত কলের চলাচলের কর্ণভেদী শব্দ। কারখানার ভিতরে অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা যে যাহার কর্ম্ম নীরবে করিতেছে, কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছে না—সকলেই এই বৃহৎ যন্ত্রটীর অঙ্গস্বরূপ। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিদায়-সূচক ঘণ্টা বাজিল। কারখানার দ্বার দিয়া এই অসংখ্য নরনারী বাহির হইয়া গেল। মলিন মুখ, নৈরাশ্যখিন্ন—সারাদিন ব্যাপী আসুরিক পরিশ্রমের ফলে নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য। জীবনে কোন সুখ শান্তির আশা নাই—কোনমতে দিনপাত হইতেছে মাত্র। রমণী সারাদিন শিশু পুত্রকন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহারা কি খাইয়াছে কি করিয়াছে তাহা সে জানে না—অভাগিনী উদরের জন্য কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে। দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকা—তাহারাও বাল্য চপলতা পরিহার করিয়া এই যন্ত্রের যন্ত্রী হইতে আসিয়াছে। সকলে বাসায় ফিরিল। কদর্য্য আহার, তাহাও অল্প পরিমাণে, তাহাদের সারাদিনের পরিশ্রমের ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। তাহার পর ক্ষুধা শান্তি করিতে পুরুষ ছুটিল মদের দোকানে, সুরাদেবীর অর্চ্চনায় সমস্ত গ্লানি ও ক্লান্তি ডুবাইতে। হায়! এই পূজার অঞ্জলি হয়ত তাহার সারা সপ্তাহের বেতন। গৃহে অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত স্ত্রী পুত্র রহিয়াছে, কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। যেমন খাদ্য, শয়নের স্থানও তদ্রূপ। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ৩০।৩৫ জন নরনারী, বালক বালিকা কোনমতে শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে, সুনীতি বা সুরীতি রক্ষা কি সম্ভবে?

যেখানে এই দরিদ্র শ্রমিকগণের জঘন্য বাসভূমি, তাহার নিকটে শ্রমিকের শ্রমলব্ধ অর্থে পুষ্ট ধনীর সুরম্য প্রাসাদ। তাহার কক্ষে কক্ষে উজ্জ্বল আলোক,—পান-ভোজনের শব্দে গৃহ মুখরিত। ঐশ্বর্য্য, ধনমত্ততা গৃহের প্রত্যেক কোণ হইতে নিজের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। দৃপ্ত ধনী তাঁহার দরিদ্র শ্রমীদিগের প্রতি বিমুখ। তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তাহারা অর্থের বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করে, সুতরাং ধনী ও শ্রমিকের সম্পর্ক ঈসপ কথিত বৃদ্ধ ঘোটক ও তাহার প্রভুর অনুরূপ। যতদিন শ্রমিকের দেহে বল আছে, যতদিন সে কর্ম্মপটু, ততদিন প্রভু তাহার আদর করেন, বেতন দেন, কিন্তু সে মরিল কি বাঁচিল সে অনুসন্ধান তিনি আবশ্যক মনে করেন না। ইহার ফলে শ্রমিক তাহার প্রভুকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না।

বলা বাহুল্য, এই কুব্যবস্থার ফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হইল না। অল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিল। একদিকে আশাতীত পরিমাণে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছিল, অন্যদিকে জাতির এক অংশ অন্নাভাবে ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। ধনলোলুপ ধনীর ধনাহরণের প্রবল চেষ্টা, দরিদ্র শ্রমীর অর্ঘ্যে স্ফীত হইতেছিল। স্বার্থের দারুণ আবর্ত্তে পরার্থ ভাসিয়া গিয়াছিল।

মধ্যে মধ্যে Ashley (অ্যাশলি) প্রমুখ মহানুভবগণ শ্রমীদিগের দুঃখমোচন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পার্লামেণ্টে ধনীদিগের প্রভাব প্রবল ছিল বলিয়া এই চেষ্টা সফল হইল না।

দেশে যখন এমন দারুণ অসন্তোষ, এই সুযোগে জার্ম্মাণী হইতে সোসিয়ালিজম্ বা ধন-সাম্যবাদ ইংলণ্ডে আসিল। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা প্রবল হইল। রাজা প্রজা উভয়েই এই মতের বল দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিক উচ্চকণ্ঠে দাবী করিল যে, কারখানার শ্রম লঘু করা হউক, অল্পবয়স্ক শিশু গুরুশ্রম করিতে পারিবে না, শ্রমের বেতন বর্দ্ধিত হউক, সব ধন সাধা-

রণের হউক, ধনীর নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকিতে পাইবে না। এই মতবাদীদিগের মধ্যে উগ্র প্রকৃতির যাঁহারা, তাঁহারা মানস চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে—অদিবলে ধনী সম্প্রদায় দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার স্থানে এক নূতন সমাজ গঠিত হইয়াছে, যেখানে ধনী দরিদ্র নাই, উচ্চ নীচ নাই। সকল সম্পত্তি, সকল ধন সাধারণের, কৃষিকর্ম্ম সাধারণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়, প্রত্যেকে অভাবানুযায়ী তাহার উপসত্ব ভোগ করিয়া থাকে।

এই আন্দোলনের ফলে শ্রমীদিগের অনেক দুঃখ দূর হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক অবশিষ্ট রহিল। শ্রমী-ধনীর সম্পর্ক পূর্ব্ববৎ সেইরূপ নির্ম্মম থাকিলেও, ধনী, শ্রমীদিগের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর বাসভবনের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন, শ্রমের সময়ও হ্রাস পাইল।

এমন সময় জর্ম্মাণ সমর আসিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরই, গভর্ণমেণ্ট সকল কল-কারখানা নিজেই পরিচালন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকলের এক মাত্র লক্ষ্য হইল যুদ্ধজয়—ইহার জন্য সর্ব্ব প্রকার পারিবারিক কলহ সকলে ভুলিয়া গেল। যুদ্ধের সময় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অসম্ভব পরিমাণে বাড়িয়া গেল। তাহাতে শ্রমীদিগের বেতনও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু বৃদ্ধি সমান হারে হইল না, বা সকল শ্রেণীর শ্রমী পাইল না। যাহারা আন্দোলনে পটুতা দেখাইতে পারিল, তাহারাই জিতিল। লৌহ কারখানার শ্রমীগণের মজুরী এক বৎসরের মধ্যে ১৫ পনর শিলিং বাড়িল, কিন্তু রাজমিস্ত্রীগণ পূর্ব্বের বেতন পাইতে লাগিল। লণ্ডন পুলিস বিভাগে অসন্তোষ কমাইবার নিমিত্ত তাহাদের বেতন সপ্তাহে ৭০ সত্তর শিলিং করিয়া দেওয়া হইল। ১৯১৭।১৮ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যখন শতকরা ৪৩ হারে বাড়িয়াছিল, ইঞ্জিনিয়ারদিগের বেতন তখন ৩৫ শিলিং বৃদ্ধি পাইল। রেল বিভাগ, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিল। সেই জন্য রেল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অসন্তোষ পূর্ণ মাত্রায় রহিল। তাহাদের আবেদন আন্দোলন গবর্ণমেণ্ট শুনিলেন না—কারণ অন্যান্য শ্রমীদিগের অতি উচ্চহারে বেতন বৃদ্ধিতে গভর্ণমেণ্ট নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার ফলে রেল কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট করিল, আড়াই লক্ষ লোক কর্ম্ম ত্যাগ করিল। কিন্তু এবার গভর্ণমেণ্ট দৃঢ় হইলেন, এই ধর্ম্মঘট বশতঃ কার্য্যের বিশৃঙ্খলা সত্বেও গভর্ণমেণ্ট বেতন বর্দ্ধিত করিলেন না।

এখন ইংলণ্ডে শ্রমীগণ আর ধনীর অধীনে কর্ম্ম করিতে চাহে না—তাহারা বলে যে, নিজের স্বার্থের নিমিত্ত এতদিন ধনীগণ নির্দ্দয়তার সহিত শ্রমীগণকে খাটাইয়াছেন, শ্রমীর অর্থে পুষ্ট হইয়াছেন; আর শ্রমীগণ এই প্রকার দাসত্ব সহিবে না। এখন সকল সম্পত্তি, সব কলকারখানা সাধারণের হউক, শ্রমীদিগেরও কর্ত্তৃত্ব থাকুক। এতদিন গভর্ণমেণ্ট শ্রমী ও ধনীর মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া কোনরূপে জোড়া তাড়া দিয়া সারিয়াছেন। এখন শিল্প ব্যবসায়ের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, শ্রমশিল্পের ভিত্তি বদলাইতে হইবে। নূতন ভিত্তির উপর নূতন সৌধ দাঁড়াইবে। স্ব-স্বার্থ চিন্তার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না। দেশের প্রত্যেক লোকের মনে এই ধারণা হওয়া উচিত যে, সে কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের ভৃত্য নহে, সে সাধারণের ভৃত্য।

প্রধান প্রধান ব্যবসায়গুলি অর্থলিপ্সু ধনিকের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, কয়লার খনি, রেল লাইন, ডক, ইলেকট্রিকের কারখানা, সকল শ্রেণীর জাহাজ—সরকারি কর্ত্তৃত্বে আসা উচিত, কারণ ধনিক ভৃতিকের মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ ইহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বা কার্য্য সুপরিচালিত না হইলে জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি ও দুর্দ্দশার আশঙ্কা আছে। বিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নির্দ্ধারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন (The Whitley Reports):—

ব্যবসায়গুলি যথাসম্ভব সরকারী কর্ত্তৃত্বে আনিতে

হইবে। ইঁহাদের পরিচালনে শ্রমিকদের প্রভাব বর্দ্ধিত করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে পঞ্চক গঠিত হইবে, ইহাতে শ্রমিক ও ধনিক প্রতিনিধি স্থান পাইবে। এই পঞ্চক, মজুরী ও শ্রমের সময় নির্দ্ধারণাদিতে পরামর্শ দিবেন এবং শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে আপোষে সেই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সহিত শ্রমিকগণের যাহাতে অবস্থার উন্নতি হয় সে বিষয়েও ইঁহারা দৃষ্টি দিবেন।

অতএব বিলাতে ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছি যে, ধনিকের প্রধান্য অল্পকালই প্রবল ছিল। বৃহদায়তন কল-কারখানা যে ব্যবসায়ের প্রাণ, শত শত নর-নারী যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধনিকের ধন যাহার রুধির, সে ব্যবসায় দেশে সুখশান্তি না আনিয়া যে দারুণ দুঃখ ও সামাজিক বৈষম্যের সৃজন করিয়াছে তাহা আর বিচিত্র কি! এক দিকে ধনিকের ধনলিপ্সা যেমন ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছিল, শ্রমিকও দ্রুতবেগে দারিদ্র্যের সোপানে অবতরণ করিতেছিল। অবশেষে দুর্দ্দশার চরম সীমা যখন আসিল, যখন শ্রমিকের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়, তখন সে একবার অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইল এবং এই প্রতিবাদের ফলে আজ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শ্রমজীবীর প্রধান্য, শিল্প ব্যবসায়ে শ্রমিকের এমন প্রতাপ।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ইংলণ্ডের শিল্প-ব্যবসায়ের ইতিহাসের সেই অঙ্কগুলি এখানেও অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতিকায় কল-কারখানা, পূর্ব্বের সেই কুটীর-শিল্পগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। যেখানে একজন কারিগরের অধীনে দশ পনের জন শ্রমিক সুখে তৃপ্তিতে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিত, আজ ধনিকের অর্থপুষ্ট বৃহদাকার কলবাড়ীতে অসংখ্য নর-নারী তাহাদের দুঃসহ জীবনের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের অভাব প্রয়োজনের অন্ত নাই—অথচ অভাব নিবারণেরও উপায় নাই। অর্দ্ধভুক্ত, বস্ত্রহীন, সহায়-সম্পদহীন হইয়া তাহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে; অর্থলোভে সুদূর গৃহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া, দেশের ও নিজের ক্ষতি করিতেছে। ক্ষেত্রগুলি অকর্ষিত, গৃহে পরিবারবর্গ অনাহারে আছে, অথচ এই প্রবাসী শ্রমিক সারাদিনের পরিশ্রমের পর কষ্টার্জ্জিত অর্থ অপরিমিত মদ্যপানে উড়াইয়া দিতেছে।

ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বাড়িয়াছে। দ্রব্যাদির সাময়িক দুর্ম্মূল্যতা শ্রমিকের দুর্দ্দশা বৃদ্ধির সহায় হইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যেই কত বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। জমসেদপুর, জামালপুর, খড়্গপুরের ধর্ম্মঘটের কথা কেহই ভুলেন নাই। এই সকল স্থানে, শ্রমিকগণ দলবদ্ধ হইলে কি শক্তি, কি তেজে বলীয়ান হইতে পারে, তাহার আভাস দিয়াছে। স্থানে স্থানে শ্রমিক সমিতি গঠিত হইতেছে। এই সমিতিগুলি শ্রমিকের শুভচিন্তা করিবে, উৎপীড়ন নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে, এবং আসন্ন শ্রমিক-ধনিক সংঘর্ষে এই সমিতিগুলি শ্রমিককে পরিচালন করিয়া তাহার বলবৃদ্ধি করিবে। অতএব ধনিকগণ এখনও সাবধান হউন। আমাদের দেশে কেন্দ্রীভূত ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হউক—তাহা হইলে এই সমস্যার পূরণ হইবে, দেশে কৃষি ব্যবসায় উভয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে এবং অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিকের আর্ত্তনাদ দেশের লোককে আর শুনিতে হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় শিল্প ব্যবসায় বিলাতী ধারায় চলিতে পারিবে না—চলিলে ফল শুভ হইবে না। আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইবে,—অন্ধ অনুকরণে সুফল মিলিবে না। ভারতবর্ষ হইতে কল কারখানা একেবারে উঠিয়া যাউক-এমন কথা আমি বলিতেছি না। দেশের লোক, অনাদরে মৃতপ্রায় কুটীর শিল্পগুলিকে সঞ্জীবিত করুন, ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের চরম উৎকর্ষ ইহাদিগের দ্বারাই সাধিত হইবে।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একাদাশী চক্রবর্ত্তীর বংশ পরিচয়।

সরবৎ পান করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুষ্কমুখ সরস করিয়া কহিলেন, "আমার বাবা সদরওয়ালা, ঘুষখোর, আর কৃপণ ছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর দুই ছেলের জন্যে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে যেতে পেরেছিলেন। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার কনিষ্ঠ আমার চেয়ে আট বছরের ছোট ছিল; কুড়ি বছর আগে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, তার মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ছিল ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরের যখন চব্বিশ বছর বয়স, আর আমার যখন বত্রিশ বছর বয়স, তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়,—সে ঘটনাটা প্রায় একত্রিশ বৎসর আগে ঘটেছিল। পিতার মৃত্যু কালে ভুবনেশ্বর অবিবাহিত ছিল। পিতার মৃত্যুর কয়েকমাস আগে সে ফিলজফিতে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছিল। আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কিছুমাত্র মিল ছিল না। আমি হয়েছিলাম আমার বাপের মত—ছোট চোখ, বেঁটে, কৃপণ; সে হয়েছিল আমার মার মত,—বড় বড় চোখ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, খুব মুক্তহস্ত। কেবল বাবার মত গৌরবর্ণ হয়েছিল, আর আমি আমার মার মত কালো হয়েছিলাম।

ডাক্তার। কৈ, আপনার বর্ণ ত কালো নয়।

চক্রবর্ত্তী। পাগলামী কোর না, ডাক্তার! আমার বর্ণ ত কালো বটেই; আমার ভাইয়ের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করলে, তোমারও বর্ণ কালো। তার মূর্ত্তি ছিল, শ্বেতপাথরে গড়া মহাদেবের মূর্ত্তির মত।

তারক। কৈ, তোমার এই ভাইকে ত আমরা কখনও কলকাতায় দেখি নি।

চক্রবর্ত্তী। কেমন করে দেখবে? পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে, সে এইখানে থেকেই লেখাপড়া শিখত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর এই বাড়ী আমার হস্তগত হলে, আমি কখনও তাকে আমার বাড়ীতে থাকতে দিতাম না; মনে হত, তার উদার হস্তের স্পর্শে আমার যত্ন-সঞ্চিত সর্ব্বস্ব বাজীকরের গোলকের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং সে কলকাতায় এলে, তার কোন বন্ধুর বাড়ীতে বাস করত। ঐ বন্ধুর মৃত্যু হলে, সে ইদানীং আর কলকাতায় আসত না; পল্লীগ্রামে বাস করত।

তারক। তোমার ভাই খুব দাতা ছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। তার মত দাতা তুমি কখনও দেখ নি। দান, দান, দান; দান করে সে তার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ করেছিল। দানযজ্ঞে সে তার জীবন উৎসর্গ করেছিল। মৃত্যুকালে অর্থহীন দীন ভিক্ষুকের মত মরেছিল। কিন্তু আমি শুনেছি, সে হাসতে হাসতে মরেছিল।

তারক। তোমার মা তখন বেঁচে ছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। না; আমার পিতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই আমার মার মৃত্যু হয়। মার মৃত্যু-কালে, আমি কলকাতায় বসে' অর্থ সংগ্রহ করছিলাম, কাযেই আমি তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারি নি; ভুবনেশ্বর তাঁর মৃত্যুকালের শেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিল।

ডাক্তার। আপনার ভাইয়ের কি ব্যারাম হয়েছিল?

চক্রবর্ত্তী। তার ব্যারামের সংবাদ আমি পাই নি। সে সংবাদ, আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভাইয়েরা গ্রাস করে ফেলেছিল। পরে তার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। শুনলাম, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হয়নি। ভাই আমার, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হয় নি? সে

সময় আমার দৈনিক আয় ন'শো টাকারও বেশী; সেই সময়, অর্থাভাবে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা হয় নি। বুঝলে তারক? অর্থাভাবে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা হয় নি। আমি এই যে খাট খানায় শুয়ে আছি. এর দাম পাঁচ হাজার টাকা; এটা তার মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে কিনেছিলাম। তবু, অর্থাভাবে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা হয় নি। ভাই আমার, গরীবের মত বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। আমি বলেছি, ভুবনেশ্বর, কলকাতায় এলে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে বাস করত; মৃত্যুর পূর্ব্বে তার অর্থকষ্টের সময়, অনেকবার তার এই বন্ধু তার বিশেষ সহায়তা করেছিল। সে তার সহপাঠী, দুজনে অভিন্নাত্মা ছিল। আবার এই ডেপুটি বাবুর নাতনীর সে পিতামহ। আমার ভাইয়ের মৃত্যুকালে সে বেঁচে ছিল না; থাকলে, বিনা চিকিৎসায় আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না; সে এসে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে তার চিকিৎসা করাত।

তারক। এই বন্ধুটির নাম কি?

চক্রবর্ত্তী। আমার ভাইয়ের এই অকৃত্রিম বন্ধুর নাম, দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। এই দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের দুই ছেলের আমি সর্ব্বনাশ করেছি।

তারক। কি করে?

চক্রবর্ত্তী। সে কথা পরে বলব। এখন আমার নিজের কথা, অর্থার্জ্জনের কথা বলি। আমি বলেছি, আমার পিতা মৃত্যুকালে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

তারক। মৃত্যুকালে তোমার পিতা তোমাদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তির কি রকম ভাগ করেছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। আগে তাঁর কি কি সম্পত্তি ছিল, শোন। পরে তার ভাগের কথা শুনবে।

তারক। পূর্ব্বে তুমি একবার আমাকে বলেছিলে যে, তোমার পিতা মৃত্যুকালে তোমাকে নগদ চার লক্ষ টাকা আর কলকাতার এই বাড়ী দিয়ে গিয়েছিলেন।

চক্রবর্ত্তী। কলকাতার বাড়ী দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে এ বাড়ী নয়; এ বাড়ীর সামান্য অংশমাত্র। তাতে মোট একবিঘা জমী ছিল, তা ক্রমে বেড়ে বেড়ে এখন সাতায় বিঘারও বেশী হয়েছে।

তারক। তোমাদের পল্লীগ্রামের বাড়ী বুঝি তোমার ছোট ভাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, দেশের বাড়ী জমীদারী দুই ভুবনেশ্বর পেয়েছিল। সে বাড়ী এখনও আছে; জমীদারীর চিহ্নমাত্র নেই। আমার ভাই তা দানে নিঃশেষ করে গিয়েছে।

তারক। তুমি জমীদারীর কিছু অংশ পাও নি?

চক্রবর্ত্তী। না।

তারক। কেন?

চক্রবর্ত্তী। আমারই ইচ্ছামত, বাবা তাঁর সমস্ত নগদ টাকা, আর কলকাতার বাড়ী আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থাই ভাল বুঝেছিলেন; কারণ তিনি ভুবনেশ্বরকে চিনতেন; তিনি জানতেন যে, ভুবনেশ্বর নগদ টাকা পেলে আর কলকাতাতে থাকলে, দুদিনেই সমস্ত ব্যয় করে' নিঃস্ব হয়ে পড়বে। সে পল্লীগ্রামে থাকলে, এই অপব্যয়ের কম আশঙ্কা আছে মনে করে', তিনি পল্লীগ্রামের বাড়ী আর জমীদারী তাকে দিয়েছিলেন।

তারক। এ ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল।

চক্রবর্ত্তী। কিন্তু সেটা মানুষের ব্যবস্থা। ভগবানের পৃথিবীতে মানুষের ব্যবস্থা মত কোন কাযই হয় না।

ডাক্তার। আপনাদের এই পল্লীগ্রাম নদীয়া জেলায়, নয়?

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, নদীয়া জেলায়।

ডাক্তার। গ্রামটির নাম কি?

চক্রবর্ত্তী। গ্রামের নাম রঙ্গণঘাট। আমাদের রঙ্গণঘাটের বাড়ী, কলকাতার সেই বাড়ীর চেয়ে বড় ছিল; কারণ সেইখানেই বিবাহ উপনয়ন পূজা এই সব উৎসব হত। আমরা রঙ্গণঘাট, আর তার আশে পাশের আট দশ খানা গ্রামের জমীদার ছিলাম।

তারক। তোমাদের জমীদারীর কত আয় ছিল?

চক্রবর্ত্তী। মৃত্যুকালে পিতা জমীদারীর আয় রেখে গিয়েছিলেন, বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা।

তারক। এ কি সবই তোমার পিতার স্বোপার্জ্জিত?

চক্রবর্ত্তী। না, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির বাৎসরিক চার হাজার টাকা আয় ছিল। বাবা আরও ভূসম্পত্তি কিনে, বার্ষিক আয় কুড়ি হাজার টাকা করতে পেরেছিলেন। ভুবনেশ্বর এই বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, দানে ব্যয় করে গিয়েছে। দান করে' জগতের আশীর্ব্বাদ নিয়ে, হাসিমুখে স্বর্গারোহণ করেছে। ডাক্তার, তোমরা ত বিজ্ঞানের আলোচনা করেছ; আচ্ছা বল দেখি,—এখনও ত হয়ই নি—ভবিষ্যতে কখনও কি বিজ্ঞানের বলে, মানুষ আপনার সঞ্চিত অর্থ মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যেতে পারবে? আজ আসন্ন মৃত্যুকালে ভাবছি, যদি কিছুই নিয়ে যেতে না-ই পারব, সকলই যদি ফেলে যেতে হবে, তবে দরিদ্রদের বঞ্চনা করে' কেন এই অর্থরাশি সঞ্চয় করলাম? ভুবনেশ্বর ঠিক বুঝেছিল; যা নিয়ে যাবার, তাই সে সঞ্চয় করেছিল,—সর্ব্বস্ব ব্যয় করে, আপনার মাথার উপর পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করেছিল।

ডাক্তার। লোকের আশীর্ব্বাদও বোধ হয়, মরণের পর কোন কাযে লাগে না।

চক্রবর্ত্তী। ডাক্তার, বিজ্ঞান পড়ে' তুমি নাস্তিক হয়েছ। তুমি যদি জানতে যে একটা পরলোক আছে, এবং আমাদের ইহকাল ও পরকাল একজন লোকনাথের দ্বারা গঠিত হচ্চে, তা হলে বুঝতে পারতে, লোকের আশীর্ব্বাদে লোকনাথের হৃদয় কি রকম বিচলিত হয়ে পড়ে;—লোকের আশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত মস্তক তাঁর চরণতলে দেখলে, তিনি তা তুলে নিয়ে অনন্তকাল আপন অনন্ত বক্ষে ধারণ করেন। কোন্ দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায়, কোন্ পুষ্পরচিত উপাধানে, কোন মাতৃক্রোড়ে মাথা রেখে মানুষ সেই আনন্দ, সেই শান্তি লাভ করিতে পারে?

তারক। তোমার ভাইয়ের বিবাহ হয়েছিল?

চক্রবর্ত্তী। তার যখন ত্রিশ বৎসর বয়স, তখন সে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তখনও তাঁর দান থামে নি। একদিন এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এসে তার শরণাপন্ন হল; বল্লে যে তাহাকে উদ্ধার করতেই হবে; পাঁচ শো টাকা না পেলে তার কন্যার বিবাহ হবে না; কন্যার বিবাহ না হলে তার জাত থাকবে না। আমাদের ভদ্রাসন বাড়ীটি পূর্ব্বেই ভুবনেশ্বর ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছিল। ভুবনেশ্বর দ্বারে দ্বারে ঘুরলে, যদি সেই ঋণের উপর আর কেউ তাকে পাঁচ শো টাকা ঋণ দেয়। কিন্তু সে কোনও খানে এক পয়সাও পেলে না। বুঝলে তারক, দুর্লভ আশীর্ব্বাদটা লোকে সহজে দিতে পারে, কিন্তু অর্থ দিতে পারে না। কোনও স্থানে টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে, সে অগত্যা আমাকে চিঠি লিখলে। কিন্তু অর্থ সঞ্চয় যার ব্রত, অর্থ যার উপাস্য দেবতা, সে ভাইয়ের কাতরতায় মুক্তহস্ত হয় না। আমি তাকে টাকা পাঠালাম না; তার চিঠির উত্তর দিলাম না। পরে সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণটি, হঠাৎ একদিন আমার কলকাতার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। টাকা চায় না, কিন্তু তার মেয়ের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করে। আমরা কুলীন নই। কিন্তু তার চক্ষে একজন সুন্দর কান্তি এম-এ পাশ করা সবজজপুত্র, একজন কুলীনকুমার চেয়ে কম আদরণীয় নয়। মেয়েটিকে না দেখেই, ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচয় গ্রহণ না করেই, অনুমতি দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পেলাম। ভুবনেশ্বরের বিবাহ হল; আমি বুঝলাম, অর্থের অভাবে সে আপনাকে দান করলে। এই বিবাহ উপলক্ষে, একদিনের জন্যে আমি রাণাঘাটে গিয়েছিলাম। দেখলাম, বউটির আশ্চর্য্য রূপ। বউয়ের মুখ দেখে, পাঁচটি টাকা তার হাতে দিয়ে আমি চলে এলাম। পাঁচ বছর পরে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ভুবনেশ্বরের মৃত্যু হল। সে আজ কুড়ি বছরের আগের ঘটনা।

ডাক্তার। আপনার ভাইয়ের কি কোন ছেলেপিলে হয়নি?

তারক। আমিও ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

চক্রবর্ত্তী। হাঁ্যা, তার একটি ছেলে হয়েছিল; মৃত্যুকালে সে একটি তিন মাসের শিশু পুত্র রেখে গিয়েছিল।

তারক। সে ছেলে কি এখনও বেঁচে আছে?

চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ।

তারক। সে এখন কোথায় আছে?

চক্রবর্ত্তী। সে এখন রঙ্গণঘাটেই আছে।

তারক। তাকে তুমি কখন দেখেছ?

চক্রবর্ত্তী। তাকে আমি জীবনে একবার মাত্র দেখেছি। তার বয়স তখন দশ বছর। সে আমাকে 'জেঠা মহাশয়' বলে চিঠি লিখেছিল। সে চিঠি এখনও আমার কাছে আছে; এখনও আমি তা রোজ পড়ি। সেই চিঠি পেয়ে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম।

তারক। তোমার স্ত্রী নেই, ছেলে নেই; এই ভ্রাতুষ্পুত্রই তোমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাকে তুমি কলকাতায় এনে, নিজের কাছে রাখনি কেন? তাকে নিজের কাছে রেখে, তার বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করনি কেন? আমি তোমার বহুকালের বন্ধু, কিন্তু আমার কাছে তুমি কখনও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম করনি।

চক্রবর্ত্তী। এখন, আমার এই মৃত্যুকালে, আমার মাথায় যে বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে, তখন আমার সে বুদ্ধি ছিল না। আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যেও অর্থব্যয়ে তখন আমি কুণ্ঠিত ছিলাম; তাই তার নাম করতাম না। দশ বছর পূর্ব্বে ঐ চিঠি পেয়ে, একবার মাত্র তার জন্যে আমার প্রাণটা ব্যথিত হয়েছিল। ওই ডীড্‌বক্স থেকে চিঠিখানা বের করে' তোমরা পড়।

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বাক্সের মধ্যে কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া ঐ ক্ষুদ্র পত্রখানি বাহির করিলেন। তাঁহাদের মাথার উপর বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড়টি আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে একত্র পত্রখানি পাঠ করিলেন। অতি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন অক্ষরে পত্রখানিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা ছিল;—

জ্যেঠা মহাশয়,

আপনি আমার ও মার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আপনি অনুমতি করিলে, এগার বৎসরে আমার উপনয়ন হইবে। এই অনুমতি পাইবার জন্য, মা আপনাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। আপনি অনুমতি দিবেন। এই অনুমতি চাহিবার জন্য আমি নিজে আপনার নিকট যাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন, আমি ছেলেমানুষ, কলিকাতায় পথ খুঁজিয়া পাইব না। আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। আপনাকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। নিবেদন ইতি। ১৩০১ সাল, ১৫ই চৈত্র।

সেবকানুসেবক
শ্রীঅশ্রু।

ঐ পত্রের অনুসন্ধান ও পঠন সময়ে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিমীলিত নেত্রে শয়ান ছিলেন। তাঁহার নিমীলিত নেত্র হইতে দুইটি অশ্রুপ্রবাহ নীরবে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি শয়ান থাকিয়া, তাঁহার দগ্ধ ও অন্ধকার মানসপটে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সুন্দর ও সুকোমল মুখশ্রী আঁকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, এখন সে এই দশ বৎসর পরে, বড় হইয়া না জানি কত মনোহর হইয়াছে! সে কি তাহার পিতার মত হইবে? তাহার মুখশ্রী অনেকটা তাহার মাতার মত বটে, কিন্তু সে তাহার পিতার ন্যায় প্রশস্ত ও উন্নত ললাট পাইয়াছে; তাহার দেহও তাহার পিতার ন্যায় উন্নত হইবে।

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবুর পত্রপাঠ শেষ হইলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সজল ও নিমীলিত নেত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখশ্রী ভাবিতে ভাবিতে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই চিঠি পেয়ে, আমার ভাইপোর এই চিঠি পেয়ে, সত্যি বলছি তারক, আমি চোখের জল সামলাতে পারিনি। কাঁদতে কাঁদতে রঙ্গণঘাটে

গিয়ে তাকে কোলে নিয়েছিলাম। ভুবনেশ্বরের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে', ভদ্রাসন ঋণমুক্ত করেছিলাম। সমারোহ করেই তার উপনয়নও দিয়েছিলাম। তার পর, তাকে কলকাতায় এনে আমার কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাবার কথা বলেছিলাম।

তারক। কিন্তু কথামত কার্য্য করনি কেন? সে অশিক্ষিত অবস্থায় তোমার এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে, কিছুই রক্ষা করতে পারবে না। তাকে এখানে আনাই তোমার উচিত ছিল।

চক্রবর্ত্তী। তাই উচিত ছিল বটে; কিন্তু বউমা আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বল্লেন যে, ছেলের বিদ্যাশিক্ষার ভার তিনি আপনিই নেবেন। বোধ হয় কতকটা অভিমানেই এই রকম বলেছিলেন। তাঁর স্বামীর, আমার ভাই ভুবনেশ্বরের, মৃত্যুকালে আমি যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলাম, তা তখনও তাঁর স্মরণ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তা ছাড়া, ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর অশ্রুকুমারের উপনয়নকাল পর্য্যন্ত আমি তাঁদের কোন সংবাদ নিই নি; তিনি অলঙ্কার থালা ঘটি এক একটি করে বিক্রী করে, বাড়ীর দরজা জানালা খুলে বিক্রী করে, কোন মতে মহাদুঃখে আপনার আর ছেলেটির অশন বসন নির্ব্বাহ করেছিলেন। যা হোক, অশ্রুকুমার আমার সঙ্গে কলকাতায় আসে নি; আর বউমা, অনেক সাধ্যসাধনার পর, খরচের জন্যে আমার কাছ থেকে কেবল মাসিক মাত্র পঞ্চাশটি টাকা নিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

তারক। তাঁদের প্রতি তোমার ব্যবহার ভাল হয়নি।

চক্রবর্ত্তী। এই পৃথিবীতে আমি কার প্রতি ভাল ব্যবহার করেছি, তারক? আমি যে কি জিনিষ, কি মহা নরাধম, তা আজ ক্রমে তোমাদের শোনাব। ডাক্তার, আমি কি বলছিলাম? দেখ, আমি বলতে বলতে ভুলে গিয়েছি।

ডাক্তার। আপনি বলছিলেন যে, আপনার ভাইপোকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আপনি কোন বন্দোবস্তই করতে পারেন নি।

চক্রবর্ত্তী। তাই এক রকম সত্য বটে; কোনও বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা হয় নি। তবু ডাক্তার, আমি তার শিক্ষার জন্যে একটা সুযোগ পেয়েছিলাম।

ডাক্তার। সুযোগ কি হয়েছিল?

চক্রবর্ত্তী। আমাদের পল্লীগ্রামে একজন বৃদ্ধ সুপণ্ডিত বাস করেন। তিনি আমার চেয়ে আট দশ বছরের বড়। তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন; এখন প্রায় চৌদ্দ বছরকাল পেন্সন নিয়ে বাড়ীতে বাস করছেন। কলকাতায় ফিরে আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম।

ডাক্তার। কি চিঠি লিখেছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। লিখেছিলাম যে, যত দিন তিনি বাড়ীতে থাকবেন, ততদিন আমি তাঁকে বছরে বছরে হাজার টাকা দেব; তিনি এই টাকা আমার ভাইপো বা তার মায়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে', অশ্রুকুমারকে আপন বাড়ীতে রোজ ডেকে এনে, তাকে রীতিমত লেখাপড়া শেখাবেন।

তারক। তোমার চিঠি পেয়ে তিনি কি উত্তর লিখলেন?

চক্রবর্ত্তী। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন; আর, আজ প্রায় দশ বছর তিনি অশ্রুকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

তারক। সে এতদিনে কি রকম পড়াশুনো করেছে?

চক্রবর্ত্তী। সেই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমি দশদিন হল যে চিঠিখানা পেয়েছি, তা পড়লেই তুমি জানতে পারবে।

তারক। সে চিঠি কোথায়?

চক্রবর্ত্তী। তা আমার খানসামা যদুর কাছে আছে। সে এখনই তোমাকে দেবে।

সহসা গৃহমধ্যে বগলা নিঃশব্দ আবির্ভাবে ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন; কেহই তাহার এই প্রকার আগমনের প্রত্যাশা করেন নাই।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবে শুইয়া, মুদ্রিত

নয়নেই বলিলেন, "তারক, বদুর কাছ থেকে চিঠিখানা নাও।"

যদু তারক বাবুর হস্তে উহা প্রদান করিয়া, নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এটর্ণি বাবু ও ডাক্তার উভয়ে মিলিয়া, পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন। উহা ইংরাজিতে লিখিত ছিল, আমরা নিম্নে উহার অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম—

"প্রিয় কেদারেশ্বর,

"তোমার শেষ পত্র প্রাপ্ত হইবার পর, আমি দুই তিন দিন অসুস্থ ছিলাম। এ জন্য যথাসময়ে তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে পারি নাই। আমাদের বাঙ্গালা দেশে, এই বর্ষার শেষে, বৎসর বৎসর যেমন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়, সুখের বিষয় এ বৎসর এ অঞ্চলে সেরূপ হয় নাই। গ্রামের প্রায় সকলেই সুস্থ আছে। মাঠে জল আছে, এবং ভাল ফসলের আশা আছে।

"তোমার অসুখের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। ভরসা করি, এবারকার পত্রে তোমার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া আনন্দলাভ করিতে পারিব। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমাকে দীর্ঘকাল সুস্থ রাখেন। তোমার পীড়াটা কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

"শ্রীমান্ অশ্রুকুমারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তুমি যে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছ, নিম্নে তাহার সংক্ষেপ ও সাধ্যমত সঠিক উত্তর প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার উত্তরগুলি পড়িলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে বিদ্যাশিক্ষায় অশ্রুকুমারের বিলক্ষণ যত্ন আছে।

"এক্ষণে আই-এ পরীক্ষায় কলেজে যতটা গণিতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, অশ্রুকুমার তাহা সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। গণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষা দিলে সে নিশ্চয় শতকরা নব্বই নম্বর পাইতে পারে। গণিতবিদ্যা সম্বন্ধে ইহার অধিক শিক্ষাদান করিবার শক্তি আমার নাই।

"আমার গুরুদেবের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবনাথ বিদ্যারত্ন আমাদের গ্রামে একটি টোল খুলিয়াছেন; এই ব্যাপারে গ্রামের সকল লোকই তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; পাকা টোলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য তুমি যদি তাঁহাকে কিছু সাহায্য কর, তাহা হইলে, আমরা বিশেষ উপকৃত হই। শ্রীমান্ অশ্রুকুমার এই ভবনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও কোষ পাঠ করিয়াছে; ইহা ছাড়া সে ভট্টি, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত প্রভৃতি কয়েকখানা কাব্যও পড়িয়াছে। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, এক্ষণে সে কাদম্বরী ও হর্ষচরিত পাঠ করিতেছে।

"লাটিন সাহিত্যে আমার যে সামান্য জ্ঞান ছিল, আমি উহাকে তাহা প্রদান করিয়াছি।

"ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্র ও ইতিহাসে তাহার অসম্ভব অধিকার জন্মিয়াছে। আমার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা দূরের কথা, সে এক্ষণে আমাকেও শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ। তুমি জান, তাহার পিতার একটি পুস্তকাগার ছিল; তাহাতে ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগৃহীত ছিল। অশ্রুকুমারের মাতা দুরবস্থায় পড়িয়া বস্ত্র ও তৈজসাদি সকলই বিক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পুস্তকগুলির একখানিও বিক্রয় করেন নাই; তাঁহার স্বামীর আদরের সামগ্রী মনে করিয়া, অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। অশ্রুকুমার এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিবার জন্য এক্ষণে আপনাকে অবিরত নিযুক্ত রাখিয়াছে।

"আমি দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছি, এ জীবনে বহু ছাত্রের সংসর্গে আসিয়াছি, কিন্তু অশ্রুর মত মেধাবী, পাঠরত ও শান্ত বালক কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই।

"আমি যদি বলি যে, তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা হইলে, তাহার নির্ম্মল দেবচরিত্রের কিছুই পরিচয় দেওয়া হইবে না। তাহার তুষার অপেক্ষা নির্ম্মল চরিত্রে, কখনও অতি সামান্য কলঙ্কের ছায়াপাতও হয় নাই। সে সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ; সৎ বা অসৎ তাহার কোন প্রকার সঙ্গী নাই; এ অঞ্চলে এমন কোন বালক নাই যে অশ্রুকুমারের অমিত প্রতিভার উজ্জল

উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। বিদ্যাচর্চ্চা এবং মাতার সহিত দুই একটা কথা কহা ছাড়া, তাহার আর কোনও কার্য্য নাই।

"এ যাবৎ অশ্রুর কোন প্রকার কঠিন পীড়া হয় নাই, তাহার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল আছে। কিন্তু তাহাকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার কোন প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুযায়ী তাহার ব্যবস্থাও করিলাম। সে আমার এই ব্যবস্থা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে।"

এই পত্র পাঠ করিয়া এটর্ণি বাবু কহিলেন, "তোমার ভাইপোকে যে রকম লেখাপড়া শেখান হয়েছে, তা বিবাহের বাজারে, অর্থাৎ যেখানে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এম-এ উপাধিগুলো উচ্চমূল্যে কেনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকে, সেই স্থানের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও, আমার বিবেচনায়, কলেজের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার চেয়ে কোন ক্রমে হীন নয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "যাতে তার মাথায় অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা না আসে, সে জন্যে তাকে কিছু সম্পত্তি দান করলে ভাল হয়।"

এটর্ণি বাবু প্রস্তাব করিলেন, "মনে কর, যদি তুমি এককালে তাকে একলক্ষ টাকা দান কর, তা হলে, সে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান উপার্জ্জন করতে পারবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্তিমিতনেত্রে কহিলেন, "দান? তারক, অর্থদান আমার অদৃষ্টে নেই। আমি ইচ্ছা করলে, এতদিন তাকে অনেক টাকা দিতে পারতাম।"

এটর্ণি। এতদিন যা কর নি, এখন তা কর।

চক্রবর্ত্তী। কেন?

এটর্ণি। তাকে তুমি ভালবাস; তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে।

চক্রবর্ত্তী। তার ভবিষ্যৎ মঙ্গল, মঙ্গলময় নিজে করবেন। মঙ্গলময় দু' তিন দিনের মধ্যে আমার জীবন লীলা শেষ করবেন। তখন মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হঠাৎ মৌন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া ডাকিলেন, "যদু।"

যদু কক্ষে প্রবেশ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে।"

"আমি এখন কি খাব?"

"ডাক্তার বাবু সাবু খেতে বলেছেন।"

"আনতে বল।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া, যদু সাবু আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া, ডাক্তারের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদুকে ডাকবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদের কি বলছিলাম, ডাক্তার?"

ডাক্তার। আপনি বলছিলেন যে, মঙ্গলময় নিজে আপনার ভাইপোর মঙ্গল করবেন।

চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ। আমার মৃত্যুর পর, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়, আমার অশ্রু আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যা দান না করলেও, আইনের বলে আমার মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই সে আপনা হতে পাবে, তার কিঞ্চিৎ তাকে এখন দান করলে আমার পাপের ভার কিছু লঘু হবে না। না, এই মৃত্যুকালে আমি তাকে কিছু দান করব না। সে আমার উত্তরাধিকারী হয়ে আমার সম্পত্তি দখল করবে। তবু একটা কথা তাকে বলবার জন্যে আমি উইল করব। আমার মৃত্যুর পর, সে আমার উত্তরাধিকারী হয়ে আমার সম্পত্তি পেলে, সে তার সামান্য অংশ ডেপুটীবাবুর নাতনীকে দেবে।

তারক। কেন?

চক্রবর্ত্তী। সে কথা একটু পরে তোমাদের বলব। আপাততঃ আমি কিছু সাবু খেয়ে, আট মিনিট বিশ্রাম করব। ডাক্তার, তোমার ঘড়িটা একবার খুলে দেখ, ক'টা বেজেছে।

ডাক্তার। আটটা বেজে বাইশ মিনিট হয়েছে।

চক্রবর্ত্তী। বেশ, এখন তোমরা সেই পূর্ব্বদিকের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি আট মিনিট

পরে, ঠিক সাড়ে আটটার সময় আমার কথা আবার আরম্ভ করব।

ডাক্তার। আপনার আপত্তি না থাকলে, এই কয়েক মিনিট আমরা এই খানেই অপেক্ষা করব।

চক্রবর্ত্তী। ভাল, এই খানেই অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় যত্নের আনীত সাবু পান করিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর বংশপরিচয়।

ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে ঠিক আটটা বাজিয়া ত্রিশ মিনিট হইবামাত্র, চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আবার কথা আরম্ভ করিলেন। মুদিত নয়নে বৃদ্ধের এই অভ্রান্ত সময়জ্ঞান দেখিয়া, যুবক ডাক্তার মনে মনে বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, এই বুড়া বড় অদ্ভুত লোক; ইহার কাহিনী যাহা শুনিলাম, তাহাও অদ্ভুত বটে; না জানি, এ ব্যক্তি কত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছে! পিতার নিকট শুনিতাম, ইহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, এবং ইহার বুদ্ধিও অত্যন্ত প্রখর।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদিত নয়নে ধীরে ধীরে যে কাহিনী বলিলেন, ডাক্তার ও এটর্ণি বাবুদের সহিত কথোপকথন বাদ দিয়া তাহা সংক্ষেপে এই—

"আমার ভ্রাতা ভুবনেশ্বরের এক অকৃত্রিম বন্ধু ছিল; তাহার নাম দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। এই দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় কোটালিগ্রামের জমীদার ছিল। কিন্তু সে কোটালিগ্রামে বাস না করিয়া, অন্যান্য জমীদারদিগের ন্যায়, কলিকাতাতেই বাস করিত। তাহার জমীদারীর আয় ছিল বৎসরে চৌদ্দ হাজার টাকার কিছু উপর। কিন্তু বাৎসরিক চৌদ্দ হাজার টাকা আয়ে কলিকাতাতে একটা জমীদারের চালে থাকা চলে না। একন্য জীবনের শেষাবস্থায় সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খুচরা ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার সমুদয় সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া, আমি তাহাকে ঋণদান করিয়াছিলাম। ঐ ঋণের পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকা। বাৎসরিক শতকরা ছয় টাকা হিসাব সুদে, আমি ঐ টাকাটা দিয়াছিলাম।

"দীনবন্ধু এই ঋণের কিছুই পরিশোধ করিয়া যাইতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র, ডেপুটিবাবুর নাতিনী সৌদামিনীর পিতা, আমার নিকট পিতৃঋণ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিল।

"হেমচন্দ্রের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল; তাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। তাহার প্রকৃতি হেমচন্দ্রের মত ছিল না; সে মহা অপব্যয়ী। পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এক মত হইতে পারিল না। অগত্যা হেমচন্দ্র ঋণের নিজ অর্দ্ধাংশ পরিশোধের পৃথক ব্যবস্থা করিল। সে তাহাদের কলিকাতার বাটীর অর্দ্ধাংশ ভ্রাতার নিকট হইতে পৃথক করিয়া লইল, এবং উহা, অর্থাৎ নিজ অর্দ্ধাংশ, পঁয়ষট্টি হাজার টাকায় বিক্রয় করিল; এবং ইহার উপর আপন সোণা, রূপা ও রত্নাদি বিক্রয় করিয়া, তাহার ঋণের ভাগ এবং ঐ অর্দ্ধাংশ ঋণের বাকী সুদ পরিশোধ করিল। আমি, তাহার প্রদত্ত সমুদয় টাকার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া একখানা রসিদ লিখিয়া দিলাম। রসিদে লেখা রহিল যে, মৃত দীনবন্ধুর ঋণের মধ্যে, এত টাকা ও এত সুদ হেমচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম।

ইহার পর আরও কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। হেমচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার অংশের ঋণ পরিশোধের কোনও বন্দোবস্ত করিল না; এক কপর্দ্দক সুদও প্রদান করিল না। আমি বারবার তাগাদা করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে আমি উভয় ভ্রাতার নামেই এক লক্ষ ছয় হাজার টাকার দাবিতে নালিশ রুজু করিলাম।

"আমি মৃত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের সমুদয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তাহাকে ঋণ প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ ঋণের কতকাংশ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র পরিশোধ করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাপ্তি স্বীকারও করিয়াছিলাম, তথাপি সমস্ত টাকার দাবীতে কেন নালিস করিলাম?

ঋণের কতকাংশ যেই পরিশোধ করুক, বাকী ঋণের জন্য সমুদয় বন্ধকী সম্পত্তিই দায়গ্রস্ত ছিল। পিতার মৃত্যুর পর দীনবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কখনও পৃথগন্ন হয় নাই এবং জমীদারীও বিভাগ করিয়া লয় নাই। কেবল মাত্র কলিকাতার বাটীরই অর্দ্ধাংশ পৃথক করিয়া লইয়াছিল, এবং তাহাই বিক্রয় করিয়া পিতৃঋণের অর্দ্ধাংশ পরিশোধ করিয়াছিল। কাযেই অবশিষ্ট পৈত্রিক ঋণের জন্য সমুদয় অবিভক্ত পৈত্রিক সম্পত্তিই দায়ী রহিল।

"অধিকন্তু যে তমসুক পত্রের দ্বারা আমি দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়াছিলাম, তাহাতে একটা সর্ত্ত লিখিত ছিল যে, ঋণ আংশিক ভাবে পরিশোধ করিলেও, অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধের জন্য, আমি ইচ্ছানুযায়ী এক বা দুই বা সমুদয় আবদ্ধ মহাল বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা মায়সুদ আদায় করিয়া লইতে পারিব। যাক্। কৌশলটা যেরূপই হউক, তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমার কৌশলে হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র উভয় ভ্রাতাই সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

"তিন লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি কিরূপে এক লক্ষ ছয় হাজার টাকার দাবীতে নষ্ট হইল; কিরূপে অল্পকাল মধ্যে পরোপকারী জমীদার দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় নিঃস্ব হইল, জানিতে চাও? প্রথমতঃ সুদ ও খরচা যোগ করিয়া, আমি, এক লক্ষ ছয় হাজার টাকার স্থলে, এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকার ডিক্রি পাইলাম। দুই মাস বাদে আমি ডিক্রি জারি করিয়া তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিলাম। হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র আমার নিকট আসিয়া করযোড়ে কাঁদিল; বলিল,—আমাদিগকে রক্ষা করুন।

"আমি প্রস্তাব করিলাম যে, যদি তাহারা আমাকে এক লক্ষ বাইশ হাজার এবং তাহার শতকরা বার্ষিক বার টাকা হিসাবে দুই মাসের সুদ, এবং ডিক্রিজারির খরচা সর্ব্বমোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার একটি নূতন তমসুক পত্র লিখিয়া রেজিষ্টারি করিয়া দেয়, তাহা হইলে, ডিক্রি রদের প্রার্থনা করা যাইবে। বলা বাহুল্য, বিপন্ন যুবকদ্বয় এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইল; তাহারা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার একটি তমসুক লিখিয়া, তাহা রেজিষ্টারি করিয়া দিল। তমসুকে একটা সর্ত্ত রহিল যে, যদি ছয় মাস মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, তাহা হইলে, আমি এক কপর্দ্দকও সুদ গ্রহণ করিব না; কিন্তু তাহা না পারিলে, আমি মাসিক শতকরা দুই টাকা হিসাবে সুদ গ্রহণ করিব। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে, এইরূপ অনুগ্রহ ও কাঠিন্য যুক্ত সর্ত্ত রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন কোন ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিতে অবহেলা না করে,—এক দিকে উৎসাহ, অন্যদিকে ভয় প্রদর্শন—তাহাদের মঙ্গলেরই কারণ হইবে।

"তখনও উভয় ভ্রাতা এক মত হইলে, বোধ হয় ঋণটা পরিশোধ করা সহজ হইত। কিন্তু কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে চাহিল না।

"তাহার পর, অনুগ্রহের ছয় মাস অতিবাহিত হইল; নিগ্রহের কাল আরম্ভ হইল। তখন ঋণ পরিশোধ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। দুই বৎসর ছয় মাস পরে তাহাদের তমসুকের মেয়াদ ফুরাইল। প্রায় তিন বৎসর পরে, এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার দাবীতে, আমি উহাদের নামে পুনরায় নালিশ করিলাম। তাহারা কোন প্রতিবাদ করিল না; করিলেও তাহা আদালত অগ্রাহ্য করিতেন। আমি বিনা আপত্তিতে, মায় খরচা, এক লক্ষ নব্বই হাজার হাজার টাকার ডিক্রি পাইলাম।

"প্রায় দুই বৎসর বাদে, মূল ডিক্রির টাকা, তাহার সুদ এবং ডিক্রিজারির খরচা,—সর্ব্বসমেত দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আদায়ের জন্য, মৃত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি নিলামে চড়িল। দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকায় সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। ঐ অর্থে ঋণ পরিশোধ করিয়া, সামান্য যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা লইয়া, দুই ভ্রাতা সামান্য অবস্থায় কলিকাতায় মধ্যে বাস করিতে লাগিল। দুরবস্থায় পড়িয়া জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র অধিক কাল জীবিত

থাকে নাই; মনের দুঃখে ও অর্থকষ্টে কয়েক মাস রুগ্নশয্যায় থাকিয়া, শিশু সৌদামিনীকে পিতৃহীনা করিয়া, সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া থাকিবার পর বলিতে লাগিলেন, "যারা অস্ত্র দিয়ে নরহত্যা করে' থাকে, তারাও আমার মত মহা নারকী নয়। তারা অত্যন্ত অভাবের তাড়ায়, কিম্বা অসহ্য রাগের বশে নরহত্যা করে। আমার অর্থের অভাব ছিল না, আর হেমচন্দ্রের উপর রাগেরও কোনও কারণ ছিল না; তবু আমি তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে মেরেছিলাম। তারক, তোমাদের আইনে, আমার মত নরঘাতকের জন্যে কোন রকম সাজা নির্দ্দিষ্ট হয়নি; কারণ তা মানুষের আইন। কিন্তু মানুষের আইনের উপর আর এক আইন আছে। সেই অলৌকিক আইনে, এই রকম নরহত্যার যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে, তা অতি, অতি ভয়ঙ্কর।' তা মনে করতে, এই দেখ, এখনই আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হচ্চে।"

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বাত্যাতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষশাখার ন্যায়, শয্যামধ্যে সন্তাড়িত হইতেছে। তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ক্ষীণ হস্তদ্বয় আপন আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং ছাদ হইতে লম্বিত দীপের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন যে, তাঁহার শুষ্ক ও বিকৃত মুখমণ্ডল বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। ডাক্তার ভীত হইলেন; ভাবিলেন, এখনই বুঝি বৃদ্ধের ভবলীলা শেষ হইয়া যায়!

কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় মরিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম করিয়া, পূর্ব্ববৎ মুদিত নেত্রে, তাঁহার পাপ-কাহিনী বিকৃত কণ্ঠে বিবৃত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ডাক্তার, তারক, তোমরা বস। আমি কেবল মাত্র এক নরহত্যার পাপে পাপী নই। আমার পাপের ভার আরও গুরুতর! আমি স্ত্রী-হত্যা করেছি। হেমচন্দ্রকে না মারলে, তার সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী মরত না; সৌদামিনী মাতৃহীনা হত না। আছে, তারক, আছে;—এ নরঘাতকের, এ স্ত্রীঘাতকের সাজা আছে।—কত যুগ যুগান্তরব্যাপী, কত কত জীবনব্যাপী সে সাজা, পরম দণ্ডধরের সে মহাদণ্ড কত তীব্র, তা তোমাদের কি বোঝাব? যদু!"

যদু খানসামা মুহূর্ত্ত মধ্যে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার নয়ন উন্মীলন না করিয়া, আপন উদরদেশে স্থাপিত হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ঈষৎ সঞ্চালিত করিলেন। তাহা দেখিয়া যদু 'যে আজ্ঞে' বলিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার এটর্ণি বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এটর্ণি বাবু ঘাড় নাড়িলেন। ডাক্তারের দৃষ্টিপাতে প্রশ্ন হইল, "বুড়ো যদুকে কি বল্লে?" এটর্ণি বাবুর স্কন্ধ সঞ্চালনে উত্তর হইল, "বোঝা গেল না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিৎকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার যা বক্তব্য ছিল, তা বলা প্রায় শেষ হয়েছে। তারক, তুমি আমার শেষ উইল প্রস্তুত করবে। ডাক্তার, আমি তোমার ও অন্যান্য সাক্ষীর সমুখে সেই উইলে দস্তখৎ করব। এই উইলে লেখা থাকবে যে, অশ্রুকুমার ব্যতীত আমার অন্য কোন ওয়ারিসান নেই; সেই আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। আমার সম্পত্তির একটি তালিকা, আমার ম্যানেজার বাবু তৈরী করেছেন; এই ডীডবাক্সেই সেটা আছে, দেখ।"

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু বাক্স অনুসন্ধান করিয়া উহা পাইলেন, এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিলেন। তালিকাটি ইংরাজি ভাষাতে লিখিত ছিল। তাহা পাঠ করিয়া ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু বুঝিলেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পত্তির মূল্য, কয়েকটি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকায়, কোম্পানির কাগজে, ভিন্ন ভিন্ন ডিবেঞ্চরে, শেয়ারে, বাড়ীতে মজুদ টাকা মোহর রত্নালঙ্কারাদিতে—সুর্ব্বশুদ্ধ দুই কোটি পনের লক্ষ টাকারও অধিক এবং তাহা সুদে ও উপসত্বে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে, এই

রাজপ্রাসাদতুল্য বিস্তীর্ণ বসতবাটী ব্যতীত, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্ত কোনও ভূসম্পত্তি ছিল না।

সম্পত্তির তালিকা পঠিত হইলে, মরণোন্মুখ বৃদ্ধ আবার অবিচলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমার উত্তরাধিকারী আমার এই সমস্ত সম্পত্তি পাবে; এর এক কপর্দ্দকও আর কেউ পাবে না। কেবল সৌদামিনীর পিতাকে হত্যা করে' আমি যে অর্থোপার্জ্জন করেছিলাম, তা, আর তার এতদিনের সুদ, সমস্ত সৌদামিনীকে দিতে হবে। আমার উত্তরাধিকারীর কাছে আমার মৃত্যুকালে এই শেষ প্রার্থনা। আমি নিজেই উইল লিখে সৌদামিনীর টাকা সৌদামিনীকে দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা হবে না, আমার মহা অপরাধের এতটুকু কলঙ্কও আমি এ পৃথিবীতে ধোব না। সমস্ত কলঙ্কের ভার মাথায় দিয়ে, নরকাগ্নিতে ঝাঁপ দেবো। অক্রুকুমার আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে আমার শেষ প্রার্থনানুযায়ী, সুদে আসলে সমস্ত টাকা সৌদামিনীকে দেবে। তারক, তুমি একটু পরিষ্কার করে, সেটা উইলে লিখবে। কাল বেলা তিনটের পূর্ব্বে যেন উইল প্রস্তুত হয়। আমার সম্পত্তি যতদিন আমার উত্তরাধিকারী না পায়, ততদিন তা তোমার জিম্মায় থাকবে। রত্ন অলঙ্কারাদি গৃহ-সজ্জাদির একটি বিস্তৃত তালিকা আমার ম্যানেজার বাবুর কাছে পাবে; তা সমস্ত আমার উত্তরাধিকারীকে বুঝিয়ে দেবে। তুমি উইল তৈরির জন্যে দুহাজার টাকা পারিশ্রমিক নেবে। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। তোমরা আহারাদি করে, আপন আপন বাড়ী যাও।"

এটর্ণি বাবু আহারাদি সম্বন্ধে এবং পারিশ্রমিক লওয়া সম্বন্ধে বুঝি কি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার অবসর পাইলেন না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরত হইতে না হইতেই, পার্শ্বের এক বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, জাপান দেশজাত বিচিত্র ও বহুমূল্য যবনিকা অপসারিত করিয়া, বহুখানসামা ডাকিল, "আসুন!"

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাক্য ও অর্থ

সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে প্রাচীনতম না হইলেও, বর্ত্তমান কালে যে সকল ভাষা অতি প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সংস্কৃত ভাষা যে তাহাদেরই অন্যতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহারা এই ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ যতই দূরবর্ত্তী হইতেছে, তাঁহাদের কথার অর্থ বুঝাও আমাদের পক্ষে ততই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। ঐ সব কথার মধ্যে অসংখ্য অমূল্য তত্ত্ব নিহিত থাকিলেও, আপাততঃ অযৌক্তিক, অসম্ভব বা সন্দিগ্ধার্থ কথাও বড় কম নহে। শাস্ত্রবিশেষে "দ্ব্যর্থৈঃ পদৈঃ পিশুনয়েচ্চ রহস্যবস্তু" অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়গুলির দ্ব্যর্থপদের দ্বারা সূচনা করিবে, এইরূপ নিয়ম থাকায় তাৎপর্য্যার্থ সহজে বুঝিতে পারিলেও স্মৃতিশাস্ত্রে, দর্শনে অথবা বেদে ঐরূপ সহজ কোন নিয়ম নাই, কিংবা কোনও একটি নিয়মও সর্ব্বত্র খাটে না, এজন্য ঐরূপ স্থলের অর্থ গ্রহণ করা বড়ই কঠিন। কোন কোন যুক্তিবাদী আবার মনুসংহিতার—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এই বচনের উপর নির্ভর করিয়া

কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিং।

ইত্যাদি শাস্ত্রের কোন যুক্তি না পাইয়া খিন্ন হন।

একাদশীর উপবাসেও ঐ কথা। তিথিবিশেষে শরীর ভার হয়, অতএব ঐ সব দিনে উপবাস করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এই যুক্তিও ত্র্যহস্পর্শের পরদিন দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান করায় শাস্ত্রকারগণের অভিমত নহে, ইহা বেশ বুঝা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে চাক্রায়ণ ঋষি হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট কুলুত্থ সাদরে উদরসাৎ করিলেন, অথচ তাহার জল খাইলেন না দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। বেদে "উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি" বলিয়া সূর্য্যের উদয় ও অনুদয় উভয় অবস্থাতেই হোম বিহিত হইয়াছে, অথচ তাহার পরেই উভয়বিধ হোমকারীরই নিন্দা করা হইয়াছে ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? শাস্ত্রে এই সব বক্রোক্তির কোন প্রয়োজন আছে কি না, অথবা তাহা নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয়, তাহা যুক্তি দেখাইয়া বুঝান কঠিন। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে একই রূপে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তদনুরূপ ভাষা প্রয়োগ না করায় শাস্ত্রকারগণ অপরাধী হইলেও, যখন তাঁহাদের কথা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না, তখন অগত্যা তাঁহাদের কথার অর্থ তাহাদের নিয়মানুসারেই করা উচিত।

ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যখন শাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগণের রচিত এবং তাঁহারা নিজ মুখে কিছুই বলেন নাই, তখন অন্য এক জনের কল্পিত নিয়মের উপর নির্ভর করিব কেন? কেনই বা তাহাদের কষ্ট-কল্পিত অর্থ ত্যাগ করিয়া যথাশ্রুতার্থের আদর না করিব?

তাহাতে এই মাত্র বলা যায় যে, বাধা না থাকিলে যথাশ্রুতার্থই যে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ইহা আমরাও স্বীকার করি। পরন্তু কীদৃশ বাধার সম্ভাবনায় কিরূপ অর্থ করিলে ঐ দোষ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, যথাস্থানে তাহারও কিছু আলোচনা করা যাইবে।

এখন প্রথমতঃ যথাশ্রুতার্থ কাহাকে বলে তাহাই দেখা যাউক। প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'যথাশ্রুতার্থ' শব্দের অর্থ করেন—শক্তিভ্রমাজন্য নিরূঢ়লক্ষণেতর লক্ষণাগ্রহাজন্য শাব্দবোধবিষয়ীভূতো হ্যর্থঃ যথাশ্রুতার্থঃ। অর্থাৎ যে বাক্যার্থের জ্ঞান পদের কোনরূপ শক্তি-ভ্রম হইতে অথবা নিরূঢ়লক্ষণা ভিন্ন অন্য কোনরূপ লক্ষণা জ্ঞান হইতে না জন্মে, সেই অর্থই সেই বাক্যের যথাশ্রুতার্থ। ফলতঃ যথার্থ শক্তিজ্ঞান অথবা লক্ষণা সমূহের মধ্যে কেবল মাত্র নিরূঢ়-লক্ষণাজ্ঞান হইতে যে বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই যথাশ্রুতার্থ। নিরূঢ়লক্ষণা শক্তিতুল্য লক্ষণা। যে পদের যে অর্থে শক্তি না থাকিলেও আবহমান কাল হইতে সেই অর্থে সেই পদের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে, সেই অর্থে সেই পদের নিরূঢ়-লক্ষণা। যেমন শুক্ল শব্দের অর্থে—শুক্ল-রূপ-বিশিষ্ট।

শুক্ল প্রভৃতি শব্দের শুক্লরূপেই শক্তি, শুক্লরূপবিশিষ্টে শক্তি নহে, ইহা বহু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, অথচ শুক্লরূপবিশিষ্ট এই অর্থে শুক্ল শব্দের প্রয়োগও চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাই ঐ অর্থ শুক্ল শব্দের নিরূঢ়লক্ষণা-গ্রাহ্য অর্থ।

প্রতিবাদিগণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যের "গঙ্গাতীরে গোয়ালা পাড়া" এই অর্থকে যথাশ্রুতার্থ বলেন না, আমরাও বলি না। কারণ এইস্থানে 'তীর' রূপ অর্থ গঙ্গা শব্দের শক্তি দ্বারা অথবা নিরূঢ়লক্ষণা দ্বারা বুঝায় নাই, অন্য লক্ষণা দ্বারা বুঝাইয়াছে। এইরূপে সুধীগণ দেখিবেন যে, তাঁহারা যাহাকে যথাশ্রুতার্থ বলেন, কেবল সেই খানেই এই লক্ষণ গিয়াছে, অন্যত্র যায় নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কোন্ পদের কোথায় শক্তি, কোথায় জহৎস্বার্থা লক্ষণা, কোথায় অজহৎস্বার্থা লক্ষণা, কোথায়ই বা নিরূঢ় লক্ষণা—এই সব ভাল করিয়া না জানিলে যথাশ্রুতার্থ নিরূপণ করা অসম্ভব। এক্ষণে সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যাহারা পদ পদার্থের ধার না ধারিয়া, কেবল মাত্র নিজের স্থূল দর্শনানুসারে যথাশ্রুতার্থ বলিয়া চীৎকার করে, তাহারা কৃপার যোগ্য কি না এবং ঐরূপ যথাশ্রুতার্থেরই বা মূল্য কতটুক।

ন্যায়দর্শনে জাতি-লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।" ইহার অর্থ যদি এই রূপ হয়, "তুল্য ব্যক্তি হইতে উৎপত্তির নাম জাতি",

তাহা হইলে ফলতঃ "যাহাদের উৎপত্তি স্থান সমান তাহারা তজ্জাতীয়" এইরূপ "অর্থ আসিয়া পড়ে। তাহাতে ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন সন্তানগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে, অথবা বিরুদ্ধ জাতিদ্বয়ের আকর্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কোন জাতিরই অন্তর্গত না হইয়া নৃসিংহবৎ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে ত যাহারা "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" বলিয়া জন্মকৃত ব্রাহ্মণাদি মানেন না, তাঁহাদের এবং শুক্লত্ব নীলত্বাদি জাতিবাদী মহর্ষির সর্ব্বনাশ!

মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন 'মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ।১। ভাবং তু বাদরায়ণোহস্তি হি ।২।' ইহার অর্থ যদি এইরূপ হয়, "ভাষ্য রচনার যোগ্য বিদ্যা না থাকায় ভাষ্য রচনা অসম্ভব, অতএব জৈমিনি মুনি বলেন মধ্বাচার্য্য প্রভৃতিতে ভাষ্য রচনার অধিকার নাই। ১। বাদরায়ণ মুনি বলেন, হাঁ বিদ্যা আছে, অতএব তাঁহার ভাষ্য রচনায় অধিকারও আছে। ২ ॥"—তবে ত চমৎকার!

আর যদি ধর্ম্মোপদেশ কালে আচার্য্যের মুখে "সর্ব্বস্বং হর সর্ব্বস্য ত্বং ভবচ্ছেদতৎপরঃ" শুনিয়া "তুমি হত্যাদি কার্য্যে আসক্ত হও এবং সকলের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কর" এই অর্থ গ্রহণ করতঃ কেহ চুরি ডাকাতি আরম্ভ করে, তবে তাহারই বা তাহাতে দোষ কি?

অপিচ, চিকিৎসা শাস্ত্রে "বিল্বপয়োধর বালা নাগর সহিতা রম্যা" দেখিয়া "বিল্বসদৃশ পয়োধরশালিনী ষোড়শ বর্ষীয়া নাগরিকের সহিত মিলিত হইলেই রমণীয় হয়" এইরূপ যথাশ্রুতার্থ কেহ করিলে, কবিরাজেরা তাহার জন্ম মধ্যম নারায়ণ ব্যবস্থা করিবেন। আর যদি ঐরূপ কোন রোগিণীর গায়ে বেদনা দেখিয়া "বয়স্থা নাগরাসজ্জাদঙ্গানাং হন্তি বেদনাং" এই বচনের ঐজাতীয় কোন অর্থ করেন, তবে বোধ হয় ধনঞ্জয়-রসাস্বাদই তাহার উচিত ঔষধ!

বস্তুতঃ এই সব স্থলে প্রকৃতানুযায়ী অর্থ করিতে হইলেও,

সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা।
অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ ॥

ইত্যাদি প্রাচীন নিয়মগুলি অপরিহার্য্য। লৌকিক বিরোধস্থলে যথাশ্রুত সম্ভব হইলেও তাহা গ্রহণ করা যায় না। "মহর্ষি জৈমিনিও বিধিনাত্বেক বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ঐ জাতীয় বাক্যগুলি প্রশংসাপর কিংবা নিন্দাপর হইলে তাহা হইতে প্রকৃত কার্য্যের উপাদেয়ত্ব ও হেয়ত্বই বুঝায়, ঐরূপ অসম্ভব কোন অর্থ বুঝায় না, ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত বেদের বিরোধ হইলেই বা কিরূপে অর্থনিশ্চয় করা কর্ত্তব্য, তাহাও "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং" ইত্যাদি সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে। অবশ্য মহর্ষি জৈমিনির মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের সহিত এমন কোন নিকট সম্বন্ধের কথা অদ্যাপি জানা যায় নাই, যাহাতে তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ স্মৃতির প্রামাণ্য রক্ষার জন্য তিনি ঐরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারেন। কেবল এই জন্যই তিনি বৃহত্তম কলেবর মীমাংসা দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন।

এখন ভাবিবার বিষয় এই যে, যথাশ্রুতার্থের সম্মান রাখিতে গিয়া চুরি, বাটপাড়ি প্রভৃতি সকল কুকার্য্যই করিলাম, শেষ পর্য্যন্ত তাহার সেই সম্মান রাখিতে পারিলাম কৈ? পরন্তু যাহারা ঐসব বাক্যের স্থূল অর্থ অসম্ভব দেখিয়া উহাকে উন্মত্ত প্রলাপ সংজ্ঞা দেন, এবং তাহারই পূর্ব্ব বা পর পংক্তির যথাশ্রুতার্থ লইয়া কোন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করেন, তাঁহাদের বিদ্যার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না!

যথাশ্রুতার্থ গ্রহণে এইরূপ অনেক বাধা আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং এখন আমরা সুপ্রসিদ্ধ একটী স্মৃতি-বচনের ঐরূপ বাধায় নিকৃষ্ট অর্থ নির্দ্ধারণের পথ দেখাইয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বচনটি এই—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

ইহার স্থূল অর্থ এই, যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে জীবিত অবস্থাতেই সবংশে শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এখানে এই প্রকার অপত্তি হইতে পারে, দ্বিজ শব্দে দন্ত, বিপ্র ও অণ্ডজ বুঝায়। পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজের বেদাধ্যয়ন সম্ভব নহে, তাহা না করিলেও তাহারা শূদ্র হয় না, এ জন্য এস্থানে দ্বিজ শব্দের অর্থ ত্রিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। তাহাতেও বিপদ এই যে, যদি ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি জন্মকৃত না হয়, তবে ব্রাহ্মণোচিত গুণোপার্জ্জন করিয়া লোককের ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, অথচ ঐ সব গুণ বেদজ্ঞান না হইলেও হয় না। সুতরাং শাস্ত্র মানিতে হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতিও জন্মকৃত স্বীকার করিতে হয়। উপনয়ন সংস্কারের পূর্ব্বে ত্রিবর্ণ-গণেরও বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকে না, অথচ ঐ অবস্থায় তাহাদের আহার বিহার ব্যায়াম প্রভৃতির জন্য পরিশ্রম অবশ্যম্ভাবী। যদি তাহাতেই তাহাদের শূদ্র হইতে হয়, তবে উপনয়নের পূর্ব্বে সকলেই শূদ্র হইয়া গিয়াছে, জগতে ত্রিবর্ণ বলিয়া কেহই নাই, অতএব কে কাহাকে উপদেশ দিবে? অতএব দ্বিজ শব্দেও 'বেদাধ্যয়নে অধিকারী দ্বিজ' এই অর্থই বুঝিতে হইবে।

তার পর, অনধীত্য এস্থানে অধি+ইঙ্ অর্থে অধ্যয়ন, যপ্ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্তর্য্য, নঞ্ অর্থে অভাব। মোটামুটি ধরিতে গেলে অনধীত্য পদের 'অধ্যয়নের আনন্তর্য্যের অভাবকালে' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। তাহাতেও গোলমাল এই যে, অধ্যয়ন বহুবিধ—কেবল-আবৃত্তি, অর্থজ্ঞান, স্বরশিক্ষা ইত্যাদি। এই স্থানে কি সকল রকম অধ্যয়নের কথাই বলা হইয়াছে, অথবা দুই একটা ছাড়িয়াও দেওয়া হইয়াছে? ছাড়িয়া দিলেই বা, কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি রাখা হইয়াছে তাহা কে বলিয়া দিবে? ভোজন শেষ না হইতে কেহ 'ভোজনানন্তর' এরূপ ব্যবহার করে না। প্রকৃতস্থলে বেদাধ্যয়ন কালেও যদি কেহ ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গেও পরিশ্রম করে, তবে সেও শূদ্র হইবে ইহাই কি মহর্ষির অভিপ্রায়? 'বেদং' এই একবচনেরই বা অর্থ কি? জাত্যর্থে এক বচন হইলে ত সকলেরই চতুর্ব্বেদ পড়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে "যে কোন একটি বেদ" অথবা "বেদের যে কোন একটী মন্ত্র" এইরূপ অর্থ করিয়া স্বীয় বেদাপেক্ষা স্বল্পায়তন কোনও বেদ, অথবা কোনও একটী সহজ মন্ত্র পড়িলেই ত শাস্ত্রার্থ পালন হয়। তাহা হইলে আর ব্রাহ্মণদিগকে বেদবর্জ্জিত বলিয়া নিন্দা করা চলে না। "অন্যত্র কুরুতে শ্রমং" ইহার অর্থও সহজ নহে। কোনও ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া সমিধাহরণ, পুষ্পচয়ন বা যোগাভ্যাস করিলে সে শূদ্র হইবে কি?

বচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ঐরূপ দ্বিজের পক্ষে শূদ্রত্ব বিহিত হইয়াছে। এখানে শূদ্রত্ব শব্দে শূদ্রের ভাব অর্থাৎ শূদ্রের ধর্ম্ম বা শূদ্রের ক্রিয়া এইরূপ অর্থ হইলে, কোন্ শূদ্রের কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ ক্রিয়া বিহিত হইল তাহা বলা আবশ্যক। যাবতীয় শূদ্রের সমস্ত ধর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিধান অসম্ভব-দোষ নিবন্ধনই হইতে পারে না।

যে কোন শূদ্রের যে কোন একটি ধর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিধান হইলে গুরুভক্তি, বিবাহ, ভোজন প্রভৃতি শূদ্রের ভাব দ্বিজগণের পক্ষেও বিহিত থাকায়, নিন্দাংশে বচনের তাৎপর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায় না। ঐ অর্থ হইলে বচনের ঐ অংশটীর অনুবাদকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে আবার উহার প্রামাণ্য থাকে না। শূদ্রত্ব জাতির বিধান হইলে তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিত্য, সুতরাং তাহার বিনাশ নাই। এ অবস্থায় বিরোধী ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ত্তমান থাকিতেই বা শূদ্রত্ব আসিবে কেমন করিয়া? ব্রাহ্মণত্ব শূদ্রত্ব প্রভৃতি নিত্য কি না, অথবা উহার একটী আসিয়া অপরটীকে নষ্ট করিতে পারে কি না, এ বিচার ত আরও জটিল, আরও গুরুতর। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি স্থূল অর্থে প্রত্যেক পদে ঐরূপ বাধা পাইয়া, মহর্ষি জৈমিনির নিয়মানুসারে শেষার্দ্ধে নিন্দা শ্রবণ করতঃ, "বেদাধ্যয়নে অধিকারী যথাবিধি স্বীয় বেদশাখার অধ্যয়ন না করিলে পাপী হয়" পূর্ব্বার্দ্ধের কেহ এইরূপ অর্থ করেন, তবে তাহার অপরাধ কি?

ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ করা বড়ই কঠিন। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। ইত্যাদি।

সুখের বিষয়, এখন সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্যই হউক, কিংবা নূতন আবিষ্কারের যশোলিপ্সাতেই হউক, অথবা সুবিধাজনক আচার ব্যবহারগুলিকে শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্যই হউক—ইঁহারা অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্য, দর্শন ও বেদের পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছেন। ইঁহাদের আলোচনার বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা শাস্ত্রের স্থূলার্থ গ্রহণ করিয়াই স্বস্ব সিদ্ধান্তগুলিকে শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। ঐ রূপে ঘাষিয়া মাজিয়া অর্থ পরিষ্কার করিবার কোন প্রয়োজন আছে, অথবা তাহার নিয়ম সকল যুক্তিসঙ্গত, একথা মানিতে চাহেন না। ইঁহাদের নিকট অনুরোধ এই যে, ইঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে নিজের কোন অভিমত প্রকাশ করিতে হইলে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কেবল ঐরূপ স্থূলার্থের উপরেই নির্ভর না করেন। তাহাতে সরলমতি ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।

শ্রীঅমরনাথ ন্যায়তীর্থ।

অমিয়বালার ডায়েরি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নারায়ণ,

কোথা তুমি? প্রভু, কোন অজানিত দেশে লুকাইয়া আছ? একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার শান্তিময় আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিটি লইয়া, একবার এস প্রভু। একটি বার নয়ন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া জীবন ভরিয়া সেই ব্যথাহারা মূর্ত্তিটি তোমার দেখিব। একটিবার এ আঁধার ছাড়িয়া আলোকে, দুঃখ ছাড়িয়া শান্তিতে, আকুলতা ঠেলিয়া তৃপ্তিতে, অবিশ্বাস মহা নরকের মাঝখান হইতে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় এ জীবন এ প্রাণ পূর্ণ করিয়া একবার আসিয়া দাঁড়াও। আমি বড় তৃষিত। হে সর্ব্বান্তর্য্যামী, যে রাবণের চিতা ধিকি ধিকি এ ক্ষুদ্র বুকের ভিতর দিনরাত হুহু করিয়া জলিতেছে, তা কি তুমি দেখিতে পাও না? উঃ—জলিয়া গেলাম, হৃৎপিণ্ড ছাই হইয়া গেল,—প্রভু আর কত দিন? এ অসহ্য যন্ত্রণা, এ বুকভাঙ্গা হাহাকার কতদিনে নিবিবে? ওগো, আর যে পারি না! এ সংসারের যাতনা আর যে সয় না হরি! কি করি, কোথায় যাই, কিসে শান্তি পাই তাহা ত জানি না প্রভু। বড় জ্বালা হরি! প্রাণের কথা বলিবার সঙ্গী পাই না, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার উপায় পাই না, ওগো সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্যথাহারী, তাই তোমারই উদ্দেশে এ উন্মত্ত প্রাণ ছুটিয়া আসে, অভিমান বেদনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তোমারই উদ্দেশে ছুটিয়া গিয়া শূন্যে—মহাশূন্যে মিশাইয়া যায়। তা কি তোমার চরণে পৌছায়? কৈ, কোথা তুমি?

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, তুমি আছ। প্রথম যখন মুখে কথা ফুটে, তখন হইতে হরি, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী বলিতে আগে শিখিয়াছি। যখন আর

একটু বড় হইয়া খেলা করিতে শিখিয়াছি, তখন হইতে তোমার নাম, তোমার স্তব, তোমার পূজা খেলার একটা অঙ্গ মনে করিয়াছি। আবার যখন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চণ্ডী, মহাভারত, রামায়ণের উপাখ্যান পড়িয়াছি। তোমার ঐ ছবিখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সরল ঐকান্তিক বিশ্বাসে প্রাণে প্রাণে জানিয়াছি, অনুভব করিয়াছি—তুমি আছ, তুমি আছ। আজ জীবন-মধ্যাহ্নে এ কি করিলে প্রভু? এ কি বিষে আমার অন্তর বাহির ভরিয়া দিলে? কেন প্রভু আমায় নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে? আমার বড় আপনার বড় প্রিয় যে স্বামী, আমার কোন্ অপরাধে, নারায়ণ, তাহা হইতে আমায় দূরে—বহুদূরে রাখিয়া দিলে? অতি প্রিয় জিনিষে অতি বিষ ঢালিয়া দিয়াছ, অতি আপনার জনকে অত্যন্ত পর করিয়াছ, বড় ভালবাসার স্থানে বড় অনাদর রাখিয়াছ—এ কি! এ বিচিত্রবিধান কি তোমার খেলা, দেব? সতীর একমাত্র গতি পতি, আর পতি তোমারই প্রতি-মূর্ত্তি, ভিতরে তুমি বাহিরে স্বামী, তোমায় ত পাই না, তাই স্বামী-দেবতার পায়েই সেবা ভক্তি ভালবাসা সব ঢালিয়া দিতে হয়। ওগো জগৎস্বামী, যদি বাহিরের স্বামী হইতে আমায় বঞ্চিত করিলে, তবে তোমার ও-চরণে আমার স্থান কৈ? যখন সকাল সন্ধ্যায় তোমায় ডাকিব মনে করিয়া নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসি, যখন চক্ষু বুজিয়া তোমার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে যাই, তোমার নাম গান করিতে চাই, তখন হঠাৎ এক সময় চমকিয়া উঠিয়া দেখি—এ কি! কার মূর্ত্তি ভাবিতেছি? ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—আমার স্বামীর মূর্ত্তিখানি; মন তোমার পা হইতে পলাইয়া গিয়া তাহারই কথা ভাবে; জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া তোমার নাম করে না। দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে উঠিয়া আসি—এ কি বিড়ম্বনা! সে ত আমায় ভুলিয়াছে, আমার স্মৃতি ছিঁড়িয়া দিয়াছে, তবে আমিও কেন তাই পারি না? তাকে ভুলিয়া তোমায় কেন ডাকিতে ভালবাসিতে ভক্তি করিতে পারি না? যে ভক্তি ভালবাসা স্নেহ প্রেম দেহ প্রাণ স্বামীর চরণে দিয়াছিলাম, তাই কেন তোমার পায়ে দিই না? মনে করি, কিন্তু কিছুতেই ত শক্তিতে কুলায় না প্রভু! নানা সন্দেহদোলায় এ মন দুলিতে থাকে। কি করি, কি ভাল—এই সব চিন্তায় আমায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আবার ভাবি অন্ধবিশ্বাসে তোমারই পায়ে সব দিয়া, তোমারই মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকি না কেন? এক এক সময় পারি, প্রভু। কোথা হইতে আকুল বিশ্বাস, অনন্ত তৃপ্তি দৃঢ়-তায় প্রাণটাকে বলীয়ান্ করিয়া তোলে, নির্ভরতার শান্তিতে বুক ভরিয়া যায়। কিন্তু থাকে না। আলে-য়ার আলোর মত আবার এসব কোথায় লুকাইয়া যায়। তখন একটা বিষম বেদনা, বুকভরা অফুরন্ত হাহাকার, চির অশান্তি প্রাণে জাগিয়া উঠে। তোমাকে প্রাণের মধ্যে দেখিতে পাই না, সান্ত্বনার কিছুই খুঁজিয়া পাই না। এ জগতের কোনও জিনিষই আমায় বিন্দুমাত্র সুখ দিতে পারে না। তখন প্রাণে স্বামীর মুখ জাগিয়া উঠে, তাহারই জ্বালাময়ী স্মৃতি আমাকে দংশন করিতে থাকে। তখন মনে হয়, কিছুই চাই না ভগবান, আমায় এ ব্যর্থতা হইতে উদ্ধার কর, আমার স্বামীর সঙ্গে চিরমিলন করিয়া দাও, আমাদের দুটি প্রাণ এক করিয়া, পবিত্র বিশুদ্ধ ভালবাসায় জীবন ভরিয়া দাও। তাহা হইলে সবাই সুখী হইবে, সব দুঃখ যাইবে।

প্রভু, যদি সংসারের সুখ আমায় না দাও, স্বামীর পায়ে স্থান না দাও, যদি এ জীবন এমনিই থাকে, তবে প্রভু তোমার দিকে আমার প্রাণ মন টানিয়া লও। সংসারের সুখ সাধ আশা তৃষা কামনা, প্রাণ হইতে দূর করিয়া দাও, একান্ত তোমারই করিয়া, তোমারই পায়ে বাঁধিয়া রাখ। সমস্ত ভুলাইয়া দাও—স্বামীর স্মৃতি, এ জগৎ সংসার, ইহকাল পরকাল, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ—সমস্ত ভুলাইয়া, শুধু তুমি আমার প্রাণে জাগিয়া উঠ, তুমি আমার হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হও। আমি তাই চাই প্রভু, তাই আজ আমায় দাও। একটা কিছু দাও হরি, এমন করিয়া দুইয়ের বা'র করিয়া রেখ না। যে স্বামী পায়ে ঠেলিয়াছে, যাহাকে সেবা

করিতে, সুখী করিতে পাইলাম না, সেই স্বামীর মূর্ত্তিতে আমার সমস্ত জীবন ভরিয়া তুমি দাঁড়াও। কি ছার এ সংসার সুখ; চির শান্তি অপার আনন্দে তাহা হইলে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিবে। এ সংসারে শত কষ্ট সহস্র যন্ত্রণাও আমার কিছুই করিতে পারিবে না। স্বামীর শত উপেক্ষাও আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে পারিবে না। তখন দেখিব, তোমার প্রতি কাযই তোমার মঙ্গলময় হস্তে হইতেছে, দুঃখ ও সুখের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, জীবের মঙ্গলের জন্যই তুমি দুঃখ কষ্ট দাও, অশান্তি দাও; তোমায় ভুলিয়া থাকি—সুখে ডুবিয়া তোমায় ভুলিয়া যাই—তাই দুঃখ দিয়া তোমার কথা মনে পড়াইয়া দাও।

সে দিন কি আসিবে প্রভু? আজ যেটা মুখে বলিতেছি, কোনও দিন প্রাণের সঙ্গে কি তাহা বলিতে পারিব? নিষ্কাম ভক্তিমতী যোগিনী হইয়া কোনও দিন কি তোমাকে আমার জীবনের সর্ব্বস্ব করিতে পারিব?

জীবন যে যায়। একে একে ১৮ বৎসর কাটিয়া গেল। কবে তোমার ডাক পড়িবে তা ত জানি না। শূন্য হাতে শূন্য প্রাণে কেমন করিয়া তোমার কাছে গিয়া দাঁড়াইব? এ জীবনের কি হিসাব নিকাশ তোমার পায়ে দিব? কিছুই ত উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না। তোমার কাযে আসিয়া, এ জীবন যে বৃথা গেল। গৃহীর সংসারই একটা কর্ম্মের স্থান। সে সংসারে সৎকর্ম্ম কিছুই করিলাম না। অসৎও যে কি করিয়াছি তাও জানি না। ধর্ম্ম তোমায় ডাকা—তাও কিছুই হইল না। তবে আমার কি উপায় হইবে? জীবনের মধ্যাহ্ন ত যায়; সন্ধ্যার ধূসর আঁধার এখনই চারিদিক ছাইয়া ফেলিবে, তখন ত আর চোখে দেখিতে পাইব না। তাই বলি, ওগো দীনবন্ধু পতিতপাবন, দয়া কর, এ অবোধ সন্তানকে তোমার কাছে টানিয়া নাও, জীবন সার্থক কর। সব ভুলাইয়া দিয়া, এ ভাঙ্গা শুষ্ক প্রাণে তুমি আসিয়া দাঁড়াও, আমার প্রাণে শান্তি দাও, আর পারি না! এখন শুধু

দাও শ্রীচরণ, জুড়াই জীবন
আর এ যাতনা সহে না।
অভাগীর গতি করহে শ্রীপতি
অন্তিম সময়ে ভুল না।

১৮ই জুলাই, ১৯১৯

আজ পিসিমার একখানা চিঠি পাইলাম। শুনিলাম গত মঙ্গলবারে সে * * *য় গিয়াছিল, পিসিমাকে অনেক কথাই বলিয়া আসিয়াছে। সেই তাহার সব পুরাণো অত্যন্ত লজ্জাকর কথাই সে আবার বলিয়াছে— আমি তার ঘর করিবার একান্তই অনুপযুক্ত, কারণ আমার মহৎ রোগ আছে। মহৎ রোগ কি, মেয়ে-মানুষের মেয়েলি রোগ—যাহা শতকরা ৯৫ জন স্ত্রীলোকেরই আছে। সে রোগ এমনি "মহৎ" যে সেজন্য আমি তার ঘর করিবার উপযুক্ত নহি! একটা কথা বড় আশ্চর্য্যের সঙ্গে ভাবি আমি কে, তার মার বয়সী পিসিমা, সম্পর্কেও গুরুজন, তাঁহার সঙ্গে এসব কথা-বার্ত্তা সে কি করিয়া বলে? একটু লজ্জাও করে না তার? আর, একবার নয়, বারবার এই কথা সে তাঁর কাছে বলিয়াছে। আমার বড় আপশোষ হয়, কেন মরিতে তাকে সে কথা বলিয়াছিলাম, কেন স্বামীর কাছে সরল মনে নিজের এ অসুখের কথা জানাইয়াছিলাম! হায়, তখন কি জানিতাম যে, সে এই অতি সহজ অত্যন্ত সরল কথাটা, এত বড় ও এত কলঙ্কের করিয়া তুলিবে, নির্দ্দোষীকে এই জন্য চরিত্রের দোষ পর্য্যন্ত দিবে! তা আগে জানিতাম না, তাই নিজের কোনও বিষয়টিও তাহার কাছে গোপন করি নাই, সরল ঐকান্তিক বিশ্বাসে প্রাণের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলাম। হায়, যদি কেহ আগে আমায় বলিয়া দিত ওরে বোকা, এ জগতে যত কুটিল যত মহাপাপী যত অসচ্চরিত্রেরই আদর, তাহারাই এ জগতে স্থান পায়, নিরপরাধী সরল হইলে, জগতের যে কেহ হউক না তোকে দুই পায়ে দলিবে, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তোকে

অত্যন্ত যন্ত্রণা দিবে।—কেন তা কেহ আমায় বলিয়া দেয় নাই? আর, আমি নাকি "বড়মানুষের মেয়ে," তাই "তেজ করে' তাকে কড়া কড়া চিঠি লিখে থাকি।" আজ ২।৩ মাস পরে, সেদিন মার অনুরোধে একখানা চিঠি তাহাকে লিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু "বিদ্যা ফলিয়ে ঠ্যাকার করে" কি লিখিয়াছি তাহা ত মনে পড়ে না। কাকে সে "তেজ" বলে তাহাও আমার ধারণায় আসে না। ঐ কথা সে বলে বলিয়াই ত আমি আর প্রায় চিঠিপত্র লিখি না—নেহাৎ খবরটা না পাইলে প্রাণটা বড় চঞ্চল হয়, তাই নিরুপায় হইয়া তাহাকে দু'কলম লিখি। এ জীবনের সব গিয়াছে শুধু তার মঙ্গল সংবাদটা আশা করিয়াই বাঁচিয়া আছি—সেটা পাইলেই অনেক সুখশান্তি আমি পাই। সে ভাল থাকুক, বাঁচিয়া থাকুক—আর কোনও কামনা আমার নাই। সে আমার স্বামী—গুরু—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব; নারায়ণ, বড় বিষ ঢালিয়া রাখিয়াছেন—তবু তাহাকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রাণ শ্মশান হইয়াছে, তবু এক মুহূর্ত্তও তাহাকে কখনও ঘৃণা করি নাই;—তবে তাহার কাযকে আমি ঘৃণা করি, দেখিয়া দুঃখ পাই। আমার প্রাণ চায় সে মহৎ হউক, পবিত্র হউক, প্রেমের স্নিগ্ধ আলোক তার চারিদিক জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলুক। এ স্বার্থের মাঝখানে তাহাকে দেখিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়; তবু আমার অন্তর্য্যামী জানেন, তাহাকে আমি ভালবাসি। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, তাহার মঙ্গল কর, ভিতর বাহির তাহার পবিত্র কর।

আর যে পারি না। হাত যে আর চলে না গো! মনের কথা যে আর লিখিতে পারি না। বেশ শান্ত প্রাণটি লইয়া সুখে দুঃখে একরকম করিয়া দিনটা কাটিতেছিল, আজ কোথা হইতে এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গা প্রাণটা আরও ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল! আঘাত সহিবার আর যে শক্তি নাই প্রভু!

বাবা আমার, চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সে জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস আমার প্রাণের ভিতর আসিয়া বিঁধিল। বাবা! কি করিব আমি, তোমার এত কষ্ট দেখিয়াও তাহা লাঘব করিবার শক্তি ত আমার নাই! যদি প্রাণ দিলে হইত, তবে তোমার শান্তির জন্য আমি তাহাও দিতাম। স্বামী, প্রাণাধিক, কবে কত দিনে এ দীনা অযোগ্যা দাসীকে "আমার" বলিয়া পায়ে স্থান দিবে? কতদিনে—কতদিনে প্রভু, আমার এ ব্যর্থ জীবন সার্থক করিবে? ঐ মুখপানে চাহিয়া যে কত দিন কত মাস আমি বসিয়া আছি—কতদিনে প্রসন্ন হইবে দেব? দাসীর মুখপানে কি চাহিবে না?

রাত্রি ১১টা।

[মৃত্যুর ২ মাস ৯০ দিন পূর্ব্বে লিখিত। ইহাই ডায়েরির শেষ লেখা।—মাঃ মঃ সঃ]

১লা আগষ্ট, রাত্রি ৮টা।

আজ কি জানি কেন প্রাণ আমার উদাস হইয়া কাহার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন কি আছে, কি নাই, সবই শূন্য, সবই ব্যর্থ! মন কোন্ দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কত জোর করিয়া টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এমনি অবাধ্য, এমনি নির্ব্বোধ সে, যে কিছুতেই আসিবে না। মনে হইতেছে যেন আমার কি ছিল, আজ যেন কি নাই, কি যেন পাইয়া হারাইয়াছি; বুঝি এক দিনের জন্য বিশাল ঐশ্বর্য্যের রাণী হইয়াছিলাম, আজ তাহা নাই, আজ আমি ভিখারিণী। একদিন যেন কে একজন প্রাণের দ্বারে বড় মধুর বীণা বাজাইয়াছিল, আজ তা নীরব হইয়াছে। তাই তাহার বিরহে প্রাণ আমার তাহারই উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেন? কেন, তা জানি না—কেবল এইটুকু আমি জানি, আজ আবার নূতন করিয়া প্রাণটা হাহাকারে ভরিয়া উঠিয়াছে; কি জন্য জানি না, কেবলই হায় হায় করিতেছে।

ধীরে ধীরে ঐ যে এক খানি ছবি, সব স্মৃতি ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। ঐ যে, আমি বেশ দেখিতে পাই-

তেছি, কত লোক, কত কোলাহল, আর তারই মাঝখানে আমি—হাঁ, আমিই ত—গোলাপী রঙের চেলি খানি পরিয়া, চন্দনের টিপ পরিয়া, মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়া—আমিই ত—আলপনা দেওয়া পীড়িখানির উপর বসিয়া আছি—কি জানি কাহার আশায়! কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, কত সাধ, কত স্নেহ প্রেম ভালবাসা ভক্তি লইয়া, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া, কি জানি কাহার আশায় বসিয়া আছি। কৈ গো দেবতা! আমার পূজার অর্ঘ্য কি নিয়াছ তুমি?—তার পরে, জানি না কাহারা সব আসিয়া আমায় উঠানে—যেখানে স্ত্রী-আচার হইতেছিল সেইখানে—সেই দেবতার উদ্দেশ্যে—লইয়া আসিল। স্ত্রী আচার হইয়া গেল; সবাই বলিল, "অমু, এবার চেয়ে দেখ, এই শুভদৃষ্টি। এই চার চোখের মিলনই চির জনমের মিলন।" চাহিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না—কিসের লজ্জা যেন চোখ দুইটাকে চাপিয়া ধরিল। তখন পিসিমা আর বউদিদি বলিলেন, "দেখতে হয়, চেয়ে দেখ।" আমি তখন চাহিলাম। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয় লইয়া চাহিলাম। ধীরে ধীরে চারি চক্ষে মিলন হইল, চকিতের মত চাহিয়া চোখ নামাইলাম। হায়, মিলন হইল কি? সেই—সেই চিত্রখানি আবার আজ কতদিন কত মাস পরে আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

না না—এস না, আমি পাগল হইয়া যাইব। যেমন আছি, তেমনি থাকিতে দাও। নারায়ণ, আর মনে পড়িয়া দিও না! প্রভু, দয়া কর। আমি দুর্ব্বল দীনা ভিখারিণী, বুকের আগুন আর বাড়াইও না। দেব! এ জ্বালা ত জুড়াইবার নয়!—ঐ যে—ঐ যে—ঐ হোমাগ্নির সম্মুখে, গোলাপী বসন পরা, দাঁড়াইয়া কে প্রভু? আমিই ত! ঐ—আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া, কে আমার সর্ব্বস্বের মালিক হইল? না—পালাই আমি—

প্রাণের পিপাসা নাথ কিছুতেই মিটিবে না
তবু প্রেম-মকরন্দ বিনা।

৺অমিয়বালা দেবী।

পরলোকগত বৈদ্যনাথ বসু

পরলোকগত গণিত-বিশারদ বৈদ্যনাথ বসু মহাশয় বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি ও সুনাম রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য বা অনুপম অধ্যাপনাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন বলে মানব কিরূপে উন্নতিপথে ধাবমান্ হইয়া বিদেশের ও দেশের হিতসাধন করিয়া থাকেন, বৈদ্যনাথ বাবু তাহারই অন্যতম উদাহরণ-স্থল। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক অসাধারণ বলে বলীয়ান ছিলেন। তাই ঐ মহাত্মার জীবনকথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছি।

১২৫৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ তারিখে, নদীয়ার অন্তর্গত বাগাঁচড়া গ্রামের বসু বংশে বৈদ্যনাথ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে, এক মাসের মধ্যে পিতৃমাতৃহীন হন। তখন বৈদ্যনাথ কুমিল্লা জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। এই কুসংবাদ পাইয়া পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে সাশ্রুনয়নে বাড়ী ফিরিলেন। পিণ্ডদান কোন প্রকারে হইয়া গেল, কিন্তু এখন করিবেন কি এই ভাবনাই ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। সংসারে লোকও ছিল না, বা অর্থও ছিল না। এক বৎসর কাল এইরূপে কাটিয়া যাওয়ার পর বৈদ্যনাথ আবার কুমিল্লায় ফিরিলেন। গিয়াই তথায় এক পাঠশালা খুলিলেন। সুবিধা হইবে না বুঝিয়া পাঠশালা পরে বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাকে আদালতে ও ডাক বিভাগে বহুবিধ কার্য্য করিতে হইয়া-

ছিল। কুমিল্লার পোষ্ট আপিসে যখন কায করিতেন, সেই সময় একখানি সরকারী রেজেষ্টরি চিঠি হারাইয়া যাওয়ায় খুব গোল বাধিয়া উঠে। বহুদিন ধরিয়া অনুসন্ধান চলিল, অনেকের চাকরী গেল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। অবশেষে বৈদ্যনাথের বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে সেই বিপথগামী পত্রের কিনারা হইল। পারিতোষিক স্বরূপ তিনি কুমিল্লার ডাক ঘরের প্রধান পোষ্টমাষ্টার হইলেন এবং "smart boy"নামে ডাক বিভাগে অভিহিত হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেতনও অনেক বৃদ্ধি হইল। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে ইনস্পেক্টর করিবার জন্য সুপারিস পর্য্যন্ত হইল।

কিন্তু বৈদ্যনাথের বিদ্যানুরাগ তখন প্রবল। পূজার পূর্ব্বে, ১৮৬৬ সালের অক্টোবরের প্রথমে, তিন মাসের অবকাশ লইয়া আবার তিনি জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। ডিসেম্বরে পরীক্ষা হইয়া গেল। ফল বাহির হইলে দেখা গেল, বৈদ্যনাথ চট্টগ্রাম বিভাগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বৃত্তি লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতে লাগিলেন।

এই সময় সুবিখ্যাত নাট্যকার ৬দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ডাকবিভাগের চাকরী সূত্রে কৃষ্ণনগরে থাকিতেন। অল্পদিন মধ্যে যুবক প্রৌঢ়ের সহিত আলাপ করিলেন। উভয়েই পরস্পরকে বুঝিলেন। আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। কিছু দিন পরে মিত্র মহাশয় বৈদ্যনাথ বাবুকে নিজের বাসায় রাখিয়া, নিজ পুত্রগণের চরিত্র-গঠনের ভার তাঁহাকে দিলেন। বৈদ্যনাথ বাবু মিত্র মহাশয়ের সংসারে আত্মীয়বৎ মিলিয়া মিশিয়া ছিলেন। এ মিশ্রণ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার সুশিক্ষা প্রভাবে আজ মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণ সকলেই সচ্চরিত্র ও সদাচার-পরায়ণ, অনেকেই কৃতবিদ্য ও মান্যগণ্য।

এম-এ পরীক্ষা দিয়াই বৈদ্যনাথ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোলিটনে প্রবেশ করিলেন। এ সময়ে ঐ বিদ্যালয়ে প্রবেশিকার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়ান হইত। এই নবাগত শিক্ষকের অধ্যাপনা গুণে উহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, উহাকে কলেজে পরিণত করিবার জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। যথা সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাবিভাগে ঐ মর্ম্মে আবেদন করিলেন। ঐ সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে ইংরেজ ভিন্ন আর কেহই কলেজে পড়াইতে সমর্থ নহেন। কাযেই আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

যাহা হউক, অনেক তর্ক বিতর্কের পর কলেজ করিতে অনুমতি আসিল; কিন্তু সর্ত্ত এই রহিল যে পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল না হইলে কলেজ পুনরায় স্কুলে পরিণত হইবে।

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান অবলম্বন বৈদ্যনাথ বাবু। কাযেই অধ্যাপনার ভার অধিকাংশ তাঁহারই উপর পড়িল। বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই গুরুভার তিনি বহন করিতে লাগিলেন।

প্রথম বারের ফল বিস্ময়কর। ১৭টী ছাত্র পরীক্ষা দেয় তন্মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইল। একটী গণিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল; ২টী ২০৲ বৃত্তি পাইল।

ইংরেজ ভিন্ন ভারতবাসী কলেজে পড়াইতে পারেন না এই কুসংস্কার বৈদ্যনাথ বাবু চূর্ণ করিয়া দিলেন। এই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তিনি ভারতের কি উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ করা যায় না। ইহাকেই বলে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

এই প্রকারে বৈদ্যনাথ বাবুর নাম চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। নানা কলেজ হইতে আহ্বানও আসিতে লাগিল। কিন্তু কৃতজ্ঞ বৈদ্যনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়েন নাই। বর্ত্তমান যুগে প্রৌঢ় সম্প্রদায়ের অনেকেই বৈদ্যনাথ বাবুর ছাত্র। ২।৪ জনের নাম উল্লেখ করিলাম যথা—স্যর পি, সি, রায়, মিঃ কে, সি, দে I. C. S; মিঃ জে, এন, গুপ্ত, I. C. S.; মিঃ জে, ঘোষাল, I. C. S.; প্রভৃতি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, স্বহস্ত-গঠিত সাধের মেট্রোপলিটন বৈদ্যনাথ বাবুকে ছাড়িতে হইয়াছিল। কিসে কি হইয়াছিল অনেকেই জানেন;

সেই অপ্রীতিকর বিষয় এখানে চর্চ্চা করিতে চাহি না।

মঙ্গলময় ভগবান যাহা করেন তাহাতেই মঙ্গল। মেট্রোপলিটন না ছাড়িলে বিহারে যশঃপ্রতিষ্ঠা বৈদ্যনাথ বাবুর অদৃষ্টে ঘটিত না। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কয়মাসের জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করার পর, তিনি মুঙ্গের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। তখন এই বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পরিচালনা গুণে অতি শীঘ্রই ইহার উন্নতি হইল—এখন কি কলেজ হইয়া গেল। আজ এই ডায়মণ্ড জুবিলি কলেজ বিহারের অন্যতম শোভা।

মুঙ্গেরে বৈদ্যনাথ বহুপ্রকার সরকারী কার্য্যে যোগদান করিতেন। ন্যূন কল্পে ২০ বৎসর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিচারেও সুনিপুণ ছিলেন। আপিলে তাঁহার রায় কখন খণ্ডিত হয় নাই। জীবনের শেষভাগে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদন পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন, "ছাড়িবেন না, তাহা হইলে আপনার শরীর আরও খারাপ হইবে। বাড়ী বসিয়া কাছারি করুন; অসুবিধা হইলে বন্ধ করিয়া দিবেন।" তৎপরে ঐ ভাবেই কাছারি করিতেন। এ সুবিধা কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে বলিতে পারি না। অনেক সময় ভাল ভাল কায করার জন্য, ১৯১১ সালে বৈদ্যনাথ বাবু একটী দরবার মেডাল পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে উপাধি দিবার জন্য সরকার হইতে বহুবার প্রস্তাবনা হয়, কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই।

অনেকে ঘরে একরূপ বাহিরে অন্যরূপ। কিন্তু বৈদ্যনাথ বাবু ঘরে বাহিরে সমান ছিলেন। তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দাস দাসীগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে ঐ বিষয়েও তাঁহাকে আদর্শ স্থল বলিয়া মনে হয়। আমরা তাঁহাকে কখনও উগ্র কথা কহিতে শুনি নাই। বৈদ্যনাথ বাবু শান্তিময় পুরুষ ছিলেন। অন্নদান ও বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া অবধি অনেক নিরাশ্রয়কে তিনি পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের রীতিমত খাওয়া হইত কি না সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দয়া দাক্ষিণ্যের পরিচয় আর কি দিব?

বৈদ্যনাথ বাবুর ন্যায় ক্ষমতাবান পুরুষ দুর্লভ। কি দৈনন্দিন ব্যাপারে, কি বৃহৎ ব্যাপারে, সকল সময়েই আমরা তাহার দক্ষতা দেখিয়াছি। কোনও ব্যবস্থা বা কোনও হিসাবের ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহার নৈতিক বলও যথেষ্ট ছিল। হৈচৈ করিয়া কখন অভিঘোষণা করিতেন না—যাহা করিতেন তাহা গোপনে।

এখন শেষের কথা। বিগত কয় বৎসর তাঁহাকে যাহা দেখিয়াছি, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি সাধক পুরুষ ছিলেন। এই সাধনার বলেই পীড়ার জ্বালা যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সহাস্য বদনে ও সজ্ঞানে শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সবল অবস্থায় এই মায়া-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের পরমানন্দ। আর আর একটী আনন্দের কথা এই যে, তিনি সুফল রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাঁহার একমাত্র পুত্র, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

শ্রীখুদীরাম বসু।

ধর্ম্ম

(৪)

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা গেল যে বর্ব্বর (Savage) যুগ হইতেই মানব অদৃশ্য শক্তির কার্য্যক্ষমতা মানিয়া আসিতেছে ; বর্ব্বর যুগে সেই অদৃশ্য শক্তি মানবীয় মৃত ব্যক্তির শ্বাসরূপ শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত ; তৎপরবর্ত্তীকালে উহা অমানবীয় শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। "অমানবীয় শক্তি" অর্থে, যে শক্তি কখনই মানব-দেহগত ছিল না। ঝড়, জল, অগ্নি, পর্ব্বত, নদী, চিয়াব, এঞ্জেল, অনেক দেব, যক্ষ প্রভৃতি এই শ্রেণীর। ক্রমে জীবন্ত অথবা মৃত মানবের শক্তির উপর যতই আস্থা হ্রাস হইতে লাগিল, অমানবীয় শক্তিও ততই ঐশী শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। অবশেষে মানব স্বীয় জীবন্ত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ের শক্তির উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া, অনন্ত ঐশী শক্তির উপর একান্ত নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল। মানব প্রথমে জানিত আমিই সব। পরে বুঝিল আমি কিছুই নহি—যথা-নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

বর্ব্বর যুগে মানবীয় মৃত ব্যক্তির শক্তি অদৃশ্য অবস্থায় নিকটেই বায়ুমণ্ডলে, বৃক্ষে, নদীতে, পর্ব্বতে কিংবা সমুদ্রগর্ভে বাস করে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। (১) আরও কিছু উন্নত অবস্থায়, মৃতের আত্মাদিগের বাসের নিমিত্ত কেবল উর্দ্ধেই বায়ুমণ্ডলে অথবা আকাশে পৃথক্ বাসস্থান কল্পিত হইয়াছিল। মানবীয় শক্তির পরিবর্ত্তে যখন ঐশী শক্তির অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও ঐ শক্তির আবাস উর্দ্ধেই স্থাপিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মানবীয় শক্তি ঐশী শক্তিতে পরিণত হইতে বহুযুগ লাগিয়াছিল। প্রথমে মানবীয় শক্তি ; পরে অগ্নি জল বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি ; তৎপর তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী চিয়াব, এঞ্জেল, ফেরেস্তা, যক্ষ, দানব, দেব প্রভৃতি নানাবিধ মধ্যবর্ত্তী সত্তা ; তদনন্তর ইহাদিগের অপেক্ষাও শক্তিমান্ অর্থাৎ অনন্ত শক্তিধর একেশ্বর কল্পনা। এই উপায়ে মানবমনের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ ধারণা যখন যে সমাজে যে ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তখনই তাহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র উর্দ্ধদেশে আকাশ মণ্ডলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখনও এই ধারণাই চলিতেছে। সকল দেশেই অত্যন্ত জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পদার্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য ; কিন্তু সভ্য সমাজেও অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্ এক উর্দ্ধতম পরম ব্যোমে ঐশী শক্তির আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মৃত মানবের প্রেতাত্মার আবাসস্থান প্রেতলোক ; উত্তরোত্তর অধিক শক্তিশালী মধ্যবর্ত্তী সত্তা সকলের আবাসস্থান স্বর্গাদি বিবিধ লোক।(২) অনন্তশক্তিমান্ একেশ্বরের অবাসস্থান পরম ব্যোম। যদিও সুসভ্য সমাজেও কেহ কেহ এ বিষয় সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু স্থূলতঃ এইরূপ বিশ্বাসই সভ্য সমাজে অধিক প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তে ৭ম শ্লোকে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—"এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই?" তাহার উত্তর ঐ শ্লোকেই দেওয়া হইল—"যিনি ইহার অধ্যক্ষ, পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত, এই কথা তিনিই জানেন অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।" (৩) এখনও আমরা ঈশ্বরের নিকট স্তব করিতে হইলে উর্দ্ধদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

(১) অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসীরা এইরূপ বিশ্বাস করিত।

(২) The disembodied soul is regarded as leading an intermediate sort of existence in the air or in a heaven which corresponds to the death whereby it died. Cf. Handbook of Ethnographical Collection, British Museum. p. 105. এই বিশ্বাস বোর্ণিও দ্বীপের সাকাই নামক জাতির মধ্যে প্রচলিত।

(৩) ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন।
১০।১২৯।৭

সুতরাং মানব বর্ব্বর যুগের কিছু পর হইতেই স্বর্গাদি কল্পনা উদ্ভেই করিয়াছে। কিন্তু তখনও নরকের কল্পনা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যখন সমাজ আরও উন্নত হইল এবং অপরাধীর বিচার হইয়া দণ্ডাদি দিবার প্রথা ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে কয়েদ রাখিবার নিয়ম প্রতিষ্টিত হইল, তৎপরে নির্দ্দিষ্ট নরকের স্থান পৃথক্ ভাবে কল্পিত হওয়াই সম্ভব ও স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বর্গাদি লোকের অধিবাসী ইহলোকের মানব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে। তাহাদিগের শক্তি অধিক, এই মাত্র। মানব তাহার রক্ত মাংসের দেহ লইয়া পদব্রজে স্বর্গে যাতায়াত করিতে পারে; স্বর্গের অধিবাসীরাও সর্ব্বদাই ইহলোকে আসিতে পারেন, উভয় স্থানের স্ত্রী পুরুষগণের সংসর্গ হইয়া অপত্য জন্মে—এ সকল এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন; পূর্ব্বকালেও অনেক সমাজেই ঈদৃশ বিশ্বাস ছিল। (৪)

যাহাদিগকে আমরা মধ্যবর্ত্তী সত্তা বলিয়াছি, তাঁহারা ইচ্ছামত মানবীয় দেহ ধারণ করিতে পারিতেন; অন্য দেহেও প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের রূপ কল্পনা করিতে হইলে মানবের আদর্শ লওয়াই স্বাভাবিক। আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে বিটেটিলা জাতি ধর্ম্মানুষ্ঠানকালে যে মুখোস পরিধান করে, তাহা বীভৎস হইলেও মানবীয় মুখের ন্যায়। ঐ প্রদেশের অন্য বর্ব্বরেরা পূর্ণ মানব দেহ গড়িয়া অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। (৫) আমাদিগের দেশে চড়ক পূজায় সন্ন্যাসিগণও পূর্ব্বে বীভৎস মানবীয় মুখ শোলা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া মুখে লাগাইয়া নৃত্য করিত। এই সকল স্থলে মানবীয় আদর্শ গৃহীত হইয়াছে; বোপ্, পেলেঙ্গি, বু সঙ্গোদিগের দলপতি ছিলেন; তাঁহার কাষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহারই মত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবিত কালেই এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল সুতরাং মূর্ত্তিগঠন, মানবের মৌলিক প্রকৃতি। চিত্রবিদ্যাও তাহাই। বিবর্ত্তনবশে মানব যখন প্রথমে মানব নামের যোগ্য হইল, সেই আদিম কালেও নানাবিধ অস্থির উপর প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তৎকালীয় মানব নানাবিধ জন্তুর বা বৃক্ষপত্রাদির মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত। এ প্রবৃত্তি সেই আদিযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

সুতরাং ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বিভাগে মূর্ত্তি রচনা করা স্বাভাবিক। ইহা বর্ত্তমান সুসভ্য যুগেও চলিয়া আসিতেছে। মৃত আত্মা মঙ্গল অমঙ্গল উভয়ই করিতে পারে এ ধারণা যখন বর্ব্বর যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তখন তাহার মূর্ত্তি গঠন করা হইলে পর, তাহার নিকটে নানা চেষ্টা দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিবার প্রবৃত্তিও চলিয়া আসিবে ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরং ইহাই সম্ভব মনে হয়। হইয়াছেও তাহাই। কিন্তু প্রথমে ঐ মূর্ত্তিকেই কিঞ্চিৎ ভয়াবহ প্রকারে গঠিত করা হইত। যখন পীড়া অথবা অন্য অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেতাত্মাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইত না, তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া প্রহার করিয়া কিংবা অন্য প্রকারে উৎপাত করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করা হইত। রোগীকে ভূতে পাইয়াছে বিবেচনায় ওঝা মহাশয় তাহাকে প্রহার করিতেন, কখনও বা তাহার নাসিকার নিকট লঙ্কা পোড়াইয়া ধরিতেন; এ সকল তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা। ইহারই অনুরূপ চেষ্টা ভয় প্রদর্শন করা। সুতরাং সে যুগে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া উপলক্ষে যে সকল মূর্ত্তি রচিত হইত, তাহা মানবীয় আদর্শে হইলেও, ভয়ঙ্কর রূপেই গঠিত হইত। কঙ্গো প্রদেশের হাত পা কাটা মূর্ত্তি এই শ্রেণীর। এরূপ মূর্ত্তি কেবল বর্ব্বর যুগে অথবা অসভ্য সমাজেই গঠিত হইত তাহা নহে, সুসভ্য সমাজেও গঠিত হইয়া থাকে। (৬)

(৪) পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অধুনা স্বর্গকে ধরাতলে নামাইতেছেন।

(৫) Handbook, pp. 225—226. ২২৬ পৃষ্ঠায় যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার দুই হস্ত নাই; পায়ের হাটুর নীচের ভাগ ভাগ নাই। সুতরাং হাত পা কাটা মূর্ত্তি।

(৬) পুরীর কাষ্ঠময় হাত পা কাটা মূর্ত্তি যেরূপ ভীতিপ্রদ, তাহা দেখিয়া কোন কোন শিশু কাঁদিয়া উঠে।

মূর্ত্তি একবার ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে প্রচলিত হইলে, উত্তরোত্তর সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে নানাবিধ ভাবে নানারূপ কারণে উহা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ভিন্ন, মোক্ষসাধনায় উহা জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক কখনই স্বীকৃত হয় না। "অল্পমেধসাং সাধকানাং হিতার্থায়" মূর্ত্তি এখনও রচিত হইতেছে। সুসভ্য সমাজে উহার বিবিধ দার্শনিক যুক্তি ও ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হউক, কিন্তু যে সকল অসভ্য জাতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে মূর্ত্তি গঠন করে তাহারা ঐ সকল দার্শনিক যুক্তির বিন্দুবিসর্গও বুঝে না। এ কার্য্য অসভ্য যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

মূর্ত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ হইবার পর উহা বাসগৃহেই স্থাপিত হইত। অসভ্য সমাজে এখনও তাই হয়। তদনন্তর বিবিধ কারণ বশতঃ উহা ভিন্ন গৃহে স্থাপিত হয়। সে সকল কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। কিন্তু এ মূর্ত্তি প্রথমেই গৃহদেবতার আসন পায় নাই। যতদিন কোনও দলপতির মূর্ত্তি তাঁহার জীবিত কালে অথবা মরণান্তে স্থাপিত হইত, ততদিন সমাজে দেবতার জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। শেষে মানবীয় শক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বিশেষ সত্তার ধারণা জাত হইলে, ঐ সকল মূর্ত্তি ক্রমে গৃহদেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট নিবারণ, এই দুই ভাবই ঈদৃশ মূর্ত্তি স্থাপনের মূল ভিত্তি। ঐ সকল মূর্ত্তিকে তুষ্ট করিতে হইলে তাহাকে বিবিধ প্রকারের আহার্য্য বস্তু দেওয়া আবশ্যক। মৃতের আত্মাকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বর্ব্বর সমাজে যেমন মৃতের সহিত তীরধনু, আম মাংস, পশুচর্ম্ম ইত্যাদি দেওয়া হইত, তেমনই এই সকল দেবতার তুষ্টি সাধনার্থ [অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে] মাংসাদি সুপক্ব আহার্য্য অথবা সুমিষ্ট ফল দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে পশুবধ করা বর্ব্বর যুগের শেষভাগ অথবা অসভ্যাবস্থার প্রথম ভাগ হইতেই সম্ভবতঃ চলিয়া আসিতেছে। মৃত মানবের মূর্ত্তির নিকট অথবা অমানবীয় মূর্ত্তির নিকট, উভয় স্থানেই এই উপলক্ষে পশুবধ করা হইত এবং এখনও হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই মৃতের নিকট আমমাংস দিবার প্রথা ছিল তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। কারণ তখনও মানুষ রন্ধন করিতে শিক্ষা করে নাই।(৭) তখনও মূর্ত্তি রচিত হয় নাই। পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, বায়ু, বীভৎস মানবমূর্ত্তি—এ সকলই মানব-মনের বিভিন্ন অবস্থায় অতিশয় শক্তিশালী বিবেচিত হয় এবং মানবের ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং ইহারা উপহার, নৈবেদ্য, নানাপ্রকার খাদ্য বস্তু প্রথম হইতেই পাইয়া আসিতেছে; এখনও পায়।

যে সকল মানব মূর্ত্তিপূজা করে না, তাহারা মানব মনের সর্ব্ব প্রথম অবস্থায় অদ্যাপিও আছে। সর্ব্বপ্রথম অবস্থা কি? নিকট আত্মীয় স্বগণের মৃত্যুর পর তাহার শ্বাসকেই জীবনীশক্তি বিবেচনা করিয়া এবং ইষ্টানিষ্ট সাধনে সমর্থ জ্ঞান করিয়া তাহার তুষ্টির নিমিত্ত তীর, ধনু, আম মাংসাদি দেওয়া। সেই শ্বাসই আত্মা, শ্বাসই শক্তিমান; শ্বাসকেই তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। ডেঙ্গর দ্বীপের বর্ব্বর জাতি হইতে সভ্যতম হিন্দুজাতি পর্য্যন্ত, সকলেই এই সংস্কার বিভিন্ন আকারে পোষণ করিয়া আসিতেছে। এই সংস্কার আদিম। যদি তাহাই হইল, তবে শ্বাসের ত মূর্ত্তি নাই; সুতরাং তাহার মূর্ত্তি গঠন অসম্ভব। এই সংস্কার যতদিন চলিয়াছে, ততদিন (বর্ব্বর যুগেও) মূর্ত্তি গঠিত করা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; সভ্য যুগেও কোন কোন সমাজ হইতেছে না। আত্মা, হোলি স্পিরিট, ইত্যাদি অমূর্ত্ত। সুতরাং এই পথে যে সকল জাতির ধর্ম্মমত কাল সহকারে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে তাহারা মূর্ত্তি গঠন করে না। তবুও মূর্ত্তি চায়। এই নিমিত্ত তাহারা কোন কোন শক্তিশালী মানবকে অবতার কল্পনা করিয়া, মনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে।

(৭) রন্ধন করিয়া সুপক্ব বস্তু আহার করা সভ্যতার লক্ষণ; সম্পূর্ণ অপক্ব অথবা অর্দ্ধপক্ব মাংসাদি আহার করাকে অসভ্যতার লক্ষণ বলা যায়। এই লক্ষণ অনুসরণ করিলে আধুনিক ইউরোপ আমেরিকায় অনেক তথাকথিত সভ্য জাতিকে প্রকৃত পক্ষে অর্দ্ধসভ্য বলাই সঙ্গত।

আর পর্ব্বত, নদী, মানবাত্মা ইত্যাদিকে শক্তিশালী বিবেচনা করিয়া মূর্ত্তি রচনা করা বর্ব্বরাবস্থার পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান। উহা আদিম অনুষ্ঠান নহে। এই সংস্কার আশ্রয় করিয়া যাহাদিগের ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বেও মূর্ত্তি গঠন করিয়াছে, এখনও করে।

কিন্তু যাহা কিছু আদিম, যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই উত্তম স্থান করা ভক্তিভাবের অন্যতম বিকাশ। পূর্ব্বকালীয়গণ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ, তাঁহাদিগের আচার অনুষ্ঠানকে ভক্তি করাও স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এই কারণেই—অমূর্ত্ত অনুষ্ঠানই প্রাচীনতম বলিয়াই—এখনও শ্রেষ্ঠ গণ্য হইয়া থাকে, মূর্ত্তি রচনা "অধম" বলিয়া বিবেচিত হয়।

ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশ এই ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে বিবিধ মানব সমাজে পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছে। কোন সমাজে সর্প, ব্যাঘ্র সিংহ, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির তুষ্টি সাধন; কোন সমাজে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ; কোথাও বা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে 'লাইবেশন' দান কিংবা অ্যানসেষ্টার পূজা; কোন সমাজে নানাশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী দেবতার তৃপ্তি সাধন; কোথাও একেশ্বরের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া—একদিকে মানব মনের ক্রমবিকাশের যেরূপ পরিচয় দিতেছে, অন্যদিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানও তেমনই জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

এ সকল অনুষ্ঠান বাহ্যিক। ইহা কোথাও নৃত্য, চীৎকার, সুরাপান এবং বিকট বাদ্যধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ করে, কোথাও পশুবধ, অগ্নি প্রজ্জ্বালন, অথবা উদ্ভিদ ছেদনে তৃপ্তিলাভ করে; কখনও বা নরবলি, অথবা নরহত্যার আকার ধারণ করিয়া ভয়াবহ উঠিয়া উঠে। বাহ্যিক অনুষ্ঠান কখনও বা মানবের অঙ্গপীড়নে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু মানবগণ যতই উন্নত হয়, ততই বাহ্যিক অনুষ্ঠান কমিয়া যায়; এবং তাহার পরিবর্ত্তে মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ ধ্যান অথবা যোগই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়।

মৃত মানবের আত্মা অথবা অন্যবিধ (যাহাকে পূর্ব্বে অমানব আত্মা বলিয়াছি) অদৃশ্য আত্মা, যখন যাদৃশ আত্মাকে মানব পরম শক্তিশালী এবং ইষ্টানিষ্ট-বিধায়ক বলিয়া মনে করিয়াছে, তখনই নানাবিধ পদার্থ তাহার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছে। আম মাংস, নবীন শস্য অথবা ফল, তীরধনু ইত্যাদি দেওয়া হইত—মৃত মানবীয় আত্মার অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু যখন অন্যবিধ আত্মাকে বিভিন্ন বস্তু দান করিবার অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়, তখন সে দানেরউদ্দেশ্য অভাব পূরণ নহে, ঐ সকল আত্মার তুষ্টি সাধন। এই দ্বিবিধ ভাব হইতেই ক্রমে ঈদৃশ দান, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান রূপে পরিণত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

হিন্দু সমাজে নারীর স্থান ও শিক্ষা

পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকেই দুই দিক হইতে দেখা যায়—এক স্বানুভবের (subjective) দিক হইতে, আর এক পরানুভব বা বাস্তবের (objective) দিক হইতে। এই দুই দিক দিয়া যখন কোন জিনিসকে দেখা যায়, তখনই জিনিসটিকে পুরাপুরি ভাবে দেখা হয়; নতুবা দেখা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

আমাদের দেশের নারীজাতির বিষয় আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কেবল এক দিক দিয়াই চিন্তা করিয়া থাকি। কাযেই আমাদের চিন্তার কোথায় অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায় তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যখনই আমরা তাহাদের বিষয় আলোচনা করি, তখনই কেবল স্বানুভব (subjective) ও উপযোগিতার (utility) দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া থাকি; অর্থাৎ ইহাই ভাবি যে, সে উন্নতিতে

আমাদের স্বার্থের যোগ কতটুকু, প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধ কতখানি ; নারীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি অর্থে আমরা বুঝি, আমাদের সুখ সাধনে নারীর উপযোগিতা বৃদ্ধি। স্ত্রীজাতি আমাদের একান্ত আবশ্যকের সামগ্রী, ভোগের বস্তু, আমাদের প্রেম-সাধনে অনিন্দনে আত্মবলিদানেই নারীজীবনের চরিতার্থতা, কাযেই কিরূপ শিক্ষা দিলে তাহারা আরও সুন্দররূপে, গভীরতর ভাবে আমাদের সুখোৎপাদন করিতে প্রয়াসী হইবে, অলক্ষ্যভাবে অন্তরে এই ধারণা লইয়াই'ত আমরা চিরকাল নারীর শিক্ষা ও উন্নতি কামনা করিয়া আসিয়াছি। নারীর শুচিতা, সতীত্ব ও পবিত্রতার কথাও যখন ভাবিয়াছি, তখনও তাহা স্বামিত্ব-প্রতীতি ও নিজস্ব-জ্ঞানের দিক হইতেই ভাবিয়াছি। কিন্তু নারীর শিক্ষা, নারীর উন্নতি নারী জীবনের দিক দিয়াও যে কতখানি আবশ্যক, আমাদের মন সে চিন্তাকে চিরদিনই এড়াইয়া আসিয়াছে। আমাদের উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করা ছাড়াও যে ফুল-জীবনের অন্য সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা যেমন ভাবিবার ক্ষমতা আমাদের কোন দিনই হয় নাই, অথবা সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও আমরা কখনও বুঝি নাই, তেমনি স্ত্রীজাতির উন্নতি-কামনা যে নারীস্বাতন্ত্র্য-চিন্তা হইতে উদ্ভূত না হইয়া স্বামিত্ব-প্রতীতি ও নিজস্ব-চিন্তা হইতে উদ্ভূত হইয়া এতদিন আমাদিগকে চালিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমাদের সহজজ্ঞানে আসে নাই।

এই যে স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য ও স্ত্রী-জাতির উচ্চ শিক্ষার কথা উঠিলেই আমরা ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় আঁৎকাইয়া উঠি এবং "It is not wise to implant in girls, by means of education, tastes which they would not have an opportunity to gratify in their after life, and thus sow the seeds of future discontent and discord"...(১) প্রভৃতি বড় বড় যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়া হিন্দুনারীসমাজের প্রতি দরদ দেখাই, তাহা কি সত্য সত্যই নারীজীবনের শুভাশুভের দিকে তাকাইয়া দেখাই, না সেই স্বামিত্ব-বোধের দিক দিয়া ও সমাজ-জীবনে স্বার্থের যোগসূত্রের দিকে তাকাইয়া ? আমরা মুখে যতই বলি না কেন "যে দেশে নারী পূজা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন সে দেশে দেবতারা বিরাজ করেন", প্রকৃতপক্ষে নারী-স্বাতন্ত্র্য, নারীর অধিকার, সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত ও স্বার্থচিন্তাশূন্যভাবে আমরা কখনও চিন্তা করি নাই বা করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ তাহাদের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে হইলে আমাদিগকে কতখানি গভীরতা, কতখানি ধীরতা এবং কতখানি উদারতার সহিত চিন্তা করিতে হইবে, এবং সে চিন্তা যাহাতে একান্ত স্বার্থানুগ না হইয়া স্বার্থাতিগ ও পরাভিমুখ হয়, সে বিষয়ে কতখানি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা কোন দিনই বুঝি নাই ; কাযেই যখনই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে গিয়াছি, আমাদের অলক্ষ্যে তাহা স্বাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সত্য সত্যই যদি আমরা নারী-জাতির প্রকৃত কল্যাণ, নারীত্বের স্বতঃস্ফূর্ত্তি ও বিকাশ দেখিতে চাহিতাম, তাহাদের অধিকার নিজেদের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতাম এবং নিরপেক্ষ ভাবে অচল-প্রতিষ্ঠ সংস্কার সমূহের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের শুভাশুভের কথা ভাবিতাম, তাহা হইলে আমাদের মন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যচিন্তাকে এরূপভাবে এড়াইয়া যাইতে পারিত না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতিকে স্বতন্ত্রভাবে আমরা কখনও দেখি নাই, কাযেই এ প্রশ্ন আমাদের কোন দিন মনে হয় নাই যে, যে শিক্ষা আমরা নিজে অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে পারি এবং নিঃসঙ্কোচে বালকগণকে দিতে পারি, নারীজাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার আমাদের আছে কি না ; এবং সে শিক্ষা দিলে যে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে, নৈতিক বন্ধন

(১) Calcutta University Commission Report, 1917-19, Part I, Vol. II, Chap XIV. p. 6.

শিথিল হইবে এবং পারিবারিক জীবনের শুচিতা নষ্ট হইবে ইত্যাদি ভাবিবার অধিকার কেবল পুরুষের উপরই আছে কি না।

মানুষ বলিলে যখন আমরা স্ত্রী ও পুরুষ সকলকেই বুঝি, কাহাকেও বাদ দিতে পারি না, তখন মানুষের যাহা অধিকার তাহা হইতে স্ত্রীজাতিকেই বঞ্চিত করি কিরূপে? কাযে কাযেই যদি আমাদের এ বিশ্বাস থাকে যে, সমাজের শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার একা পুরুষেরই আছে, তাহা হইলে সে বিশ্বাসের মূলে সত্য ও নিরপেক্ষ বিচার আছে কি না তাহাও দেখা আবশ্যক। আর যদি সে অধিকার আমাদের নাই স্বীকার করি, তাহা হইলেও ভাবিতে হইবে, যে জন্মজাত অধিকার ও প্রকৃতিগত প্রাপ্য হইতে কোন মানবকেই বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই, নারীজাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমরা সমাজের কি অকল্যাণ সাধন করিয়াছি এবং মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের নিকট কি অপরাধ করিয়া আসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার নানা দোষ সত্ত্বেও যখন তাহার প্রভাবে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও জাতীয়ত্বের বহু বিকাশ হইয়াছে আমরা স্বীকার করি, তখন সেই শিক্ষায় যদি নারীত্বের বিকাশ হইবারও সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সাময়িক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় সে শিক্ষা-লাভ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না তাহাও চিন্তার বিষয়।

স্বীকার করি যে, যাহারা বহুযুগ হইতে আপনাদের সত্তা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য পুরুষের সত্তায় ও ইচ্ছায় মিশাইয়া দিয়া আসিয়াছে এবং আত্ম-শক্তি-স্ফুরণের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া পুরুষের প্রেয়সাধনকেই স্বীয়জীবনের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়সাধন ও চরম পরিণতি জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে অকস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিতে ও নবতর জাগরণে উদ্বুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরের বদ্ধ বাতাস হইতে বাহিরের মুক্ত বাতাসে আনয়ন করিলে তাহারা একটু বেশী অসংযত ও অস্বাভাবিক ভাবেই ক্রয়াশীলা হইয়া উঠিবে এ সম্ভাবনা আছে; এবং তজ্জন্য সমাজে যে সাময়িক নীতিবিপ্লব ঘটিবে তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও "অধিকতম জনের প্রভূততম কল্যাণ"-এর দিকে তাকাইলে সে অপকার তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়।

তাহার পর নারীর মর্য্যাদা, নারীর শুচিতা ও পবিত্রতা যে শুদ্ধ পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং সামাজিক কঠোরতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহা বিশ্বাস করাও ত গৌরবের বিষয় নহে! তাহাতে শুদ্ধ যে নারীজাতির মর্য্যাদা খর্ব্ব হয় তাহা নহে, তাহাতে পুরুষকেও বিকৃত করে, সমাজকেও লজ্জা দেয়। শুদ্ধ কদর্য্যতা ও প্রলোভন হইতে লুকাইয়া রাখিলে, বাহিরটাকে একেবারে তাহাদের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিলে কখন কখন তাহাদের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে নারীত্বের মর্য্যাদা ও নারীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় এবং নারী-স্বাতন্ত্র্যের লোপই ঘটিয়া থাকে তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর বর্ত্তমান সমাজে আমরা যাহাকে রমণী-চরিত্রের শান্তিপ্রিয়তা ও কমনীয়তা বলিতেছি, এবং যাহা আমাদের সমাজকে বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য দান করিতেছে বলিয়া ভাবিতেছি, তাহা কি প্রকৃতপক্ষে শান্তিপ্রিয়তা, না একটা প্রাণহীনতা, একটা জড়তা মাত্র? যাহাকে আমরা নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পাতিব্রত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, তাহা কি যথার্থই পাতিব্রত্য, না একটা নিরবচ্ছিন্ন দাসীত্ব? যে সেবায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মদান নাই, যে বিসর্জ্জনে আত্ম-মর্য্যাদার মহনীয়তা নাই, যে নিষ্ঠায় প্রাণস্পর্শ নাই, তাহাকে দাসীত্ব বই আর কি বলিতে পারি? আমরা নাটকে নভেলে, পুরাণে, আখ্যানে, সাহিত্যে ইতিহাসে সতীধর্ম্ম ও পাতিব্রত্যের যে চিত্র আঁকিয়া আসিয়াছি, তাহাদ্বারা কি আমরা নারীজাতিকে বিবর্ত্তন-ধারার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শের দিকে এবং নারী-ধর্ম্মের নবতর বিকাশের দিকে লইয়া যাইতেছি, না দিন

দিন নারীর অধিকার, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নারীর মর্ম্মগত ধর্ম্ম ভুলাইয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বামীর প্রেয়সাধনের দ্বারা এবং এই দাসীত্ব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া জীবনের চরিতার্থতা উপলব্ধি করিবার একটা অন্ধ প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতেছি? আমাদের সমাজের বালবিধবা ও কুলবধূদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি কিরূপে আমরা নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি, প্রবৃত্তি ও শীলতাকে নিদারুণভাবে অস্বীকার করিয়া, নারীর স্বতন্ত্র সত্তাকে নির্ম্মমভাবে দলিত করিয়া, শুদ্ধ পুরুষের সুখসাধনে এবং নির্ব্বিচারে তাহাদের অনুগমন চেষ্টায় তাহার সকল শক্তি পর্য্যবসিত করিতে শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু আমরা ভাবিতেছিনা যে, এইরূপে আমাদের লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমরা যতই নারীজীবনের গূঢ়তর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছি, আমাদের সমাজ-জীবনও ততই পদে পদে ব্যর্থ হইয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। এই অন্ধ নির্ভরশীলতা, এই প্রাণহীন আত্মোৎসর্গ (self-abnegation) কি নারী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে? ত্যাগের দিক দিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে ইহা বরণীয় ও মহনীয়, কারণ সে ক্ষেত্রে ইহা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আনন্দদানের স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত; কিন্তু একটা জাতি হিসাবে একটা সমাজ হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে, এই ত্যাগ ও আত্মদান যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত (out of free-will) হইবে তাহা আশা করা কি সমীচীন? না সেই অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিয়া, তাহাকে বিধিনিষেধের বন্ধনে বাঁধিয়া প্রথা হিসাবে গ্রহণ করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক? যাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব, তাহা সমগ্র জাতির পক্ষেও সম্ভব, এরূপ বিশ্বাস করিয়া কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে তাহার যে বিষময় ফল হয়, তাহা ত সতীদাহ প্রথার পরিণাম হইতেই আমরা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছি। তাহারা যে সদা "রক্ষণীয়া স্ববন্ধুভিঃ" এবং অবিশ্বাসিনী বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহাও ত আমাদের চিরদিন স্বায়ত্তীকরণ-চেষ্টা ও স্ত্রীচরিত্রে সংশয়েরই ফল। কারণ তাহাদেরই নৈতিক শক্তি ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে আমরা চিরদিন যে নিদারুণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি, তাহাতেই তাহারা এরূপ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীনা ও পরনির্ভরশীলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ভিতরও যে একটা আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং একটা প্রবল নৈতিক শক্তি রহিয়াছে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই; কাযেই আমরা ধারণাও করিতে পারি না যে উচ্চশিক্ষা প্রভাবে সেই মর্য্যাদা জ্ঞান ও আত্মশক্তিকে স্ফুটতর করিলে, আপনা আপনি তাহাদের ভিতর হইতে যাহা অসুন্দর যাহা কুৎসিত ও নিন্দার্হ তাহার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারা নির্ভীক চিত্তে সমাজের সহস্র কদর্য্যতা সহস্র প্রলোভনের মধ্য দিয়াও আপনাদের শুচিতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিবে। ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক টোকভিল (A. D. Tocqueville) তাঁহার "Democray in America" নামক পুস্তকে আমেরিকার রমণীগণের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া এই কথাটি বড় সুন্দর রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"And instead of inculcating mistrust of herself, the Americans constantly seek to enhance their confidence in her own strength of character. As it is neither possible nor desirable to keep a young woman in perpetual or complete ignorance, they hasten to give her a precocious knowledge on all subjects. Far from hiding the corruptions of the world from her, they prefer that she should see them at once and train herself to shun them."

ইহাতে হয়ত অনেকে বলিবেন, হিন্দু রমণীকে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিতা করিলে বা তাহাকে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ করিলে আমাদের সমাজের সনাতন আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহারা ক্রমশঃ স্বৈরিণী

হইয়া পড়িবে,—ফলে স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি নারীজাতির সে সমস্ত সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি পারিবারিক জীবনকে মধুর করিয়া রাখে, সে সকলগুলিই প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইবে, সমাজ জীবনে একটা বিরোধ ও বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু একটু ধীরভাবে উদার ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বস্তুতঃ তাহাতে সে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। কারণ সামাজিক বিপ্লব-সৃজন ও দ্বন্দ্ব বিরোধই মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; যুগধর্ম্মের উপযোগী করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে যাইয়া যদি একটু চঞ্চল ও অসংযত হইয়া পড়ে, তথাপি অচিরকাল মধ্যে তাহাকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে আসিতেই হইবে। পুরুষ বা স্ত্রী, সমাজ-জীবনে কেহই স্বপর্য্যাপ্ত নহে। প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়াই প্রত্যেকের জীবন, প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই প্রত্যেকের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি এবং প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মদানের ভিতর দিয়াই প্রত্যেক জীবনের সার্থকতা। তাহার উপর, যাঁহারা ধাত্রীর মত মানব-সমাজকে অনাদিকাল হইতে নিবিড় ভাবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে সমাজে অকল্যাণ ও অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই ধারণা পোষণ করা কি যুক্তিসঙ্গত? বরং যাঁহারা রক্ষণী ও পালনী শক্তিরূপে মানব সমাজকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এবং নবতর জাগরণে জাগরিত হইলে, সমাজকে সুন্দরতর, প্রিয়তর এবং মধুরতর করিয়াই তুলিবেন।

অবশ্য আমি এরূপ কথা বলিতেছি না যে, হিন্দু নারীকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিতা করিতেই হইবে, বা সে শিক্ষা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই; কিন্তু একটি কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, স্ত্রী ও পুরুষ সমাজ শরীরের দুইটি অঙ্গ। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও সমোন্নতি (harmonious growth) সাধন করিতে হইলে এই উভয় অঙ্গের ভিতর সর্ব্ববিষয়েই একটা ঐক্য ও একটা সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক, নতুবা অঙ্গবিশেষের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন দ্বারা সমাজকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা কীলকবদ্ধ তরণী-চালন প্রয়াসের ন্যায় জাতীয় মনের প্রতিভা ও শক্তির অপচয় মাত্রই হইবে, তাহাতে সমাজের উন্নতি বা লাভ কিছুই হইবে না। যাঁহারা গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মনীষিণীদিগের শিক্ষালাভ প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা দিবার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন—

We do not want.........that women in India should be steadily Anglicised, importing into our peaceful homes the spirit of revolutionary and rationalistic iconoclasm, condemning all our ancient institutions that are the outcome of a long past, and a part of our flesh and blood, as it were.*

তাঁহাদিগকে আমি তাৎকালিক শিক্ষা-প্রণালী ও পারিবারিক জীবন-ধারার দিকেও লক্ষ্য করিতে বলি। বর্ত্তমান যুগেও যদি আমাদের যুবক ও বালকদিগকে ভারতের চিরন্তন প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়া ভারতীয় আদর্শে তাহাদিগের পারিবারিক জীবন-ধারা গঠিত করিবার সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য প্রণালীতে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা দিবার কোন কথাই উঠিত না। কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, তখন নারীজাতিকে এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে বা সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শে তাহাদিগকে গঠিত করিবার চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে পারিবারিক জীবনে বিরোধ ও পার্থক্য দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে স্ত্রীজাতিকে এরূপ

* C. U. Commission Report, 1917-19, Chap. XIV. para 13.

শিক্ষা দিতে হইবে, যাহা তাহাদের ভিতরে স্বাতন্ত্র্য বোধ ও আত্মপ্রত্যয়-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে কালোপযোগী করিয়া তুলে, এবং তাহারা নিজেদের অধিকার প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া, আমাদের অনুগ্রহদত্ত শিক্ষালাভে ও এই দাসীত্ব ধর্ম্ম পালনে তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া নারী জীবনের চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া, স্বেচ্ছায় অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে পুরুষের প্রেয়সাধনে আত্মদান করে ও মঙ্গলমূর্ত্তিরূপে আমাদের পারিবারিক জীবনে দেখা দেয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

ডাংপিটে

(গল্প)

ছোট্ট একটি পাহাড়। ভুঁইফোড় খামখেয়ালের মত সে ধূধূ-করা মাঠের মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার অনেক দূরে একরত্তি একখানি ঝাপ্সা-সবুজ গ্রাম কতকাল ধরিয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। শেষ রৌদ্রে পাহাড়ের লম্বা ছায়া অতিকষ্টে তাহার কিনার-টুকু ছোঁয়, যেন ইচ্ছাময় স্পর্শ দিয়া ডাকিয়া বলে—"সখি জাগো।"

পাহাড় ত পাহাড়—গ্রামের লোকেরা পাহাড়ের একটা খবরই রাখে না। সে যে বেশী করিয়া তাহাদেরই একটা জিনিষ, অন্য লোকের নয়, এ অন্যায় অহঙ্কার তাহাদের নাই। তাহাদের কাহারোই কখনো সখ হয় নাই এই মস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিতে। রাখাল গরু লইয়া তাহার বাঁচড়ার মধ্যেই ঘোরে, চাষা লাঙ্গল দিয়া তাহার মাঠান জমিই চযে—তার বাহিরে তাহারা যায় না, যাওয়া দরকারও মনে করে না—কেননা কাজ চলিয়া যাইতেছে।

গ্রাম হইতে পাহাড় কতটা দূরে, কি আছে তাহাতে, কতটা সে উঁচু, এসব কথার কেহ জবাব দিতে পারে না—দিতে পারে না বলিয়া দুঃখিতও নয়, লজ্জিতও নয়। তাহারা জানে পাহাড় পর্য্যন্ত যাইতে গেলে ঘাম ছুটিয়া যাইবে, আর পাহাড়ে উঠিতে গেলে পা পিছ্লাইয়া যাওয়াই সম্ভব। তাহারা ঘাটে যায়, হাট করে, খায়, দায়, ঘুমায়—একটানা শান্তিতেই আছে।

পাহাড়টা যে একটা বেয়াড়া জিনিষ, একটা খাপ্-ছাড়া ছন্দছাড়া কিম্ভূত কিমাকার কিছু—একথা তাহারা জানে। গ্রামের এলাকার মধ্যে দাঁড়াইয়া পাহাড়ের চূড়ার দিকে চাহিলেও অনেক সময় তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়—তাই তাহারা পাহাড়ের দিকে বড় একটা চাহেই না; চাহিলেও, আড়চোখে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরাইয়া লয়। তবে তারই মধ্যে এটুকু তাহারা দেখিয়া লইয়াছে যে, পাহাড়ের স্বভাবটা বড় সুবিধার নয়—অর্থাৎ ভোরবেলা তার রংটা থাকে ধোঁয়াটে, কিন্তু বেলা বাড়িলেই হয় তামাকের মত কটা, আর বিকাল বেলা আকাশের সঙ্গে একদম মিশিয়া যায়। কেহ কেহ আবার ইহাও হলপ্ করিয়া বলেন যে, জ্যোৎস্না রাতে তার রংটা হয় মিশ্মিশে কালো—যেন একখানা কয়লা-ভরা মেঘ কত কি দুশ্চিন্তা লইয়া আকাশের নীচের তালায় মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। তা ছাড়া ইহাও শোনা গিয়াছে যে, নিশুতি রাত্রে যদি কেহ মাঠে দাঁড়াইয়া চেঁচায়, তাহা হইলে পাহাড়ের দিক হইতেও কে যেন চেঁচাইয়া ওঠে—আর সে এম্নি বিশ্রী গলায়—যে কার না বুক ধকাস্ ধকাস্ করে?

ঘর বুড়ীদের মধ্যে পাহাড়ের দুই একটা গল্পও চলিত আছে। সে গল্প যে-কি তাহা ঠিক্ জানি না, তবে এইটুকু জানি যে, ছেলেরা যখন খাইয়া দাইয়া বিছানার মধ্যে শোয়, তখন তাহার চেয়ে ভাল ঘুম-পাড়ানী গল্প আর নাই। খুব ছট্‌ফটে ছেলেও হয় কাঠের পুতুলের মত শক্ত হইয়া যায়,মুখে টুঁশব্দটী থাকে না, না হয় কেন্নোর মত কোঁকড়াইয়া গিয়া বালিস জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "আর না ঠাকুমা, থাক্।"

বলিষ্ঠ যুবাপুরুষেরা অবশ্য পাহাড়ের কোন নিন্দা করেন না, তবে এইটুকু বলেন যে, পাহাড়টা না থাকিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না, বরং লাভের মধ্যে শীত বৃষ্টি কিছু কমিত; আর দেখিতে শুনিতে নিহাৎ মন্দ না হইলেও, এমনই বা কি? বরং প্রকাণ্ড জিনিষের দোষই আছে যে মনের মধ্যে ঢুকিলে চট্ করিয়া বাহির হইতে চায় না—আর এটাও ঠিক্ প্রচ্ছন্দসই নহে যে, হউক অচেতন, তবু দিনরাত্রি ঘাড় উঁচু করিয়া চৌকিদারের মত দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর গ্রামের কে কি করিতেছে না করিতেছে দেখিবে।

বেশ বোঝা যাইতেছে, পাহাড়ের কোন ধরিবার ছুঁইবার মত দোষ নাই, অথচ সকলেই যারপর নাই খুসী হন, যদি একদিন সকাল বেলা উঠিয়া দেখেন যে কেহ তাকে রাতারাতি গুঁড়াইয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া গিয়াছে।

আজ কয়দিন হইতে নাকি ধরিবার ছুঁইবার মত দোষও পাওয়া গিয়াছে। বৃদ্ধেরা অনেক রাত্রে তামাক খাইতে উঠিয়া দেখিয়াছেন যে, পাহাড়ের মাথায় কি যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলে, আবার নিবিয়া যায়—কাণ পাতিয়া শুনিয়াছেন, কি যেন কাঁসর ঘণ্টার মতও বাজে। প্রথমটা সাহসী যুবার দল এ কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "এ আবার আপনাদের বাড়াবাড়ি।" কিন্তু শেষে তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ব্যাপারটা একটু ভাবিবারই মত। অতঃপর রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাঁহারা দস্তুরমত বৈঠক বসাইলেন—বৃদ্ধেরা যথেষ্ট নিষেধ করিলেন, শুনিলেন না। তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যদিও তাঁহারা প্রত্যেকেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন ব্যাপারটা কি, কারণ এক দৌড়ে যাওয়া এবং তড়বড় করিয়া লাফাইয়া ওঠা বিশেষ কিছু শক্ত নয়—তবু এক্ষেত্রে তাহার কোনই প্রয়োজন নাই—যেহেতু ঘরে বসিয়াই সব জলের মত বোঝা যাইতেছে। বোঝা যাইতেছে এ সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ রহিল না। তবে কি বোঝা যাইতেছে, সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু গরমিল থাকিয়া গেল—যথা, কেহ বলিলেন ওটা আগ্নেয় গিরির আগুন, কেহ বলিলেন ওটা দাবানল, কেহ বলিলেন ওটা আলেয়ার ন্যায় একটা ভৌতিক জ্যোতি। মোটের উপর বৃদ্ধেরা তাঁহাদের শক্তি ও সাহসের চেয়ে বুদ্ধি প্রাথর্য্যের অধিক প্রশংসা করিতে পারিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

গ্রামের মধ্যে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন একটী ছেলে সেই গ্রামে বড় হইয়া উঠিতেছিল, যাহাকে কেহ বড় একটা প্রীতির চক্ষে দেখিত না, যাহার দুর্দান্ত অসম-সাহসের জন্য সকলেই তাহাকে "ডাংপিটে" বলিয়া ডাকিত। পনেরো বৎসর বয়সে সে এমন সব কাজ করিয়া বসিত, যাহাতে গ্রামের প্রখ্যাত বীরেরাও পিছ্‌পা হইতেন। সে পঞ্চাশ হাত উঁচু তেঁতুল গাছের লিক্‌লিকে ডগায় উঠিয়া চিলের বাসা ভাঙ্গে, সব চেয়ে বড় পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়া কাঁদা তোলে।

ডাংপিটে একদিন তাহার বাপ্‌কে আসিয়া বলিল, "বাবা! পাহাড়ের উপরটায় খুব হাওয়া, না?"

বাপ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! ওখান-কার হাওয়া কি হাওয়া? ঝড়!"

"ঝড় তো আরও ভাল। ঝড়ের মুখে ছুটলে কেমন ফূর্ত্তি হয়। হুঁহু করে চুল ওড়ে।" বাপ রাগ করিয়া বলিলেন, "ফের ও কথা বল্‌বি ত মুখ ভেঙ্গে দোব।"

পরদিন সে তার মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! পাহাড়ের উপরটা বেশ ঠাণ্ডা, না?"

মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "চুপ্ চুপ্ ও কথা বল্‌তে নেই, ওখানে কি ঠাণ্ডা, একেবারে শিলপ"

"শিল ত আমি কড়মড় করে খেতে পারি। তুই বলিস ত এখুনি গিয়ে এক চাঙড়া নিয়ে আসি।"

"ষাট, ষাট, বালাই। আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ ওদিকে যাবিনি?" ছেলে হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল।

তার পরদিন দ্বিপ্রহরে সে আর পড়িতে যায় নাই, চুপটী করিয়া ঘরে বসিয়া আছে, আর জানলাটি খুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে পাহাড়ের দিকে; তাহার চোখে পলক নাই, মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে। তাহার ঠাকুরমা কখন্ তার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তা সে জানেও না। সে নিজের মনে বলিয়া উঠিল, "ওখান থেকে সব কেমন ছোট ছোট দেখায়!"

ঠাকুরমা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কিরে ডেঙ্গো, কি ভাবচিস্? কি ছোট ছোট দেখায়?"

ডাংপিটে চম্‌কিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখে ঠাকুরমা। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই গাছপালা, আর ঘর বাড়ী।"

"কোত্থেকে ছোট দেখায় রে?"

"কেন, ঐ পাহাড় থেকে।"

"এ্যাঁ, তুই কি পাহাড়ে উঠেছিলি নাকি?"

"না উঠিনি—একদিন উঠবো ভাবচি—তা তুই যেন কাউকে বলিস্‌নি।"

"না, বলবে না! তোর কি মাথা খারাপ হয়েচে নাকি? বলে তোর ঠাকুর্দা ছিল যেন অসুর, পাকি দশ সের চালের ভাত খেতো, সে পর্য্যন্ত যায় নি, আর তুই একরত্তি ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, তুই কি না যাবি ওখানে! ধন্যি কিন্তু তোর ভরসা! শুনে অবধি গা কাঁপচে।"

"তোরা মেয়েমানুষ, তোদের গা কিসে না কাঁপে?"

"বটে! তোর ভারি সাহস, না? শুনেছিস্ ও পাহাড়ে কি আছে?" এই বলিয়া আলো ও শব্দ হওয়া রূপ অলৌকিক ব্যাপারের যথোচিত বর্ণনা ও যথাতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিলেন।

ডাংপিটে কিন্তু ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি?"

ঠাকুমা তাঁর চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বলিলেন, "তবে কি আমি উপকথা বল্‌চি? ওকি যে সে পাহাড়? সাক্ষাৎ শনি! ওর ও পারে কি আর দেশ আছে না লোক আছে!"

ডাংপিটে এ কথায় কিছুমাত্র কান না দিয়া, ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন আলোটা জ্বলে ঠাকুমা?"

"কখন? এই ত আজ কদিন ধরে জ্বল্‌চে। তোরা কি জানবি, তোদের তখন এক ঘুম হয়ে যায়।"

সেইদিনই ডেঙ্গোর গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে তাহার অদ্ভুত সাহসের কথা ঠাকুরমা কর্তৃক গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং যথাসময়ে ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিয়া আসিয়া ডেঙ্গোর বাপ মায়ের কানেও উঠিল। বাপ বলিলেন, "ছেলেটাকে ভূতেই পেয়েছে—রোজা ডাকাতে হচ্চে।"

মা বলিলেন, "ভূত না আরো কিছু! বাছার আমার কোন দোষ নেই—ও কি নোংরা থাকে, না যা তা খায়? ওই সর্ব্বনেশে পাহাড়ই ত—ওই যে কি আছে না, যা লোহাকে টানে? তেমনি করে ওকে—"

বাপ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহাহা! তাইত—কিছু বোঝনা অথচ কথা কও—ওই জন্যেই ত তোমাদের দশ হাত—পাহাড় কি আর অমনি অমনি টানে? পাহাড়ে ভূত আছে, ছেলেটার উপর 'উপর-নজর' হয়েচে।"

"এ্যাঁ—তাহলে কি হবে? হ্যাঁ গা এর কি কোন উপায় নেই?" ভাল করিয়া কাঁদিবার জোগাড় হইতেছে বুঝিয়াই বাপ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "থাক্ ভয় নেই—যখন টের পাওয়া গেছে তখন উপায়ও হবে—আমি আজই বিষ্টু জোলার তাগা, নদে তাঁতির তাবিজ, আর গজানন তলার মাদুলী আনাচ্ছি।"

মা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "আর আমিও ও-পাড়ার বোষ্টম দিদিকে দিয়ে মেরফান ফকিরের ধুক্‌ধুকি আনাই।"

ফলে পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ডাংপিটের আষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে এত রক্ষাকবচ বাঁধা হইল যে আর কেহ হইলে সেই ভারেই নুইয়া পড়িত—সুতরাং রক্ষাও পাইয়া যাইত।

দুই সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। ডাংপিটেকে সকলে চোখে চোখে রাখা একটু কমাইয়া দিয়াছে। তাহার মা আর রাত্রিকালে তাহার কাছার সঙ্গে নিজের আঁচলের মুড়ায় গেরো বাঁধিয়া শোন্ না। এমন সময় একদিন গ্রামের মধ্যে হৈচৈ পড়িয়া গেল। তখন রাত অর্দ্ধেকেরও বেশী, জ্যোৎস্না ফুটফুট করিতেছে। কে একটা ছেলে পাহাড় বাহিয়া উঠিতেছে! এত দূর হইতে চেনা যায় না, কিন্তু ছেলেটার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পাতলা চেহারা, আর লম্বা লুম্বা ছেয়ালো গড়ন দেখিয়া সবারই মনে হইল এ ডাংপিটে ছাড়া আর কেহই নয়! সকলে যে যার ঘরে নিজেদের ছেলেদের দেখিয়া লইয়া, ডাংপিটের মা বাপকে খবর দিল। তাঁহারা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বিছানা হাতড়াইয়া দেখিলেন, ডাংপিটে নাই। তখন তাঁহারা বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সত্যই একটা ছেলে পাহাড় বাহিয়া উঠিতেছে—প্রায় বারো আনা আন্দাজ উঠিয়াছে, আর পাহাড়ের মাথায় সেই আলো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। হায় হায়, এ ত আর কেহই নয়, এ যে তাঁহাদের ডেঙ্গো। তাঁহারা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে নাব নাব, নেবে আয়।" সে চীৎকার নিস্তব্ধ রাতেও মাঠে মারা গেল।

ডেঙ্গোর মা মরিয়া হইয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিলেন, কিন্তু পাঁচজনে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "যাও কোথায়? এখন কি আর যাবার সময় আছে? শেষে নিজের প্রাণটাও খোয়াবে?" ডেঙ্গোর বাপ ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "নাঃ, গিয়ে আর কোন লাভ নেই—বরং এইখান থেকেই সকলে মিলে চেঁচানো যাক্।" তখন সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল —"ফিরে আয় ডেঙ্গো, ফিরে আয়।" সে শব্দ শুনিয়া মনে হইল যেন সমস্ত গ্রামটা একটা বিকট চীৎকার করিয়া ফাটিয়া গেল। এ শব্দ ডেঙ্গোর কানে গিয়া পৌঁছিল। সে ফিরিয়া চাহিল; সকলে এক সঙ্গে হাতছানি দিয়া ডাকিতে লাগিল, ডেঙ্গোর হাত ফস্কাইয়া গেল—সে গড়াইতে গড়াইতে নীচে কোথায় গিয়া পড়িল তা রাত্রে আর ভাল করিয়া দেখা গেল না।

সকলে "গেল গেল" এবং তার পর "হায় হায়" শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল। সে রাত্রে গ্রামের মধ্যে কেবল কান্না, দুঃখ প্রকাশ, শাসন ও সান্ত্বনার ঝড় বহিতে লাগিল; কিন্তু ডেঙ্গোর উদ্দেশে কেহই গেল না।

পর দিন প্রভাত হইতেই সকলে দেখিতে পাইল, একটা মাংসপিণ্ডের মত কি যেন পাহাড়ের তলায় পড়িয়া আছে, তার উপর দিকটা লাল। মা ভাঙ্গা গলায় কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো আমি যাই, নিয়ে আসি আমার বাছাকে।"

বাপ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আর নিয়ে এসেই বা কি হবে, ফিরোতে ত পারবে না।"—দু' একজন প্রতিবেশী মুরুব্বি এ কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তা ত বটেই; আর যাওয়াও ঠিক নয়—যে ফেলে দিয়েচে সে কি এখনি ওর সঙ্গ ছেড়েচে? ওকে আগ্‌লে নিয়ে বসে আছে।" সকলের গায়ের ভিতর দিয়া একটা বৈদ্যুতিক ঝাঁকি চলিয়া গেল। ডেঙ্গোর মা আবার কাঁদিয়া বলিলেন, "তবে কি বাছার আমার গতিও হবে না? আহা! পড়বার সময় বাছার আমার কতই না লেগেছিল রে।"

প্রথম বাক্যেরই উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া একজন প্রবীণ গ্রামবাসী বলিলেন, "এ যে অপঘাত মা, এর গতি করলেও হয়, না করলেও হয়—কেননা যে গতি ওর হয়েচে তা শাস্ত্রমতে চূড়ান্ত, অধোগতির পরেই একেবারে উর্দ্ধগতি।"

আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইল না। ডেঙ্গোর বাবাই তাঁহার স্ত্রীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "যখন ভৌতিক মৃত্যুই হয়েচে তখন ওকে আর টেনে আনা ঠিক নয়—ও হয়ত ভালই আছে; যদি পোড়াতে হয় ত ব্যবস্থা নিয়ে একটা খড়ের মূর্ত্তি পোড়ালেই

হবে।" ইহার পর ডেঙ্গোর মা আর বেশী কিছু বলিলেন না—কেবল নাকি সুরে গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"বাছাকে একবার শেষ দেখাও দেখ্তে পেলাম না রে।"

তখন শোকের বেগ একটু কমিয়া আসিয়াছে বুঝিয়া পাড়ার দুই একজন বৃদ্ধা তাঁহাকে এইরূপ ভাবে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, যথা—"কেঁদে আর কি হবে? ও ত তুমি জানতেই মা, আমরাও জানতাম যে ওর ওই রকমই একটা হবে—আহা! গোঁয়ারতুঁমি করেই মলো! তা যাক্, তোমার ত আরো দুটি আছে—তারা বেঁচে থাক্—তুমি বেঁচে থাক—আর বয়সই বা কি, আরো কত হবে—নাও ওঠ, একটু মুখে চোখে জল দাও।"

ডেঙ্গোর মা হিতৈষিণীদের সান্ত্বনা শুনিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিতেই তাঁহারা সান্ত্বনার আরও উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ করিলেন যথা—"তা তুমি কাঁদচই বা কেন? মনে কর না, ও হয় নি। ও কি তোমার ছেলে? ও একটা মানুষই নয়—ও কি রকম একটা হাওয়া তোমার পেটে ঢুকেছিল—নৈলে আরো ত ছেলে দেখছ—কৈ কার অমন অসম সাহস? বলে 'পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে'—ও মরবে বলেই ওর অমন মতিগতি হয়েছিল। ছেলেবেলাতেই দেখতাম ওকে দাওয়ায় শুইয়ে রেখেছ, আর ওদিকে আকাশে যেমন মেঘ তেমনি চিক্কুর, ও কোথায় কাঁদবে, তা না হাতে তালি দিয়ে হাসচে! ও কি একটা ছেলে!"

তিন দিন চলিয়া গিয়াছে—ডেঙ্গোর কথা লোকের মুখ হইতে প্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। যদি বা দৈবাৎ কেহ ডেঙ্গোর কথা তোলেন, তাহা হইলে সেটা দুঃখ প্রকাশের জন্য নয়, নিজের ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য। হয়ত গালাগালি দিয়া বলেন, "হতভাগা ছেলের এক জেদই ছিল আলাদা। যা কেউ করে না তাই করবে—আর বাপ মায়েরও দোষ ছিল—তেমন শাসন করতো না, নৈলে ছেলে কখনো বেগড়ায়? পিঠের চামড়া আলাদা করে রাখলে না কেন? বলে "মায়ের নাম লক্ষ্মীকান্ত ভূত পলায় যার ডরে" তা হোক্ না কেন পাহাড়ে ভূত!

এদিকে ডেঙ্গোর শরীর পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রাম হইতেই দেখা যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন পাহাড়ের উপর উড়িতেছে, সবারই চোখ নীচের দিকে—সবাই ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে নামিতেছে। তার পর আরও দুই একদিন গেল, শকুনের দল আর ওড়ে না—ডেঙ্গোর হাড় ক'খানা রৌদ্রে শুকাইয়া সাদা হইতেছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা সবাই দেখিতে পাইল, পাহাড়ের গা বাহিয়া কে একটা লোক নামিতেছে, তার এক হাতে একটা চিমটা, আর এক হাতে একটা ঘণ্টা। সে পাহাড় হইতে নামিয়া যখন গ্রামের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তার কাঁধের উপর একটা ভাঙ্গা-চোরা কঙ্কাল। সে আসিয়াই একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার হাড়? কে পাহাড় থেকে পড়ে গেছে?"

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে 'বাপ' বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। সন্ন্যাসী আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে? এর সৎকার হয়নি কেন?"

"পাহাড়ে ভূত! পাহাড়ে ভূত" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে গ্রামশুদ্ধ লোক জড় হইল। তখন সকলে বুঝিতে পারিল, এ লোকটা ভূত নয়, সন্ন্যাসীই বটে। এ-ই পাহাড়ের মাথায় ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া থাকিত—এ-ই ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা করিত। তখন তাহারা সন্ন্যাসীকে বলিল, "ও যে ছেলের হাড়, তাকে ভূতে পেয়েছিল, ভূতেই তাকে পাহাড়ে টেনে তোলে, ভূতেই তাকে আছড়ে ফেলে দেয়; ওর কি কোন সৎকার করতে আছে?"

সন্ন্যাসী আর কোন কথা না বলিয়া, গ্রাম হইতে খানকয়েক কাঠ জোগাড় করিয়া সকলের সম্মুখেই হাড় ক'খানাকে চিতায় তুলিয়া দিলেন। তার পর যখন সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তখন সেই ছাই নিজের

গায়ে মাখিলেন, আর খানিকটা হাতে করিয়া গ্রামের লোকদের ডাকিয়া বলিলেন, "নাও, একটু একটু করে তুলে রাখো।"

"তুলে রাখবো? মড়া পোড়ানো ঠাণ্ডা ছাই?"

"হ্যাঁ, রাখবে; এতে করে তোমাদের মঙ্গল হবে। এ ছাই ঠাণ্ডা নয়,—এর মধ্যে আগুন গন্‌গন করচে—এই আগুনে যদি তোমাদের মধ্যেও আগুন জ্বলে ওঠে।"

সকলে বলিয়া উঠিল, "নাঃ, সন্ন্যাসী হলে কি হয়! পাগল, নৈলে ভূতে-পাওয়া ছেলেকে পোড়ায়—আর সেই ছাই মাখে?"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভূতে-পাওয়া ছেলে! ভূতে-পাওয়া! এ ভূত যদি তোমাদের ঘাড়ে চাপ্‌তো, তোমরা মানুষ হয়ে যেতে—আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই ভূত তোমাদের সব ছেলেপিলের ঘাড়ে চাপুক।"

রুষ্ট গ্রামবাসীর দল লাঠি ছুড়িয়া ঢিল মারিয়া সন্ন্যাসীকে গ্রামের বাহিরে তাড়াইয়া দিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পথের ইঙ্গিত

৬। বিবাহ।

সূতিকাগারে ব্রহ্মা যখন অদৃষ্টলিপি লিখিতে আসেন তখন কোন এক সন্তোজ রসিক-পুঙ্গব তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, অন্য শত দুঃখ তিনি সহ্য করিবেন, কিন্তু অরসিকে রসের নিবেদনরূপ মহা-দুঃখ যেন তাঁহার কপালে না লেখা হয়। আমার অদৃষ্টলিপি লিখিতে যখন সেই দেবতা আসিয়াছিলেন, তখন আমার পক্ষ হইতে তাঁহার কাছে রস-সার বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা করা হইয়াছিল কি না, তাহা আজিও জানিতে পারি নাই। কিন্তু এখনও সে রসে বঞ্চিত আছি। এসম্বন্ধে আমি আজিও কোন রসিক বা অরসিকের কাছে কোনও নিবেদন করি নাই, এবং দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত অনেক লোক থাকা সত্ত্বেও কাহারও নিকট হইতে আমি কোন আবেদন পাই নাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার বাল্যবন্ধু নারায়ণ বাবু একটি আবেদন বহন করিয়া আমার বনবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে প্রজাপতির দূত, আমার বন্ধুবেশে আসিয়াছেন, তাহা প্রথমে তিনিও প্রকাশ করেন নাই, আমিও বুঝিতে পারি নাই।

আমার এই বনবাসে বন্ধুবান্ধব বড় একটা কেহ আসেন না। নারায়ণ বাবুকে সেই জন্য অযাচিতভাবে পাইয়া খুব আহ্লাদ হইল। দেখাটা অনেক দিনের পর, সুতরাং কথাবার্তাও অনেক হইল। তাহার পর তাঁহাকে আমার ছোট বাড়ীটি, বাড়ীর সম্মুখের ছোট বাগানটি, তাহাতে দুইটা আম কাঁটালের গাছ, গোটা-কতক মল্লিকা, যুঁই, জবা, টগর, কামিনী, বকুল প্রভৃতি ফুলের গাছ, একটু শাকসব্জীর ক্ষেত, বাগানের পাশে ছোট পুকুরটি—তাহাতে গোটাকতক হাঁস সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে,—গোয়াল ঘরে দুইটি গাই, খানিক দূরে লাঙ্গলের গোরু চরিতেছে—এই সব দেখাইলাম। নদীর ধারে হাতে চালানো একটা জলতোলা কল আছে, সেটা দেখাইয়া, আমার ভাণ্ডার বাড়ীতে লইয়া গেলাম। সেখানে একটি ধানের গোলা আছে, তার পাশে একটি ঘরে আমি কৃষি-রসায়ন লইয়া একটু নাড়াচাড়া করি তার দুই চারিটা যন্ত্র, রাসায়নিক সার, মাটি ইত্যাদি

আছে। একটু গো-বৈদ্যগিরি করি, তারও দুই চারি শিশি ঔষধপত্র আছে। একটা আলমারীতে কতকগুলি বই আর তারই পাশে একখানা তক্তপোষের উপর খানকতক খবরের কাগজ ও মাসিকপত্র ছড়ান আছে,—সবই অ-যথাস্থান বিনিবেশিত হইয়া আছে। নারায়ণ বাবুকে এই সব দেখাইলাম। নারায়ণ বাবু দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। বলিলেন,"সবই বেশ দেখলাম, কিন্তু সবই যেন একটু শ্রীহীন শ্রীহীন বোধ হচ্চে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা না থাকলে ঘরে শ্রী আসে কোথা থেকে? গৃহলক্ষ্মীর হাত না পড়লে কোন জিনিষই সুন্দর হয় না। জান ত, 'গৃহ'কে গৃহ বলে না, 'গৃহিণী'কেই গৃহ বলে। সুতরাং তোমার এ ঘরই নয়, যতদিন না ঘরণী আসেন। এবার ভাই, বিবাহটা করে ফেল।"

আমি বলিলাম, "এই সৎ পরামর্শ দিতেই বুঝি আসা হয়েছে? তা' তোমার পরামর্শকে আদেশ বলেই মানবো এবং পালন করতে চেষ্টা করব, কিন্তু আমি মনে করি, আমি এখনও এ কাযের যোগ্য নই। আর—

নারায়ণ বাবু। 'আর' কি আগে তাই বল, তার পরে তোমার যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করা যাবে।

আমি। আর বিশেষ কিছু নয়, যা কিছু আছে ঐ যোগ্যতার ভিতরেই চলে' যাবে। আমার যোগ্যতা ত এখন তোমার বিচারাধীন, কাযেই সে বিষয়ে আর আমি এখন কোন মতামত প্রকাশ করব না। কিন্তু কোন প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি যদি বিবাহ করতে চান, তা হলে একটি যোগ্য পাত্রী পাওয়াও নিতান্ত সহজ নয়। "যোগ্য" কথাটা অবশ্য আপেক্ষিক। পাত্রীটি পাত্রের যোগ্য কি না এও যেমন দেখা দরকার, পাত্রটি পাত্রীর যোগ্য কি না, তা'ও তেমনি দেখা দরকার। পাত্রের যোগ্যতা বলতে আমরা বুঝি, পাত্রের বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা; আর পাত্রীর যোগ্যতা বলতে বুঝি, পাত্রীর বয়স, পাত্রীর রূপ, আর পাত্রীর পিতার পদমর্য্যাদা। আমি মোটামুটির কথা বলছি, অবশ্য আরও অনেক কথা আছে। স্বাস্থ্য, রুচি, প্রবৃত্তি, কায করবার শক্তি ও ইচ্ছা, বুদ্ধি, বিবেচনা, সমবেদনা—এ সকল বিষয়েও পাত্র পাত্রীর মধ্যে সমতা থাকা আবশ্যক। বাস্তবিক আছে কি না, তা' জানবার চেষ্টাও নেই, উপায়ও নেই।

নারায়ণ বাবু। দেখ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ—স্ত্রীই বল আর পুরুষই বল—পৃথিবীতে দুর্লভ। আর যদি থাকে, ত তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়া আরও সুদুর্লভ। আদর্শ বিবাহ সেই জন্যে প্রায় অসম্ভব। ব্রহ্মচর্য্যের মূলও বোধ হয় এই রকম একটা কিছু হবে। কিন্তু বল দেখি, ভালবাসা বলে' একটা জিনিষ আছে কি না? পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে ভালবাসার যে এত মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কি সত্য নেই? একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করেনা যে, মানুষ যদি তার সুখ-দুঃখের ভাগ অন্যকে না দিতে পারে, তা হলে সে নিজের সুখ-দুঃখের চাপে অবসন্ন হয়ে পড়ে। মনটা তার যেন দুর্ব্বহ ভারে পীড়িত হয়ে পড়ে। সেই ভারটা নামিয়ে দিয়ে মনটাকে একটু হাল্কা করতে পারলে, মন যেন একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। মনের এই ভার নামিয়ে নেবার একজন লোকের অত্যন্ত অভাব সময়ে সময়ে সকলেই বোধ করে। এই লোক অবশ্য যে-সে হলে হয় না। সকলেই প্রায় নিজের নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে এত বিব্রত থাকে যে অন্যের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে বড় ইচ্ছাও করে না, অবসরও পায় না। কাযেই একটি লোককে আপনার করে' নিতে হয়। এই স্ত্রী সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হওয়া ছাড়া, আমাদের কর্ম্মে প্রেরণা দেন, উৎসাহ দেন এবং সাহায্য করেন। সংসারে অনেক কাম্য বস্তু আছে, তার মধ্যে বোধ হয় স্ত্রীই প্রধান। সেই জন্যে সে কালের লোকে দেবতার কাছে যেমন আয়ু দাও, ধন দাও, যশ দাও বলে' প্রার্থনা করতেন, তেমনি প্রার্থনা করতেন—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।" এই মনোরমা, মনোবৃত্তির অনুসারিণী স্ত্রী ব্যতিরেকে সংসার সরস হয় না, মানুষকে মানুষ প্রেমের চক্ষে

দেখতে পারে না, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারে না।

আমি। তোমার বর্ণনা শুনে আমারও "মনোবৃত্তানুসারিণী ভার্য্যা"র প্রতি লোভ হচ্ছে। কিন্তু কবিদের বর্ণনাটা কল্পনার রাজ্যে যতটা খাটে, কর্কশ কঠিন বাস্তব ঘটনার সংসারে ততটা খাটে না। তোমার কল্পনার তুলিতে আঁকা কোমল রমণীর সুখগুলির পরিবর্ত্তে যা অতি সত্যভাবে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, তা তো হচ্ছে—অল্প আয়, ততোধিক ব্যয়, ব্যর্থ আশা, ভগ্ন স্বাস্থ্য, চাকরীর লাঞ্ছনা, রুগ্না স্ত্রী, পাঁচটি ছেলে এবং কিছু ঋণ। বড় মানুষদের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু আমাদের শ্রেণীর লোকের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। স্বাস্থ্যটা বজায় রাখবার মত একটা বাড়ীতে বাস করিতে পারিনে। ছেলেমেয়েদের মনের মত শিক্ষা দিতে পারিনে, রোগে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারিনে, গৃহিণীকে সংসারের অবিরাম পরিশ্রম থেকে একটু বিশ্রাম দিতে পারিনে। দুঃখক্লেশের তাপে রস শুকিয়ে যায়, আনন্দ আসে কোথা থেকে? মনোরমা মনোবৃত্তানুসারিণী ভার্য্যার সঙ্গে প্রেমালাপের সময় কৈ? ভাগ দেবার মত সুখের ত অত্যন্ত অভাব, দুঃখের ভাগও দেওয়ার চেয়ে নিতে হয় অনেক বেশী। স্বাস্থ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে ছেলেমেয়েগুলি যা তয়ের হয়ে ওঠে, তাতে সংসারের ভার বৃদ্ধিই হয়। আর যে সকল বাড়ীতে আমরা সচরাচর বাস করে' থাকি, ভার্য্যা মনোরমা হলেও, সেই ছোট আলো-হাওয়া-বিহীন, স্বাস্থ্যের বিঘ্নজনক, আবর্জ্জনা রাশি পূর্ণ বাড়ী মোটেই মনোরম নয়। আর আমরা দিনের শেষে কর্ম্মক্লান্ত দেহ-মনে বাড়ী এসে—

"ক্ষুধা ক্ষয় পরিশ্রমে
নিদ্রা যাই সেই ধাম।"

কিন্তু স্বপ্নে চণ্ডীর দর্শন না পেয়ে, কর্ম্মস্থানের অবাঞ্ছনীয় মূর্ত্তি সকল দেখি।

নারায়ণ বাবু। সংসার-চিত্রের এটাও যে একটা দিক তা অস্বীকার করতে পারা যায় না। কিন্তু এই দিকটা দেখেই কি সকলে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে?

আমি। বৈরাগ্য অবলম্বন করবে কি না, করা উচিত কি না, তার ব্যবস্থা দেবার ভার বা অধিকার আমার নেই। কিন্তু বৈরাগীর দলের চেয়ে অনুরাগীর দল যে এ বিষয়ে কিছু কম অনিষ্ট করছেন, তা বলে' ত বোধ হয় না। আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগবাদী নই। যাঁরা ওর ভোগে বিঘ্ন পেয়ে নিরাশ হয়েছেন, তাঁরাই অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করে যোগী হতে চান। তাঁদের সংসারে ত কামনা পূর্ণ হয়ই নি, যোগেও সিদ্ধিলাভ হয় না। তাঁরা যে বৈরাগ্যের প্রচার করেন, আমি তার উপাসক নই। কিন্তু বৈরাগ্যের কথা থাক্—অনুরাগের কথাটাই ভাল করে' দেখা যাক্। বিবাহটা আমাদের দেশ একটা সংস্কার—এবং প্রধান সংস্কার। আমরা শাস্ত্রের অন্য আদেশ মানি না, এ আদেশটি বেশ মানি—নতশিরে মানি। অনুরাগটা পাত্র পাত্রীর পরস্পরের প্রতি নয়, বিবাহ-সংস্কারটার প্রতি। এ বিষয়ে আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই ভূতগ্রস্ত। আমরা শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা করিনে, পরিণাম দেখিনে, কিন্তু বিবাহটি করি। তার পর বিবাহের "বহন" কার্য্যটি যখন ঘাড়ে পড়ে, তখন বেদনা অনুভব করি, ভ্রমটা বুঝতে আরম্ভ করি। শিক্ষায় মন যেটুকু উঁচু হয়, এই ভারে তা আবার নীচু হয়ে যায়। ছোট কাযের প্রতি বিতৃষ্ণার স্থানে প্রবল তৃষ্ণা জন্মায়। কায মানে, আমাদের কাছে, চাকরী। যোগ্যতার পরীক্ষা উঠে গিয়েছে। এখন বড় লোকের ছেলে না হলে বড় চাকরী হয় না। কাযেই ছোট চাকরী করতে রাজী হই, কিন্তু আমরা রাজী হলেও, যিনি চাকরী দেবেন তিনি রাজী হন না। এই চাকরী যোগাড় করতে শরীরের এবং মনের শক্তির যে অপচয় হয়, তার আর পূরণ হয় না। চাকরী যদি হয়, তা বজায় রাখতে আবার বাকী শক্তিটার সমস্ত প্রয়োগ করতে হয়। এমন শক্তি আর থাকে না, যা দিয়ে একটা কোন ভাল কায করতে পারি। মনের সদ্বৃত্তিগুলি অনুশীলনের অভাবে নির্জ্জীব হয়ে যায়—আমরা সকল বিষয়ে ছোট হয়ে যাই। আরও দুঃখের বিষয়

এই যে, আমরা যে ছোট হয়ে যাচ্ছি, তা আমরা বুঝিতেও পারি না। তাই আমাদের যুবকদের দ্বারা কোন মহৎ কায হবার আশা পর্য্যন্ত চলে' যাচ্ছে,—আর এর মূল হচ্ছে বিবাহ। আবার এর ফল যখন ষষ্ঠীর কৃপারূপে আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হয়, অনুরাগ তখন বিরাগে পরিণত হয়। বংশবৃদ্ধির অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি হয় না। খাদ্য দ্রব্যাদির পরিমাণের সঙ্গে খাদক সংখ্যার সমতা থাকে না। তখন প্রকৃতি, শিশুর যকৃৎরূপে, বালকের ম্যালেরিয়া রূপে, যুবক যুবতীর যক্ষ্মারূপে যমের দূত পাঠিয়ে, অতিরিক্তগুলিকে লোকান্তরিত করে দিয়ে, আবার খাদ্য-খাদকের সমতা স্থাপন করে দেন। শিশুমৃত্যুর হার কমাবার জন্তে নাকি সভা হয়েছে, সভ্যেরা এর কারণ অনুসন্ধান করে' উপায় নির্দ্ধারণ করে' দেবেন। কারণটা প্রায় সকলেই জানে, আর আর উপায়টা হচ্ছে শিশু-মৃত্যু-হারিণী সভা নয়, বিবাহ-নিবারিণী সভা। বিবাহটা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, এখন কিছু দিন মুলতুবী রাখলে ভাল হয়—অন্ততঃ অসমর্থদের বিবাহটা। কেউ কেউ বলেন, লোক-সংখ্যা এত বাড়েনি যে তার জন্তেই সকল বিষয়ে এত কষ্ট হয়েছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই এর একমাত্র কারণ না হতে পারে, কিন্তু এটা একটা প্রধান কারণ। দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সম্বন্ধ অর্থশাস্ত্রের একটা বড় সমস্যা। ছোট করে' দেখলে, সন্তান বৃদ্ধি যে পারিবারিক দারিদ্র্যের হেতু সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। দারিদ্র্য মানে যে কেবল অন্ন বস্ত্রের কষ্ট তা নয়, পারিবারিক আরও অনেক অসুখ অশান্তি দারিদ্র্যেরই নামান্তর। জীবন-যাত্রার আদর্শ এতে ছোট হয়ে যায়। এই জীবন-যাত্রার আদর্শ যে দেশে যত বড়, যে দেশ সেই পরিমাণে সভ্য। যে দেশের সাধারণ লোক অতিদরিদ্র নয়, জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় যে দেশে সহজ, যে দেশে সকলেরই জন্তে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা আছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য আছে, সকলেই ইচ্ছা করলে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে এবং পূরণ করতে পারে, সেই দেশকেই সভ্য দেশ বলে। আমেরিকা ও ইউরোপ এই হিসাবেই সভ্য। এই সকল দেশের উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তানের সংখ্যা একটি, দুটি বা তিনটির অধিক প্রায় নেই। ফরাসীরা পৃথিবীর সভ্যতম জাতিদের অন্যতর। তাদের মধ্যে ২০ বৎসরের বেশী বয়সের লোকের হাজার-করা ৬০৯ জন মাত্র বিবাহিত। বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে হাজার করা ২০০ লোক নিঃসন্তান, ৬৪০ জনের একটি বা ৬'টি মাত্র সন্তান। এরা ইচ্ছা করেই সন্তান সংখ্যা বাড়তে দেয় না। তাদের ইচ্ছা, যে দু'একটি সন্তান তাদের হয়, তাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করে দেয়। সন্তানের সংখ্যা বেশী হলে তা হতে পারে না। মঃ লাগেনো ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে বিজ্ঞানসভায় এই বিবরণী পাঠ করেন। (১) মঃ পি, লেরয় বোলো বলেন, সংখ্যা হ্রাসের এ কারণ ঠিকই, কিন্তু আরও কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কমে' যাওয়া, আর একটি হচ্ছে সুখ দুঃখ অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই হবে এই সংস্কারের পরিবর্ত্তন। (২) আমরা কিন্তু এই সংস্কারটিকেই প্রধান

(১) Statement by M. Lageneau at a meeting of the Academic des Science, July 1890.

(২) It (low birth-rate) appears to be particularly associated with democratic aspirations and still more with a lessening of religious belief on the part of the people and a modification of the old ideas of resignation and submission to their lot. * * * * Thus what it has been agreed to call civilization, which is really the development of material ease, of education, of equality and of aspirations to rise and to succeed in life, has undoubtedly conduced to a diminution of the birth-rate.

—The Influence of Civilization upon the Movement of the Population by P. Leroy-Beaulieu. (Translation from the Economiste Francaise, 20th and 27th Sep. 1890, published in the Journal of the Royal Statistical Society of London, June 1891.)

ল করে, জীবনযাত্রা আরম্ভ করি ও শেষ করি।

দুর্ভিক্ষে, ম্যালেরিয়ায়, কলেরায়, ইন্‌ফ্লুএঞ্জায় এত রাশি রাশি লোক মরে যাচ্ছে, আর আমরা বেশ বসে বসে দেখচি কোন কথাটি কই না।

সন্তান সংখ্যা অধিক হলে পারিবারিক সুখশান্তির অনেক যে ব্যাঘাত ঘটে তা আর বুঝিয়ে দেওয়া অনাবশ্যক। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে তার একটা কারণ এই যে, আমরা যে রকম বাড়ীতে সহরে বাস করি, তা এত ছোট যে তাতে ছেলেদের জন্যে একটা খেলা করার ঘর নেই, উঠানেরও পরিসর এত অল্প যে তাতেও স্থান নেই। হয় শোবার ঘরে, না হয় বৈঠকখানায় (যদি থাকে), সে কাযটা তাদের করতে হয়। সেই রকম, যদি কারো ব্যারাম হয়, বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যারাম, তা হলে তার বিশ্রামের জন্যে বা সংক্রমণ নিবারণের জন্যে একটা স্বতন্ত্র ঘর দিতে পারিনে। বাড়ীর ভিতরে বা বাইরে একটা স্থান বা গাছপালা নেই যে সেখানে বসে তাহা মুক্ত আলো-বাতাসে পড়াশুনো বা খেলা করে। ভোর বেলা উঠে সেই ঘরের কোণে পড়া, আবার সন্ধ্যা বেলায়ও সেই ঘরের কোণে পড়া। আর বলা বাহুল্য যে সেই বাড়ীগুলি ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি বা পড়াশুনোর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষজ্ঞ স্থপতির দ্বারা তয়ের করান হয় নি। তা ছাড়া, ছেলেদের জীবনী-শক্তির অস্তিত্ব ও প্রসারের জন্যে একটু উৎপাত' উপদ্রবও করতে দিতে হয়। কবির নায়ক নায়িকাদের এ সব ঝঞ্ঝাট নাই—তাঁরা সকলেই পুরুরবা উর্ব্বশীর মত গন্ধমাদনের অনবচ্ছিন্ন নীরব শান্তিতে প্রেমালাপে সুখের দিনগুলি অবাধে কাটিয়ে দেন। সেখানে কেবল ফুলের গন্ধের উন্মাদনা, মলয় সমীরণ আর জ্যোৎস্না আছে এবং এই সকলের উপভোগের কোন বিঘ্ন নেই। আর আমাদের অবস্থা ত আগেই বলেছি।

নারায়ণ বাবু। সমস্যাটা যে ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠলো।' তুমি বলচো বৈরাগ্য অবলম্বন করাও উচিত নয়, আবার বিবাহ করে' সংসার করাও উচিত নয়। এ সমস্যার তবে সমাধানটা কি?

আমি। সমস্যাটা নতুনও নয়, হঠাৎও উপস্থিত হয় নি। সকল দেশেই যেমন যেমন লোক সংখ্যা বাড়চে, আর দারিদ্র্যকে লোকের মধ্যে থেকে দূর করে' দেবার চেষ্টা হচ্চে, সমস্যাটাও তেমনি তেমনি গুরুতর হয়ে উঠচে। আমাদের দেশেও বহুপূর্ব্বকালে যখন অনেক অনাবাদী জমি ছিল, লোক সংখ্যা খুব কম ছিল, তখন ব্যবস্থা ছিল, বিবাহ কর আর বংশবৃদ্ধি কর। বিবাহের পরে দম্পতী সন্তান প্রজননের কোন সুযোগই যেন ত্যাগ না করে,—করলে বাছুর মারার পাপে বিদ্ধ হবে। (৩) পণ্ডিতেরা বল্লেন, "প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।" এর উপর বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং অবাধে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। তার পর লোক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে যখন দারিদ্র্যের আবির্ভাব হতে লাগল, অর্থশাস্ত্রবিৎ কৌটিল্য বল্লেন, "বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য।" কিন্তু তখন অর্থশাস্ত্রের চেয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবল ছিল, কাযেই আমরা অর্থশাস্ত্রের কথা না শুনে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অনুসারে বংশ বিস্তার করছি। ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এ সমস্যা লোকের মনকে খুব আন্দোলিত করছে। সেখানেও ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা "বেঁচে থাক এবং বংশবৃদ্ধি কর।" আর অর্থশাস্ত্রবিদেরা সাবধান করে' দিচ্চেন, বংশবৃদ্ধিতে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি না হয়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি হবে। এক দিকে জীবধর্ম্ম মানুষকে বিবাহ করতে প্রেরণা দিচ্চে, উন্মত্ত করচে, আর এক দিকে দারিদ্র্যের কঠোর নির্দ্দয় শাসন তাকে বিবাহের সুখ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করচে, আর সে শাসন না মেনে যারা বিবাহ করচে, তাদের সন্তান বৃদ্ধি হতে দিচ্চে না। ম্যালথস এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করে' পরামর্শ দিয়েছেন যে, শেষ বয়সে বিবাহ করা উচিত,—তা হলে প্রজননের

(৩) ঋতুস্নাতাং তু যো ভার্য্যাং
স্বস্থঃ সন্ নোপগচ্ছতি।
বালগোঘ্নাপরাধেন বিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
মনু।

সময় কমে যাবে; সন্তানের সংখ্যাও কম হবে,—অথচ বিবাহিত জীবনের সুখও উপভোগ করা হবে। কিন্তু তিনি ভুল করলেন এই যে, যে বয়সে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা সব চেয়ে প্রবল, সেই বয়সেই তিনি বিবাহ করতে নিষেধ করলেন। তাঁর পরামর্শ বিফল হয়ে গেল। অবিবাহিতদের সন্তান হতে লাগল; সে এক বিপদ হল। সন্তানদের পিতা পিতৃত্ব অস্বীকার করতে লাগলেন, মাতারা অসহায় হয়ে নিরুপায় হয়ে, সন্তান ত্যাগ করতে লাগলেন। মানব-হিতৈষী লোকেরা পরিত্যক্ত সন্তানদের জন্যে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু এ রকম প্রতীকার ত যথেষ্ট হতে পারে না। চিন্তাশীল সমাজহিতৈষীরা আবার চিন্তা করতে লাগলেন। আমেরিকার ডাক্তার নোলটন (Knowlton) শরীরতত্ত্ববিদ্যা আলোচনা করে বল্লেন, গর্ভাধান নিবারণ করা যেতে পারে। তিনি ব্যবস্থা করলেন, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই এমন শিক্ষা দেওয়া হোক, যে সকলেই যেন আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করতে সমর্থ হয়। পুরুষেরা ত নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করেই, স্ত্রীরাও আবশ্যক হলে পারবে। তা হলে জীবিকার জন্যে আর স্ত্রীকে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করতে হবে না। এই রকম শিক্ষিত লোকেরা—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই—প্রথম যৌবনে বিবাহ করবে, কিন্তু সন্তান প্রজনন বিষয়ে খুব সংযত হবে। অবস্থা বিবেচনা করে' যাতে একটিও সন্তান না হয়, অথবা অবস্থা অনুসারে একটি কি দুটি মাত্র হয় তার উপায় করবে। শুচিবায়ুগ্রস্তেরা বলেন, উপায়টা স্বভাবানুযায়ী নয়। কিন্তু স্বভাবানুযায়ী না হলেই যে দোষের হবে এমন কোন কথা নেই। আমাদের সমস্ত জীবনটাই ত স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; আমাদের আহার পরিচ্ছদ বাসস্থান, কোনটাই ত স্বভাবানুযায়ী নয়। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধই ত জীবন। এই যুদ্ধ না থাকলে প্রাকৃতিকই হোক আর সামাজিকই হোক, কোন রকম অভিব্যক্তিই হত'না। ডাক্তার নোলটন যখন এই তত্ত্ব তাঁহার Fruits of Philosophy বলে' একখানি বইতে প্রচার করলেন, তখন ইংলণ্ডে এ তত্ত্বের প্রচার হয়নি। শ্রীমতী আনি বেশান্ত এবং চার্লস ব্রাডল এই বই তাঁদের 'স্বাধীন-চিন্তা সমিতি' (Free Thinking Society) থেকে প্রকাশ করলেন। ইংলণ্ডের সমাজ তখনও এসব বিষয়ে বড় অগ্রসর হয় নি। ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা বইখানিকে অশ্লীল বলে মনে করলেন। শ্রীমতী আনি বেশান্ত ও চার্লস ব্রাডল'র নামে অশ্লীল বই প্রকাশ করার জন্যে মোকদ্দমা হল। কিন্তু মোকদ্দমায় তাঁরাই জিতলেন, প্রতিপন্ন হল বইখানি বৈজ্ঞানিক, অশ্লীল নয়। তার পর এরকম অনেক বই বেরিয়েছে এবং অনেক দেশের অনেক লোক সন্তান বৃদ্ধি নিবারণের জন্যে এই সকল উপায় অবলম্বন করেচেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেকে করচেন। ফ্রান্সের কথা আগেই বলেছি। ইংলণ্ডেও এখন খুব প্রচলন। জোসেফ ম্যাক্‌কেব তাঁহার নতুন প্রকাশিত "কপটতার অত্যাচার" (Tyranny of Shams) নামক পুস্তকে বলেন যে, সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মধ্যে, এমন কি ধর্ম্মযাজকদের মধ্যেও অধিকাংশ লোকেই এখন সন্তান বৃদ্ধি নিবারণের জন্যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন, অথচ আমরা কল্পনা করি যে এটা একটা নিন্দার্হ আচরণ। (৪)

নারায়ণ বাবু। তুমিও এখন এই তত্ত্ব প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছ না কি?

আমি। এই "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"র দেশে এই তত্ত্বের প্রচার! সর্ব্বনাশ আর কি! কিন্তু আমার মনে হয়, এর বহুল প্রচার হলে আমাদের দেশের যুবকেরা খুব উপকৃত হয়, দেশেরও মঙ্গল হয়।

নারায়ণ বাবু। কিন্তু দেশের লোকের মন এখনও এত উদার হয় নি যে এ বিষয়ের ধারণা করতে পারে, এ মত গ্রহণ করতে পারে।

---

(৪) The majority of educated people of all classes, even many of the clergy now practise artificial limitation of the family, yet we proceed on the fiction that this is a disreputable practice.

—Tyranny of Shams, by Joseph Mc. Cabe.

আমি। তখন কবির সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয় "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা।" অনেক লোক আছেন, অনেক জন্মাবেন, যাঁরা এ মত গ্রহণ করচেন বা করবেন এবং এর অনেক উন্নতি সাধন করবেন। সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের (Eugenics) কথা শুনেছ ত? তাও এদেশে আসবে এবং চলবে। জ্ঞানের আলো আসা কি কেউ বন্ধ করতে পারে?

নারায়ণ বাবু ও আমি এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর, স্নানাদি সমাপন করিয়া আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে বসিয়া নারায়ণ বাবু বলিলেন, "দেখ, আহারের ব্যাপারটার জন্তে একটি অন্নপূর্ণা-রূপিণী গৃহিণীর নিতান্তই আবশ্যক। পাকের কার্য্য আমাদের মত গরীব গৃহস্থের পক্ষে, গৃহিণীর দ্বারা যেমন সুসম্পন্ন হয়, পাচকের দ্বারা তেমন আশা করা যায় না। আর, সহাস্যমুখে সুচারু হস্তে যদি তাঁরা পরিবেষণ করেন ত ক্ষুধারও যেমন উদ্রেক হয়, পরিপাকেরও তেমনি সাহায্য হয়। শিব বোধ হয় এই জন্তেই অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষার্থী হয়েছিলেন। তোমার বিবাহ-নিবারিণী সভা আর বংশবৃদ্ধি-রোধিনী সমিতিকে কিছু দিনের জন্তে বন্ধ রেখে, একটি সুগৃহিণী নিয়ে এস। এবার যখন তোমার অতিথি হয়ে তোমার সঙ্গে খেতে বসব, তখন যেন তোমার মনোরমা গৃহিণীর সুচারু কোমল হস্তের মনোরম অমৃত পরিবেষণ পাই। তোমার বিবাহ-নিবারিণী ব্যবস্থা ত বংশবৃদ্ধি নিবারিণী ব্যবস্থার বিকল্পে?

আমি। আমারও মনে হয়, যে সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই তত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রচার করচেন তাঁদেরও এই মত। সন্তান সংখ্যা নিয়মিত করতে পারলে বিবাহ করা মন্দ নয়। তাতে বোধ হয় তোমারও মতে কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম দুইয়েরই ফল হয়। যা হোক, তুমি গৃহিণীর যে সরস বর্ণনা করেছ, তাতে আমার কৌমার্য্য ভঙ্গ হতেও পারে এবং

"একদা সুক্ষণে,
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে,
চন্দন চর্চ্চিত ভালে, রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তার পরে,
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ-কঙ্কণ করে,
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।"

নারায়ণ বাবু। তথাস্তু। কিন্তু কবির অনির্দ্দিষ্ট "একদা"কে নির্দ্দিষ্ট করে' একটা "সুক্ষণ" স্থির করতে হবে, আর সেটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

আমি। আচ্ছা, তারই চেষ্টা করা যাবে। আর দিন কতক সময় দাও, আর একবার ভাল করে' ভেবে চিন্তে দেখি।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আহার সমাপন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

নারায়ণ বাবু। যোগ্য পাত্রীর কথা বলছিলে, তা অপেক্ষাকৃত সুপাত্রী পাওয়া নিতান্ত কঠিন না হতেও পারে। এদেশে অবশ্য অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি আছেন, যাঁরা তোমাকে কন্যাদান করতে পারলে কৃতকৃতার্থ বলে ধন্য হতে পারেন। কিন্তু কন্যাটি কেমন সেইটিই কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পড়া ছেলের সঙ্গে, মহাকালী পাঠশালায় পড়া মেয়ের বিবাহ হলেই যে রাজযোটক হয় এমন কথা পাঁজিতে লেখে না। বেথুন কলেজে বা সেই রকম অন্য কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই। তাঁদের শিক্ষার উচ্চতা কতদূর হয় তা জানবার আমাদের সুযোগ নেই। বাইরে যতদূর দেখতে পাই, তাতে মনে হয়, তাঁদের শিক্ষার উচ্চতার চেয়ে বিলাসের উচ্চতাটা একটু বেশী। অনেকেই বড় লোকের মেয়ে, অনেকের পক্ষে সেটা অশোভনও হয়ত নয়।

আমি। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ স্বয়ম্বরা হন, ত আমার মত লোককে পতিত্বে বরণ করবেন না। আমাদের গরীবের ঘর তাঁদের পায়ের ধূলোর যোগ্য নয়। আমি সে সকল মহিলাদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এও মনে করি যে, তাঁদের কারও শুভদৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

নারায়ণ বাবু। আমিও সেই কথাই বলচি। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের একটু ভাল শিক্ষা দেবার মত বিদ্যালয় ত দেশে বড় একটা দেখা যায় না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাঠশালা অনেক জায়গায় আছে, মিশনরী ইস্কুলও কোন কোন জায়গায় আছে। কিন্তু সেখানে কেবল প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, আর আমাদের মেয়েরা সেইখানেই দশ এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করে।

আমি। আর আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাদেরই সহধর্ম্মিণী সহযোগিনী "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ" বলে' গ্রহণ করেন।

নারায়ণ বাবু। গ্রহণ না করে' আর করেন কি? কেউ কেউ বিবাহের পর স্ত্রীকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়, কারো বা সে বিষয়ে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। মেয়ের বাপ শিক্ষিত হলে কখন কখন বাপের বাড়ীতেও মেয়ের কিছু কিছু শিক্ষা হয়। কিন্তু মেয়ের বাপই হোন আর স্বামীই হোন, এমন শিক্ষা কেউই দেন না যাতে করে মেয়েটি পরে "মানুষ" হতে পারে—স্বতন্ত্র আত্মাবিশিষ্ট "মানুষ"—সাজগোজ করা গহনা পরা খেলা ঘরের পুতুল নয়।

আমি। স্বতন্ত্রতার কথা ত আমাদের দেশে বলবারই যো নেই। এখানেও আমরা ভূতাবিষ্ট। প্রাচীন সংহিতাকারেরা বলে' গিয়েছেন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" আর আমরা অর্ব্বাচীনেরা সে সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করি না। যতদিন না আবার নূতন সংহিতাকার জন্ম গ্রহণ করেন, ততদিন বর্ত্তমান ব্যবস্থাদাতারা ভূতেরই গুণকীর্ত্তন করবেন, আর আমরাও ভূতগ্রস্ত হয়ে থাকব।

নারায়ণ বাবু। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতে হবে, নারীকে শ্রদ্ধা করার সম্মান করার ব্যবস্থাটা সেকালে খুব ছিল।

আমি। সেটা সমান অধিকার বিশিষ্ট মানুষ বলে নয়। তাঁরা আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জীব এ ধারণাটা সর্ব্বত্র প্রবল। এই দেখ না, তাঁদের শূদ্র শ্রেণীতে ফেলে বেদ শোনবার পর্য্যন্ত অধিকার দেওয়া হয় নি। তবে তাঁদের না হলে আমাদের চলে না, সেই জন্যে তাঁদের খাতির করবার, অপ্রিয় কায না করবার ব্যবস্থা আছে।

নারায়ণ বাবু। সে বিষয়ে সে কালের বিধিব্যবস্থা যাই থাক, একালে আমাদের এমন বিধি ব্যবস্থা আবশ্যক হয়েছে যাতে করে তাঁদের "মানুষ" করা যায়।

আমি। আসল কথা হচ্চে, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর না এলে শরীরেরও বল হয় না, মনেরও বল হয় না, কিছুরই সম্যক্ স্ফুর্ত্তি হয় না। যত কিছু অভিব্যক্তি হয়েছে, সবই ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। আমরা কিছু অত্যধিক ভালবাসার মোহে স্ত্রীলোককে সংসারের সকল প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত থেকে দূরে রেখে এসেছি, এবং এখনও রাখছি। তার ফলে তাঁরা হয়েছেন "অবলা।" কিন্তু এখনকার এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে "অবলা"র কোথাও স্থান নেই। এখন শরীর মন বুদ্ধির বল চাই। বলহীনের আত্মলাভ হয় না।

এইরূপ নানা আলোচনায় আলাপে দুইটা দিন কাটাইয়া দিয়া নারায়ণ বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

আঁধারের শিউলি

(উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবকুমার সুভদ্রাকে পত্র লিখিল না বটে, কিন্তু মন হইতে তাহাকে মুছিয়া ফেলিতেও পারিল না। অনেক সময় মনের মাঝে অভিমানের মেঘ উঠিয়া সুভদ্রার স্মৃতিকে ম্লান করিয়া ফেলিতে চাহিত, কিন্তু তাহা আকাশের চলন্ত মেঘের মত দু'দণ্ডের জন্য মাত্র। সুভদ্রার উপর অভিমান করিবার একমাত্র অছিলা—দেবকুমার তাহাকে চিঠি লিখিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একখানি চিঠি লিখিল না কেন? কিন্তু দেবকুমার যে সেই তার ছোট্ট চিঠিখানির মধ্যে করিয়া কতখানি ব্যথা, কি কঠিন দণ্ডের অন্যায় আদেশ পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহা ভাবিতেই তাহার সেই হাওয়ার রচা অভিমান কোথায় ভাসিয়া যাইত, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় অনুশোচনার বেদনায় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিত। আবার মুকুলের কথা মনে পড়িত;—দুঃখ হইত—রাগও হইত। দুঃখ হইত—তার মত সরলা স্বামিপ্রেমে একান্ত নির্ভরশীলা, স্বামিপ্রেমের পূর্ণতা হইতে তলে তলে বঞ্চিতা হইতেছে দেখিয়া; রাগ হইত—কেন সে না বুঝিয়া অমন চিঠি দিয়া তাহার স্বামীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিল? সময়-সময় দেবকুমার দুঃসহ অশান্তিতে অস্থির হইয়া উঠিত; ভাবিত, না—আর এ কপটতা, আত্মগোপনতা সহ্য হইতেছে না—মুকুলের নিকট সব স্বীকার করি। কিন্তু আবার ভাবিত—তাহাতে মুকুলের লাভ? সে যে চিরজীবনের মত অসুখী হইবে! সেই চিঠি?—না, না, সে চিঠির কথায় নারীর মন কখনই সায় দিতে পারে না!—সে মুকুলের হৃদয়ের কথা নহে, সে কেবল তার স্বামিপ্রেমের উপর অগাধ বিশ্বাসের ফল, তাহারই বলে সে অমন কথা লিখিতে পারিয়াছিল। সে বিশ্বাস তার ভাঙ্গিতে পারিব না—সেই ভুলে-ভরা বিশ্বাস লইয়া যত দিন পারে সে শান্তিতে থাক্,—আমি না হয় ফেরারী আসামীর মত সারাজীবন উদ্বেগ অশান্তির বোঝা বহিতে থাকিব।

দেবকুমার সকলের অলক্ষ্যে হৃদয়ের এই গুরুভার নীরবে বহন করিতে পারিলেও, মুকুলের চোখ এড়াইতে পারিল না। মুকুল একদিন স্বামীকে বলিল, "হ্যাগা, তুমি দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?"

দেবকুমার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "শুকিয়ে যাচ্ছি?"

মুকুল বলিল, "হ্যাঁ, সেই মধুপুর থেকে আসার পর থেকেই এই রকম হয়ে যাচ্ছ; যেন মনে সুখ নেই—কেমন যেন অন্যমনস্ক, খাওয়াও ঢের কমে গেছে।"

দেবকুমারের বুকটা আচম্‌কা কাঁপিয়া উঠিল—ভাগ্যে মুকুল বলে নাই 'কাশী থেকে আসার পর থেকে!' নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দেবকুমার বলিল, "তবে বোধ হয় একটা অসুখ বিসুখ হবে!"

মুকুলের স্বামী নিজে ডাক্তার, সুতরাং তাহার মুখ হইতে এমন ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মুকুলের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "এখানে ভাল ডাক্তার কেউ নেই?"

দেবকুমার বলিল, "ভাল ডাক্তারের আর দরকার কি? আমি নিজেই একটা ওষুধ ঠিক করে নেব'খন।"

মুকুল বলিয়া উঠিল, "নিজের ডাক্তারি নিজে করা কি চলে? না না, ভাল ডাক্তার এখানে না থাকে, তুমি কলকাতায় চল।"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "পাগল আর কি! এই সেদিন হল কলকাতা থেকে এসেচি, আর এখনই—কলকাতায় চল! কিছু দরকার নেই—নিজের ওষুধেই সেরে উঠব।"

মুকুলের মন কিন্তু কিছুতেই শুনিল না। সে

স্বামীর মঙ্গলের জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতার সামিষ ও নিরামিষ পূজা মানত করিল এবং মামীশাশুড়ীকে কাঁদিয়া কাটিয়া এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে দেবকুমারের ভারি অসুখ, তাহাকে আর চেনা যায় না; কিন্তু কিছুতেই চিকিৎসা করাইতে চাহিতেছে না, সুতরাং চিকিৎসার জন্য যাহাতে কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারা যায় তাহার সত্বর ব্যবস্থা করা আবশ্যক—ইত্যাদি।

মামী পত্র পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বড় ছেলেকে পাঠাইয়া দিলেন এবং ভাগিনেয়ের উপর হুকুম জারি করিলেন—পত্র পাঠ তুমি মুকুলকে লইয়া এখানে আসিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে, সুভদ্রার পিতা বাটী ফিরিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, কঠিন; কেবল চক্ষু দুইটি দিয়া যেন আগুনের ঝলক বাহির হইতেছিল। সুভদ্রা মাতার শবদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। নিকটে পাড়ার দুইচারিজন স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। হারাণচন্দ্র তাহাদের দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"দূর হও, দূর হও সব এখান থেকে!"

সে কণ্ঠস্বরে অপরাহ্ণের আকাশ বাতাস যেন কাঁপিয়া উঠিল। সুভদ্রা ভীত চকিত হইয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া স্মৃতির কশাঘাতে শিহরিয়া পিতার সেই প্রচণ্ড মূর্ত্তিপানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সমাগত স্ত্রীলোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া যে যেদিক পারিয়াছে পলাইয়াছে। সুভদ্রা আড়ষ্টভাবে অশ্রুকণ্ঠে বলিল, "কি হয়েচে বাবা?"

"এ চামারের দেশ মা—এ চামারের দেশ! কেউ আসতে চাইলে না—জমীদার 'একঘরে' করেচে আমায়।"

সুভদ্রা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে বাবা?"

"এ চামারের দেশের মুখে আগুন জেলে দিয়ে চলে যাব।"

সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে বলিল, "সৎকারের কি হবে?"

হারাণচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "সে জন্যে ভাবনা করি নে আর—জমীদারের চক্রান্তে দুফোঁটা ওষুধ পেল না বলে' সৎকারের জন্য কাঠের অভাব হবে না!" এই বলিয়া হারণচন্দ্র কঠোর দৃষ্টিতে নিজ বাসভবনের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

সুভদ্রা ভীতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু কেউ যে এল না! শ্মশান কত দূরে—তোমায় আমায় পারব না?"—আবার মায়ের জন্য শোক উথলিয়া উঠিল। সুভদ্রা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুভদ্রার পিতা কন্যার কাতরতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "কারুকে আসিতে হবে না—আজ গাঁয়ের বুকের ওপর শ্মশান প্রতিষ্ঠা করে যাব।"

শুনিয়া সুভদ্রা শিহরিয়া উঠিল।

হারাণচন্দ্র তখন পত্নীর সৎকারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে শালকাঠের একটা পুরাতন বড় সিন্দুক ছিল, সেটাকে কুড়াল দিয়া চিরিলেন। ভিতরের চৌকাট হইতে দরজা সব খুলিয়া চিরিলেন, দাওয়া হইতে খুঁটি সব উপড়াইয়া লইলেন, লেপ মশারি মাদুর যাহা ছিল একত্র করিলেন, তার পর ছোট বাক্স, জলচৌকী, পিঁড়ি, কাঠের সামগ্রী যাহা ছিল কিছুই বাদ দিলেন না—সব খণ্ড খণ্ড করিলেন। সুভদ্রা বিস্ময়ে আতঙ্কে আত্মহারা হইয়া পাথরের মত স্থির অবিচল ভাবে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

তার পর চিতা সাজান হইল—ঘরের মাঝে! পিতা পুত্রী মিলিয়া শবদেহ চিতার উপর স্থাপিত করিলেন। লেপ বালিশ মশারি দিয়া শব আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর আবার কাঠ সাজাইলেন। চালের কিছু খড় ছিল, তাহাও চিতার উপর চাপাইলেন—চিতা গৃহের চাল প্রায় স্পর্শ করিল। এইরূপে চিতা সাজান হইলে ব্রাহ্মণ একটা পুঁটলী বাঁধিলেন। তাহাতে দু-চারখানা কাপড়, একটা ঘটি, একখানা তালপাতার পুঁথি আর

কিছু অর্থ লইলেন। গৃহে এক খানা ধারাল ছোরা ছিল, সেখানা কন্যাকে দিয়া বলিলেন—"এখানা তুই রেখে দে।"

সুভদ্রা নীরবে পিতার হস্ত হইতে ছোরাখানা লইয়া বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। হারাণচন্দ্র কন্যাকে বলিলেন, "ওখানা কক্ষণো ছাড়িস নে—ওই খানাই তোর শেষ আশ্রয়, বুঝেছিস্?" কন্যা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বুঝেছি।

যখন রাত্রি নিসুতি হইয়া আসিল, হারাণচন্দ্র চিতায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বাড়ীর দ্বারে তালাবদ্ধ করিলেন। সেই রাত্রেই কন্যাকে লইয়া তিনি জন্মের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতিবেশীরা যখন অগ্নিকাণ্ডের শব্দে জাগ্রত চকিত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা নিজেদের বাড়ী রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাহাদের কোন আশঙ্কা ছিল না তাহারা ভাবিল,—এ কায জমীদারের ভিন্ন আর কাহারও নহে, সুতরাং তাহারা আগুন নিবাইবার জন্য সাহস করিল না,—হারাণচন্দ্রের বাড়ী নির্ব্বিঘ্নে জ্বলিতে লাগিল।

প্রভাতের আলো তখনও ভাল করিয়া ফুটে নাই' হারাণচন্দ্র কন্যাসহ চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া ষ্টেশনে পৌছিলেন। সমস্ত দিনের অনাহারে সুভদ্রা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হারাণচন্দ্রেরও শরীর যেন আর বহিতেছিল না। ষ্টেশনের পুষ্করিণীতে উভয়ে স্নান সম্পন্ন করিয়া, কিছু ফলমূল কিনিয়া আহার করিলেন। তার পর বেলা নয়টার ট্রেণে হারাণচন্দ্র কন্যাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বহুবাজারে দিবাকর নামে তাঁহার দূরসম্পর্কীয় এক ভাই থাকিতেন, এইটুকুমাত্র তাঁহার জানা ছিল। কিন্তু কলিকাতার মত জনাকীর্ণ সহরে বাড়ীর নম্বর জানা না থাকিলে কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা কতদূর অসম্ভব এবং তাহা পারিলেও, সামান্য আত্মীয়তার বলে সেখানে আশ্রয়লাভ কিরূপ কঠিন তাহা বৃদ্ধ হারাণচন্দ্রের জানা ছিল না।

কলিকাতায় পৌছিয়া বহু অনুসন্ধানে বদি বা আত্মীয়ের বাড়ীর উদ্দেশ পাইলেন, কিন্তু শুনিলেন, তাঁহার সেই ভ্রাতা দিবাকর দুই বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র হরিদাস এখন কর্ত্তা।

হরিদাসের সংসারে পরিবারের মধ্যে হরিদাস, তাহার মাতা ও দাসী মোক্ষদা। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই মোক্ষদার নাম ছিল 'পারুল', এখন সে আবার মোক্ষদা হইয়াছে। সে এখন খোলার ঘরের সংসার উঠাইয়া দিয়া, গৃহস্থের বাড়ীতে রাত দিন দাসী হইয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে এ সংসারে রাত দিনের ঝির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিবাকরের মৃত্যুর পর রাত্রে একা থাকিতে হয় বলিয়া হরিদাসের মাতা অনেক চেষ্টা করিয়া মোক্ষদাকে পাইয়াছেন। উপরে দুই খানি ঘর। একখানিতে হরিদাসের মা দাসীকে লইয়া শয়ন করেন, আর একখানিতে হরিদাসের রাত্রে শুইবার কথা।

হরিদাস তখন বৈকালিক নিদ্রা অন্তে স্নান সমাপন করিয়া, নৈশ বিহারের উপযোগী বেশভূষা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হারাণচন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

প্রথমটা হরিদাস অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিল; হারাণচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি কন্যাকে বলিলেন—"উনি তোমার দাদা হন, প্রণাম কর।"

সুভদ্রা ম্লান দৃষ্টিতে পিতার মুখপানে চাহিল। হরিদাস বলিয়া উঠিল—"থাক—থাক—"

কন্যার সপ্রশ্ন ম্লান দৃষ্টিতেই হারাণচন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল, এখন প্রণাম করিতে নাই। তিনি বলিবলিলেন—"না না, আমারই ভুল হয়েছে, ওর অশৌচ এখন প্রণাম করতে নেই।"

হরিদাস আহ্লাদুক্কের মত বলিয়া বসিল, "তবে তো আর কথাই নেই! তা চল তোমাকে মার কাছে নিয়ে যাই।"—এই বলিয়া সে সুভদ্রার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

সুভদ্রা সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

হরিদাস বলিল, "তুমি আমার ছোট বোন—লজ্জা কি, চল।"

হারাণচন্দ্র অত বুঝিলেন না, বলিলেন, "যাও, দাদার সঙ্গে ভেতরে যাও।"

সুভদ্রা হরিদাসকে সঙ্কুচিত ভাবে বলিল. "আপনি চলুন—আমি যাচ্চি।" সুভদ্রা হরিদাসের অনুগমন করিল।

হরিদাসের বাড়ীর উপরে উঠিবার সিঁড়ি সব সময়ই অন্ধকার; দিনের বেলায়ও অপরিচিত ব্যক্তির উঠিতে অসুবিধা হয়। বিকালের দিকে অন্ধকারে ঘুট ঘুট করিতে থাকে।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া সুভদ্রা থমকিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসের সুবিধা হইল, সে বলিল, "বড্ড অন্ধকার, না?"

সুভদ্রা বলিল, "হ্যাঁ, ওপর থেকে একটা আলো—"

"না আলো আনতে হবে না—চল তোমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্চি"—এই বলিয়াই সে সুভদ্রার হাতখানা খপ করিয়া ধরিয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"এঁ্যা লজ্জা কি ভাই? আমি তোমার—"

হরিদাসের স্বর আর ফুটিল না, এবং সুভদ্রার মনে হইতে লাগিল হরিদাসের আপাদমস্তক কাঁপিতেছে। সুভদ্রা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, হরিদাস দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "এঁ্যা এঁ্যা লজ্জা কোর না, আমি তোমাকে—"

সুভদ্রা আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল—"বাবা!" আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পশুটাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। সুভদ্রার চীৎকারেই হরিদাসের মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আচম্‌কা ধাক্কা খাইয়া সে সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া গেল। সেই অবসরে সুভদ্রা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া উৎকণ্ঠিত পিতাকে রাগে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "এখানে আমি এক দণ্ডও থাকচি নে—আপনি উঠুন।"

হারাণচন্দ্র ব্যাপার কি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কি, কি হয়েচে?"

সুভদ্রা ঘৃণার স্বরে বলিয়া উঠিল,—"সে যা হয়েচে আমি বলতে পারব না—আপনি উঠে আসুন তো!"

সুভদ্রা আর ক্ষণকাল সেখানে দাঁড়াইল না। পিতা-পুত্রী তখন কালীঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার বলিল, দেবকুমারের অন্য কোন অসুখ নয়, কেবল মনের অসুখ। মনের অশান্তিটুকু দূর হইলেই সে আবার সারিয়া উঠিবে।

মামী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—দেবকুমারের মন খারাপ হইবার কারণ কি? সংসারে মানুষের যাহা কিছু বাঞ্ছিত, বিধাতা তো সমস্তই তাহাকে দিয়াছেন—সে তাহার পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে; সে নিজে শিক্ষিত, তাহার দেবতুল্য কান্তি—পরিপূর্ণ যৌবন, তাহার উপর অমন স্ত্রী!—তবু কেন সে অসুখী? তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ছয়মাস পূর্ব্বে মুকুলের কোন প্রসঙ্গে দেবকুমারের হৃদয় মন যেমন উৎকর্ণ হইয়া উঠিত, এবং মুকুলে ব্যবহারের তুচ্ছ বিবরণটি পর্য্যন্ত শুনিতে তাহার যেমন ভাল লাগিত, এখন তো আর কৈ সেরূপ দেখা যায় না। পূর্ব্বে সে মনের আবেগে মুকুলের সম্বন্ধে অনেক কথা যেমন অসাবধানে বলিয়া শেষে লজ্জায় পড়িয়া যাইত, এখন ত আর তার সেরূপ অসাবধানতা দেখা যায় না! সে মধুর চঞ্চলতাপূর্ণ যৌবন এই ছয় মাসে যেন প্রৌঢ় হইয়া পড়িয়াছে। মুকুলেরও আর সে সোহাগে প্রীতিতে ঢল ঢল ভাবটি নাই! সব সময় মুখটি ম্লান! মামী বুঝিলেন, মুকুলের এই ম্লান ভাবের কতটা স্বামীর অসুখের জন্য, কিন্তু সবটুকু সেজন্য নহে। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, স্বামী স্ত্রীর মাঝে এক খানা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কেন? মামী তখন অতীতের অন্ধকারে স্মৃতির প্রদীপ লইয়া কারণ খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন তিনি মুকুলকে বলিলেন, "তুমি বড় বোকা মেয়ে।"

মুকুল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন মামী মা ?"

"এতদিনে ত দেবকুমারের দুঃখের কারণটা খুঁজে বের করতে পারলে না ?"

মুকুল বলিল, "অনেকবার জিজ্ঞাসা করেচি মামীমা, কিছু বলতে চান না।"

"দূর পাগলী, মনের ব্যথা কি জিজ্ঞাসা করলেই সব সময় জানা যায় ?"

মুকুল বলিল, "তবে ?"

"মনের পিছু নিতে হয়।"

"সে কি রকম মামীমা ?"

"এই তার সঙ্গে বেশী মিশতে হয়, অনেক রকম কথা তুলতে হয়, কোন্ বিষয়ে সে সুখী হয়, কোন্ কথায় সে গম্ভীর হয়, কোন্ বিষয় বা সে চাপতে চেষ্টা করে—এ সব লক্ষ্য করতে হয়। তার পর তার থেকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বেদনার কাঁটাটি ঠিক করতে হয়। বুঝলে ?"

"কিন্তু আজ কাল যে বেশী কথাবার্ত্তা কইতে চান না।"

"কি বলে ?"

"কখন বলেন, ঘুম পেয়েচে, কখন বলেন—শরীর খারাপ, কখন দেখি আগে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েচেন !"

"এ রকমটা কতদিন হয়েচে ?"

"সেই যে মধুপুর গিয়েছিলেন—সেই থেকে !"

"মধুপুর থেকে বাড়ী ফেরবার পর, না, মধুপুর থাকা সময়েই ?"

মুকুল একটু ভাবিয়া বলিল, "না, মধুপুর থেকে আসার পর থেকেই শরীর ভাঙতে আরম্ভ করেচে।"

"না না, তা বলচি নে, আমি জিজ্ঞাসা করচি তোমার সঙ্গে আগেকার মত কথাবার্ত্তা না কওয়া কবে থেকে আরম্ভ হয়েচে ?"

"সেটা মধুপুর থাকতেই হয়েচে। তখন থেকেই ভিতরে ভিতরে শরীর খারাপ হতে সুরু হয়েছিল কি না।"

মামী মনে মনে কহিলেন, "তোমার মাথা !" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কাশী থেকে বেড়িয়ে আসার পর থেকে না ?"

মুকুল ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলিল, "আপনি কি করে জানলেন মামীমা ?"

মামী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জানলাম !" কথাটা বলিয়াই মামী ভাবিলেন কাযটা তো ঠিক হ'ল না। তখন তিনি নিজের সেই গম্ভীর ভাবটাকে সাধ্যমত তরল করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমি যে গুণতে জানি।"

মুকুল তাহা বিশ্বাস করিল না ; বলিল, "না, আমার মাথা খান, সত্যি বলুন না।"

এবার মামীশাশুড়ী বেশ সহজভাবে বলিলেন, "আন্দাজী বলেছিলাম, লেগে গেল !"

মুকুল সহর্ষ বিস্ময়ে বলিল, "আপনার ভারি সুন্দর আন্দাজ তো—ঠিক মিলে গেল। সব আন্দাজই কি এমনি মেলে ?"

"কোনটা মেলে, কোনটা মেলে না।"

"আচ্ছা, কাশী গিয়ে যে তাঁর মন খারাপ হল, তার কি কারণ আন্দাজ করুন ?"

মামী এবার বড় মুস্কিলে পড়িলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়িল, কাশীতে দেবকুমারের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। অমনি চট করিয়া একটা উত্তর গড়িয়া লইয়া বলিলেন, "এর আন্দাজ করা শক্ত নয়, তুমিও একটু ভাবলে বলতে পারবে।"

মুকুল খানিকক্ষণ অনেক ভাবিল। শেষে হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কৈ, পারলাম না।"

"পাল্লে না ? তোমার শাশুড়ী কোথায় মারা গেছলেন—জান ?"

"কাশীতে।"

"তবে ?"

"ও ! তাই সেখানে গিয়ে মন খারাপ হয়েছিল—না ? আমি কি বোকা ! এইটুকু আর এত দিন বুঝতে পারছিলাম না।"

মামী বলিলেন, "সত্যি তুমি বড় বোকা !"

মুকুল তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু মামীমা, যার জন্তে যদি মন খারাপ হয়ে থাকে, তবে তা সারবে কেমন করে ?"

মামী বলিলেন, "সারবে, কিন্তু তা অপরে সারাতে পারবে না, পারবে কেবল তুমি।"

মুকুল বলিল, "আমি !"

"হ্যাঁ, তুমি। সংসারে মনের ব্যথা মুছে নিতে পারে দু' জন—মা, আর স্ত্রী। ব্যথা মুছে নিতে হলে ব্যথার ভাগ নিতে হয়। স্নেহে মায়ের আসন ঢের উঁচুতে, কিন্তু মানুষের মনের সব ঘরগুলির চাবি মা পায় না, পেতে পারে কেবল স্ত্রী। তোমারও দেবকুমারের মনের সবগুলি চাবি পেতে হবে, তবেই তাকে সুখী করতে পারবে।"

মুকুলের মনে হইতে লাগিল, এই স্নেহ উপদেশের চারি ধারে কি যেন একটা গভীর ভয়ঙ্করতার অস্পষ্ট ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করলে মনের সব কথা জানতে পারব ?"

"দরদীর ব্যাকুলতা নিয়ে তার মনের পিছন পিছন ফিরতে হবে। পোষাপাখী উড়ে গেলে মানুষ যেমন খাঁচা নিয়ে তার খোঁজে ফেরে, তেমনি ফিরতে হবে। হয়ত তাতে কতবার নিরাশ হবে, কতবার ব্যথা পাবে, কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, অভিমান করলে হবে না, ঠাকুরের কাছে ধন্না দেবার সময় যেমন মন শক্ত করতে হয়, তেমনি করতে হবে।"

মুকুল আত্মহারা হইয়া মামীশাশুড়ীর কথা শুনিতেছিল। এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "মা, ঠাকুর যে বসে আছে, ঘি ময়দাগুলো বের করে দিলে দাদাবাবুর খাবারটা তৈরি করে ফেলত।"

মামী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও মা। ভুলে গেছি। মুকুল, ঘি ময়দাটা দিয়ে এস ত। ঝির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেবকুমার কি বেড়িয়ে এসেচে ?"

সেই সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল।

ঝি বলিল, "না, কৈ দাদাবাবু এখনও আসেন নি।"

মামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ন'টা বাজল, এখনও আসেনি ? এত দেরি তো কৈ হয় না।"

মুকুল ঝিকে ঘি ময়দা বাহির করিয়া দিয়া আসিয়া মামী শাশুড়ীকে বলিল, "বোধ হয় এসেচেন—নীচে যেন তাঁর গলা শুনলাম।"

মামী বলিলেন, "তুমি তবে খোকার কাছে বস— আমি নীচে গিয়ে লুচি ক'খানা তাড়াতাড়ি করিয়ে নিই গে।"

নীচে নামিতে গিয়া সিঁড়ির বাঁকের কাছে দেবকুমারের সহিত মামীর সাক্ষাৎ হইল। মামী বলিলেন, "এত দেরি হল যে ?"

দেবকুমার বলিল, "উপরে চলুন, বলচি।"

"আচ্ছা তুমি যাও, আমি একবার রান্নাঘর থেকে চট্ করে আসচি"—বলিয়া মামী দুই তিন ধাপ নামিতেই দেখিলেন, সিঁড়ির এক পাশে জড়সড় হইয়া এক কিশোরী দাঁড়াইয়া। তাহার মাথায় ঈষৎ ঘোমটা ছিল, মুখের অনেকটা দেখা যাইতেছিল। মুখখানিতে শান্ত ভাব মাখানো—অতি সুশ্রী, কিন্তু বড় বিষণ্ণ—যেন হেমন্তের জ্যোৎস্না দিয়া গড়া।

তাহাকে দেখিয়া মামী থমকিয়া গেলেন। বলিলেন, "কে গা ?" মামীকে নীচে যাইতে দেখিয়া, দেবকুমার উপরে না যাইয়া মামীর পিছনে পিছনে আসিয়াছিল। সেই মামীর প্রশ্নের উত্তর দিল, "সব বলবে'খন আপনি নীচে থেকে আসুন।"

মামী এবার একবার ভাগিনেয়ের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, ওকে মুকুলের কাছে নিয়ে যাও, আমি আসচি।" যাইবার সময় মামী অপরিচিতার উপরেও একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে ছাড়িলেন না।

মামী নীচের কায সারিয়া উপরে আসিয়া বিরক্তির স্বরে দেবকুমারকে বলিলেন, "কি ব্যাপার শুনি ? এমন সোমত্ত মেয়েকে কোত্থেকে এনে হাজির করলে ?"

মামীর বিরক্তির ভাবটুকু দেবকুমার লক্ষ্য করিয়া-

ছিল। বলিল, "আগে শুনুন সব, তার পর বিরক্ত হতে হয় হবেন।"

তখন দেবকুমার মামীকে যাহা বলিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—মেয়েটি ব্রাহ্মণের ঘরের। বাপ জমীদারের অত্যাচারে দেশ ছাড়িয়া কন্যা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। সেখানে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়ায় নিরাশ্রয় হইয়া শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। কুলোকে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ছিল দেখিয়া সে উহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

শুনিয়া মামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপের বাড়ীর কেউ না থাকে, শ্বশুর বাড়ী ত আছে?"

দেবকুমার বলিল, "সেও থাকা না থাকা সমান! স্বামীটা ওর হতভাগা, খোঁজখবর নিতে চায় না, শ্বশুর খাশুড়ী নেই, আর যারা আছে তারা আশ্রয় দেয় না, তাই বাপের বাড়ীতেই থাক্‌ত।"

মামী একবার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখচি এর সব-খবর নিয়ে বসেচ!"

দেবকুমার একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "কোন জায়গায় এর একটু আশ্রয় হতে পারে কি না জানবার জন্যে সব খবর জান্‌তে হয়েচে, তাতে আর দোষটা কি হয়েচে বলুন!"

মামী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করবে স্থির করেচ?"

"আপনাকে একে একটু আশ্রয় দিতে হবে।"

মামী গভীর আশ্চর্য্যে চোখ দুটা বড় করিয়া বলিলেন—"আমাকে!"

"নয়তো আর কোথায় যাবে যাবে বলুন!"

মামী নিতান্ত ভাল মানুষের সুরে বলিলেন, "কেন, তোমার ওখানেই নিয়ে যাওনা!"

দেবকুমার বলিল, "যদি আপনি একান্তই একে আশ্রয় না দেন, অগত্যা তাই-ই করতে হবে!"

মামী মনে মনে বলিলেন—"হুঁ!—তাতো ঠিক!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালীঘাটে পৌঁছিয়াই সেই রাত্রে হারাণচন্দ্রের প্রবল জ্বর হইল। দুই দিন বে-হুঁসে কাটিল। চিকিৎসাদি একরূপ কিছুই হয় নাই। পাওার কয়েক শিশি পাঁচ পয়সা ড্রামের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও আট আনা মূল্যের "পারিবারিক চিকিৎসা" বহি ছিল। তাহারই চিকিৎসা হইতেছিল।

সুভদ্রার চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল!—এই বিদেশে অসহায়, কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। একবার ভাবিল—স্বামীকে খবর দিই, কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তাকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিল। চতুর্থ দিনে হারাণচন্দ্রের অনেকটা জ্ঞান হইল। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার?"

সুভদ্রা বলিল, "শনিবার।" হারাণচন্দ্র আপনা আপনি বলিলেন, "আজ চার দিন।"

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কাউকে খবর দিলে হত না?" বৃদ্ধ হতাশ ভাবে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কাকে, আর দেবে মা!—সেই হরিদাসকে? না—না!"

সুভদ্রা মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া বলিল, "না, তার কথা বলি নি।"

"তবে?" পরক্ষণেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেবকুমারকে?" সুভদ্রা নীরব। বৃদ্ধ অতি দীন নয়নে সুভদ্রার পানে চাহিয়া বলিলেন, "শেষে মরবার সময়টা প্রতিশ্রুতি ভাঙতে বলিস মা? যা কখনও করিনি? না মা, থাক্‌।" বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কি ভাবিয়া পরে বলিলেন "মা, একখানা পোষ্টকার্ড যোগাড় করে আনিতে পার?—লিখে দিই। তার ঠিকানা জান ত? আমি জানিনা—ইচ্ছা করেই জানতে চাই নি।"

স্নেহের দায়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে হইতেছে বলিয়া বৃদ্ধের সেই ব্যাধিক্লিষ্ট মুখে যে একটা গভীর

বেদনা ফুটিয়া উঠিল। তাহা সুভদ্রা লক্ষ্য করিল, সে বলিল, "আমিও জানি না।" পিতার সত্য রক্ষা করিতে, পিতার মৃত্যুশয্যায় বসিয়া এই মিথ্যা কহিতে সুভদ্রার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

সুভদ্রাও ঠিক জানে না শুনিয়া বৃদ্ধ প্রথমটা যেন বড় আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার চোখে মুখে একটা গভীর হতাশার ছায়া ফুটিয়া উঠিল, তিনি আক্ষেপ-সূচক একটা অব্যক্ত শব্দ করিলেন। বৃদ্ধ চক্ষু মুদিলেন। অনেক পরে ডাকিলেন "সুভদ্রার।" সে উত্তর দিল।

"আমার মুখে একটু জল দাও মা।"

জল পান করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ঠিক বলচিস, মা—তার ঠিকানা জানিস না ? অ্যাঁ, বল্ না মা!"

মরণোন্মুখ পিতার সেই করুণ আবেগ দেখিয়া সুভদ্রা আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না, সহসা তার মুখ হইতে বাহির হইল—"জানি।"

উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে বৃদ্ধ রোগজীর্ণ দেহে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "এ্যাঁ, জানিস্ ? জানিস ? কিন্তু—উঃ, আমার বুকের ভিতরটা কেমন করচে। আমায় ধর মা সুভদ্রা, বুঝি তাকে লিখতে পারলাম না—একটু বাতাস—"

সকলে বলিল হঠাৎ হার্ট ফেল্ করায় বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে।

* * *

দিনের আলো তখনও নিবে নাই, বৃদ্ধ হারাণচন্দ্রের চিতা নিবিল। এতক্ষণ সুভদ্রা বিমূঢ়ার ন্যায় একদৃষ্টে শূন্য পানে তাকাইয়া ছিল, একটা সীমাহীন শূন্যতায় আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়াছিল। কাহার কণ্ঠস্বরে তাহার সে আত্মবিহ্বল ভাব কাটিয়া গেল। সে বলিতেছে, "ওগো এবার একটা দিয়ে এস।" সুভদ্রা বুঝিল, সব শেষ হইয়াছে।' তার বড় কান্না পাইল, কিন্তু কাঁদিতে পারিল না। ভবিষ্যতের সীমাহারা একটা বিরাট শূন্যতার চিত্রে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে যন্ত্রচালিতের ন্যায় আদেশ পালন করিল।

এইবার দাবী দাওয়ার পালা পড়িল। পাষণ্ডেরা যখন শুনিল সুভদ্রা একান্ত নিরাশ্রয়া, তখন তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য সকলেই অত্যধিক মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পয়লা নম্বর দাবী করিলেন পাণ্ডা মহাশয়, যে হেতু তাঁহারই আশ্রয়ে পিতাপুত্রী উভয়ে প্রথম হইতে স্থান পাইয়াছিল এবং তাঁহারই পাঁচ টাকার 'হোমিওপ্যাথি' নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুই নম্বর দাবীদার বলিলেন, তিনি এই নিরাশ্রয়ার পিতার অন্তোষ্টিক্রিয়ার প্রধান উদ্যোক্তা এবং তাঁহার পিসী বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁহার গৃহ পয়লা নম্বর দাবীদারের বাটী অপেক্ষা নিরাপদ, অধিকন্তু তিনি হোমিওপ্যাথির মূল্যবাবদে পাঁচ টাকা ফেলিয়া দিতে প্রস্তুত। তিন নম্বর দাবীদার সুভদ্রার পিতার সহিত একটা অনতিদূর সম্পর্ক খাড়া করিয়া বলিল, সুভদ্রা তার সম্পর্কে শ্যালিকা-দুহিতা, অতএব তাহারই অভিভাবকত্বের দাবী ষোল আনা।

এই রূপে যখন দাবীর-মূল্য ক্রমশঃ ষোল আনা হইতে আঠরো আনায় চড়িবার উপক্রম করিল, তখন সুভদ্রা বড় ভয় পাইল। কিন্তু এ সময় ভয় পাইলে দুর্ব্বৃত্তেরা আরও পাইয়া বসিবে ভাবিয়া সুভদ্রা সাহসে ভর করিয়া অতি পরিষ্কার কণ্ঠে সকলকে বলিল,—"আমি আপনাদের কারুর আশ্রয়েই যাবনা।"

শিকার হাত ছাড়া হয় দেখিয়া ক্ষুব্ধ ক্রোধে সকলেই সমস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"তাই নাকি।—আচ্ছা চল, একে পুলিশের হাতে জিম্মা করে দিই, তা হলেই বাছাধন আসল ঠিকানায় চলে যাবেন।"

পুলিশের নাম শুনিয়া সুভদ্রা সদ্যোমৃত পিতাকে উদ্দেশ করিয়া করুণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেবকুমার ঘটনাক্রমে সেইখান দিয়া যাইতেছিল, সেই স্বরে চকিত হইয়া সে স্থানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া রোরুদ্যমানা সুভদ্রার সম্মুখে গিয়া বলিল, "কে ? সুভদ্রা ? তুমি!"

সুভদ্রা পরিচিত কণ্ঠস্বরে যেন পুনর্জ্জীবন পাইয়া,

আগন্তুকের পানে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পাষণ্ডেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক পাষণ্ড আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি আপনার কে হন মোশাই ?"

দেবকুমার রুক্ষস্বরে বলিলেন, "সে কৈফিয়ৎ পরে হবে, একটু জল নিয়ে এস।"

সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনার চাকর নই যে হুকুম করচেন।"

দেবকুমার তীব্র ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

অতি অল্প সময়েই সুভদ্রা সুস্থ হইয়া উঠিল। কোন কথা নাই, কেবলি কাঁদিতে লাগিল। আজ তাহার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার দিন। এ শুধু বিরহের তরল বেদনা নহে, এ শুধু দারুণ শোকের দ্রবীভূত জ্বালা নহে—এ অশ্রু মিলনের হাহাকার আনন্দ বেদনার তরল সংমিশ্রণ।

ইতিমধ্যেই পাষণ্ডের দল একে একে সরিয়া পড়িয়াছে, কেবল সেই পাণ্ডা তখনও দাঁড়াইয়া। কৌতূহলী পথিকের দল ক্রমশ পরিপুষ্ট হইতেছিল। দেবকুমার সুভদ্রাকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে পাণ্ডা বলিল,"আপনি ত আত্মীয় হয়ে এঁকে নিয়ে চল্লেন ; কিন্তু আমি যে খরচ পত্র করেছি, সে কে দেবে ?"

দেবকুমার খরচের হিসাব জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "কত দিতে হবে ?"

"কত টত নয়—পঞ্চাশখানি মুদ্রা।"—মৃদুস্বরে বলিল, "শুধু আত্মীয় সাজলেই হয় না।"

"তবে আমার বাসায় এস—কাছে ত আর অত টাকা নেই।"

পাণ্ডা এবার একটু কর্কশ স্বরে বলিল, "বাসায় আবার কে যেতে যাবে ?"

"আচ্ছা, তোমার নাম কি ?"

পাণ্ডা বিদ্রূপস্বরে বলিল, "কেন বাসায় গিয়ে মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে ?"

দেবকুমার রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি আমায় কালীঘাটের জোচ্চোর পাওনি। আচ্ছা দাঁড়াও আমি শ্রীপতি হালদারকে ডেকে পাঠাচ্চি।" এই বলিয়া সেই জনতার মধ্যে ভদ্রপ্রকৃতির কোন ব্যক্তির সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

শ্রীপতি হালদার কালীঘাটের সম্ভ্রান্ত ধনশালী সেবায়েত। সুতরাং তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠানর কথায় সেই পাণ্ডা বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "তিনি কি মহাশয়ের নায়েব যে—"

এবার দেবকুমার সগর্ব্বে বলিল, "হারিৎপুরের দেবকুমার রায়ের কে তিনি, এখনি দেখবে।"

"হারিৎপুরের রায় ?" বলিয়া পাণ্ডা পর মুহূর্ত্তে একেবারে অদৃশ্য। দেবকুমার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "এই সব অধম কুকুরগুলোর জন্যে বামুন জাতটাই নীচু হয়ে যাচ্চে। নামে কলঙ্ক হয়ে যাচ্চে।"

যাহারা ইতিপূর্ব্বে সামান্য জলের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই, তাহাদের অনেকেই এখন দেবকুমারের আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাহার কার্য্য করিয়া আপ্যায়িত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। দেবকুমারের ইঙ্গিত মাত্র একজন একখানা ঠিকা গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিল। কেহ বা দেবকুমারকে পিপাসিত মনে করিয়া বরফশীতল পানীয় আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল। দেবকুমার ধন্যবাদের সহিত তাহাদের অযাচিত উপকার প্রত্যাখ্যান করিয়া, সুভদ্রাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া মাতুলালয়ের উদ্দেশে চলিল।

পথে দেবকুমার সুভদ্রাকে বলিল, "এমন ভাবে তোমায় আমায় দেখা হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

সুভদ্রা গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "মোটেই দেখা হবে কি ভেবেছিলেন ?"

"ভেবেছিলেন—এ কি রকম ? আমি কি তোমার মাষ্টার মশাই ?"

সুভদ্রা পূর্ব্ববৎ গাঢ়স্বরে বলিল, "না আরো ঢের বেশী—আমার ত্রাণকর্ত্তা !"

"প্রাণকর্ত্তা! এ সম্বন্ধটা তো খুব বেশী দিনের বেশী ক্ষণেরও নয় সুভদ্রা! এইটেই কি ঢের হল?"

"না এর চেয়েও বড় সম্বন্ধ আছে—

"তবে সেইটে কেন ভুলচ?"

"সে সম্বন্ধও [illegible] উপকারীকে কেউ ভোলে [illegible]"

"আমার সঙ্গে কি কেবল কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ তোমার?"

"তার বেশী আর আমার দাবী কি?"

"মন্ত্রের সম্বন্ধ?—সেটা কিছু নয়?"

সুভদ্রা এবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে যে কাশীর মন্ত্র! ভুল নয় কেমন করে বুঝব?"

দেবকুমার নীরব হইল। পরক্ষণে বলিল, "সে সব কথা পরে হবে। এখন, এখানে কি করে' এলে, ব্যাপার সব কি হয়েছে, বল দেখি।"

সুভদ্রা তখন সংক্ষেপে সমস্ত বলিল, কেবল তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কীয় চিঠি পত্রের কথার উল্লেখ করিল না।

[illegible] দেবকুমারের মাতুলালয়ের অনতিদূরে পৌঁছিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথা তুমি কি পরিচয় দেবে।"

"নিরাশ্রয়া!"

"শ্বশুর বাড়ীর কথা যদি জিজ্ঞাসা করে?"

সুভদ্রা অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া বলিল, "একটা যাহোক কিছু বানিয়ে বল্লেই হবে।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ

নিকোবার দ্বীপ আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের ৮০ মাইল দক্ষিণে এবং সুমাত্রা হইতে ঠিক ১১০ মাইল দূরে অবস্থিত। আণ্ডামানের মতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টি লইয়া নিকোবার দ্বীপ গঠিত। বেলাভূমি হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। কোথাও-বা সুপ্রশস্ত সবুজ প্রান্তর, কোথাও-বা নয়ন মনোহর ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি পরিশোভিত অরণ্যানী। বৃক্ষগুলি সাধারণতঃ খুব উচ্চ। অনেকে বলেন এই সকল অরণ্যজাত বৃক্ষ হইতে জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৃক্ষগুলির উচ্চতা দেখিলে মনে হয় উহারা জাহাজের মাস্তুল প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া খুব সম্ভবপর।

নিকোবার দ্বীপের প্রাকৃতিক শোভা অথবা অরণ্যভূমির বৃক্ষ-সম্পদ ভিন্ন এ প্রদেশে যে আর কিছুই নাই, তাহা নহে। খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্র, লৌহ এবং কয়লা প্রভৃতির বিদ্যমানতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে কেহই এ পর্য্যন্ত সচেষ্ট ও অগ্রসর হন নাই।

এ প্রদেশের দ্বীপ সমূহের আশপাশ দিয়া প্রতিনিয়ত জাহাজাদি যাতায়াত করিয়া থাকে, অথচ নিকোবারের কোনরূপ কাহিনী, বড় একটা কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ঔদাসীন্য যে একেবারে কারণশূন্য তাহাও ঠিক বলিতে পারা যায় না। ডেন্মার্ক এবং সুইডেন প্রদেশের অধিবাসীরা একবার নিকোবারে উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এখানকার জল হাওয়া বিদেশীয়দিগের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে। এখানে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ খুব দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব খুব অধিক,



শোমপেঁ জাতীয় পুরুষগণ

সেখানে দেখা গিয়াছে, স্থানীয় অধিবাসীরা পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় তথায় বিদেশীরা থাকিলে ত মৃত্যু অনিবার্য্য। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা "কর নিকোবারে" (Kar Nicobar) উপনিবেশ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়াতে একে একে তাঁহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া পরে আর কেহই তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল কারণে বিদেশীয়দিগের নিকোবারে বাসস্থান সম্বন্ধে বীতরাগ হওয়া বিচিত্র নহে। পর্য্যটনকারিদিগের কাহিনী হইতে এ অঞ্চলের দ্বীপ সমূহের মোটামুটি যে একটা বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার বেশী আর কিছু জানিবার উপায় নাই। তাহাদের বিবরণী হইতে যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহারই কতকটা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে ঝড় ও বৃষ্টি প্রভৃতির উপদ্রব তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে মধ্যে মধ্যে এখানে প্রবল ভূমিকম্প হয় বটে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘন ঘন ভীষণ ভূকম্প হইয়াছিল। সে সময়ে নিকটবর্ত্তী গিরিশিখরে অগ্নিও দেখা গিয়াছিল এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী কতক কতক স্থান একেবারে ধসিয়া গিয়াছিল। এমন কি, সে জন্য আশে পাশের অধিবাসীরা স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

তার পর ১৮৮১ এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেও প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

সার হেন্‌রি ইউলের মতে টলেমীর (Ptolemy) সময়ে নিকোবারের নাম কাহারও অবিদিত ছিল না। চীন দেশের অধিবাসীরাও সহস্রবৎসর হইতে চলিল এই দ্বীপপুঞ্জের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তার পর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে (৮৫১ খৃঃ অঃ) আরব দেশের পর্য্যটকদিগের বিবরণীতেও নিকোবার দ্বীপের কথা জানা যায়। পরিশেষে ইংরাজেরা ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশ অধিকার করিলেও, তাহা নামে মাত্র অধিকার করেন, কেননা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দেই ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথম এই দ্বীপ গুলি দখল করিয়াছিলেন।

নিকোবারের আদিম অধিবাসিগণ একটি অবিমিশ্র জাতি। এ জাতির কোন শাখা প্রশাখা নাই। বর্ত্তমানকালে ইহাদিগকে অন্ততঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তর ভাগে যাহারা থাকে তাহারা শোমপেঁ (Shompen) নামে অভিহিত। এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিবাসীরা এখন নিকোবারিজ (Nicobarees) বলিয়াই খ্যাত।

শোমপেঁ জাতিদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। দুই চারিটি পরিবারের সহিত তীরভূমির লোকদের সদ্ভাব আছে দেখা যায়। নতুবা ইহারা নিকোবারীদিগকে আদৌ ভাল চক্ষে দেখে না। শোমপেঁরা সংখ্যায় সর্ব্বসমেত তিন চারি শতের অধিক হইবে না।

বহুদিন হইতে অনেকের এইরূপ ধারণা ছিল যে নিকোবারের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসীরা নেগ্রিটো (Negritoes) অর্থাৎ আণ্ডামানবাসীদের শাখা সম্ভূত; কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। কেননা উক্ত অংশ চিরদিন শোমপেঁদিগেরই অধিকারভুক্ত। বস্তুতঃ শোমপেঁরা মালয়বংশ সম্ভূত। ইহারা অসভ্য, কিন্তু ইহাদের গঠন ও আকৃতি দেখিলে ইহাদিগকে সঙ্কর জাতি বলিয়া অনুমান হয়।

শোমপেঁরা দেখিতে বেশী লম্বাচওড়া নয়। তাহাদের গায়ের রং ঘোরালো তামাটে রকমের, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের গায়ের রং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের চেহারা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহারা মালয় বংশ হইতে উদ্ভূত।

ইহাদের চুল ঘন কুঞ্চিত এবং তরঙ্গায়িত। পুরুষদিগের দাড়ি গোঁফ একেবারেই নাই! এ দেশীয় লোকের মুখাকৃতি কতকটা চতুষ্কোণ, কপাল উঁচু এবং গোল, কিন্তু একেবারেই প্রশস্ত নয়। ভ্রূরেখা





শোমপেঁ জাতীয় রমণীগণ

অত্যন্ত বিরল, চক্ষুর পাতা খুব কালো, চোখ ছোট নহে। স্ত্রীলোকদের চক্ষুতে ঈষৎ মঙ্গোলিয়ান (Mongolian) সাদৃশ্য দেখা যায়। দাঁত বড় বড়, কিন্তু অসমান, মুখের হাঁ বড় এবং ঠোঁট পুরু পুরু, কাণ প্রায়ই চুলে ঢাকা থাকে। কাণ ছিদ্র করিয়া তাহাতে বেশ বড় গোছের একখানা কাঠের টুকরা অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করে। আকার প্রকার তাহাদের ছবি দেখিলেই বুঝা যায়।

মাষ্টার সীজার ফ্রেডরিক বলেন, "১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে মালাক্কা প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা জাহাজে করিয়া যখন নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময়ে নিকোবারিদের একখানি নৌকা আমাদের কাছে আসিয়া আমাদিগকে নানারকমের কতকগুলি ফল উপহার দিল। ফলগুলির অধিকাংশই খাইতে বেশ সুস্বাদু। আপেলের মত এক প্রকার ফল দিয়াছিল তাহা খুব মিষ্ট এবং খুবই উপাদেয়। আমরা তাহাদিগকে আমাদের জাহাজে আসিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে অনুরোধ তাহারা রক্ষা করে নাই, কিছুতেই তাহারা আমাদের জাহাজে আসে নাই। যে সকল ফল আমাদের দিয়াছিল, তাহার দাম দিতে চাহিলে তাহারা গ্রহণ করে নাই। অনেকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন মতেই দাম লইল না। ছেঁড়া সার্ট কিংবা অন্যান্য ছেঁড়া কাপড়ে তাহাদের একান্ত লোভ দেখিলাম। ফলের পরিবর্ত্তে তাহারা তাই চায়, সুতরাং আমাদের প্রদত্ত জীর্ণ বস্ত্রাদি অতিশয় সানন্দে গ্রহণ করিল। আমরা ঐ সকল ছেঁড়া কাপড় ও ন্যাকড়া দড়ির সাহায্যে ঝুলাইয়া তাহাদের নৌকায় নামাইয়া দিতাম। আমরা দড়ি নামাইয়া দিলে তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফল তাহাতে বাঁধিয়া দিত। এই সমুদয় ফলের বিনিময়ে তাহারা ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যাইত।"

বারবোটা নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার প্রণীত "ইষ্ট আফ্রিকা ও মালাবার" (East Africa and Malabar) নামক গ্রন্থে সংক্ষেপে নিকোবার সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"সুমাত্রার পুরোভাগে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তথাকার জল অতি সুস্বাদু। এই দ্বীপগুলি উপযুক্ত বন্দরে পরিণত করা যাইতে পারে। এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র—তাদের নিকোন্‌বার বলে। ইহারা নানাবিধ সামগ্রী—প্রধানতঃ কাঠ এবং ফলমূলাদি—মালাক্কা এবং অপরাপর বন্দরে সরবরাহ করিয়া থাকে।"

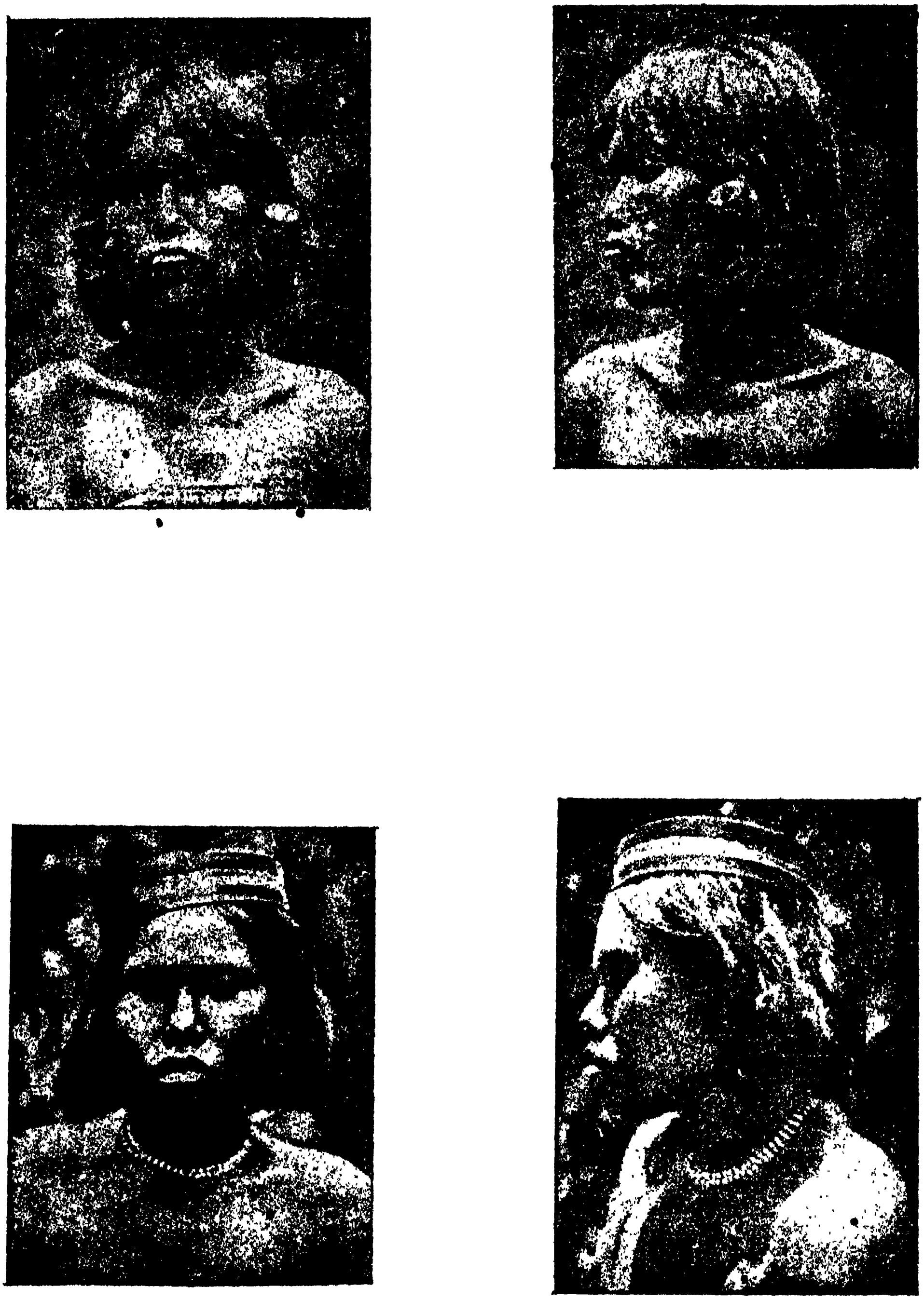
আর্কটিক প্রদক্ষিণকারী ক্যাপ্টেন জন ডেভিস্ খৃষ্টীয় ১৫৯৯ অব্দে একবার এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "নিকোবার দ্বীপের অধিবাসীরা বহু কমলালেবু ও অন্যান্য ফল এবং মুরগী ইত্যাদি আমাদিগকে দিয়াছিল। এই সকল জিনিসের বিনিময়ে আমরা তাহাদের নিজের ব্যবহার করিবার ও টেবিল প্রভৃতি ঢাকিবার জন্য ছেঁড়া কাপড় দিয়াছিলাম। এখানকার জমিগুলি নীচু, কিন্তু এ অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল জন্মে। এ প্রদেশের অধিবাসীরা ফল এবং মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। এখানকার মাঠে কোন প্রকার "সার" দেওয়া হয় না; অথবা কেহ চাষ আবাদও করে না।"

রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে সার জেমস্ ল্যাঙ্কষ্টার বহুবার এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী মিষ্টার বার্কার বলেন, "১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমরা নিকোবার দ্বীপে গিয়াছিলাম। এখানকার অধিবাসীরা মুর জাতীয়। আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহারা নৌকা বোঝাই করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফল মূল এবং মুরগী আনিয়া দিয়াছিল।"

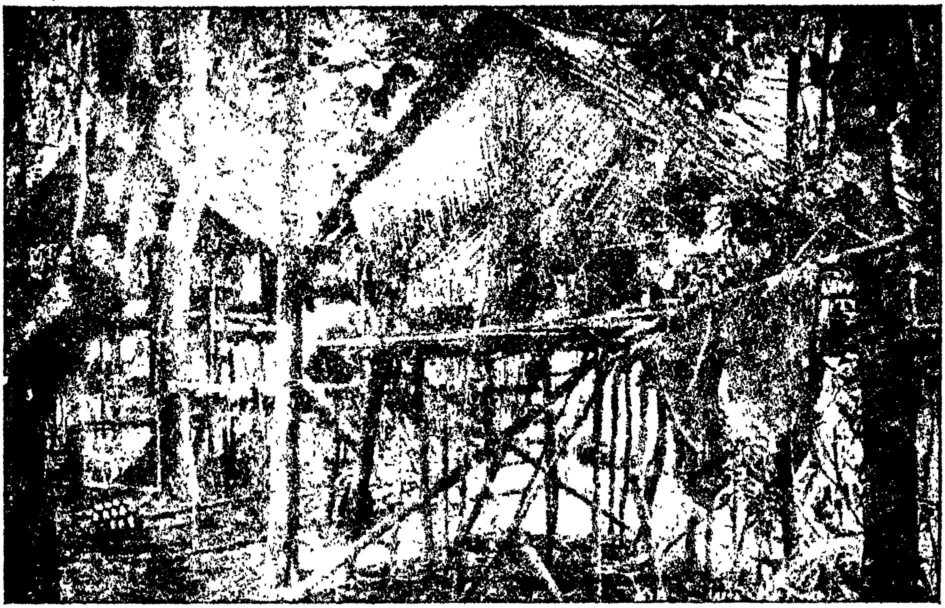
তাঁহার অপর এক সহযাত্রী ইহাদের সম্বন্ধে বলেন এদেশের অধিবাসীদিগের মুসলমান ধর্ম্ম।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুইডেন দেশীয় মিষ্টার কোপিং (Koeping) নামক এক ব্যক্তি নিকোবার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা একটু কৌতুকাবহ বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"জাহাজ হইতে এখানকার অধিবাসীদের দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বুঝি ইহাদের লেজ আছে।



শোমপেঁ জাতীয় রমণীগণ



শোমপেঁদিগের বাস-কুটীর

উহারা ঠিক বিড়ালের মতই লেজ নাড়িতেছিল। যাহা হউক, তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়াই যে আমার ঐরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, পরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কারণ তাহাদের পরিচ্ছদের কিয়দংশ লেজের অনুকরণে পশ্চাদ্‌ভাগে ঝুলাইয়া রাখে এবং সেটি উহারা বিড়ালের মত এদিক ওদিক নাড়িতে চাড়িতে পারে।

"নিকোবারের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমি যে জাহাজে ছিলাম, সেই জাহাজ হইতে যে পাঁচজন লোক প্রয়োজনবশতঃ তীরে নামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনও আর ফিরিয়া আসে নাই। দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিন তাহাদের অস্থি ও পঞ্জরাবশেষ উক্ত তীরভূমিতেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংরাজ বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্যোপলক্ষে নিকোবার দ্বীপগুলিতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরাজ বণিকদিগের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে ক্রমে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সভ্য আদব কায়দা দেখা যাইতে লাগিল।

শোমপেঁদের সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা আমাদের বলিবার আছে। তাহাদের আকৃতি ও গঠনের কথা ইতঃপূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাদের বাস ভবনের কথা সংক্ষেপে কিছু বলিব। সাধারণতঃ ইহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যেই বসবাস করে। এই কুটীরগুলি নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ সাজানো গোছানো এবং পরিচ্ছন্ন কুটীরও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, খুব সামান্য রকমের পর্ণকুটীরও আবার তেমনি দেখা যায়। কুটীরগুলি মেঝ নামক একপ্রকার কাঠ দিয়া তৈয়ারি, উপরিভাগে নারিকেল পাতার ছাউনি। আবার নারিকেল বৃক্ষে কাঠের মাচা বাঁধিয়া কখন কখন তাহাতেও বাস করিয়া থাকে।

বাগান বাগিচার দিকে শোমপেঁদিগের খুব সখ ও ঝোঁক আছে। সেই সকল বাগানে তাহারা কলা নারিকেল প্রভৃতি গাছ রোপণ করে। ফলবৃক্ষের চাষ ইহারা প্রচুর পরিমাণেই করিয়া থাকে। ইহারা

কুকুর, বিড়াল, শূকর মুরগী প্রভৃতি পশুপক্ষী পালন করে; জঙ্গল হইতে ইহাদের শাবক অবস্থায় ধরিয়া আনে এবং ক্রমে যত্নের সহিত তাঁহাদের পোষ মানায়।

খুব অল্প জিনিসই এ দেশে উৎপন্ন হয়। ইহারা নৌকা তৈয়ার করিতে জানে এবং বড় বড় কাঠ দিয়া খুব ধারালো বর্শা প্রস্তুত করিয়া থাকে। তা ছাড়া ঝুড়ী এবং একপ্রকার গাছের ছাল হইতে এক রকম মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। শোমপেঁরা তাম্বুল ব্যবহারের খুব অনুরাগী।

নিকোবারীদের সহিত যাহাদের সদ্ভাব আছে, তাহাদের সঙ্গে তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতি বৈরভাব পোষণ করে, সুবিধা পাইলেই তাহাদের আক্রমণ করে, এমন কি হত্যা করিয়া লুঠ তরাজ করিতেও কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না।

শোমপেঁদিগের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়—তাহাদের মধ্যে শিশু কিংবা বৃদ্ধ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দশ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ে অথবা পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা কখন বিদেশীদের নিকট উপস্থিত হয় না।

জল সম্বন্ধে ইঁহারা কোনরূপ বাছ-বিচার করে না। অর্থাৎ কর্দ্দমাক্ত জলই হউক, বা যে কোন জলই হউক, অবাধে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় এখানে শ্লীপদ এবং দদ্রুরোগের প্রাদুর্ভাব অধিক দৃষ্ট হয়।

ইহাদের সকলের ভাষা একরূপ নয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্নরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।*

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

* C. Boden Kloss প্রণীত In the Andamans and Nicobars নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

মনের বনে

দাও গো দেখা আজকে সখা
গহন মনের বনপথে
বনমালি!
বনবিহারী তোমার তরে
জীবন জুড়ে বনের তরু-
বল্লী পালি॥
দুঃখশোকের বকুল তমাল
শাখে শাখে,
নিবিড় তমঃ দিন দুপুরেও
আট্‌কে থাকে
পিয়াল তলে ভয়াল রবে
শিয়াল ডাকে
অমঙ্গলটা রটায় খালি॥

কণ্ঠ-পথে কথায় কথায়
লতায় লতায় কাঁটায় কাঁটায়
জড়াজড়ি।
শুষ্ক ব্যথার মর্ম্মরিত
পাতায় পাতায় ঝরা ফুলের
ছড়াছড়ি।
জীর্ণ মম পাঁজর ফাঁকের
বাঁকে বাঁকে,
স্মৃতির ঝিঁঝিঁ ঝাঁঝর বাজায়
ঝাঁকে ঝাঁকে,
বসে আছি তোমার লাগি
আকুল আঁখে
শীর্ণ আশার জোনাক জ্বালি॥

শ্রীকালিদাস রায়।

আলোচনা

"কালিদাসের নাটকে বিহঙ্গ পরিচয়।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কয়েকটি পাখী সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। আমার রচিত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি তাঁহার মত পক্ষিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যে ধৈর্য্যসহকারে আগাগোড়া পাঠ করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে তাঁহার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগিয়াছে, ইহা আরও আহ্লাদের বিষয়।

প্রথমেই গৃধ্রের কথা উঠিয়াছে। গৃধ্র সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—(১) গৃধ্র প্রায়ই শৈলশিখরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। (২) কতকগুলা জাতি বৃক্ষশাখায় নীড় রচনা করে। পুনশ্চ, ইহারা সকলেই সাধারণতঃ কোনও বৃক্ষে যে বাসা নির্ম্মাণ করে এমন নহে; প্রায়ই তাহারা পার্ব্বত্য স্থানে থাকিতে ভালবাসে। অতএব আমি নিবাসবৃক্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সতর্কতার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে,আমার মনে হয় যে যখন মহাকবি নিবাসবৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন তখন বোধ হয় পাখীটা পার্ব্বত্য জাতীয় নহে; আর বৃক্ষাগ্রে নীড় রচনা না করিলেও, সেখানে সম্ভবতঃ তাহার roosting অভ্যাসের দরুণ বৃক্ষটিকে তার নিবাসবৃক্ষ বলা হইয়াছে। এইখানে প্রশ্নকর্ত্তা সেন মহাশয় বলিতে চাহেন যে, কোনও কোনও গ্রামে বৃক্ষাগ্রে গৃধ্ররচিত নীড় যখন দেখা যায়, তখন নিবাসবৃক্ষ কেবলমাত্র roosting place ধরিয়া লইব কেন? গাছের উপর যে শকুনির বাসা হয় না একথা অবশ্যই আমি বলি নাই; তবে কেন আমি নিবাসবৃক্ষ অর্থে roosting placeএর দিকে ঝোঁক করিলাম তাহা একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক;—কারণ সমালোচক মহাশয়ের সঙ্গে গৃধ্রের বৃক্ষাগ্রে নীড়-রচনা সম্বন্ধে আমার মতদ্বৈধ নাই। মহাকবির নাটকের মধ্যে যখন সহসা গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষের কথা আসিয়া পড়িল, তখন উক্ত বৃক্ষকে গৃধ্রের নীড়াধার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দিক হইতে এই প্রশ্ন প্রথমেই আসিয়া পড়ে যে, যে ঋতুকে 'background করিয়া নাটকবর্ণিত কোনও বিশিষ্ট ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে সে ঋতুতে Vulturidæ শ্রেণীর কোনও পাখীর বৃক্ষাগ্রে nidification বা নীড়রচনা সম্ভবপর কি না? দেখা যাইতেছে যে গৃধ্রনিবাসবৃক্ষপ্রসঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব;—বিকৃতমস্তিষ্ক রাজা পুরূরবা মাথার উপরে ঘনঘটা দেখিয়া মনে করিতেছেন যে বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার মাথার উপরে রাজছত্র ধরিয়াছেন,—

> বিদ্যুল্লেখা কনকরুচিরং শ্রীবিতানং মমাভ্রং
> ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্ম্মঞ্জরীচামরাণি।
> ঘর্ম্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
> ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ॥

আকাশের বিদ্যুল্লেখাসমন্বিত কনকরুচির মেঘ আমার মাথার উপরে রাজছত্রের মত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, কম্পমান নিচুলতরুর মঞ্জরী চামর ব্যজন করিতেছে, নীলকণ্ঠ ময়ূর সুস্বরে আমার বন্দনা গান করিতেছে।'

এখন ইহারই কিছু পরে যদি গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষের অন্বেষণে বাহির হইতে হয়, তাহা হইলে গৃধ্রের roosting place ব্যতীত আমরা আর কিছু দেখিতে পাইব কি? Vulturidæ শ্রেণীর প্রায় সকল পাখী শীতকালে অর্থাৎ পৌষ মাসের মধ্যে আরম্ভ করিয়া, নাগাইৎ চৈত্রের শেষ অথবা কোন কোন স্থলে বৈশাখের প্রারম্ভের মধ্যে স্বরচিত নীড়ে ডিম্বপ্রসব শাবকোৎপাদন ইত্যাদি গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম্ম শেষ করিয়া থাকে। তাহার পর বর্ষাকালে কোনও বৃক্ষ শকুনির nesting place হইতে পারে না, কিন্তু roosting place হইতে পারে। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাব করিয়া আমি নিবাসবৃক্ষ অর্থে roosting place সমীচীন বিবেচনা করি। কেহ যেন মনে না করেন যে কাউয়েল (E. B. Cowell) সাহেবের অনুবাদে roosting place আছে বলিয়া আমি তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ঋতুবিশেষে গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষ বা nesting place থাকিলেও, কবিবর্ণিত ব্যাপারের সময় নিশ্চয়ই গ্রামপ্রান্তে কোনও বৃক্ষ হয়ত দলবদ্ধ শকুনির roosting place ছিল। তাহাই কবিবর্ণিত নিবাসবৃক্ষ। এই নিবাসবৃক্ষের নিকটে যে ভাগাড় থাকা চাই, নহিলে ইহার উপর শকুনির নিত্য আসিয়া বসা সম্ভবপর নয়, সেন মহাশয়ের এই অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। এই যোজন-দৃষ্টি বিহঙ্গ যেখানেই মৃত পশু দেখিতে পায়, প্রান্তরেই হউক, অথবা নদীবক্ষেই হউক, মানববাসের সন্নিকটে অথবা দূরে হইলেও কিছু আসিয়া যায় না, সেইখানেই সে ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক বালুতটে পক্ষ বিস্তার করিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে

বিশ্রামের পর তাহার অভ্যস্ত নিবাসবৃক্ষের উপর নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন করিয়া খাদ্য পরিপাক করে ও নিদ্রা যায়। এ সময়ে সে মোটেই পক্ষবিস্তার করিয়া থাকে না, তাহার শিরোদেশ সঙ্কুচিত ও পুচ্ছ শিথিল ভাবে নত হইয়া পড়ে, মোটের উপর সে তাহার সমস্ত দেহ কোঁকড়াইয়া গুটিয়া সুটিয়া সুদীর্ঘকাল (প্রায় ১৭।১৮ ঘণ্টা) নিদ্রায় অতিবাহিত করে। জনৈক বিদেশী পক্ষি-তত্ত্বজ্ঞ ভারতবর্ষের শকুনিপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"The toils of the day completed, they go in search of water, and, after preening themselves, lie down to roll in the sand and bask in the sunshine; this performance over, they retire to THEIR SLEEPING PLACE IN A TREE, where they perch bolt upright, with head drawn in, and tail hanging loosely down, until a late hour in the following morning. So large an amount of rest do these Vultures require, that they do not commence the duties of the day until about ten o' clock, and seldom SEEK FOR FOOD after about four or five in the afternoon." (১)

যে বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া গৃধ্র প্রায় দিনরাত roost করে, তাহাকে নিবাসবৃক্ষ বলিলে roosting place বুঝিতে হইবে বৈকি।

কুররীপ্রসঙ্গে সেন মহাশয় প্রথমতঃ দুইটি মৎস্যাশী প্রসহ বিহঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। যেটিকে তিনি শ্বেতগ্রীব বাজ বলিতেছেন, যাহার কণ্ঠস্বর ঠিক যেন অঃ-অঃ-অহহঃ, তাহা সম্ভবতঃ Polioætus শ্রেণীভুক্ত পক্ষিবিশেষ। এই জাতীয় পাখীর গ্রীবা সম্পূর্ণ শুভ্র না হইলেও "ashy grey with more or less distinct whitish shaft-stripes"। ইহার কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে মিঃ লেগ্‌ বলেন—

"It is a deep resounding call or shout...... repeated three or four times, and somewhat resembles the monosyllables KOOW, KOOW."

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ospreyর সহিত ইহার কতকটা আকারগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তবুও কেন আমি osprey পাখী-কেই কুরর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। আর একটি পাখীর কিঞ্চিৎ বিবরণ সেন মহাশয় দিয়াছেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহা osprey হইতে পারে না, ডিম্বের বর্ণ সম্পূর্ণ পৃথক। osprey পাখীর ডিম বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। আলোচ্য পাখীটির ডিম কিন্তু নিছক সাদা, বর্ণনা পড়িলে মনে হয় যেন ঠিক Haliætus পক্ষিবিশেষের ডিম, যাহার বর্ণনা এই-রূপ লিপিবদ্ধ আছে—

"The eggs are nearly always two in number but sometimes only one......they are dull white and vary in shape......the shell is tolerably rough" (২) কিন্তু ইহাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ, মিঃ ডেওয়ার বলেন, loud resonant but unmelodious। (৩) বোধ হয় সমালোচক মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই যে এই Haliaetus পাখী ospreyর মত মৎস্যাশী নহে, অথচ প্রবত্বলক্ষণাক্রান্ত না হইলে কিছুতেই তাহাকে কুরর বলা যাইতে পারে না। ডেওয়ার বলেন—

"It does not indulge much in the piscatorial art (প্রবত্ব); it prefers to obtain its food by robbing ospreys, kites, marsh-harriers and other birds weaker than itself." (প্রসহ)। (৪)

এই প্রসহ পাখীটি হংসাশী। কুররের যতদূর আভিধানিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার মধ্যে প্রবত্ব ও প্রসহত্ব বিশেষভাবে প্রকট। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি osprey পাখীকে কুররী বলিয়া স্থির করিয়াছি। কণ্ঠস্বরের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কিন্তু আর একটা পাখীর কণ্ঠস্বরের উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ বলিয়া রাখি যে, আমি ইচ্ছা করিয়াই "কোকিলবর্গ" শব্দ ব্যবহার করি নাই, পরভৃত শব্দটি ও তাহার কয়েকটি নামান্তর (যথা অন্যভৃত, পরপুষ্ট) পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছি—কারণ সমগ্র কোকিল জাতিকে বাঙ্গলায় কোকিলবর্গ বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় কিছু বাধা আছে। সমালোচক মহাশয়ের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, Phœnicophainae এবং Cuculinae মোটামুটি এই দুই শ্রেণী লইয়া Cuculidae বা Cuckoo জাতি গঠিত হইয়াছে, ইহা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে Cuculinæ পাখী

১। Cassell's Book of Birds (from the Text of Dr. Brehm) Vol. II, p. 77.

২। Legg's History of the Birds of Ceylon.

৩। A Bird Calendar for Northern India.

৪। Ibid, p. 12.

বিশেষভাবে পরনির্ভর ; কিন্তু Phœnicophainae পাখীদের মধ্যে কেবল Eudynamis honorata বা কোকিল ব্যতীত অপর সমস্ত পক্ষী সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভর। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকের মতে কোকিলের পরনির্ভরতা (Parasitism) Cuculinae পাখীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে প্রবল নহে। মিঃ ফ্র্যাঙ্ক ফিন্ ইহাকে incomplete parasitism বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৫) এই নিমিত্ত যে শ্রেণীর পাখীর parasitic instinct আংশিকভাবে প্রকট অথবা আদৌ দেখা যায় না, সেই শ্রেণীকে অথবা উহার অন্তর্ভুক্ত কোনও বিশিষ্ট পাখীকে উপলক্ষ্য করিয়া, বাঙ্গালীর পরিচিত সঙ্কীর্ণার্থ কোকিল শব্দ ব্যবহার করিয়া সমগ্র পরভৃতবর্গকে কোকিলবর্গ বলিতে আমি রাজী নহি ; এবং কোকিলবর্গ শব্দ ব্যবহার করি নাই বলিয়া আমার আদৌ আশঙ্কা হয় নাই যে বাঙ্গালী পাঠক কোকিল বলিতে পাপিয়া বুঝিবে। আমি তাহা বুঝাইতে চাহিও না। কে বলিল যে Endynamis honorataকে ইংরাজেরা Brain-fever bird বলেন না ?

Kool প্রসঙ্গে মিঃ ফ্র্যাঙ্ক ফিন্ বলিতেছেন,—

"Unfortunately the bird insists on calling at night as well as by day, and is rather apt at all times to be 'instant out of season'; whence many Europeans call him the Brain-fever Bird." (৬)

কাক ও কোকিল সম্বন্ধে সেন মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। দেখিতেছি যে ঠিক সেই রকমই প্রশ্ন কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে ডগলস্ ডেওয়ারের মনে উদিত হইয়াছিল এবং যতদূর সম্ভব তাহার সদুত্তর প্রদানে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন (৭)—সেই প্রবল-দুর্ব্বল সমস্যা, সেই sensitiveness of the back, সেই অগ্র-পশ্চাৎ ডিম ফুটা। অতএব আমার কায কিছু হাল্কা হইয়া গিয়াছে, কারণ কয়েকটি ছত্র মিঃ ডেওয়ারের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

(ক) "I consider it proven that the Koel undoubtedly destroys or tries to destroy some of the Crow's eggs it finds in the nest. My idea is that, given the opportunity, the Koel will destroy all the Crow's eggs."

(খ) "I may add that there is no hollow in the back of the Koel nestling, and that it does not appear to be sensitive when brought into contact with a foreign body."

(গ) The Koel's egg hatches out more quickly than that of the Crow, and I may here say that in all the nests I have examined where there are both Crow's eggs and a Koel's egg, the last has invariably been the first to hatch out."

সেন মহাশয়ের প্রত্যক্ষীভূত কোকিলডিম্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক এখন এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কোনও সাধারণ নিয়ম আছে একথা বলা খাটে না। সদ্য-প্রসূত কোকিলডিম্ব হইতে যে পুরাতন কাকডিম্ব অপেক্ষা আগে শাবক বাহির হইবে একথা সব সময়ে চলে এমন বোধ হয় আমার প্রবন্ধ পড়িয়া কেহ বুঝিবেন না। তবে একই সময়ে প্রসূত কাকডিম্ব ও কোকিলডিম্ব পর্য্যবেক্ষণ করিলে যাহা দেখা যায়, তাহা মিঃ ডেওয়ারের উল্লিখিত উক্তিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু পক্ষিতত্ত্ববিৎ ডেওয়ার অস্মদ্দেশীয় কোকিল সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর বোধ হয় পান নাই, যতদূর চেষ্টা তিনি করিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তিনি কোকিলশাবকের পৃষ্ঠদেশ ও হিংস্র স্বভাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি সেন মহাশয় তাহাই সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইয়া এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন,—কোকিলের ছানা কাকের ছানাকে নীড়চ্যুত করে ইহাই কি সাধারণ নিয়ম, না সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ? পাখীর পৃষ্ঠের ত্বক্ sensitive না হইলে যে অন্য পাখীর ছানাকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া অথবা স্পর্শমাত্রই ফেলিয়া দিবার অন্য কোনও কারণ থাকে না এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা অবৈজ্ঞানিক, কারণ পাখীর যদি প্রকৃতিগত এইরূপ হিংস্র instinct বা সহজসংস্কার থাকে, তাহা হইলে অন্য কোনও কারণ অন্বেষণ করিবার দরকার হয় না। মূল প্রবন্ধে আমি পরভৃততত্ত্বের কথায় পাখীর সহজ সংস্কার সম্বন্ধে কোনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই ; যদিও অন্যত্র প্রসঙ্গতঃ instinct লইয়া আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। এবং এই instinctএর বশবর্ত্তী হইয়া কাকের বাসা হইতে কোকিল-শিশু কাকের ছানাকে নীড়চ্যুত

৫। Bird Behaviour, by Frank Finn, p. 192.

৬। Garden and Aviary Birds of India, p. 150.

৭। An enquiry into the Parasitic Habits of the Indian Koel.—Journal, Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. XVII, pp. 765—782.

করে। ইহা এত সাধারণ ব্যাপার যে ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন—"The Crows bring up the Koel, which at times, at all events, ejects the young Crows after they are hatched." (৮) মিঃ হিউম এবং মিঃ ওট্‌স্‌ সম্পাদিত The Nest and Eggs of Indian Birds নামক গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—"The young Crows that are got rid of, probably by the young Cuckoo; I have found the latter in a nest with three young Crows all freshly hatched, and a week later have found the young Crows 'missing' and the young Cuckoo thriving."

কাপ্তেন হ্যারিংটন্‌ বলেন—"In March 1903 I got two Magpies' nests; one containing three magpies' and two koel's eggs, the other five magpies' and one koel's egg: in the latter case the magpies' eggs were practically fresh (no traces of blood), while the koel's egg was well incubated, the young bird being well developed, showing that the koel's eggs must hatch out well before the foster-parent's eggs, thus giving the young koel a better chance of kicking out his young foster brothers and sisters".(৯) কিন্তু তাই বলিয়া যে কোকিলের ও কাকের ছানা একত্র কাকের বাসায় থাকিতে দেখা যায় না, তাহা নহে। সাধারণ পাখীর পক্ষে এ রকম থাকাটা যে মোটেই আশ্চর্য্যজনক নহে, বরং না থাকাটাই যে বিস্ময়জনক তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আবার যদি পরের ছানা পালকের শিশুকে নীড়চ্যুত করিয়া তাহাদের বাসা দখল করিয়া বসে, তাহা আরও বিস্ময়জনক। এইজন্য আমি পরভৃতচিত্রে পুষ্কিচরিত্রের এই অংশটার উপর কিছু বেশী করিয়া রং ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছি, অথচ সমগ্র চিত্রটি যাহাতে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে না হয়, সতর্কতা সহকারে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এই একত্রে থাকা ও না থাকা উভয়ই সত্য। ইহার মধ্যে কোন্‌টা নিয়ম আর কোনটা নিয়মের ব্যতিক্রম তাহা লইয়া বাদানুবাদ নিষ্ফল।

সেন মহাশয় শালিকের বাসায় কোকিলের ডিম পাইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ইংলিস (Chas. M. Inglis)ও শালিকের বাসায় কোকিলের ডিম পাইয়া এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"I personally superintended the taking of a Myna's (A-tristis) nest which contained three mynas eggs and one of the koel......it is, I believe, the first time that this has been noted, and it appears to me to be worthy of record." (১০)

অন্যেঃ পুষ্ট পোষয়ন্তি বুঝাইবার সময় আমি শালিকের কথা পাড়ি নাই; কৃষ্ণগোকুলের (oriole) কথাও (১১) তুলি নাই—এই সকল পাখীর নাম করিয়া ক্রমাগত দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া আমার প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহি নাই। যতটুকু বলিলে কবিবরের অন্যৈঃ শব্দের তাৎপর্য্য বুঝান যায়, ততটুকু বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।

সমালোচক মহাশয় fountain-pen fillerএর প্রসঙ্গ না তুলিলেই ভাল করিতেন। তাহার সাহায্যে কোনও উপায়ে যে ডিম্ব রক্ষা করিবার জন্য drill যন্ত্রের মত ছিদ্র করা চলে না, ইহা বুঝিয়াই দেখিতেছি তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন।

"বাঙ্গালীর পরিচিত কোন্‌ জাতীয় কোকিল" সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়া বৈজ্ঞানিক কিছু ধাঁধায় পড়িয়া যাইবেন; অর্থ ঠিক করা শক্ত, তবে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে টুনটুনির বাসায় পরভৃত ডিম্ব পাড়ে। যথা, ক্যানারায় মিঃ বেল্‌ (T. R. Bell) ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—"I have several eggs of Cacomantis passerinus (The Indian Plaintive Cuckoo), I have seen Orthotomus feeding young Cacomantis a fair number of times, and about the eggs of this Cuckoo being ordinarily laid in Tailor-birds' nests I have not the slightest doubt."(১২) মিঃ ডেভিডসন্‌

৮। Fauna of British India, Birds Vol. III, p. 230.

৯। Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XV, p. 520.

১০। Ibid, Vol. XVIII, p. 682.

১১। Journal, Bomb. Nat. Hist. Soc., Vol. XIII, p 629.

১২। Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XVII, p. 372.

(J. Davidson, C. S.) লিখিয়াছেন—"I have eggs of this Cuckoo taken at Karwar.........All were taken in the nests of O. Sutorias (The Indian Tailor Bird). (১৩) কাছাড়ে (North Cachar) মিঃ ই, স্টার্ট বেকার Emerald Cuckooর ডিম টুনটুনীর বাসা হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন—"I took another egg which I believe is an Emerald Cuckoo's.........I found it in a nest of O. Sutorius together with three eggs of the owner. (১৪) Cacomantis বা Plaintive Cuckoo সম্বন্ধে ইনিই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"Normally the bird in the South of India, Belgaum and Kanara, where it is most common, and also in the Nilghiris, lays its eggs in the nests of the Fan-tail Warbler, the Common tailor-bird and the Indian Wren Warbler. (১৫) পুনশ্চ, Cuculus Canorus পাখী যে সকল পাখীর বাসায় ডিম রাখে, তাহাদের যে তালিকা বেকার সাহেব দিয়াছেন, তন্মধ্যে টুনটুনি পাখীর ডিম দিতেন তিনি ভুলেন নাই। অলমতিবিস্তরেণ—

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

১৩। Ibid.

১৪। Ibid p. 686.

১৫। Ibid p. 891.

পতিতা

হের ওই পথ বাহি চলে' যায় দীনা ভিখারিণী;
ধনীর প্রমোদগৃহে একদিন ছিল বিলাসিনী,
যৌবন-সৌন্দর্য্য আর অধরের রঙ্গিমা যখন,
প্রস্ফুটিত গোলাপের সম ছিল চিত্তবিমোহন;
নর্ত্তনে মঞ্জীর যবে পায়ে তার জাগিত গুঞ্জরি';
ললিত লতিকা দেহে নবশোভা উঠিত মুঞ্জরি',
চঞ্চল কটাক্ষ মোহ ইন্দ্রজাল করিত বয়ন;
নন্দিত করিত তারে শত শত বিমুগ্ধ নয়ন।
জীবন যাপন তার হতেছিল যবে এই মতে,
কলঙ্ক-পসরা বহি শিশু এক এল এ মরতে
মাতৃপদে বরি তারে। ক্ষুণ্ণ হল নিটোল যৌবন;
লোকলাজ ছল করি ত্যজিল সে উপাসক-জন।
ঘৃণায় ভ্রুকুটি করি সমাজ সে ফিরাইল মুখ,
পুত্রপানে চাহি তার অনুতাপে পূর্ণ হল বুক।
ভুল সে যে কত বড়, পাপ সে যে কত গুরুভার
সংসারের নির্য্যাতন বুঝাইল পরিমাণ তার;
প্রায়শ্চিত্ত অভাগীর আরো কিছু ছিল যে গো বাকী—
একদিন শিশু তার মাতৃস্নেহে দিয়া গেল ফাঁকি।
সন্তান হারায়ে ও যে পাগলিনী সেইদিন হতে,
বিগত যৌবনরূপ, ফেরে নগরের পথে পথে।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

কামনা

আমারে করিও, প্রভু, কাননের ফুল
পূজিতে তোমার ওই রাতুল চরণ।
প্রভাতে ফুটিয়া উঠি সৌরভে আকুল,—
ধরণীর স্নিগ্ধ বক্ষে সন্ধ্যায় মরণ।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

মহাভারতে বাহুপত্য বিবাহ

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ভিণ্টেরনিট্‌স্ মহাভারতের আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (১) এই প্রবন্ধে লেখক মহাভারত-বর্ণিত নিয়োগ, যৌথ পরিবার ও বাহুপত্য বিবাহ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদীর বাহুপত্য বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন :—

"To sum up, we have three different stories intended to explain the polyandric marriage : (1) the story of Kunti who said, May ye all enjoy it together ; (2) the story of the five Indras ; (3) the story of the maiden who said five times, Give me a husband......

The conclusion seems inevitable that the original Mahabharata related the polyandric marriage as a fact without any attempt at explaining it away." (২)

দ্রৌপদীর বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সে সিদ্ধান্ত মোটের উপর পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল হইলেও সমস্ত বিষয়ে আমি ভিণ্টেরনিট্‌সের সহিত একমত হইতে পারিতেছিনা। অপর পক্ষে ভিণ্টের নিট্‌স্ প্রদর্শিত যুক্তিগুলি ব্যতীত মহাভারতে বর্ণিত আরও এমন দুই একটী ঘটনা আছে, যেগুলির সাহায্যে ভিণ্টেরনিট্‌সের শেষ সিদ্ধান্ত আরও সমর্থিত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপরে যে তিনটি প্রক্ষিপ্ত বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমেই প্রথমটির কথাই আলোচনা করিতে চাই, কারণ সাধারণ লোকের মনে বিশ্বাস যে কুন্তীর আদেশই এই বাহুপত্য বিবাহের প্রধান কারণ। (৩) মহাভারতে লিখিত আছে :—

কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ
প্রোবাচ ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে।

ভিণ্টেরনিট্‌স বর্ণিত কারণগুলি ব্যতীত আরও অপর একটী কারণে এই বিষয়টী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। উপরের দুই পংক্তি পাঠে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, পাণ্ডবগণ ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হইত এবং তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা নিজে নিজের অন্ন প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল এক স্থানেই রক্ষিত হইত এবং আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া কুন্তীদেবী তাহা সন্তানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে :—

সায়ঞ্চ ভীমস্তু রিপুপ্রমাথী জিষ্ণুর্যমৌ চাপি মহানুভাবৌ।
ভৈক্ষং চরিত্বা তু যুধিষ্ঠিরায় নিবেদয়াঞ্চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ॥
ততস্তু কুন্তী দ্রুপদাত্মজাং তামুবাচ কালে বচনং বদান্যা।
ত্বমগ্রমাদায় কুরুষ ভদ্রে বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্ষাম্॥
যে চান্নমিচ্ছন্তি দদস্ব তেভ্যঃ পরিশ্রিতা যে পরিতো মনুষ্যাঃ।
ততশ্চ শেষং প্রবিভজ্য শীঘ্রমর্দ্ধং চতুর্দ্ধা মম চাত্মনশ্চ॥
অর্দ্ধন্তু ভীমায় চ দেহি ভদ্রে য এষ নাগর্ষভতুল্যরূপঃ।
গৌরো যুবা সাংহননোপপন্ন এষো হি বীরো বহুভুক্ সদৈব॥

---

(১) Journ. Ry. Asia. Soc. (১৮৯৭) ৭১৪-৭৫৩ পৃঃ। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বন্ধুদ্বয় আমাকে এই প্রবন্ধের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের উভয়ের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ।

(২) উক্ত প্রবন্ধ, ৭৫৩—৭৫৪ পৃঃ।

(৩) দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত আষাঢ় মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (৪৫২—৪৫৫ পৃঃ)।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল কি ভাবে প্রত্যহ ব্যয়িত হইত তাহা দেখা যাইতেছে এবং এইরূপ ব্যয়ই স্বাভাবিক। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তের সহিত লক্ষ্যভেদের অব্যবহিত পরে 'ভিক্ষা' সম্বন্ধে কুন্তীর প্রতি আরোপিত আদেশের মিল দেখা যায় না এবং ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত।

অতঃপর তৃতীয় প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইব। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে ব্যাসদেব পাণ্ডবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর কথাপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্তের বিষয় বিবৃত করিলেন ও বলিলেন :—

দ্রুপদস্য কুলে জজ্ঞে সা কন্যা দেবরূপিণী।
নির্দ্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা॥
পাঞ্চালনগরে তস্মান্নিবসধ্বং মহাবলাঃ।
সুখিনস্তামনুপ্রাপ্য ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ॥

মহাভারতে যাহা লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে ব্যাসের নিকট হইতে এই কথাগুলি শুনিয়া পুত্রগণ সহ কুন্তী পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল ও তাঁহারা ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। তৎপরে কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের দেখা হয় এবং সেই ব্রাহ্মণদের সহিত যুধিষ্ঠিরের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া ভিণ্টেরনিটস্ বলিয়াছেন—

"The whole chapter (excepting the first verse) has no sense unless we assume that the Pandavas knew nothing about the Svayambara and received the first intimation of it from the Brahmans." (৪)

ভিণ্টেরনিটসের সিদ্ধান্ত পড়িয়া মনে হয় যে, তাঁহার মতে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের বিষয় সর্ব্বপ্রথমে এই ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্যাস অথবা এই পথিক ব্রাহ্মণগণ ইহাদের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের বিষয় সর্ব্বপ্রথমে শ্রবণ করেন নাই; ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বেই অপর এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন:—

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে সহ কুন্ত্যা নরর্ষভাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে বিপ্রং কথয়ন্তঃ কথাঃ শুভাঃ॥
কথয়ামাস দেশাংশ্চ তীর্থানি সরিতস্তথা।
রাজ্ঞশ্চ বিবিধাশ্চর্য্যান্ দেশাংশ্চৈব পুরাণি চ॥
স তত্রাকথয়দ্বিপ্রঃ কথান্তে জনমেজয়।
পাঞ্চালেষ্বদ্ভুতাকারং যাজ্ঞসেন্যা স্বয়ম্বরং॥

ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিষয় পাণ্ডবগণ শ্রবণ করিলেন এবং

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌন্তেয়াঃ শল্যবিদ্ধা ইবাভবন্।
সর্ব্বে চাস্বস্থমনসো বভূবুস্তে মহাবলাঃ॥

তৎপরে পুত্রদিগকে 'তদ্গতচেতাঃ' দেখিয়া কুন্তী পাঞ্চালনগরে যাওয়া স্থির করিলেন এবং

তত আমন্ত্র্য তং বিপ্রং কুন্তী রাজন্ সুতৈঃ সহ।
প্রতস্থে নগরীং রম্যাং দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ॥

এই দুই পংক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে এবং ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়েই আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যাসদেব পাণ্ডবদের নিকটে আগমন করিয়াছেন, দ্রৌপদীর জন্ম বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন, পঞ্চপাণ্ডবকে এক পত্নী গ্রহণের জন্য উপদেশ দিয়াছেন ও বলিয়াছেন :—

পাঞ্চালনগরে তস্মান্নিবসধ্বং মহাবলাঃ।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিতে পারি :—

(ক) দ্রৌপদীর বর্ণনা শুনিয়া প্রত্যেক ভ্রাতার চিত্তই দ্রৌপদীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা 'শল্যবিদ্ধা' শব্দের কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

(খ) কুন্তী পুত্রদের এই অবস্থা বেশ বুঝিতে পারি-

(৪) উঃ প্রঃ ১৬৬ পৃঃ।

রাই পাঞ্চাল নগরে যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং 'সর্ব্বাংস্তদ্গতচেতসঃ' এই কথা দ্বারা ইহা বিশদভাবে সূচিত হইতেছে।

(গ) ব্যাস যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল নগরে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত 'প্রতস্থে নগরীং রম্যাং দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ' দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ব্যাসের সহিত দেখা হওয়ার পূর্ব্বেই মাতার সহিত পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল নগরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। "পাঞ্চাল নগরে তস্মান্নিবসধ্বং মহাবলাঃ"—ব্যাসের এই উপদেশ হইতে আমরা এই অর্থ করিতে পারি।

(ঘ) যে অধ্যায়ে পাণ্ডবদের সহিত ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে সেই অধ্যায়ের আরম্ভ এই ভাবে হইয়াছে—

বসৎসু তেষু প্রচ্ছন্নং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
আজগামাথ তান্ দ্রষ্টুং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন? পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজার নগরীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

(ঙ) যদি উপরিউক্ত কথাগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্বের উপাখ্যান ও পথিমধ্যে ব্রাহ্মণদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার বর্ণনা এই উভয়ই পরবর্ত্তী কালে মহাভারতে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় প্রক্ষিপ্ত নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনা পরম্পরার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি—

(ক) পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্রৌপদীর বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

(খ) মাতা পুত্রগণের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের সহিত পাঞ্চাল নগরে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(গ) এই সময়ে ব্যাস আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং ইহা অনুমানকরা নিতান্ত অন্যায় নহে যে, সেই সময়ে তিনি পঞ্চভ্রাতাই দ্রৌপদীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া, 'ভেদভয়াৎ' অর্থাৎ দ্রৌপদীর জন্য পরে ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভেদ হইতে পারে এই ভয়ে সকল ভ্রাতাকে এক পত্নী গ্রহণের উপদেশ দিয়াছিলেন। কুন্তীও নিশ্চয়ই সেই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতা অথবা ভ্রাতারা কেহই ব্যাসের কথাতে প্রতিবাদ করিলেন না। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভাগ করিয়া লওয়া ও সেই প্রসঙ্গান্তর্গত তৎপরবর্ত্তী ঘটনাগুলি প্রক্ষিপ্ত।

Goldstuckerএর মতে দ্রৌপদীর বিবাহের বিবরণ একটী 'real piece of history'। (৫) উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনা হইতেও আমরাও সেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি:—

(ক) লক্ষ্যভেদ হইয়া গেলে পর

বিধ্বস্ত লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা পার্থঞ্চ শক্রপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
আদায় শুক্লাম্বরমাল্যদাম জগাম কুন্তী সুতমুৎস্ময়ন্তী॥
স তামুপাদায় (৬) বিজিত্য রঙ্গে দ্বিজাতিভি-স্তৈরভিপূজ্যমানঃ।
রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্যকর্ম্মা পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ॥

(৫) Literary Remains, Vol II.

(৬) ৮ কালীপ্রসন্ন সিংহের মতানুসারে 'তামুপাদায়'= দ্রৌপদী-দত্ত মালা গ্রহণ পূর্ব্বক (অনুবাদ ১৫৩, পৃঃ বসুমতী সংস্করণ)। মহারাষ্ট্রীয় মহাভারতে এই কথার ব্যাখ্যা স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, 'ত্যানেং তিচা স্বীকার কেলা'। (১৭৮ পৃঃ) প্রতাপচন্দ্র রায়ের ইংরাজী অনুবাদে লিখিত হইয়াছে "having won Draupadi by his success." নির্ণয়সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত মহাভারতের যে অধ্যায়ে এই শ্লোকগুলি আছে, সেই অধ্যায়ের প্রারম্ভে উক্ত অধ্যায়ের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে অর্জ্জুন নিজকে অন্যান্য ভ্রাতার প্রতিভূস্বরূপ মনে করিয়া দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, রঙ্গ হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

(খ) পাণ্ডবগণের দ্রৌপদী লাভের বিষয় অবগত হওয়ার পর কৌরবদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য হস্তিনা-পুরে এক মন্ত্রণা-সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভাতে দুর্য্যোধন পঞ্চভ্রাতার মধ্যে ভেদ জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে পর কর্ণ বলিয়াছিলেন :—

পরস্পরেণ ভেদশ্চ নাধাতুং তেষু শক্যতে।
একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্॥
ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্তৃতা।
তঞ্চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা॥

(গ) যদি বাহুপত্য বিবাহ সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইত, তবে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই হস্তিনা নগরীতে যে মন্ত্রণা-সভা আহূত হইয়াছিল, সে সভাতে কেহই পঞ্চ ভ্রাতার এক পত্নী গ্রহণ সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া মতপ্রকাশ করেন নাই।

বাহুপত্য বিবাহ কৌরব বংশে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে পাঞ্চাল বংশেও প্রচলিত ছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিণ্টেরনিট্‌স্ পঞ্চেন্দ্রো-পাখ্যান প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই মত সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোনও বক্তব্য নাই। এই উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হইতেও পারে, বা না হইতেও পারে। কিন্তু লক্ষ্যভেদ সভাতে ব্যাসদেব উপস্থিত ছিলেন এবং দ্রৌপদীর বাহুপত্য বিবাহে দ্রুপদরাজের আপত্তি হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া বা বাহুপত্য বিবাহে দ্রুপদ-রাজের আপত্তি হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি দ্রুপদ রাজের সভাতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বাহুপত্য বিবাহ যে অন্যায় কার্য্য নহে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার উপদেশ শুনিয়াই দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্যার সহিত পঞ্চভ্রাতার বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছিলেন ইহা মনে করা অযৌক্তিক নহে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

লিখিত আছে, 'দ্রৌপদ্যা অর্জ্জুনকণ্ঠে মালা প্রক্ষেপঃ' (৩৪৫ পৃঃ)। কিন্তু এই মহাভারতে এই অধ্যায়ে কয়েকটী শ্লোক আছে যাঁহা অপর কোনও মহাভারতে দেখিতে পাইলাম না। সেই শ্লোক কয়েকটীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

গত্বা চ পশ্চাৎ প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা
পার্থস্য বক্ষস্য বিশঙ্কমানা।
ক্ষিপ্‌ত্বা স্রজং পার্থিববীরমধ্যে
বরায় বব্রে দ্বিজসঙ্ঘমধ্যে॥

'দাম' শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এই স্থলে 'দাম' শব্দ ক্লীব লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তাম্' কৃষ্ণাকে বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ঠিক হইলে 'তাম্' তদ্ (আর্ষ-প্রয়োগ)। এই স্থলে কাশীরাম দাস সম্পূর্ণভাবে মূল হইতে ভিন্ন বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে দেখিতে পাই—

হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।

আইবুড়ো

(গল্প)

সতীশের এক চিঠি পাইলাম, লিখিয়াছে সে শীঘ্রই তার ব্যবসা উপলক্ষে কাণপুরে আসিবে।

সতীশ আমার অনেক বছরের সতীর্থ ও বন্ধু। সে সবের স্মৃতি আমার মন হইতে কোন দিন অপসারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতাও অনেকদিন ধরিয়া ছিল না। কলেজ ছাড়িয়া আমি আইন ব্যবসায় ঢুকিয়াছিলাম; সেও একটা ব্যবসাই সুরু করিল, কিন্তু তাহা আইন লইয়া নয়, সত্যিকার ব্যবসা। তার পরও মাঝে মাঝে তাহার সহিত দেখা হইত, কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন যাবত তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাযেই সতীশ আসিতেছে শুনিয়া, অত্যন্ত খুসী হইলাম এবং আগ্রহের সহিত তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

* * * *

সারাদিন সতীশ কোথায় টোটো করিয়া ঘুরিয়াছে, দু'দণ্ড আমার সঙ্গে আলাপ করিবার ফুরসৎ ঘটে নাই। রাত্রিতে আহারের পর সে বলিল, "এস বারান্দায় বসে একটু গল্প করা যাক্‌। তুমি হয়ত আমাকে ভয়ঙ্কর কৃতঘ্ন ভেবেছিলে। কিন্তু জান, সারাদিনের ভিতর সব চাইতে যা ভাল সময়, সেইটুক তোমার সঙ্গে গল্প করবার জন্যে আমি ঠিক করে রেখেছি। কি কাযের চাপই যে আজ ছিল। মরবার অবসরটুকুও আমার ছিল না।"

বারান্দায় দুইটা ইজি চেয়ার দখল করিয়া আমরা বসিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প চলিল,—সে যে কত বিষয় লইয়া তার অন্ত নাই। দেখিলাম, সতীশ ঘন ঘন হাই তুলিতেছে। আমি বলিলাম, "সে হবে না। সারাদিন তোমার ব্যবসা ছিল, আর আমাকে আমলই দাও নি; তার শোধ এখন তুলব।"

সতীশ বলিল, "কিন্তু এসব বাজে বকুনি আর ভাল লাগে না, রসাল কিছু বল।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, রসালই এমন কিছু জিজ্ঞাসা করব, যাতে শুক্‌ন ডালে ফুল ফোটে।"

সে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "বেশ বেশ, তা হলে রাত্রি ভোর করে দিতে পারি। সে অভ্যাস যে এককালে ছিল. তা ত জান।...এইবার জিজ্ঞাসা করে ফেল, আজো ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবার লোকের পদার্পণ হল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞাসা করব। যৌবন-তরী ত চল্লিশের ঘাটে এসে ভিড়লো প্রায়। ব্যবসা করে চঞ্চলা লক্ষ্মীকেও ঘরে বেঁধেছ, কিন্তু সত্যিকার অচঞ্চলা লক্ষ্মীর আসন আজো শূন্য পড়ে কেন?"

সতীশ বলিল, "দেখ, তোমার কথার জবাব দেবার আগে একটা কথা বলে রাখছি,—যদিও আমি বিয়ে করিনি এবং করব কি না তারও ঠিক নেই, কিন্তু তাই বলে বয়স আমার চল্লিশ হতে যাবে কেন? সে কথা আমি কিছুতেই অম্লানবদনে মেনে নেব না।"

আমি বলিলাম, "তা যেন হল, কিন্তু তোমার কখন্ ফুরসৎ হবে, সেই জন্যে ত আর কালের ঘড়িটা বন্ধ থাক্‌বে না!"

"তা যদি এমন নাই থাকে, তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। দু-একটা ক্লাশ ডিঙিয়ে ডবল প্রমোশনের চেষ্টা করা যাবে।"

"না ভায়া, ওসব চিন্তা এখনি মাথায় ঢুকিও না, তার এখনো ঢের দেরি আছে। কিন্তু সত্যি তুমি ভেবেছ কি বল দেখি?"

"কিছু ভেবেছি বলে ত মনে হয় না। কিন্তু লোকে যে অত্যন্ত ভাবছে তার প্রমাণ প্রতিদিনই পাচ্ছি। জান,

এ পর্য্যন্ত অন্তত হাজার লোককে আমায় এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে।"

"তাদের কি জবাব দাও ?"

"তার কিছু ঠিক নেই ; সেও হাজার রকম।"

"যথা ?"

"এই যেমন কাউকে বলি, কেউ জুটিয়ে দেয় না ; কাউকে বা বলি, সময় পাইনি বা মনে ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব উত্তর শুনে কেউ সন্তুষ্ট হয় না।"

আমি বলিলাম, "আমিও যে সন্তুষ্ট হব না, সে সে কথা তোমাকে না বল্লেও বুঝতে পারছ। কলকাতায় যখন ছিলাম, তখন তোমার সেই প্রতিদিন বিকেলে ভবানীপুর যাওয়া, আমাদের একটা মিষ্টি আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু তখন তুমি এমনি গম্ভীর হয়ে উঠলে যে কিছুই বের করা গেল না। অনেক অনুরোধের পর নামটা শুধু তুমি বলেছিলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জানই ত নাম সম্বন্ধে আমার স্মরণ শক্তি বড্ড কম, তাই সে নামটা ভুলে গেছি।"

সতীশ বলিল, "নামটাই ভুলে গেলে ? যাও, তুমি কিছুতেই আমার বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নও।"

আমি বলিলাম, "সে একটা অপরাধ বটে, কিন্তু আমি ক্ষমার অধিকারী, কেন না আমার অনেক সময় আশঙ্কা হয়, কখন নিজেরই নাম ভুলে যাই। সে যাক। আমরা সবাই আশা করেছিলাম ব্যাপারটা মধুরেণ সমাপ্ত হবে। কিন্তু কেন যে হল না, সে খবর আর তুমি কিছু দাও নি। বল না শুনি তোমার সে সব ইতিহাস।"

সতীশ বলিল, "তুমি দেখছি আমাকে নিছক কাব্যের ভিতর টেনে নিয়ে চলেছ। সারাদিনের ব্যবসার ঝকমারির পর, রাত্রিতে অন্ধকারে বসে কাব্য আলোচনা যদিও নিতান্ত অশাস্ত্রীয়, তবু তুমি যদি শুনতে চাও, আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু ইতিহাস ত ওর বিশেষ কিছু নয়। সেই পুরাণো কথা।......এক ছিল রাজা, সুখে শান্তিতে রাজপুরীতে বসে সে রাজ্য পালন করত, এমন সময় এক বিদেশী শত্রু রাজ্যের দ্বারে এসে উপস্থিত। সে তার রাজ্য রাজপুরী সব দখল করতে চায়। রাজা তখন যুদ্ধং দেহি বলে' শত্রুর সম্মুখীন হল। কিন্তু দুদিনেই সে দেখতে পেলে তার সঙ্গে যুদ্ধ চলে না, অন্তত সেটা বিধেয় নয়। আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ করে' সমস্ত বীরদের কথা তার মনে হল ; সে দেখলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটা শুধু প্রাচীন নয়, সত্যও বটে। কাযেই সে বুদ্ধিমান লক্ষ্মণসেনের মত রাজ্য ও রাজপুরীর মায়া কাটিয়ে নিজের প্রাণ ও মান বাঁচালে, কেন না রাজাই বল আর যাই বল, মানুষ নিজের চাইতে বেশী আর কিছুকেই ভালবাসে না।"

আমি বলিলাম, "দেখ ভায়া, তোমার ওসব অলঙ্কার রেখে সোজা বাঙলায় কথা বল। আইনের ব্যবসা করি, কাব্যের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা নেই। সোজা করে ঘটনাটা বলতে ত আর কিছু আপত্তি নেই ? বিশেষতঃ যখন এত দিন হয়ে গেছে।"

সতীশ একটু গম্ভীর গলায় বলিল, "না, আপত্তির কিছু থাকতে পারে না ; কিন্তু ঘটনা কিছুই নেই এর ভিতর। ......তাকে আমি অত্যন্তই ভালবাসতাম।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "বাসতাম বোলো না। যেহেতু তুমি তাকে ভালবাসতে, এখনো তাকে ভালবাস।"

সতীশ বলিল, "না, ঐখানে তোমার ভুল। আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম, কিন্তু এখন বাসি না। কিন্তু তুমি যদি তর্ক করতে চাও, তবে ঘটনা বলে কায নেই, তর্কই কর।"

আমি বলিলাম, "দোহাই তোমার, তুমি বলে যাও, আমি আর কিছু বলব না।"

সতীশ তখন বলিতে লাগিল, "আমি যে তাকে কি রকম ভালবাসতাম, তা তুমি বুঝবে কি না জানি নে। ভালবাসাকে ভয়ঙ্কর বল্লে যদি কিছু বোঝা তবে তাই। মাঝে মাঝে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম এই দেখে যে এত গভীর ভাবে

ভালবাসবার ক্ষমতা আমার আছে। খাঁটি ভালবাসার রূপ সবখানেই এক রকম; তা আর বুঝিয়ে কি বলব? সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব আমি ভুলে যেতাম। ভালবাসার আর এক নাম পূজা। দেহি পদপল্লবমুদারম্" আজকাল তোমাদের কাছে বিদ্রূপের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ও যে কতখানি গভীর ভালবাসার প্রকাশ, তা আমি জানি। সে সামনে একটা উঁচু চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসত, আর আমি নীচু একটা ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে গল্প করে যেতাম। ভালবাসা নিয়েই বা কত আলোচনা হত,—তখন মনে হত, তার শুধু ঐ ছোট্ট পা দুখানি দু হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারলে কতই না শান্তি পাওয়া যাবে। আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠত তার শুধু ঐ পা দুখানার স্পর্শ লাভের জন্যে। এমনি করে' কিছুদিন গেল। আর একটি ভদ্রলোক সে পরিবারে প্রবেশলাভ করলেন। প্রথম হতেই মন আমার ঈর্ষায় জলে উঠল। হিন্দু নীতিবিদ্‌গণ মাৎসর্য্যের স্থান দিয়েছেন ষড়রিপুর সর্ব্বশেষে, কিন্তু আমার মতে তার স্থান হওয়া উচিত সর্ব্বপ্রথম, অন্ততঃ দ্বিতীয়। তুমি যখন বিয়ে করেছ, তখন এই ঈর্ষা যে কি জিনিস তা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। ......যে কবি নারী চরিত্র চুলচেরা করে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তিনি বলে গেছেন, Maidens like moths are caught by glare. এই glareএর প্রাচুর্য্য দেখলাম তার ভিতর অত্যন্ত বেশী; কি ঐশ্বর্য্যে, কি সৌন্দর্য্যে—সর্ব্ব বিষয়ে। তাই আমার ঈর্ষার আগুনে আমি নিজেই পুড়তে লাগলাম, কিন্তু তার পথ আগলিয়ে দাঁড়াবার প্রবৃত্তি হল না। তুমি বলবে জগৎ সিংহ ও ওসমানের মত একটা লড়াইয়ের সূত্রপাত করা আমার পক্ষে উচিত ছিল; তা হয়ত করতাম, যদি না দেখতাম, আমার চাইতে তার দাবী কিছু বেশি। যে বেশি উপযুক্ত সেই জয়ী হবে, প্রকৃতির এই নিয়মটা না মেনে উপায় নেই। তাই তার পথ ছেড়ে দাঁড়ালাম। তার পর যখন দেখতে লাগলাম, পুরাতন বস্ত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করতে পারলেই সে বাঁচে, আমার পূজার অর্ঘ্যের দিকে তার দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই, তা নিতান্ত অবহেলার জিনিস হয়ে উঠেছে, তখন আমার গর্ব্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগল; আমি সরে পড়লাম। অতখানি গর্ব্ব মানুষের মনে দিয়ে ভগবান তাকে বাঁচিয়েছেন।"

সে চুপ করিল। শুনিয়া আমি ব্যথিত হইলাম। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনও তাকে ভালবাস?"

সে শক্ত হইয়া বলিল, "না। ভালবাসাকে যারা আগুনের সঙ্গে তুলনা করে থাকে, তারাই একে ঠিক বুঝেছে। আগুন বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ইন্ধন চাই, নইলে সে নিবে যাবে নিশ্চয়। ভালবাসার নানা অবস্থায় তার নানারকমের ইন্ধনের জোগান্ চাই। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘুচে গেল, তার উপর আবার অবহেলা—এ অবস্থায় ভালবাসা কি করে বেঁচে থাকে বল দেখি? কিছুদিন পর আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যেতাম যে, যাকে অত ভালবাসতাম, কি করে অমন ভাবে তাকে ভুলে গেলাম!"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "ভাল করে ভেবে দেখেছ যে তাকে তুমি সত্যি ভুলে গেছ? আমার ত মনে হয়, এরই ফলে তোমার বর্ত্তমানের এই অবস্থা।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "উপন্যাস পড়ে' পড়ে' তোমাদের কল্পনা এই বাঁকা পথেই চলতে শিখেছে। সত্যিকার পুরুষ মানুষের মন যে কি অদ্ভুত জিনিষ তা আর তোমরা ভাবতে পার না। তবে শোন এর তিন বছরের পরের আর একটা ঘটনা বলি—

"Beware of Eve in every woman এই শাস্ত্র-বাক্যটা অনেক দিন মনে মনে খুব আওড়ালাম। ভেবেছিলাম, আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার যে কি করে' আর এক জায়গায় ভিড়ে পড়লাম, ভাবলে অবাক হতে হয়। তার সঙ্গে অনেক দিন থেকেই সামান্য পরিচয় ছিল। এবার সেটা কেন যে ঘনিষ্ঠ হতে লাগল তা জানিনে।

"এই রকম অবস্থায় পুরুষ ও নারীর ঘনিষ্ঠতার

আমাদের দেশের সমাজ যে আশা বা আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, এক্ষেত্রে যে তার ব্যতিক্রম হবে না তা দুদিনেই বুঝতে পারলাম। শীঘ্রই এ নিয়ে বাইরে আলোচনা উঠল; কিন্তু তাতে কিছু আশ্চর্য্য হওয়ার ছিল না,—আশ্চর্য্য হলাম আমি এই দেখে যে, তেমনি ধারা আলোচনা আমার মনেও জেগেছে। বুঝলাম, পুরুষ ও নারীর পরিচয় হওয়া মাত্রই যে আমাদের দেশের সমাজের লোকেরা একবারে অন্তিম জিনিষটি কল্পনা করে বসে, সে শুধু এ দেশের সমাজের দোষ নয়,মনোভবেরও বটে। নিঃসম্পর্কিক দুজনার পরিচয় হলেই, এদেশের সমাজিক জীবনের গুণে, মনোভব সেখানে এসে একটু উঁকি মেরে যাবেই।

"জানিনে ভগবানের কি অভিশাপ আমি মাথায় বহন করে বেড়াচ্ছি, এক দিন কি শুনলাম জান? সে বাগ্‌দত্তা—এক বছর আগে তার এ কাযটি সমাধা হয়েছিল; সেই ভাগ্যবান পুরুষটি তখন বিলাতে।

"বুঝতেই পার, আমার অদৃষ্ট দেবতাটির উপর আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম না; কিন্তু তাকে শাস্তি দেবার কোনও সম্ভাবনা যখন দেখতে পেলাম না, তখন আপাতত নিজেকেই শাস্তি দিতে হল। সে বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু এ যে কত বড় শাস্তি তা বুঝতে দেরী হল না। বিয়ে করবার মত ভাল তাকে বাসতাম না হয়ত; কাযেই সে আশা বর্জ্জন করতে আমাকে বেশী কষ্ট পেতে হল না। কিন্তু এ আমি দেখলাম যে বিকাল বেলাটা ভরে ওখানে গল্প করে না কাটালে আমার জীবন আর চলে না। মনকে অনেকখানি দাবিয়ে আবার পূর্ব্ববৎ তার সঙ্গে আলাপ চলতে লাগল।

"একদিন বিকেলে ও-বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হল না। শুনলাম সে তার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার মা এসে বল্লেন, 'শুনেছ হতভাগা লক্ষী-ছাড়াটার কাণ্ড? সে নাকি বিলেতে এক মেম বিয়ে করেছে। প্রথম থেকেই ওকে আমার খুব ভাল লাগে নি, তোমার মত এমন সরল চিত্ত সে নয়। কিন্তু এমন কাণ্ড করে বসবে তা ত স্বপ্নেও ভাবি নি। ওর মনে বড় লেগেছে, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে যেও, তোমাকে ও খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে।'

"বুঝতে পারছ, তার মার এই কথার ভিতর দুটো সংবাদ পেলাম। প্রথম খবরটা শুনে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটু সোয়াস্তিই বোধ করেছিলাম হয়ত, কিন্তু দ্বিতীয় সংবাদটায় বুঝলাম, ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলোর প্রয়োজন হয়েছে। শুনে মন আমার বিমুখ হয়ে উঠল। সেদিন তার সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত মনে করলাম না।

"যাকে ভালবাস তার চোখের জল কখনো দেখেছ? পরদিন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে আলাপ হল। দেখলাম, তাকে সে অনেকখানিই ভালবাসত। তার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে সে আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলে না; মুখ তার বেদনাতুর হয়ে উঠল, তার পর ঝরঝর করে দুচোখ দিয়ে সে কি বর্ষণ! দুঃখে লজ্জায় জর্জ্জরিত হয়ে সে সেখান থেকে সরে পড়ল।

"ভালবাসার পাত্রের চোখের জল যে কি জিনিষ তা ত জানতাম না। আমি যুগপৎ ব্যথিত মুগ্ধ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। হৃদয় আমার সহানুভূতিতে কানায় কানায় ভরে উঠল। একে সুখী না করতে পারলে আমার আর নিস্তার নাই। বেচারা!

"আমার তখন সর্ব্বপ্রধান তপস্যা হয়ে উঠল, একে জয় করা। কিন্তু সে যে কত বড় দুঃসাধ্য কায, তা বুঝতে দেরী হল না। কিন্তু জান, ছেলেবেলা থেকেই, যা কিছু দুঃসাধ্য তার উপরই ঝোঁক আমার বেশী। কাযেই এর মন ফিরিয়ে আমার দিকে আনবার জন্যে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলাম। কিন্তু 'উপায়'ই কখন যে আমার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল সেদিকে খেয়াল ছিল না।

"কিন্তু এমন দিন এল যে দিন বুঝতে আমার কিছু কষ্ট হল না যে, আমার এতদিনকার এই সমস্ত ব্যবহারে দ্বারা যে শুধু তাকেই প্রতারিত করেছি তা নয়—নিজেকেও কিছু কম করি নি।

"মাস দুই এই ঐকান্তিক চেষ্টায় কাটলো। চেষ্টার অসাধ্য কোনো কায নেই, এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে যখন আর সন্দেহ করবার কিছু রইল না, তখন একদিন তাকে আমার মনের ইচ্ছা জানালাম যে তার সুখ দুঃখের সমস্ত ভার সে আমাকে দিলে তা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া হবে। কতক্ষণ পরে তার উত্তর পেলাম —'মাকে জিজ্ঞাসা করুন।' তখনই আমি ছুটতে চাইলাম তার মার কাছে, কিন্তু ভগবানের করুণা তার মুখ দিয়ে প্রকাশ পেল, 'এত ব্যস্ত কেন, এখন থাক্ না।'

"কিন্তু কারু মুখে আর কথা ফুটল না; সেও কিছু বল্লে না, আমারও যেন কিছু আর বলবার ছিল না। কতকক্ষণ পর সে উঠে পড়ল, আমিও উঠে পড়লাম। বাইরে আসতেই তার মার সঙ্গে দেখা। ভাবলাম, তাঁকে বলি, কিন্তু পারলাম না. কিছুতেই মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। মনে মনে ভাবলাম, থাক না আজকে, কালই বলব।

"একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তায় সারাটা রাত ও পরের দিন কাটল। বিকালের দিকে তাদের বাড়ী গেলাম, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ জমলো না। তার মার কাছে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে অনেক বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প চল্ল। বারবার ভাবলাম, এইবার তাঁর মত জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কেন জানি নে, বলতে পারলাম না; কিছুতেই ভিতর থেকে সাড়া পেলাম না। চলে আসবার সময় তার সঙ্গে দেখা। চোখের দিকে চাইতেই মনে হল যেন সে জিজ্ঞাসা করতে চায়, মা কি বল্লেন? কিন্তু আমি আর তার দিকে না চেয়ে বরাবর চলে এলাম।

"পরদিন আবার রওনা হলাম সে বাড়ীর দিকে। মনে মনে সঙ্কল্প করে গেলাম, আজকে তার মাকে বলে সমস্ত ঠিকঠাক করতে হবে। কিন্তু যতই সে বাড়ীর কাছাকাছি হতে লাগলাম, ততই যেন আমার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। ...মন থেকে যে একটুও সাড়া পাইনে, কি আশ্চর্য্য!

"বাড়ীর কাছে গিয়েও ঢুকতে পারলাম না। অন্য পথ ধরে অনেক ঘুরে ফিরে বাসায় ফিরে এলাম। আর সে বাড়ীতে যেতে পারি নি।

"বছর খানেক পর শুনলাম, তার একটি বেশ ভাল বিয়ে হয়ে গেছে। শুনে অবধি অনেকটা সোয়াস্তি বোধ করছি।"

সতীশ তাহার কথা শেষ করিল। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহার এই কাহিনী শুনিতেছিলাম, আর চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহার মনের সাগরে ডুব দিয়া যদি বা তার চারিদিকটা একটু দেখা যায়। কিন্তু শেষটায় আমাকে ভাঙা গলায় বলিতেই হইল, "নাহে ভাই, তোমার কিছু বুঝলাম না।"

সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "সত্যি বলেছ ভাই, আমিও কিছু বুঝি নি।" তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "কিন্তু অত বড় অকাব্য শুনিয়েও, তোমাকে কবির ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,

আজকে বড় শ্রান্ত আছি,
ঘুমুতে যাই, ঘুমুতে যাই।"

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

বক্স সিংহ

যোধপুরের মহারাজ অজিত সিংহ প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। মোগলের সৌভাগ্যসূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ, তখন মোগল সুবাদারকে পরাজিত করিয়া তিনি আজমীর নিজের অধিকারভুক্ত করেন। ভরতপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পূরণমল জাঠের পুত্র মুহকম সিংহের সহিত সম্রাট্ মহম্মদ শাহের মনোমালিন্য হয়, তিনি মহারাজ অজিত সিংহের নিকট হইতে মুহকম সিংহকে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ সম্রাটের এই

প্রস্তাবে অস্বীকৃত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ সম্রাট্ অসংখ্য সৈন্যসহ আজমীর অবরোধ করেন। সম্রাটের সৈন্য চারি মাস আজমীর দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া ছিল; কিন্তু অজিত সিংহের কোন অনিষ্টই ইহারা করিতে পারেন নাই। অবশেষে জয়পুরের মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের মধ্যস্থতায় মহারাজের সহিত সম্রাটের সন্ধি হয়। সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহারাজ অজিত সিংহ আজমীর সুবা সম্রাট্‌কে প্রত্যর্পণ করিলেন। সম্রাট কৌশলে অজিত সিংহকে হত্যা করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অজিত সিংহের দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ অভয় সিংহ, কনিষ্ঠ বক্ত সিংহ। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ অভয় সিংহকে দিল্লীতে আহ্বান করেন। অভয় সিংহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, সম্রাটের সভাসদ্‌গণ ও মন্ত্রিসম্প্রদায় তাহাকে বলিলেন যে, "যদি আপনি মারবাড়ের রাজা হতে চান, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনার পিতা অজিত সিংহের প্রাণ বধ করুন।" সম্রাটের কৌশলে ও মহারাজ সওয়াই জয় সিংহের মন্ত্রণায় অভয় সিংহ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বক্ত সিংহকে তিনি লিখিলেন, "যদি যোধপুরের রাজসিংহাসন নিরাপদ রাখিতে চাও ত অবিলম্বে পিতাকে হত্যা করিবে। মনে রাখিও, এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে তুমিই যোধপুরের স্বাধীন রাজা হইবে।"

বক্ত সিংহ রাজ্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ১৭৮০ সম্বতে আষাঢ় শুক্লা দ্বাদশীর দিন রাজকুমার বক্ত সিংহ নিদ্রিত পিতাকে হত্যা করিয়া পিতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিলেন। পরদিন এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল; রাজভক্ত প্রজা ও সামন্ত সর্দ্দারগণ বক্ত সিংহকে দণ্ড দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। ইহাতে ভীত বক্ত সিংহ দিল্লী হইতে অভয় সিংহের লিখিত পত্রখানি দেখাইয়া,কাতর প্রার্থনায় নিজের প্রাণ রক্ষা করেন। এই সময় বক্ত সিংহের বয়স ২৯ বৎসর ছিল।

ইহার পর তিনি দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া সম্রাট্ ও তাঁহার মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ এবং মন্ত্রী উভয়েই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের দ্বারা তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন, "পিতৃহন্তা মহাপাপীর মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়।"

সম্রাটের এই শ্লেষপূর্ণ অপমানজনক উত্তরে বক্ত সিংহ অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত হইলেন। অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় অশান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে রেওয়াড়ীর নিকট জনৈক সামন্ত সর্দ্দার তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। এই সময় বক্ত সিংহ উন্মত্তবৎ হইয়া গিয়াছিলেন, কোনও রূপ রাজচিহ্ন ত দূরের কথা—তখন তাঁহার মস্তকে পাগড়ী পর্য্যন্ত ছিল না। বক্ত সিংহের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, এক মহাপুরুষ তাঁহাকে বিস্তর সান্ত্বনা দেন। ধর্ম্মোপদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহাকে বলেন যে, "এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় ভ্রমণ করিলে কোন ফলই হইবে না। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবার পূর্ব্বে যদি মৃত্যু হয়, তাহাতে তোমার আত্মার অসদ্‌গতিই হইবে। অতএব উপস্থিত তুমি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালন কর এবং প্রতিজ্ঞা কর যে, আজ হইতে স্বপ্নেও তুমি অন্যায় কার্য্য করিবে না; ইহাই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" মহাত্মার এই উপদেশে বক্ত সিংহ কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। সেই জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করিয়া রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আজ হইতে ভুলিয়াও অন্যায় কার্য্য করিব না।"

মহারাজ অজিত সিংহের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দিল্লীতেই সম্রাট অভয় সিংহকে যোধপুরের মহারাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাগোরের সুবা বক্ত সিংহকে অর্পণ করিয়া, ফরমান বা আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলেন। মহারাজ অভয় সিংহ ১৭৮১ সম্বতে দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বক্ত সিংহকে নাগোরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

বক্ত সিংহ সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। নিজের ভাই

মহারাজ অভয় সিংহকে তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেন। ১৭৮৭ সম্বতে বিজয়া দশমীর দিন মহারাজ অভয় সিংহ সুবাদার সরবুলন্দ খাঁকে পরাজিত করিয়া অহমদাবাদ অধিকার করেন। এই যুদ্ধে মহারাজ বক্ত সিংহই প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইঁহারই যুদ্ধ কৌশলে বুলন্দ খাঁ সহজে পরাস্ত হন। ভ্রাতার রণপাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ অভয়সিংহ তাঁহাকে জালোর পরগণা উপহার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কোন বিশেষ কারণে উভয় ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ১৭৯৬ সম্বতে মহারাজ অভয় সিংহ বিকানীরের মহারাজ জোরাবর সিংহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রায় ছয়মাস ধরিয়া উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু বিকানীর দুর্গ অভয় সিংহ অধিকার করিতে পারিলেন না। গৃহবিবাদ হওয়ায় অভয় সিংহ এই যুদ্ধে বক্ত সিংহের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ভ্রাতার ব্যবহারে মহারাজ বক্ত সিংহ বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে, বিকানীর জয় করিয়া মহারাজ অভয় সিংহ তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে পারেন। কয়েক দিন চিন্তার পর তিনি বিকানীরের রাজদূতকে বলিলেন, "তুমি তোমার মহারাজকে জয়পুর-অধিপতি জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতে বল। তিনি জয়পুর মহারাজকে এই কথা লিখুন যে, যোধপুর মহারাজ ইতিপূর্ব্বে যে অম্বর পরগনা জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের ইহাই উত্তম সুযোগ!" বক্ত সিংহের মন্ত্রণানুযায়ী বিকানীর মহারাজ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া জয়পুরে দূত প্রেরণ করিলেন।

এই সময় মহারাজ জয় সিংহের পানদোষ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জয়পুরের প্রধান মন্ত্রীর সহিত বিকানীরের রাজদূতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দূতের পরামর্শানুসারে মহারাজের নেশার সময়ে মন্ত্রী বিকানীরের প্রার্থনাপত্র খানি তাঁহাকে দিলেন। নেশার ঝোঁকে মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী জয় সিংহ মহারাজ অভয় সিংহকে লিখিলেন, "বিকানীর রাজার সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং আপনি বিকানীর রাজকে ক্ষমা করিয়া সৈন্যসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। নতুবা স্মরণ রাখিবেন আমার নাম জয়সিংহ।" ইহার উত্তরে অভয়সিংহ লিখিলেন, "আমাদের এই বিবাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার আপনার নাই। আপনার নাম জয় সিংহ, আমার নামও অভয় সিংহ।" নেশা ছুটিলে মহারাজ সওয়াই জয় সিংহ তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ বৃথা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া দুই লক্ষ সৈন্যসহ তিনি যোধপুর অবরোধ করিলেন এবং মহারাজ বক্তসিংহকে লিখিলেন, "আপনি সসৈন্যে আমার সাহায্যার্থে আসুন, যুদ্ধ জয়ের পর আমি আপনাকে যোধপুরের সিংহাসনে বসাইব।" বক্ত সিংহ সসৈন্যে জয়সিংহের সাহায্যার্থে আগমন করেন। উদয়পুরের মহারাণাও আশী হাজার সৈন্যসহ জয়সিংহের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। এই বিরাট বাহিনী দেখিয়া অভয় সিংহ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাইশ লক্ষ টাকা দিয়া জয়পুর মহারাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাজ বক্ত সিংহ নিরাশ হৃদয়ে নাগোরে ফিরিয়া গেলেন।

বক্ত সিংহের এই ব্যবহারে অভয় সিংহ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ভ্রাতৃস্নেহ ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইল। অভয় সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মহারাজ বক্ত সিংহ কিন্তু বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং এই অপরাধের জন্য ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এবং জয়পুর আক্রমণ করা উচিত কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। অভয় সিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন যে, জয়পুর আক্রমণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ভ্রাতার পরামর্শানুযায়ী ১৭৯৮ সম্বতে বক্ত সিংহ জয়পুর আক্রমণ করিলেন। যোধপুর হইতে মহারাজ

অভয় সিংহ সসৈন্যে বক্ত সিংহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন, কিন্তু সামন্ত সর্দ্দারগণকে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমি শুদ্ধ বক্ত সিংহকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যেই যাইতেছি, তাহার পক্ষে থাকিয়া জয়পুরের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নহে। মেড়তায় উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল। বক্ত সিংহকে লক্ষ্য করিয়া চম্পাওয়ত সর্দ্দার ঠাকুর কুশল সিংহ কতকগুলি ব্যঙ্গপূর্ণ কথা বলিলেন; ইহাতে বক্ত সিংহ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। শেষে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই আমি জয়পুরের সহিত যুদ্ধ করিব, কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

মহারাজ জয় সিংহ যখন শুনিলেন যে বক্ত সিংহ জয়পুর অবরোধার্থে আসিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার গতিরোধার্থ দুই লক্ষ সৈন্য সহ মারবাড়ের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বক্ত সিংহ মাত্র পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া এই বিরাটবাহিনী আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে জয়পুর-বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল, কিন্তু মহারাজের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে ছত্রভঙ্গ সৈন্য একত্র হইয়া আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এবারেও বক্ত সিংহ জয়লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পাঁচ সহস্র সৈন্যের মধ্যে মাত্র ষাটজন জীবিত রহিল।

বক্ত সিংহের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, এই অবশিষ্ট সৈন্য কয়টি লইয়া পুনরায় জয়পুর অবরোধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণ এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। বক্ত সিংহের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ যুদ্ধে ভ্রাতা অভয় সিংহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন; কিন্তু অভয় সিংহের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন। যুদ্ধান্তে উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে, মহারাজ অভয় সিংহ বলিলেন, "তুমিই যাহাতে এই বিজয়-গৌরবের অধিকারী হও, তাহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; সেই জন্য আমি তোমাকে কোন রূপ সাহায্য করি নাই।" উদয়পুরের মহারাণার মধ্যস্থতায় মহারাজ জয় সিংহের সহিত বক্ত সিংহের সন্ধি স্থাপিত হইল।

১৮০৬ সম্বতে মহারাজ অভয় সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সামন্ত সর্দ্দারগণকে প্রতিজ্ঞা-করান যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা তাঁহার পুত্র রাম সিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রতিজ্ঞানুসারে সামন্ত সর্দ্দারগণ মহাসমারোহে রাম সিংহকে যোধপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। রাম সিংহ সিংহাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু রাজকার্য্য পরিচালনের অবসর তাঁহার ছিল না; ভোগ বিলাস লইয়াই তিনি উন্মত্ত থাকিতেন। কুসঙ্গীগণের মন্ত্রণায় তিনি তিনি নানারূপ কুকার্য্য করিতে লাগিলেন। সামন্ত সর্দ্দার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। প্রকাশ্য রাজসভায় মহারাজ রাম সিংহ সর্দ্দারগণকে অপমানিত করিতে লাগিলেন। রাম সিংহের ব্যবহারে সর্দ্দারগণ ব্যথিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন; এই প্রকার নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত সর্দ্দারগণ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাম সিংহের রাজ্যাভিষেকের সময় মহারাজ বক্ত সিংহ নিজে যাইতে পারেন নাই, বাহক দ্বারা অভিষেক দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পিতৃব্যের এইরূপ আচরণে মহারাজ রাম সিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন; তিনি অবিলম্বে নাগোর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সর্দ্দারগণ রাম সিংহকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিলেন না; ইহাতে দুই চারি জন সর্দ্দার ব্যতীত অন্য সকলেই বক্ত সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। রাম সিংহ নাগোর অবরোধ করিলেন।

লুনাবাসের নিকট মেড়তার বিস্তৃত প্রান্তরে রাম-সিংহ ও বক্ত সিংহের সংঘর্ষ হয়। কয়েক দিন ভীষণ যুদ্ধের পর মহারাজ রাম সিংহ পরাজিত হন এবং জয়-পুরে পলায়ন করেন। সামন্ত সর্দ্দারগণ বক্ত সিংহকে যোধপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং মহা-সমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়।

মহারাজ বক্ত সিংহের পরাক্রম দিন দিন বাড়িতে

লাগিল। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, পরদুঃখ-কাতরতায় প্রজাবর্গ তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িল। কিছু দিন পরে তিনি আজমীরও জয় করেন। ইতিমধ্যে মহাদজী সিন্ধিয়া রাম সিংহের হইয়া বক্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যোধপুরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হন।

এই সংবাদ পাইবামাত্র দুই লক্ষ সৈন্য সহ বক্ত সিংহ অগ্রসর হন এবং জয়পুরের নবীন মহারাজ ঈশ্বরী সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরী সিংহ (জয় সিংহের পুত্র) মৌখিক ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু রাম সিংহের মন্ত্রণায় বক্ত সিংহকে হত্যা করিবার জন্য এক ভীষণ চক্রান্ত করিলেন।

ঈশ্বরী সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সিংহের পত্নী, অভয় সিংহের কন্যা বা বক্ত সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরী সিংহ তাঁহাকে বক্ত সিংহের নিকট পাঠাইলেন। বক্ত সিংহকে উপহার দিবার জন্য একটি বিষাক্ত ফুল তাঁহার হাতে দিয়াছিলেন। এই পুষ্পটি নাকের কাছে লইয়া যাইতেই মহারাজ বক্ত সিংহের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল; সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল না। মলয়পুর হইতে দুই মাইল দূরে, জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুরের সীমায় অবস্থিত "ভূপোলাব" নামক পুষ্করিণীর নিকটস্থ সেনানিবাসে, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাজ বক্ত সিংহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতৃ হত্যার ফল তিনি হাতে হাতে পাইলেন।

মহারাজ বক্ত সিংহ অত্যন্ত ধীর, বীর, বিনয়ী ও বুদ্ধিমান ছিলেন; ইনি অত্যন্ত উদার হৃদয় নরপতি ছিলেন। ইঁহার শরীর বলিষ্ঠ এবং তেজোদৃপ্ত ছিল। দেশ এবং জাতির উপকারের জন্য ইনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি সেই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কখনও অন্যায় কার্য্য করিব না, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি ইঁহার সৎকার্য্য ও ন্যায়নিষ্ঠার অসংখ্য কাহিনী মারবাড়ে প্রচলিত আছে। বক্ত সিংহ সম্বন্ধে মহাত্মা টড লিখিয়াছেন, "ইঁহার ন্যায় দূরদর্শী, ন্যায়নিষ্ঠ, সদাচারী নরপতি রাজপুত জাতির গৌরবস্তম্ভ। ঈশ্বরেচ্ছায় বক্ত সিংহ যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীর সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না এবং ভারতে আর একবার রাজপুতের জয়পতাকা উড়িত।" *

বক্ত সিংহ যদি পিতৃহত্যা না করিতেন, তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে ইঁহাকে আদর্শ নরপতি বলা যাইতে পারিত। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় পিতৃহত্যার অপরাধে ইঁহার আদর্শ চরিত্র কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

* He was a man of great political sagacity and of considerable genius, of deep artifice, of restless ambition, and of implacable revenge. With a high opinion of his personal address, * * * * His habits were simple, his manners kind and frank, * *."—Col. Tod.

পাশাপাশি

ডাকঘরে গিয়ে দেখি, আমার নামেতে
আসিয়াছে দুটি চিঠি দুখানি খামেতে।
একখানি লিখেছেন বন্ধু একজন
কন্যার বিবাহে মোরে করি নিমন্ত্রণ।
দ্বিতীয় সে চিঠিখানি স্বজন আমার
লিখেছেন—গৃহে তাঁর আজি হাহাকার;

জামাইটি মারা গেছে দু'দিনের জ্বরে,
বিধবা হয়েছে মেয়ে পনের বছরে।
মনে হল যেন এই দুটি ছোট লিপি
হাসিছে আমার পানে মুখ টিপি টিপি;—
পরম আত্মীয় দোঁহে, বসি পাশাপাশি
গলাগলি করি আছে অশ্রু আর হাসি!

"বনফুল।"

বঙ্গমহিলার বদরিকাশ্রম-দর্শন

শিশুকাল হইতে আমার দেশভ্রমণের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। মনে আছে, যখন আমার আট নয় বছর বয়স, সেই সময়ে আমার মাতা বা পিতামহীর নিকট যদি কেহ আসিয়া তীর্থভ্রমণের গল্প করিতেন, আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। আমার পিতা বলিতেন, "আমার এই কন্যার জন্মপত্রিকার ফল বহুতীর্থ ভ্রমণ, সেই জন্য এই বয়স হইতেই শিশুর ঐ বিষয়ে এত অনুরাগ।"

তার পর ১০বৎসর ৫ মাস বয়সে যে পরিবারে ভিতর আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের বাড়ীতে তীর্থযাত্রা যেন একটা মহা অন্যায় কার্য্য এই রূপ বিবেচিত হইত। ক্রমেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়ে যতই হতাশ হইতে লাগিলাম, তীর্থভ্রমণের ইচ্ছাটা মনের ভিতর ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া তখন একান্ত মনে ভগবানকে জানাইতাম, বলিতাম, "তুমিই আমাকে লইয়া চল।" এবং সময়ে সময়ে ইহাও মনে হইত যে, আমার পিতা সর্ব্বদাই জ্যোতিষ-চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, তাঁহার কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে।

যখন আমার ২৮ বৎসর বয়স, সেই সময়ে আমি আমার স্বামীর সহিত তাঁহার চাকরীস্থান মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলাম। সেইস্থানে এক সন্ন্যাসিনীর সহিত আমার পরিচয় হয়। ইনি সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক, সংসারের অশান্তি সহ্য করিতে না পারিয়া পরিণত বয়সেই ইনি সন্ন্যাস লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার নিকটেই আমি বদরীর বিষয় প্রথম শুনিয়াছিলাম। ইনি যখন তথায় গিয়াছিলেন, তখন লছমন ঝোলার পুল তৈয়ারি হয় নাই, দড়ির ঝোলা ছিল। তিনি বদরীর বিবরণ বিস্তারিতভাবে যখন বলিয়া যাইতেন, আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম। এক এক বিষয়ের বা স্থানের বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিয়া যাইত। সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার এরূপ ব্যাকুলতা আসিত যে মনে হইত, এ সকল ছাড়িয়া তখনই তাঁহার সহিত চলিয়া যাই। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণকে বলিতাম, "দেব, তুমিই লইয়া যাইও তোমার কাছে। যাঁহাদের ভিতর রাখিয়াছ, তাঁহাদের নিকট হইতে তোমাকে দেখিতে যাওয়া বা পাওয়া বুঝি অসম্ভব।"

এইরূপ ১৮ বৎসর ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে, তবে ঠাকুর দয়া করিয়া, ৩রা বৈশাখ তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য আমায় পথে বাহির করিলেন। আমাদের নেতা হইলেন, আমার সহোদরাতুল্যা জগৎমোহিনী গুপ্তা। ইঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়াই সব স্থির করি। ইনি হাজারিবাগের কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিলেন। আমাদের যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইলে, ইঁহার সহিত ইঁহার কন্যা এবং আরও পাঁচ জন বন্ধু যাইবেন স্থির হয়। সব সুদ্ধ আমরা সাত জন স্ত্রীলোক। আমাদের সঙ্গে যাইলেন একটি ভদ্রলোক, তাঁহার সহিত একজন চাকর, আমাদের একজন চাকর এবং কেদারনাথ ও বদরীর দুই স্থানের দুই জন পাণ্ডা। এই দলটি লইয়া আমরা বদরী যাত্রা করিলাম।

৩রা বৈশাখ রাত্রি ৯॥ টার বম্বে মেলে আমি হাওড়া হইতে হাজারীবাগ যাত্রা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত মহাশয়দের দুই জন লোক—একজন বদরী যাইবেন, ইনি স্ত্রীলোক; একজন হাজারীবাগ রোড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবেন।

রাত্রি ৩॥ টার সময় আমরা হাজারীবাগ রোডে পৌঁছিলাম। আমাদের প্রধান পাণ্ডা ভগিনী জগৎমোহিনী সেইখানে আমাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন। মহা আনন্দে আমরা যাত্রা করিলাম। ৪ঠা বেলা ৯॥টার সময় মোগলসরাই আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই দিন সেইখানে ইঁহাদের এক আত্মীয় ডাক্তারের বাটীতে থাকিয়া, স্নান আহার ও সঙ্গে যে সকল ঔষধ পত্র যাইবে তাহার বন্দবস্ত করা হইল।

পর দিন অর্থাৎ ৫ই, বেলা ৯টার সময় লক্ষ্ণৌ মেলে

মোগলসরাই ছাড়িয়া, ভোর ৪টায় হরিদ্বার পৌছিলাম। হরিধ্বনি করিয়া সকলে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়া গেল। তখনও বেশ অন্ধকার। আমরা ষ্টেশনের অপর পার্শ্বে আসিয়া, কাঁকড়ের উপর এক একখানা কম্বল বিছাইয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম। এরূপ ভাবে ভূমিশয্যা আমার এই প্রথম, কিন্তু বেশ একটু আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। পাণ্ডা বলিল, "মা এই রকম যায়গা, এই রকম বিছানা, এই আরম্ভ হইল, এর চেয়ে আরও খারাপ স্থান মিলিবে।"

শুইয়া শুইয়া কত কথাই মনে আসিতে লাগিল। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি ষ্টেশনে লোক আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সকলকে উঠাইয়া, আপনিও উঠিয়া পড়িলাম। সেইখানে বসিয়াই স্থির করা গেল যে স্বামীজী শ্রীশ্রীভোলানাথগিরি মহাত্মার আশ্রমে থাকিবার চেষ্টা করা হউক। তাহাই হইল, আমরা মহাত্মা গিরি ঠাকুরের ঠাকুরবাটীতে আশ্রয় পাইলাম। কি সুন্দর স্থানে বাড়ীটি! একেবারে গঙ্গার ঠিক উপরেই। বারাণ্ডা হইতে দড়ি নামাইয়া জল তোলা যায়। সেইখানে আসিয়া স্নান করা হইল। সকালে আর রান্না হইল না, বাজারের খাবার আনিয়া খাওয়া হইল। বিকালে বাবার আশ্রমে গিয়া, তাঁহার সহিত অনেক বিষয় কথাবার্ত্তা হইল, এবং বদরীর পথ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়া দিলেন, অনেক উপদেশও দিলেন। এইখানে খুব আনন্দে আমরা দুইদিন কাটাইলাম। ডেরাডুন হইতে এক বন্ধু এইস্থানে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে এখানে এক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন সাধুকে দেখি, ইনি হাতের এবং কপালের রেখা দেখিয়া আমাদের জীবনী যেন জলের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন! কে কোথা হইতে আসিতেছি তাহাও বলিয়া দিলেন। তিনি বাংলা মোটে জানেন না; কাশ্মীরের লোক।

৮ই প্রাতে ৯টায় সময় টমটম করিয়া সকলে হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। ১১।১২টার মধ্যেই আমরা হৃষীকেশে পৌছিয়া, কালী কম্লীওয়ালার ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। ৮ই, ৯ই এই স্থানে থাকিয়া, এই স্থান হইতে ঝাপান, কাণ্ডী ও মাল বহিবার কুলীর বন্দবস্ত করা হইল। এ সকল বন্দবস্ত পাণ্ডারাই করিয়া দিল। কেহ কেহ হরিদ্বার হইতেই এ বন্দবস্ত করিয়া লন।

আমরা তিনখানা ঝাপান ও দুইটি কাণ্ডী লইলাম। বাকী পুরুষেরা এবং আমাদের ভিতর দুইজন স্ত্রীলোক হাঁটিয়াই যাইবেন স্থির করিলেন, তাঁহারা ঝাপানে চড়িতে রাজী হইলেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা, অন্যা তাঁহাদের আত্মীয়া। ইঁহাদের এই দুঃসাহসিক কার্য্যে পাণ্ডারা হইতে সকলেই বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা হাঁটিয়াই বদরী ভ্রমণ করিবেন স্থির করেন ও কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১০ই, ভোর ৫টা। ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া তিন মাইল আসিয়া লছমন ঝোলা! এখন 'পুল' হইয়াছে, কোনও কষ্ট নাই। সেখানে স্নান দান ইত্যাদি করণীয় কার্য্য সকল শেষ করিয়া, যে সকল ঠাকুর দেবতা আছেন তাহা দেখিয়া লইলাম। এবং বাসায় আসিয়া একটু একটু জল খাইয়া তখনই সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। লছমঝোলা হইতে তিন মাইল দূরে 'ফুলবাড়ী চটি'। বেলা দশটার পর সেখানে পৌছিলাম। প্রকৃত বদরী যাত্রা এইখান হইতেই আরম্ভ হইল।

সেখানে রান্না হইল আলু ও কাঁচা কড়াইয়ের ডাল, ভাতে ভাত। অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত তাই খাওয়া গেল। একটু বিশ্রাম করিয়া বাহির হইব মনে করিতেছি, এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ক্রমে কমিয়া আসিল, কিন্তু ছাড়িল না। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিয়া, ছাড়িবার আশা নাই দেখিয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া আমরা সেই বৃষ্টিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। বেলা ৬টার সময় ৪ মাইল দূরে মোহন চটিতে আসিয়া পৌছিলাম। তখন সকলেরই চেহারা হইয়াছে ঠিক ভিজা কাকের মত। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। আমা-

দের কম্বলগুলি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, আর চলিতেও পারা যাইবে না দেখিয়া এই চটিতেই রাত্রি যাপন করিব স্থির হইল। কম্বলগুলি বাঁশে ঝুলাইয়া দিয়া আমরা চটিটি পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলাম। যে ঘরটি আমরা পাইলাম, সেটি গরু ও ছাগলের স্থায়ী আড্ডা। চারিদিকে জঙ্গল। কোনও রকমে একটুখানি স্থান পরিষ্কার করিয়া, এক একখানি বালাপোষ গায়ে দিয়া শুইয়া পড়া গেল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সকলেরই খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। খানিকটা এই রকম শুইয়া থাকিবার পর শরীরটা বেশ গরম হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষুধাও বোধ হইল। চটির দোকানে কিছু খাবার পাওয়া যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করায়, শুনিলাম কিছুই নাই, অল্প ছোলাভাজা আছে মাত্র। তাই কিনিয়া আনা হইল, এবং একটু হালুয়া তৈয়ারি করিয়া ও খান কয়েক পাঁপর ভাজিয়া সকলে মিলিয়া তাই একটু একটু খাওয়া গেল। রাত্রি তখন ১১টা। এইবার শুইয়া শুইয়া সকলে মিলিয়া অনেক রকম গল্প হইতে লাগিল। আজ সকলেরই মনে বড় আনন্দ। মনে হইতেছে সত্যই নারায়ণ দর্শন করিতে যাইতেছি। রাত্রি ১২টা অবধি আমাদের গল্প হইল, বাকী রাতটুকু এক ঘুমেই কাটিয়া গেল।

১১ই, ভোর ৪টা। মোহন চটি ছাড়িয়া বাহির হইলাম। দুই মাইল দূরে 'বীজনী চটি', সেখানে রাস্তার ধারে বসিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। সেখান হইতে আরও দুই মাইল দূরে 'বড় বীজনী চটি'। সেখান হইতে তিন মাইল দূরে 'কুণ্ড চটি'। এই খানে রাস্তার ধারে বসিয়া ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা গরম দুধ ও পাকা কাঁচকলা বিক্রয় করিতেছে। এইখানে আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। ঝাপানীরা দুধ ও কলা কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমরাও কিছু কলা কিনিয়া লইলাম। এই চটিতে চাল, দুই রকম খোষা সুদ্ধ দাল, আটা, ঘি, লঙ্কা, গুড়, ছাতু ও ছোলা ভাজা বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। দুই একটা চটি ছাড়া, এই সকল জিনিষ প্রায় প্রত্যেক চটিতেই পাওয়া যায়। তবে এবৎসর সকল জিনিষেরই দ্বিগুণ দাম। এখান হইতে তিন মাইল দূরে বাঁদর চটী। পথ খুব চড়াই। আমরা উঠিতে আরম্ভ করিলাম, বৃষ্টিও আরম্ভ হইল; সমস্ত রাস্তা ভিজিতে ভিজিতে চলিলাম। এই চটীতেই স্নান আহার হইবে স্থির করা গেল। চটীতে পৌছিয়া রান্না হইল,—আলু ভাতে ভাত। তাই খাইয়া কম্বল বিছানায় সকলেই শুইয়া পড়িলাম, বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলাম।

সমস্ত দিন কি বৃষ্টি! বেলা ৪টার সময় বৃষ্টি ছাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্র দেখা দিল। আমরাও কম্বল ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তিন মাইল চলিয়া, ৬টার সময় মহাদেব চটিতে পৌছিলাম। তখনি তল্পী-তল্পা ফেলিয়া গৌরীশঙ্কর দেখিতে গেলাম। এখানে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর একটি ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্ম-শালার ঠিক উপরেই মহাদের গৌরীশঙ্কর আছেন। উপরে উঠিবার সিঁড়ি প্রায় ৫০টি। উপরে উঠিয়াই একটি সাধুর বড় সুন্দর আশ্রম আছে। সাধু নাই, তিনি দেহ-রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার দুটি শিষ্যা এই আশ্রম রক্ষা করিতেছেন। আশ্রমে কয়েকটি গাভীও আছে। সন্ন্যাসিনী মাতা আমাদের কত মিষ্ট কথা বলিয়া, ঠাণ্ডা জল এক ঘটি ও তাজা দুধ পান করিতে দিলেন।

সব দেখিয়া শুনিয়া আসিলাম। সে রাত্রিটা মহাদেব চটিতেই থাকা হইল। খাওয়া হইল এক একটি পেড়া ও ছোলা ভাজা। খাইয়া কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া অনেক গল্প করা গেল। তার পরে এক ঘুমেই ভোর।

১২ই, ভোর ৫টা। ঝাপানীরা বলাবলি করিতে লাগিল, আজ আমরা যে পথে চলিব, সে পথ বড়ই ভয়ানক। আমরা শুনিতে শুনিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ৪ মাইল দূরে 'শিমলা চটি'। বাস্তবিক এই ৪ মাইল পথ যে কি ভয়ানক চড়াই উৎড়াই, দেখিলে ভয় হয়। উপর দিকে চাহিলেও মাথা ঘুরিয়া উঠে, আবার নীচের দিকে চাহিলেও গা কাঁপে। এক এক স্থানে পাহাড়ের

গা কাটিয়া দুই হাত চওড়া রাস্তা বাহির করা হইয়াছে, সে স্থানটা যে কি ভয়ানক তাহা না দেখিলে বোঝান যায় না। পথের অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গিনীরা কেহ কেহ ভয় পাইতেছেন দেখিয়া ঝাপানীরা বলিল, "আভি ইসিমে ডর ক্যা হ্যায় মা, ডরকে রাস্তা আভি ত পড়া হ্যায়।' শিমলা চটি হইতে দুই মাইল দূরে 'কানী চটি।'" এই চটিতেই এ বেলা থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইল, কারণ ঐ ভয়ানক পথে আসিয়া আমরা—বিশেষ যাঁহারা হাটিয়া আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা—বড়ই ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। অতএব এই চটিতেই স্নানাহার করা হইল।

একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা সাড়ে তিনটায় কানী চটি ছাড়িয়া আবার বাহির হইলাম। এক মাইল আসিয়া, আমাদের একজন সঙ্গিনী ঝাপান ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সে এক ভয়ানক কাণ্ড! যদি আর আধ হাত ওদিক পানে পড়িতেন, তাহা হইলে একেবারে গড়াইয়া গভীর খাদে বা গঙ্গায় গিয়া পড়িতেন। এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন।

সেইখানে বসিয়া তাঁহার মুখে চোখে জল দিয়া একটু সুস্থ করিয়া লইয়া, আবার আমরা চলিলাম। এই পথ যে কি ভীষণ তাহা কল্পনাতেও আনা যায় না। এইখানে এখনও একটি দড়ির সাঁকো পার হইতে হয়। উঃ সে যে কি, তা চোখে না দেখিলে তাহার ভীষণতা বোঝা যায় না। সাঁকোর উপর দিয়া আসিতে আসিতে সেটা দুলিতে লাগিল। পাহাড়কে দুই খণ্ড করিয়া মাঝখান দিয়া কি গভীর গর্জ্জন করিয়া ফেনময়ী গঙ্গা খরস্রোতে চলিয়াছেন! এই পাহাড়েরই শৃঙ্গে শৃঙ্গে সাঁকো বাঁধা। এপার হইতে একজন লোক ক্রমাগত যাত্রীদের সাবধান করিতেছে, "এক যাত্রীকে যাস্তি নেই উঠনা, পাণ্ডাকা হাত পাকড়না।" উঃ কি ভয়ানক সে স্থানটা! নীচের দিকে চাহিলে চোখে অন্ধকার দেখিতে হয়।

এইরূপ ভাবে ঝোলা বা সাঁকো পার হইয়া একটু আসিয়া ব্যাস চটি। এই সকল ভয়ঙ্কর স্থানে ঝাপানরা ডাণ্ডি চলে না, হাঁটিয়াই যাইতে হয়। ঝোলা পার হইয়াই সকলে বসিয়া পড়িলেন। আমারও কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমি ভয় পাই নাই। সেখান হইতে উঠিয়া চটিতে আসা হইল, এবং এই ব্যাস চটিতেই রাত্রিবাস করা হইবে স্থির হইল। আমাদের চটির অল্প দূরেই ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম। সেখানে স্নান করিতে হয়।

আমরা যখন চটিতে পৌছিলাম, তখন ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি স্নান করিতে নামিয়া পড়িলাম। গঙ্গার কি অপূর্ব্ব শোভা! গঙ্গা ও অলকানন্দা পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছেন। গঙ্গার জল একটু ঘোলা, আর অলকানন্দার জল স্বচ্ছ নীল। স্নান করিতে নামিয়া, স্নান ভুলিয়া গেলাম, নানা রঙ্গের নুড়ী ও ছোট বড় পাথর কুড়াইয়া কুড়াইয়া ছেলেমানুষের মত খেলায় মাতিলাম।

রাত্রি হইয়া যায়, স্নান দান শেষ করিতে হইবে তাহা যেন মনেই রহিল না। অমন যে বরফগলা জল, তাহাতেও কষ্ট বা শীত বোধ হইতেছিল না।

পাণ্ডা ও সঙ্গীদের তাড়ায়, স্নান-খেলা শেষ করিয়া সকলেই উপরে উঠিলাম। উঠিয়া মনে হইল, প্রকৃতি মাতার কোলে আসিলে সকলেই বুঝি এইরূপ শিশু হইয়া যায়। পাণ্ডা বলিল, "মা, এৎনা ঘড়ি পানিমে রহনা নেহি, সব পানি আভি বরফ হ্যায়, ঠাণ্ডি পাকড় লেগা।" বেচারা অনেক সাবধান করিল। পাণ্ডার কথামত করণীয় কার্য্য সকল শেষ করিয়া, চটিতে ফিরিয়া আসিয়া রান্নার যোগাড় করা হইল, কারণ সেদিন দশমী ছিল, পরদিন একাদশী, সঙ্গে কতকগুলি বিধবা, এবং একটি বিধবা বালিকা। তাঁহাদের সকলেরই পর দিন নিরম্বু উপবাস। সেই জন্য এত পথকষ্টের পরেও, সেই রাত্রিতে খাবার তৈরী করা হইল। চটীর দোকানীর কাছে পাওয়া গেল একটু কুমড়া, তাই কিনিয়া আনিয়া রান্না হইল কুমড়া ছেঁচকি ও পরোটা। সন্ধ্যাবেলায় বরফ গলা জলে স্নান করিয়া সকলেরই খুব শীতবোধ হইতেছিল, উননের কাছে বসিয়া বেশ একটু আরাম

হইতে লাগিল। আগুন পোহান, গল্প করা ও খাবার করা তিন কাষই এক সঙ্গে চলিতে লাগিল। আমি একটা মোটা কম্বল বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া আগুনের কাছে বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার শীতটা গেল, গা বেশ গরম হইল, তখন সকলে মিলিয়া খাইয়া লইয়া শুইয়া পড়া গেল। একজন বলিলেন, "এখন সব ভয়ানক পথ আছে, জানলে ছেলেরা কি আসতে দিত ?" আর এক জন বলিলেন, "যাদের কেউ নেই, তারাই এ পথে আসে, আগে তাই শুনতাম।" এই রকম সব কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কানী চটি হইতে গঙ্গা কথনও ডাহিনদিকে কথনও বাম দিকে চলিয়াছেন। এই পথে কি ভয়ানক জঙ্গল ও উচ্চ পাহাড়! এক এক স্থানে এত উচ্চ যে আকাশ দেখা যায় না। আমার স্বামীর চাকরীর জন্য তাঁহার সঙ্গে আমি নানাস্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এরূপ ভয়ানক জঙ্গলময় পাহাড় আমি কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছি পথের ভীষণতা ক্রমেই বেশী দেখা যাইবে। কি চড়াই, কি উৎরাই! এক এক স্থানে পাহার ঠিক সোজা উঠিতেছে, নামিবার সময় মনে হয় যেন পিছন হইতে কে ঠেলিয়া দিতেছে। এই সকল স্থানে পাহাড়ী-দের সাহায্য এবং লোহা বাঁধানো বাঁশের লাঠি ব্যতীত চলা অসম্ভব।

ক্রমশঃ

শ্রীসুশীলা বসু।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

আছে পড়ি ইউরোপ বিষশর-দিগ্ধ,
পীযূষের ধারা যাও, কর তায় স্নিগ্ধ।
কামনার গুহাতলে পড়ে' পোড়া প্রাণ হে,
যাও ভাগীরথী-ধারা স্বরগের দান হে।
মহাকুরু-শ্মশানেতে যাও তুমি শান্তি,
—জগতের মরুভূমে শরতের কান্তি।
কাল যেথা হয়ে গেছে কালানল-বৃষ্টি,
যাও শ্রাবণের ধারা, করুণার সৃষ্টি।
ঠেলি অনলের ঢেউ, বারুদের গন্ধ,
যাও আরতির দীপ, ফুল-মকরন্দ।
যাও নারদের বীণা, অভয়ের হাস্য,
যাও বিভীষিকা-শেষে দেবতার আস্য।
যেথা জাগে দম্ভ ও বিনাশের যন্ত্র,
যাও সেথা প্রেম-ক্ষেম-মিলনের মন্ত্র।
মাথা পাতো, ইউরোপ, পুণ্যের ফল গো—
ঋষি-কবি যান লয়ে শান্তির জল গো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বঙ্গমাতার যে সমুদয় কৃতী সন্তান ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় পাঠ করিলে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ স্বতঃই উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহাতে বিশিষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু প্রধানতঃ আধুনিক যুগের বাঙ্গালীর কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালেও যে বাঙ্গালী স্বীয় দেশ হইতে বহুদূরে কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন শিলালিপি সম্যক্ আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি তিনখানি শিলালিপিতে আমি এইরূপ বিবরণ পাঠ করিয়াছি। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত-সার লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা প্রাচীন লিপির আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই যদি এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ বিবরণগুলি প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটি লুপ্ত প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে।

১। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাকতীয় বংশের রাজগণ উড়িষ্যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের গণপতি-রাজ ৬২ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রুদ্রদেবী অথবা রুদ্রাম্বা নাম্নী তাঁহার কন্যা, রুদ্রদেব-মহারাজ এই পুরুষ-নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১২৬১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গন্তুর জিলার অন্তর্গত গন্তুর তালুকের অধীনস্থ মাল্‌কাপুরম্ নামক স্থানে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের বিবরণ অবগত হওয়া যায় (১)

লিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য গৌড়-দেশের অন্তর্গত রাঢ়া প্রদেশের পূর্ব্বগ্রাম নামক স্থানের অধিবাসী, সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইনি ধর্ম্মশম্ভু নামক শৈব গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ, ও চোল-রাজ এবং অন্যান্য রাজগণ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাকতীয়-রাজ গণপতি নিজেকে ইঁহার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল এবং বাঙ্গালা দেশের বহু শৈবাচার্য্য ও কবি কাকতীয়-রাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। লিপিখানিতে উক্ত হইয়াছে যে আলম্বিত কর্ণভূষণ, কণ্ঠহার ও হেমকান্তি জটাধারী, প্রতিভা-দীপ্ত মুখমণ্ডল বিশ্বেশ্বর-শম্ভু যখন গণপতি রাজার প্রাসাদে বিদ্যামণ্ডপে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হইতেন। ১১৮৩ শকাব্দে (১২৬১ খৃষ্টাব্দে), রাণী রুদ্রদেবী আচার্য্য বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মন্দর ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম ও কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। মন্দর নামক গ্রামে আচার্য্য কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপিত হয়। তিনি ঐ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ইহাকে "বিশ্বেশ্বর গোলকী" নাম প্রদান করেন। কাকতীয় রাণীর নিকট হইতে তিনি যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া-

(১) মূল লিপিখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯১৫—১৯১৬ সালের দক্ষিণ বিভাগের আর্কিওলজিক্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বার্ষিক রিপোর্ট (৪৪ পৃঃ) ও ১৯১৭ সালের গভর্ণমেণ্ট এপিগ্রাফিষ্টের রিপোর্টে (১২২ পৃঃ) ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

ছিলেন, তাহার কিয়দংশ ষাটটি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশিষ্ট সমান তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ভাগ শিব মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, দ্বিতীয় ভাগ শুদ্ধ শৈবগণের মঠ ও ছাত্রগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এবং তৃতীয় ভাগ একটী মাতৃমন্দির, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী অন্নসত্রের ব্যয় বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। ঋক্, যজু ও সাম বেদ পড়াইবার নিমিত্ত তিন জন এবং ন্যায়, সাহিত্য ও আগমের নিমিত্ত পাঁচজন অধ্যাপক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও একজন হিসাব নবীশও নিযুক্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত দুই পুট্টি ভূমি বরাদ্দ ছিল। মন্দিরে দশজন নর্ত্তকী ও আটজন বাদ্যকর ছিল। মঠ ও অন্নসত্রে একজন কাশ্মীর দেশীয় গায়ক, চৌদ্দজন গায়িকা, ছয়জন নর্ত্তকী, দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, চারি জন ভৃত্য, ছয়জন ব্রাহ্মণ ভৃত্য ও দশজন বীরভদ্র ছিল। এই বীরভদ্রগণ গ্রামের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত এবং গ্রামের রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে উদর, জিহ্বা ও মস্তক কর্ত্তন করিত। এতদ্ব্যতীত বিশজন বীরমুষ্টি ভৃত্য ছিল। ইহারা শিবপন্থী, এবং স্বর্ণকার, তাম্রকার, কর্ম্মকার, রাজমিস্ত্রী, কুম্ভকার, স্থপতি, সূত্রধর, নাপিত ও শিল্পীর কার্য্য করিত। উল্লিখিত একাশী জন প্রত্যেকে এক পুট্টি করিয়া জমি পাইত। এতদ্ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য স্বীয় জন্মভূমি পূর্ব্বগ্রাম নিবাসী ৩০ জন শ্রীবৎস গোত্র ও সামবেদী ব্রাহ্মণকে তৎপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের আয়ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই এক পুট্টি জমি দান করিয়াছিলেন। অন্নসত্রে যাহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলেই সকল সময়ে আহারাদি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ছিল। মন্দির, অন্নসত্র, মঠ ও গ্রাম—এই সমুদয়ের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একশত নিষ্ক বেতনে সর্ব্বোপরি একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই অধ্যক্ষ তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিলে, অথবা অন্য কোনরূপ কুব্যবহার করিলে, স্থানীয় শৈব সম্প্রদায় একযোগে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

উল্লিখিত মহদনুষ্ঠান ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য আরও নানা স্থানে মঠ, শিবলিঙ্গ ও অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমি দান করিয়াছিলেন। নিজের নামানুসারে তিনি "বিশ্বেশ্বরনগর" নামক একটি নগর ও "বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ" নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই কর্ম্মবীর, সুদূর দাক্ষিণাত্যে গৌরবময় রাজগুরু পদে অভিষিক্ত থাকিয়া, এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন করতঃ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

২। ঈশান শিব।

প্রাচীন পঞ্চাল দেশের অন্তর্গত, যুক্তপ্রদেশস্থ বদাউন নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে (২) আর একজন বাঙ্গালী শৈব সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাল দেশে রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ঈশান শিব নামক গৌড়দেশীয় একজন শৈব সাধক এই বংশের দশম রাজা অমৃতপালের গুরু এবং একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বৎসভার্গব গোত্রীয় এবং ভার্গব, চ্যবন আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ প্রবরযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সরস কদলীদণ্ডবৎ অসার সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত হন। কালক্রমে তিনি রাজগুরু ও মঠাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইয়া, একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের বর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে যে, মহাদেব কৈলাসগমনে বিমুখ হইয়া ঐ মন্দিরেই বসতি করিতে এবং সূর্য্যদেব অবিরত আকাশমার্গে পরিভ্রমণে ক্লান্ত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য ইহার উচ্চচূড়ায় বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য ও ঈশান শিবের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, ত্রয়োদশ

(২) এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম সংখ্যা, ৬৫ পৃঃ।

শতাব্দীতে বাঙ্গালায় শৈব ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন।

৩। গদাধর।

আগ্রা জিলার অন্তর্গত বটেশ্বর নামক স্থানে প্রাপ্ত এবং চান্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের রাজত্বকালে ১২৫২ সংবতে (১১৯৫ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপির (৩) নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকে আগ্রা প্রদেশস্থিত একটি বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়।

"গৌড়ান্বয়ৈক তিলকস্য গদাধরাখ্যো
　লক্ষ্মীধরস্য তনয়ঃ কবিচক্রবর্ত্তী।
বিদ্যাবতাং স পরমঃ পরমর্দ্দিদেব
　সংধানবিগ্রহ মহাসচিবো বভূব॥
তস্যাত্মজো দেবধরঃ কবীন্দ্রঃ
　প্রশস্তিমেতামতুলাঞ্চকার।
অস্যানুজো ধর্ম্মধরশ্চ ধীরঃ
　কুতূহলাদ্বালকবিল্লিলেখ॥

এই শ্লোকদ্বয় হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়দেশীয় লক্ষ্মীধরের গদাধর নামক এক পুত্র ছিল। ইনি কবি ও বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং চান্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের সান্ধি-বিগ্রাহিক এই নামধেয় সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র দেবধরও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিখানি তাঁহারই রচনা।

যে সময় বাঙ্গালা দেশ উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞের অভাবে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া যবনগণের পদানত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই একজন বাঙ্গালী সুদূর আগ্রা প্রদেশে সান্ধিবিগ্রাহিক নামক উচ্চ অমাত্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

(৩) এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম সংখ্যা, ২১১ পৃঃ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

অভাব দর্শন—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা, ১০১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত এবং মামুদপুর, (জেলা ফরিদপুর) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৶০

ইহা একখানি দার্শনিক প্রবন্ধ পুস্তক। গ্রন্থকার এই "অভাবময় বিষয় সংসারে বহুরূপ অভাব দর্শন জনিত" দুঃখ পীড়াদি দর্শন করিয়া, সেই "অভাব শব্দ" অবলম্বনেই এই "অভাব দর্শন" নামক পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে বিষয়কামী এবং বিষয় ভোগী ব্যক্তিগণ যে, কামনা ও ভোগের ভিতরেও নানা প্রকার অভাব দর্শন জনিত দুঃখ, পীড়া ও সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন এবং বাসনা ও আসক্তিই যে উক্ত অভাব ও দুঃখাদি অনুভবের মূল এবং সে সকল যে, বস্তুতঃ সত্যজ্ঞান প্রসূত নহে, গ্রন্থকার তদনুকূল নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। পুস্তকখানি শিক্ষা ও উপদেশ মূলক। দর্শন শাস্ত্রানুরাগীদিগের ইহা ভাল লাগিবে। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল।

ভাষাটা অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর ও সহজবোধ্য হইলে ভাল হইত। পুস্তক খানির কাগজ ও ছাপা পরিষ্কার।

সপ্তক—গল্প-গ্রন্থ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত। কলিকাতা, ২৮ নং বাগ্বারাম অক্রুর লেন, "বাণী" প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ, বি-এল ভবানীপুর, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ১৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

সাতটি গল্পের সমষ্টি, এই জন্য বহি খানির নাম দেওয়া হইয়াছে "সপ্তক"। গল্পগুলির আখ্যান ভাগে তেমন কিছু নূতনত্ব দেখা গেল না। সবগুলিই সেই মামুলি ধরণের। তবে গল্প গুলির মধ্যে "বিভ্রম" গল্পটি মন্দ হয় নাই, বেশ সহজ ও সরল ভাবেই লিখিত হইয়াছে। গল্পটির শেষ ভাগই

অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। যাহা হউক, গল্প কয়টি মোটের উপর সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করিলেও, লেখকের রচনা শক্তি আছে।

তারপর ছবির কথা। আজকাল বিবাহের ব্যাপারে যেমন কতকগুলা করিয়া কবিতা লেখার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে, উপন্যাস ও গল্পের বহিতেও, আমরা দেখিতে পাই, তেমনি কতকগুলা ছবি যুড়িয়া দেওয়া প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমাদের বিবেচনায় এই ব্যর্থ ছবিগুলি না দিলেই ভাল হইত।

বহিখানির ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নহে।

মরুর কুসুম—উপন্যাস। শ্রীশাহাদাৎ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা, ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রকাশক—এম্, ফজলর রহমান, এম, সেলাম, আহমদ এণ্ড কোং, ১০৮।৩, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবলক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৮৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

ইহা মুসলমান রাজত্ব কালের একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও ইহার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি গ্রন্থকার অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বাদসাহ সেলিম, আনার, নূরজহান, যোধাবাই, অমরসিংহ, মানসিংহ এবং সোফিয়া প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি অল্প বিস্তর ভাবে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাগ্য এবং সহায় হীনা ইরানবালা আনারের জীবন কাহিনী আদ্যন্ত বড়ই করুণ ও মর্ম্মভেদী। পাঠ করিতে করিতে চোখে জল আসে। এই আনার কাহিনীই আলোচ্য উপন্যাস খানির প্রধান অবলম্বন। লেখকের রচনা শক্তি আছে। ভাষাটি সরল এবং সৌষ্ঠব সম্পন্ন। ইহা আজকালকার "চলিত" ভাষা নয়। ভাষা সম্বন্ধে লেখক সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, আমরা উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

একখানি মাত্র ছবি ইহাতে আছে। ছবিখানি না দিলেই ভাল ছিল। বহিখানির ~~ক্রাউন~~ ছাপা ও রেশমী বাঁধাই খুব উৎকৃষ্ট।

কবিকথা—২য় খণ্ড। শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা, ৫ নং ছিদামমুদীর লেন, শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত ও কলিকাতা, ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ৫১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

এখানি গ্রন্থকার প্রণীত "কবিকথার ২য় খণ্ড। ইহার ১ম খণ্ডে গ্রন্থকার কালিদাস ও ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি গল্পাংশ গদ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আলোচ্য খণ্ডে প্রাচীন মহাকবি ভাসের নাটকগুলির গল্পাংশ সেইরূপ ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"বঙ্গসাহিত্যের দিন দিন পরিপুষ্টি সাধিত হয় ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ, তাই সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের এই অভিনব রত্নের আলোকে বঙ্গসাহিত্যকে যথাসাধ্য আলোকিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" নিখিল বাবু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর এ শুভ উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সম্পদশালী করিতেছেন, ইহা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থের ভাষা, আমাদের বিবেচনায়, অপেক্ষাকৃত সরল ও সরস হইলে ভাল হইত। বোধ হয়, সংস্কৃত মূলের ভাব যথাযথ বজায় রাখিতে গিয়াই ভাষা কিছু দুর্ব্বোধ্য, নীরস ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে। আমরা পাঠকগণকে বিখ্যাত প্রাচীন কবি ভাসকৃত নাটক গুলির বিবরণ ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থে ছয়খানি ছবি আছে, তার মধ্যে দুই একখানি আমাদের ভাল লাগিল।

পুস্তকখানি এণ্টিক কাগজে ছাপা, বাঁধাই ভাল।

আমার ভুল—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ৬৭।৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট "ইউনিয়ন" প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৹

এখানি গল্প ও কবিতাগ্রন্থ। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহেন, সময়ে সময়ে তাহার পরিচয় আমরা কোন কোন মাসিকপত্রে ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার ছয়টি ছোট গল্প ও ৩৩টি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। গল্প ও কবিতাগুলি যেমন সরস তেমনি হৃদয়স্পর্শী। গল্প রচনায় তেমন বিশিষ্ট শক্তি না থাকিলেও, লেখকের লিখিবার বেশ কৌশল আছে। কবিতাগুলিও সরল, সুললিত এবং ভাবপূর্ণ। কবিত্বরস আছে। কতকগুলি কবিতা, বিশেষতঃ "রামকৃষ্ণ" শীর্ষক কবিতাটি উৎকৃষ্ট

হইয়াছে। পুস্তকখানি সুপাঠ্য হওয়ায়, আশা করি, পাঠকগণের নিকট আদর লাভ করিবে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভাল।

আকাশের খোকা।—শ্রীমতী কানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ, রায় এম্ সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৵০

ইহা বালক বালিকাদের জন্য বেশ সহজ ভাষায় লিখিত একখানি ছোট গল্পের বহি। বালক বালিকাদিগকে গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়াই রচয়িত্রীর উদ্দেশ্য। সৎপথে থাকিলে মানুষের সদ্‌গতি হয় এবং অসৎপথে থাকিলে অসদ্‌গতি ঘটে, ইহাই আলোচ্য গল্পটির নীতি। আমরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। গল্পের ভাষাটিও ছেলে মেয়েদের পক্ষে বেশ মনোরঞ্জক ও সহজবোধ্য হইয়াছে। বহিখানির নাম শুনিয়া তাহারা যেমন আশ্চর্য্য হইবে, পাঠ করিয়া তেমনি আনন্দ ও কৌতুক উপভোগ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-লাভও করিবে।

পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা ভাল।

"কমলাকান্ত।"

বন্দিনী (উপন্যাস)।—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত ও ২৩ নং রামাপুকুর লেন হইতে শ্রীভোলানাথ দেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

গ্রন্থকারের আরও ৫।৭ খানি উপন্যাস পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি সাহিত্য-সংসারে পরিচিত হইয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি অনেক দিন হইল আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিন্তু নানা কারণে এপর্য্যন্ত পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি নাই। যাহা হউক এখন শ্রীপতি বাবুর সুচিন্তিত ও সুসমঞ্জস কল্পনার পরিচয় দিতেছি। পুস্তকখানিতে প্রধানতঃ দুইটী বিভিন্ন চরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহা বেশ পরিস্ফুটও হইয়াছে। স্বার্থপর অর্থশোষকণারী জমীদার নগেন্দ্রনাথ, কুটবুদ্ধি তোষামোদ-পটু নীচপ্রবৃত্তিপর কর্ম্মচারী কার্ত্তিক পোদ্দারের সাহায্যে নির্ম্মমভাবে প্রজাপীড়নে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। গ্রামবাসী গৃহস্থ, চিরকৌমার ব্রতাবলম্বী শিক্ষিত শিবনাথ, গ্রামবাসী অপর যুবকগণকে সৎশিক্ষা দিয়া, দেশের প্রাণস্বরূপ অসহায় মূর্খ কৃষককুলের সুবিধা ও উন্নতিবিধান কল্পে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিবনাথ তাহাদেরই সাহায্যে, নিজে দুর্ব্বল হইয়াও প্রবল জমীদারের বিরুদ্ধে কিছুকাল পর্য্যন্ত কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে বেশ দেখাইয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ—জমীদারের কূট-চক্রান্তে অর্থবলশূন্য শিবনাথ-দলের অকৃতকার্য্যতা এবং তাহাদের সকলের পীড়ন দলনের চিত্রগুলিও সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ঘটনাবলীর ঘাত ও প্রতিঘাতে পাঠকের মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে। গ্রন্থকার উপন্যাসের উপসংহারটী বেশ মনোমদ করিয়া তুলিয়াছেন—স্বাভাবিক ঘটনাবশে দুষ্ক্রিয়াকে সংযত ও অমঙ্গলকে দূরীভূত করিয়া অথচ চরিত্রগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, দুর্দ্দান্ত জমীদারের মনোভাব পরিবর্ত্তন করাইয়া, জমীদার প্রজার পরস্পর বিপক্ষতাচরণের পরিবর্ত্তে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া, গ্রামে মঙ্গল সুখ শান্তি সংস্থাপন করিয়া, চিত্রটী সুন্দর মনোজ্ঞ করিয়া পাঠকের উদ্বেগ দূর করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে শিবনাথ কর্ত্তৃক শিক্ষিতা—কেবল লেখাপড়া শিক্ষা নহে, পরদুঃখকাতরতা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষিতা—তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, সেটীও আলোচ্য গ্রন্থে একটী প্রধান চিত্র এবং গ্রন্থকার তাহা চিত্রণে বেশ সফলতা লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা দেশ কাল পাত্রোপযোগী, কিন্তু স্থানে স্থানে কমা, ছেদ কোটেশন প্রভৃতি চিহ্ন অভাবে প্রথমদৃষ্টিতে একটু গোলমাল ঠেকে। ছাপা ও বাঁধা বেশ পরিপাটী ও সুদৃশ্য।

"বাণীসেবক।"

শান্তিমন্দির—উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। বিউটী প্রেস ও দেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স হইতে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২৪৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আমরা একটী সুন্দর গার্হস্থ্য চিত্র দেখিতে পাইলাম। গ্রন্থের নায়িকা শ্রীমতী কণিকাসুন্দরী সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিয়া স্বামীর অপেক্ষায় রহিয়াছেন; কারণ পত্নীপ্রাণ শ্রীশচন্দ্র কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশ গমন করিয়াছেন এবং তথা হইতে পত্র দিয়াছেন যে উক্ত দিনে তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তিনি না আসিয়া কণিকাকে এক পত্র লিখিয়া এবং কণিকাকে সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া অজ্ঞাতবাস করেন। ইহার কারণ এই যে, শ্রীশচন্দ্রের অন্নপুষ্ট রামেশ্বর, কণিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া স্বীয়

পাপাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কণিকার নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া শ্রীশচন্দ্রকে এক পত্র লিখিয়াছিল। ভ্রমান্ধ শ্রীশচন্দ্র পত্রোক্তি ধ্রুব সত্য স্থির করিয়া, কণিকাকে পূর্ব্বোক্ত পত্র লিখিয়া ইক্ষুদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় নাম গোপন করিয়া ষ্টুয়াট সাহেবের সহিত মিলিত ভাবে 'ষ্টুয়াটচন্দ্র' নামে চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

এদিকে পাপিষ্ঠ রামেশ্বর শ্রীশবাবুর গৃহ হইতে তাড়িত হইবার পর, একটি খোলার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে বাড়ীওয়ালীর কৌশলে তাহাকে কুলীরূপে ইক্ষুদ্বীপস্থ জনৈক সাহেব কোম্পানীর আবাদে যাইতে হয়। সেখানে তাহার চুক্তিকাল উত্তীর্ণ হইবার পর, এক কুলী রমণীকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে লইয়া ষ্টুয়াট চন্দ্রের কারখানায় পলায়ন করে। পথিমধ্যে রামেশ্বর শিকারী কর্তৃক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া ষ্টুয়াটচন্দ্রের কুলী-হাসপাতালে নীত হয়। তথায় সে শ্রীশবাবুর সহিত দেখা করিতে চাহিলে শ্রীশবাবু তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন। মৃত্যুশয্যায় রামেশ্বর স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া বলে যে সে কণিকার নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া শ্রীশচন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিল। ইহাতে শ্রীশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কণিকাকে দেখিবার জন্য স্পেশাল ট্রেণে রওনা হয়েন।

এদিকে কণিকা ৺পুরীধামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দ্বাদশ বর্ষকাল প্রত্যহ তাঁহার পূজা করেন এবং অনাথা বিধবাদিগের ভরণ-পোষণ করেন।

ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের সহিত কণিকার মিলন হইল। কিছুকাল পরেই স্বামীর ক্রোড়েই মস্তক রাখিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তদবধি শ্রীশচন্দ্র উক্ত মন্দিরের নাম 'স্মৃতি মন্দির' রাখিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল মন্দিরেই অবস্থান করেন।

কণিকা চরিত্র অতি সুন্দরই হইয়াছে। কণিকার মৃত্যুই শ্রীশচন্দ্রের অবিমৃষ্যকারিতার শাস্তি! সাবিত্রীসমা রমণীর সতীত্বে কলঙ্ক আরোপ করিলে কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয় তাহা 'রামেশ্বর' চরিত্রে গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রগুলিও উপভোগ্য হইয়াছে।

"দেবদত্ত।"

নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ—৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীঅবনিনাথ ভট্টাচার্য্য, ১০৬।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৯০+৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০

এই গ্রন্থ সমালোচনা-বিষয়ক। ইহাতে এক দিকে যেমন মূল সূত্রগুলি নির্দ্দেশ করা আছে, তেমনি দুই চারিখানি কাব্য অবলম্বন করিয়া সে সকল বুঝাইয়া দেওয়াও হইয়াছে। আজি কালি যেরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এ গ্রন্থ সেরূপ নহে। অন্য শ্রেণীর কাব্য হইতে নাটকের কি প্রভেদ, কি কারণে সে প্রভেদ জন্মে, সেই প্রকৃতিগত প্রভেদের জন্য অন্য কাব্যের তুলনায় নাটকের মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান প্রধান ও অধিক প্রয়োজনীয় হয়, এবং সেই উপাদান রচনা করিতে কি শ্রেণীর কবি-প্রতিভার প্রয়োজন, সচরাচর নাটকে কি ত্রুটি দেখা যায়, কি কি কারণে সেই ত্রুটি আসিয়া পড়ে—এই সকল মূল-তত্ত্ব গ্রন্থকার অল্প কথায় দার্শনিক আলোচনা দ্বারা বিশদ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে দুই তিন খানি কাব্য দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দীনবন্ধু বাবুর সধবার একাদশী হইতে নিমে দত্তের চরিত্রই বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সে চরিত্র-রচনার সফলতা দেখাইয়াছেন। এই অংশেও মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহার সূক্ষ্মদর্শন ও কাব্যরসগ্রাহিতার বিশেষ পরিচয় আছে। দুইটী পৃথক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রান্তি-বিলাস ও কবি ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বঙ্গসুন্দরী কাব্যেরও সমালোচনা আছে।

গ্রন্থ-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া মনস্বী লেখক মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণও উপদেশ পাইতে পারেন। এই পুস্তকের প্রথম অংশে, এবং স্থল-বিশেষে অন্য অংশেও, যেখানে তিনি বিবিধ শ্রেণীর কাব্যের মূল তত্ত্ব সকল মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রাঞ্জল, অথচ অল্প কথায় ব্যক্ত, যে সে সকল স্থল এরূপ রচনার আদর্শ স্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য। বিষয় যতই জটিল ও গুরুতর হউক না কেন, লেখক তাহা এমন স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তৎপাঠে বিস্মিত হইতে হয়। দার্শনিক ভাবের সমালোচনা আজি কালি কিছু কিছু যে না দেখা যায় এমত নহে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্যগুলির বিশ্লেষণ করিয়া, দৃশ্য ও শ্রাব্যকাব্য ভেদে তাহাদের বিকাশ ও প্রদর্শনের নিমিত্ত যে সকল চিরন্তন বিধিনিষেধ স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহা পরিষ্কার ভাবে বিবৃত করিয়া, তাহা হইতে প্রণালী স্থির করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

লেখক আজ কালকার লোক নহেন; বঙ্কিম বাবু দীনবন্ধু বাবুর সময়ের লোক ছিলেন। তাঁহার ভাষায় কোন আড়ম্বর নাই; একদিকে যেমন সংস্কৃতের আড়ম্বর নাই, অপরদিকে তেমনি সংস্কৃত পরিহার করিবারও আড়ম্বর নাই। ইনি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু ইঁহার ভাষাতে কোথাও ইংরাজীর গন্ধ নাই। এ সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিব-ছত্রপতী—Extracts and Documents relating to Maratha History, Vol. I) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ মহাশয়ের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি শিবাজীর পারিষদ্ কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদের মারাঠী বখর্ ('শিব-ছত্রপতী-চেঁ চরিত্র)—ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন।

ছত্রপতি শিবাজী সম্বন্ধে যে-সমস্ত মারাঠী উপাদান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রাজারামের আদেশানুসারে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ শিবাজীর মৃত্যুর প্রায় ১৪ বৎসর পরে) রচিত, সভাসদের বখর্ই একমাত্র মূল্যবান্; ইহা কোন রাজকীয় কাগজপত্র অবলম্বনে রচিত নহে,—স্মৃতির সাহায্যে লিখিত। শিবাজী সম্বন্ধে অন্যান্য মারাঠী বখর্গুলির অধিকাংশই সভাসদের রূপান্তরমাত্র।

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) জগন্নাথ লক্ষ্মণ মান্‌কর্ Life and Exploits of Shivaji নাম দিয়া এই সভাসদ্ বখরের ইংরেজী অনুবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। মান্‌কর একখানি মাত্র পুঁথির সাহায্যে অনুবাদ কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন; ইহার একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। একাধিক পুঁথি হস্তগত না হইলে পাঠান্তর ধরা পড়ে না; সুতরাং অনুবাদে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই; অনুবাদ-কালে তিনি রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে কর্ত্তৃক সম্পাদিত সভাসদ্-বখরের সাহায্য পাইয়াছেন। সানে মহাশয় একাধিক পুঁথি মিলাইয়া, বিভিন্ন পাঠান্তর ও টীকাটিপ্পনীসহ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং ইহা যে মান্‌করের একমাত্র মূল পুঁথি অপেক্ষা সমধিক বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও একটী কথা, অনুবাদে সুরেন্দ্রবাবু যথাসাধ্য মূলের অনুসরণ করিয়াছেন;—কিন্তু মানকরের অনুবাদ সর্ব্বত্র মূলানুগত নহে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টা সফল হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে টিট্‌নীস্ ও শিবদিগ্বিজয় বখরদ্বয় হইতে কোন কোন অংশের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়ায়, সভাসদের অঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থশেষে,—'শিবাজীর জীবন চরিত সম্বন্ধে মারাঠী উপকরণ,' 'উদয়পুর রাজপরিবারের সহিত শিবাজীর তথাকথিত সম্বন্ধ,' এবং 'প্রাচীন মারাঠী-ভাষার উপর ফার্সীর প্রভাব,'—এই তিনটী পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। এগুলি রাজবাড়ে রচিত মারাঠী প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে লিখিত। ইংরাজী পাঠকদের সম্মুখে মারাঠাদেশীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা উপহার দিয়া সেন মহাশয় জ্ঞানবিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির কাগজ ও অক্ষর সুন্দর; কিন্তু ছাপার ভুল অসংখ্য, ইতিহাসে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

সুরেশের শিক্ষা (উপন্যাস)।—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। কলিকাতা সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ১৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷৹

এখানি গুরুদাস লাইব্রেরীর আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চাশত্তম গ্রন্থ। সুরেশ, পাড়াগাঁয়ের স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিল, হিন্দু হষ্টেলে বাসা করিল। পল্লীগ্রাম হইতে হঠাৎ রাজধানীতে আসিয়া সুরেশ যাহা দেখিল শুনিল, তাহার মনের ভাব যেরূপ হইল, সে মুহূর্দয়ের বর্ণনা ইহাতে আছে। বৌবাজারে হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়া চুল ছাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া ফুটবল ম্যাচ খেলা, সহপাঠীর বিবাহে বরযাত্রা—সবই বর্ণিত হইয়াছে। সুরেশ অবশেষে এম-এ পাস করিয়া হষ্টেল ছাড়িল।

বর্ণনা গুলি সমস্তই সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; হাসির ফোড়নও মাঝে মাঝে বেশ আছে। ছাত্রগণের শিখিবার ও ভাবিবার কথাও বহিখানির অনেক স্থলে দৃষ্ট হইল।

(১) মুক্তাচরি (২) রাগরঙ্গ (৩) রাখালের রাজগি—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। বহিগুলি যথাক্রমে কলিকাতা কান্তিক প্রেস, স্বর্ণ প্রেস ও এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। সবগুলির প্রকাশক মেসার্স গুপ্ত এণ্ড কোং, ৪৯ রসারোড, ভবানীপুর। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে—৮২+২১, ৭৭+১৮ ও ৮০+১৬, মূল্য প্রত্যেকখানির ১৲

বাঙ্গালায় যাহা কখনও পুরাতন হইবার নহে, সেই রাধা-কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া, দীনেশ বাবু এই পুস্তক তিন খানি লিখিয়াছেন। লিখিবার ভঙ্গীটি উপন্যাস অথবা বড় গল্প লেখার মত। গল্পগুলির উপাদান প্রধানতঃ মহাজন-পদাবলী। সেক্স-

[illegible]পিয়রের নাটক অবলম্বন করিয়া ল্যাম্ব সাহেব যেমন তাঁহার Tales লিখিয়াছিলেন, সেই রূপ মহাজন-পদাবলী অবলম্বন করিয়া রায় সাহেব এই গল্প তিনটি তৈয়ারী করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সুবিধাও হইয়াছে যথেষ্ট। কীর্ত্তন-পদাবলীর ভাব ও ভাষা তিনি অনেক স্থানে গদ্যে তর্জ্জমা করিয়া দেওয়াতে, রচনা গুলি কবিদের রসে ও গন্ধে অতি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। "মুক্তাচুরি"র অবতরণিকাতে তিনি লিখিয়াছেন —"এ দেশের গৌরব সম্বন্ধে একজন লেখক ইতিপূর্ব্বে একটি সন্দর্ভ লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশের প্রথম গৌরব হচ্ছে হাতী,—এ শুনে আমরা হাসি সংবরণ করতে পারিনি। কিন্তু আমার মতে এ দেশের গৌরব করার মত চারটি জিনিষ আছে। প্রথম ঢাকার মসলিন ......দ্বিতীয়, নব্য ন্যায়,......তৃতীয় গৌরব, ফজলী আম...... মনোহর সাই কীর্ত্তন হচ্ছে বাঙ্গলার চতুর্থ এবং সর্ব্ব প্রধান গৌরব।......কীর্ত্তনের পদাবলী থেকে সংগ্রহ করা ভাবগুলি নিয়ে আমি যে বইগুলি লিখেছি, তাদের সম্বন্ধে মৌলিকতার দাবী আমি করি না।......মহাজনগণের ভাণ্ডারে যে সকল মুক্তা পেয়েছি, তাঁদের কবিত্বের [illegible] আমি সেগুলি অপহরণ করেছি।"—আমরা বলি, বেশ [illegible]ছেন। আমরা তাঁহার এই চোরাই মাল সাদরে ও জ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া, ৪১১ ধারার আসামী হইতেও রাজি আছি—লোভ সংবরণ করা দুষ্কর।

বহি তিন খানির আখ্যানাংশ কি, তাহা বলিতে আমরা বিরত রহিলাম; পাঠকগণ পড়িয়া দেখিবেন। রাধা-কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ হইলেও এই বহি তিনখানির কুত্রাপি এমন কিছুই নাই, যাহা পুত্র পিতাকে পড়িয়া শুনাইতে পারে না—অথচ রস যথেষ্টই আছে। কিঞ্চিৎ নিন্দা করাও আবশ্যক বিবেচনায় লিখি, রাধা কৃষ্ণ, কথোপকথনে "হলুম" "গেলুম" প্রভৃতি "বাঙ্গী ভাষা" ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া একটু রসভঙ্গ হয়। রাধা কৃষ্ণ কখনও কলিকাতায় আসেন নাই, এবং "কথ্য" ভাষার কোনও পাণ্ডা কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোনও মাসিক পত্রেরও গ্রাহক ছিলেন না ইহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অপরাজিতা" উপন্যাস যন্ত্রস্থ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

রজনী গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী হইতে বাঙ্গলায় প্রবন্ধ রচনার জন্য দুইটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। প্রথম—"রজনী গুপ্ত স্মৃতি পদক"; বিষয়—"মোগল আমলে বাঙ্গালীর বীরত্ব ও রাজ্য শাসন।" দ্বিতীয়—"শিশিরকুমার স্মৃতি-পদক"; বিষয়—"পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায়।" উভয় প্রবন্ধই ১২৮।২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ১৯২০ সালের ১৫ই নভেম্বর মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। সমাদ্দার মহাশয়ের "সমসাময়িক ভারতের" প্রথম খণ্ডের হিন্দী সংস্করণ রাজপুতনা হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমাদের পূর্ব্ব প্রথানুসারে শারদীয়া (কার্ত্তিক) সংখ্যায়, ধারাবাহিক কোনও উপন্যাস বা প্রবন্ধাদি থাকিবে না। ঐ সংখ্যা আগামী ২১শে আশ্বিন (ইং ৭ই অক্টোবর) আমরা ডাকে দিব। যদি কোনও গ্রাহক গ্রাহিকা তৎপূর্ব্বেই স্থান পরিবর্ত্তন করেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া নূতন ঠিকানা আমাদিগকে জানাইবেন, আমরা সেই নূতন ঠিকানায় কার্ত্তিক সংখ্যা তাঁহাদিগকে পাঠাইব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



উহার জননীর [illegible]

[illegible]

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১২শ বর্ষ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩২৭ | ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা

অর্দ্ধেন্দু-কথা *

(১)

যাঁহারা আজ রাত্রে আমায় 'অর্দ্ধেন্দু-কথা'র বোধন-তলায় বসাইয়া এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বা বিচার-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। কারণ, অর্দ্ধেন্দু বাবু হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেন—তাঁহার ভাবভঙ্গী পোষাকপরিচ্ছদ, স্বরলয় সব জিনিসেই হাস্যরস বা ভাঁড়ামি ফুটিয়া পড়িত; আর আমি চিরদিন ইস্কুলমাষ্টারি করিয়া আসিয়াছি, আমাকে সর্ব্বদাই গম্ভীর হইয়া থাকিতে হইত, অথবা গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর গম্ভীরতম হইয়া থাকিতে হইত—কারণ আমি ইস্কুল মাষ্টারও ছিলাম না, ছিলাম ইস্কুল-পণ্ডিত। যে ছেপ্‌লামিতে অর্দ্ধেন্দু বাবুর সুখ্যাতি ধরিত না, সেরূপ ছেপলামি আমি করিলে, মার খাইতে হইত। তাই বলিতেছিলাম, এ কাজের ভারটা আমার উপর না দিলেই হইত।

তাহার পর আর এক কথা—গ্রহ, উপগ্রহ আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখন না কখন তাহাদের orbit cross করে; আমরা দুজনেই যদিও কলিকাতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, আমাদের orbit কদাচ কখন cross করে নাই। সুতরাং তাঁহাকে বুঝিবার সুযোগ আমার হয় নাই। কখন কখন থিয়েটারে যাইতাম। কিন্তু কে যে কোন পার্ট লইয়াছে তাহা জানিবার সুযোগও হইত না, ইচ্ছাও ছিল না। তবে অর্দ্ধেন্দু বাবুর যশ বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। ১৮৭৬।৭৭ সালে চিৎপুর রোডে মল্লিক বাবুদের বাড়ীর সামনে একটা বড় বাড়ীতে 'নীলদর্পণ' দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। সেদিনকার উড্ সাহেবটি খুব ভাল হইয়াছিল। সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে—যেন সব চোকের উপর ভাসিতেছে। অনেক সময়ে থিয়েটারে দেখিতাম, অর্দ্ধেন্দু

* বিগত ৩০শে ভাদ্র ১৩২৬, মঙ্গলবারে মিনার্ভা থিয়েটারে ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে যে বিশেষ অভিনয় হয়, সেই অভিনয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটী উক্ত স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

বাবু ধুতি ও চাদর গায়ে, ভুঁড়ীটি খুলিয়া নানারূপ রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন, আর থিয়েটার সুদ্ধ লোক হাসিতেছে। একবারের একটা কথা বড়ই মনে পড়িতেছে—সেটা আলবার্ট হলে। তিলক আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত আলবার্ট হলে সভা হইয়াছে, ষ্টেজ হইয়াছে, নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও কৌতুক হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু বাবু একাই একটি ডিস্পেন্সরী সাজিয়াছেন। অতি কাতর স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁচিঁ করিতে করিতে ডাক্তারের কাছে গিয়া আপনার কষ্টের কথা বলিতেছেন; আবার ডাক্তার হইয়া ভঙ্গী করিয়া রোগী দেখিতেছেন, রোগীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর টেবিল হইতে কাগজ লইয়া প্রেস্ক্রপ্সন লিখিতেছেন; আবার কম্পাউণ্ডার হইয়া "এস" বলিয়া রোগীকে ডাকিতেছেন আর ঔষধ দিতেছেন—বলিতেছেন, "এ কাগজখানি হারিও না, আবার যখন আসবে কাগজখানি হাতে করে' এস।" ঔষধ দিতেছেন কিন্তু সেই এক ক্যাষ্টর অয়েল। একজন রোগী চিৎকার করিতে করিতে আসিল, দাত কট্‌কটানিতে



অর্দ্ধেন্দুশেখর—যৌবনে



অর্দ্ধেন্দুশেখর—প্রৌঢ়ে

সে মারা যাইতেছে, সে কখন মুখে হাত দেয়, কখন কাঁদে, কখন যন্ত্রণায় বসিয়া পড়ে।" ডাক্তার হাত দেখিলেন, পেট টিপিলেন, আর ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবস্থা করিলেন। কম্পাউণ্ডার বলিলেন—এস। খানিক ক্যাষ্টর অয়েল একটা শিশিতে ঢালিয়া দিলেন। রোগী বলিল, "আমার হয়েছে দাঁতে শূল, আপনি জোলাপ দিলেন যে ?" কম্পাউণ্ডার খাদে গলা তুলিয়া বলিলেন, "ওতেই আরাম হবে।" এইরূপ কত রোগী আসিল—সবই একসুর, একই রকম চিকিৎসা, একই রকম ঔষধ। হলসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির।

ডিস্পেন্সরী-কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিন তোতলার নকল করিতে বসিলেন। একটা তেমাথার পথে একটা রকের উপর দুই তোতলা বসিয়া আলাপচারী করিতেছে, এমন সময় আর এক-জন তোতলা আসিয়া তাঁহাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ম—ম—মশায়, মাঝের পাড়ার ম—ম—মহিম

চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কোথায় যাব ?" সে লোকটা "ম"-এ তোতলা,ম বলিতে গেলেই ম—ম—ম—মকার। দুজনের মধ্যে একজন বলিল, "এই যে বাঁ—আঁ দিকের রা—রাস্তা দেখছেন, ঐ রাস্তা ধরে, শুঁ—,উঁ—উঁ—ড়ীদের পুকুর দেখতে পাবেন। সেই পুকুরের বাঁ—আঁ দিকে সি—ই—ইংগি ওয়ালা বাড়ী চ—অ—অক্রবর্ত্তী মশায়ের।" এ লোকটা অনুনাসিকে তোতলা,আর তালব্য বর্ণে তোতলা। যে আসিয়াছিল, সে লোকটা মনে করিল আমায় ভেঙচাইতেছে। সে বড়ই রা করিয়া উঠিল, আর বলিল, "ম—ম—শায় আমা—মার যেন গলার দোষ আছে। তাই বলে' কি ম—শায়ের তামা—মা—আসা করা উচিত ?" তাই শুনিয়া তৃতীয় তোতলা মধ্যস্থ করিতে আসিয়া বলিল—"মশাঃ র্ র্ র্ রাগই কর্ র্ রেন কেন ? আপনার-র-র যেমন একটু গলার-র্-র্ দোষ আছে, এনার্ রো তেমনি একটু আছে।" হলসুদ্ধ লোক ত হাসিয়া অস্থির।



ভাবব্যঞ্জনায় অর্দ্ধেন্দুশেখর—আহ্লাদে আটখানা



ভয়াং

আমি অরবিস্তর অর্দ্ধেন্দু বাবুর যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি যে একটা খুব প্রতিভাশালী লোক, তাহা আমার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। থিয়েটারের যাহাতে ভাল হয়, তাহারই জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন, নিজের পরিবারের সুখদুঃখের দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না, থিয়েটারের আমোদেই মজগুল হইয়া থাকিতেন—একথা রঙ্গালয়ে দাঁড়াইয়া বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। যাঁহারা রঙ্গালয়ের অধিকারী, যাঁহারা থিয়েটার করেন, যাঁহারা থিয়েটার দেখিতে যান, তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধেন্দু বাবুকে জানিতেন, এখনও অর্দ্ধেন্দু বাবুর কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। তিনি থিয়েটারে যে দাঁড়া বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে দাঁড়া অনেক দিন চলিবে. সে দাঁড়া লোপ হইবে না। যাঁহারা অর্দ্ধেন্দু বাবুর সহিত সর্ব্বদা মিশিতেন, তাঁহার সহিত একহাড় এক প্রাণ ছিলেন, একত্র কাজকর্ম্ম করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং এখানে উপস্থিত আছেন।

যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।” অর্দ্ধেন্দু বাবু যেমন তন্-মন্-ধন দিয়া কেবল রঙ্গালয়েরই সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র আমাদের পরম বন্ধু ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও তন্ মন্ ধন দিয়া সাহিত্যের, বিশেষ সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। একজন থিয়েটারকে, আর একজন সাহিত্যকে আপনাদের জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের সহস্র তাড়না সহ্য করিয়াও দুজনেই আপনাদের জীবনব্রত উদ্যাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী দুজনেরই জন্য সমানভাবে কাঁদিতেছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাদের ভালরূপ আদর করিতে পারে নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে। হয় ত সাহিত্য-সেবক আরও মিলিবে, থিয়েটার-সেবক আরও মিলিবে; কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর মত হাস্যরসের রসিক আর একটি মিলিবে কি না সন্দেহ। কারণ নিরন্ন বাঙ্গালী পেটের জালায় হাসিখুসি ভুলিয়া যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে



একাগ্রতা



পুস্তক শ্রবণ

পাঠক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক), শ্রোতা—অর্দ্ধেন্দুশেখর

লোকের যেরূপ স্ফূর্ত্তি, হাসির গর্‌রা, ফক্কুরির আদর দেখিয়াছি, একালে তাহার শতাংশের এক অংশও দেখি না। তখন অন্ন ছিল, তাই অর্দ্ধেন্দু বাবুর মত লোক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন অন্ন নাই, ঐরূপ লোক আর হইবে না।

বসিবার পূর্ব্বে আমার একটি প্রাণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেটি এই। আমি একটু একটু নাট্যপ্রিয়। যখন পড়িলাম—নাট্যশাস্ত্রে পড়িলাম—নটগণ কুশীলবদের অংশে জন্মিয়াছেন, তখন আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহারই পর-অধ্যায়ে পড়িলাম, ঋষিদিগকে কেরিকেচার করার দরুণ ঋষিরা শাপ দিলেন, তোমরা শূদ্র হইয়া যাও। হইলও তাহাই। চাণক্য কুশীলবদের শূদ্র বলিয়াই লিখিয়া গেলেন। সেই অবধিই নটেরা সমাজে হেয় হইয়া রহিল।

কিন্তু আজি আপনারা আপনাদের একজন কুশীলবের স্মৃতিরক্ষার জন্য যেরূপ উদারভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার আশা হইতেছে আপনারা আবার আপনাদের পূর্ব্বগৌরব লাভ করিতে পারিবেন, আবার লোকে আপনাদের দেব-অংশ সম্ভূত বলিয়া মনে করিবে ও আদর করিবে। আপনারা এই উদারভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করুন, আর দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(২)

নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের নাম আশৈশব শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অভিনয় অনেকবার দেখিয়াছি। কিন্তু প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই, পরে হইয়াছিল। তিনি আমার পিতৃদেব ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে প্রধান প্রধান ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, সেই জন্য আমার পিতৃদেবের নাটকের সহিত মুস্তফী মহাশয়ের নাম আমার মনে বিশেষ ভাবে জড়িত। খ্যাতনামা অভিনেতৃগণের মধ্যে তিনি পিতৃদেবের একজন বিশেষ স্নেহের ও আদরের পাত্র ছিলেন। তাঁহার অভিনয় দেখিবার জন্য আমার পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল। মৃত্যুশয্যাতেও সে আগ্রহের হ্রাস হয় নাই।



অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তাঁহার পুত্রদ্বয়। দক্ষিণে ব্যোমকেশ, বামে ভুবনেন

মুস্তফী মহাশয় আমার পিতার শেষ পীড়ার সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। সেই সময় "কমলে-কামিনী" প্রকাশিত হয়। এক দিন মুস্তফী মহাশয় আসিলে পিতৃদেব তাঁহার হস্তে একখানি পুস্তক দেওয়াইয়া তাঁহাকে পড়িতে বলেন। তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন; যখন গান্ধারীর অনুতাপ পড়িতে লাগিলেন, পিতৃদেব ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন; তিনি জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "আমার এ নাটক খানি তোমরা অভিনয় করবে?" বলিয়া আবার কাঁদিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু উত্তর করিলেন, "আপনার নাটক নিয়েই সাধারণ রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়েছে, আপনার নাটক অভিনয় করবার জন্যে কি অনুরোধের আবশ্যক?" পিতৃদেব কহিলেন, "অনুরোধ করছি না; তোমরা অভিনয় করবে আমি জানি, কিন্তু তুমি সাজবে, আমি দেখিতে পাব না।" বলিয়া আবার ক্রন্দন করিলেন। সে দিনের পাঠ সেই খানে সমাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের কিছু পরে "কমলে-কামিনী" অতি সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। মুস্তফী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন না, সেই নিমিত্ত সে অভিনয়ে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি "বকেশ্বরের" ভূমিকা লইয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয়ে, নট ও নাট্যকার শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতলাল বসু মহাশয় ঐ ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমি তখন বালক ছিলাম, সেই অভিনয়-দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। মুস্তফী মহাশয়ের অভিনয় দেখিয়াছি, সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের সমুচিত প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বাগবাজারের কতিপয় যুবক "সধবার একাদশী" অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হন। সেই সময়ে এক শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্রের সহিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় সম্বন্ধে কথা হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে সধবার একাদশীর পূর্ব্বাভিনয় দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। অর্দ্ধেন্দু আখড়াই দেখিতে গেলেন। সে দিন তিনি এক মাত্র শ্রোতা। পালা শেষ হইলে গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলেন, 'নিমচাঁদ' ও 'অটল' ভিন্ন অন্য ভূমিকা কিছুই হয় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে দলের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিলে অর্দ্ধেন্দু সম্মত হইলেন। বঙ্গের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সেই এক স্মরণীয় দিন। তাহার পর উভয়ের সহযোগিতায় শীঘ্রই সধবার একাদশীর অভিনয় হইল। অর্দ্ধেন্দু কর্ত্তা 'জীবনচন্দ্র' সাজিয়াছিলেন এবং গিরিশচন্দ্র 'নিমচাঁদে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। এক দিনকার অভিনয়-রজনীতে গ্রন্থকার উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই দিন তাঁহার প্রতিভার সম্মানের জন্য রঙ্গমঞ্চে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল—He holds the mirror up to Nature. অভিনয় শেষে একজন মুস্তফী মহাশয়কে বলিলেন, গ্রন্থকার আপনাকে দেখিতে চাহেন। তিনি কম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হইলে, গ্রন্থকার তাঁহাকে আদরের সহিত বলিলেন—"যদি ব্রাহ্মণ হও ত পায়ের ধুলা দাও, নইলে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।" উৎসাহ দিবার জন্য আরও বলিয়াছিলেন, "অটলের উপরে বিরক্তি দেখাবার জন্যে, যাবার সময়ে তুমি যে তাকে পদাঘাত করেছিলে, that is an improvement on the author." পরবর্ত্তী সংস্করণে Stage directionএ একথা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিন গিরিশচন্দ্রকে তিনি কহিয়াছিলেন, "নিমচাঁদ তোমার জন্যেই যেন লেখা হয়েছে।" সধবার একাদশী অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর উভয়ে অতি উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা বলিয়া আদৃত ও সম্মানিত হন। বলা যাইতে পারে, সে আদর ও সম্মান তাঁহাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র "লীলাবতী" অভিনয়ের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় "লীলাবতী"র অভিনয়

সম্পাদিত হয়। অভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। সে অভিনয়ের কথা জানিয়া, কলিকাতার নবীন অভিনেতারা অধিকতর যত্নের সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিখাইবার ভার প্রধানত মুস্তফী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের অভিনয়ের দিনও গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অভিনেতৃগণকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "এবার চিটি লিখব—ভুয়ো বঙ্কিম।" এই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'ললিত' ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর 'হর্ষবিলাস' সাজিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, যে দৃশ্যে "লীলাবতী" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খেদোক্তি করিতেছেন, তাহা শুনিয়া অর্দ্ধেন্দু মুখে ভাবের ব্যঞ্জনা দেখাইবার যে ক্ষমতা প্রদর্শন করেন তাহাতে গ্রন্থকার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি সে অভিনয় দেখি নাই, কিন্তু অন্যত্র তাঁহার ভাবব্যঞ্জনার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। বস্তুতঃ তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়।

যখন বাগবাজারের দল 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, সেই সময় গিরিশচন্দ্র কোন কারণ বশতঃ ঐ সম্প্রদায় হইতে তফাৎ হইলেন। শিখাইবার ভার অর্দ্ধেন্দু বাবুর উপর সম্পূর্ণ রূপে ন্যস্ত হইল। তখন স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু তাঁহাকে সে পথ হইতে লইয়া আসিয়া নিজেদের দলভুক্ত করেন। বঙ্গের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। অমৃত বাবু চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন না করায় বঙ্গে সুচিকিৎসকের অভাব হয় নাই, কিন্তু তিনি রঙ্গালয়ে যোগ না দিলে তাঁহার মত একাধারে উৎকৃষ্ট নট ও নাট্যকার আমরা পাইতাম না। বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালা ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

"নীলদর্পণে" অর্দ্ধেন্দুশেখর 'গোলকচন্দ্র' 'সাবিত্রী' ও 'উড' সাহেবের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। তিনটি বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকা লইয়া সকল গুলিই দক্ষতার সহিত অভিনয় করা সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। কর্ত্তা ও গিন্নী উভয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলিতেন আমি "নীলদর্পণে" একাধারে রাধা-কৃষ্ণ হইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে উড সাহেবের রূপে অনেক বার দেখিয়াছি; সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় একবার দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না। অন্যান্য খ্যাত-নামা অভিনেতা কর্ত্তৃক উডসাহেবের ভূমিকা অভিনীত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু মনে হয় কেহই মুস্তফীর সমকক্ষ হন নাই। একবার গিরিশচন্দ্র উডসাহেব সাজিয়া পাঁচকড়ি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন হয়েছে?" পাঁচকড়ি বাবু উত্তর দেন, "বেশ হয়েছে বটে, কিন্তু মুস্তফী মশায়ের মত হয় নি। গিরিশচন্দ্র কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "দেখ, ওর মত সাহেব সাজতে বাঙ্গালী কেউই পারবে না।" তিনি অভিনেতৃমহলে "সাহেব" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সাহেব আখ্যা পাইবার আর একটি কারণ ছিল। যখন ডেভকারসন নামধারী একজন ইংরাজী নট "I am a Bengalee Babu, রাধাবাজারে I keep my shop" ইত্যাদি বাক্যে বাঙ্গালীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, সেই সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বজাতি-প্রেমে প্রণোদিত হইয়া ডেভকারসনকে উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি কালি মাখিয়া সাহেব সাজিয়া জবাব দিয়াছিলেন, "হাম বড় সাহেব হ্যায় দুনিয়া মে।" শুনিয়াছি ডেভকারসন এ জবাব উপভোগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা মুস্তফীকে সাহেব সাজিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সাহেব আখ্যার সার্থকতা স্বীকার করিবেন।

অর্দ্ধেন্দু বাবুর সাহেব সাজা সম্বন্ধে আর একটি গল্প অমৃত বাবুর নিকট শুনিয়াছি। যখন ষ্টারে "প্রতাপাদিত্য" নাটকের রিহার্সাল চলিতেছিল, অর্দ্ধেন্দু বাবু তখন 'বিক্রমাদিত্য' সাজিবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। 'রডা' সাহেব সাজিবার জন্য আর একজন অভিনেতাকে শিখান হইতেছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু একদিনও 'রডা' সাহেব সাজিবার জন্য মহলা দেন নাই। কিন্তু

যে দিন পোষাক তৈয়ারি করিবার জন্য বন্দোবস্ত হয়, সেই দিন তিনি বলিলেন, "আমার জন্যে একটি সাহেবের পোষাক আবশ্যক, আমি বড়া সাজব।" কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, "এক দিনও রিহার্সাল দিলে না, কি করে' সাজবে?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি রঙ্গমঞ্চে থাকতে অপর কেউ সাহেব সাজবে তা হতে পারে না, আমার নামই সাহেব।" অমৃতবাবু প্রমুখ অধ্যক্ষগণ সাহেবের ক্ষমতা বিশেষ জানিতেন, আর আপত্তি না করিয়া পোষাকের মাপ লইলেন। অভিনয় রজনীতে "সাহেব" সাহেবের ভূমিকায় যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সে অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারিবেন না। এই ক্ষুদ্র চিত্রেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়াছিলেন এবং সাহেব আখ্যারও স্বার্থকতা বজায় রাখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, তাঁহার বিক্রমাদিত্যের অভিনয়ও অতুলনীয় হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

"নবীন তপস্বিনী"তে জলধরের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুর ক্ষমতা ষোল কলায় পূর্ণ হইয়াছিল। সে অভিনয় নাট্যজগতের বিজয়-নিশান। সে অভিনয় যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে একটি অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার চালচলন, ভাবভঙ্গি, কথা ও স্বর, সকলই যেন পূর্ণ সুষমায় শোভিত হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধেন্দু বাবুর জলধরের অভিনয়ে মৃত মানুষকেও হাসিতে হয়। সকলেই জানেন, তিনি সুবিধামত নাটকের ভাষা কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন। জলধর যেখানে মল্লিকাকে কহিয়াছেন, "মল্লিকে, তোমার কথাগুলি যেন আকের টিকলি" অর্দ্ধেন্দু বলিতেন "মল্লিকে, তোমার কথাগুলি যেন গোলাপি গাণ্ডেরি।" আর একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। গুরুপুত্র "ভূতবাসরঃ যো জো ঘণ্টা কেলিকুঞ্চিকা ভিন্দিপালঃ" ব্যাখ্যা করিলেন, "ভূতবাসর অর্থে বয়ড়া, যো জো ঘণ্টা অর্থে হাতীর গলার ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা বলে ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ভিন্দিপাল অর্থে দেড় হেত্তে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্লেই দেড় হাত লম্বা একটি খেটে বোঝায়, পাঁচ পোয়া সাত পোয়া নয়।" জলধর-রূপী অর্দ্ধেন্দু বলিলেন ইহার আর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পণ্ডিতবৃন্দ বলিলেন, "কি?" তিনি উত্তর করিলেন; "ভূতবাসর কি না—ভূতোর বিয়ে হচ্চে, বাসর ঘরে নিয়ে গেছে, যোজো ঘণ্টা হাতীর গলায় ঘণ্টাই বটে; কারণ একটি দীর্ঘকায় প্রাচীন পুরুষের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বালিকার বিয়ে হচ্চে; কেলিকুঞ্চিকা স্ত্রীর ভগিনীই, তবে কনিষ্ঠা নয় জ্যেষ্ঠা; ভিন্দিপাল কি না খেটে অর্থাৎ ভুতো বাসরে বয়স্থা শালীগণের সঙ্গে অযথা প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হলে তার শ্যালকগণ ভিন্দিপাল নিয়ে অগ্রসর হলেন।" যদিও এ সকল অনেকেই অনুমোদন করিতেন, তথাপি কখন কখন মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারায় অর্দ্ধেন্দু রসজ্ঞের বিরাগভাজন হইতেন। তাঁহার অভিনয়ে আমিও স্থলবিশেষে এরূপ বিরাগ অনুভব করিয়াছি। সত্যের খাতিরে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিলাম।

"জামাইবারিকে" অর্দ্ধেন্দু 'কর্ত্তা' সাজিতেন; জামাইরূপে রামায়ণের কথকতা করিতেন এবং মাণিক পীরের গান গাহিতেন। তাঁহার কথকতা শুনিলে মোহিত হইতে হইত এবং মাণিকপীরের গানে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। গান গাহিবার পূর্ব্বে তিনি মুসলমানের মত অঙ্গ প্রক্ষালনাদির যে ভঙ্গি দেখাইয়াছিলেন, তাহা বহুদিনের কথা হইলেও, এখনও ভুলিতে পারি নাই। ইদানীন্তন কালে এই মাণিকপীরের গান তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে দিয়াছিলেন। একজন রেকর্ড বিক্রেতা বলিয়াছিলেন যে, রেকর্ড অসম্ভব বিক্রয় হইয়াছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির এক বড় সাহেবের সহিত আমার পরিচয় হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "It is splendid and the record has an unusual sale." তিনি গায়কের বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

আমার পিতৃদেবের নাটকগুলিতে অর্দ্ধেন্দু যেরূপ অভিনয় করিতেন তাহার পরিচয় দিয়াছি। এখন অন্যান্য নাটকে তিনি কিরূপ অভিনয় করিতেন তাহার

উল্লেখ করিব। তিনি হাসির অভিনেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি গম্ভীর ও গুরুতর অভিনয়েও যে সমান দক্ষ ছিলেন তাহা অনেকে অবগত নহেন। আমি "প্রফুল্ল" নাটকে তাঁহাকে 'যোগেশ'রূপে দেখিয়াছি। গিরিশচন্দ্রেরও ঐ ভূমিকায় অভিনয় দর্শন করিয়াছি। উভয়েই অতি উচ্চ অঙ্গের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। তুলনায় বলা যায় না কাহার অভিনয় অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মনে হয় কোন কোন স্থলে গিরিশচন্দ্রের ভাল হইয়াছিল, আবার কোন কোন স্থলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভাল হইয়াছিল। "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' উক্তিতে, অর্দ্ধেন্দু করুণ ভাবের এরূপ উৎস আনিতেন যে, যতবার সেই উক্তি শুনিয়াছিলাম, চক্ষে জল আসিয়াছিল। মুস্তফী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, একবার ঢাকাতে তাঁহার যোগেশের অভিনয় দেখিয়া একজন শ্রোতা ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। "আনন্দমঠে", তিনি যখন মহাপুরুষ সাজিয়া সত্যানন্দকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, সে গুরুগম্ভীর স্বর এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। "পলাশীর" যুদ্ধে তিনি ক্লাইব সাজিয়া ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া মুখে যে বিস্ময়ের ভাব আনিতেন, সে ছবিও অতি মনোরম।

অর্দ্ধেন্দু যেমন উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-শিক্ষকও ছিলেন। শুনিয়াছি যখন গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু উভয়ে এক থিয়েটারে থাকিতেন, শিখাইবার ভার গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি বলিতেন, অর্দ্ধেন্দুর মত শিখাইবার ক্ষমতা আমাদের কাহারও নাই। যখন "সঙ্গীত সমিতি"র সভ্যগণ সধবার একাদশী অভিনয় করেন, সেই সময় আমি অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা দিবার প্রণালী দেখিয়াছিলাম। তিনি কাহাকেও শিখাইবার পূর্ব্বে তাহার উক্তির মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন এবং কিরূপ স্বরে ও ভাবে উক্তি আবৃত্তি করিতে হইবে দেখাইয়া দিতেন। আবশ্যক হইলে অপর উদাহরণ দ্বারা, কিরূপে ভাব আনিতে হইবে বুঝাইয়া দিতেন। "রোমান ধ্বংসের" [illegible] ভিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহাদের মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। পরলোকগতা অভিনেত্রী তিনকড়ির লেডি ম্যাকবেথ ভূমিকার যে অতুলনীয় অভিনয়, তাহাও মুস্তফী মহাশয়ের শিক্ষার ফল। এ বিষয় তিনি নিজে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন ম্যাকবেথ অভিনয়ের আয়োজন হয়, গিরিশচন্দ্র একজন পুরাতন অভিনেত্রীকে লেডি ম্যাকবেথ সাজাইবার জন্য ঠিক করেন। অর্দ্ধেন্দু ইহার অনুমোদন না করিয়া তিনকড়িকে লেডি ম্যাকবেথ সাজাইবার জন্য অনুরোধ করেন। পরে ঠিক হইল, মুস্তফী মহাশয় তিনকড়িকে শিখাইবেন এবং গিরিশচন্দ্র অপর অভিনেত্রীকে শিখাইবেন। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়কে বলেন যে তিনি যাহাকে শিখাইতেছেন, তাহা কর্ত্তৃক অভিনয় সম্ভব নহে, কারণ সে facial expression আনিতে অসমর্থা; তাহার আশা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। গিরিশ বাবু অর্দ্ধেন্দু বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কতদূর সফল হইয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, পরীক্ষা গ্রহণ করুন। তখন রঙ্গমঞ্চ হইতে সকলকে বিদায় করিয়া তাঁহারা দুইজন এবং অভিনেত্রী তিনকড়ি মাত্র রহিলেন। গিরিশচন্দ্র তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনকড়ির অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে, তাকিয়া ছাড়িয়া উপবেশন করিলেন। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইলে বলিলেন, "এবার যেখানে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ উভয়ের এক সঙ্গে অভিনয় আছে আমরা দু'জনে অভিনয় করি।" তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইলে, অভিনেত্রীকে বিদায় দিয়া দুইজনে কথা আরম্ভ করিলেন। গিরিশ বাবু বলিলেন, "লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবথকে উঁচিয়ে গেছে, আমি ও পর্দ্দায় উঠতে পারব না।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর অভিনয়েও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, আমি ম্যাকবেথ সাজব।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "তা অসম্ভব, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল ভূমিকা তোমার

উপর ভার দেওয়া হয়েছে তা আর কেউ সুন্দর ভাবে অভিনয় করতে সমর্থ হবে না। আর আমাকে শেখাতে হবে না, আমি এখন আমার মতন করে' নেবো।" অতঃপর গিরিশচন্দ্র অভিনেত্রীকে শিখাইবার ভার লইলেন। যেদিন ম্যাকবেথ অভিনয় দেখি, লেডি ম্যাকবেথের অভিনয় দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছিলাম; বঙ্গরমণীর দ্বারা এরূপ অভিনয় হইতে পারে তাহা কল্পনার অতীত ছিল। ধন্য শিক্ষার প্রভাব! অর্দ্ধেন্দু বাবু Witch, Old man, Porter, Physician সাজিয়াছিলেন। প্রত্যেক অভিনয়েই তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্বরে অভিনয় করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী গিরিশচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন ঐ সকল ভূমিকা অপর কাহারও দ্বারা সুন্দররূপে অভিনীত হওয়া সম্ভব নহে, তাহা যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ ব্যতীত অন্যত্রও অর্দ্ধেন্দু সাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সতত অগ্রসর হইতেন। একবার আলবার্ট হলে ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সম্ভাষণের জন্য এক অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে অর্দ্ধেন্দু Charitable Dispensary শীর্ষক কৌতুক চিত্র দেখাইয়া উপস্থিত ভারতবাসী মাত্রকেই মোহিত করেন। সকলেই তাঁহার স্বরের ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হন। তাঁহার তোতলা রাবণের আবৃত্তি আমি সেই প্রথম শুনি। হাসির চোটে দম আটকাইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল। তিনি গল্পচ্ছলে বলেন, একবার একটি জন্ম তোতলা যুবক তাঁহার নিকট রাবণ সাজিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন, "তুমি তোতলা, কি করে' রাবণ সাজবে?" তোতলা যুবক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন, রাবণ যে তোতলা ছিল না ইতিহাসে এমন কিছু লেখা নাই। কাযেই তাঁহাকে নিরুত্তর হইতে হইল। অর্দ্ধেন্দুর সামাজিকতার অভাব ছিল না, তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত মজলিস নিজগুণপনায় সন্তুষ্ট রাখিতেন।

যখন অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতি স্থাপিত হয়, আমার অনুজসদৃশ শ্রীমান্ মনোমোহন পাঁড়ে আমাকে ঐ সমিতির সম্পাদকতায় বরণ করেন। স্মৃতিরক্ষার জন্য আমি নিজে কিছুই করিতে পারি নাই, তাই অর্দ্ধেন্দু-কথা লিখিয়া বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিলাম।

কথা বাড়িয়া যাইতেছে, এইবার উপসংহার করিলাম। বলা বাহুল্য বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

রবীন্দ্রনাথের "গোরা"

"গোরা" বর্ত্তমান ভারতের গদ্য-মহাকাব্য। বর্ত্তমান ভারতের সকল আশা, হর্ষ, দ্বন্দ্ব, ভয় এবং সমস্যার কথাই ইহাতে আছে। হয়ত সকল তর্কের মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সর্ব্বোপরি, যে মহা-সমস্যার মীমাংসাকল্পে এই পুস্তকখানি লিখিত, তাহার বেশ সুন্দর মীমাংসাই ইহাতে আছে।

এমনি কথাও শুনিয়াছি যে, পুস্তকখানি কি ভাবে শেষ করিতে হইবে, লেখক নাকি তাহা লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ইহা হইতেই এমন কথা ধরিয়া লওয়া যায় না যে এই পুস্তক রচনার কোন উদ্দেশ্যই লেখকের মনে ছিল না। বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই যে বইখানি রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

গোরা য়ুরোপীয় সন্তান, অথচ সে মানুষ হইয়াছে বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর পরিবারে এবং বাঙ্গালার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে। ইহা শুধু গল্পের প্লট জমাইবার জন্য নয়; এইখানেই ত লেখকের প্রধান উদ্দেশ্যটি নিহিত। গোরা ত জানে না যে সে আইরিশ-ম্যান্, কাযেই সে যে ব্রাহ্মণতনয় ইহা লইয়া সে যখন

আস্ফালন করে, তখন তাহা পাঠকের কাণে কেমন যেন বিদ্রূপের মত শোনায়। এই যে irony, ইহা শুধু লেখকের শিল্পরচনাকেই ফুটাইয়া তুলে নাই, ইহা লেখকের রচনার উদ্দেশ্যকেও সার্থক করিয়া দিয়াছে। কিন্তু গোরা তাহার প্রকৃতিকে কিছুতেই বদ্‌লাইতে পারে নাই; এ প্রকার পরিবর্ত্তন আনিবার কোন চেষ্টার ত প্রয়োজন ছিল না। তবে গোরা যদিও তাহার য়ুরোপীয় প্রকৃতিতে পাঠকের নিকট ধরা পড়িয়াছে, তথাপি তাহার মধ্যে এমন কোন কিছু ছিল না, যদ্দারা সে নিজের কাছে বা অন্য কাহারও কাছে ধরা পড়িতে পারে। কারণ, ঐরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন বাঙ্গালী যুবকের অভাব নাই।

এ পুস্তকে হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, রাজনীতি এবং রাজরীতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহাতে হৃদয়ের ধর্ম্ম, প্রেমের রীতি এবং নারী নীতি প্রভৃতি নানা জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ আছে। আমরা সে সব কথা এখানে তুলিব না। গোরা যখনই যে কথা লইয়া তর্ক করিয়াছে, তখন আমাদের মনে হইয়াছে সে সম্বন্ধে উহাই যেন চরম কথা; উহার উপরে যেন আর কথা চলে না। কিন্তু তাহার উপরেও যে কথা বলা চলে, লেখক নিজেই তাহা দেখাইয়াছেন। তবে প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সত্যরূপ আছে। গোরা যখন যে জিনিস ধরিয়াছে, তখনি সেটার সত্য রূপটিকেই ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছে। হয়ত সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে গেলে তাহার সেই খণ্ড সত্যটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু তাহা ধরিতে পারে কয়জন লোক? গোরা মূর্ত্তিপূজার যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছে, কয়জন হিন্দু তাহা দিতে পারে? অথচ মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে উহাই চরম কথা নয়।

গোরার মধ্যে আমরা লেখকের আত্মচরিতের ছায়া পাই। অর্থাৎ গোরার আত্মা ও লেখকের আত্মার উপাদান যেন একই। গোরার আশ্চর্য্য মনীষা, তাহার দুর্জ্জয় তেজ, তাহার প্রগাঢ় সত্যানুসন্ধিৎসা লেখকের প্রকৃতিকেই যেন ধরাইয়া দেয়। গোরার দেশভক্তির আদর্শ যেন লেখকের নিজেরই আদর্শ।

এই আদর্শের কথাটি বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইল জাতীয় সমস্যা। ইহা ছিল হিন্দুর ভারতবর্ষ, এখন হইয়াছে হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানের ভারতবর্ষ। কিন্তু হিন্দু সে কথা সহজে স্বীকার করিতে চায় না। সে যেন বলিতে চায়, ভারতবর্ষ আমাদেরই; অন্য জাতীয়েরা এখানে সকলেই অনধিকার প্রবেষ্টা। আমাদের জাতীয়তার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম এক সঙ্গে গাঁথা, সুতরাং সে ক্ষেত্রে অন্য জাতির সঙ্গে আমাদের মিলন অসম্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষ বলিতেছে—ভারতবর্ষ ভারতবাসীর, এখানে জাতি ধর্ম্মের কোনও বিচার নাই। ভারতবর্ষ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেরই—কাহাকেও বাদ দিলে ত চলিবে না। সকলকেই রাখিতে হইবে, এবং সকলকেই মিলিতে হইবে। এই মিলন না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই। একদিন সকলকে মিলিতেই হইবে, কিন্তু যতদিন সমাজ ও ধর্ম্মের অভিমান দূর না হইবে, ততদিন এই মিলন অসম্ভব। প্রত্যেককেই শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, সে ভারতবাসী—সে হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, খৃষ্টান নয়, সে শুধু ভারতবাসী। ইহা ছাড়া ভারতের একতার অন্য কোনও উপায় নাই। বিধাতার ইচ্ছায়—

হেথায় আর্য্য, হেথায় অনার্য্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হুন দল, পাঠান, মোগল,
এক দেহে হল লীন।

এমন অপূর্ব্ব মিশ্রণ আর কোনও দেশে কোনও কালে হয় নাই। সেই জন্যই ভারতের সমস্যা এমন জটিল। কিন্তু জটিল বলিয়াই হটিলে চলিবে না, ইহার একটা মীমাংসা করিতেই হইবে; এবং এই যে মীমাংসা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন, ইহা ছাড়া আর কোনও মীমাংসা নাই।

আমাদের স্বদেশপ্রেম অনেকটা বইপড়া স্বদেশপ্রেম। গোরার মত আমরা ইহা লইয়া লাফালাফি করি; তবে পার্থক্য এই যে, গোরা তাহা জানিত, আমরা তাহা জানি না। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের আস্বাদ

লাভ করিবার জন্য গোরার প্রাণে যে ব্যগ্রতা ছিল, আমাদের তাহা নাই। গোরা বিনয়কে বলিতেছে, "ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্চি সে ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে নয়; সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে। আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দ মনে হচ্চে—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই, সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে, সম্পূর্ণ দিতে হবে—মাধুর্য্য নয়, একটা দুর্জ্জয় দুঃসহ আবির্ভাব। এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ঙ্কর—এর মধ্যে সেই কঠিন ঝঙ্কার আছে যাতে করে সপ্তসুর এক সঙ্গে বেজে উঠে, তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে উঠে, আমার মনে হয় এই আনন্দই পুরুষের আনন্দ, এই হচ্চে জীবনের তাণ্ডবনৃত্য, পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্ত্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্চি—আজকেকার এই আসন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখতে পাচ্চি—দেখ, আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্চে।"

এই ভাবুকতাটুকু হয়ত আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু এইখানে দেশপ্রীতির আরম্ভ মাত্র। এই স্বপ্নকে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিবার মত কঠোর সাধনাও হয়ত অনেকের আছে, কিন্তু কেবল দুঃখকে বরণ করিলেই ত ঈপ্সিত জিনিস পাওয়া যায় না, কেবল স্বার্থত্যাগ করিলেই ত আদর্শলোকে পৌছান যায় না। গোরার মত এবং গোরার চেয়েও অধিক কষ্টকর দেশসেবার অভিজ্ঞতা অনেকে পাইয়াছেন; দুঃখের কণ্টকমুকুট কত জন সগৌরবে এবং সোল্লাসে মাথাকে ধারণ করিয়াছেন, তথাপি সেইখানে পৌছিয়াছেন কয়জন, যেখানে গোরা একটা দৈবঘটনা-সজ্যাতে গিয়া উপনীত হইয়াছিল? অথচ যতক্ষণ আমরা সেখানে না পৌছিব, ততক্ষণ আমাদের সকল সেবা এবং সাধনার মধ্যেই খুঁত থাকিয়া যাইবে। গোরা নিজেই বলিতেছে, "পরেশ বাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেচি। একটা না একটা জায়গায় বেধেচে। সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিনরাত কেবলি চেষ্টা করে এসেচি, সেই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারিনি; সেই আমার একটি মাত্র সাধনা ছিল। সেই জন্যেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্য দৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেচি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্ব্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারদিকের সঙ্গে কি লড়াই না করেচি! আজ এক মুহূর্ত্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মত উড়ে গেচে, আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েচি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌচেচে। আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েচি—সত্যকার কর্ম্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েচে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়, সে একবারে পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্র।"

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ গোরাকে সমস্যার এমন গোলকধাঁধায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাকে সকল দিক বজায় রাখিয়া তাহার মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিতেছিলেন না; অবশেষে তাহাকে তাহার জন্ম কথা জানাইয়া দিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন—ইহার মধ্যে সমস্যার কোনও মীমাংসা ত নাই। গোরা পক্ষিশাবকের মত খোলস ভাঙ্গিয়া মুক্ত আকাশতলে নবজন্মলাভ করিল বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে সে যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাহা যে একেবারে ছিঁড়িয়া গেল। কেহ কেহ বলেন, রবি বাবু এটা করিলেন কি? গোরাকে একেবারে নামকাটা

সেপাই বানাইয়া ছাড়িয়া দিলেন ! অনেকেরই মনের ভাবটি এই রকম যে, গোরা যদি আইরিশম্যান না হইত, সে যদি বাস্তবিকই একজন বাঙ্গালীর ছেলে হইত, এবং তাহাকে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়াই সমস্ত ঘটনা জমিয়া উঠিত, তাহা হইলে যেন ভাল হইত। গোরাকে বাঙ্গালীর ছেলে রূপে কল্পনা করা কিছুই কঠিন নহে এবং সে যাহা কিছু করিয়াছে বাঙ্গালীর ছেলের মতই করিয়াছে। কিন্তু পুস্তকের শেষ দিকটা তাহা হইলে এরকম না হইয়া হয়ত অন্যরকম হইত। কিংবা যদি এ রকমই থাকিত, অর্থাৎ গোরা বাঙ্গালী হইয়াও যদি অবশেষে বলিত—"আজ আমি ভারতবর্ষীয়, আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"—তাহা হইলে সে কথা এমন জোর বাঁধিত না—গোরার মুখে এই কথা যেমন জোরাল হইয়াছে। তাহা যেন ভাবুকের একটা কল্পনার মত মনে হইত। কিন্তু গোরার মুখে ইহা কাল্পনিকতার মত শোনায় না, ইহা তাহার মুখে বেশ সুস্পষ্ট সত্যের মতই শোনায়। সুতরাং গোরাকে আইরিশম্যান বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে ক্ষতি কিছুই নাই, বরঞ্চ যথেষ্ট লাভ আছে। রবীন্দ্রনাথ যে কথাটার উপর জোর দিতেছেন, ইহাতে ঠিক সেই কথাটিই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "গীতাঞ্জলি"র একটি কবিতাতেও কবি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সেই কবিতায় তিনি ভারতে সম্মিলিত মহামানবকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।"

এই যে ভারতবর্ষ, যেখানে,

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হতে,
সমুদ্রে হল হারা।"

এই ভারতবর্ষে সবাইকে মিলিতে হইবে—

"হেথায় সবারে হইবে মিলিতে
আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

তাই তিনি সবাইকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু, মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান,
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, কর অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

"সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" মার অভিষেক করিতে হইবে, ভারতবাসীকে আজ এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। ধর্ম্মের বিরোধ আমাদের জাতীয়তাকে এতদিন খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, আজ সে বিরোধ ভুলিতে হইবে। দেশপ্রেম কি একটা ধর্ম্ম নহে? এই ধর্ম্মের পতাকাতলে ত আমরা সকলে মিলিতে পারি। গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই বলিয়াছেন। ভারতবর্ষকে যাঁহারা ভালবাসেন এবং ভারতের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারাই বলুন দেখি, আমাদের জাতীয়-মিলন-সমস্যার ইহাই মীমাংসা কি না?

৺অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

সত্যের জয়

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য কোনও স্থানে সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া, দরিদ্র তারকনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বগ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে পাত্রের সন্ধানে মহেশপুরে রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ কলিকাতায় যাইয়া, কোনও সদাগরি আফিসে চাকুরী করিতেন; এবং এইরূপে চাকুরী ও পৈত্রিক গৃহসম্পত্তি দুই-ই রক্ষা করিতে পারিতেন। রঘুনাথ বাবুর তিন পুত্র; বড়টির বয়স বাইশ বৎসর; সে এক বৎসর পূর্ব্বে মহেশপুরের জমীদারদিগের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, চাকুরীর চেষ্টায় পিতার সহিত কলিকাতায় আনাগোনা করিতেছে। তাহারই উপর কন্যাদায়গ্রস্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল।

পাত্রের রূপ উপন্যাসের নায়কের মত না হইলেও, তাহাকে দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পছন্দ হইল। অন্য কোনও স্থানে তিনি এখনু সুপাত্রের সন্ধান পান নাই। কিন্তু তিনি সসঙ্কোচে চিন্তা করিলেন যে রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা ভাল, কলিকাতায় চাকুরী করিয়া মাসে মাসে আশী টাকা বেতন পান, তাহার উপর উপরি-পাওনা, দেশে পাকা দ্বিতল গৃহ ও চাষবাস আছে। এরূপ অবস্থাপন্ন লোক কি অল্প অর্থ লইয়া, পাশকরা পুত্রের বধূরূপে তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিবেন?

কিন্তু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্যান্য কুলীন চূড়ামণি-গণের ন্যায় পুত্রের বিবাহ দিয়া ধনবান হইবার আশা করিতেন না। ইহা ছাড়া এতদঞ্চলের সর্ব্বসাধারণের ন্যায়, তিনি সুপণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি করিতেন। সর্ব্বোপরি, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুশীলা, সুরূপা এবং সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যাটিকে দেখিয়া, তাঁহার অতিশয় পছন্দ হইয়াছিল; ভাবিয়াছিলেন, এমন লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না কন্যাকে বাটীতে আনিতে পারিলে, তাঁহার গৃহে চিরদিন লক্ষ্মীশ্রী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতএব বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন—"আমি দু'হাজার পাঁচ হাজার কিছুই চাইনে; তবে আমরা কুলীন, ছেলেও পাশকরা, শীগ্‌গির একটা চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরীও পাবে, এমন ছেলের জন্যে সামান্য কিছু খরচ আপনাকে করতে হবে বৈকি?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছু আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পরিমাণ খরচ করলে এই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাব?"

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় কহিলেন—"দেখুন; আমি বেশী কিছু চাইনে। সর্ব্বসমেত হাজার টাকা দিতে পারলেই, আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ দেব। পাঁচশ নগদ দেবেন, তিনশ টাকার গহনা দেবেন, আর বরাভরণ ফুলশয্যা ইত্যাদিতে দুশো টাকা খরচ করবেন। আমি কি কিছু অন্যায় প্রস্তাব করলাম?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় বিবেচনা করিয়া কহিলেন—"না, আজকালকার দিনে আপনার প্রস্তাবটা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। আপনি যা চাচ্ছেন, তা অতি সামান্যই বলতে হবে। কিন্তু আমার পক্ষে এই সামান্য টাকাও সংগ্রহ করা কঠিন হবে। যাই হোক, একবার শিষ্য যজমানদের ধরে দেখবো; যদি টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি, পনের কুড়ি দিনের মধ্যে আপনাকে সংবাদ দেব। আমার ইচ্ছে যে এই বৈশাখ মাসেই বিয়ে দিই। মেয়েটি একটু বড় হয়ে পড়েছে; তাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করতে না পারলে জনসমাজে নিন্দা হবে।"

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় কহিলেন—"বেশ, তা হলে

ঐ হাজার টাকার কথাই ঠিক রইল। এখন, আপনার মত দেশমান্য ব্যক্তির পায়ের ধূলো যখন আমার মত সামান্য ব্যক্তির বাড়ীতে পড়েছে, তখন একটু মিষ্টি মুখ করে আমাকে কৃতার্থ করতে হবে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় বাটী হইতে স্নান আহ্নিক করিয়া আসিয়াছিলেন; এ জন্য জলযোগ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে, তদ্দণ্ডে স্বীয় গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিতে না পারিলে, তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বাটী ফিরিতে পারিবেন না। তিনি গৃহে ফিরিয়া আহারাদি না করিলে, তাঁহার পত্নী জলবিন্দু মাত্র গ্রহণ করিবেন না। অতএব তিনি রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের জলযোগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, মিনতির সহিত কহিলেন—"থাক্ থাক্, আজ আমাকে ক্ষমা করবেন, আজ আর জলযোগের উদ্যোগ করবেন না। বেলা হয়ে গেছে; এখন এখানে বিলম্ব হ'লে, বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বাড়ী ফিরতে পারবো না।" এই বলিয়া, তিনি রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়কে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার প্রতিনমস্কার গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে বাটীর পথে ফিরিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেশপুরের জমীদারের নাম শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর। তিনি উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার সম্পত্তির বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকারও অধিক। তাঁহার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত জমীদার সে অঞ্চলে বোধ হয় দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার দুরন্ত শাসনে প্রজা ও ভৃত্যবর্গ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রায় বাহাদুর অনেক সদ্‌গুণেরও অধিকারী ছিলেন। তিনি দরিদ্রগণের প্রতি দানশীল, পুত্রের প্রতি স্নেহবান, পত্নীর প্রতি প্রেমময়; কর্ম্মতৎপর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গ্রাম্য বালকদিগের সুবিধার জন্য তিনি গ্রাম মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত প্রজাবর্গের জন্য তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর নানাস্থানে সুপেয় জলপূর্ণ সরোবর সকল খনন করাইয়াছিলেন। দরিদ্র রোগার্ত্তদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ জন্য গ্রাম মধ্যে ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলসীপূর্ণ দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র পতিত হইলে তাহা যেমন অপবিত্র হইয়া যায়, তাঁহার তাবৎ সদ্‌গুণই তাঁহার একটি মহাদোষে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল;—তাঁহার সামান্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ যদি এতটুকু 'টু' শব্দ করিত, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; যে দৈবক্রমে তাঁহার একটি কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত, তিনি তাহাকে অশেষ বিধানে নির্য্যাতিত করিয়া তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বুঝাইয়া দিতেন।

সম্প্রতি রায় বাহাদুরের এক পার্শ্বচর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-রাজ তাঁহার নিকট হইতে কিস্তি কিস্তি মালগুজারি লইয়াই নিশ্চিন্ত; প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাঁহার জমীদারীর রাজা; রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষক। অতএব তাঁহার মুসলমান প্রজাগণ যাহাতে আগামী বক্‌রীদ উপলক্ষে গোজাতির ধ্বংসসাধন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ, কাযেই প্রস্তাবটা সহজেই তাঁহার মনোমত হইল। অভিপ্রায়টা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মহেশপুরের একজন গণ্যমান্য মুসলমান প্রজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মহম্মদ আলি সুশিক্ষিত ও ধনবান প্রজা। সে আসিয়া রায় বাহাদুরকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুরের হুকুম?"

রায় বাহাদুর কহিলেন—"দেখ মহম্মদ, তোমাকে এবার একটা কায করতে হবে। এই তোমাদের বক্‌রীদ আসছে; এই বক্‌রীদে আমার জমীদারীর ভেতর কোনও যায়গায় যাতে গোরু-কোরবানি না হয় তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।"

মহম্মদ আলি মিনতির স্বরে কহিল—"হুজুর যেমন

হুকুম করছেন, আমাদের গ্রামে আমি তা অনায়াসে করতে পারব ; এ গ্রামের সব মুসলমান আমার কথায় হুজুরের হুকুম তামিল করবে। কিন্তু অন্য গ্রাম সম্বন্ধে আমি জবাবদিহি হতে পারব না। আর একটা কথা হুজুরকে নিবেদন করি। এখন এই বাঙ্গলা দেশে সকল মোসলমানই গরীব হয়ে গেছে ; নবাব বাদশার জাত এখন খানসামাগিরি, ভিস্তিগিরি, আর বাবুর্চ্চিগিরি করে। অন্য দিকে দেশের জমীদারেরা চরাবার জন্যে মাঠ দেন না, গরুর চিকিচ্ছে করবার কোনই ব্যবস্থা রাখেন না ; তাতে গরুগুলো না খেতে পেয়ে আর রোগে হাজার হাজার মরে যাচ্ছে ; তাতে গরুর দামও অনেক বেড়ে গেছে ; চাষ আবাদের জন্যে এখন গরু কেনা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেলা টাকা খরচ করে গরু কিনে কোরবানি করে, দেশে এমন মোসলমান কটা আছে হুজুর ? একটা বকরি কেনবার পয়সা জোটে না—"

মহম্মদ আলির দীর্ঘ বাক্য শুনিয়া রায় বাহাদুর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন—"তোমার কথা বন্ধ কর। তোমার কাছে বক্তৃতা শোনবার জন্যে তোমাকে আমি ডাকিনি। আমি যা হুকুম করেছি, তা করবে কি না ?"

রায় বাহাদুরের কড়া কথায় মহম্মদ আলি একটু অপমান বোধ করিল ; সে কুক্ষণে কহিল—"হুজুর, আগেই ত বলেছি যে অন্য গ্রাম সম্বন্ধে আপনার হুকুম তামিল করতে পারবো না।"

রায় বাহাদুর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ; উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আমি জমীদার, রাজা, আমার হুকুম ! তামিল করতেই হবে। আমার কাছে তোমার হারামজাদি খাটবে না।"

অকারণ অপমানকর গালাগালি শুনিয়া মহম্মদ আলির মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে উদ্ধত কণ্ঠে কহিল—"খবরদার হুজুর, ইজ্জৎ রেখে কথা বলবেন !"

রায় বাহাদুর রক্তবর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন—"কি ? আমি জমীদার রাজা, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা কও ? জান না, পাজি, তুমি এখনও আমারই জমীতে বাস করো।"

মহম্মদ আলি শুনাইয়া দিল—"অমনি নয়, খাজানা দিয়ে বাস করি। আমার বাপ দাদা আপনার বাপ দাদাকে অনেক টাকা সেলামি দিয়ে পাট্টা নিয়েছিল।"

তালপত্রের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রায়বাহাদুর লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন ; চীৎকার করিয়া কহিলেন—"চোপ রও ! পাজি হারামজাদ্, শূয়ারকা বাচ্চা !"

মহম্মদ আলি আর সহ্য করিতে পারিল না ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুসলমান রক্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তীব্র ভাষায় জমীদারকে গালাগালি দিল। তার পর জমীদারের ভৃত্যবর্গের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নিম্নতলে নামিয়া ফটকের দিকে ছুটিল।

ক্রোধান্ধ জমীদারের হুকুমে ফটকের নিকট পলায়নপর মহম্মদ আলি ধৃত হইল ; এবং তাঁহার হুকুমে অজস্র পাদুকা-প্রহারে ভূতলশায়ী হইল ; অধিকন্তু তাঁহার আদেশে, তাঁহার নীচ জাতীয় পাইকগণ তাহার মুখে বার বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষণিক ক্রোধের বিষময় ফল যখন ফলিতেছিল, তখন পণ্ডিতবর তারকনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যার জন্য পাত্র মনোনয়ন করিয়া, জমীদার বাটীর ফটকের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া বাটী ফিরিতেছিলেন। সেই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর উৎপীড়িত মুসলমানের পীড়নে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দ্রুতবেগে জমীদার বাবুর নিকটে আসিলেন।

রায় বাহাদুর বিদ্যারত্ন মহাশয়কে চিনিতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও রায় বাহাদুরকে চিনিতেন ; কতবার পণ্ডিত বিদায়ে তাঁহার বাটীতে আহুত হইয়া উপহার লইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ক্রোধোন্মত্ত রায় বহাদুর

সমীপাগত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিলেন না; তারস্বরে পাইকগণকে কহিলেন—"মার্, মার্, আরও মার্! দে, হারামজাদার মুখ একবারে ভেঙ্গে দে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় রায় বাহাদুরের দুই হস্ত ধারণ করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন—"আহা! আহা! ক্ষান্ত হোন। নিবারণ করুন। লোকটা যে মারা যাবে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনিয়া, যে লোকগুলা মহম্মদ আলিকে প্রহার করিতেছিল, তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল যে লোকটা যদি সত্যই মরিয়া যায়, তবে তাহারা নিশ্চয় খুনের জন্য দায়ী হইবে; এবং হয়ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অতএব তাহারা প্রহারে বিরত হইল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় মৃতপ্রায় মহম্মদ আলিকে ধরিয়া তুলিলেন।

রায় বাহাদুর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—"এখানে তুমি কেন? এখানে ত পণ্ডিত বিদায় হচ্ছে না। আমি প্রজাশাসন করছি, তাতে তুমি হস্তক্ষেপ করবার কে?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মহম্মদ আলিকে ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। পরে আপন গ্রামাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে সেই দারুণ গ্রীষ্মে গৃহিণী জলবিন্দুমাত্র গ্রহণ করিবেন না, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া, বারবার আপন পদপ্রান্তে পতিত ছায়ার দিকে চাহিয়া সময়ানুমান করিয়া অতি দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন।

বাঁশফুলি নামক গ্রামে বিদ্যারত্ন মহাশয় পুরুষানুক্রমে বাস করিতেন। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় তিনি বাঁশফুলি গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন।

সেখানে তাঁহার তৃণাচ্ছাদিত রন্ধনগৃহের মৃন্ময় দাবায় বসিয়া, তাঁহার গৃহিণী একটি কুলার উপর বিস্তৃত দাল হইতে একটি একটি করিয়া আবর্জ্জনা-কণা বাছিয়া ফেলিতেছিলেন; তাঁহার নিকটে বসিয়া, তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা সুমুখী, কড়ি ও গুলা নামক দশম ও অষ্টম বর্ষ বয়স্ক ভাই দুটিকে, বঁটী পাতিয়া কাঁচা আম ছাড়াইয়া দিতেছিল; তাহারা আপন আপন বাম হস্তে লবণ লইয়া, লবণ সংযোগে আম্রখণ্ডগুলি নানারূপ মুখভঙ্গী সহকারে চর্ব্বণ করিতেছিল। সেই উচ্চ দাবার নিম্নে একটি জুঁইফুলের গাছ হইতে রৌদ্রতাপে অসংখ্য জুঁইফুলের পাপড়ি সকল শেষ সুবাস বিতরণ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় গৃহপ্রবেশ করিয়া গৃহিণীর উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণ হইতে হাঁকিলেন—"কই গো, তোমরা কোথায় গেলে?"

গৃহিণী কুলা ও দাল ত্বরিত হস্তে বাঁশের শাঙার উপর উঠাইয়া রাখিয়া, দ্রুতপদে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন; প্রফুল্ল নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া মিষ্ট মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, খবর ভাল ত?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় পত্নীর প্রফুল্ল মুখের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, খবর ভাল। পাত্রটি—"

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"সে কথা পরে শুনব এখন। বড় ঘরের দাওয়ায় চল; সেখানে মাদুর বিছিয়ে রেখেছি, বসবে; সুমুখী বাতাস করবে। কি ঘেমেছ!—গায়ে যেন বর্ষার ধারা বয়ে যাচ্ছে। এস, এস, বসবে। আমি ভাত বেড়ে বড় ঘরের দাওয়াতেই নিয়ে যাব এখন। এস।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন—"না; আমাকে মুসলমান বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। কাপড় চাদর না কেচে, আর একটা ডুব না দিয়ে ঘরে ঢুকবো না।"

সুমুখী, মাতার নির্দ্দেশ মত, তালবৃন্ত লইয়া পিতাকে ব্যজন করিতে আসিয়াছিল। সে ব্যজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, তেল এনে দেব কি?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন—"না; সকালবেলা তেল মেখে স্নান করেছি; এখন আর তেল মাখবো না। আর এই ঘামের উপর তেল মাখ্‌লে আটার মত জড়িয়ে যাবে।" অতঃপর পুত্রদ্বয়ের সম্বন্ধে

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে সুমুখী, কড়ি আর ওলা কোথায় গেল রে?"

পিতার প্রশ্ন শুনিয়া রান্নাঘরের দাবা হইতে ওলা উচ্চ কণ্ঠে কহিল—"এই যে, বাবা! আমরা এখানে এই রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কাঁচা আম খাচ্ছি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় রান্নাঘরের দাবার দিকে অগ্রসর হইয়া স্নেহপূর্ণ নয়নে নন্দনদ্বয়ের ললিত অবয়ব অবলোকন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে, তোরা আম কোথা পেলি রে?"

ওলা বলিল—"দাদা মুখুয্যে কাকার গাছ থেকে পেড়েছিল।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়া কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সর্ব্বনাশ! এমন কায কেন করলি?"

গৃহিণী নিকটে ছিলেন; তিনি স্বামীর দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন—"না, না, কিছু অন্যায় করে নি। আমাকে এসে বল্লে, মা, মুখুয্যে কাকার গাছে আমগুলো বড় বড় হয়েছে, মুখুয্যে কাকাকে বলে' চারটে পেড়ে নিয়ে আসব? আমি বল্লাম, যাও কিন্তু না বলে' পেড়ো না, আর চারটির বেশী পেড়ো না। তাই গিয়েছিল। আর মুখুয্যে ঠাকুরপো আরও বেশী নিতে বল্লেও, চারটির বেশী নেয় নি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন—"তোমার অনুমতি নিয়ে কায করলেও, এ কাযটা ভাল হয় নি। আমি তোমাকে কতটা শ্রদ্ধা করি, তাত তুমি জান, গিন্নি। তোমার গর্ভের ছেলে হয়ে, পরের গাছে আম ঝুলছে দেখে সে তা খাবার জন্যে লোভ করবে, এমন ত হতে পারে না। আজ আমের কথা বল্লে, কাল যদি এসে বলে, যে অমুকের গাইয়ের বাঁটে খুব দুধ হয়েছে, দুয়ে নিয়ে আসবো? তখন তুমি কি বলবে?"

গৃহিণী এতটুকু হইয়া বলিলেন—"কাযটা যে এমন অন্যায়, তা আগে আমি বুঝতে পারি নি। [illegible] ছেলেরা এমন অন্যায় কায আর কখনও করবে না। আজ তুমি আমাদের দোষ নিও না।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কাহারও দোষ গ্রহণ করেন নাই। বরং ভাবিয়াছিলেন, যাহার এমন কর্ত্তব্যময়ী গৃহিণী, যাহার সুমুখীর মত সুরূপা ও সুশীলা কন্যা, যাহার কড়ি ও ওলার ন্যায় সুবোধ পুত্র, তাহার সংসার নহে,—পৃথিবীতে ত্রিদিবের প্রতিবিম্ব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্নানান্তে ধৌত উত্তরীয় ও বস্ত্র আতপতাপে শুষ্ক করিবার জন্য কন্যা সুমুখীর হস্তে প্রদান করিয়া, বিদ্যারত্ন মহাশয় বেলা তিন প্রহরের সময় আহার করিতে বসিলেন।

গৃহিণী পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে করিতে মুগ্ধনেত্রে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অতি বৃহৎ ললাটের শোভা দেখিতে লাগিলেন; দেখিলেন, তাহাতে দুশ্চিন্তার একটি মাত্র রেখা পতিত হয় নাই; দেখিলেন, জ্ঞান ও শান্তি সেখানে ক্রীড়া করিতেছে। ভাবিলেন, শান্ত জ্ঞানময় স্বামী তিনি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার মত ভাগ্যবতী এ পৃথিবীতে আর কে আছে?—অমন স্বামী, অমন কন্যা, অমন পুত্র লাভ করিতে পারিয়াছে? হঠাৎ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার ভাবনার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার সুন্দর আনন অনুরাগরাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আহার অর্দ্ধ সমাপ্ত হইলে, তিনি স্বামীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁগা, যে পাত্রটি দেখে এলে, তার বয়স কত?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন—"পাত্রটির বয়স বেশী নয়, একুশ কি বাইশ বছর হবে। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। আর লেখাপড়াও জানে, একটা পাশ করেছে; চাকরীর চেষ্টা করছে। পাত্রের [illegible]

পাকা দোতলা বাড়ী সবই আছে। সেখানে যদি সুমুখীর বিয়ে হয়, তা হলে খুব সুখেই থাকিবে।"

বিধাতা যে সুমুখীকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, গৃহিণী মনে করিলেন যে স্বামী পাত্রের অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিলেন, সেই অবস্থাতে কন্যা চিরসুখিনী হইবে। অতএব তিনি ভোজনরত স্বামীকে কহিলেন—"সুমুখীর জন্মের লগ্ন দেখে তুমি ত আগেই বলেছিলে যে ও চিরসুখিনী হবে। তা আমার মনে হচ্ছে, সেখানেই ওর বিয়ে হবে। তবে তাঁরা যদি অনেক টাকা নগদ চান, তা হলে কি হবে বলা যায় না।"

বিস্তারত্ন মহাশয় তখন নগদে গহনায় যাহা বরপক্ষকে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিলেন।

গৃহিণী। দেখ, এই গহনার জন্যে তোমার কিছুই ভাবতে হবে না। আমার এই বালা আছে, আর হার আছে। এই দুটো গহনা ভাঙলেই বারো তেরো ভরি সোণা পাওয়া যাবে; তাতে সুমুখীর হার, বালা, আর অনন্ত হবে। আর ওর কাণে পাশা মাকড়ী আর নলক ত আছেই। তা ছাড়া আমার বাক্সে পণ্ডিত বিদায়ে পাওয়া ক'টুকরো রূপো আছে; তাও পনেরো ষোল ভরি হবে। তাতে ওর পায়ের মল হয়ে যাবে।

বিস্তারত্ন। তোমাকে আমি কখন একটুক্‌রো সোণা দিতে পারি নি; এখন তোমার বাপের দেওয়া গহনা আমি তোমার গা থেকে খুলে নিতে পারবো না।

গৃহিণী। কেন পারবে না? আমাকে যে তুমি নিয়েছ! আমি, আমার ছেলে মেয়ে, সর্ব্বস্ব যে তোমার। আমাদের চেয়ে ত দু'চার ভরি সোণা বেশী নয়? তা' ছাড়া, আমার মেয়ে; তার গা সাজাবার জন্যে আমি যদি তাকে দু'চার ভরি সোণা দি, তুমি ত তা বারণ করতে পার না।

বিস্তারত্ন। না, বারণ করব না; তুমি দিও। এই গহনা ছাড়া দানসামগ্রী, বরাভরণ ও ফুলশয্যাতে আরও দুশো টাকা খরচ করতে হবে। এই দুশো টাকা একটু চেষ্টা করলে আমি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবো।

গৃহিণী। আর বরযাত্রদের, আর আমাদের গ্রামের জনকতক ব্রাহ্মণকে খাওয়াতেও আরও একশ টাকা খরচ পড়বে।

বিস্তারত্ন। তাও এক রকম করে চলে যাবে। মুদীর দোকান থেকে ধারে জিনিস পত্র নিয়ে, ক্রমে তা শোধ করলে চলবে। আমার ভাবনা কেবল ঐ নগদ পাঁচশো টাকার জন্যে।

গৃহিণী। আমার মনে হচ্ছে তার জন্যও তোমার ভাবতে হবে না। তোমার পঞ্চাশ ঘর শিষ্য আছে; তারা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। তারা প্রত্যেকে যদি দশটাকা হিসাবেও দেয়, তা'হলে অক্লেশে তোমার পাঁচশ টাকা হয়ে যাবে। তুমি কালই তাদের সকলকে চিঠি লেখ।

বিস্তারত্ন। চিঠি লিখলে চলবে না। কালই সকালে দুর্গানাম করে' আমি নিজে বেরিয়ে পড়বো। দশ বার দিন গ্রামে গ্রামে শিষ্যবাড়ী ঘুরে আমি এই চৈত্র মাসেই বাড়ী ফিরব। যদি ঐ টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি, তা হলে আগামী বৈশাখ মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে।

গৃহিণী। তা টাকার যোগাড় হবেই; আর ঐ খানেই ঐ বোশেখ মাসেই সুমুখীর বিয়ে হবে।

বিস্তারত্ন। আমার মনে কিন্তু ততটা সহজ বোধ হচ্ছে না। আমার প্রতি আমার শিষ্যদের খুব ভক্তি আছে বটে; কিন্তু জান ত, তারা সব ছাঁপোষা লোক; তার উপর, জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য হওয়ায় সংসার চালানই দায় হয়ে পড়েছে। অনেকে পূজায় যে দু'পাঁচ টাকা বার্ষিক বরাদ্দ আছে, তাই দিয়ে উঠতে পারে না। এখন হঠাৎ এই বছরের শেষে, অতটা টাকা যে দিয়ে দিয়ে উঠতে পারবে, এমন মনে হয় না। তবে একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

গৃহিণী। কালই আসবে কি?

বিস্তারত্ন। হঁ, কালই যেতে [illegible]

দেরী করা হবে না; এই মাসের মধ্যেই বাড়ী ফেরা আবশ্যক।

পর দিন প্রত্যুষেই গৃহিনীর নিকট বিদায় লইয়া এবং সংসারের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, তাঁহার হস্তে পাঁচটি রজত মুদ্রা প্রদান করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয় দুর্গানাম জপ করিতে করিতে গৃহ ত্যাগ করিলেন। গৃহিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহদ্বারে গিয়া কতক্ষণ স্বামীর গমন পথের দিকে উদাসনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিষাদাচ্ছন্ন মুখে বাটীর মধ্যে ফিরিলেন; এবং নিত্যাচরিত গৃহকর্ম্মে মন দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যারত্ন মহাশয় গৃহত্যাগ করিবার পরে গৃহিনী হঠাৎ কিছু বিচলিত হইয়া, গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন, কৈ তিনি ত প্রভাত হইতে একবারও ওলাকে দেখেন নাই। শুইবার ঘরের দাবার উপর মাদুর পাতিয়া, তাহাতে বসিয়া কড়ি এক মনে পাঠাভ্যাস করিতেছিল। কিন্তু কড়ির নিকট ওলা ছিল না। গৃহিনী কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে, কড়ি, ওলা কোথায় গেল রে? তাকে ত সকাল বেলা থেকে দেখিনি।"

পূর্ব্বদিন পিতাকে আম পাড়ার কথা বলিয়া দিয়াছিল, এজন্য কড়ির মন ওলার প্রতি তত প্রসন্ন ছিল না। সুতরাং সে তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—"কি জানি, কোথায় গেছে। বোধ হয় এখনও বিছানাতে শুয়ে আছে।"

গৃহিনী কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন—"সুমুখী দেখ্ ত, মা, এত বেলা হল, ওলা এখনও উঠল না কেন?

শয়নগৃহে ওলাকে দেখিয়া আসিয়া সুমুখী বিহ্বল নেত্রে কহিল—"মা, ওলা বিছানাতেই শুয়ে রয়েছে। তার গা খুব গরম। এত ডাকলাম উত্তর দিলে না। তুমি একবার দেখবে এস।"

গৃহিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—"ও মা, কি গেরো! তিনি বাড়ী থেকে বেরুতে না বেরুতে ছেলেটা জ্বরে পড়লো।" বলিতে বলিতে তিনি ছুটিয়া ওলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। দেখিলেন, ওলা সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া আছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার অঙ্গের উত্তাপ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া তিনি অতিশয় ভীতা হইলেন। অকস্মাৎ পুত্রের এই কঠিন পীড়ায় কি কর্ত্তব্য তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, স্বামীর পশ্চাতে কোনও লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি কোন পথে কোথায় গিয়াছেন, তাহার ত নিশ্চয়তা নাই; আরও, তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, এ সময় মধ্যে তিনি প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এখন তাঁহার অনুধাবন করিয়া কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না। অতএব তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য, তাঁহার অনুগমন করা বৃথা; আপন বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ীই পুত্রের পীড়ার প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভৃত্য বা অন্য অভিভাবকাদির সহায়তাশূন্যা কুলবধূ, ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কন্যা ও দশম বর্ষীয় এক বালকের সহায়তায় কি করিবেন? গ্রামে ডাক্তার নাই, মহেশপুর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে হইবে; গ্রামে ঔষধালয় নাই, মহেশপুর হইতে ঔষধ আনিতে হইবে। দুই ক্রোশ পথ আনাগোনা করিয়া কে এই সকল কার্য করিবে? গ্রামের কোন লোককে বলিলে বোধ হয় এই বিপদের সময় কেহই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না;—সকলেই যে তাঁহাদের ভালবাসে। বোধ হয়; মুখুয্যে ঠাকুরপোকে বলিলেই, সে ডাক্তার ডাকিয়া দিবে, ঔষধ আনিয়া দিবে, আর অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থাই করিবে। কিন্তু অর্থ? পুত্রের চিকিৎসা ও পথ্য ক্রয় জন্য তিনি অর্থ কোথায় পাইবেন? তাঁহার হাতে তাঁহার স্বামী যে পাঁচটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত একবার ডাক্তার আসিলেই, আর একদিনকার

ঔষধ পথ্যেই ব্যয় হইয়া যাইবে। তাহার পর আবার ডাক্তার আনিতে হইলে, আরও অর্থ তিনি কোথায় পাইবেন? তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার গায়ে গহনা আছে; সেই গহনা বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন এবং পুত্রের চিকিৎসা করাইবেন। তিনি স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে সেই গহনা বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে দিবেন; কিন্তু সে বিবাহ পরে হইবে; তাহার আগে ত তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন! এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন—"কড়ি, বাবা, তুমি একবার তোমার মুখুয্যে কাকাকে ডেকে নিয়ে এস। বলো যে ওলার খুব অসুখ; আর তিনি বাড়ীতে নেই।"

দুই মিনিট পূর্ব্বে কড়ি ভ্রাতার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া পড়িতে বসিয়াছিল; এখন সে ভ্রাতার অসুখের কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়ি পুস্তক তুলিয়া রাখিয়া, বিপন্নের ন্যায় মুখুয্যে কাকাকে ডাকিবার জন্য ছুটিল।

মুখুয্যে কাকা প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ,তাহার নাম রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। বড় ভাই লেখা পড়া শিখিয়া, বিদেশে থাকিয়া চাকুরী করিত। সে লেখাপড়া না শিখিয়া বাড়ীতে থাকিয়া জমী জমা দেখিত, আর গ্রামের লোকের ফায়ফরমাস খাটিত; উৎসবে লুচি ভাজিত, কোমর বাঁধিয়া পরিবেষণ করিত; মৃত্যুতে শ্মশানে মৃতদেহ বহন করিতে ঘাড় পাতিয়া দিত। রাখালদাস আসিয়া ওলার গায়ে হাত দিয়া বলিল—"তাই ত বৌঠাকরুণ, জ্বরটা যে বড় বেশী; একবারে যে বেহুস হয়ে রয়েছে। একজন ডাক্তারকে ত ডাকা দরকার।"

গৃহিনী বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—"তাই ত তোমায় ডেকেছি, ঠাকুরপো। তিনি বাড়ী নেই; শিষ্যবাড়ী গেছেন। বাড়ী ফিরতে দশ বারদিন দেরী হবে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এসব তুমি না করলে আমার আর ত কোন ভরসা নেই ঠাকুরপো।"

রাখালদাস কহিল—"সে সব তোমার কিছু ভাবনা নেই। কোন্ ডাক্তারকে ডাকতে হবে বল, আমি এখনই ডেকে নিয়ে আস্‌ছি। মহেশপুরের কেদার ডাক্তার বেশ ভাল ডাক্তার; ভিজিট নেবে দু' টাকা আর গাড়ীভাড়া নেবে দেড় টাকা,—তাকেই ডেকে নিয়ে আসবো কি?"

গৃহিনী কহিলেন—"তুমি যাকে ভাল বিবেচনা কর তাকেই নিয়ে এসো।"

রাখালদাস গমনোদ্যত হইয়া কহিল—"তাকে ত আনবোই। কিন্তু দৈবক্রমে যদি তার দেখা না পাই, তা হলে অন্য যাকে পাব তাকেই নিয়ে আসবো। ছেলেটার পেটে আজ দু' এক দাগ ওষুধ পড়া চাই।"

গৃহিনী এক প্রতিবেশিনীর নিকট তাঁহার স্বর্ণহার বন্ধক রাখিয়া এক শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। মহেশপুর হইতে কেদার ডাক্তার প্রত্যহ আসিতে লাগিল; ঔষধ পথ্যের রীতিমত ব্যবস্থা হইল; সুমুখী ও গৃহিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র সেবা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ওলার রোগের উপশম হইল না। পঞ্চম দিনে তাহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল দেখিয়া মহেশপুরের ডাক্তার কহিলেন—"রোগটি বড়ই কঠিন; অন্য একজন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। আপনারা জেলা থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করুন।"

জেলা হইতে একবার ডাক্তার আনিতে হইলে, পাথেয় ও দর্শনীতে যাট পঁয়ষট্টি মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে। গৃহিনী আপনার হস্তের বালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"তাই হবে।" তিনি বালা বন্ধক রাখিয়া আবার ঋণ গ্রহণ করিলেন। রাখালদাস জেলা হইতে ডাক্তার লইয়া আসিল। মহেশপুরের ডাক্তারও দুই বেলা আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। ওলার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইল।

কয়েকদিন কিছু ভাল থাকিয়া, একাদশ দিবসে ওলার রোগ আবার অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মহেশপুরের ডাক্তার বলিলেন—"আবার জেলা থেকে ডাক্তার আনতে হবে।"

আনিতে ত হইবে! কিন্তু আর অর্থ কোথায়? দয়াময়, তোমার করুণার রাজ্যে দুঃখিনী মাতা কি

আপনার চক্ষের সম্মুখে, আপন পুত্রকে, আপন বক্ষের নিধিকে, আপন প্রাণাধিক প্রাণকে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দেখিবেন ?

দুঃখিনীর অর্থ নাই, অর্থ সংগ্রহের উপায় নাই ;— না থাক, তুমি দয়াময়, তোমার অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার ত শূন্য হইয়া যায় নাই !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

না, তোমরা বিশ্বাস কর, ভগবানের অসীম দয়ার ভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না। পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, অশ্রুধারার পর অশ্রুধারা ঢালিয়া গৃহিণী যখন পুত্রের চিকিৎসার কোনও উপায়ই দেখিতে পান নাই, তখন নিরুপায়ের উপায় আপনি দ্বারের কাছে উপায় আনিয়া দিয়াছিলেন। ক্যাম্বিসের ব্যাগটি দক্ষিণ হস্তে ঝুলাইয়া স্বয়ং বিদ্যারত্ন মহাশয়, গৃহিণীর দুশ্চিন্তার অন্ধকার আকাশে প্রভাতকালীন শুকতারার ন্যায়, গৃহ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী আপন পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারের পার্শ্বে ব্যাগটি রাখিয়া কহিলেন—"ওলার অসুখের কথা আমি গ্রামে ঢুকেই শুনেছি। এখন কেমন আছে ?"

গৃহিণী স্বামীকে গললগ্নীকৃতাঞ্চলে প্রণাম করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—"আর আমার ভাবনা নেই। এইবার তুমি এসেছ ; এইবার ওলা আমার ভাল হয়ে উঠবে। তুমি ওর কাছে গিয়ে বস ; আর মাথায় তোমার পায়ের ধুলা একটু দাও। আমি ততক্ষণ নেয়ে এসে তোমার জন্যে চারটি ভাত চড়িয়ে দি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যার বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিয়া শিষ্যগণের নিকট ঈপ্সিত পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন নাই ; কিন্তু কিঞ্চিদধিক দেড়শত টাকা পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা ব্যয় করিয়া, জেলা হইতে দুইবার ডাক্তার আনাইয়া ওলার চিকিৎসা হইল। ওলা আরোগ্যলাভ করিল, পথ্য পাইল ; আবার পিতামাতার নয়নানন্দবর্দ্ধন করিয়া গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল।

সুমুখীর বিবাহের জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী আবার চিন্তিত হইলেন। চিন্তিত হইবারই কথা। কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছিল ; তাহার বিবাহ দেওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার উপর বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ না করায় গ্রাম মধ্যে তাঁহাদের নিন্দা হইয়াছিল ; সে নিন্দা তাঁহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। মহেশপুর-নিবাসী রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাশ করা পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, একথা বাঁশফুলি গ্রামের সকল লোকেই শুনিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিল যে তেমন পাত্র জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিলেও কোথাও পাওয়া যাইবে না ; বিদ্যারত্ন নিতান্ত নির্ব্বোধ তাই এমন সুপাত্র, এমন অল্পব্যয়ে মুষ্টিমধ্যে পাইয়াও ইতস্ততঃ করিয়া কাল বিলম্ব করিতেছেন। গ্রামবাসিগণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অর্থাভাবের কথা বুঝিল না ; তাহারা পরস্পরের নিকট কহিল যে বিদ্যারত্ন নিতান্ত ব্যয়কুণ্ঠ ; তাঁহার হাতে যথেষ্ট অর্থ আছে ; না থাকিলে সামান্য একটা পুত্রের চিকিৎসার জন্য জেলা হইতে ডাক্তার আনাইয়া কেহ এত টাকা ব্যয় করিতে পারে না। এখনও তাঁহার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হস্তে এত অর্থ আছে যে তাহাতে তিনি অনায়াসে পাঁচটা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন ; অথচ তিনি এমনই কার্পণ্যভাবাপন্ন যে সামান্য হাজার টাকা খরচ করিয়া একটা মেয়ের বিবাহ দিবেন না, চতুর্দ্দশ পুরুষের উজ্জ্বল মুখ মসীলিপ্ত করিয়া, যুবতী কন্যাকে গৃহে পুরিয়া রাখিবেন! গ্রাম্য ললনাগণও সুমুখীর সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসিৎ কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করিলেন না।

লোকের মুখে মুখে ক্রমে সকল কথাই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। লোকনিন্দার সুতীক্ষ্ণ বাণগুলা তাঁহার হৃৎপিণ্ড ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল ; কিন্তু তিনি তাহা নীরবে সহ্য করিলেন। অসহ্য ক্ষোভের

মধ্যে এক-একবার আশান্বিত হইয়া ভাবিলেন, আহা! দেশে কি এমন সদাশয় ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি তাঁহাকে আজ এক হাজার টাকা দান করিয়া এই অসহ্য কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন!

১৫ই বৈশাখ রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পত্র আসিল।

গৃহিণী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি লিখেছেন?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন—"লিখেছেন, যে দু' একদিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে একটা পাকা কথা না পেলে, তিনি অন্যত্র পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করবেন।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উত্তর দেবে? মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ত আর একটা টাকাও নেই।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন—"আজ ভেবে দেখি, কাল যাহা হয় একটা উত্তর দেওয়া যাবে। এখন ত সেখানে সুমুখীর বিয়ে হবার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছিনে। আবার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় এই হয়েছে যে, মেয়ের বিয়ে দেব বলে' শিষ্যদের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে এসেছি, যদি এখন বিয়ে দেওয়া না ঘটে, তাহলে সে টাকাটা এখন তাদের ফেরত দেওয়া দরকার। কিন্তু ফেরত দেবার টাকা কোথায় পাব? আমাদের এই দু'খানা চালা ঘর আর বাস্তুজমী টুকু বন্ধক রেখে কি কেউ দেড়শো টাকা ধার দেবে? আজ রাতটা ভাবি, কাল সকালে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছিল; বিদ্যারত্ন মহাশয় সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া, শয়ন গৃহের দাবায় সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে নীরবে বসিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন, দৈব কি এমন সুপ্রসন্ন হইবেন যে, তিনি হাজার টাকা লাভ করিয়া, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারিবেন? দৈবের প্রসন্নতা লাভ করা ব্যতীত কন্যার বিবাহ দিবার আর ত কোন উপায়ই ছিল না। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইল দেখিয়া, কন্যা সুমুখী পিতার নিকট একটি দারুময় দীপাধারে একটি প্রজ্জ্বলিত মৃৎপ্রদীপ রাখিয়া গেল। কন্যার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কড়ি ও ওলা রাত্রের আহার সমাপন করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। গৃহিণী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অন্ন দিবার জন্য স্থান মার্জ্জন করিয়া, কম্বলের আসনখানি বিছাইয়া দিলেন। কিন্তু অন্ন দেওয়া হইল না।

সহসা বহির্দ্বারে করাঘাত করিয়া কোনও ব্যক্তি ডাকিল—"বিদ্যারত্ন মশায়, বিদ্যারত্ন মশায় বাড়ী আছেন?"

রাত্রে অপরিচিত কণ্ঠস্বরে কে তাঁহাকে ডাকিল, ইহা ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারের নিকট আসিয়া অর্গল খুলিয়া দেখিলেন যে কোন অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে আপনি?"

ভদ্রব্যক্তি অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—"বলছি, ভিতরে চলুন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কোনও বহির্ব্বাটী ছিল না। তিনি শয়ন গৃহের দাবায় একটি কম্বল বিস্তৃত করিয়া ভদ্রব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া তাহাতে বসাইলেন; এবং তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরপি প্রশ্ন করিলেন—"মশায়ের নাম? কি অভি-প্রায় আসা হয়েছে?"

ভদ্রব্যক্তি উপবেশন করিয়া কহিলেন—"আমাকে আপনি চিন্‌তে পারছেন না?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রদীপটি আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ভদ্রলোকটিকে উত্তমরূপে দেখিয়া বলিলেন—"বিলক্ষণ! আপনাকে আর চিন্‌ব না? আপনার

হাত থেকে কতবার পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করেছি। আপনি মহেশপুরের জমীদার রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মশায়ের খাতাঞ্চী।"

খাতাঞ্চী বাবু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও আছে কি না; তাহার পর কহিলেন—"হ্যাঁ, আমি রায় বাহাদুরের কাছ থেকেই আসছি। একটু বিশেষ প্রয়োজনেই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

বিদ্যারত্ন। এই রাত্রে? রাত্রে কি প্রয়োজন?

খাতাঞ্চী। দিনে আপনার কাছে আসিনি, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে আমি এসেছিলাম তা গ্রামের কোনও লোক জানতে পারে।

বিদ্যারত্ন। এই গোপনীয় প্রয়োজনটা কি?

খাতাঞ্চী। প্রয়োজনটা কি আপনাকে বলি শুনুন। আপনার বোধ হয় মনে আছে যে, প্রায় একমাস আগে আপনি একবার মহেশপুরে গিয়েছিলেন?

বিদ্যারত্ন। বিলক্ষণ মনে আছে। রঘুনাথ মুখুযোর বাড়ীতে মেয়ের জন্যে পাত্র দেখিতে গিয়েছিলাম।

খাতাঞ্চী। সেদিন পাত্র দেখে বাড়ী ফেরবার পথে মহেশপুরে আর কিছু দেখেছিলেন?

বিদ্যারত্ন। দেখেছিলাম। জমীদার রায় বাহাদুরের হুকুমে তাঁর পাইকেরা একজন ভদ্র মুসলমান প্রজাকে প্রহার করছিল। দেখে, আমি তা নিবারণ করেছিলাম; আর মুসলমানকে তার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।

খাতাঞ্চী। সেই বজ্জাৎ বিধর্ম্মী মোসলমানটার নাম মহম্মদ আলি। সে প্রজা হয়ে জমীদার রায় বাহাদুরের নামে নালিশ করেচে। আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখুন! সে আপনাকে সাক্ষী মেনেচে;—ব্যাপারটা আপনি ছাড়া বাইরের লোক আর ত কেউ দেখে নি। তাই রায় বাহাদুর আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বলেছেন যে আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; ব্রাহ্মণ ছাড়া, তাঁর মত ব্রাহ্মণ জমিদারকে আর কে রক্ষা করবে? আপনি হিন্দু, মোসলমানের পক্ষ অবলম্বন করে' হিন্দু ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা জমীদারকে যদি রক্ষা না করেন, তাহলে পৃথিবীতে আর হিন্দুয়ানী থাকবে না। তিনি আপনার সম্মান রাখতে ক্রটি করেন নি। তিনি শুনেছেন যে কন্যার বিবাহে রঘুনাথ বাবুকে আপনার টাকা দিতে হবে; তার উপর ব্রাহ্মণ ও বরযাত্রদের খাওয়াতেও খরচ আছে। এই খরচটা আপনি যাতে সহজে নির্ব্বাহ করতে পারেন, তার জন্যে আপনার প্রণামী দেড় হাজার টাকা আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মকর্দ্দমায় জিত হলে, এ ছাড়া পাঁচশো টাকা প্রণামী দেবেন। টাকাটা—"

এই বলিয়া, খাতাঞ্চী বাবু পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্মুখে রাখিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা স্পর্শ না করিয়া কহিলেন —"আমি ত এ পর্য্যন্ত সাক্ষীর সমন পাইনি; যদি পাই, তা হলে আমাকে কি করতে হবে?"

খাতাঞ্চীবাবু অকুণ্ঠ কণ্ঠে কহিলেন—"তার পক্ষের সাক্ষী হয়ে, আদালতে গিয়ে বলতে হবে যে, আপনি এক বছরের ভিতর মহেশপুরে একবারও যাননি, আর কখনও কোনও মারপিটও দেখেন নি। বেটা মোসলমান তখন বুঝবে, যে হিন্দুর বিপক্ষে হিন্দু কখনও সাক্ষ্য দেয় না।"

খাতাঞ্চী বাবুর অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জায় ও অপমানে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চক্ষু কর্ণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবনত আননে ভাবিলেন, সত্যের বিনিময়ে এই অর্থটা গ্রহণ করলে মনোমত সুপাত্রের সহিত সুমুখীর বিবাহ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে, তাঁহার ভদ্রাসন ঋণদায় হইতে রক্ষা পাইবে; তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর অঙ্গের অলঙ্কার সেই সুন্দর অঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া দেহশোভা বর্দ্ধিত করিবে। হায় ভগবান! তুমি দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে একি মহা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিলে! ব্রাহ্মণ কি সত্যের অবমাননা করিয়া আপন মহাকুলকে কলঙ্কিত করিবেন? তিনি কি এই হেয়

অর্থের সহিত এই মহা অপমান মস্তকে তুলিয়া লইবেন? না।

বিদ্যারত্ন মহাশয় কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তারপর দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"মশায়, রায় বাহাদুরকে বল্‌বেন, যে তাঁর এই অর্থ আমি কখনই গ্রহণ করতে পারব না; আর ব্রাহ্মণ হয়ে সত্যের অপলাপও করতে পারব না। আপনি নোটগুলি নিয়ে, আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে আমার কুটীর এই দণ্ডে ত্যাগ করুন।"

খাতাঞ্চী বাবু কিয়ৎকাল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দিকে বিস্ময়বিকৃত নয়নে চাহিয়া রহিলেন; এবং তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণের সহিত আর যুক্তিতর্ক করা বৃথা হইবে। তাঁহার নোটগুলি তুলিয়া লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন; এবং প্রস্থানোদ্যত হইয়া কহিলেন—"আপনি অত বড় একটা জমিদারের বিপক্ষতাচরণ করে' সুবিবেচনার কায করলেন না। জানবেন, তাঁর ক্রোধে আপনার মহা অনিষ্ট ঘটবে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় উদ্বেগশূন্য কণ্ঠে কহিলেন—"খাতাঞ্চী বাবু, আপনি বৃথা ভয় প্রদর্শন করছেন। মানুষের ক্রোধকে আমি কখনও ভয় করিনি, এখনও করবো না,—তা সে মানুষটা জমীদারই হোক, আর রাজাই হোক।"

ভদ্রব্যক্তি প্রস্থান করিলে, বিদ্যারত্ন মহাশয় আহার করিতে বসিয়া মুগ্ধনেত্রা গৃহিণীর নিকট ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিলেন—"দেখ গিন্নি, এখন সুমুখীর বিয়ের ভারটা, আমি আর নিজের হাতে রাখ্‌লাম না; তা ভগবানের হাতে সমর্পণ করলাম। এখন আর নিজেকে কন্যাদায়গ্রস্ত মনে করে অর্থলাভের প্রলোভনে পড়তে হবে না। মেয়ের বিয়ে দেব বলে, শিষ্যদের কাছ-থেকে যে টাকাটা এনেছি, কালই ভদ্রাসন বন্ধক রেখে, তা পরিশোধ করবার ব্যবস্থা করবো। তোমার অলঙ্কার গেল, আমার ভদ্রাসন গেল; কিন্তু, গিন্নি, আমাদের হাতে সত্যের অবমাননা হয় নি।"

গৃহিণী কথা কহিলেন না। সত্যালোকে সমুজ্জ্বল, স্বামীর সেই প্রশস্ত ললাটের দিকে তাকাইয়া আপন মনে ভাবিলেন—'ধন্য আমি।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাঁশফুলি গ্রামের দুইজন ভদ্রলোক আদালতে সাক্ষ্য দিয়া কহিল যে, ঐ অবাস্তব ঘটনার দিন বিদ্যারত্ন মহাশয় মোটেই মহেশপুরে যান নাই; সেদিন সমস্ত সকাল বেলাটা তিনি প্রকৃতপক্ষে বাঁশফুলি গ্রামেই ছিলেন, এবং বারোয়ারীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাহাদের সহিত গল্প করিয়াছিলেন। মহেশপুরের রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় হলফ করিয়া বলিলেন যে, বিদ্যারত্ন মহাশয় কস্মিনকালে তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার বাটীতে আসেন নাই। জেলার হাঁস্‌পাতালের যে ডাক্তার মহম্মদ আলির মুখমণ্ডলের আঘাত চিহ্ন সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিও শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নমুখে পতিত হওয়ায়, সম্ভবতঃ ঐ সকল ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল। মহম্মদ আলির দুইজন মুসলমান প্রতিবেশী ডাক্তার বাবুর কথার সমর্থন করিয়া কহিল যে, তাহারা মহম্মদ আলিকে এক গো শকট হইতে কঙ্করময় রাস্তায় নিম্নমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছিল। কলিকাতা হইতে একজন এটর্ণি আসিয়া অম্লান মুখে বলিলেন যে, তথাকথিত ঐ ঘটনার দিন সকালে এবং তাহার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময়, মহেশপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতায় ছিলেন। জমীদার বাবুর এক সত্যবাদী কর্ম্মচারী কহিল যে, মহম্মদ আলি অন্যায় পূর্ব্বক বিনা খাজানায় যে অতিরিক্ত জমী দখল করিতেছিল, তাহার খাজানা চাওয়ায় সে মনের আক্রোশে অকারণ জমীদার বাবুর নামে এই মিথ্যা মকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। মহেশপুরের একজন মুসলমান প্রজা কর্ম্মচারীর কথায় সমর্থন করিল। সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনিয়া, এবং আদালতের প্রধান

উকিলের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, বিচারক রায় লিখিলেন যে মকর্দ্দমা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

মহম্মদ আলি ম্লান মুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় শুনিয়া গেল যে, জমীদারের নামে মিথ্যা মকর্দ্দমা রুজু করার জন্য ফৌজদারী আইন অনুযায়ী তাহার দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইবে।

জমীদার রায় বাহাদুর মাথায় জয়পত্র বাঁধিয়া মহেশপুরে ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামে আসিয়া তিনি তাঁহার দেওয়ানজীকে কহিলেন—"মিথ্যা মকর্দ্দমা আনার জন্যে যাতে মহম্মদ আলির জেল হয় তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। এই অবসরে তার সমস্ত ধানী জমীগুলো, একে একে তার হাত থেকে কৌশলে কেড়ে নিতে হবে। বেটা জানে না যে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস করা চলে না।"

দেওয়ানজী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রায় বাহাদুর, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডাকিয়া সৎপরামর্শ দিলেন যে তাঁহার পুত্রের বিবাহ জন্য বস্ত্র-অলঙ্কার-ধারিণী প্রভৃত-যৌতুক-আমদানী-কারিণী মনোমোহিনী কন্যা আনিয়া দিবেন; তিনি যেন বাঁশফুলির বিদ্যারত্নের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ না দেন।

রঘুনাথ বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন—"আজ্ঞে, বিদ্যারত্ন মশায় এই মকর্দ্দমার অনেক দিন আগেই পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, আমার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

রঘুনাথ বাবু কহিলেন—"আমি যে হাজার টাকা চেয়েছিলাম, তা তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন, 'যে হাজার টাকা সংগ্রহ করে' একটা মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, সেই কন্যাভারগ্রস্ত অন্নহীন দরিদ্রের এত গর্ব্ব! এ গর্ব্বে আমি চূর্ণ করবো। আর কোথাও যাতে তার মেয়ের বিয়ে না হয়, জনসমাজে যাতে তার মুখ হেঁট হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো।

রায় বাহাদুর আপন অভিপ্রায় মত ব্যবস্থা করিলে[ন।] এক দিকে অর্থাভাবে, অন্য দিকে নানা অপব[াদে] বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ রহিত হইয়া গে[ল।] তথাপি রায় বাহাদুর মনে শান্তিলাভ করিতে পারি[লেন] না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উন্নত দেহ সত্যের বি[জয়]স্তম্ভের ন্যায় তাঁহার অশান্ত মনোমধ্যে নিশিদিন চি[ত্রিত] হইয়া রহিল। সেই চিত্রের পদতলে মিথ্যাভারে [ন]ত তাঁহার মস্তক বারবার অবনত হইয়া পড়িত। অশা[ন্তি] তাঁহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, বিদ্যারত্ন উন্নত সত্যব[ান] রহিলেন, আর তিনি নিজে পতিত মিথ্যাবাদী ছ[াড়া] আর কিছু হইতে পারিলেন না। কি অশান্তি! তাঁ[হার] শত নিন্দাতেও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কন্যার অনি[ন্দ্য] পবিত্রতায় একটুও কলঙ্কপাত হইল না; কেবল তি[নি] হেয় নিন্দুক হইলেন। অশান্তির তরঙ্গাঘাতে তাঁ[হার] হৃদয় বিলোড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার অশা[ন্তি] সমুদ্রে, সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী আলোকস্তম্ভের ন্যায় বিদ্যা[রত্ন] মহাশয়ের সত্যের জ্যোতি জ্বলজ্বল্ করিয়া জ্বলি[তে] লাগিল।

অবশেষে মনের মহা অশান্তিতে রায় বাহাদুরের [দেহ] অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার রাত্রগুলি অনি[দ্রায়] কাটিতে লাগিল। বিনিদ্র থাকিয়া চক্ষু মুদিত ক[রিয়া] তিনি বারবার ভাবিতেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অপরা[ধ] কি? দুই সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির প্রলোভনেও, দরিদ্র ক[ন্যা]ভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন নাই, ইহাই কি তাঁ[র] অপরাধ? এই অপরাধের জন্যই কি তিনি তাঁহা[কে] অশেষ বিধানে নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিতেছে[ন?] আর পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিসমা গৃহস্থকন্যা! সে তাঁ[র] কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল যে তিনি তা[র] জীবনটা বৃথা করিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে[ন?] ভাবিতে ভাবিতে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ও তাঁহার কন[্যার] কাল্পনিক মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাঁহাদের [...] জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত পাপ আরও [...] হইয়া উঠিত। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তাঁহার মর্ম্মস্থল বিক্ষত হইয়া যাইত।

জমীদার গৃহিণী স্বামীর এই অশান্তি ও অনিদ্রা লক্ষ্য রিলেন। দেখিলেন, স্বামীর সুন্দর মুখমণ্ডলে মন-ষ্টের একটা কৃষ্ণ ছায়া পতিত হইয়াছে। তিনি মীর মুখের দিকে বিষাদপূর্ণ নয়নে চাহিয়া প্রশ্ন করি-লেন—"তোমার কি হয়েছে?"

রায় বাহাদুর গৃহিণীর নিকট তাঁহার মনের অশান্তির থা ও তাহার কারণ অকপটে বিবৃত করিলেন।

জমীদার গৃহিণী কহিলেন—"এর প্রতীকার ত তামারই হাতেই রয়েছে। যা করে' মনে শান্তি পাচ্ছ, া, তা আর কোরো না।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু যা করে লেছি, আর তার যা বিষময় ফল ফলেছে, তা কি রে নষ্ট করবো?"

জমীদার গৃহিণী কহিলেন—"তুমি রাগ কোরো না; ামাকে একটা কথা বলবো। জেনো, তোমার কাছে নও অনিষ্টই হয় নি। তোমার সমস্ত বিদ্বেষের তটুকুও বিদ্যারত্ন মশায়ের কেশাগ্র স্পর্শ করতে রে নি। তিনি দরিদ্র হলেও, মনে মহাশান্তি উপভোগ র', প্রফুল্ল মনে আপন কুটীরে বাস করছেন। জেনো, ভগবানের পৃথিবীতে মিথ্যার কখনও জয় হয় না; র পৃথিবীতে চিরকাল সত্যেরই জয় হয়ে এসেছে।"

রায় বাহাদুর কহিলেন—"এখন তা আমি খুব ঝেছি। খুব বুঝেছি, যে বিদ্যারত্ন মশায়কে জব্দ তে গিয়ে, আমি নিজে জব্দ হয়েছি, তিনি হন নি। র কোনও অনিষ্ট হয় নি, কাজেই তার কোন প্রতী-রেরও দরকার নেই। কিন্তু আমার মিথ্যা নিন্দায় নিরপরাধিনী কন্যার যে অনিষ্ট হয়েছে, তার ত টা প্রতীকার করতে হবে!"

জমীদার গৃহিণী কহিলেন—"তার প্রতীকারও মারই হাতে রয়েছে। তুমি নিজে সেই মেয়ের বিয়ে ।"

রায় বাহাদুর কহিলেন—"আমি, তার সম্বন্ধে যে মিথ্যা নিন্দা রটনা করেছি, লোকে তা সত্য বলে জেনেছে; এখন কে তাকে বিয়ে করবে?"

জমীদার গৃহিণী কহিলেন—"লোকে সত্য বলে জানুক, তুমি ত জান যে সে নিন্দাটা ভয়ানক মিথ্যা। অন্য কারও সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারবে না বটে, কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে তোমারও কোনও আপত্তি থাক্‌তে পারে না। তুমি ছেলের জন্যে সুপাত্রী খুঁজে বেড়াচ্চ; এমন সুপাত্রী, এমন বাপের মেয়ে, তুমি কোথায় পাবে! আর মেয়েটিও খুব সুরূপা; আমি বাঁশফুলির অনেক মেয়েমানুষের মুখে এই মেয়ের রূপের সুখ্যাতি শুনেছি। তুমি এই মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দাও। তা হলেই আবার মনের শান্তি ফিরে পাবে।"

রায় বাহাদুর কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন; তাহার পর কহিলেন—"তুমি ঠিক বলেছ গিন্নি, আমি এই মেয়ের সঙ্গেই হেমের বিয়ে দেব। বিদ্যারত্ন মশায়ের এই হেম বিয়ে করে' আমার কুলে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবে।"

হেমচন্দ্র—রায় বাহাদুরের একমাত্র পুত্র। সে এম্-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া আইন পড়িতেছিল। সে পিতার পত্র পাইয়া বাটী আসিল। বিবাহের জন্য মাঘ মাসের একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। সুমুখীর বর মিলিল। যে বরের সহিত বিধাতা তাহার বিবাহ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই সহিত শুভ-দিনে মহাসমারোহে সুমুখীর বিবাহ হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে, আদালতের বিচারে কখন-কখনও মিথ্যার জয় হইলেও, ভগবানের বিচারে চিরদিন সত্যেরই জয় হয়।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ডিকেন্স

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে ডিকেন্সের মৃত্যু-সংবাদ দেশে প্রচারিত হইবামাত্র ইংলণ্ডের অন্তঃকরণের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল হাস্যরাশি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া নিস্তব্ধ অন্ধকারময় গহ্বরের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল! হাস্য ও করুণ রস উদ্দীপনে সিদ্ধহস্ত, মিলন ও বিয়োগের চিত্রাঙ্কনে সুনিপুণ ডিকেন্সের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া খুব জাঁক জমকের সহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল। অসংখ্য দীনহীন ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল। ডিকেন্স যে ইহাদের আন্তরিক স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন!

Goethe এবং Schiller, Moliere এবং Victor Hugo সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তাঁহাদের পুস্তকে চিত্রিত চরিত্রাবলীর মধ্যে এমন বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্য নাই। এমন কি সাহিত্যবীর বাল্‌জাক ও প্রতিবার নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রায় একই রকমের চরিত্র বিভিন্ন পুস্তকে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ডিকেন্সের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার Pickwick Papers পুস্তকে প্রায় তিন শত নরনারীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অন্য পুস্তকে তাহাদের মধ্যে একটিরও পুনরাবির্ভাব নাই। এ যেন কোনও বাজীকর একটা খেলা দেখাইয়া তাহার সাজ সরঞ্জাম সব বাক্সে তুলিয়া সরাইয়া রাখিয়াছে এবং নূতন উপাদান লইয়া বিভিন্ন খেলা আরম্ভ করিয়াছে! নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্কের গভীর চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে মন্ত্রপূত লেখনীর দ্বারা তিনি যে সব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য! এই সব নরনারী-চরিত্র একত্র করিলে সত্যই তাহারা একটি ছোটখাট সহর গড়িয়া বসিবে।

অপরাপর ঔপন্যাসিকের পুস্তক পড়িয়াও পাঠক-সম্প্রদায় তৃপ্ত হয়, এমন কি সময় সময় এত তন্ময় ও আত্মহারা হইয়া যায় যে, নিজেদের অস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাহাদের মন কোন এক কল্পনার রাজ্যে উড়িয়া যায়। কিন্তু ডিকেন্সের উপন্যাসে তাহারা তাহাদের নিজেদেরই চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পায়, নিজেদেরই সুখ দুঃখের কাহিনী পাঠ করে। তিনি তাঁহার মায়া-যষ্টির দ্বারা আমাদের হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে এরূপ সজোরে আঘাত করেন যে, সে আঘাতের সঙ্গে দয়া, মায়া, স্নেহ ও আনন্দ স্বতঃই শতধারে প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন নিজেদের পূর্ব্বে আমরা যতটা ক্ষুদ্র ও অক্ষম বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে ভাব যেন মন হইতে দূর হইয়া যায়, আমরা নিজেদের বড় করিয়া ভাবিতে শিখি। উচ্চহৃদয় প্রেমিক পুরুষের দ্বারাই এরূপ কার্য্য সম্ভব। তাঁহারাই বড় লেখক, বড় আচার্য্য বা বড় নেতা—যাঁহাদের সম্বন্ধে এই উক্তি খাটে যে—Write me as one that loved his fellow men। কেবল বিদ্যাবুদ্ধি বা সংসার জ্ঞানই এরূপ রচনা-সাফল্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে ডিকেন্সের অপেক্ষা আরও অধিক প্রতিভাশালী লেখক জন্মিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভা নানামুখী, মনুষ্যচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি হয়ত আরও তীক্ষ্ণ, রসিকতা অধিকতর সূক্ষ্ম, কল্পনা আরও জীবন্ত, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সারাজীবনের ক্ষুদ্র ও বড় প্রতি-কার্য্যই এমন প্রেমরশ্মিপাতে উজ্জ্বল, এরূপ লেখক পৃথিবীতে বড় অল্প। একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"বার্দ্ধক্যবশতঃ জীবনে যখনই অবসাদ অনুভব করি, আমি ডিকেন্সের একখানি উপন্যাস লইয়া পড়িতে বসি। তখন আমার মনে হয়, যেন অনন্তযৌবনসম্পন্না অপ্সরীদের নির্ঝরের জল পান করিতেছি। পুস্তকের দশ বার পৃষ্ঠা পড়িতে না পড়িতেই আমি পুনর্ব্বার আমার বিগত যৌবন ফিরাইয়া পাই, প্রত্যেক শিরা উপশিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় এবং চক্ষুর সম্মুখে প্রেমের আলোক নৃত্য করিতে থাকে!"

প্রৌঢ়াবস্থায় পুস্তক পড়িতে পড়িতে সহজে পাঠকের চক্ষু দিয়া জল ঝরে না, কিংবা সামান্য কারণেই তাহার মনে হাস্য রসের উদ্রেক হয় না। কিন্তু যৌবনে ডিকেন্সের উপন্যাস পাঠের সময় আমরা Sam Weller-এর সহিত যেরূপ প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলাম, Jonas Chuzzlewit ও Carkerকে ঘৃণা করিয়াছিলাম, Little Nellকে ভালবাসিয়াছিলাম, Quilp-এর আবির্ভাবে ভয়ে কম্পমান হইয়াছিলাম, নিজেদের Nicholas Nickleby বলিয়া মনোমধ্যে কল্পনা করিয়াছিলাম, David Copperfieldএর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম, Gypকে পাইবার জন্য কত লালায়িত হইয়াছিলাম, Pecksniffকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছিলাম এবং Oliver Twist ও হতভাগ্য Smikeএর দুঃখকষ্টে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলাম, সে সকলের স্মৃতি আমাদের পরবর্ত্তী জীবনের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

মিঃ চেষ্টার্টন একস্থলে বলিয়াছেন যে, "Dickens had the key of the street"; এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। দেশের জনসাধারণের সুখদুঃখপূর্ণ দৈনিক জীবনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাহাদের অনেককেই তিনি চিনিতেন, তাহাদের সম্পদে হর্ষ ও বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সেই জন্যই তাহাদের জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাও তাঁহার বিদিত ছিল এবং তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের মন সম্পূর্ণ জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

দীনদুঃখীর বন্ধু ডিকেন্স দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যেই আত্মীয়ভাবে বাস করিতেন, তাহাদের দুঃখ ও অভাবের কাহিনী মনোযোগ সহকারে শুনিতেন, তাহাদের নিরানন্দ কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতেন, তাহাদের কথাবার্ত্তার প্রণালী, এমন কি উচ্চারণের accent অবধি তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরে নিজের অতুলনীয় শক্তির দ্বারা উজ্জ্বল ভাবে তাঁহার অমর পুস্তকে তাহাদের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিয়া জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। নগণ্য দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি তাঁহার অসীম অনুকম্পা ছিল, নিঃসহায় নিরাশ্রয় বালকের দুঃখ দেখিলে, তিনি ব্যথিত চিত্তে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। এবং এই সব তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোককে নিঃশব্দে মনশ্চক্ষুর অন্তরালে বীরের ন্যায় সংগ্রামে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতে দেখিয়া, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিত।

বড় বড় সহরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কত কষ্টে দিনপাত করে, তাহাদের উপর কতদূর অন্যায় অত্যাচার হইয়া থাকে, অথচ তাহাদের মধ্যেই আবার কতটা মহত্ত্ব ও উদারতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাঁহা দরিদ্রের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা কিছুই সংবাদ রাখিতেন না। এই মহাপ্রাণ ঔপন্যাসিক লেখনী-সঞ্চালনে তাঁহাদের অন্তঃকরণকে ইহার প্রতি সজাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জোর গলায় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই সব ঘৃণিত নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রাণেও আশা ভরসা উচ্চাভিলাষ আছে, ইহারাও সুখ দুঃখ অনুভব করে এবং তাঁহাদের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রার্থী। তাঁহার পক্ষে—

> The street, the market place
> Were holy ground : each face—
> Pale faces marked with care,
> Dark toil-worn brows grew fair ;
> King's children were they all,
> though want and sin
> Had marred their beauty—
> glorious within
> He might not view them
> but with reverent eye.

সমাজ-সংস্কারক রূপে ডিকেন্সের যতটা প্রশংসা প্রাপ্য, ইংলণ্ডবাসী তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। নিজ সমাজের দোষগুলিকে তিনি তীব্রভাবে ভর্ৎসনা

করিতেন এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতে সমাজের কতদূর অহিত সাধিত হইতে পারে, তাহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্-বাণী প্রায়ই ফলিয়া যাইত। তাঁহার উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের জলন্ত চিত্র আছে এবং সেই সব যে এখন কিয়ৎ পরিমাণে দেশ হইতে দুরীভূত হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে ডিকেন্সের প্রবল অভিযোগই তাহার প্রধান কারণ। তিনিই প্রথম লণ্ডনের সমাজচ্যুত হতভাগ্যদের দুঃখের কথা এরূপ করুণ ভাষায় সকলের সম্মুখে প্রকাশ করেন যে, দেশের শাসনকর্ত্তাদেরও দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। এই সব হতভাগ্যের পাপপঙ্কিল জীবন-কথা তিনি দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অনশন-জীর্ণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। সংবাদ-পত্রের রিপোর্টাররূপে তিনি কিছুদিন পুলিস কোর্টে যাতায়ত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ন্যায়বিচারে যে সব প্রধান দোষ লক্ষ্য করিয়া নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে বিচারপতিদেরও মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়াছিল। Haunted Man এবং Bleak House উপন্যাসদ্বয়ে সমাজচ্যুত দুইটি বালকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিরূপ নিষ্করুণ অবজ্ঞায় সহিত কোনও কোনও পিতামাতা পুত্রকে জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য সংসারসমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়, তাহা পাঠে এই শ্রেণীর বালকদের দুরবস্থার প্রতি দেশবাসীর চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন উপন্যাসই পাঠকের বিচারশক্তিকে এরূপ ভাবে উদ্বুদ্ধ ও বিচলিত করিতে পারে নাই। উপন্যাসের ভিতরেই আমরা সর্ব্বদা তাঁহার নিজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি; তিনি যে কতদূর উদারহৃদয়, দয়ালু, পরদুঃখকাতর, কষ্টসহিষ্ণু, দীনদুঃখীর কিরূপ বন্ধু ও পক্ষসমর্থনকারী ছিলেন, তাহা স্পষ্টই আমরা অনুভব করিতে পারি। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী Carlyle তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে পড়িয়া যায়—"The good, the gentle, high-gifted, ever friendly, noble Dickens—every inch of him an honest man."

ডিকেন্সের পুস্তকগুলি মন দিয়া পড়িলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, তাঁহার উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য যে কেবল দেশবাসীকে আমোদ ও তৃপ্তি প্রদান করা বা তাহাদের প্রাণে রঙ্গরসের উদ্রেক করা, তাহা নহে। তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসই একটা না একটা উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত (Books with a purpose)। অথচ তাহাতে উপন্যাসের কোন সৌন্দর্য্যেরই হানি হয় নাই বা পাঠক তাহা বুঝিতে পারিয়া পুস্তকের উপর বীতরাগ হয় না—তাঁহার রচনা-শক্তির এমন অদ্ভুত ক্ষমতা! Pickwick এবং Little Dorrit পুস্তকে, দেনার দায়ে লোকে কারারুদ্ধ হইলে তাহাদের স্ত্রী-পুত্র কিরূপ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা দেখাইয়া, এই নির্ম্মম প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। Nicholas Nickleby ও Oliver Twist নামক উপন্যাসদ্বয়ে, নিঃসহায় দরিদ্র বালক জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য কার্য্যের সন্ধানে বাত্যাবিতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং নানা কষ্ট ভোগের পর তাহাদের ভবিষ্যত উন্নতির সকল আশা ভরসাই কিরূপ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। Old Curiosity Shop নামক পুস্তকে সঙ্কীর্ণমতি লোভী আইন ব্যবসায়ীকে সাধারণের নিকট ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। কুশীদজীবীর ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী Our Mutual Friend উপন্যাসে জলন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। The Chimes পুস্তকে অন্যায়কারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিচারপতিদের কুৎসা তিনি সর্ব্ব সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। এবং Christmas Carol উপন্যাসে অর্থপিশাচ মনিবের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সব গুরুগম্ভীর নীতিশিক্ষার মধ্যেও তিনি যে উজ্জ্বল হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা

বড়ই বিস্ময়কর। প্রসিদ্ধ বাগ্মী Earl of Rosebery তাঁহার বক্তৃতার এক অংশে একবার বলিয়াছেন,—"ডিকেন্সের Pickwick Papers যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ নির্ম্মল হাস্যরসের আস্বাদ কিরূপ তাহা জানিত না। সে সময়ের সাহিত্যে আমরা এমন কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাই না, যাহা পাঠে সাংসারিক দুঃখকষ্ট ভুলিয়া প্রাণ খুলিয়া আমরা হাসিতে পারি। রঙ্গমঞ্চে প্রহসন দর্শনের সময়ই আমরা যা একটু আধটু হাসিতে পাইতাম। কিন্তু ডিকেন্সই আমাদের শিখাইয়াছেন, কেমন করিয়া হাসিতে হয়। অথচ এই নির্ম্মল হাসি স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ অনুকূল। Pickwickএর কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পড়িলেই আমাদের দেহের সকল অবসাদ দূর হইয়া যায়, চিত্ত প্রফুল্ল হয় এবং সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন আনন্দের একটা স্রোত বহিতে থাকে।"

ডিকেন্সের হাস্যরাশি অন্ধকারেও মলিন হয় না। Sam Weller, Mrs. Jingle, Winkle, Dick Swiveller, Mrs. Micawber, Mrs. Jellyby, Newman Noggs, Barkis, Tom Pinch, Miss La Creevy প্রভৃতি শত শত হাস্যোদ্দীপক চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া বড় বড় সমালোচকেরা একযোগে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে এরূপ রঙ্গরসের সৃষ্টি পূর্ব্বে কোন লেখকই করিতে পারেন নাই, এবং এরূপ চির নূতন চির বিচিত্র অতুলনীয় চরিত্রসৃষ্টি ভবিষ্যতেও আর কোন লেখকের দ্বারা সম্ভবপর হইবে কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল। ডিকেন্স যেমন তাঁহার মানরজ্জুর দ্বারা অশ্রু সাগরের গভীরতা নির্ণয় করিয়াছেন, তেমনি তিনি বোধ হয় হাসির ভাণ্ডারও লুট করিয়া রত্নরাজি সব হরণ করিয়া আনিয়াছেন!

বিষাদ ও অবসাদগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ডিকেন্সের উপন্যাস-পাঠই সর্ব্বাপেক্ষা বলকারক পথ্য। দেশবাসীর দুর্ব্বলতা, তাহাদের খামখেয়াল ও পাগলামীও তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তাই অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি সহকারে সেই সব নিজপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাস্যোদ্দীপক চরিত্রগুলি বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য। Betsey Prig, Sairey Gamp, Mrs. Harris এবং Mark Tapley প্রভৃতি চরিত্রগুলি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে যে সব দৃশ্যের অবতারণা করিয়া তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন,—যেমন Pickwick ক্লাবের কার্য্যবিবরণ, অদৃষ্টের সহিত Dick Swivellerএর কথোপকথন, বালক Copperfieldএর লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় পথে হোটেলে খানসামার ব্যবহার,—Codlin এবং Shortএর রসিকতা, Sam Wellerএর বিবাহ সম্বন্ধে পিতার সহিত কথাবার্ত্তা প্রভৃতির ন্যায় আনন্দের এমন ভূরিভোজ ইংরাজী সাহিত্যে বড় বিরল।

ইংরাজীতে একটি উক্তি আছে,—The poet is an everlasting child; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দর্শনমাত্রেই কবির চিরস্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে তাহা প্রতিফলিত হইয়া যায়; বাহিরের ভাব ও ধারণা সংগ্রহ করিতে কবিহৃদয় সর্ব্বদাই উন্মুখ, তাহার বিস্ময়ানুভূতির কখনও হ্রাস হয় না। এ বিষয়ে ডিকেন্সও একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের অনেক অংশই অনায়াসে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিতায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। তিনি একজন বিস্ময়প্রবণ স্বপ্নাবিষ্ট বালক,—তাঁহারই সৃষ্ট Paul Dombey, David Copperfield, Pip, Oliver Twist কিংবা Joeর ন্যায়ই বালক ছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি নিজে যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, কিংবা কাযের (Blacking business) প্রতি তিনি মনে মনে যে ঘৃণা পোষণ করিয়াছিলেন, সে দুঃখকষ্ট ভোগ তাঁহার জীবনকে কিছুতেই বিষাদময় ও নিরানন্দ করিতে পারে নাই। পরজীবনে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইলেও কষ্ট ও অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তিনি পূর্ব্বের সে স্মৃতি কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নিঃসহায়

বালকের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে তাঁহাকে কখনও পশ্চাৎপদ দেখা যাইত না। এই "child-like vision" ডিকেন্সের উপন্যাস পাঠের সময় আমাদের মুগ্ধ করে। গল্পগুলিকে তিনি নিজের পূর্ব্বজীবনের দুঃখের স্মৃতিতে যেন সিক্ত করিয়াই বালক Paul Dombey, নিরাশ্রয় Joe, নিঃসহায় Oliver Twist এবং খঞ্জ Timএর অপূর্ব্ব করুণাত্মক চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন।

করুণ রসোদ্রেকে ও সরলতার চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ডিকেন্স তাঁহার উপন্যাসে শোকের আতিশয্যও যথেষ্ট বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেখানে পাপ ও অনুশোচনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিংবা নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার 'tragic' শক্তি আমাদের সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে। লেখনীর প্রভাবে তিনি আমাদের হাসাইতে কাঁদাইতে বা ভয়ে থর থর কাঁপাইতে পারেন। Fagin, Shylockএর ন্যায়ই জীবন্ত এবং নিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নীচমনা Bill Sikes এবং নির্ম্মম ঘৃণাস্পদ Quilpএর নারকীয় চিত্রদ্বয়ও ভীষণদর্শন!

তাঁহার গল্পে অনাবিল হাস্যরাশি ও গভীর দুঃখযন্ত্রণা একত্র পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছে। যে অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে মানুষের আত্মা ডুব দিতে পারে, তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। এ বিষয়ে ইংরেজ নাট্যকার Websterএর সহিতই তাঁহার তুলনা হয়। নীচ পশুজনোচিত ভয় ও আতঙ্কের দৃশ্য বর্ণনায়, করুণরসের চিত্রাঙ্কনের মতই তিনি সমনিপুণ ছিলেন। যখন তিনি দুর্ব্বৃত্তদের লোমহর্ষণকারী অমানুষিক অত্যাচার ও নির্দ্দয় আচরণ সম্বন্ধে লেখনী চালনা করেন, তখন তিনি যে একজন ভাবপ্রধান রসিক লেখক তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই, তিনি তখন "tragic Titan"এর মূর্ত্তিই ধারণ করেন।

Sikesএর দ্বারা Nancyর খুনের গল্প, পাপসাধনের পর তাহার সঙ্গীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে পরিত্যাগ, Sikesএর মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ, তাহার মৃত্যু, কারাবাসে Faginএর ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ, টেমস নদীতে Quilpএর পদস্খলন এবং পরে কর্দ্দমাক্ত আগাছার ন্যায় তীরে ক্ষেপণ, অন্ধকারে ডিজঁন হইতে James Carkerএর পলায়নের মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য, উত্তালতরঙ্গময় ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্ভে James Steerforth, এবং অন্যায়কারীকেও বাঁচাইতে চেষ্টা-পরায়ণ বিশ্বাসী Ham, দুইজনেরই সমাধিপ্রাপ্তি প্রভৃতির দৃশ্য হইতে আমরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, দুঃখকষ্টের বর্ণনায় ডিকেন্সের শক্তি কতদূর বলবতী ছিল।

ডিকেন্সের রচনার বিরুদ্ধে এক প্রধান অভিযোগ এই যে, তাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকদের বড় বেশী অশ্রুপাত করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত Andrew Lang আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছেন যে, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মৃত্যু-দৃশ্যের সংখ্যা বড় বেশী। ডিকেন্স অবশ্য শুভদর্শী—বিশ্বসংসারের সমস্তই উৎকৃষ্ট ও হিতকর এই মতবাদী ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার উপন্যাসের উপসংহারে আমরা ব্যবহারসিদ্ধ মিলনের ছবিই দেখিতে পাই। তথাপি তাঁহার রচিত অনেক চরিত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই যে, আমরা তাঁহার উর্ব্বরা কল্পনাশক্তি ও অদ্ভুত সৃষ্টিকরী ক্ষমতার কথা ভুলিয়া গিয়া এই অভিযোগ করি। তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসে তিনি যে অসংখ্য নূতন চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাদের সকলেই অবশ্য গল্পের শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার চরিত্র সৃজনের এই অসীম ক্ষমতার কথা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

David Copperfield উপন্যাস বিমল দাম্পত্য-প্রেমের চিত্রে পরিপূর্ণ। Martin Chuzzlewit, Our Mutual Friend এবং Great Expectations প্রভৃতি উপন্যাসেও প্রেম-কাহিনী উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের ব্যাপারকে ডিকেন্স কখনও এক গভীর রহস্য বলিয়া ভাবেন নাই। এই জিনিষটাকে

অপরাপর পার্থিব জিনিষের ন্যায়ই স্বাভাবিক ও সরল ভাবেই তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। একমাত্র Hard Times উপন্যাসে ব্যতীত ইহাকে তিনি কখনও কঠিন সমস্যার ন্যায় আলোচনা করেন নাই। A Tale of Two Cities নামক উপন্যাসে Sydney Carton-এর চরিত্রে প্রেমের স্বার্থত্যাগের তিনি যে উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার তুল্য চিত্র কেবল ইংরাজী সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও বড় দুর্লভ।

Pickwick, Stiggins এবং Cnadland প্রভৃতি চরিত্র চিত্রণে, ভণ্ডামীরূপ পাপের তিনি যে তীব্র সমালোচনা ও তাহার প্রতি যথাযোগ্য ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা হইতেই অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে ডিকেন্স বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরও বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভুল ধারণা। পক্ষান্তরে যীশু-খৃষ্টের জীবনে ও চরিত্রে যে ধর্ম্ম প্রকট হইয়াছিল, সে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পদদলিত দুঃখ-জীর্ণ নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করিয়া রচিত তাঁহার প্রত্যেক আবেদনের মধ্যেই এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতর আমরা ধর্ম্মের মূল পদার্থ লক্ষ্য করি। Thackeray কিংবা Scott-এর লেখাতেও আমরা এতটা দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রতিভা স্পষ্টই খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক, সুতরাং মৃদু, কোমল এবং ক্ষমাশীল।

মুমূর্ষু কয়েদীর মুখ দিয়া তিনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করাইয়াছেন, তদপেক্ষা তীব্র অথচ করুণ উক্তি আর কি হইতে পারে? সে খাবি খাইতে খাইতে বলিতেছে—

"I hope my merciful Judge will bear in mind my heavy punishment on earth. Twenty years, my friend—twenty years in this hideous grave! My heart broke when my child died, and I could not even kiss him in his little coffin. My loneliness since in all this noise and riot has been dreadful. May God, forgive me. He has seen my solitary, lingering death." পুনশ্চ খ্রীষ্টমাস পর্ব্ব সম্বন্ধে একস্থলে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"In every cheerful image and suggestion that the season brings, may the bright star that rested above the poor roof be the star of all the Christian World."

মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে পুত্রকে তিনি পত্র লিখিতেছেন—"Try to do to others as you would have them do to you, and do not be discouraged if they should fail sometimes. It is much better for you that they should fail in obeying the greatest rule laid down by our Saviour than that you should. * * * I put a New Testament among your books, because it is the book that ever was or ever will be known in the world, and because it preaches you the best lessons by which any human creature who tries to be truthful and faithful to duty can be guided."

Mrs. Clennam যখন দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণার সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত, ডিকেন্স তখন Little Dorrit-এর মুখ দিয়া তাহাকে এই সুন্দর নীতি উপদেশ শুনাইতেছেন—"Be guided only by the healer of the sick, the raiser of the dead, the friend of all who were afflicted and forlorn, the patient Master who shed tears of compassion for our infirmities. We cannot but be right if we put all the rest away and do everything in remembrance of Him. There is no vengeance

and no infliction of suffering in His life, I am sure. There can be no confusion in following Him and seeking for no other footsteps, I am certain !"

বর্ত্তমানে ডিকেন্‌সের লক্ষ লক্ষ পাঠকের সংখ্যা দেখিয়া আমরা স্থির বলিতে পারি যে, তাঁহার লেখা কখনও পুরাতন হইবে না, ভবিষ্যৎ পাঠক সম্প্রদায়ও আমাদের মতই তাঁহার পুস্তকের আদর করিবে। সেক্ষপীয়রের ন্যায়, তিনিও নিজের পরিমাণানুযায়ী একটা অমরতা লাভ করিয়াছেন। Dombey and Son, Bleak House এবং David Copperfield-এর ন্যায় প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি তাঁহার স্মৃতিকে চিরদিন উজ্জ্বল রাখিবে। লেখনী সঞ্চালনের দ্বারা তিনি সমাজের অনেক দোষ সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, দেশের ও দেশবাসীর প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার লেখার স্থানে স্থানে অত্যুক্তি বা শ্লেষাধিক্য লক্ষ্য করিয়া কোন-কোনও পাঠকের মনে অসন্তোষের উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্বীকার করিলেও তাঁহার অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি, উজ্জ্বল প্রতিভা, বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব, মানবের দুঃখে তাঁহার দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ চিরদিনই তাঁহাকে সাহিত্যে স্থায়ী উচ্চাসন দান করিবে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, রসিকতা, কল্পনা, করুণরস ও উপচিকীর্ষার সাহায্যে জনসাধারণের মঙ্গল বিধানার্থ তিনি যে সব হাসি ও অশ্রুর চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহার যশ ইংরেজ সমাজে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তিদের সুখ দুঃখের কাহিনী যাহা তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহাদেরই অন্তঃকরণে বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও সজোরে আঘাত করিবে।

লোকে তাঁহার লেখা ভুলিলে ইংরাজী সাহিত্য ও সমাজের যে কতদূর ক্ষতি হইবে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। অনেক শোকতাপক্লিষ্ট জীবন, দুঃখে শান্তি ও শোকে সান্ত্বনা লাভের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে; কত হতভাগ্য বালক নিজেদের অদৃষ্ট আরও কঠিন ও নৈরাশ্য পীড়িত বলিয়া অনুভব করিবে! এই উজ্জ্বল বিশ্বজনীন হিতসাধন প্রবৃত্তির আলোকেই তাঁহার প্রতিভা উদ্ভাসিত। তাঁহার অন্তঃকরণ বড় উচ্চ ও উদার ছিল। মানুষকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, বিশেষতঃ তাহাদের দুঃখ কষ্টের সময় তাঁহার ভালবাসার মাত্রা আরও বাড়িত। তিনি আমাদের বিশ্বপ্রেমের যে উদারতা শিক্ষা দিয়াগিয়াছেন, তাহা Schillerএর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

Have love : not love alone for one,
But man as man thy brother call,
And scatter like the circling sun
Thy charities on all.

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পূজার গল্প

(গল্প)

আশা নিরাশায় শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ে পূজার ছুটিতে দেশে যাইবার ইচ্ছা মার নিকট প্রকাশ করিলাম। মা তাঁহার ঊনবিংশতিবর্ষীয় 'বড় খোকা'র মুখে এই অসম্ভাবিত অদ্ভুত কথা শুনিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। মাতৃস্নেহাঞ্চল ব্যতীত বা বধূর প্রেমাঞ্চল ছাড়া তাঁহার আদরের নন্দদুলাল যে আর কোথায়ও যাইতে চাহিবে, এটা মার ধারণার বহির্ভূত ছিল। বধূর প্রেমাঞ্চল যখন সুদূর-পরাহত—তখন মায়ের

সুনিশ্চিন্ত, সুনিরাপদ বক্ষোনীড়ই তাঁহার স্নেহের শাবকের একমাত্র উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনেই ছিলেন।

মা আমার সহরের মেয়ে। বাল্যকাল হইতে সহরেই প্রতিপালিতা। কলনাদিনী বিশালকায়া পদ্মা-নদীর পরপারে পাবনা জেলার অন্তর্গত আমাদের সেই ছায়াসুনিবিড় আম্রকাননে বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটি তিনি বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। কয়েকটি মাটীর কুটীর ঘেরা তৃণদলে সমাচ্ছন্ন বর্ষাসিক্ত অঙ্গনটি তাঁহার চিদা-কাশে সমুজ্জ্বল চন্দ্রমার ন্যায় প্রতিভাত না হইয়া, তৎ-পরিবর্ত্তে ভীতি ও আশঙ্কাপূর্ণ বলিয়াই মনে হইত। কোন্ মধুময় যৌবন-প্রারম্ভে স্বদেশ হইতে স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমার পিতা জীবন-সংগ্রামের জন্য বিদেশে আসিয়াছিলেন। সহরের জলবায়ুর গুণেই হউক, অথবা পল্লীর প্রতি মার বিতৃষ্ণার জন্যই হউক, বাবা আমার পুরামাত্রাতেই প্রবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তাই অবকাশের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেও দেশে যাইতেন না। দেশের সহিত সমস্ত সম্বন্ধই ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার কাকা ও কাকী-মাই দেশের বাড়ীতে বাস করিয়া পৈত্রিক ক্রিয়াকর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিলেন। বাল্যে পিতামাতার সহিত আমি একবার দেশে গিয়াই পল্লীর শান্তশীতল তরু-পল্লব-মর্ম্মরিত পিককূজন-মুখরিত অনির্ব্বচনীয় শোভা-সম্ভার দেখিয়া দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। একটি সহরবাসী বালকের সুকুমার চিত্ত কেমন করিয়া পল্লীর নিকটে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল তাহা কে বলিবে?

এবার পূজার ছুটিতে বাবা মা যখন দিল্লী-ভ্রমণের মানস করিয়া দিল্লী প্রবাসী জনৈক বন্ধুর দ্বারা গঙ্কানালায় বাসা স্থির করিয়া যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাদের আদরের ঢেঁকি বলিয়া বসিল কি না—সে অজ পাড়াগাঁয়ে জল কাদা ভরা দেশে যাইবে। আমার প্রস্তাব শুনিয়া মা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন, "ও সাধ ত্যাগ কর্ অরুণ—ম্যালেরিয়া কলেরার ডিপো, বন জঙ্গলে ভরা, সাপ জোঁকের রাজ্যে আমার প্রাণ গেলেও তোকে পাঠাতে পারব না।"

আমাকে নীরব দেখিয়া মা ভাবিলেন, তাঁহার উপযুক্ত বীরপুত্র বুঝি সেই কল্পিত সাপ জোঁক ও বন জঙ্গলের কথা শুনিয়া রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। মার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ প্রফুল্লতা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না। আমার আবেদন, নিবেদন ও অশ্রুজলের নিকট মা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিয়া, মাত্র দশ দিনের জন্য আমাকে দেশে যাইতে অনুমতি দিলেন। যে ক্ষেত্রে মায়ের সম্মতি মিলিয়া গেল, সেখানে পিতার অসম্মতির কোনই কারণ ঘটিল না। দেবীপক্ষের মধ্যে গমন, কাযেই পঞ্জিকা খুলিয়া শুভ দিনক্ষণ নির্ণয় করিতে হইল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে বোঁচকা-বাধিয়া, বাক্স সাজাইয়া পিতা মাতার পদধূলি মাথায় লইয়া দেশে রওনা হইলাম। যাত্রাকালে মা প্রতিদিন পত্র লিখিতে বলিয়া দিলেন। বাবা গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন, আমি যেন আমার খুড়তুত ভাই স্বরূপের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করি।

২

একটি দিন ও একটি রাত্রি রেল ষ্টীমারের সাদর আলিঙ্গনের মধ্যে কাটাইয়া, পঞ্চমীর দিন প্রভাতে দেশে পঁহুছিলাম। পল্লীর অর্দ্ধবিস্মৃত অস্পষ্ট একটি চিত্র যে আমার হৃদয়ের নিভৃতে অঙ্কিত ছিল, আজ চাহিয়া দেখিলাম এ সৌন্দর্য্য-পারাবারের মধ্যে সে চিত্র, সে স্মৃতি নিতান্তই ক্ষীণ। তখনও ধরাদেহ হইতে বর্ষারাণী শেষ বিদায় লন নাই। গ্রামের নিচে খালে বিলে রাশি রাশি কুমুদ কহ্লার বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। স্রোতস্বিনী নদীটি তখনও পূর্ণযৌবন-বেগে কুলুকুলু গানে তটভূমি মুখরিত করিয়া কোন্ অনির্দ্দে-শের উদ্দেশে আপনার মনে ছুটিয়া যাইতেছে। নদীর পরপারে ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, স্বচ্ছ জলে তাহার প্রতিচ্ছায়া সমীরণে আন্দোলিত হইতেছে। মাঠে মাঠে হরিৎ-

বর্ণের শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া শেফালীগন্ধামোদিত প্রভাত পবন সকৌতুকে বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপরে অসীম উদার শরতের উন্মুক্ত নীলাকাশ রৌদ্র-কিরণে কখনও হাসিতেছে, পরক্ষণে সুনিবিড় মেঘের ছায়ায় ম্লান শোভা ধারণ করিতেছে।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে নয়নপথে পতিত হইল—চণ্ডীমণ্ডপ। অন্দর ও বাহিরের মাঝামাঝি স্থানে মণ্ডপ ঘর। কুমারেরা নিবিষ্ট মনে মৃন্ময়ী প্রতিমার অঙ্গ চিত্র করিতেছিল। তখন 'চিত্তির' প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, শুধু, চক্ষুদান বাকী। পাড়ার এক-পাল বালক বালিকা মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া মহা-জটলা করিতেছিল; আমাকে দেখিয়া তাহারা ভ্রূক্ষেপও করিল না। নূতন নূতন গবেষণা ও তথ্য আবিষ্কার জন্য তাহারা এতই সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল যে সদ্য প্রত্যাগত আগন্তুকের দিকে তাহাদের চাহিবারও অবকাশ ছিল না। আমি তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম, একটি বালক অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "আগে সরস্বতীর চক্ষুদান হবে ভাই, উনি হচ্ছেন বিদ্যার দেবতা কি না।" অপর বালক বিজ্ঞভাবে মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিল, "দূর বোকা, তা কেন? আগে হবে গণেশের চক্ষুদান, গণেশ যে সিদ্ধিদাতা।" এই দুইটি বালককে বিদ্রূপ করিয়া একটি ক্ষীণকায়া ক্ষুদ্র বালিকা বলিয়া উঠিল, "তোরা জানিস নে—আগে ভগবতীর চক্ষু দান হবে, ভগবতী যে সকলের মা।"

সরলা বালিকার এই ক্ষুদ্র "সকলের মা" কথাটি আমার প্রাণে যেন সুধা বর্ষণ করিল। আমি অন্দরে ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"কাকীমা।" আমার আহ্বানে কাকীমা গৃহের বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। ঘর হইতে একখানি মাদুর আনিয়া বারান্দার উপরে আমাকে বসিতে দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "কাকা কাকীমাকে মনে করে যে এসেছিস বাবা, এতে বড় সুখী হলাম। তোর বাবা মা ত পুজোয় তিনটে দিনও বাড়ীতে পায় ধুলো দেন না। তুই তবু এবার বাড়ীর পুজো দেখতে এসেছিস!"

কাকীমার কথায় বাবা ও মার ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইলাম। কাকীমা আমার নিকটে উপবেশন করিয়া আমার বাবা মা ভাই বোনদের কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরম স্নেহশীলা মাতৃরূপিণী কাকীমার স্নেহবিগলিত কথা-গুলি শুনিয়া আমার মন পরিতৃপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিনবার কাকীমাকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আজিকার মতন এমন করিয়া নহে। আজ এই চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরিহিতা শঙ্খ-সিন্দুর-ভূষিতা প্রফুল্ল বদনা কাকীমাকে আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমি বলিলাম, "স্বরূপদা কোথায়, কাকা কোথায়?"

কাকীমা বলিলেন, "তোমার কাকা জমীদার বাড়ী গেছেন। দুপুর বেলা আধ ঘণ্টার জন্যে স্নানাহারের ছুটি পাবেন। আর সেই রাত বারোটায় ঘুমোবার ছুটি।"

আমি জানিতাম, কাকা মহাশয় পনের টাকা বেতনে স্থানীয় জমিদার বাড়ী চাকরী করেন। পনের টাকার এত প্রতাপ শুনিয়া কিছু বিস্ময় বোধ হইল। আমাদের কলিকাতার বাসায় পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনাই পনের টাকা। বিদ্যুৎ বাতি, বিদ্যুৎ পাখা ও গাড়ী ঘোড়ার খরচে মাসে মাসে বাবার কত টাকা খরচ হইয়া যায়। আর এখানে আমার নিজের কাকা—বাবার সহোদর ভাই—পনের টাকার জন্য দাসত্ব পণে আবদ্ধ, সত্যই কি ইহা বিস্ময়াবহ নহে? আমি কাকীমাকে পুনরায় স্বরূপদার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। হঠাৎ কাকীমার হাস্যদীপ্ত মুখখানি ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল। তিনি ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলিলেন, "সে কোথায় যেন গিয়েছে, তার কথা তোমায় কি বলব বাবা।"

এমন সময় শুনিতে পাইলাম রাস্তা দিয়া কে যেন—

"হিয়ার পাশেতে অধীর পিয়াসা
পুষে রেখ সখা, এসো না,
তুমি দূরে থাক কাছে এসো না।"

গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। গানের স্বরে কাকীমা উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, স্বরূপদা বাড়ী ঢুকিল। মা বাড়ীতে, অথচ ছেলে এমন গান গাহিতে গাহিতে আসিল, এটা যেন আমার নিকটে বড়ই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। স্বরূপদা আমাকে দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। হাস্যবিকশিত মুখে বলিলেন, "কিরে অরুণ, কখন এলি? এবার খুব মজা হবে। আমরা বিজয়ার দিন নপাড়ার বাবুদের বাড়ী থিয়েটার করব, তোকে একটা সখীর পাঠ নিতে হবে, তোর গলা শুনলে বাবুরা অমত করবে না।"

আমি সখীর পাঠ লইবার জন্য ব্যস্ততা না দেখাইয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বরূপদাকে দেখিতে লাগিলাম। আমা অপেক্ষা স্বরূপদা মাত্র এক বৎসরের বড়, কিন্তু তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু ও শুষ্ক মুখ, শরীরের শীর্ণতা দেখিয়া তাহাকে ত্রিংশ বর্ষীয় যুবক বলিয়া অনুমান হয়। গত এক বৎসর স্বরূপদার সহিত আমার দেখা হয় নাই; এই এক বৎসরেই তাহার এত পরিবর্ত্তন। আমাকে নীরব দেখিয়া আমার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া স্বরূপদা বলিল, "চুপচাপ যে বসে রইলি অরুণ, একটু সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে চল্, একবার বাবুদের সঙ্গে দেখা করে সখীর পাঠটা ঠিক করে ফেলা যাক। এই ক'দিনেই আবার গানটানগুলো মুখস্ত করতে হবে।"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কাকীমা দুয়ারের সম্মুখ হইতে বলিলেন, "অরুণকে আর ভালবেসে ওপথে টেনে নিয়ে যেতে হবে না স্বরূপ! ওর মার বুকে এ আগুন জ্বালাবার আর দরকার নেই।"

আমি কাকীমার এ কথার ভাবার্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তখন জানিতাম না; কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার এ প্রচ্ছন্ন মর্ম্মব্যথা আমার নয়ন সম্মুখেই উন্মীলিত হইবে।

৩

জুতা জামা ছাড়িয়া বিশ্রামান্তে স্বরূপদার দৃষ্টান্তে এক বাটী সরিষার তৈলে আপাদমস্তক লিপ্ত করিয়া স্নানে চলিলাম।

স্বচ্ছ শীতল জলে নদীর তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম—কাকা জমিদার ভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার দেহ মনের উপর দিয়া হর্ষের প্লাবন ছুটিল। তিনি শীর্ণ হাতখানা বাড়াইয়া আমাকে তাঁহার স্নেহভরা বক্ষে টানিয়া লইলেন। আমাকে স্পর্শ করিয়া, আদর করিয়া, ভালবাসিয়া কিছুতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। আমি যেন তাঁহার কত দিনের কত জন্মের হারাধন, আজ ফিরিয়া আসিয়াছি।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কাকা দুইটি পাণের খিলি মুখে পুরিয়া সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে মনিব বাড়ীর অভিমুখে রওনা হইলেন। আর স্বরূপদা আমাকে সখী সাজাইবার পরামর্শের জন্যই হউক, অথবা আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হউক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নপাড়ার বাবুদের বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিল। কাকীমা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দক্ষিণের ঘরে বিছানা পাতা আছে, সেইখানে শুয়ে একটু ঘুমোগে বাবা, সমস্ত রাত জেগে এসেছিস।"

আমি কাকীমার নির্দ্দেশ মত বাড়ীর সব চাইতে বড় এবং ভাল ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এই ঘরখানিই পূজার ভাঁড়ার হইয়াছে। চাল, ডাল, নুণ, তেল, তরি-তরকারীতে ঘরখানি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গৃহকোণে একখানি তক্তপোষের উপর একটি পরিষ্কার বিছানা পাতা রহিয়াছে, তাহারই সন্নিকটে একটি আলনার কয়েকখানি ছিন্নবস্ত্র বাতাসে উড়িয়া স্থানচ্যুত হইয়া গৃহস্বামীর দরিদ্রতা প্রকাশ করিতেছে। আমি বিছানার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বদিন রাত্রিজাগরণের জন্য ঘুমটা একটু গভীরই হইয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন আর সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। রজনীর ম্লান ছায়া ঘন পল্লবিত তরুশ্রেণীর উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছে। দুই একটি

উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রশান্ত স্মিত হাস্যে নির্ম্মল গগনপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া শুক্লপক্ষের পর্য্যাপ্ত জ্যোৎস্না শাখাপত্রবহুল বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া নিম্নের শ্যামল তৃণদলে লুটাইয়া পড়িল। মর্ম্মরিত পল্লবের দীর্ঘশ্বাসের সহিত শেফালীর সুনিবিড় সৌরভ চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিল। আমি কাকীমার রন্ধনশালা অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

৩

গভীর রাত্রে কি একটি শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয়নকালে আমি ও স্বরূপদা এক গৃহেই শয়ন করিয়াছিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, স্বরূপদার শয্যা শূন্য ও গৃহদ্বার উন্মুক্ত। বাহিরেও যেন কাহারা চাপা গলায় কথা কহিতেছে। কৌতূহলের বশে মুক্ত গবাক্ষের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া বিস্মিত হইলাম। অঙ্গনের মধ্যে স্বরূপদার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া একটি যুবক কাকীমার সহিত অনুচ্চ কণ্ঠে কথা কহিতেছে। যুবকের কথা ভালরূপ বোঝা গেল না। কাকীমা বলিলেন, "তোমাদের ঋণ আমি জীবনেও পরিশোধ করতে পারব না নিমু ঠাকুরপো। এর পর স্বরূপ যদি তোমাদের উঠানে পা দেয় তা'হলে ওর রক্তে তোমাদের উঠান ভিজিয়ে দিও, এই আমার অনুরোধ। আজ যে খবর তুমি নিয়ে এসেছ, এর বদলে স্বরূপের মৃত্যু খবর পেলেও আমার এত দুঃখ হত না। ওঁর কাণে এ খবরটা যেন না যায় ঠাকুরপো।"

যুবক আশ্বাসের স্বরে বলিল, "না বৌঠান, দাদাকে জানাব না। একে তাঁর নানা দুঃখ, অভাব, তার পর দেনা করে' পৈত্রিক ক্রিয়া রক্ষা, এই সব জ্বালাতেই অস্থির। উপযুক্ত ছেলের এই অধঃপতন তিনি কেমন করে সইবেন।"

যুবকের এই সহানুভূতি সমবেদনার কথায় কাকীমার হৃদয় যেন আর্দ্র হইয়া নয়নে জল আসিল। তিনি দুস্বরে উত্তর করিলেন, "তোমরা যতটা বোঝ ঠাকুরপো, ছেলে হয়ে তার শতাংশের একাংশও বোঝে না। ও মানুষ হলে আমাদের দুঃখ কি ছিল। রাত হয়ে গেছে, বাড়ী গিয়ে শোওগে ঠাকুরপো।"

যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে স্বরূপদার হাত ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। কাকীমাও শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

আমি শয্যার উপর বসিয়া এই রহস্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাকে অধিক ক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। রহস্যকারী নিজেই রহস্যভেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। স্বরূপদা গৃহে ঢুকিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "কিরে অরুণ, জেগে বসে আছিস যে? আমি ত সাতকাণ্ড রামায়ণ সেরে এলাম।"

আমি বলিলাম, "কি রামায়ণ স্বরূপদা? আমায় বল না।"

একটু চিন্তার পর স্বরূপদা বলিল, "তোকে আর গোপন করে কি হবে অরুণ, তুইত আমার রামায়ণের ভাই লক্ষ্মণ। বেশী কিছু করিনি ভাই, ওই ঘোষালদের আইবুড়ো ধাড়ী মেয়েটার সঙ্গে একটু লভ করতে গিয়েছিলাম। তা গোড়াতেই গলদ, আমার সাড়া পেয়েই মেয়েটা ভাইকে গিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে, তার পর যা ফল সে ত দেখতেই পেলি।"

লজ্জায় ঘৃণায় আমার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। এই তরুণ যৌবনে পবিত্র সুকোমল মনোবৃত্তিগুলিকে মানুষ এমন নরকের নিম্নস্তরেও সাধ করিয়া লইয়া যায়! আমি বলিলাম, "কাকীমার কাছে বলে' সেই মেয়েটিকে তুমি বিয়ে কল্লেই পার। মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাওগে, মা সন্তুষ্ট হয়েই তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন।"

"সে আশায় ছাই রে, সে আশায় ছাই। নিমু ঘোষালের বোন আমায় বড় ঘেন্নার চোখে দেখে—সেইটে জানতে পেরেই—আমি তার প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিলাম। পূজো উপলক্ষে তার মায়েরা সকলে কুটুম বাড়ী গেছে, কিন্তু হতভাগী ছুঁড়ি সব নষ্ট করে দিলে। আর মার কাছে ক্ষমা চাইতে বলছিস—আমি তাঁর কাছে কোন দোষ করিনি। মার ঐ দোষ—সব কথাতেই আছেন। তা থাকুন, যাকে আমি আমার

ভোন্‌টকেয়ার করি। কুড়ি বছর আমার বয়স হল, এখন আমি ছেলেমানুষ নই।"

মনে মনে বলিলাম, "ঠিক কথা, তুমি ছেলে বটে কিন্তু মানুষ নও। যে মা দশমাস দশদিন জঠরে তোমাকে ধারণ করেছিলেন, নিজের বুকের রক্ত জল ক'রে তোমাকে প্রতিপালন করেছিলেন, সেই মাতৃ-স্নেহের এই প্রতিদান, দে'য়াই তোমার মত পুত্রের উপযুক্ত কায।" অধঃপতিতের সহিত অযথা কথা কাটা-কাটি না করিয়া, নীরবে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

৪

একটি অজানা আনন্দের উদ্বেগে ষষ্ঠীর রজনী গত হইয়া, সপ্তমীর হাস্যময় উৎসবময় মধুময় প্রভাত বিশ্বের হৃদয়দ্বারে সমাগত হইল। পাড়ায় পাড়ায় নানা সুরে নানা রাগিণীতে বাদ্য বাজিতে লাগিল। সানাই গান ধরিল—

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ওই এল পাষাণী তোর ঈশানী।"

ভোর হইতেই পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া কেহ ফুল তুলিতে লাগিল, কেহ বেলপাতা বাছিতে বসিল, কেহ বা কাঁসর ঘণ্টা বাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হর্ষের দীপ্তি যেন তাহাদের মুখ চোখ হইতে উছলিয়া পড়িতেছিল। মণ্ডপের মধ্যে মা, ঠাকুরমা, পিসিমা প্রভৃতির সহিত বালিকার দলও সমাগত হইল। কেহ ঠাকুরমার সহিত বৃহৎ পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে লাগিল। কেহ বা মায়ের হাত হইতে নৈবেদ্যের কলা কাড়িয়া লইয়া বঁটিতে কাটিতে বসিল। কোন শান্তস্বভাবা বালিকা এক পার্শ্বে ব'সিয়া নিবিষ্ট মনে দুর্ব্বা বাছিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র বালক বারকোসের উপরিস্থিত নারিকেলের মঠ ও তিলের নাড়ুর প্রতি বার কয়েক লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কার্য্যে রতা মাতার কর্ণমূলে কি যেন একটি গোপন কথা বলিয়া ফেলিল, মাতা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জিব কাটিয়া অনুচ্চস্বরে কি যেন বলিলেন। বালক একবার মৃন্ময়ী প্রতিমার দিকে ও মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। আমি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, আজ যেন কেহ পর নয়। সকলেই আপনার জন, আপনাদের বাড়ী ঘরের মতই বিনা আহ্বানে বিনা প্রশ্নে উৎসাহের সহিত কায করিয়া যাইতেছে। আজ ভোগের ঘরেও বিরাট আয়োজন! কোমরে আঁচল জড়াইয়া পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত কাকীমা ভোগ রাঁধিতেছেন। সেখানেও পাড়ার মেয়েরা সমবেত হইয়া কেহ জল তুলিতেছে, কেহ চাল ধুইতেছে, কেহ বা কুটনো কুটিতেছে। সকলেই প্রফুল্ল বদনে পরস্পরের সহিত হাস্যালাপের মধ্যেও নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কাযগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করিতেছিল। চারিদিকে ব্যস্ততা ও কোলাহল যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে শরতের হাস্যময় উজ্জ্বল রৌদ্রে অঙ্গন ভরিয়া গেল। পুরোহিত আসিয়া ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার উচ্চ নিনাদের মধ্যে পূজায় বসিলেন। পূজান্তে বলির সময় উপস্থিত হইল। দলে দলে ইতর ভদ্র, বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ বলি দেখিতে আসিল। বৃহৎ অঙ্গনটি জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জনকোলাহলের মধ্যে ঢাক ঢোলের উচ্চ রোলে দুইটি নিরীহ ছাগশিশু ধরাবক্ষ হইতে শেষ বিদায় লইল।

মধ্যাহ্নে মহাসমারোহের সহিত মায়ের ভোগ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাধা হইয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত ধনী দরিদ্র পরিতৃপ্তির সহিত মায়ের প্রসাদ পাইল। আজ অবারিত দ্বার—কাহারও প্রবেশ নিষেধ নাই—আজ যে বিশ্বজননী ভাণ্ডার খুলিয়া দীন দরিদ্র অন্নহীনকে আহ্বান করিতেছেন!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরতি দেখিবার জন্য আবার লোকজনে অঙ্গন ভরিয়া উঠিল। পাড়ার মেয়েরা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আরতি দেখিতে আসিল। খুড়া জেঠার হাত ধরিয়া বালক বালিকাগণ আরতি দেখিতে আসিয়া মহা জটলা করিতে লাগিল। বাটীর

বড় বড় ধুন চতে আগুন করিয়া ধূপ ও গুগ্গুল্ নিক্ষেপ করা হইল। ধূপের সৌরভের সহিত পুষ্পসৌরভ মিশ্রিত হইয়া সে স্থানটি মধুরতর করিয়া তুলিল। আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের মত সন্ধ্যাতেও সানাই গান ধরিল—

"এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না!

মায়ে ঝিয়ে কোরব ঝগড়া জামাই বলে মানব না।"

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত আরতি হইল। দর্শকবৃন্দ মায়ের প্রসাদী ফলমূলে জলযোগ করিয়া যে যাহার গৃহে ফিরিয়া গেল।

৫

তখনও সপ্তমীর চন্দ্র অস্তাচলে গমন করেন নাই। শুকতারা নির্নিমেষ নয়নে নিশাবসানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মানবের পাপ তাপ দুঃখ ব্যথা দেখিয়াই বুঝি দেববালিকারা শিশিরছলে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই শুভ্র স্বচ্ছ অশ্রুকণা নবীন তৃণদলে আচ্ছাদিত ধরা বক্ষে, বর্ষাস্নাত বৃক্ষপত্রে ঝরিয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে নীরবতার রাজ্য। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মৃদু সমীরণ সন্‌সন্ করিয়া যেন কহিতে লাগিল, "ওরে অবিশ্বাসী, ওরে ভ্রান্ত, চেয়ে দেখ্ মা এসেছে।" ফুলভারে অবনত শেফালী গাছও যেন শাখা দোলাইয়া পুলকোচ্ছ্বাসে কহিতেছিল—"এসেছে রে, মা এসেছে।" নীরব নিঝুম রজনী দিকে দিকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া যেন বলিতে লাগিল—"আমাদের মা এসেছে, জগতের মা এসেছে।"

অতর্কিতভাবে রজনীর শেষভাগে কাকীমার আহ্বানে চমকিয়া উঠিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কাকীমা দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া ম্লান মুখে তিনি কহিতে লাগিলেন, "বড় বিপদ অরুণ, রাত একটা থেকে স্বরূপের কলেরা হয়েছে। এই এতক্ষণে আমি জানতে পারলাম, সে কাউকে জানায় নি।" এই

কাকীমার ...ছিলে... ঈষৎ কাঁপিয়া গেল। আমি ...নি বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বরূপদার ঘরে ঢাকিয়া দেখিলাম, স্বরূপদা মুদ্রিত নয়নে বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে চোখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে, হাতে পায়ে খিল ধরিয়া আসিতেছে, সময় সময় গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। বুঝিলাম অবস্থা সুবিধাজনক নহে। আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া কাকীমা ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "গাঁয়ে ত ডাক্তার নেই অরুণ, এক ডাক্তার, তিনিও হাটুরিয়া জমিদার বাড়ী গেছেন, পাবনা গিয়ে ডাক্তার আনতে হবে।"

আমি বলিলাম, "রাস্তা চিনলে, পাবনা গিয়ে—

কাকীমা বাধা দিয়া বলিলেন, "তুই পারবি নে অরুণ, ঘোষালদের বাড়ীর নিমু ঠাকুরপোকে বল্‌গে—তার ঘোড়া আছে সে এক্ষুনি চলে যাক।"

আমি পল্লীবাসের প্রধান সুখের পরিচয় পাইয়া নীরস কণ্ঠে কহিলাম, "আমি ঘোষালদের বাড়ী যাচ্ছি। এখানে কাকাকে ডেকে দেব?"

"তাঁকে আর জাগিয়ে কায নেই অরুণ, উঠে শুধু ব্যস্ত হবেন বইত নয়। সমস্ত দিন রাতের ভিতরে এই একটু বিশ্রাম, আহা থাকুন।" বলিয়া কাকীমা স্বরূপদাকে ছোট ছেলের মত কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

বেলা প্রহরাধিকের সময় পাবনা হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বিজ্ঞ ডাক্তার আসিয়া, রোগীর অবস্থা দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গম্ভীরমুখে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখের কারণ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে মহাষ্টমীর পূজা ভোগ ইত্যাদি সমাধা হইল। বাড়ীতে পূজা, একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তথাপি আজিকার দিনেও কাকার ছুটি নাই। হায় রে পনের টাকা, তোমার এত প্রতাপ, এত প্রতিপত্তি! আজ স্বরূপদার রোগশয্যায় অনেক জিনিসই দেখিলাম, যাহা ইতিপূর্ব্বে দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। দুই দিন পূর্ব্বে স্বরূপদা মনের মধ্যে একটি অতি কদর্য্য, অতি ঘৃণিত কুমতলব পোষণ করিয়া যে নিমু কাকার বাড়ী গিয়া-

ছিল, আজ দেখিলাম সেই নিমু কাকাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বরূপদার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছেন। আরও দেখিলাম, মায়ের কি অনাবিল অমল অন্তরস্নিগ্ধকর স্নেহের ধারা! এ কোথায় হইতে, ভগবানের কোন্ হৃদয়গুহা হইতে ত্রিদিবের মন্দাকিনীর স্রোত এ মর-জগতে ঝরিয়া পড়িতেছে! দুই দিন পূর্ব্বে যে মা সদর্পে তেজঃপূর্ণ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন "পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তিনি কাতর হইবেন না—আজ সেই তেজ সেই গর্ব্ব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আজ সেই মা অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের মস্তক কোলে লইয়া স্নেহভরা মমতাভরা নয়ন দুইটি রুগ্ন পুত্রের মুখের উপর প্রসারিত করিয়া অনিমেষে চাহিয়া আছেন।' ও দৃষ্টি যে মৃত্যুঞ্জয়ী, ও দৃষ্টি যে সন্তাপহারা!

সন্ধ্যা হইতে স্বরূপদার অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। ডাক্তার মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়া গেলেন। কাকা জমীদার ভবন হইতে পনের টাকার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া বাড়ী আসিয়া, ঘরের মেজেতে লুটাইয়া পড়িলেন। পাড়ার দুই একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ও পুরুষ একটি আসন্ন সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রোগীর শয্যাপ্রান্তে বিষণ্ণ হৃদয়ে উপবেশন করিলেন। কিন্তু সকলের অপেক্ষা যে মুখখানি অধিক প্রভাশূন্য ও মলিন হইবার কথা—সেই মুখটি যেন কি এক অবর্ণনীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে মুখ যেন এ জগতের রক্তমাংসে গড়া নহে। যেন এক অশরীরী দেবীর অবয়ব—পুত্রের প্রাণ ভিক্ষার প্রার্থনায় বিশ্বজননীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

৬

একটি নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনায় অষ্টমীর নিশাপ্রভাতে স্বরূপদার গৃহে গিয়া দেখিলাম—স্বরূপদা নিরুদ্বেগে প্রশান্ত বদনে ঘুমাইতেছেন। জননীর অহ্বানে বিশ্ব জননীর আসন টলিয়াছে দেখিয়া আনন্দে চক্ষে জল আসিল। মধ্যাহ্নে ডাক্তার আসিয়া প্রফুল্ল মুখে অপরাহ্নে স্বরূপদাকে সহজভাবে হাসিমুখে কথা কহিতে দেখিয়া আমরা নবমীর আনন্দটুকু পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিলাম।

বাঙ্গালীর বড় আশার, বড় আনন্দের পূজা ফুরাইল। দশমীর প্রভাতে ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাসের মত ক্রন্দন-জড়িত সকরুণ স্বরে বাঁশরী বাজিতে লাগিল—

"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী
বিলম্ব আর সহে না।"

আজ আর এ আগমনীর গানে কাহারও হৃদয়ে আশার আলোক উজ্জল হইয়া উঠিল না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি একটি অনির্ব্বচনীয় নিবিড় ব্যথার উৎস ছুটিতে লাগিল।

সংক্ষেপে পূজান্তে "পাণ্ডা"-ভোগ নিবেদনের পর মায়ের দর্পণ বিসর্জ্জন হইল। গৃহে গৃহে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। অপরাহ্নে রমণীগণ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ধান দূর্ব্বা ও সিন্দুর দ্বারা প্রতিমা বরণ করিয়া খই বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন হরিধ্বনিতে সমস্ত গ্রামটি সচকিত করিয়া প্রতিমাকে বাচের নৌকায় তোলা হইল। বালকবালিকা-পূর্ণ নৌকায় ও প্রতিমার নৌকায় নদীবক্ষ ভরিয়া উঠিল। আসে পাশের কয়েকখানি গ্রামের প্রতিমার নৌকায় উচ্চ নিনাদে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে লাগিল। সৌখিন যুবকদের বাচের নৌকা হইতে হার্ম্মোনিয়মের সুরের সহিত—

"সুদূর দেশের মধুর যামিনী এসেছে,
তাই রঙ্গে অঙ্গ ঢাকিরি ফুলহারে ধরা হেসেছে"

সমীরণে বহিয়া আনিতে লাগিল। জলস্থল সুবর্ণছটায় আলোকিত করিয়া যখন নদীর পরপারে বৃক্ষ-অন্তরালে দশমীর সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, সেই দিবা এবং সন্ধ্যার মহাসন্ধিক্ষণে, নদীগর্ভে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

কাকীমা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দে পাটিটা বিছাইয়া,

গৃহে গৃহে প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গনের ধুম পড়িয়া গেল। আজ যে মহামিলন, আজ যে সব একাকার। বাড়ীর অধম ভৃত্যও প্রভুর আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত হইল না।

প্রণামার্থিগণ একে একে প্রস্থান করিলে আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, স্বরূপদা মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া কাকীমার পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া অনুতাপপূর্ণ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "আজ সকলকেই আশীর্ব্বাদ করলে মা, আমায় ত তুমি আশীর্ব্বাদ করলে না? আমার সব দোষ ক্ষমা করে', মানুষ হবার জন্যে আজ আমায় আশীর্ব্বাদ কর। আজ আমি তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, কোনও দিন তোমার অপ্রিয় কায করে' আর তোমায় কষ্ট দেব না। বল মা তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?"

কাকীমা কথা কহিলেন না; স্নেহব্যগ্র বাহু দুইটি মেলিয়া অনুতপ্ত ব্যথিত রোগশীর্ণ পুত্রকে বক্ষের মধ্যে নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরিলেন। পুত্রের কুকার্য্য দেখিয়া যে নয়ন এক বিন্দু অশ্রুও ত্যাগ করে নাই, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে যে নয়ন স্থির প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল, মার সেই নয়ন হইতে অবারিত উচ্ছ্বসিত আনন্দাশ্রু প্রাণাধিক পুত্রের মাথার উপরে অজস্র ধারায় ঝরিতে লাগিল। চন্দ্রতারা-খচিত নীলাম্বর ও শান্ত নিস্তব্ধ ভুবন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল, কি অসীম মহান দৃশ্য—মাতৃক্রোড়ে অনুতপ্ত সন্তান।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

দুইটি অলৌকিক ঘটনা

অনেকের মুখে অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনার গল্প শুনা যায়। আমি স্বয়ং এই জাতীয় দুইটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—একটি আমার বাল্যকালে, একটি যৌবনাবস্থায়। সেই দুইটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন বেলা ৩।৪টার সময় আমার জনৈক প্রতিবেশীর বাড়ীর দোতালার বারান্দায় বসিয়া খেলা করিতেছি। নিকটে একখানি তক্তাপোষের উপর আমার ছোট মাসী (গ্রাম সম্পর্কে) হলদে-রঙা কাপড় পরিয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই দিন তিনি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া শুদ্ধ হইয়াছেন। এটা তাঁহার বাপের বাড়ী। সন্তান প্রসবের জন্য তিনি ছয় মাস পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন।

হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমার পেট কামড়াচ্ছে, উঁহুঁ হুঁ" বলিতে বলিতে তিনি তক্তাপোষ হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং অনুনাসিক স্বরে বলিতে লাগিলেন, "উঁ হুঁহুঁ আমি তুম্বোওয়ালী, আমি তুম্বোওয়ালী।" আমি চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, "ওগো তোমরা সবাই এসে দেখ, ছোট মাসীর কি হয়েছে।" নীচের তালা হইতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া ছোট মাসীকে তুলিতে গেলেন কিন্তু ছোটমাসীর সেই এক বোল, "হুঁহুঁ উঁ আমি তুম্বোওয়ালী, আমি তুম্বো-ওয়ালী।"

তুম্বাওয়ালী বৈষ্ণবী, বাজার পাড়ায় থাকিত, ভিক্ষা করিয়া খাইত। সে একটি তুম্বা বা লাউয়ের খোল লইয়া ভিক্ষা করিত বলিয়া এই আখ্যা পাইয়াছিল। লোকে বলিত সে ডাইন, ছেলে খায়। আমি যদিও তখন শিশু, তথাপি আমার ভয়ডর ছিল না। আর এই পুলিশ-শাসনের দিনে একটা আস্ত ছেলেকে

ডাইনে কেমন করিয়া খাইতে পারে তাহা আমার বোধগম্য হইত না, সুতরাং সে আমাদের পাড়ায় ভিক্ষা করিতে আসিলে আমি ভয়ে লুকাইতাম না, আমার সহপাঠীরাও কেহ লুকাইত না। আমাদের সকলকেই ভুষাওয়ালী জানিত।

ছোট মাসীকে সকলে ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া আসিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীর ডাক পড়িল। ছোট মাসী নীচের ঘরে বসিয়া মাথা চালিতে লাগিলেন, আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "আমি ভুষোওয়ালী, আমি ভুষোওয়ালী।" জনৈক প্রতিবেশীর পরামর্শে মানকচুর শিকড় কাগজে জড়াইয়া আগুন ধরাইয়া ছোট মাসীর নাকের নীচে ধরা হইল। তখন উত্তর হইল, "আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, ওসব সরাও।" জিজ্ঞাসা করা হইল, "বল্ কেন এসেছিস্?" উত্তর হইল, "এ মেয়েটি আঁতুড় থেকে বেরিয়ে হলদেরঙা কাপড় পরে বসেছিল; আমি ভিক্ষা করতে এসে দেখে লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না, একে খেয়েছি।" শুনিলাম ডাইনেরা যাহাকে খায়, তাহার নাম ধরিয়া একটা কি মন্ত্র পড়ে। যিনি মানকচুর শিকড় ধরিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে এইবার ছেড়ে যা।" উত্তর হইল "যাচ্ছি।" কিন্তু ভুষোওয়ালী গেল না, সে মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমি বাড়ী গেলাম। রাত্রিতে আর কি হইয়াছিল জানি না। সকালে উঠিয়া গিয়া দেখি, ছোটমাসী মাথা চালিতেছেন আর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "আমি ভুষোওয়ালী, আমি ভুষোওয়ালী।"

আমরা পাড়ার কয়েকটি ছেলে বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিলাম। ভুষাওয়ালী ছোট মাসীর জবানী বলিতে লাগিল, "দেখ, যোগিন্ আর হলধরকে বারণ করো, তারা যেন আর আমায় বিরক্ত করে না। আমি রাধু আর জগবন্ধুর প্রাণ, কচুর পাতায় করে' রেখে দিয়েছি—তাদের আর বাঁচতে হবে না।" শেষোক্ত দুইজনের বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর, দুইজনেই তখন পীড়িত ছিল। তাহারা পাশের বাড়ীতে থাকিত। বহু চিকিৎসাতেও তাহারা আরোগ্য লাভ করে নাই। ইহাতে ভুষাওয়ালীর কিছু কৃতিত্ব ছিল কি না পাঠকবর্গ তাহার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু হলধর বা যোগিনের কিছু অনিষ্ট হয় নাই।

সকালেও ভুষাওয়ালীর অস্তিত্ব আছে বুঝিয়া, বাড়ীর কর্ত্তা কৃষ্ণ গুণীকে ওপার হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দক্ষিণাঞ্চলে যাহাকে লোকে "রোজা" বলে, আমাদের দেশে তাকে "গুণী" বলে। কৃষ্ণ গুণী বেলা প্রায় ৯টার সময় আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া বলিলেন, "আমায় এক কল্কে তামাক সেজে দিতে বলা হোক। আমি ভুষোওয়ালীকে কল্কেয় নাচাব।" তামাক সাজিয়া কৃষ্ণ গুণীকে দেওয়া হইল, তিনি ২।৩ টান দিয়া বলিলেন, "ভুষোওয়ালী এপারে নেই, ওপার গিয়েছে। এখন আর আমার মন্ত্র খাটবে না।" আমরা বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি, ছোট মাসী প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুষাওয়ালীর অস্তিত্ব ছিল। অথচ কৃষ্ণ গুণী যে বাহিরে আসিয়াছে এ সংবাদ বাড়ীর মধ্যে কেহই দেয় নাই বা বাহিরের কোন কোলাহল বাড়ীর মধ্যে নীচের ঘরে যাইতে পারে এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সেদিন আর কিছু হইল না। কৃষ্ণ গুণী ওপারে চলিয়া গেলে আবার ভুষাওয়ালীর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা গেল। পরদিন আবার কৃষ্ণ গুণী সকালে আসিলেন। সেদিনও ভুষাওয়ালী ওপারে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মন্ত্রের কোন ফল হইল না। পরদিন সাইহ্ কবিরাজকে ডাকা হইল। ইনি মুসলমান, কোন্ মতে চিকিৎসা করিতেন ঠিক জানি না, কিন্তু ঔষধ দিয়া সাধারণ রোগ আরাম করিতেন একথা ঠিক বলিতে পারি। তিনি কিছু কিছু মন্ত্রও জানিতেন।

এই সাইহ্ কবিরাজ আসিয়া কোন্ প্রক্রিয়া বলে ডাইন তাড়াইলেন আজ আমার সে কথা মনে নাই। কিন্তু ডাইন যাইবার পূর্ব্বে কবিরাজকে বলিল, "আচ্ছা আমি যাচ্ছি।" বলিয়া ছোট মাসী ঘর হইতে বাহির হইয়া খিড়কী দরজার কাছে আসিয়া কতকগুলি

নাড়ার স্তূপের উপর ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। একটু পরেই চৈতন্য হইলে ঘোমটা দিয়া নীচের ঘরে আসিলেন।

ইহার পরে তুষাওয়ালী একদিন আমাদের পাড়ায় ভিক্ষা করিতে আসিলে, মেজমামা তুষাওয়ালীকে এমন বেদম মারিলেন যে, যতদিন প্রহারকারী বাঁচিয়াছিলেন, তুষাওয়ালী আর আমাদের পাড়ার ত্রিসীমানায় আসে নাই। এই ঘটনার প্রায় ৫।৬ বৎসর পরে মেজমামা পাগল হইয়া মারা যান। ইহাতে তুষাওয়ালীর কোন হাত ছিল কি না জানি না।

বারাকপুরের কৈলাস ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছি, কোন স্ত্রীলোকের মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হইত, সে অজ্ঞান সময়ে বাড়ির লোককে না দেখিয়া নাম বলিয়া দিত; ডাক্তার আসিলেই তাহাকে না দেখিয়াই ঘরের মধ্য হইতে গালি পাড়িত। কৈলাস ডাক্তার এ রোগ কেবল ঔষধ দিয়া আরাম করেন।

২

আমি ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে ছাপরায় একটা স্কুলে মাষ্টারি করিতে যাই। পরবৎসর একটা পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া জুলাই মাসে আমার স্ত্রীকে লইয়া আসি। একজন ঠিকা ঝি ছিল, সে কায করিয়া চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীকে বাসায় একা থাকিতে হইত। আমি সন্ধ্যাবেলায় টুইশনি করিতে যাইতাম। তাই তিনি একদিন প্রস্তাব করিলেন, "অমুক ঝিকে সাহজানোয়া থেকে আনলে ভাল হয়।" এই ঝি গোরখপুরের নিকট একটা ষ্টেশনে আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কায করিত। আমার শ্বশুর ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক বলিয়া তাঁহার কিছু দেনা হইয়াছিল। আমি আমার স্ত্রীর প্রস্তাবে বলিলাম, "শ্বশুর মশায়ের মত বেশী খরচ করে' শেষে কি দেনা হবে?" ইহাতে আমার স্ত্রী রাগিয়া সমস্ত দিন কিছু খান নাই। আমি বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া খাইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু আমার কথা থাকিল না।

এই ঘটনার ২।১ সপ্তাহ পরে, বোধ হয় আগষ্ট মাসের প্রথম দিনে, আমার স্ত্রীর কলেরা হইল। বিহারের মধ্যে পাটনা ও ছাপরায় থাকিয়া দেখিয়াছি, নদীতে নূতন বর্ষার ঢল নামিলেই সহরে কলেরা আরম্ভ হয়। বর্ষার পূর্ব্বে লোকে নদীর ধারে মলত্যাগ করে; বর্ষার জলে তাহা ধুইয়া গিয়া নদীর জলে মিশে। এই সময়ে যাহাদের কলেরা হয়, আমি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের সকলেই নদীর জল পান করিয়াছিল। আমার স্ত্রীও সরযূ নদীর জল আনাইয়া গঙ্গার জল বলিয়া ভক্তিভরে পান করিয়াছিলেন। ছাপরার নীচে এক দিন গঙ্গা বহিত। এখন গঙ্গা সরিয়া গিয়াছে, সরযূ নদীই এখন গঙ্গার স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই স্থানীয় লোকে সরযূকেই গঙ্গা বলিয়া মনে করে।

যাহা হউক, আমার স্ত্রীর কলেরার সংবাদ বৈকালে পাইলাম। কিন্তু ব্যাধি সকালেই হইয়াছিল, তিনি আমায় বলেন নাই। আমি জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি ঔষধ দিলেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। আশেপাশে অনেকগুলি পরিচিত বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন সাহায্য পাওয়া দূরে থাক, তাঁহারা কলেরার ভয়ে আমার বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত ঘেঁসিলেন না। আমি নিরুপায় হইয়া বিহারী ছাত্রদের সংবাদ দিলাম। তাহারা ৩।৪ জন আসিয়া আমার বৈঠকখানায় জাগিয়া থাকিল এবং ঘড়ি দেখিয়া ঔষধ খাওয়াইবার সময় আমায় জাগাইয়া দিতে লাগিল। পরদিনও এইরূপে কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিন সাহজানোয়া হইতে আমার মাসশাশুড়ী ও জনৈক সম্বন্ধী আসিলেন। আমি বৈঠকখানায় তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছি। ঠিক পাশের ঘরেই আমার স্ত্রী একখানা খাটের উপর শুইয়া আছেন। উঠিবার সামর্থ্য আর নাই। আমার মাস-শাশুড়ী মাঝে মাঝে শয্যা পরিষ্কার করিতেছেন। আজ সমস্ত দিন এইরূপ চলিতেছে। আমি একটা খবরের কাগজে

পড়িয়াছিলাম, কলেরায় লেবুর রস খুব উপকারী। তাই দ্বিতীয় দিন হইতে পিপাসার সময় বরফ জলের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু লেবুর রস দিতেছিলাম। বোধ হয় তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে রোগের একটু উপশম হইল।

একজন তদ্দেশীয় কাহারণী (কাহার জাতীয়া স্ত্রীলোক) মধ্যে মধ্যে আমার স্ত্রীর নিকট আসিত। তাহার ছেলে বাঙ্গলা দেশে কোথায় চাকরী করিত। সে বেশ বাঙ্গলা বলিত, তাহার মাও বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিত। কাহারণীর বাড়ীতে এক দেবীজীর মূর্ত্তি ছিল। ইহা ঠিক মূর্ত্তি নহে, একটা পাথরের বড় নুড়ি, তাহাতে সিঁদুর মাখান। এই ঠাকুরটি কালীমাতা কি না জানি না। কিন্তু কাহারেরা ইঁহার পূজা করিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে ঢাক বাজাইয়া সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া পূজার জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করে। স্ত্রীলোকটী এই সময় "চৌমাসা" করিয়াছিল। শুনিয়াছি চৌমাসা করিলে ফল ভিন্ন অন্য কিছু খাইতে নাই। বর্ষাকালে কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন রান্না করিলে পোকা মাকড় আগুনে পড়িয়া মারা যাইবে বলিয়া বোধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই চৌমাসা ব্রতের প্রবর্ত্তন করেন। কাহারণীর চৌমাসা বৌদ্ধদের চৌমাসার অনুকরণ কি না জানি না।

এই স্ত্রীলোকটী দ্বিতীয় দিন হইতেই দিনে ২।৩ বার করিয়া আসিয়া আমার স্ত্রীর খবর লইত। সে তৃতীয় দিন আন্দাজ বেলা ৪টার সময় কখন আসিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল আমি জানিতাম না। হঠাৎ আমার মাসশাশুড়ী আমায় ডাকিলেন। আমি ঘরে গিয়া দেখি, আমার স্ত্রী কোমরে আঁচল জড়াইয়া পিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন, চোখ দুইটী যেন ঢল ঢল করিতেছে। কাহারণীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল।

কাহারণী। আপনি এখানে কেন এলেন?

আমার স্ত্রী। আমি কি সাধে এসেছি? এ যে একদিন না খেয়ে মনের দুঃখে মৃত্যুকে ডেকেছিল, তাই এসেছি। তা ছাড়া, এর নিজের দোষও ছিল। একদিন আমার পূজার জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ হচ্ছিল। এ মেয়েটি পুজো দেবো বলে ঠিক করেও, কুড়েমির জন্য পূজা দেয় নাই।

কাহারণী। আচ্ছা মা, এবার এর দোষ ক্ষমা করুন। এবার আরোগ্যলাভ করলেই আপনার পূজা দেওয়া হবে।

আমার স্ত্রী। তবে আজ আমি যাচ্ছি।

কাহারাণী। তবে যাবার আগে একটু কিছু খেয়ে যান। এই সরবতটুকু খান।

আমার স্ত্রী "আচ্ছা" বলিয়া একটা বড় গেলাসের এক গেলাস সরবত চোঁচোঁ করিয়া পান করিয়া বলিলেন, "তবে আমি চল্লাম।" তাহার পরই তিনি এলাইয়া পড়িলেন। সরবত খাইবার সময় আমার একটু ভয় হইয়াছিল, কিন্তু বাধা দিতেও সাহসে কুলাইল না। আমি পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমার স্ত্রীকে ধরিয়া ফেলিলাম। এতক্ষণ তাঁহার মাথায় ঘোমটা ছিল না। তিনি "মা" বলিয়া আমার মাসশাশুড়ীকে ডাকিয়া এলাইয়া পড়িলেন। আমার গায়ে তখন খুব জোর ছিল, তবুও একা ধরিয়া আমার স্ত্রীকে খাটে তুলিতে পারিলাম না। দুজনে ধরাধরি করিয়া তুলিলাম। তৎপরে আমার স্ত্রী খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন ৫।৬ ঘণ্টার পর ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আর জীবনের আশঙ্কা ছিল না।

পরে আমার মাসশাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, স্ত্রীলোকটি তাহার বাড়ীর দেবীর পূজা করিয়া, একটা ধুনুচিতে ধুনা জ্বালিয়া আমার স্ত্রীর খাটের চারিদিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, তাহার পর আমার স্ত্রীর উপর দেবীজীর ভর হয়।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

বর্ত্তমান আকিয়াব

চট্টগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে অনেক নদী, পর্ব্বত, পাহাড়, সাগর ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৮০ মাইল দূরে বর্ত্তমান আকিয়াব সহর। আকিয়াবের পূর্ব্বের নাম আরাকান ব্যতীত কিছুই ছিল না। বর্ত্তমানে যেস্থানটুকু লইয়া সহর হইয়াছে, এস্থানে পূর্ব্বে ভীষণ অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্দেশীয় মগ সকল অরণ্যের মধ্যে মধ্যে ঘরে তৈয়ার করিয়া বাস করিত। বর্ত্তমান সহরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে মিহং (Myhoung) পার্ব্বত্য গ্রামে তাহাদের রাজা বাস করিত। তথায় পাথরের কেল্লা ছিল বলিয়া, ইংরেজ অধিকার করিবার পর হইতে মিহংএর আর এক নাম "পাত্তরী" কেল্লা। এখনও সেই পাথুরের নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

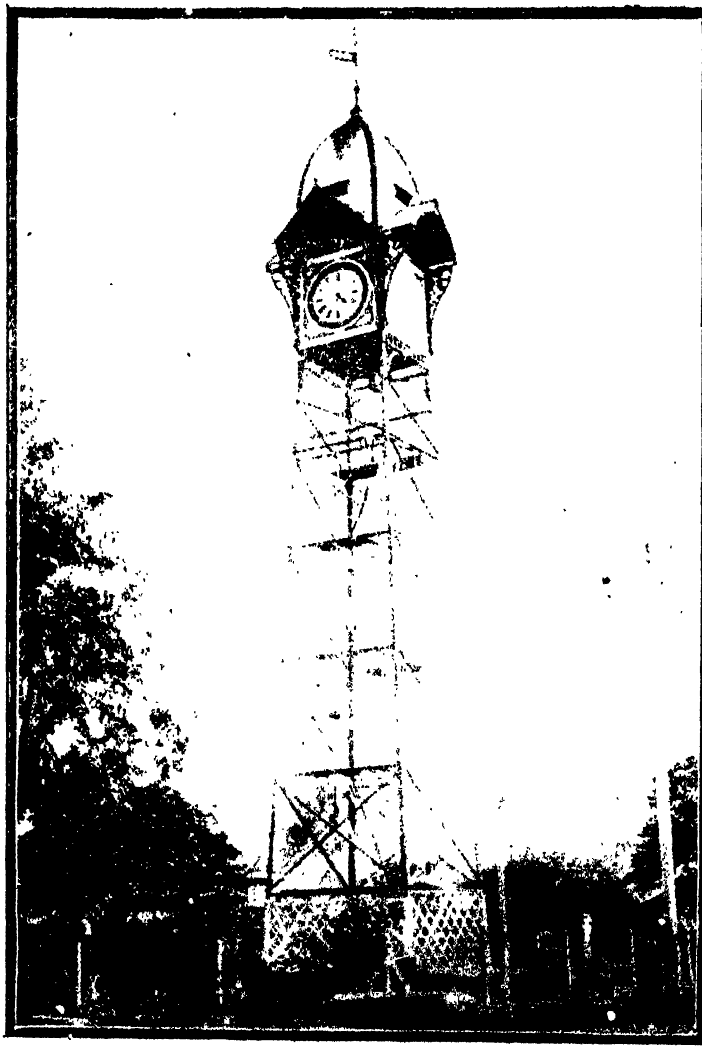
সহর হইতে তিন ঘণ্টায় ষ্টীমার যোগে "পাত্তরী কেল্লায়" যাওয়া যায়। শুনা যায়—এ দেশীয় মগ রাজা খুব শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ছিল। ইংরেজ বহুদিন যুদ্ধ করিয়া এ রাজ্য দখল করেন। রাজা ধরা পড়িবার ভয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ দিয়া অদৃশ্য হন। সেই লতা-গুল্মাচ্ছাদিত সুড়ঙ্গপথ এখনও বর্ত্তমান আছে।

ইংরেজগণ অধিকার করিবার পর হইতে এসকল জঙ্গল ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হয়। সমুদ্রের তীরে ব্যবসা বাণিজ্য ও ষ্টীমারাদি যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া এস্থানেই সহর নির্ম্মিত হয়।

আকিয়াবের পূর্ব্ব ও উত্তরে পাহাড়। এদেশীয় গ্রাম্য মগ সকল পাহাড় হইতে বাঁশ ও তাহার পাতা সংগ্রহ করিয়া পাহাড় জঙ্গলের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ



মিহং বা পাথরী কেল্লার ক্যাং (ধর্ম্মমন্দির)



আকিয়াবের বড় ঘড়ি

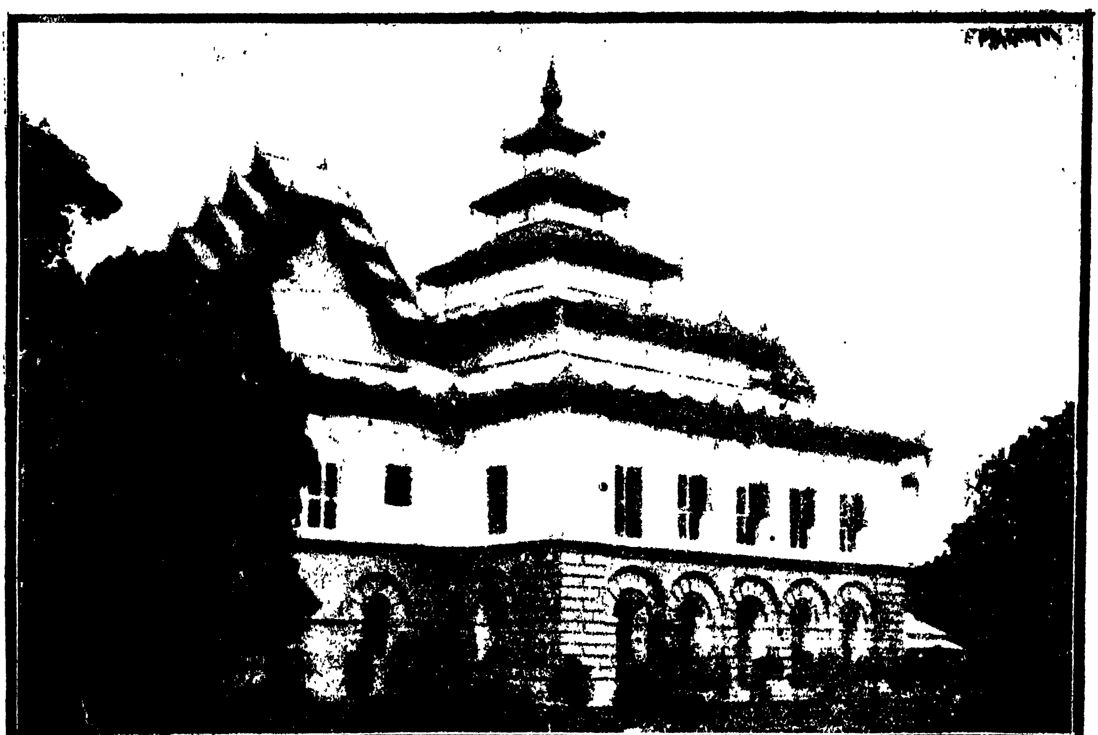
আবশ্যকানুযায়ী ঘর তৈয়ার করিয়া থাকে। তাহাদের ঘরগুলি স্বাস্থ্যকর। তাহারা ঘর তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে দুই তিন হাত বা আরও উচ্চ মাচা তৈয়ার করিয়া, মাচার উপর ঘর তৈয়ার করিয়া বাস করিয়া থাকে। এক ঘরের মধ্যেই তাহারা সমস্ত কাযই করে।

চট্টগ্রাম হইতে আকিয়াব সহরে দুই দিকে যাতায়াত করা যায়। একদিকে প্রত্যেক সপ্তাহে তিনবার (শনি, রবি ও বুধবার) মেসার্স টার্ণার মরিসন কোম্পানীর ছোট ষ্টীমার, চট্টগ্রাম হইতে আদিনাথ, কক্সবাজার প্রভৃতি স্থানের খবরের বোঝা ও লোকজন বহন করিয়া "কাইমখালী" পর্য্যন্ত আসিয়া, সেই বোঝা রেল গাড়ীর উপর চাপাইয়া দিয়া থাকে। কাইমখালী হইতে মংডোর (Moungdow) ভিতর দিয়া ভুশিদং (Bhuthidaung) সাবডিভিসন পর্য্যন্ত ১৭ মাইল পাহাড়ী রাস্তায় রেল তৈয়ার হইয়াছে। এই ১৭ মাইল রাস্তায় দুইটি সুড়ঙ্গ রেলপথ আছে। রেলগাড়ী যাঁহারা

ধীরে পার্ব্বত্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়া, ভুঁশিদং আসিয়া, মেসার্স আরাকান কোম্পানীর ছোট ষ্টীমারে সেই লোকজন সহ বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাকে। ষ্টীমার নদীর দুই পার্শ্বের খবর সংগ্রহ করিয়া রাথিদং (Rathidaung) এর ভিতর দিয়া আকিয়াব আসিয়া, সেই খবরের বোঝা বিতরণ করে। এদিকে আসিতে চারিদিন সময় অতিবাহিত হয়, তাহা ছাড়া ডাইরেক্ট ষ্টীমার অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট হয় বলিয়া বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সহরের লোক এদিকে যাতায়াত করে না।

অন্যদিকে প্রত্যেক সপ্তাহে মঙ্গলবারে রাজকীয় সংবাদ বহন করিয়া, অন্য কোন স্থানে অপেক্ষা না করিয়া মেসার্স বি, আই, এস, এন কোম্পানীর ষ্টীমার আকিয়াব হইয়া রেঙ্গুনে যাইয়া থাকে। কোন কারণে যদি রাজকীয় ডাক মঙ্গলবারে চট্টগ্রামে না পৌঁছে, তাহা হইলে ষ্টীমার সেই দিন ছাড়ে না। রাজকীয় সংবাদ বহন করিয়া আনে বলিয়া এবং কোন স্থানে অপেক্ষা করে না বলিয়া, সেই ষ্টীমারকে ডাইরেক্ট ষ্টীমার বা মেল ষ্টীমার বলে।

মেল ষ্টীমার চট্টগ্রাম হইতে মঙ্গলবারে যখন ছাড়ুক না কেন, বুধবার সকালে আকিয়াবে পৌঁছে; সেই কারণে, বিশেষতঃ রেঙ্গুন যাত্রিগণও এই ষ্টীমারে যাতায়াত করে বলিয়া, লোক-সংখ্যা খুব বেশী হয়। আকিয়াবের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ২৯৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৪৷৷৹ টাকা, মধ্যম শ্রেণী নাই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪৲ টাকা। আকিয়াব যাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়া থাকে। ষ্টীমার ছাড়িবার দুই তিন ঘণ্টার পূর্ব্বে যাত্রিগণ ষ্টীমারে উঠিতে নাবিকগণ বিশেষরূপে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ষ্টীমার ছাড়িবার পূর্ব্বে দুই তিন



সুইজাদি ক্যাং বা স্বর্ণমুকুট দেওয়া ধর্ম্মমন্দির



উরিয়াতং-এর ধর্ম্মমন্দির

ঘণ্টা যাত্রিগণকে উঠিবার সময় দেওয়া হয়। তখন হাজার, দেড় হাজার লোক এক সঙ্গে ষ্টীমারের দিকে ধাবিত হয়। ষ্টীমারের দুই দিকে মাত্র দুইখানি সিঁড়ি থাকে, সেই সিঁড়ি দিয়া এত লোক উঠিতে পারে না বলিয়া কেহ কেহ রেলিংএর মধ্যে দড়ি টাঙ্গাইয়া, দড়ি ধরিয়া ষ্টীমারের উপর উঠিয়া থাকে। তখন তাহারা এরূপ জ্ঞানশূন্য হয় যে, হঠাৎ দড়ি খানি ছিঁড়িয়া গেলে যে কি অবস্থা হইবে তাহা একটুও ভাবে না।

এরূপ ষ্টীমারে উঠিতে যাত্রিগণের শক্তি সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাদের তাহা অভাব, তাহারা জাহাজে উঠিতে টাকা, পয়সা, টিকেট, ট্রাঙ্ক, ছাতা, ইত্যাদি—এমন কি গায়ের রক্ত ও ক্ষুদ্র বৃহৎ মাংস পর্য্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে। তাহা ছাড়া কুলী শ্রেণীর লোক, নাবিকদের হাতের ঘুসি, কোন কোন শ্বেতাঙ্গের পায়ের বুট জুতার লাথি পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া, অগণনীয় মেষপালের মত কাহারও গায়ের উপর দিয়া, কাহারও পায়ের নীচে দিয়া, কোন ব্যক্তিকে ঠেলিয়া জাহাজে উঠিয়া থাকে।

ষ্টীমারে যেরূপ উঠিবার কষ্ট, সেরূপ স্থানাভাবে বসিবারও কষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য

স্থানে ষ্টীমারে গরু, ছাগল ইত্যাদি যাতায়াতের সময় যেরূপ দাঁড়াইবার শুইবার স্থান পাইয়া থাকে, আকিয়াব-যাত্রিগণও আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সেইরূপ স্থান পায়। যাহারা প্রথম উঠে তাহারা একটু সুবিধা মত বসিতে পারে। শেষে যাহারা উঠে, তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর হইয়া থাকে। যে স্থানে যে একটু দাঁড়াইয়া স্থান পায়, সে স্থানে সে বসিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেখান হইতে এক পাও নড়ে না। ভয়, পাছে কেহ আসিয়া সে স্থান অধিকার করে। মধ্য-অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এত কষ্ট ভোগ করিয়া প্রথম উঠিতে পারেন না, তাঁহারা বাধ্য হইয়া শেষে উঠিয়া থাকেন। কাযেই তাঁহাদের বসিবার জন্য স্থানাভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। তখন ষ্টীমারের নাবিকদিগকে দুই এক টাকা বখ্‌শিস্ দিয়া, রাত্রিবাসের জন্য একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকেন।

প্রত্যেক বার চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুন হইতে মেল ষ্টীমার আসিবার সময়, আকিয়াব বন্দরের এক মাইল দূরে থাকিতে একটি তোপ ধ্বনি করিয়া ষ্টীমার আসিবার খবর সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয়। তোপধ্বনি শুনিলে পুলিশ সার্জ্জেন্ট, ইনস্পেক্টর, সরকারী ডাক্তার, জল পুলিশ, পোর্ট পুলিশ, অন্যান্য লোক ও কুলি ইত্যাদি আকিয়াবের বড় জেটিতে গমন করে। ষ্টীমার জেটীর সঙ্গে লাগিলে, সমস্ত লোক ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া জেটীর উপর জমাট হইয়া যায়। ডাক্তার বাবু প্রত্যেকের মুখ দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তৎপরে শ্বেতাঙ্গ, ইংরেজ পরিচ্ছদধারী ও বিশেষ সম্মানিত লোক ব্যতীত সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ সভার মত পোলের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। পরে পুলিশ সার্জ্জেন্ট এক একজন করিয়া প্রত্যেকের ট্রাঙ্ক, বিছানা, গাটরি ইত্যাদি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

সিংহাচলম্

কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ঠিক অর্দ্ধপথে ওয়ালটেয়ার জংসন। এইখানে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনের শেষ ও মান্দ্রাজ সাউথ মাহারাট্টা রেলওয়ে লাইনের আরম্ভ হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সমুদ্রতটবর্ত্তী ওয়ালটেয়ার ৩ মাইল পূর্ব্বে, এবং জিলার প্রধান নগর ভিজাগাপত্তম ২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভিজাগাপত্তম নগরটি বঙ্গসাগরের উপকূলে ৫ মাইল বিস্তৃত। উহার উত্তর উপকণ্ঠই ওয়ালটেয়ার—জিলার প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং য়ুরোপীয়দিগের বাসস্থান। আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাট বাজার সমস্তই সহরে—অর্থাৎ দক্ষিণভাগে। রেলওয়ে জংসন হইতে ভিজাগাপত্তম পর্য্যন্ত একটি শাখা রেলওয়ে আছে।

এসময়ে স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে অনেক বাঙ্গালী ওয়ালটেয়ার আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এখানে গৃহাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল আর ওয়ালটেয়ারের উপর বাঙ্গালীদের তেমন ঝোঁক দেখা যায় না; সমুদ্রতীরে বাস করিতে হইলে সচরাচর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী পুরীতেই তাঁহারা যাইয়া থাকেন। কিন্তু নতোন্নত পর্ব্বতমালা ও অনন্ত সমুদ্রের একত্র সমাবেশে ওয়ালটেয়ারের ন্যায় রমণীয় স্থান ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে আর নাই।

ভিজাগাপত্তমের দক্ষিণ সীমায় একটি পর্ব্বত অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আকৃতিগত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া ইহার নাম রাখা



ভিজাগাপত্তম্

হইয়াছে Dolphin's Nose (মকরের শুঁড় ?)। পাহাড়টি উচ্চে ১১৭৪ ফুট, ইহার উত্তর প্রান্ত ঘেঁসিয়া, একটি নদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। এইখানে একটি বৃহৎ Harbour অর্থাৎ বন্দর নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

ওয়ালটেয়ারের সর্ব্বোচ্চ পার্ব্বত্য ভূমি সমুদ্র হইতে ২৫০ ফুট উর্দ্ধে। 'টিলা' গুলি গুল্মাচ্ছাদিত। অসমতল পথের দুইধারে "কেশু-নাট" প্রভৃতি বৃক্ষ। এক এক স্থানে এক একটা প্রকাণ্ড খণ্ডশিলা পড়িয়া রহিয়াছে। ওয়ালটেয়ার হইতে বরাবর ভিজাগাপত্তম্ পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধার দিয়া সুন্দর একটি নির্জ্জন পথ। পথের পশ্চিমদিকে দূরে এক একটি পাহাড়ের উপর এক একখানি বাড়ী, কিন্তু ভিজাগাপত্তমের দিকে লোকালয়ের সম্মুখ দিয়াই পথ গিয়াছে। যেথানে সেথানে তালবৃক্ষরাজি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের পাদদেশ যেথানে অনাবৃত, সেথানে মাটি রক্তবর্ণ।

ভিজাগাপত্তমের আদিম নাম ছিল "বিশাখা পত্তনম্" বা "বৈশাখ পত্তনম্"। উহার অপভ্রংশ ভিজাগাপত্তম্; সাহেবেরা আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বলেন—"ভাইজাগ্।" স্থানটি প্রাচীন; ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ প্রথমে এথানে কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটি জিলার প্রধান নগরে পরিণত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে, আয়তনে এত বড় জিলা আর নাই।

ভিজাগাপত্তমের উত্তরে "সিংহাচলম্" পর্ব্বত। এই পর্ব্বতশিথরে নৃসিংহদেবের একটি মন্দির আছে। অন্ধ্রদেশে এত প্রাচীন ও এরূপ প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আর নাই। বিষ্ণু নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এই নৃসিংহ বিগ্রহ স্বয়ং প্রহ্লাদের প্রতিষ্ঠিত। "নৃসিংহ" হইতেই পর্ব্বতের নাম সিংহপর্ব্বত বা "সিংহাচলম্"। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণভ্রমণে বাহির হইয়া সিংহাচলের নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

সিংহাচলম্ ওয়ালটেয়ার ষ্টেশন হইতে ৭॥ মাইল এবং ওয়ালটেয়ারের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী সিংহাচলম্ ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে। ওয়ালটেয়ারে আসিয়া মনে হইল, সিংহাচলের মন্দিরটি দর্শন করিবার সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। ২০শে চৈত্র প্রাতঃকালে একখানা মোটর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া সিংহাচল যাত্রা করিলাম। ভিজাগাপত্তম হইতে বিজিয়ানাগ্রাম পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, সিংহাচলম্ ষ্টেশনের খানিক উত্তরে সেই পথের একটি শাখা পূর্ব্বদিকে সিংহাচল পর্ব্বত অভিমুখে গিয়াছে। মোটর গাড়ী অর্দ্ধ ঘণ্টায় পর্ব্বতমূলে আসিয়া পৌছিল। এখানে বিজিয়ানা-গ্রামের বাজার, কাছারিবাড়ী, বাগান ও ছোট ছোট দুই চারিখানি দোকান ঘর আছে।

সিংহাচলে বৎসরে দুইটি পর্ব্বোপলক্ষে বহুযাত্রি-সমাগম হইয়া থাকে; অক্ষয় তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা এবং চৈত্র একাদশীতে "কল্যাণম" অর্থাৎ বিবাহ-উৎসব। চৈত্রের উৎসবটি সবেমাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক যাত্রী এখনও ফিরিয়া যায় নাই। তাহাদের জন্য পর্ব্বতের পাদদেশে ছোট একটি মেলা বসিয়াছে।

পর্ব্বতটি ৮০০ ফুট উচ্চ। উত্তর দিক হইতে পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। পথের দুই দিকেই নানাজাতীয় বৃক্ষ। ডানদিকে নিম্নে উপত্যকায় ফলফুলে শোভিত উদ্যান। বামদিকে তরুগুল্মাচ্ছাদিত পাহাড় বাহিয়া একটি ঝরণা কুলুকুলুরবে নামিয়া আসিয়াছে। এই পথে উঠিতে উঠিতে তৃণাঙ্কুরহীন ধূসর কঙ্করাবৃত পর্ব্বতের কোলে বনের শ্যামল শোভা দেখিয়া সত্য সত্যই চক্ষু জুড়ায়। কবিত্বের উপকরণ যথেষ্ট, কিন্তু পথ আর ফুরাইতে চাহে না। সিঁড়ির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। পর্ব্বতারোহণে অনভ্যাস বশতঃ খানিক দূরে উঠিয়াই বিলক্ষণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; পদদ্বয় যেন অবশ হইয়া আসিল। তখন মনে হইল, আমি 'প্রভু-



ভিজাগাপত্তম্ সমুদ্রতীর



ভিজাগাপত্তম্—ডল্‌ফিন্‌স নোজ

তত্ত্বান্বেষী নহি, পুণ্য-প্রয়াসীও নহি, আমার এ বিড়ম্বনা কেন ?—"এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে !"

কিন্তু ফিরিবারও উপায় নাই ; ফিরিবার কথা মুখে আনিলে মান্দ্রাজী সঙ্গীদের কাছে বাঙ্গালীর সম্মান বজায় থাকে না। মনকে চোখ রাঙাইয়া বলিলাম, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" এক একবার সিঁড়ির প্রান্তে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লইয়া, ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে সঙ্গী কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "বড় বেশী ক্লান্ত হয়েছেন কি ?" আমি বলি, "না—তা—হাঁ—এমন কি ক্লান্ত ! একটু ব্যায়াম তো শরীরের পক্ষে ভালই !"—একটি গল্প আছে,একজন এই-দেশী সাহেব একদা ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণীর ডেকে বসিয়া পৌষের কনকনে বাতাসে হিহি করিয়া কাঁপিতেছিলেন, অন্য একজন যাত্রী ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আজ সকালের হাওয়াটা কি বেজায় ঠাণ্ডা !"—সাহেব উত্তর করিলেন, "D-de-lightfully c-cool"। শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু পাছে কেহ মনে করে যে তাঁহার খাঁটী বিলাতী শীতের অভিজ্ঞতা নাই, এই ভয়ে তিনি সেই কন্‌কনে হাওয়াকে স্নিগ্ধ মধুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। উপস্থিতক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা এই সাহেবের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া দলে দলে ভক্ত নর-নারী—বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বালক বালিকা, স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিতেছিল এবং যেখানেই পথের ধারে একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, সেখানেই পূজা দিতেছিল। একস্থানে পথ সংকীর্ণ হইয়া একটি দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছে, মনে করিলাম, এইবার বুঝি মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিব। কিন্তু দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলাম, মন্দির আরও উর্দ্ধে। এই দ্বারের নাম হনুমান দ্বার। ডানদিকে হনুমানের ছোট একটি মন্দির ; বামদিকে যাত্রিগণের জন্য স্নানাগার, উপর হইতে ঝরণার জল অনবরত সেখানে পড়িতেছে। নিকটে যাত্রীদের থাকিবার জন্য গৃহও দেখিলাম।

অবশেষে এই দীর্ঘ সোপানাবলীর শেষ সীমায় মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। পর্ব্বতের অধিত্যকায় পাহাড়ে ঘেরা মণ্ডলাকার স্থানে এই মন্দির নির্ম্মিত। মন্দিরটি পশ্চিমদ্বারী ; প্রথমে ধ্বজস্তম্ভ, তাহার পরে নাটমন্দির (মুখমণ্ডপম্), এইটি সমচতুর্ভুজ, ১৬টি স্তম্ভ-বিশিষ্ট। এই মণ্ডপের সম্মুখে দেবতার স্থান

অর্থাৎ গর্ভগৃহ। অঙ্গনের উত্তর কোণে 'কল্যাণম্' অর্থাৎ বিবাহমণ্ডপ, এইখানে চৈত্র একাদশীতে নৃসিংহ দেবের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। সমস্ত মন্দিরই কৃষ্ণ-বর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ও কারুকার্য্য-খচিত। মণ্ডপগুলির স্তম্ভে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক চিত্র খোদিত, কিন্তু সকল মূর্ত্তিগুলিরই নাসিকা ভগ্ন। এই মন্দির যে এক সময়ে মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এই মূর্ত্তিগুলি তাহার নীরব সাক্ষী। কল্যাণম্ মণ্ডপটির কারুকার্য্য সূক্ষ্ম ও অতি সুন্দর। ইহাতে ১৬ সারি স্তম্ভ; প্রতি সারিতে ৬টি, প্রত্যেক স্তম্ভের খোদিত চিত্র বিভিন্ন ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই মণ্ডপে দেবতার নানা প্রকার যান বাহন রাখা হইয়াছে। অঙ্গনের এক কোণে একখানি পাথরের রথ রহিয়াছে, ইহার অশ্বগুলিও পাথরের। দাক্ষিণাত্যে, বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে গরুড় ও শিবমন্দিরের সম্মুখে নন্দী (বৃষ) মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই মন্দিরে সেইরূপ গরুড় মূর্ত্তি দেখিলাম না। নৃসিংহদেবের যে বৃহৎ ধাতুমূর্ত্তি দেখা গেল, শুনিলাম উহা মূল বিগ্রহ নহে, সেই বিগ্রহ অতি ক্ষুদ্র এবং চন্দনে আবৃত করিয়া ধাতু মূর্ত্তির দেহে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে।

উৎসব উপলক্ষে সমাগত যাত্রিগণের সুবিধার জন্য মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ অল্পপরিসর নাটমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই জন্য, পর্ব্বতের মূল হইতে বৈদ্যুতিক তার বরাবর মন্দির পর্য্যন্ত আনিতে হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর যাবৎ বিজিয়ানাগ্রামের রাজগণ সিংহাচলম্ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। নিজস্ব ভূমি-সম্পত্তি হইতে এই মন্দিরের বার্ষিক আয় সাত হাজার টাকা।

সিংহাচলম্ মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরে বহু প্রাচীন অনুশাসন ও দানলিপি উৎকীর্ণ আছে; ইহাকে ঐতিহাসিক তথ্যের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন্দিরটি কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপি ১০৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে তামিল অক্ষরে উৎকীর্ণ। ইহাতে দেখা যায়, তাঞ্জোরের চোল-বংশীয় ভূপতি কুলোত্তুঙ্গ কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিলালিপি হইতে জানা যায়, বেলানান্দু বংশীয় তৃতীয় গঙ্গা নামক এক সামন্ত-রাজার রাণী দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহাচলের বিষ্ণুমূর্ত্তি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন; গঙ্গা বংশীয় নরপতি প্রথম নরসিংহ ১২৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের গর্ভ-গৃহ, মুখ-মণ্ডপ, নাটমণ্ডপ এবং অঙ্গনের চারিধারের বারান্দা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের দিগ্বিজয়ী নৃপতি কৃষ্ণদেব, উড়িষ্যার গজপতি-বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়া, একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা এবং অন্যান্য দ্রব্য নৃসিংহদেবকে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রাচীরগাত্রে যে সকল বিভিন্ন দানপত্র খোদিত আছে, উহাদের সংখ্যা ১২৫টির কম নহে।

মন্দিরের অঙ্গনের বাহিরে একটি মাত্র রাস্তা, মন্দিরের সম্মুখ হইতে ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়াছে। পথের ধারে এক সারি একতলা ঘর। কোন কোন ঘরে মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ বাস করে; অন্যান্য ঘরগুলি বিশিষ্ট অতিথিদের ব্যবহারের জন্য রাখা হইয়াছে।

মন্দির দর্শন শেষ হইলে আমরা এই পথ দিয়া গঙ্গাধারা ও আকাশধারা দেখিতে গেলাম। মনে করিয়াছিলাম, জল প্রপাতের মত কিছু দেখিতে পাইব, কিন্তু ধারা দুইটি দেখিয়া নিরাশ হইতে হইল। এ আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ঝরণা', নল-যোগে উপর হইতে নিম্নে চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়িতেছে। এই জল নাকি গঙ্গা জলের তুল্য পবিত্র। ফিরিয়া আসিয়া আমরা অতিথিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি ঘরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। মন্দিরের অধ্যক্ষগণ কফি পান করিতে দিয়া অতিথি-সৎকার করিলেন। পর্ব্বত হইতে অবতরণ সময় তেমন কষ্ট বোধ হইল না।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

ছোট ছেলে

(গল্প)

যৌবনের চশমা চোখে দিলে কেহ বা বড় জিনিষকে ছোট কেহ বা ছোট জিনিষকে বড় দেখে। বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার বাইশ বছরের চোখে ঐ সবুজ চশমা লাগাইয়া, ঠিক সরার মত অত ছোট না হইলেও, পৃথিবীটা যতখানি তাহাকে তাহার চেয়ে যে ঢের ছোট বলিয়া দেখিতাম তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই, যদিও ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবীর শুধু পরিধিটাই ২৫০০০ মাইল।

তবে পৃথিবীর সব জিনিষকেই যে ছোট করিয়া দেখিতাম তাহা নয়। নিজের রূপ, বুদ্ধি এবং বিদ্যা—এ তিনটা জিনিষকে খুব বড় বলিয়াই মনে হইত।

সূর্য্য যে সময় সেদিন পশ্চিম আকাশে অনেকগুলি সহস্রবর্ণের আগুন [illegible] ছিল এবং সেগুলি দুই একটি করিয়া [illegible],—ছোট এক পাষাণ স্তূপের উপর বসিয়া তাহা আমি দেখিতেছিলাম। ক্রমশঃ [illegible] ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিবার উপক্রম করিতেছিল, তখনও উঠি উঠি করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। দৃশ্যটাও লাগিতেছিল ভাল; আর একটা কথা মনে হইয়া গমনে বাধা দিতেছিল। সে কথা নিজের কাছে বা পাঁচজনের কাছেও স্বীকার করিতে এখন আর লজ্জা নাই। বন্ধুমহলে আমার কবি বলিয়া বেশ একটু খ্যাতি ছিল, সেইটুকুর খাতিরে বোধ হয় আরও উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু যখন দেখিলাম যে সে পথে এমন কোন লোক এপর্য্যন্ত আসিল না যে এই প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যরসজ্ঞ কবির মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, এবং যখন মনে পড়িল কয়েকদিন পূর্ব্বে এই পথে একটি সাঁওতাল যুবক সর্পাঘাতে মরিয়াছিল, তখন কবিত্বের জালখানি দূর গগনপ্রান্ত হইতে সভয়ে গুটাইয়া লইয়া, সতর্ক পদক্ষেপে বাসার দিকে ফিরিলাম।

আমি বন্ধুগৃহে অতিথি। বন্ধু এখানে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত; অনেক আত্মীয় স্বজন আশ্রয়হীনের আশ্রয় স্থান। আমি ফিরিতেই তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এত শীগ্‌গির কবিত্ব ছেড়ে ফিরলে যে?"

আমি বলিলাম, "কি করব বল, তোমার চক্রতীর্থ না চক্রবোড়া সাপের ভয়ে। তারা যে রীতিমত ছোবল দিয়ে যতখানি কবিত্বের রস সবটুকু একটানে সংগ্রহ করে নেয়!"

তার পর বাহিরের প্রাঙ্গণে কয়েকজনে বসিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবসা ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয়ের কথা এক এক নিশ্বাসে শেষ করিতে লাগিলাম। এমন সময় একজন অপরিচিত লোক সেখানে আসিয়া বলিল, "বাবু, দূরের পথিক আমি, এখানে আজ রাত্তের মত আশ্রয় নিলাম।"

এই বলিয়া লোকটি নিকটস্থ চেয়ারে না বসিয়া নীচে যেখানে একটা পাটি পাতা ছিল সেখানে তাহার গামছায় বাঁধা পুটুলিটি রাখিয়া পরম নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া পড়িল।

লোকটির বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, পায়ে তালতলার চটি, গায়ে একখানি মোটা চাদর, তার ভিতরে শুভ্র উপবীত-গুচ্ছ দেখা যাইতেছে। তাহাকে অনায়াসে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারিত যদি না গোঁফ দাড়ি তাহার মুখখানাকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিয়া প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিত।

পরের আশ্রয়ে আসিয়া লোকটার অসঙ্কোচ ব্যবহার দেখিয়াই তাহার উপর আমার মনে একটা কেমন বিরুদ্ধভাব জাগিল। পরের স্কন্ধে কলবিশেষ ভাজিবার এই প্রথাটাই যে ভারতবর্ষকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিতেছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই

ছিল না। আমার বন্ধু অবশ্য তাহাকে সসম্মানে আহ্বান করিয়া বসিতে বলিয়াছিলেন, যদিও তাহার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেন না সে বসিতে বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া এমনভাবে বসিয়া পড়িয়াছিল যে বেশ করিয়া না টানিলে আর তাহাকে উঠানো যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছিল না।

বন্ধুমহলে আমি খুব রসিক বলিয়া পরিচিত—অবশ্য তাহাতে অম্লরসটাই অধিক থাকিত। তাই লোকটাকে কিঞ্চিৎ রসের পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার দিকে তাকাইয়া একটু অভিনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

বলাবাহুল্য আমি তাহাকে সাহিত্যের খাতিরে তুমি বলিয়াছিলাম; নহিলে তাহাকে আপনি বলিতে কোনই আপত্তি ছিল না; কারণ আমি বেশ জানিতাম যে ভদ্রতা বজায় রাখিয়াও আপনি বলিয়া লোককে যথেষ্ট বিদ্রূপ করা যায়।

লোকটা আমার দিকে একবার চাহিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "না, আমি তো পথ চিনে এখানে আসবো বলেই এসেছি।"

সে আমার বিদ্রূপটা ফিরাইয়া দিল, কি সরলভাবে উত্তর দিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বিদ্রূপ তেমন জমিল না।

খানিক পরে চাহিয়া দেখি লোকটা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, পাচক ও ভৃত্যদের সহিত দিব্য আরামে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। "রতনে রতন চিনে" কথাটা ভারি সত্য। একটা গল্পও মনে পড়িয়া গেল।

পরীক্ষা করিয়া যদি ভাল হয় কিনিব এই সর্ত্তে একজন লোক এক গর্দ্দভ বিক্রেতার নিকট হইতে একটি গর্দ্দভ লইয়া গিয়াছিল। লোকটির আরও অনেক গর্দ্দভ ছিল। সে বাড়ী গিয়া সেই গর্দ্দভগুলির মধ্যে তাহার নূতন আনীত গর্দ্দভটিকে ছাড়িয়া দিল। সে ছাড়া পাইতেই, যে কয়টি গাধা একেবারে অকর্ম্মণ্য অথচ ভোজনে খুব পটু তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিশিল। লোকটি তাহাতেই বুঝিল এ গর্দ্দভটির স্বভাব কি হইবে—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য ও ভোজনপটু। সে অচিরে গর্দ্দভটাকে লইয়া বিক্রেতার নিকট ফিরাইয়া দিয়া গেল।

সকলে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। বন্ধুদের বলিলাম, "অতিথিকে নিয়ে একটা মজা করি দেখ। কিন্তু তোমরা কিছু বলতে পাবে না।" বলিয়া একজন ভৃত্যকে নবাগত লোকটিকে ডাকিয়া দিতে বলিলাম।

লোকটি একটু পরেই চটিকে বিশ্রাম দিয়া খালি পায়ে আসিয়া বলিল, "বাবুরা আমাকে ডেকেছেন?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছিলাম, আপনার জন্যে কতটুকু সাবু দেওয়া হবে, তাই জিজ্ঞাসা করব বলে। পোয়াটেক কি বলেন?"

সকলের চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আমার বুকখানা, দশ হাত না হউক, হাতখানেক ফুলিয়া উঠিল।

লোকটা বোধ হয় কিছু বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বোধের মত আমার মুখের পানে বিস্মিতভাবে চাহিল।

ব্যাপারটা লোকটিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে ভাবিয়া বলিলাম, "আপনি বুঝি জানেন না, এখানে আমরা কেউ রাতে ভাত খাই না—ঐ সাবুদানাই যা করে। ভাতের একটা দানা যদি রাতে পেটে পড়েছে, তো ম্যালেরিয়া আর কোথায় আছিস! বুঝলেন,—তা আপনিও তো ওই খাবেন?"

লোকটা একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল, "তা, আপনারাও যা খাবেন, আমার জন্যেও তাই ব্যবস্থা করবেন।"

এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা কয়টি সে বলিল যে অবিশ্বাসের লেশমাত্রও যে তাহার মনে উকি মারিয়াছে এমত বোধ হইল না। তাহার সারল্যের বর্ম্মে ঠেকিয়া আমার বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ ফিরিয়া আসিল।

আমার সহৃদয় বন্ধু যেন এরূপ বিদ্রূপে একটু ক্ষুণ্ণিত

হইয়া তাহাকে হাসিমুখে বলিলেন,"না না, তা নয়, উনি একটু রহস্য ভালবাসেন, তাই ও রকম বলেছেন। ভাত-ট্যাত যা খাবেন তাই হবে।"

লোকটির মুখখানা একেবারে হাসিতে ভরিয়া উঠিল। হোহো করিয়া হাসিয়া লোকটি ঘরটা ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। লোকটির মনে কি বিদ্রূপের কোন দাগ বসে না? সরলতার প্রতিচ্ছবি তাহার সেই উচ্চ হাস্য, মুহূর্ত্তে আমার বিদ্রূপ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

রাত্রি ৭৷৮টার সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবুনঠাকুরের আজ বড্ড জ্বর এসেছে, রাতে তো আজ রাঁধিতে পারবে না।"

আমার বন্ধু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কোথায় গেল?"

ভৃত্য বলিল, "সে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘণ্টা তিনেক পরে সে আবার উঠে দেওয়া থোয়া পারবে, এখন রাঁধবার জন্য কাউকে দরকার।"

"এখন উপায়? আজ যে অবিনাশকে খেতে বলেছি, তার সঙ্গে আবার কলকাতার দুজন বেশ নামজাদা বন্ধু আসবেন।"

নিমন্ত্রিতেরা ব্রাহ্মণ বলিয়াই মুস্কিল, নহিলে আমার রান্ধনী যথেষ্টই রন্ধন-নিপুণা।

"দাঁড়াও আমি দেখছি"—বলিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। লোকটি সেই মাদুরটার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া, বুঝি বা আকাশের তারাই গণিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর মহাশয়, রান্না আসে আপনার?"

ঠাকুর মহাশয় তারা গণায় ক্ষান্ত দিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব আসে। চুপটি করে বসে বসে হাতপা নিস্‌পিস্ কচ্চে, বলুন না কি করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "আমাদের ঠাকুর অর্দ্ধেক রেঁধে লেপ মুড়ি দিয়েছে, বাকিটুকু আপনি বেঁধে দিতে পারবেন?"

"খুব পারবো"—বলিয়া লোকটি উৎসাহে উঠিয়া বসিল।

বন্ধু একটু আধটু আপত্তি করিলেন, "হাজার হোক অতিথি, তাকে দিয়ে রাঁধান! কিন্তু কিই বা এখন করি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যাবার সময় কিছু বকশিস দিয়ে দিও, তা হলেই হবে।"

তার পর তাহাকে রন্ধনগৃহে পৌছাইয়া দিলাম।

রান্না যে লোকটির পেশা হওয়া উচিত ইহা আমার প্রথম হইতেই ধারণা হইয়াছিল। যাহা হউক, লোকটিকে দিয়া তবু কায পাওয়া গেল।

২

দশটার সময় রান্না শেষ করিয়া লোকটি প্রসন্নমুখে আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত। আমাদের ঠাকুরের ভালুকজ্বর ত্যাগ হইয়াছিল, সে এখন অবশিষ্ট কর্ত্তব্যের ভার লইল।

দস্তুরমত মাথা উঁচু করিয়া তখন আমি গাহিতে ছিলাম—

"আমার মাথা নত করে দাও হে,
তোমার চরণধূলির তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

গান শেষ হইলে কেহ বলিলেন,'বাঃ', কেহ বা বলিলেন 'বাহবা'। সেই লোকটি এককোণে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া ছিল; গান শেষ হইয়া যাওয়ার খানিক পরে সে চক্ষু খুলিয়া বলিল, "কি সুন্দর গান আপনি! যেমন গান, তেমনি কণ্ঠ!"

নিজ কণ্ঠ ও রূপের প্রশংসা এতই শুনিয়াছি যে আগন্তুকের প্রশংসাবাদে একটু বরং বিরক্তই হইলাম। রান্নার কায সারিয়া লোকটা কি না আমার গানের বাহবা দিতে আসিয়াছে! তখনই উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে দোয়াত কলম ও কাগজ লইয়া গিয়া লোকটির সমুখে ধরিয়া কৃত্রিম বিনয়ের সহিত বলিলাম, "যেটা

বল্লেন সেটা লিখে দিন, তা হলে সার্টিফিকেটের কাষ করবে।"

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া হাসিমুখে বলিল, "আপনার কণ্ঠে শ্রীভগবান নিজে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন, আর কিছুর দরকার হবে না।"

চাটুবাদ অনেক শুনিয়াছি। মন ইহাতে নত হইল না। কিছুতেই লোকটাকে কাবু করিতে পারিতেছি না দেখিয়া বড়ই রোক চাপিয়া গেল।

লোকটি কি তাহার সমস্ত মনটা তৈলাক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে কোন বিদ্রূপই সেখানে একটা স্থায়ী আসন পাতিয়া লইতে পারিতেছে না?

হঠাৎ তাহাকে অনুরোধ করিয়া বসিলাম, "গান একখানা।"

সে বলিল, "আপনার গান বড় সুন্দর, আপনি আরম্ভ করুন।"

বুঝিলাম, লোকটির গাহিবার ইচ্ছা আছে। তাহাকে নির্ব্বন্ধ করিয়া ধরিলাম। সে তখন একটিবার আকাশের পানে চাহিয়া, গাহিল—

"মায়ের কোলে যেতে হলে সবার ছোট হতে হয়,
কনিষ্ঠ থাকিতে কিরে জ্যেষ্ঠ ছেলে কোল পায়।"

সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত গর্ব্ব মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অনেক গান গাহিয়াছি, অনেক গান শুনিয়াছি, কিন্তু এমন সমস্ত প্রাণ দিয়া গান গাওয়া তো কখন গাহি নাই, কখন শুনিও নাই। সেই সন্ধ্যা হইতে যাহাকে কত রকমে না অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, একটা গানের দুটি ছত্রে যে সে তাহার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিশোধ লইয়া, অনেক অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া গেল। আপনি বড় হইতে গিয়া আমি প্রতিমুহূর্ত্তে মায়ের কোল হইতে যে আপনার চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছিলাম! এই অনুযোগটি যদি আর কিছুর ভিতর দিয়া আসিত, তাহা হইলে কিছুতেই তো ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিত না।

গানের মাঝখানে কখন যে নিমন্ত্রিতেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। সে যেন দেবমন্দিরে ধ্যানস্থ যোগীর সম্মুখীন হওয়া—পাছে পদশব্দে বা নিশ্বাস-বায়ুতে তাঁহার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেওয়া হয়।

আহারাদির পর, অন্য লোকের অসাক্ষাতে, তাঁহার নিকট কৃতকর্ম্মের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া বলিলাম—"আপনার গানে আমার শিক্ষা হয়েছে। এবার থেকে ছোট ছেলে হবার চেষ্টা করব।"

সেই নির্ঝরের মত মুক্ত উচ্ছ্বসিত হাস্যে আমার সমস্ত সঙ্কোচ ভাসাইয়া দিয়া, তিনি আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

৩

যাঁহারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সকালে আসিয়াই রাত্রিকালের সেই অতিথির খোঁজ করিলেন। সন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইলাম না। ভৃত্যেরা বলিল, তিনি খুব ভোরে বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে বিশেষ কাযের জন্য তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে, আপনারা যেন কিছু মনে না করেন।

কলিকাতার এ বাবুটির নাম সতীশবাবু। ইনি হাই-কোর্টে ওকালতি করেন। তিনি হাসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "আপনাদের এখানে এক মহাপুরুষের আগমন হয়েছিল, আপনারা জানতে পারেন নি।"

আমার মনের উপর কে যেন সজোরে এক ঘা চাবুক মারিল। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে মহাপুরুষ?"

তিনি বলিলেন, "যিনি 'ছোট ছেলের' গান গাচ্ছিলেন।"

আমার বন্ধু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই নাকি! কি রকম?"

আমার তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না।

তিনি বলিলেন, "ইনি একজন খুব উচ্চশিক্ষিত লোক। আগে প্রোফেসারি করতেন। হঠাৎ কি কারণে সংসার ত্যাগ করে' সন্ন্যাসী হয়ে যান। এঁর

গুণে আর ঐশ্বরিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে অনেক গৃহী ও সন্ন্যাসী এঁর শিষ্য হয়েছিলেন; বড় বড় শিষ্য মিলে ওঁর জন্যে কাশীতে এক সুন্দর আশ্রম তৈরি করে' দিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে ওঁর আশ্রমে আমি একবার গিয়েছিলাম। বাবা ওঁর সতীর্থ ছিলেন, তাঁর মুখেই এসব শুনেছি। হঠাৎ একদিন উনি বল্লেন—লোকের সেবা নিয়ে নিয়ে আমার মনে অহঙ্কার জন্মেছে—ভগবানের কাছ থেকে আমি অনেক দূরে এসে পড়েছি—এসব আর নয়। সেদিন থেকে আশ্রম উঠিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করেন। সেই থেকে সামান্য লোকের মত দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, আর চেষ্টা করেন কিসে কার একটু উপকার করতে পারেন। ওঁর বালকেরমত সরল স্বভাব ও সেবায় সবাই মুগ্ধ হয়, কিন্তু কেউ জানতে পারে না যে কতখানি শক্তি ও কি প্রাণ ওর ভিতরে লুকান আছে।"

গত রাত্রে যে পাচকটি পীড়িত হইয়াছিল, আজ উঠিতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল। রাত্রিকার ঠাকুর-মহাশয়ের সন্ধান লইতে আসিয়া যখন সে শুনিল যে তিনি প্রত্যুষেই চলিয়া গিয়াছেন, তখন সে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াই বলিল, "আহা ঠাকুরটি বড় ভাল লোক। সারারাত জেগে আমার সেবা করেছেন।"

এই লোককে দিয়া যে কায করাইয়া লইয়াছি, আর ইঁহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা নিজের কাছেও মনে করিতে লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তবে তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভরসায় ছোট ছেলে হইবার শিক্ষাটুকু সম্বল করিয়া সেই দিন হইতে জীবনের পথে বাহির হইলাম।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

আন্‌মনা

আমি যখন মণির ঝালর বুনি
তোমরা তখন কাঠ কাটিতে ডাকো,
আমি যখন বুকের মোহর গুণি,
তোমরা তখন দ্বার খুলিতে হাঁকো।

আমি যখন চিত্রশালায় বসি
অমিতাভের ধ্যানের ছবি আঁকি,
তোমরা এখন দ্বারের কাছে আসি
আঁধার করে দাড়াও আমার আঁখি।

তুলছি যখন ফুলটি আপন মনে
কল্পনারি শালের হাঁসিয়াতে,
তোমরা আমায় জোর করিয়ে টেনে
কাস্তে থালা দেবেই দেবে হাতে!

আমি যখন তাজমহলের মাঝে
পাথর কেটে বসাই জহরৎ,
তোমরা তখন ডাকছো আপন কাযে
গাঁথতে 'গাঁড়া'র ঠুনকো ইমারৎ।

ছুটছি যখন শাঁখের ডাকের আগে,
পিকের কুহু, শ্যামার শিষের শিরে,
তোমরা তখন ব্যগ্র অনুরাগে
পিঞ্জরেতেই ডাকছো ফিরে ফিরে।

চুমুক দিয়ে চাঁদের সুধা পিয়ে
আমি যখন নেশায় থাকি ভোর,
আমায় কেন জাগাও আঘাত দিয়ে?
ভাঙাও কেন অসীম সুখের ঘোর?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বোম্বাই-পথে

২৬শে আগষ্ট। বোম্বাই যাইতে হইবে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—সেই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই ঘরের 'লক্ষ্মী' ছাড়িয়া সুদূর আরব সাগরের তটভূমিতে চলিয়াছি।

এবারে বোম্বাই সহরে জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশন (Special Session of the Indian National Congress) হইবে। "রথ দেখা ও কলা বেচা" দুইই হইবে, তাই আজই রওনা হইব। শুনিলাম ডেলিগেটদের জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করা আছে—ডেলিগেসন ফী, টিকিটের মূল্য, সর্ব্বসাকুল্য ৩০৷৷৴০ খরচে তাঁহারই টিকিট কিনিলাম।

১২-৪ মিনিটে বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের বোম্বে মেল ছাড়ে। যে লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তিনি একটু বিমর্ষ। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে অবরোধ প্রথা নাই, তাই বোধ হয় তাঁহার একটু ভয়ের কারণ হইয়াছিল (বাঙ্গালী গৃহলক্ষ্মী মাত্রেই নিজ স্বামীকে অপরের নিকট একটি লোভনীয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন)। মেয়ে—একটি বড় পুতুল পাইলেই খুসী হইবে বলিল।

একখানি ঠিকা গাড়ীতে বীরদর্পে ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। আশা ছিল যে রিজার্ভ গাড়ীতে বড় আরামেই যাইতে পারিব। ষ্টেশনে আসিয়া, একেবারে চক্ষু স্থির! লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে! আর খুঁজিবার অবসর নাই। পার্শ্বের কামরায় (ইহাতে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় ৮ জন লোক ধরিতে পারিবে) উঠিলাম। ভায়া সঙ্গে ছিল। তাহাকেও আপাততঃ আরোহীশ্রেণীভুক্ত করিয়া (এইরূপ আরও দুই এক জন আরোহী অস্থায়ী ভাবে স্থানাবরোধ করিয়াছিলেন) মোট ১২৷১৩টি প্রাণী সেইটী দখল করিয়া বসিলাম। ট্রেণ ছাড়িবার সময় নয় জন রহিলাম—হিসাবে একজন বেশী। দুইটী রাত্রি কাটাইতে হইবে বলিয়া মনে একটু আতঙ্ক হইল। যাহা হউক, স্থির হইয়া বসিয়া সকলের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। জানালার পাশে বসিয়া ১নং 'হ'—বাবু—বয়সে প্রবীণ এবং একজন নামজাদা দেশহিতৈষী। তাঁহার পাশেই 'জ'—বাবু; ইনি কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছেন; অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি—আকারসদৃশপ্রাজ্ঞঃ। আর একটী 'কু'—বাবু—ইঁহারা তিন জনেই গোঁড়া হিন্দু; ফল মূল ও দই চিড়া খাইয়াই কাটাইবেন সংকল্প করিয়াছেন। অপর কয়জন 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের। ইঁহাদের মধ্যে 'কি'—বাবুর সহিত কিছু আলাপ হইল।

দলের গোদা মহাশয়গণ এক একবার আসিয়া খোঁজ লইয়া গেলেন। ভীমরবে 'বন্দে মাতরম্' শব্দের মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে 'গী'—বাবু আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিয়া গেলেন। তিনি পাশের কামরায় উঠিয়াছেন।

গাড়ী হুহু শব্দে চলিতেছে। দুই পাশে, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই জল আর ধানের ক্ষেত। এদিকে ধান মন্দ হয় নাই। ক্রমে রূপনারায়ণ পার হইলাম। আমরা জলের দেশের লোক, কাযেই "ধান্যবৃক্ষ" প্রভৃতি আমাদের নিকট নূতন নয়।

খড়্গপুর হইতে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন আরম্ভ। মেয়েদের অনেকটা উড়িয়ার মত দেখা যাইতেছে। তার পরই ক্রমে চারিদিকে ছোট ছোট শালগাছ ও লাল মাটী, ক্রমে বিশাল শালবন ও দূরে ছোটনাগপুরের পাহাড়গুলি দেখা দিতে লাগিল। আবাদ অতি কম। ক্রমে পাহাড় নিকটে আসিতে লাগিল। গিধনি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ঘাটশিলায় উপস্থিত হইলাম। ঘাটশিলা একটী রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থান। আজকাল অনেক ভদ্রলোক এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। গলুঠীতে একটু চা পান করিয়া শরীরটাকে তাজা করিয়া লইলাম। তাকাইয়া দেখি, 'গী'—বাবু সবেগে কি যেন কতকগুলি গিলিয়া ফেলিতেছেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, তাঁহার আর চা পানের অবসর হইল

না। সন্ধ্যার সময় চক্রধরপুরে পৌঁছিলাম। সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে ডিনার অথবা কারিভাত (Rice and Curry)-এর সদ্ব্যবহার করিয়া আসিলেন। আমাদের গোঁড়া বন্ধুগণ দই এবং চিঁড়া সহযোগেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। আমার সঙ্গে কিছু পুরী, আলুর দম ও মিষ্টান্ন ছিল। কোনও বভুক্ষু বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণের ভয়ে আমি তাহা একটী ট্রাঙ্কের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। অন্ত সকলের আহারাদির সময় আমি প্রশ্নাদির ভয়ে স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে আর বিপদের ভয় নাই তখন শান্তভাবে আসিয়া বাক্স খুলিলাম—রসগোল্লার রসে আর আলুর দমের ঘি হলুদে ছুটী জামা খেশ রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে!

এইবার শয়ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গুণতিতে একজন বেশী ছিলাম। তখন সে কথা উল্লেখ করিতেই সঙ্গীদের সকলেরই দেশভক্তি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে. শয়নের কষ্টের বিষয় আমি ভাবিতেছি মনে করিয়া বড়ই লজ্জা বোধ করিয়াছিলাম। কাযেই প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হইল। আহারের সময় আমার ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগে বন্ধুগণ সকলেই আপন আপন বিছানা করিয়া লইয়াছেন! আর কি করি, আমি আমার দুইটী ট্রাঙ্ক একত্র করিয়া বাথরুমের দরজার সম্মুখে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিলাম :

২৭শে আগষ্ট। প্রভাতের সহিত চারিদিকে আবার বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র। অথচ মাঝে মাঝে সিমেণ্ট করার মত সমস্ত ক্ষেত কেবল পাথর দিয়া ঢাকা। পাহাড় ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। মধ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি। অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। ক্রমে ট্রেণ রাইপুরে উপস্থিত হইল। এইখানে একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া ডাক বাক্সে দিতে গিয়া প্রথম "টঙ্গা"র সহিত সাক্ষাৎ হইল।

সকলে মহানন্দে চা পানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রকাণ্ড চায়ের বাটী, আমরা অর্দ্ধেকও শেষ করিতে পারিলাম না। কিন্তু 'সী'—বাবু বলিলেন, "পয়সা দেওয়া গেছে, কিছু উশুল করতে চেষ্টা করা যাক।" এই বলিয়া কতকগুলি রুটী মাখন এবং ঐ আসুরিক বাটির দুই বাটি চা শেষ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তভাবে গাড়ীতে উঠিলেন। ক্রমে ট্রেণ দ্রুক (Drug) ছাড়াইয়া গেল। চারিদিকে দূরে, এবং অবশেষে নিকটেই, পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল। রাজনগাঁও অতিক্রম করিলাম—একটী সুন্দর সহর। অবশেষে ট্রেণ ডোঙ্গারগড়ে আসিয়া থামিল। নাম বটে! এই কি সেই রামায়ণ-বর্ণিত ভীষণ দণ্ডকারণ্য? এই ভীষণ অরণ্যানীর ভয় দেখাইয়া সীতা দেবীকে নিরস্ত করিতে গিয়াই কি শ্রীরামচন্দ্র কোমলা হিন্দু রমণী নিকট অপদস্থ হইয়াছিলেন? নীচে নামিয়া আমরা চারিদিকের বিশাল পাহাড়শ্রেণী দেখিতে লাগিলাম। এটী খরিয়াগড়ের রাজার সম্পত্তি। যেমন পাহাড় তেমনি জঙ্গল। অসংখ্য বন্যজন্তুও আছে শুনিতে পাইলাম। প্লাটফর্ম্মে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি রেলে কায করেন। তিনি বলিলেন যে এই ষ্টেশন হইতে কিছু দূরেই একটী প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ (Tunnel) এবং তাহার পরেই একটী প্রকাণ্ড জলপ্রপাত দেখা যায়। তাঁহার কথা শেষ না হইতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

১৫।২০ মিনিট পরে টানেলে প্রবেশ করিলাম। সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে গাড়ী চলিতে লাগিল। যেমন 'অন্ধকার হইতে আলোকে' আসিলাম, অমনি ডানদিকে এক সুন্দর জলপ্রপাত, সে এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। বহু উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বিশাল জলস্রোত পাহাড়ের গায়ে লাফাইয়া পড়িতেছে এবং কোটি কোটি হীরক খণ্ডের আকারে সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ট্রেণ এই দেবদুর্ল্লভ দৃশ্য অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

ট্রেণ গোন্দিয়াতে উপস্থিত হইল। এখানে স্নান করিয়া লইব বলিয়া সকলে নামিয়া পড়িলাম। মাত্র একটি কল। এমন ভীড় যে অনেকের 'কাক-স্নান' হইল—অনেকের তাহাও হইল না। আমি

আরও দূরে একটা কলের দিকে চলিলাম। "গী"—বাবুও সঙ্গে চলিলেন। স্নান শেষ করিতে সময় হইয়া গেল। উভয়ে ট্রেণের দিকে ছুটিলাম। একটু দূর গিয়াই "গী"—বাবু হাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়িতে তাঁহার কামরা ছাড়াইয়া গিয়া আবার আমাদের কামরাতেই উঠিয়া পড়িলেন। তখন আমাদের 'গোঁড়া' বন্ধুরা চিড়া ও গুড়ের সাহায্য মাধ্যাহ্নিক ভোজনের চেষ্টায় ছিলেন। দেখিয়াই "গী" বাবু "শস্তঞ্চ গৃহমাগতং" বলিয়া অমনি বসিয়া পড়িলেন। প্রায় তিন জনের "শস্য" একাই গৃহ অথবা গুহাগত করিয়া, তিনি উঠিয়া হাত মুখ ধুইলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে এ সুদীর্ঘ যাত্রায় তাঁহাকে অনাহারেই মরিতে হইবে। এ দিকে গম্ভীর প্রকৃতি "জা"—বাবু প্লাটফর্ম্মে নামিয়া দার্শনিকের মত নিবিষ্ট মনে একটা আম খাইতেছিলেন, এমন সময় গাড়ী ছাড়িবার বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দরজার নিকটেই ছিলেন, আমটিকে মুখে করিয়াই সেই বিশাল ভুঁড়িটাকে কষ্টেসৃষ্টে গাড়ীতে ঢ কাইলেন, কিন্তু তাঁহার আবরণের কতক অংশ রাখিয়া আসিতে হইল। এদিকে আমের রসে বুক ভাসিয়া যাইতেছে! লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ যখন বানর সৈন্য চিবাইয়া খাইয়াছিলেন, তাঁহারও বোধ হয় এই রূপ আকৃতি হইয়াছিল। চারিদিকে একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল; এমন কি প্রবীণ "হ"—বাবুর পাকা গোঁফের ভিতর দিয়া একবার সেই শ্বেত দন্তপংক্তির অংশ বিশেষ উঁকি দিয়াছিল! লজ্জিত হইয়া "জা"—বাবু আমটি ফেলিয়া দিয়া, গামছা দিয়া হাত মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন! একেই তিনি স্বল্পভাষী, তারপর এই ঘটনা। তিনি একেবারেই নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

রৌদ্র উঠিয়াছে। মাঠে কৃষকেরা (কৃষক অপেক্ষা কৃষকপত্নীই অধিক) কায করিতেছে। প্রায় সকলেরই পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী, কিন্তু কাছা দিয়া পরা। সমস্ত মধ্যেপ্রদেশেই এই একই রকম শাড়ী এবং একই রকম পরা।

তোরোয়া ষ্টেশনে দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে এত ভীড় যে, বাপ গাড়ীতে উঠিয়া গেল, অথচ ১২।১৩ বৎসরের ছেলে উঠিতে পারিল না। চলন্ত গাড়ী হইতে এক রেল পুলিশ তাহাকে ছিনাইয়া নামাইয়া লইল। দৃশ্যটী বড়ই করুণ, কিন্তু উপায় ছিল না। সময় থাকিলে তাহাকে আমাদের কামরায় উঠাইয়া লইতে পারিতাম।

কানাহান জংশন অতিক্রম করিয়া ট্রেণ চলিল। কানাহান একটা বড় রকমের সহর, দেখিতে বেশ সুন্দর। একটা স্কুলে, মেয়ে ও ছেলেরা এক সঙ্গেই পড়িতেছে দেখিলাম। ক্রমে কাম্‌টি ছাড়াইয়া, ট্রেণ মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর সহরে উপস্থিত হইল।

নাগপুর একটা বড় সহর। পুরাতন সহর ডান দিকে, আর বাঁ দিকে একটি বিস্তৃত জলাশয়ের অপর পারে প্রাডক্ টাউনের সুন্দর অট্টালিকা গুলি ছবির মত দেখাইতে লাগিল। সহরের মধ্যেই অনেক কমলালেবুর বাগান।

এখান হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার লাইন আরম্ভ। সেই মাঠ, সেই ভুট্টা ও কার্পাসের চাষ, সেই একই দৃশ্য। পুলগাঁও-এর নিকট প্রায় ৫০টি হরিণ একত্রে চরিতেছে দেখিলাম। আরও আশে পাশে ২।৪টি হরিণ দেখা গেল। বামে দক্ষিণে ছোট বড় পাহাড়, বিশেষ ডান দিকে একটি প্রকাণ্ড দেওয়ালের মত বহুবিস্তৃত পাহাড়। এইটিই প্রসিদ্ধ বিন্ধ্য পর্ব্বত। উচ্চতা দেখিয়া কিছুতেই মনে হয় না যে, এই পর্ব্বত পাছে সূর্য্যের গতি অবরোধ করে সেই ভয়ে মহামুনি অগস্ত্যকে শিষ্যের সহিত প্রতারণা করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিস্তৃতির তুলনায় তাহার উচ্চতা নিতান্তই অল্প। রাস্তার দুই পার্শ্বেই বহু ছোট বড় গ্রাম। কোথায়ও বা হাট বসিয়াছে। হাটে পুরুষের চাইতে মেয়েই যেন বেশী। সমস্ত মেয়েই কাছা দিয়া শাড়ী পরিয়াছে।

৬-৪০ মিনিটে সূর্য্য অস্ত দেখিয়া বুঝা গেল যে বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি।

সুখে দুঃখে এ রাত্রিও কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘুম একেবারেই হইল না। আমাদের কয়েকটী প্রবীণ বন্ধু দই চিঁড়ার সাহায্যে দুই দিন হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণ "হ"—বাবু জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িলেন।

ট্রেণ মনোমদ ষ্টেশনে পৌছিল। তখনও অন্ধকার যায় নাই। চারিদিকে অস্পষ্ট শৈল শ্রেণী দেখা যাইতেছে। বুঝিলাম, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতেছি। পুরাণ বর্ণিত পবিত্র গোদাবরী নদী পার হইয়া নাসিকে উপস্থিত হইলাম। এই গোদাবরী ও নাসিকের সহিত হিন্দুর কত স্মৃতি জড়িত আছে। এই নাসিকেই শূর্পনখার প্রতি সেই বর্ব্বরতামূলক কাপুরুষতার ঘটনাতেই রামায়ণকার লক্ষ্মণের দেবচরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন।

২৮শে আগষ্ট। একটু শীত বোধ হইতেছিল। নাসিক সহর এখান হইতে প্রায় ৩ মাইল দূর। ট্রাম লাইন আছে। সাগর-সমতল হইতে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির (plateau) উপর অবস্থিত এই বিশাল সহর জল বায়ু ও সৌন্দর্য্যে, দাক্ষিণাত্যের রাণী (Queen of the Deccan) পুনা হইতে বড় কম নহে। এখান হইতেই ঘাট পর্ব্বতের রমণীয় দৃশ্যরাজি আরম্ভ হইল। বর্ষার সময় পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের দৃশ্য অবর্ণনীয়। ক্রমে ট্রেণ এক স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিল। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল লাইনেও গিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোথাও উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে ধূমের মত মেঘ উঠিতেছে, আবার নিম্নে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল উপত্যকায় গো মেষাদি চরিতেছে, কোথাও বা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী কলকল নাদে উপত্যকার দিকে ধাবিতা; আবার কোথাও বা বহু উচ্চ হইতে ভীষণ হুঙ্কার শব্দে বিরাট জল-প্রপাতের সৃষ্টি করিতেছে।

ক্রমে ট্রেণ ইগাতপুরী আসিয়া পৌছিল। এখান হইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল পথ অনন্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। আট দশটী ছোট বড় টানেল ও ভায়াডাক্ট দিয়া ট্রেণকে যাইতে হয়। এই সৌন্দর্য্য বর্ণনার বিষয় নয়, অনুভবের সামগ্রী। যেন প্রকৃতি দেবী আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই জানলার পাশে গিয়া নানারূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন কি স্বল্পভাষী "জা"-বাবুও পূর্ব্ব দিনের ঘটনা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া একেবারে কবি হইয়া উঠিলেন। এই অনন্ত অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে ছোট ছোট তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট ছবির মত গ্রামগুলি যেন এক মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল। ক্রমে দূর হইতে তাল বৃক্ষের শ্রেণী সমুদ্রের সান্নিধ্য বুঝাইয়া দিতে লাগিল। ট্রেণ কল্যাণে আসিয়া থামিল।

কল্যাণ বোম্বাই হইতে ৩৪ মাইল দূরে। সম্মুখেই প্রকাণ্ড পার্শিক পর্ব্বত উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের গাড়ী সেই পাহাড়ের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের গা দিয়াই একটি বিস্তৃত নদীর ন্যায় দেখা গেল। মনে মনে ভাবিতেছি রেল লাইন কোথা দিয়া গিয়াছে; অমনি গাড়ী একেবারে পাহাড়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ পার্শিক টানেলে প্রবেশ করিল। প্রায় ১॥ মিনিট সূচিভেদ্য অন্ধকারে সেই সুড়ঙ্গ অতিক্রম করা হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই টানেল দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয়। কোয়েটার নিকট একটী সুড়ঙ্গ প্রায় ২ মাইল লম্বা—এটি প্রায় এক মাইল। এই এক মাইল আস্ত পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ্গ করিয়া, ৪ বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিরাট টানেল যে প্রস্তুত হইয়াছে।

পরের ষ্টেশন থানা—একটী সহর। বোম্বাই হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী। এখন চারিদিকেই ছোট বড় গ্রাম—আর সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। ট্রেণ নামিতেছে। ক্রমে ট্রেণ ঘাটকোপার আসিয়া পৌছিল। বুঝিলাম, পশ্চিমঘাট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দাক্ষিণাত্যের উচ্চ মালভূমির সহিত বোম্বাই দ্বীপ ও কঙ্কণ প্রদেশ যোগ করিবার

জন্য দুইটী লাইন আছে। একটী এই Thal Ghat Incline আর একটী Bhoar Ghat Incline—এটী বোম্বাইকে পুনার সহিত যোগ করিয়াছে। দুইটি, বিশেষতঃ শেষেরটী স্থাপত্য বিদ্যার গৌরবস্থল। দুইটাতেই সাধারণ প্রকাণ্ড ব্রড গেজ ডবল লাইনের ট্রেণ ২০০০ ফিট পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

কুরলা অতিক্রম করিয়া ট্রেণ বোম্বাই সহরে প্রবেশ করিল। বোম্বাই এখন নামেমাত্র দ্বীপ—'কুরলার' নিকট অল্প পরিসর এবং অগভীর সাগর শাখা একেবারে বন্ধ করিয়া ইহাকে বৃহত্তর সালসেট্ দ্বীপের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং থানার নিকট সালসেট দ্বীপকে ভারতবর্ষের সামিল করিয়া লওয়া হইয়াছে। সহরের মধ্যেই ১০।১২টী ষ্টেশন।

প্রায় ১০টার সময় ট্রেণ ভিক্টোরিয়া টার্মিনসে পৌছিল। এত বড় ও এত সুন্দর ষ্টেশন নাকি ভারতবর্ষে আর নাই। দেখিবার আর সময় ছিল না। বহু ভলান্টীয়ার উপস্থিত ছিল। তাহারা আমাদের মালপত্র নামাইয়া লইল। একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের দিকে চলিলাম। চারিদিকেই প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা। গাড়ী গিরগাঁও রোড দিয়া চলিল। সকলেই অবাক হইয়া আমাদের দিকে চাহিতেছে—খালি মাথায় মানুষ থাকিতে পারে ইহা বোধ হয় তাহাদের বুদ্ধির অগোচর।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

শিবাজী ও আফজল খাঁ

দিল্লীর ময়ূরসিংহাসন লাভ করিবার জন্য যখন সম্রাট্পুত্র আরাঙ্গেব ক্ষিপ্রগতিতে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন বিজাপুর নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দীর্ঘ দিনের রণকোলাহল তখন স্তব্ধ হইয়াছে, সুলতানজননী বারি সাহেবা তখন স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, রাজমন্ত্রী খাওয়াস খাঁর সাহায্যে বিজাপুর শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজমাতা আদেশ করিলেন, যেরূপেই হউক রাজদ্রোহী দুর্দ্ধর্ষ শিবাজীকে দণ্ড দিতেই হইবে। শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুরের জায়গীরদার ছিলেন। তখনও বিজাপুরের রাজকারাগারের স্মৃতি তিনি বিস্মৃত হন নাই, নয় বৎসর পূর্ব্বে যেরূপে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তিনি রাজদরবারে আনীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনেই ছিল। রাজমাতা তাঁহাকেই আদেশ করিলেন—তোমার দুর্দান্ত পুত্রকে শাসন কর।

শাহজী অসম্মত হইলেন। পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্য সে অসম্মতির কারণ ছিল না—পুত্রের প্রতি স্নেহের অভাব এবং উপযুক্ত কর্ত্তৃত্বের অভাব তাহার কারণ ছিল। শিবাজী যে পিতৃদ্রোহী ছিলেন তাহা নহে; কিন্তু শাহজী জানিতেন যে নবীন রূপ ও নবীন যৌবনের কুহকে পড়িয়া তিনি শিবাজীর মাতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবং মাতা ও পুত্রের কোন সংবাদ রাখিতেন না। পতিপরায়ণা সন্ন্যাসিনী জিজাবাঈ শিবাজীকে লইয়া নির্জ্জনে বাস করিতেন। শিবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি পতির উপেক্ষা ভুলিতে চেষ্টা করিতেন। শিবাজী তখন নিঃসঙ্গ ছিলেন। মাতৃসেবা তখন তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল, মাতৃপূজা শিবাজীর হৃদয়ে দেবী-পূজার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। মাতার প্রতি পিতার ব্যবহার দেখিয়া শিবাজী মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কখনও সে বিষয়ে পিতার সহিত

আলোচনায় নিযুক্ত হন নাই। শিবাজীর হৃদয়ে পিতৃ-ভক্তির অভাব ছিল না। তাঁহার সেনাগণ তাঁহার ইঙ্গিতে প্রাণপাত করিত, পেশোয়া শ্যামরাজ নীলকান্ত, মজুমুয়াদার বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, দবির রঘুনাথ প্রভৃতি বিচক্ষণ অমাত্যগণ তখন শিবাজির পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁহার অমিতবিক্রম মাউলি সেনা তখন হেলায় তোর্ণা দুর্গ অধিকার করিয়াছিল, রাজভাণ্ডার লুঠিয়া লইয়াছিল, তাঁহার নবনির্ম্মিত দুর্গ রাজগড় তিনটি প্রাচীরে সুরক্ষিত হইয়া তখন শৈলশিরে চিত্রলেখার মত দেখা যাইতেছিল। চাকান দুর্গ তখন তাঁহার চরণলগ্ন হইয়াছিল—পিতার জায়গীরের পশ্চিমাংশ ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল,—কোন্দন দুর্গ, পুরন্দর দুর্গ, প্রভৃতি তখন 'জয়তু শিবাজি' রবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। পুনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ পূর্ব্ব হইতেই শিবাজীর অধীনে ছিল, এখন দক্ষিণ দিকের গিরিদুর্গগুলি অধিকার করিয়া শিবাজি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া তুলিলেন।

শিবাজী যখন এইরূপে রাজ্যবিস্তার করিয়া দিনে দিনে বিজাপুর সুলতানকে হৃতগৌরব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হইয়া লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। শিবাজী তখন সসৈন্যে দক্ষিণ কঙ্কণ প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কল্যাণ ও ভিমরি নগর তখন বিলুণ্ঠিত হইল—দেখিতে দেখিতে বর্ত্তমান থানা জেলার কতক অংশ শিবাজীর অধীনে আসিল—উত্তর কঙ্কণে তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। বিজয়লক্ষ্মী যখন এইরূপে শিবাজীর অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিজাপুরের সুলতানের আদেশে শাহজী বন্দী হইলেন।

শিবাজী প্রমাদ গণিলেন—একদিকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয় এবং বিজাপুরের লাঞ্ছনা, অন্যদিকে কারাবাসে পিতার নির্য্যাতন। কর্ত্তব্য স্থির করিতে মুহূর্ত্তও লাগিল না। শিবাজি পদ, প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্য শাসনের আশা ত্যাগ করিয়া পিতার উদ্ধারের উপায় নিরূপণ করিতে লাগিলেন। বিজাপুরের সহিত যে যুদ্ধ কলহ চলিতেছিল তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্ধ করিলেন। এই ভাবে ছয় বৎসর কাটিল। এই দীর্ঘকাল শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। মোগল সেনা বিজাপুর প্রদেশ উপক্রুত করিয়া কখনও সুলতানকে এবং কখনও বা শিবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরাঙ্গেব দাক্ষিণাত্য হইতে প্রস্থান করিলে পর বিজাপুরের রোষ শিবাজিকে দগ্ধ করিবার জন্য জিহ্বা মেলিল। শাহজী বলিলেন, "আমি শিবাজীকে দণ্ড দিতে পারিব না—তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, শিবাজীকে দণ্ড দিবার জন্য রাজমাতা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।" রাজমাতা কহিলেন, তবে সেনা সজ্জিত হউক—শিবাজীকে পিষিয়া মারিতে হইবে।

আদেশ প্রদান যত সহজ, আদেশ প্রতিপালন তেমন সহজ নহে। বিজাপুরের আমির ওমরাহগণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিক চাহিতে লাগিলেন। পশ্চিমঘাট প্রদেশের দুর্ভেদ্য বনশ্রেণী কে অতিক্রম করিবে—দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে কে আরোহণ করিবে—শিবাজীর দুর্দ্দান্ত মাউলি সৈন্যের চাতুরীজাল কে ভেদ করিবে? কেহই সহজে সম্মত হইতে চাহিল না—শিবাজীর বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিতে কেহই অগ্রসর হইল না।

রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর আমির আবদুল্লা ভাটারি শেষে বলিলেন—কেহ না যায় আমিই যাইব। বিজাপুরে সাজ সাজ রব উঠিল—দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া আবদুল্লা ভাটারি ওরফে আফজল খাঁ শিবাজীকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যাত্রাকালে রাণীমাতা আফজল খাঁকে নানা উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। কহিলেন—শিবাজীর সহিত বন্ধুতার ভাণ ["Pretending friendship"] করিয়া তাহাকে কহিও যে, সুলতান আদিল শাহ তাহাকে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিবেন। তাহার পর সুবিধা বুঝিয়া হয় তাহাকে "হত্যা" করিও, না হয় বন্দী করিও।

আফজল খাঁ সগৌরবে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় রাজসভায় বলিলেন—চিন্তা কি, আমি যেমন



শিবাজী

নাইব অমনি শিবাজীকে ধরিয়া আনিব, একবার ঘোড়া হইতে নামিবও না! মুখে তাঁহার যে ভাব ছিল, অন্তরে সেরূপ ছিল না। তিনি তাই সম্মুখ সমরে সফলতার উপর সম্যক্ আস্থা স্থাপন না করিয়া, চক্রান্তের আশ্রয় লইলেন!

আফজলের সেনা বিজাপুর হইতে তুলজাপুরে আসিল। মহারাষ্ট্রদেশের প্রধান তীর্থ ভবানীমন্দির তুলজাপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান সেনা সে মন্দির ধ্বংস করিল—ভোসলা বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির রেণু রেণু হইয়া পবনে উড়িয়া গেল। যে যাঁতায় ভবানী দেবীর শ্রীমূর্ত্তি নিষ্পিষ্ট হইয়া ধূলিতে পরিণত হইল, তাহার ঘর্ঘর নিনাদে মারাঠার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল বটে, কিন্তু শিবাজী মুসলমান-সমরে অগ্রসর হইলেন না। আফজল মনে করিয়াছিলেন যে তিনি বাজের মত পুনার উপর পতিত হইবেন; কিন্তু সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন, কারণ শুনিলেন শিবাজী রাজগড় পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রতাপগড়ে আশ্রয় লইয়াছেন।

আফজল প্রতাপগড়াভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে যে সকল দেবমন্দির ছিল সে সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল—মানিকেশ্বর, পান্ধারপুর এবং মহাদেবের ব্রাহ্মণগণ আফজলের সেনাকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইলেন। কিন্তু শিবাজীর সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিল না। আফজল তখন ওয়াই নামক স্থানে ছাউনি করিয়া নিকটবর্ত্তী দেশমুখদিগকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে লাগিলেন। সকলকেই বলিলেন, শিবাজীকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কারের অবধি থাকিবে না।

শিবাজীকে ধরিবার জন্য এই সকল ষড়যন্ত্র করিয়া আফজল খাঁ তাঁহার নিকট দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দূত কৃষ্ণজি ভাস্কর শিবাজীর নিকট গিয়া জানাইল যে, আফজল খাঁ বলিয়াছেন শিবাজীর পিতা চিরদিন আফজল খাঁর পরম বন্ধু। (এইখানে বলিয়া রাখি যে আফজল খাঁই নয় বৎসর পূর্ব্বে শিবাজীর পিতাকে বন্দীকৃত অবস্থায় বিজাপুর দরবারে আনয়ন করিয়াছিলেন।) সুতরাং শিবাজী তাঁহার অপরিচিত নহেন। শিবাজী যাইয়া আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই, আফজল খাঁ সুলতান আদিল শাহের সম্মতি সংগ্রহ করিয়া শিবাজীকে কঙ্কণ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং শিবাজী যে সকল দুর্গ অধিকার করিয়াছেন, যাহাতে তিনি সেগুলি পান তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। শুধু ইহাই নহে। আফজল খাঁ জানাইলেন যে, শিবাজি যাহাতে রাজসম্মান ও নানা অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন, আফজল খাঁ তাহাও করিবেন। শিবাজী যদি রাজদরবারে উপস্থিত হইতে চাহেন তাহা হইলে সেখানেও যে তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইবেন তাহাও জানান হইল। ইহাও বলা হইল যে, শিবাজীর ইচ্ছা না থাকিলে, যাহাতে দরবারে যাইতে না হয়, তাহাও করা হইবে।

আফজল খাঁর শঠতার পরিচয় দিবার জন্য ইহার অধিক বলিবার আর প্রয়োজন হয় না। শঠের সহিত শঠতাই রাজনীতি। তাহা পালন করিলে তজ্জন্য কাহাকেও অপরাধী করা চলে না। শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহার ললাটে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সমরনীতি অবলম্বন না করিয়া এরূপ অবস্থায় আফজল খাঁকে নিহত করায় শিবাজি শুধু রাজনীতির আদেশই পালন করিয়াছিলেন।

ইতিহাস এইখানেই নীরব হয় নাই। আফজল খাঁ কেন নিহত হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে।

আফজল খাঁর শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া শিবাজীর সেনা প্রথমে ভীত হইল। বিজাপুর হইতে ওয়াই পর্য্যন্ত আফজল খাঁ বিজয়ের পর বিজয় লাভ করিতে করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া, তাহারা এতই চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ শিবাজিকে অনুরোধ করিতে লাগিল। শিবাজি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। যদি সন্ধি করেন তাহা হইলে প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে—চিরদিন বিজাপুরের দাস হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এতদিনের উদ্যম, এত শোণিতপাত, এত শ্রম—সকলই মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হইয়া যাইবে—লাভ হইবে শুধু দাসের শৃঙ্খলভার। যদি যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে বিজাপুর চিরশত্রু হইবে—কি সুলতান, কি দিল্লীর বাদশাহ, সকলের সহিতই চিরজীবন সমরে লিপ্ত হইয়া রুধিরসিক্ত রণাঙ্গনে কাল কাটাইতে হইবে—শিবাজী দিব্যচক্ষে তাহাও দেখিতে লাগিলেন। সেনা ও সেনাপতিগণ এক বাক্যে বলিতে লাগিল—যুদ্ধ নহে, সন্ধি। চিন্তা করিতে করিতেই সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতের তরুণ তপন যখন নবজীবন লইয়া পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল, তখন শিবাজী দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন—সন্ধি নহে, যুদ্ধ—দাসের শৃঙ্খল অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। শিবাজী তখন তাঁহার জীবন্ত দেবতা মাতার চরণধূলি লইয়া, সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

আফজল খাঁর দূত কৃষ্ণ ভাস্করের সহিত যখন সাক্ষাৎ হইল, শিবাজী তখন তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিলেন

এবং কহিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি পুরোহিত, আপনি হিন্দু—সত্য করিয়া বলুন আফজল খাঁর মনে কি আছে?

দূত সকল কথা প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু শিবাজীকে বুঝিতে দিলেন যে, আফজল খাঁর উদ্দেশ্য ভাল নহে। শিবাজী তখন দূতের সহিত নিজের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর গোপীনাথ পন্তকে আফজল খাঁর নিকটে প্রেরণ করিলেন। কহিলেন, যদি মিয়াসাহেব প্রতিজ্ঞা করেন যে শিবাজীর অনিষ্ট করিবেন না, তাহা হইলে শিবাজি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। আফজল খাঁর সেনাবল কত এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিবার জন্যও গোপীনাথ আদিষ্ট হইলেন।

গোপীনাথ আফজল খাঁকে জানাইলেন যে, শিবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকালে শিবাজী তাঁহার অনিষ্ট করিবেন না, এবং আফজল খাঁও জানাইলেন যে তিনিও শিবাজির অনিষ্ট করিবেন না। কিন্তু গোপীনাথ উৎকোচ প্রদানে আফজল খাঁর পার্শ্বচরদিগকে বশীভূত করিয়া জানিয়া আসিলেন যে, ধূর্ত্ত শিবাজিকে সম্মুখ সমরে ধৃত করা সম্ভব নহে, তাই এরূপ আয়োজন হইয়াছে যে, যখন উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে তখন আফজল খাঁ শিবাজীকে বন্দী করিবেন।

আফজল খাঁর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপীনাথ শিবাজীকে সকল সংবাদ জানাইয়া কহিলেন, খাঁর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে নিহত করিয়া, তাহার সৈন্যদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করা উচিত। গোপীনাথের নিকট সকল সমাচার অবগত হইয়া শিবাজী এরূপ ভাব করিলেন, যেন ওয়াইয়ে আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইতেছে না। খাঁ যদি স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করেন যে শিবাজীর অনিষ্টসাধন করিবেন না এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, তাহা হইলে তিনি প্রতাপগড়ের সন্নিকটে কোন স্থানে খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আফজল খাঁ তাহাই স্বীকার করিলেন।

প্রতাপগড় হইতে ওয়াই পথ ঘনবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। সেই দুর্ভেদ্য বন কাটিয়া পথ প্রস্তুত হইল এবং আফজল খাঁর পথশ্রান্ত সেনাদিগের জন্য নানাস্থানে শিবাজী আহার্য্য ও পেয় রক্ষিত করিলেন। আফজল খাঁ যখন আসিয়া প্রতাপগড়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন স্থির হইল যে, পরদিন প্রতাপগড়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে পর্ব্বতের একটি উচ্চ স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিবে।

শিবাজীর আদেশে তখন সেই বনপথের উভয় পার্শ্বে এবং দরবারের নিকটবর্ত্তী স্থানে সুদক্ষ সেনা লুক্কায়িত হইয়া রহিল। শিবাজী যে পটাবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর তখন বহুমূল্য চন্দ্রাতপ শোভা পাইল—মূল্যবান গালিচা প্রভৃতি বিস্তৃত করিয়া শিবাজী তখন দরবারের স্থানকে আফজল খাঁর রাজকীয় মর্য্যাদার যোগ্য করিয়া সুসজ্জিত করিলেন।

যখন আফজল খাঁর আসিবার সময় হইল, শিবাজী তখন সূক্ষ্ম লৌহশিকলের বর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, তাহার উপর আঙ্গরাখা পরিলেন। তাঁহার শিরস্ত্রাণের নিম্নে লৌহনির্ম্মিত টুপী রহিল। লৌহ নির্ম্মিত কতকগুলি তীক্ষ্ণ "বাঘনখ" বাম হস্তে লুকাইয়া রাখিয়া শিবাজী দক্ষিণ হস্তের উপর বিস্তৃত আঙ্গরাখার নিম্নে একখানি সরু ও তীক্ষ্ণ ছুরি রাখিলেন। সে ছুরির নাম ছিল বিছা। তাঁহার সঙ্গে যে দুইজন অনুচর রহিল, তাহারা পরম সাহসী ও অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত ছিল। তাহারাও তরবারি ও ঢাল লইয়া অগ্রসর হইল। শিবাজী যখন দুর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার জননী আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী ভক্তিভরে মাতার চরণধূলি শিরে লইলেন। বীরমাতা কহিলেন, তোমার জয় হউক। শিবাজী তাঁহার নয়নের মণি—দেহের জীবন ছিলেন। তিনি অনুচরদ্বয়কে বারংবার কহিলেন—দেখিও, শিবাজীকে রক্ষা করিও।

এদিকে আফজল খাঁ এক সহস্র বন্দুকধারী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর দূত গোপীনাথ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গোপীনাথ কহিলেন—শিবাজী দুইজন অনুচর লইয়া আসিতেছেন, আপনাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। এত সেনা সঙ্গে দেখিলে শিবাজী

ভীত হইয়া হয়ত আপনার সহিত দেখাই করিবেন না।

আফজল খাঁ তখন সেনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, দুইজন কর্ম্মপটু সেনা লইয়া শিবিকারোহণে সেই পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইলেন। গোপীনাথ ও কৃষ্ণজি সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। পটাবাসে আসিয়াই আফজল খাঁ দেখিলেন, তথায় বহুমূল্য সজ্জা বিরাজ করিতেছে। তিনি ক্রোধভরে কহিলেন—জায়গীরদারের পুত্রের এত আসবাব শোভা পায় না! গোপীনাথ ধূর্ত্ত ছিলেন। আফজল খাঁকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন—এ সকলই অতি সত্বর বিজাপুরের রাজভবনে প্রেরিত হইবে। শিবাজী যে বশ্যতা স্বীকার করিলেন, এই উপঢৌকনগুলি তাহার প্রথম নিদর্শন হইবে।

শিবাজী দুর্গমূলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সংবাদবহগণ যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনি ধীরপদে অগ্রসর হইলেন। আসিয়াই দেখিলেন, আফজলের একজন অনুচর,—তৎকাল-প্রসিদ্ধ বীর সৈয়দ বান্দা। সেকালে তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। শিবাজী কহিলেন, সৈয়দ বান্দাকে পটাবাস হইতে দূর না করিলে তিনি আসিবেন না। সৈয়দ বান্দাকে তখন পটাবাসের বাহিরে যাইতে হইল।

শিবাজী দৃঢ় পদে দরবারে প্রবেশ করিলেন। উভয় পক্ষেরই এক একজন দূত ও দুইজন অস্ত্রধারী সেনা তথায় উপস্থিত রহিল। পটাবাসের ভিতর যে উন্নত বেদী রচিত হইয়াছিল, আফজল খাঁ তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবাজী সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে সোপান বহিয়া উপরে উঠিলেন। শিবাজীকে নিকটে দেখিয়া আফজল খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন। শিবাজী অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও কৃশকায় ছিলেন। তাঁহার মস্তক আফজল খাঁর স্কন্ধদেশের উপরে আর উঠিল না।

তখন আফজল খাঁ সহসা অতিশয় দৃঢ়ভাবে শিবাজীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন এবং বামহস্তে অতিশয় বলের সহিত শিবাজীর কণ্ঠ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে নিজের দীর্ঘ তরবারি লইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন।

বর্ম্মে শিবাজীর দেহ আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া তরবারির আঘাত ব্যর্থ হইয়া গেল। শিবাজীর মনে হইল, যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইতেছে। তিনি মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইলেন এবং কৌশলে নিজের দক্ষিণ বাহু দ্বারা আফজল খাঁর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, বাঘনখের আঘাতে তাঁহার উদরদেশ ছিন্ন করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ করে বিছা লইয়া তিনি সবলে উহা আফজল খাঁর পার্শ্বদেশে বিদ্ধ করিলেন।

আহত আফজল খাঁ তৎক্ষণাৎ শিবাজীকে পরিত্যাগ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শঠতা! শঠতা! খুন খুন! শিবাজী বিদ্যুদ্‌বেগে লম্ফ দিয়া বেদী হইতে নীচে পড়িলেন এবং চক্ষের নিমেষে নিজের সেনাদিগের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন।

রক্ষিগণ মুহূর্ত্তে আসিয়া উপনীত হইল। সৈয়দ বান্দা অসি লইয়া ভীমবেগে শিবাজীর শিরে আঘাত করিল। সে আঘাতে শিবাজীর লৌহনির্ম্মিত টুপী পর্য্যন্ত টোল খাইয়া বসিয়া গেল—তাঁহার শিরস্ত্রাণ ফাটিয়া দুই খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। চক্ষের নিমেষে শিবাজী একখানা তরবারি লইলেন এবং সৈয়দ বান্দার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তে শিবাজীর জনৈক সেনা আসিয়া সৈয়দ বান্দার দক্ষিণ বাহু কাটিয়া ফেলিল এবং তাহাকে বধ করিল।

ইতিমধ্যে আফজল খাঁর লোকজন তাঁহাকে শিবিকায় তুলিয়া স্থান ত্যাগ করিতেছিল দেখিয়া, শম্ভুজী কবজি বাহকদিগের চরণে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। বাহকগণ নিরুপায় হইয়া আহত আফজল খাঁ সহ শিবিকা ফেলিয়া পলায়ন করিল। শম্ভুজী কবজি তখন আসিয়া এক আঘাতে আফজল খাঁর মুণ্ড কাটিয়া বিজয় গৌরবে শিবাজীর নিকট লইয়া গেলেন।

এইরূপে বিপন্মুক্ত হইয়া শিবাজী ক্ষিপ্রপদে দুর্গে

প্রবেশ করিয়াই কামান দাগিলেন। তাহার ঘনঘোর গর্জ্জনে শৈলশিখর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—বনভূমি কম্পিত হইল। শিবাজীর সেনাগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া বীর বিক্রমে ছুটিয়া বাহির হইল এবং আফজল খাঁর সেনাদিগের উপর পতিত হইয়া রুধির-স্রোতে কঠিন শিলাতল সিক্ত করিয়া তুলিল। যাহারা দন্তে তৃণ লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল শিবাজীর সেনাগণ তাহাদিগকে বধ করিল না। শুনিতে পাওয়া যায় এই যুদ্ধে তিন সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। শিবাজীর সৈন্যগণ জয় লাভ করিয়া ৬৫ হস্তী, ৪০০০ অশ্ব, ১২০০ উট, ২০০০ বস্তা বস্ত্রাদি এবং ১০ লক্ষ মুদ্রা ও মণিমাণিক্যাদি লুঠিয়া লইল।*

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "শিবাজী" নামক ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

কবির প্রতি

কি আজ কহিছ কবি প্রণয়ের কথা,
ছোটখাটো হাসি অশ্রু অন্তরের ব্যথা
বীণার কোমল তন্ত্রে মৃদু মূর্চ্ছনায়
গুঞ্জরিছ অনিবার! সলিল-রেখায়
নিশিদিন সঙ্গোপনে কি আঁকিছ কবি—
মর্ম্মপটে তুলিকায় কল্পনার ছবি!
বিশ্বের সকল শোভা, আনন্দ-কল্লোল,
কুসুমের স্নিগ্ধ হাসি, মলয়-হিল্লোল,
আকাশের শান্ত দিঠি, সিন্ধুর উচ্ছ্বাস,
সন্ধ্যার সিন্দুর-রাগ, উষার বিকাশ,
সুন্দরীর অভিমান, শিশুর কাকলী,
তোমার বীণার ছন্দে উঠিছে চঞ্চলি,
তব চারু চিত্রপটে লভিয়াছে প্রাণ;
প্রকৃতিরে দেছ লাজ, কলছন্দ গান
মুখরিছে প্রাণে প্রাণে!

হে বিশ্বের কবি!
হে অমর সঞ্জীবন-পীযূষ-গরবী!
আজো কি রহিবে তব কুঞ্জবীথিকায়
স্নেহের বন্ধন-মোহে পল্লীবনছায়
নিখিলের অন্তরালে? কে শুনিবে আজ
বীণাধ্বনি প্রলয়ের ঝঞ্ঝার মাঝ?
কে হেরিবে চিত্রলেখা দ্বন্দ্ব-কোলাহলে,
কোথা তার অবসর? নয়নের জলে
কে রচিবে স্বপ্নমায়া মেঘ-বলাকায়,
কাঁদায়ে তুলিবে হিয়া ব্রজের গাথায়?
কোথা আজি বৃন্দাবন, কোথা তার শ্যাম
কোথায় পল্লীর শোভা চির অভিরাম?—
নিখিলের বৃন্দাবনে চিত্ত যমুনার
মিলন উৎসব আজি!

সিন্ধু সিকতায়
বিমন্থিত ফেনপুঞ্জে গর্জ্জন গভীর,
পরিশ্রান্ত সুরাসুর, শ্রান্ত বাসুকীর
নিশ্বাসে গরল জ্বালা, অঙ্গ জরজর
আহ্বানিছে বিশ্বপ্রাণী কোথা মহেশ্বর!
হে অমর মৃত্যুঞ্জয়! লহ কণ্ঠে তুলি
যে তীব্র গরলদাহ উঠিছে আকুলি
প্রলয়ের শেষে! জাগাও মানসী বাণী,
মোহিনী মিটাক দ্বন্দ্ব সুধাভাণ্ড আনি।
কর কর নত শির, শুদ্ধ কর গান,
থামাও বীণার ধ্বনি, হের বিশ্বপ্রাণ
জাগরণ সচকিত নবীন ভুবনে
নব সৃষ্টি উষালোকে নবীন জীবনে
জাগে মহিমায়!

বহে যায় শুভক্ষণ,
হে ঋত্বিক ! কর শুভ মন্ত্র উচ্চারণ !
পূর্ণ হল মহাযোগ, কর শান্তিপাঠ,
হোমভস্মে আঁকি দাও বিশ্বের ললাট
গৌরব টীকায় ! আজি গাহ জয় জয়
বিথারি মঙ্গলবারি সারা বিশ্বময় !
শঙ্কিতে অভয় দাও, ব্যথিতে আশ্বাস,
অন্ধেরে নয়ন দাও, মূককণ্ঠে ভাষ,
শ্রান্তজনে দাও বল। তৃষিত অন্তর
দিগ্‌ভ্রান্ত অসহায় হারাল নির্ভর ;
অন্ধ প্রথা অবশেষ ধর্ম্ম ছলনায়,
কে আজ মিটাবে তৃষা ? কে দেখাবে পথ
আলোক-বর্ত্তিকা জ্বালি ?
নিখিল জগৎ
তোমারে মাগিছে আজ ! অশ্রু বিধবার,
পুত্রহীনা জননীর মৌন হাহাকার,
ক্ষুধিতের আর্ত্তস্বর, পীড়িতের ব্যথা,
নির্য্যাতিত অভাগার ব্যর্থ আকুলতা
তোমারি অভয় মাগে ! কে জাগাবে প্রাণ
মৃতের কঙ্কাল মাঝে ? বীরের শ্মশান
জাগে লয়ে দধীচির বক্ষ-অস্থি-মালা.
কে হানিবে অনাহত বজ্রানল জ্বালা
মানুষের দেবতার অন্ধ অপমানে
দর্পিতের উচ্চশিরে ? তব মুখপানে
চেয়ে আছে নির্ণিমেষ বিশ্বচরাচর,
শতাব্দীর অন্ধকার কাঁপে থরথর
যুগান্ত সীমায় !
তোমার আহ্বান বাজে
অযুত নির্ব্বাক কণ্ঠে নিখিলের মাঝে
রুদ্ধ হাহাকারে ! কোথায় স্বদেশ তব ?
হে ধরার স্তন্য-শিশু ! নিত্য নব নব
হাসি-অশ্রু-স্নেহ-প্রীতি-প্রাণ-বাঞ্জনায়
তোমারি আবাস চির অঞ্চল-ছায়ায়
বিশ্ব-মাতৃকার। তোমার চরণ ঘিরে
কালের কল্লোল ধারা বহে যায় ধীরে
অর্ঘ্য রচি ঊর্ম্মি-মালিকায়। গাহ গান
ছন্দে ছন্দে তরঙ্গিয়া অনন্ত বিমান !
দিগন্তের অন্ধকার লুপ্ত করি দিয়া
যুগান্তের ঊষালোক উঠুক হাসিয়া।
বিশ্বের মিলন যজ্ঞে কর উদ্বোধন
নব বিশ্ববিধাতার রাজ সিংহাসন !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

লুম্বিনী উদ্যান

বিগত বড়দিনের বন্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একজন সহকারী শিক্ষক "ব"—বাবু আমার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, এবারকার বন্ধের সময় বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান (স্থানীয় নাম রুমিণী দেয়ী) দর্শন করিতে গেলে ভাল হয়। আর, সেখানে যাইয়া দেখিবার সুবিধাও একটা বেশ আছে—কারণ আমাদের স্কুলেরই একটি ছাত্র শ্রীমান্ "চ"—এর বাসস্থান উক্ত লুম্বিনী উদ্যান হইতে ৩।৪ মাইল মাত্র ব্যবধান। উক্ত শ্রীমান্‌ও আমাদিগকে যাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিল। "চ"—বলিল যে যাতায়াতের জন্ত কোনই অসুবিধা হইবে না, পূর্ব্ব হইতে সে হস্তী ও ঘোটকের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে।

রুমিণী দেয়ী লুম্বিনীরই অপভ্রংশ তাহা বলা বাহুল্য। লুম্বিনী হইতে রুমিণী হইয়াছে, তাহার সঙ্গে দেবীর অপভ্রংশ দেয়ী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমে বড়দিনের বন্ধ আসিয়া পড়িল। যেদিন ছুটি

হইল, সেইদিন আমার শরীরটা কেমন একটু খারাপ বোধ হওয়াতে, লুম্বিনী দর্শন কামনা পরিত্যাগ করাটা ভাল মনে করিলাম, এবং "ব"—বাবুকে সেই কথা বলিলাম। আমি যাইতে পারিব না শুনিয়া, তিনি বড়ই বিমর্ষ হইলেন। তার পর আমি বলিয়া দিলাম যে, পরদিন তিনি যেন ষ্টেশনে যান, আমি যদি পারি তবে একেবারে ষ্টেশনেই যাইব। এই একটু আশার বাণী পাইয়াই যেন তিনি কিছু সন্তুষ্ট হইলেন।

সে দিন রাত্রিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম সেই করুণার অবতার রাজকুমারের কথা—যিনি রাজোচিত ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি, সুন্দরী রূপলাবণ্যভূষিতা পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর প্রেমবন্ধন এবং কুমার কল্পনাকুমারের স্নেহতন্তু প্রভৃতি অনায়াসে ছিন্ন করিয়া, জগতের হিতের জন্য অমৃতের সন্ধানে আপনাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ভগবান বুদ্ধাবতার যে স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই স্থানের মৃত্তিকা কত পবিত্র, সেই প্রদেশ কত পুণ্যময়, সেই ভগবানের বাল্যলীলক্ষেত্র, সেই পুণ্যভূমির কিছুই এখনও অবশিষ্ট না থাকিলেও, তাঁহার শ্রীপাদস্পর্শপূত মৃত্তিকা তো সেই আছে—সেই ভূমিভাগ সেই পুণ্যস্মৃতি সৌরভে তো সুরভিত আছে। আজ দশ বৎসর গোরক্ষপুরে আসিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ পুণ্যভূমি দর্শনের সুযোগ হয় নাই।'

পরদিন একখানি এক্কা ডাকিয়া আমার চাপরাশী সমভিব্যাহারে দুর্গা বলিয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, "ব"—বাবু এবং সেই ছাত্রটি উভয়ে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বন্ধু আমাকে পাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার আরও দুই জন বাঙ্গালী গুরুভাই গোরক্ষনাথ আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন। সুতরাং আমরা বাঙ্গালী যাত্রী চারিজন হইলাম। ছাত্রটির সঙ্গে তাহার একজন ভৃত্যও আছে।

টিকিট ক্রয় করিয়া আমরা গন্তব্য কাপ্তেনগঞ্জ ষ্টেশনগামী গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। এই গাড়ী গোরক্ষপুর হইতে লুপ লাইন হইয়া গোণ্ডা পর্য্যন্ত গিয়াছে। গাড়ীতে চড়িয়া মনে হইল, তাড়াতাড়িতে আমার নিতান্ত সহচর তামাকের সরঞ্জাম আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম, কিন্তু নিরুপায়! আর সময় নাই। দুধের পিপাসা ঘোলে অর্থাৎ সিগারেট সাহায্যেই মিটাইতে হইবে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার একজন নব্য উকীল হিন্দুস্থানী বন্ধু, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী-সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছেন। একে নব্য বয়স, তাহাতে দ্বিতীয় সংসার, সুতরাং তাঁহার বিরহ-কাতর প্রাণ "How fleet is the glance of mind"এর সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছিল। রেলের গাড়ী যে এত ধীরে চলে—এটা এবার তাঁহার কাছে নিতান্তই অসহ্য বোধ হইতেছিল। আর, তিনি এক একবার করিয়া অবতরণ পূর্ব্বক উৎসুক নয়নে শ্বশুরালয়ের অবস্থানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন যে, কোনও যাদুমন্ত্র বলে সে গ্রামটা নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছে কি না! ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইবার সময়টা তিনি ছটফট করিয়া কাটাইতেছিলেন। কখনও আমাকে বলিতেছিলেন, "দেখিয়ে বাবু সাহেব, কিতনি দের হর্ ষ্টেশনমে হোতি হ্যায়। ইস লাইনকি গাড়ী ফজুল এতনি দের করকে মুসাফিরোঁকো বহুৎ তকলিফ্ দেতি হেঁ। কোই তো শিকাইৎ করনে বালা নহি হ্যয় না!" আমি "জি হাঁ এ তো ঠিক, লেকিন্ আজ আপকি জরুরৎ ভি তো জ্যায়াদা হ্যায়" বলিয়া একটু হাসিলাম। "দেখিয়ে ক্যা কহতেহেঁ" বলিয়া তিনি প্রসন্ন হাস্যে নিজ মনের অন্তস্তল দেখাইয়া দিলেন।

আন্দাজ বেলা ১২টার সময় আমরা কাপ্তেনগঞ্জে পৌঁছিলাম। কিন্তু ষ্টেশনে হাতী ঘোড়া আসিবার যে কথা ছিল তাহা কিছুই দেখিলাম না। ছাত্র বাবাজী ত বড়ই লজ্জিত হইল। সে বলিল, "চলুন ধর্ম্মশালাতে একটু বিশ্রাম করিবেন, ততক্ষণ নিশ্চয়ই হাতী আসিয়া পড়িবে।" আমরা ধর্ম্মশালাতে গিয়া বসিলাম। ষ্টেশনে অন্য লোকের দুইটি হাতী ছিল, ছাত্রটি তাহাদের নিকট

গিয়া নিজ বিপন্ন অবস্থার কথা বলিল এবং তাহাদের নিকট হইতে ছোট হাতীটি চাহিয়া আনিল। কারণ, তাহার মালিক এই ছাত্রটির আত্মীয়। ইতিমধ্যে আমরা বাজার দেখিয়া লইলাম। বাজারে অল্পবিস্তর সব রকম জিনিষই আছে। হালুইকরের দোকানে মিঠাই নামধেয় যে সব জিনিস সাজান রহিয়াছে, তাহার উপর রীতিমত একস্তর বালি পড়িয়া ওজনে কিছু ভারী হইয়াছে। তার পর মাছি এবং ভীমরুল তো তাহাদের উপর লাগিয়াই আছে। এমন জিনিসও কিনিবার খদ্দের জোটে, ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। আমার সঙ্গী বন্ধুগণ 'ভরভূজা'র দোকান হইতে কিছু টাটকা মুড়ি, মম্‌কলি অর্থাৎ চিনাবাদাম ভাজা, এবং বাজার হইতে সুন্দর মূলা খরিদ করিয়া লইলেন এবং তদ্দারা ক্ষুধানলে আহুতি দানের ব্যবস্থা করিলেন।

ছাত্রটির জন্য একটি ঘোটক লইয়া একজন লোক আসিল; সে বলিল, হাতী অন্যত্র গিয়াছে, লোক পাঠান হইয়াছে, শীঘ্রই আসিবে। শুনিয়া আমি কতকটা হতাশ হইলাম, এবং পরবর্ত্তী গাড়ীতে ফেরৎ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু শ্রীমান্ তাহাতে এত দুঃখিত হইল যে, আমি হাস্যমুখে তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। ছোট হাতীটিতে দুইজন লোকের স্থান হইতে পারে; "ব"—বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে এক জন, পদব্রজে গমনে অশক্ত বিধায় তাঁহাদিগের জন্য হাতীর ব্যবস্থা করিলাম। অশ্বারোহণে আমি অপটু। ছাত্রবাবাজীকে বলিলাম যে সে দ্রুতবেগে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইয়া দেখিতে থাকুক হাতী আসিতেছে কি না, ততক্ষণ আমরা দুই জন পদব্রজে চলিতে থাকি।

কাপ্তেনগঞ্জ বাজারের উত্তরাংশে নেপালী গুর্খাদের একটা আড্ডা আছে। সেই বস্তির মধ্য দিয়া ধূলিবহুল রাস্তাতে আমরা যাইতে লাগিলাম। নেপালী রমণীগণ কেহ প্রসাধন-নিরতা, কেহ পুরুষদের সঙ্গে বসিয়া তাস খেলিতেছে, কেহ ছেলেপিলে লইয়া খেলা দিতেছে, পুরুষগুলি কেহ শীতের রৌদ্রে শুইয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে, কেহ খোর্ত্তা রিপু করিতেছে, কেহ তামাক খাইতেছে। বস্তি বড় অপরিষ্কার।

এই বস্তি ছাড়াইয়া আমরা মাঠে পড়িলাম এবং বেশ আনন্দের সহিত হাঁটিয়া যাইতে লাগিলাম। চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর; কোথাও সর্ষপ ক্ষেত্র, কোথাও মটরের ক্ষেত, মধ্যে মধ্যে আমের বাগান।

যাহা হউক, অনুমান এক মাইল পথ যাইতে না যাইতেই, ছাত্রটির পিতার প্রেরিত বৃহৎকায় বারণরাজ দেখা দিল। ছাত্র সানন্দে আসিয়া সংবাদ দিল—"হাতী আগেয়া।" তাহার উপর তিনজন অনায়াসে যাইতে পারে। বন্ধুরা যখন তিনজনে বড় হাতীতে উঠিলেন, এবং আমার একার জন্য ছোট হাতটি ছাড়িয়া দিলেন।

অল্পদূর অগ্রসর হইতেই আর একটি বড় হাতীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সেটি ছাত্র বাবাজীর শ্বশুরালয় হইতে প্রেরিত। নিজেদের হাতীটি অন্যত্র গিয়াছিল, এজন্য তাহার পিতা সে হাতীর জন্যও লোক পাঠাইয়াছিলেন। এবং যদি সেটা না পাওয়া যায়, এই আশঙ্কায় বৈবাহিককে পত্রদ্বারা হস্তী প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের পক্ষে ভগবৎকৃপায় সুবিধাই হইয়া গেল, নতুবা ছোট হাতীটিকে সঙ্গে লইতেই হইত।

এই নূতন হাতী আসাতে ছোট হাতীটি ছাড়িয়া দিলাম, এবং আমি ও "ব"—বাবু এই হাতীতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা ইংরেজাধিকার সীমার শেষে আসিয়া পৌছিলাম। ইহার পরেই নেপালরাজের সীমার আরম্ভ। মধ্যে কয়েক গজ স্থান সীমা-নির্দ্দেশক চিহ্নস্বরূপ পড়িয়া আছে; ইহাকে দশগজি বলে, কারণ উভয় দিক হইতে ৫ গজ করিয়া স্থান সীমানার জন্য লওয়া হইয়াছে, উহার উপরে কিয়দ্দূর অন্তরে অন্তরে এক একটি উচ্চ স্তম্ভ প্রোথিত থাকিয়া স্বাধীন নেপাল রাজ্য এবং বৃটিশ রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। শুনিলাম এইসব সীমান্তপ্রদেশে পূর্ব্বে লুঠ তরাজ অনেক হইত; এখন তত হয় না, তবে সময়

সময় বৃটিশ রাজ্যের কোন গুরুতর অপরাধী ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে নেপাল সীমানাতে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদনুসরণকারী পুলিশের লোকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে; কারণ সে সীমানাতে গিয়া ইংরাজ পুলিশের আসামী গেরেপ্তার করিবার হুকুম নাই। সেজন্য নেপাল রাজকর্ম্মচারীকে লিখিতে হয়।

এই সব প্রদেশে, বিশেষতঃ নেপাল রাজ্যের শস্যক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালীর বিশেষ ঔৎকর্ষ দেখিয়া সুখী হইলাম। খাল, বাঁধ ও সেচনের সাহায্যে জমিগুলিতে ঠিক সময়ে উপযুক্তভাবে জল সরবরাহ করা হয়, এজন্য সে সব জমিতে সর্ব্বদাই সোণা ফলিয়া থাকে।

ক্রমে আমরা ছাত্রটির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম; তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীটী প্রকাণ্ড, উপরে খোলা দিয়া ছাওয়া। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; বৈঠকখানার সম্মুখে একটি বড় ইন্দারা। আমরা বৈঠকখানাতে বিশ্রাম করিতে উপবিষ্ট হইলাম। ছাত্র বাবাজী অশ্বপৃষ্ঠে আমাদের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছিল। সে যোড়হস্তে সম্মুখে উপস্থিত হইল। একটু পরেই তাহার পিতা শুকুলজী আসিয়া বহু বিনয় ও সম্ভ্রমের সহিত আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন।

আমাদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, আর আর নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। নেপাল রাজ্যের শাসন-প্রণালী, বন্দোবস্ত ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথা-বার্ত্তা হইল। ইতিমধ্যে চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। এই সুদূর পল্লীতেও চায়ের অক্ষুন্ন প্রতাপ দেখিলাম। ইঁহারা দুবেলাই চা পান করেন।

পরদিন অনুমান বেলা ৩টার সময়, "কেহ অশ্বে, গজে কেহ" আমরা রুমিণী দেয়ীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দুইটী হস্তী এবং গোটাপাঁচ-ছয় অশ্বের সম্মিলনে আমরা যেন একটী বড় দলেই চলিলাম।

পথে এক স্থানে ঠিক বন্যার জলের মত জলের স্রোত চলিয়াছে এবং তাহাদ্বারা কতক কতক জমি একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। পৌষমাসে এমন জলস্রোত কোথা হইতে আসিল? দুই এক দিনের মধ্যে কেন, অনেক দিনের মধ্যেও বৃষ্টি বাদল কিছু হয় নাই, সুতরাং আমি কৌতুহলী হইয়া শুকুলজিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন; এসব জল ক্ষেত্রে সেচন করিবার জন্য দূর হইতে আনা হইতেছে। দূরে দূরে বড় বড় বাঁধ আছে, তাহাতে জল সঞ্চিত থাকে, প্রয়োজন অনুসারে কৃষকগণ তাহা হইতে সেচনী সাহায্যে জল উঠাইয়া আপন আপন ক্ষেত্রে সেচন করে। এইরূপে জল সেচনের ফলেই এইসব ক্ষেত্রে সোণা ফলে। ইহাদের বৃষ্টির জন্য আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতে হয় না! অবশ্য সময়-মত বৃষ্টি পাইলে বড়ই ভাল হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু না পাইলেও একেবারে তাহাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। শুকুলজি বলিলেন যে নেপাল দরবার হইতেও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, আর তাঁহারা অর্থাৎ জমিদারগণও ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন, নতুবা তাঁহাদেরই লোকসান।

প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে আম্রকানন, আর ছোট ছোট গ্রাম বা বস্তি। দূরে দূরে গ্রাম সমূহ শ্যামল প্রলেপ-মণ্ডিত প্রাচীরের মত বোধ হইতেছিল। এই প্রান্তরেরই পশ্চিম দিকে একটী উচ্চ ভূমি দেখা গেল। শুকুলজি বলিলেন ঐটাই রুমিণী দেয়ী, আমরা অল্পকাল মধ্যে সেখানে পৌছিতে পারিব।

গজরাজকে দ্রুত চালাইতে বলিয়া আমি সেইদিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, এতকাল পরে, ভগবান বুদ্ধের জন্ম দ্বারা পবিত্রীকৃত সেই লুম্বিনী উদ্যান স্বচক্ষে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইবে! সেই সুদূর অতীত কালের চিত্র যেন আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি হইতে স্থানটী অনেকটা উচ্চ এবং নানারূপ কাঁটা গাছ এবং জঙ্গলে আবৃত। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছও আছে। গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমরা উপরে গেলাম। সেখানে গিয়া একস্থানে ছোট

একটী ঘর দেখা গেল। তাহায় শিকল বন্ধ ছিল। ঘরটি ছোট একটী কুঠারি। দ্বারের উপরিভাগের ইষ্টকগুলিতে নানা প্রকার লতা পাতা কাটা। ঘরটীর অবস্থা সংস্কারাভাবে জীর্ণশীর্ণ। যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটনের উপায় করা গেল। দ্বার খোলা হইলে দেখিলাম, ঘরটির মেঝে, উপরের ভূমি হইতে অনেক নিম্নে, অর্থাৎ ঘরটী ভূমি-গহ্বরে অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে পাথরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি আছে, তবে তাহাতে কারুকার্য্যের নাম গন্ধ কিছুই নাই। পাথরের উপরে মোটামুটী ভাবে খুদিয়া মূর্ত্তির একটা খসড়ামাত্র খাড়া করা হইয়াছে। বামদিকে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্ত খানি উর্দ্ধে উত্থিত, বাম হস্ত উরুদেশে স্থাপিত, মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাহারই দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, তাহার বাম হস্ত পূর্ব্ব মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তের সহিত সংলগ্ন। তাহার দক্ষিণে দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি, যেন শান্ত্রী বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি পূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া যেন কিছু গ্রহণ করিতেছে এইরূপ ভাব। মূর্ত্তিগুলির চোখ মুখ প্রভৃতির কোন চিহ্ন নাই। আমরা অনুমান করিলাম যে, প্রথম স্ত্রীমূর্ত্তিটি বুদ্ধজননীর হইতে পারে। তিনি ন্যগ্রোধ শাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মানা, পার্শ্বে তাঁহার সখী এবং অপর দুইজন শরীররক্ষী শান্ত্রী হইবে। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে শিল্পের নৈপুণ্য কিছুই নাই। ঠিক যেন একটা খসড়ামাত্র খাড়া করা। এগুলি সিন্দুর ও তৈলে চর্চ্চিত হইয়া একজন পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে পূজা ও প্রণামী পাইতেছেন। বলা বাহুল্য পুরোহিত একজন হিন্দু, এদেশীয় ব্রাহ্মণ। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একজন চীন দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। শুনিলাম যে এই পুরোহিতই এই মন্দির আবিষ্কার করিয়া ভূমিগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন এবং ইহাকে বর্ত্তমান আকারে সংস্কৃত করিয়াছেন।

যদি এই গৃহটী সত্যই সেই প্রাচীন কালের গৃহই হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতি এরূপ অযত্ন করার কারণ বুঝিলাম না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়া, ইহার চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া স্থানটিকে মনোরম করিয়া তুলিতে পারেন। যাহা হউক, আমরা কিয়ৎকাল এই পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান বুদ্ধদেবের চিন্তা করিলাম।

তাহার পর আমরা সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, জঙ্গলের মধ্যে দিয়া আরও কিছু পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া একটি অশোক স্তম্ভের নিকট উপনীত হইলাম।

স্তম্ভটি অন্যান্য অশোক স্তম্ভের মতই। উপর হইতে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্তম্ভটি এত যুগ যুগান্তর ধরিয়া কালের অত্যাচার সহ্য করিয়াও অতি সুন্দর ও অবিকৃত আছে। কেবল উপরে অনেক স্থলে শুষ্ক শেওলার মত স্তর পড়িয়া গিয়াছে।

স্তম্ভটির পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে নাটা প্রভৃতি কণ্টক-লতাগুল্মে এমন জঙ্গল হইয়াছে যে তাহার চারিদিক ভাল করিয়া দেখা অসম্ভব। তখন হস্তীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। আমাদের নির্দ্দেশ ক্রমে মাহুত হস্তীকে আনিয়া চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ করিল। আমি গজরাজের পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট রহিলাম। সে স্বীয় পদ দলনে এবং পেষণে অবিলম্বেই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে চলিবার উপযুক্ত পথ করিয়া লইল। আমি তাঁহার পৃষ্ঠে বসিয়া একখানি ইষ্টক সাহায্যে স্তম্ভগাত্র পরিষ্কার করিয়া উপরের লেখাগুলি পড়িতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লেখা সব বুঝিতে পারা গেল না। কতক অক্ষর দেবনাগরী, কতক বা অন্য কোন রূপ। একটি "ওঁ মণি পদ্মে হুং" ইহা বেশ বুঝা যায়। এক স্থানে "চোলদেব নীলদেব" দেবনাগরীতে লেখা আছে। অধিকাংশই এইরূপ খণ্ড খণ্ড কথাতে পূর্ণ। এগুলি দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, এগুলি স্তম্ভ স্থাপনের অনেক পরে দর্শক ও পরিব্রাজকাদির দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে;—ইহাদের সঙ্গে আসল স্তম্ভের কোনও সম্পর্ক নাই।

স্তম্ভের সর্ব্বনিম্নে পশ্চিম দিকে আসল লিপিটি মাগধী

তাবাতে পরিষ্কারভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহাই অতি মূল্যবান। আমি বিশেষ যত্নের সহিত পেন্সিল সাহায্যে লেখাগুলি একখানি কাগজে অবিকল নকল করিয়া আনিতে চেষ্টা করিলাম। :শুকুলজি প্রভৃতি বলিলেন, এ যে কি অক্ষর ও কি লেখা, তাহা কেহ পড়িতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না; কত কত লোক আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে, কেহই পারে নাই। আমি তাঁহাদিগকে এই অক্ষরের এবং লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝাইয়া দিলাম, এবং বলিলাম যে লেখাটি অবিকল উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে ইহার পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করা যাইতে পারিবে। তাঁহারা সানন্দে, তাহাতে সম্মতি দিলেন, এবং আমার কার্য্য সাগ্রহে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক লেখাগুলি এখনও অতি সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে রহিয়াছে। আমি কাগজে অতি যত্নের সহিত যাহা লিখিয়া আনিয়াছিলাম, পরে তাহা ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেবের কৃত Rulers of India শ্রেণীভুক্ত অশোক নামক পুস্তকে উদ্ধৃত Fuhrer কর্ত্তৃক গৃহীত প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি যে উভয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

লিপি মাগধী ভাষাতে লিখিত। মাগধীতে র স্থানে ল উচ্চারিত হয়। উহার পাঠ বাঙ্গলা প্রতিলিপিতে নিম্নে লিখা যাইতেছে—

দেবান: পিয়েন পিয় দশিন লাজিন বীসতিবস ভিসিতেন অতন আগাচ মহীয়িতে হিদ বুধে জাতে সক্য মুনীতি শিলা বিগড়ভীচা কালাপিত শিলা থভেচ উস পাপিতে হিপ ভগবং জাতেতি লুংমিনি গামে উবলিকে কটে অঠ ভাগিয়ে চ।

ইহার ভাবার্থ এই যে—

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক স্বীয় রাজত্বের বিংশতি বর্ষে স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক এইস্থানে নিজ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহা পাথরের রেলিং দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন এবং একটি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপিত করিলেন। আর ভগবান বুদ্ধ এই স্থানে জন্মিয়াছেন এই জন্য এই লুম্বিনী গ্রাম সর্ব্বপ্রকার কর দান হইতে অব্যাহতি পাইল এবং অষ্টভাগীয় রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী হইল।

বলাবাহুল্য আমি ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেবের প্রদত্ত অর্থেরই সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পাথরের রেলিংএর কোনই চিহ্ন এখানে দেখা গেল না।

মহারাজ অশোক স্বীয় গুরু উপগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র সমুদয় তীর্থস্থান পর্য্যটন করেন এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ স্তম্ভ উত্তোলন, পর্ব্বতগাত্রে অনুশাসন ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যান। লুম্বিনী উদ্যান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি এখানেই আগমন করেন। অনুমান খৃঃ পূঃ ২৪৯ অব্দে এই লুম্বিনী গ্রামে তিনি আসিয়াছিলেন।

এই সেই লুম্বিনী উদ্যান, যেখানে জগৎপাবন ভগবান বুদ্ধদেব জীবক্লেশ নিবারণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সময় না জানি ইহার কি শোভা কি সমৃদ্ধিই ছিল, যাহার জন্য বুদ্ধজননী আকৃষ্টা হইয়া এখানে চিত্তবিনোদনার্থ আসিয়াছিলেন। সে উদ্যান কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, কত কত বিশাল তরুবর, মিষ্ট ফলভরা নমিতশাখ বৃক্ষাবলী, সুগন্ধি কুসুমস্তবকে নমিতা লতা একদিন সেখানে স্বীয় শোভা বিস্তার করিত; কত না আরাম-বাটিকা মনোমদভাবে সজ্জিত হইয়া সে উদ্যানকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। অরবিন্দ কুমুদ কহ্লারাদি শোভিত, কলহংস কারণ্ডবাদি কূজিত নয়নাভিরাম জলাশয়ই বা সে উদ্যানে কত ছিল, যাহার তীরতরুতলে বসিয়া আতপতপ্ত শ্রান্ত পথিক বায়ু সেবনে পথক্লম নিবারণ করিত!

কোথায় আজ সে উদ্যান, কোথায় আজ তার শোভা সমৃদ্ধি! এখন কণ্টক-গুল্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া এ স্থানটি দুর্গম বনের মত কেবল বিষধর সর্প এবং শ্বাপদাদির আবাস হইয়া রহিয়াছে। স্তম্ভটির কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে একটি ডিম্বাকার জলাশয়ের চিহ্ন রহিয়াছে দেখিলাম, কোনও কালে সেটা জলাশয় ছিল বলিয়াই বেশ বোধ

হয়। এই স্থানের একটু দূরে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আর একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি আছে, সেখানকার মৃত্তিকাতেও ইষ্টকচূর্ণ বেশী মাত্রায় মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইল। সেই স্থানটিতেও পূর্ব্বকালে অট্টালিকাদি ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকটস্থ কতকটা ভূমিভাগের মৃত্তিকা অনেকটা ধূসর বর্ণের অথবা কালচে রঙ্গের দেখা গেল।

জনশ্রুতি এই যে, এই সমস্ত স্থান ব্যাপিয়াই আরাম বাটিকা ছিল। শুকুলজি বলিলেন, ইংরেজ সরকার হইতে এই স্থান খনন করিবার জন্য নেপাল দরবারের সম্মতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু নেপালরাজ তাঁহাদিগকে সে অধিকার দিতে সম্মত হন নাই। দরবার পক্ষ হইতে একবার খননের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে এই প্রদেশে ভয়ানক ওলাউঠার ব্যারাম হওয়াতে জনসাধারণের মনে বিশ্বাস হয় যে, এই স্থান খননোদ্যম জনিত দেবরোষই এই রোগবিস্তৃতির কারণ। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে খনন কার্য্য স্থগিত হয়। তাহার পর আর কোন চেষ্টা হয় নাই।

স্থানটির অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল যে, ভালরূপ খনন করিলে এস্থান হইতে প্রাচীন স্মৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে।

ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে করিতে গোক্ষুরা সাপের ৪।৫ হাত লম্বা একটি বৃহৎ খোলস দেখিতে পাইয়া, রুম্মিণী দেয়ী দর্শনের নিদর্শনস্বরূপ সেটিকে আমি রুমালে বাঁধিয়া লইলাম।

এদিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইলাম। ইতিমধ্যে শুকুলজি স্বীয় বন্দুকটি উঠাইয়া ধরিয়া, একটা বড় গাছের মাথায় নিশানা করিতেছিলেন। জীবক্লেশ নিবারণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতাররূপে যাঁহার আবির্ভাব, 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' যাঁহার মূলমন্ত্র, সেই ভগবানের জন্মস্থানে নিরীহ পক্ষীর প্রাণবধ করাটা আমার নিকট এতই বীভৎস বলিয়া বোধ হইল যে, আমি করযোড়ে তাঁহাকে এ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিলাম, এবং সকলে মিলিয়া সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

দানো নদী পার হইয়া আমি অনেকদূর পর্য্যন্ত মনে মনে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" চিন্তা করিতে করিতে পদব্রজেই অগ্রসর হইলাম এবং মধ্যে মধ্যে সেই পবিত্র স্থানের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। যদিও এ স্থানে এখন দেখিবার মত বিশেষ কিছুই নাই; কিন্তু ইহার সহিত সেই প্রাচীনকালের যে অমৃত-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার জন্য ভাবিবার জিনিস ইহার মধ্যে অনেক আছে। আমি সেই ভাবনাতেই ডুবিয়া গেলাম; এ পবিত্র স্থান দেখিতে পাইলাম বলিয়া নিজকে আমি ধন্য মনে করিলাম। যাতায়াতের দুর্গমতার জন্য অনেকেই এ স্থানটি দর্শন করিবার সুযোগ সহজে প্রাপ্ত হন না; ছাত্র বাবাজির কল্যাণে আমি সে সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম এটা কি আমার কম সৌভাগ্য? আর ধন্যবাদার্হ আমার সাধু বন্ধু 'ব'—বাবু; কারণ তাঁহার আগ্রহাতিশয্যেই আমি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, আমরা শুকুলজির বাটীতে দুই তিন দণ্ড রাত্রি হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তার পর সন্ধ্যাক্রিয়াদি শেষ করিয়া, গেলাসে করিয়া চা পান এবং শুকুলজির পরিবারস্থা রমণীগণের স্নেহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করা গেল। পরে রাত্রির ভোজন শেষ করিয়া, কিছুক্ষণ নানা প্রসঙ্গে কাটাইয়া শয়ন করিলাম।

ভোরে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া জলযোগান্তে গোরক্ষপুর প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করা হইল। দুইটি হস্তী সজ্জিত হইয়া আসিল, আমরা তাহাতে আসীন হইলাম। শুকুলজি আমার সম্মান স্বরূপে ১৬৲ কি ২০৲ টাকা আনিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি করযোড়ে কাতরভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহা ফিরাইয়া দিলাম এবং তাঁহাদের সৌজন্য ও অতিথেয়তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিয়া আমরা বিদায়গ্রহণ করিলাম।

ট্রেণের সময় কিছু কম ছিল আশঙ্কা হওয়াতে হস্তীপকগণকে একটু দ্রুত চালাইতে আদেশ করিলাম। তাহারা সে আদেশ খুব কড়াকড়ি ভাবেই পালন করিল। সময় সময় হস্তী এত দ্রুত গমন করিতে লাগিল যে, এই জন্তু যে এই বিশাল বপুর ভার বহন করিয়া এত দ্রুত গমন করিতে পারে ইহার পূর্ব্বে আমি তাহা ধারণাই করিতে পারি নাই। পথে যাইতে যাইতে আর একটী বড় মজার ঘটনা হইয়াছিল। আমরা যাইতে যাইতে পথে একটী উষ্ট্রচালকের সহিত দেখা হইল। আমাদের হস্তিদ্বয় উট দেখিয়া এমন ভীত হইয়া পড়িল যে, তাহারা প্রায় দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল।

চালকগণ অঙ্কুশের ব্যবহার না করিয়া দ্রুত চালনের এই কৌশল আবিষ্কার করিয়া, উট চালককে জিজ্ঞাসা করিল যে সে কোথায় যাইবে। তদুত্তরে সে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, কতকটা দূর পর্য্যন্ত সে আমাদের সঙ্গেই যাইবে। তখন হস্তিচালকগণ খুসী হইয়া তাহাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিল। যখনই হস্তী স্বীয় গতিবেগ মন্দীভূত করিয়া তুলে, তখনই মাহুতের সঙ্কেতমত উষ্ট্রচালক স্বীয় উষ্ট্রকে দ্রুত চালনা করিয়া হস্তীর পার্শ্বে লইয়া আইসে, উটের লম্বা গলার ছায়া দেখিতে না দেখিতেই আমাদের হাতীরা একেবারে ছুট ছুট ছুট—আর মধ্যে মধ্যে কাতর চীৎকার। এইরূপে আমরা ক্রমে ক্রমে ব্রিজমানগঞ্জ বাজারে উপস্থিত হইলাম।

হস্তীর মাহুতগণকে পুরস্কৃত করিয়া, পুনরায় তাহাদের মারফৎ শুকুলজিকে আর এক দফা নমস্কার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিলাম।

পরে ট্রেণ আসিলে দেখিলাম, তাহাতে বেজায় রকম ভিড়; স্থান পাওয়া বড়ই কঠিন। আর, নেপালী গুর্খার দলেই আরও বেশী ভিড় করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করাও দায়, স্থান আদায় করাও মুস্কিল। যাহা হউক, নানারূপ কৌশল খাটাইয়া স্থান করিয়া লওয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীবক্ষে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা গোরক্ষপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বাসায় প্রত্যাগমন করিলে, রুমালে বাঁধা কিছু দেখিয়া ছেলেপিলেরা কিছু মিষ্ট দ্রব্য ভাবিয়া সাগ্রহে টানিয়া লইল; কিন্তু খুলিতেই সাপের খোলস দেখিয়া মহা আতঙ্কিত হইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। গৃহিণী এ ব্যাপারে আমার বার্দ্ধক্যেও বালকত্ব দেখিতে পাইয়া দু'কথা শুনাইতে ছাড়িলেন না।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিমন্ত্রণের উল্লাস

নিমন্ত্রণ বোসেদের বাড়ী—
খুদু যায়, মধু যায়, ওপাড়ার যদু যায়,
রাধু বিধু শশী নসু ছুটে তাড়াতাড়ি।

গ্রামের প্রধান ধনী রায় বাবুদের ননী
রহিয়াছে নিমন্ত্রণে যাবার আশায়;
সকাল হইতে আজি যে হর্ষে রয়েছে সাজি,
হয়নাক সে হর্ষের প্রকাশ ভাষায়।

তিনটে বাজিয়ে গেলে দলে দলে সব ছেলে
চলিয়াছে ভোজবাড়ী, পড়িয়াছে ডাক,
সাটিনের জামা গায়ে রাঙা জুতাজোড়া পায়ে
বাহির হয়েছে ননী করি বহু জাঁক।
হেনকালে হায় হায় পিতা এসে ধমকায়—
"বোসবাড়ী নেমতন্নে যাস তুই বুঝি!
ওরা কি খাওয়াতে জানে? দিন খায় দিন আনে
মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা উহাদের পুঁজি!

চল্‌'ছস সন্ধেকালে যেতে যে ছেলের পালে,
রায়েদের বংশে হেন দেখিনি পেটুক !
বুঝেছি মেয়েরা তোরে পাঠায়ে দিতেছে ধরে,
অবেলায় ভাত খেয়ে করিবে অসুখ।
ভোজ পেলে ফের নাচা ! বাড়ীতে নেই কি খাছা ?
বল দেখি পাসনাক কি জিনিস খেতে ?
ফল মূল ক্ষীর ছানা নিত্য কত খাবি, খা' না—
কাল ত পোলাও মাংস খেলি বাপু রেতে !
কি না তুই খেতে পাস ? পরের বাড়ী যে যাস !
রোজ রোজ হয় ভোজ তোদের বাড়ীতে !
রুই মাছ ঝুড়ি ঝুড়ি, রাশ রাশ লুচী পুরী
সন্দেশ আসিছে নিত্য হাঁড়ীতে হাঁড়ীতে।"

বিষম প্রমাদ গণি কেঁদে গড়াগড়ি ননী,
মাটীরে জানায় তার চিত্ত-ব্যাকুলতা।
পিসিমা আসিয়া তোলে, বলে তারে ধরি কোলে,
"ছেলেমানুষের সাধ, থাক্‌—সে কি কথা।"
ননীর বেদনা যাহা কেহ তা বুঝে না আহা,
কেন তার সাজগোজ কেন ধূমধাম,
জোর করে ধরে' যারে খাওয়াইতে হয়, তারে
পিতা কিনা দেন হায় পেটুক ছুর্ণাম !
খুছ যায় মধু যায়, শশী নণ্ড যদু যায়,
পাড়ার সকলে আজি চলেছে যথায়,
হায় হায় কি দোষেতে সেথানে পাবে না যেতে ?
ননী যে তাহার কিছু খুঁজিয়া না পায় !

সেথানে সবার সাথে একত্রে কলার পাতে
কড়কড়ো ভাত খাওয়া বসিয়া উঠানে,
সে আনন্দ সে উল্লাস হৃদয়ের সে উচ্ছ্বাস
মিলিবে সেদিন কি গো বাড়ীর দালানে ?
হারু হাঁদু মধু বিধু ফটিক ফকির সিধু
সবারে একত্রে পাওয়া খাওয়ার সময়,
মাতামাতি মহোৎসব হইচই কলরব
অখাদ্য করিয়া তুলে বড় মধুময়।
খাইয়া আপন ঘরে নিত্য বটে পেট ভরে,
কোনো দিন মিলে না যে বুকভরা সুখ।
সেথা চেয়ে চেয়ে খাওয়া, না চাহিতে বহু পাওয়া,
চেয়ে না পাওয়ার মাঝে কত যে কৌতুক।
যে আনন্দ মধু-স্মৃতি হৃদয়ে জাগিবে নিতি,
বারোমাস হৃদিকোষে রহিবে সঞ্চিত,
যে আনন্দ সবে পাবে ননী শুধু বাদ যাবে ?
ননী শুধু অকারণে রহিবে বঞ্চিত ?
কাণে গুঁজি ছটী পাণ —বড়ই দয়ার দান—
এলানো কোঁচাটি তার বাম হাতে ধরে'
পুকুরে আঁচান হায় কত যে উল্লাস তায়,
ভোজের বাড়ীর গল্প যায় কোলে চড়ে।
একটি দিনেরো তরে বসিয়া ধূলির পরে
আভিজাত্য ধনগর্ব্ব করি পরিহার,
পাড়ার সবার সঙ্গে মহোৎসবে মহারঙ্গে
নিজেরে ভাবিতে পায়া সমান সবার
তাহাতে যে কত সুখ, কি উল্লাসে নাচে বুক !
এখন পিতায় তাহা স্বপনের মত।
সে কথাটি বুঝিবার শকতি নাহিক আর
সুখের শৈশব তার বহুদিন গত।

শ্রীকালিদাস রায়।

ঝিলে জঙ্গলে শিকার

১লা অক্টোবর, ১৯১৭

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

আহত হিংস্র জন্তুকে—যেমন বাঘ ভালুক চিতাকে—অনুসরণ করা সঙ্গীন কায। নির্ব্বিঘ্নে এ কায সমাধা করতে হলে, আপনাকে আর অনুচরবর্গকে রক্ষা করতে হলে সাবধানতা ও বহুকাল অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার বিশেষ আবশ্যক। অনুচরবর্গকে রক্ষা করার দিকেই অধিক মনোযোগ করতে হয়, কেন না তারা আত্মরক্ষার যোগ্য অস্ত্রধারণ করে না। এমন কি অনেক সময় তাদের কোন অস্ত্রই থাকে না। সর্ব্বতোভাবে তারা আত্মজীবন রক্ষার জন্যে তোমার উপর নির্ভর করে থাকে। শিকার ব্যাপারে দৈবাৎ কিছুই ঘটে না, যদি কোন বিপদ হয় তবে নিশ্চয় জেনো সেটা অজ্ঞতা নির্ব্বুদ্ধিতা আর দুঃসাহসিকতার পরিণাম। এতদিন ধরে আমার চিঠি পড়ে তোমরা এটুকু জেনেছ বোধ হয়, দুরন্ত হিংস্র জন্তু শিকার করতে হলে কেমন জায়গায় দাঁড়িয়ে এ কায করবে, সেই স্থানটি বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনার সহিত নির্ব্বাচন করে নেওয়া প্রথম এবং প্রধান কায। আর সবদিকে দৃষ্টি রেখে গুলি করবে, অনর্থক বিপদ ডেকে আনবে না। বন্দুক আওয়াজ করবার পর আর কোন শিকারী যাতে কিছুমাত্র শব্দ না করে, সে বিষয় কড়া হুকুম দিয়ে দেবে, আর যাতে এ আদেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয় সে সম্বন্ধে মনোযোগী হবে। আজ পর্য্যন্ত আমি এই নিয়মেই চলেছি, আর যে মৃগয়াক্ষেত্রে আমার একছত্রী অধিকার, সেখানে কখনই এ নিয়ম ভঙ্গ হতে দিই নি। তারপর আমার বাঁশীর সঙ্কেতে তারা জানতে পারে, শিকার ফসকেছে, ঘায়েল হয়েছে, কিম্বা ঘায়েল হওয়ার পর পালিয়ে গিয়েছে। চারিদিক নিঃশব্দ থাকলে আহত জন্তু অধিক দূরে যায় না, নিকটে আড়াল আবডাল দেখে লুকিয়ে বসে, তবে গোলমাল যদি চলে, তবে প্রাণপণ শক্তিতে যতদূর সাধ্য তত অধিক দূরে চলে যায়। খুব সম্ভবতঃ সে দৃষ্টির মধ্যেই থাকে, তবে সেখানে শেষ গুলি মারবার সুবিধা হয় না, তাই জন্যে নড়া চড়া, কথা কওয়া, তোমার কৃতকার্য্যতা অথবা তোমার জীবনের পক্ষে হানিকর হতে পারে। যদি তোমার বন্দুক বাহক অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অভ্যাস থাকে, তাহলে তাকে এম্নি শেখাবে যে সে যেন টুঁ-শব্দটি না করে।

এ সম্বন্ধে তোমাদের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি একবার মস্ত একটা চিতাবাঘকে ঘন ঘাস বনের মধ্যে হতে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবা মাত্রই মেরেছিলাম, সৌভাগ্য বশতঃ আমা হতে দুচার পা দূরে আমার দিকে পিঠ করে সে পড়ে গিয়েছিল। কাছেই গুটিকত বাবলা গাছ, চারিদিকের ঘাস এক ফুটের বেশী উঁচু নয়—হাত চল্লিশের মধ্যে তার লুকিয়ে আশ্রয় নেবার দ্বিতীয় স্থান ছিল না। আমার আর তার মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না, অনায়াসেই সে আমাকে আক্রমণ করতে পারত। তার মূর্ত্তি আর ভঙ্গী দেখে তার মনোভাবও যে তাই, সে-কথা বোঝা যাচ্ছিল। সমস্ত শরীরটা টান করে রেখেছিল, ঘাড়ের রোম সব উঁচু হয়ে উঠেছে, কাণ দুটি খাড়া, লেজটি শুধু ঈষৎ নড়ছিল। আমি দেখলাম এক গুলির চেয়ে দুইগুলি বেশী কাযের হবে। সমস্তক্ষণ বাঘের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি বন্দুকের ডান দিকের নলে গুলি ভরছি, (ভেবনা কাযটা বড় সোজা) এমন সময় দলের একজন শিকারী গাছের উপর হতে হঠাৎ বলে উঠল, "ওবে উঠছে, গুলি কর গুলি কর।" খুব সম্ভবতঃ আমার চেয়ে বাঘের দুরভিসন্ধি সে ভাল করে বুঝতে পেরেছিল; এমন অবস্থায় যে কখন পড়েছে, সেই জানে কি ভয়ানক আক্রোশের সঙ্গে বাঘটা উঠে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমি বন্দুক নীচু করে, গুলি মেরে যখন দেখলাম, সে আবার ধরাশায়ী হয়েছে, তখন কি

আরামই বোধ হল! তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হবার ইচ্ছায় একটু এগিয়ে অন্য নলটিও তার উপর খালি করলাম। আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে যখন সে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করেছিল, সে ভয়ঙ্কর শব্দ দু'শ' হাত দূর হতে স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল। বিপিন যদি না চেঁচাত, (তোমরা তাকে চেন) আমি অনায়াসেই কার্য্য সমাধা করতে পারতাম, বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটাও অনর্থক নষ্ট করতে হত না, সেটা তোলা থাকত, বিশেষ দরকারের সময় কাযে লাগাতে পারতাম। বেচারী বিপিন বেয়াকুবি করে ভারী দুঃখিত আর লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। একবার শিক্ষা হয়ে পরে আর কখনো এমন করেনি।

বাঘ কিম্বা চিতা যদি খুব নীচু হয়ে চলে, কিম্বা ভুঁয়ে শুয়ে পড়ে, তাহলে তুমি যত তীক্ষ্নদৃষ্টি হওনা কেন, সহজে তাকে খুঁজে পাবে না। মনে রেখ, তার নিজের মনোনীত স্থানে তোমার তাকে খুঁজতে হয়। খোলা জায়গায় রক্তের ধারা কিম্বা পায়ের চিহ্ন দেখে কখনো আহত জন্তুকে অনুসরণ করা উচিত নয়। অনেক অনুচর সহচর সঙ্গে থাকলেও এটা করা অবিবেচনার কায। বন্দুক ঘাড়ে কুচ করা সিপাহীর মত দলবদ্ধ হয়েও এ কাযে অগ্রসর হওয়া অন্যায়। এ ভাবে অনেকবার অনেক বিপদ ঘটতে শোনা গিয়েছে, কারণ আহত জন্তুটি যে কখন কোন পথে কি ভাবে এসে পড়ে তার নিশ্চয়তা থাকে না। যদি চারিদিক নিস্তব্ধ, বাক্যালাপ একেবারে নিষিদ্ধ হয়, তা হলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় আহত জন্তু নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা যদি কর, তা হলে দেখবে হয় সে মৃত, নয়ত এত দুর্ব্বল ও অক্ষম যে নির্ব্বিঘ্নে অবাধে তার কাছে এগিয়ে যেতে পার। Nemo me impune lacessit ভাবটাই তার মনে তখন রাজত্ব করে। তাই অকারণে উত্যক্ত করলে সম্ভবতঃ আক্রমণকারীর উপর প্রতিশোধ তোলবার চেষ্টা করে। এ সব সময় আমি কি করি জান? প্রথমে শিকারী ও অনুচরবর্গের একটা মন্ত্রণা সভা বসাই, তার পর চক্রাকার পথে অনুসন্ধানে তাদের পাঠিয়ে দি। প্রথমে তারা দেখে আগে কত দূরে সে গিয়েছে, তার পর ক্রমে সেই চক্রব্যূহ সঙ্কোচ করতে করতে আমরা এগিয়ে আসি। যদি পথে বেতবনের বাধা এসে পড়ে, তাহলে সে বনের মধ্যে হয়ত তাকে খোলা জমিতে বার করে নিয়ে আসবার জন্যে দু একটি হাতী থাকলে কাযটা সহজ হয়, হাতী অভাবে শিকারিদের দলবদ্ধ করে, হাতে মস্ত মস্ত এক একটা বাঁশ দিয়ে পাঠান ভাল, দূরে হতে বাঁশের খোঁচায় বেতবন হতে বাঘকে বার করে নিয়ে আস্‌তে পারে। পাহাড়ে জায়গায় নালার মধ্যে এক দল মেষ তাড়িয়ে পাঠান সব চেয়ে নিরাপদ পন্থা, এ অবস্থায় নালার কিংবা নদীর ধারে নিজে বন্দুক ঘাড়ে, খুঁজতে যাওয়া আত্মহত্যারি সামিল। এমন করে যে কতজনের যে কত বিপদ ঘটেছে সে কথা আর বলবার নয়। পাথরের ঢিবির পিছনে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে যে জন্তু লুকিয়ে বসে আছে সে তোমার গন্ধ পায়, আর তোমার পদশব্দ ভাল করে শোনে, সে নিজে মস্ত শিকারী, একটু শব্দ হতে না হতে সেই দিকে ফিরে দেখে। এ বিষয় তুমি নিজে পরখ করে নিতে পার। তোমার কুকুরকে মার, সে আরো শাস্তির ভয়ে টেবিল কিংবা কোচের নীচে গিয়ে আশ্রয় নেবে, তার পর তুমি যতই নিঃশব্দে পা-টিপে টিপে তার দিকে যাবার চেষ্টা করবে, দেখবে সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে তোমার দিকে দেখছে।

বাঘ, চিতা, ভালুক সবারি সম্বন্ধে এই এক কথাই খাটে, তবে ঋক্ষরাজ শ্বাপদ জাতির মত অতটা বেশী চতুর না, তা ছাড়া শ্বাপদের আর একটি বিশেষ সুবিধা অতি সামান্য আড়ালে কিংবা প্রস্তর খণ্ডের পিছনে আত্মগোপন করতে পারে। তুমি তোমার বন্দুক ব্যবহারে যতই ক্ষিপ্র হওনা কেন, হঠাৎ অতর্কিতভাবে তোমার উপর এসে পড়ে কাযে বাধা দেয়। নিজে কোন গাছ কি বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে থেকে, চারিদিকে নজর রাখার জন্যে গাছে মানুষ চড়িয়ে দেওয়া ভাল, আর মাঝে মাঝে সম্ভবপর জায়গাগুলিতে ঢিল

ছুড়ে সন্ধান নেওয়া মন্দ বুদ্ধি নয়। তবে সময়টা যদি সন্ধ্যার প্রাক্কাল হয়, তাহলে পরদিন প্রত্যূষের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকাই সুবুদ্ধির পরিচয়।

আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক। উৎসাহের বশে মৃতপ্রায় বাঘ কিংবা চিতার বেশী কাছে কখনো এগিয়ে যেয়োনা; এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে অনেকে বিপদে পড়েছেন। চলচ্ছক্তি রহিত মৃতপ্রায় বাঘের শরীরে মৃত্যুর যথার্থ লক্ষণ আবিষ্কার করা সহজ কথা নয়, শরীরটা যখন একেবারে অসাড় নিস্পন্দ দেখায় তখনও আর এক গুলি মেরে দেখা ভাল। নয়ত বন্দুক ঠিক রেখে, দূরে হতে বর্ষার খোঁচা দিয়ে পরখ করে নিলে ক্ষতি নেই। আমার এক শিকারী বন্ধু গল্প করেছেন, বাঘটিকে মৃত মনে করে হাতীর পিঠে তুলে বেঁধে নেবার পরও বেঁচে উঠতে দেখা গিয়েছে, মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে তার উত্তমাঙ্গ চূর্ণ করে তবে রক্ষা পায়। কয়েক বৎসর আগে কর্ণেল— আমায় বলেছিলেন, একবার এ রকম একটা বাঘ হঠাৎ বেঁচে উঠে, বাঁধন দড়ি সব ছিঁড়ে ফেলে, হাতী আতঙ্কে অধীর হয়ে চীৎকার করতে করতে দৌড় দেয়, তার পর বাঘটা পাশেই এক পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে, মাথায় শক্ত আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন একজন তার ঘাড়ের কাছে গুলি করে তাকে নিঃশেষ করে। পরে পরীক্ষায় আবিষ্কার হল প্রথম গুলি তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে নি, শুধু সামান্য একটু ছিদ্র করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফলে সে কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মাত্র।

প্রথম প্রথম যখন শিকার করতে আরম্ভ করি, সেই সময়ের একটি ঘটনা হতে আমি এই অত্যাবশ্যক জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলাম। গুলির আঘাতে বাঘটি ধরাশায়ী হবার পর, ম—দাদা তাকে টেনে বার করবার জন্যে উৎসুক হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু চেহারা দেখে তার মৃত্যু সম্বন্ধে তখনও আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। আমার অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি তার উপর আর এক গুলি মারতেই, এই মৃতবৎ জন্তুটি হুঙ্কার ছেড়ে, লম্ফ দিয়ে উঠে, তবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ভাগ্যবশতঃ আমরা পশ্চাতে ছিলাম, নতুবা শুধু তর্ক রোধ নয়, সত্বর সদ্‌গতির পথে সে আমাদের অগ্রসর করে দিত। আর একবার এমনি অবস্থায় পরিণাম শুভ হয়নি। শিকারীরা এসে চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, দু একজন উৎসাহী যুবক বাঘটাকে টেনে বার করবার জন্যে উৎসুক। দীর্ঘ বর্ষা দিয়ে বেতবনের মধ্যে বার বার খোঁচা দিচ্ছে। এ ব্যবহার আমার মনোমত হয়নি, তাই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। যে জন্তুটিকে একেবারে বাসি মড়া বলে বোধ হচ্ছিল, চক্ষের পলকে ঝাঁপিয়ে উঠে, সে আমাদের আক্রমণ করলে, যেন তার কিছুই হয় নি। ভাগ্যে আমি এগিয়ে ছিলাম, বন্দুকের মুখ তার মুখের উপর রেখে সম্বর্দ্ধনা করলাম, তার পর আর এগোতে হল না। যে সব শিকারীরা এতক্ষণ লম্ফ ঝম্ফ করছিলেন, আতঙ্কে পালাবার পথ দেখতে না পেয়ে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আর যাঁরা বেতবনের মধ্য দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সর্ব্বাঙ্গ লতার আলিঙ্গনে সুন্দর রক্তরাগ অভিজ্ঞানে সুশোভিত হল। তন্বী এই বনবল্লরীটি পত্রবিহীন, কিন্তু প্রসারিত কণ্টকিত শাখা বাহু দিয়ে যখন স্বাগত জানায়, সে হর্ষস্পর্শে আলিঙ্গিতের দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়। বহুদিন যাবৎ তার নিদর্শন শরীর ও মন হতে মিলায় না। জমির দখল নিয়ে অনেক দিন ধরে যখন লড়াই চলে, (আইনের অনিশ্চয়তা আর বিচারের দীর্ঘসূত্রতাই তার প্রধান কারণ) তখন দেখা যায় যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ কেউ অস্ত্ররূপে বংশদণ্ডে বেতসবল্লরী জড়িয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়, আর নির্ব্বিচারে নির্ম্মমভাবে চারিদিকে সেটা আস্ফালন করতে থাকে। বাবরিধারী লাঠিয়াল প্রাণ গেলেও এই অপরূপ অস্ত্রের সম্মুখীন হতে চায় না, কেননা একবার কোন রূপে যদি অস্ত্রটি তার সযত্ন রক্ষিত কেশদামের সংস্পর্শে আসে, তবে সে কৈশিকাঘাতে তার আর লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা থাকে না।

এক গুলিতেই শিকার, বাঘ কিংবা ভালুক, চিতা অথবা বন্য মহিষ ফর্‌সা হয়ে গিয়েছে বলতে বেশ, ভাবতেও কম গৌরব নয়, অন্যে এমন কথা বল্লে এ অহঙ্কারটুকু করলে আমার শুন্‌তে ভালই লাগে, কিন্তু আমার নিজের সময়ে সন্দেহ মাত্র থাকলে, এ আনন্দ আর এই গৌরব আমি শিকেয় তুলে রেখে, এক গুলির চেয়ে দুই গুলি ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। তোমার এ "মুকলিস" সুখ সম্ভোগের আমি পরামর্শ দেব না। আমার কাঁচা বুদ্ধির দিনে একবার এক গুলিতে বাঘকে ধরাশায়ী করে, সেটিকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে লোক ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, মাটীর উপর খানিকটা জমাট রক্ত রেখে সে কোথায় অন্তর্দ্ধান। চারিদিকে বন বাদাড় পিটিয়ে ওলট পালট করে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় কত খোঁজ করে কোথাও আর তার দেখা পাওয়া গেল না। তার এই তিরোধান দুঃখ আমি এখনও ভুলতে পারি নি। এ কথাটি কখনো ভুলোনা যে শিকারকে যত শীগ্‌গির পার একদম মেরে ফেলতে হবে, এতে কার্ত্তুস খরচের কার্পণ্য করলে চলবে না। এ যদি করতে পার, তা হলে আহত শিকার অনুসরণ করবার প্রয়োজন হবে না, বিপদের মুখে পড়বে না, কাযেই দুঃখের কোন কারণও ঘটবে না।

আহত জন্তু যে সর্ব্বদাই বিপজ্জনক হয় তা নয়, বরং অনেক সময়ে অতিশয় ভীরুর মতই ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের বহু পুরাতন প্রবাদে নখী দন্তী শৃঙ্গীকে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য বলে যে উপদেশ আছে, সেটা মেনে চলাই ভাল; তবে যতটা ব্যবধানের বিধান আছে তুমি অনায়াসেই অমান্য করতে পার।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।

রঙ্গ-তরঙ্গ

(১) পাথর বাটীতে ইংরেজী ঔষধ।

কোনও অপ্রানিত বিদ্যালয় হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ডাক্তার বাবু এক প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য পল্লীগ্রামে ডাক্তারী করিতেন; এবং ডিস্‌পেন্সারি খুলিয়া ঔষধ বিক্রয় করিতেন।

এক বৃদ্ধা জ্বরে কাতর হইয়া, তিন দিন তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ লইয়া যাইয়া সেবন করিয়াছিল; কিন্তু আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। চতুর্থ দিনে সে ডিস্‌পেন্সারীতে আসিয়া ডাক্তার বাবুকে কহিল, "বাবা! আমি তিন দিন তোমার অষুধ খেলাম, তবু ত জ্বরটা ছাড়ল না।"

ডাক্তার। দে, দে, ছ' আনা পয়সা দে; আজ এমন অষুধ দেব, জ্বর ত জ্বর, জ্বরের বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে।

বৃদ্ধা ছয় আনা পয়সা দিয়া, ছয় দাগ ঔষধ লইয়া, ডাক্তারখানা হইতে আপন কুটীরে ফিরিয়া গেল। পর দিন সকালে আবার সে ডাক্তারখানায় আসিয়া দেখা দিল; কহিল, "কাল রাত্রেও আমার জ্বর এসেছিল। একটু ভাল দেখে অষুধ দাও, বাবা। জ্বরটা যাতে আর না আসে, এমন একটু ভাল অষুধ দিও।"

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "অষুধ ত ভালই দিয়েছিলাম, বেটী; কিন্তু কাল যে একাদশী গিয়েছে। কোনও ডাক্তারের বাবার সাধ্যি নেই যে একাদশীতে জ্বর বন্ধ করে। আজ ঐ অষুধটা আর এক শিশি খা, জ্বরের নামগন্ধ থাকবে না।"

বৃদ্ধা অঞ্চলবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, ছয় আনা পয়সা গণিয়া দিয়া ঔষধ লইল। এবং বাড়ী ফিরিয়া

গেল। পরদিন প্রভাতে আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ অভিযোগ করিল।

ডাক্তার বাবু ললাটে চিন্তার রেখা চিত্রিত করিয়া ভাবিলেন যে, চিরকলঙ্কী চন্দ্রের উপর দোষারোপ করিয়া আরও কিছু দিন অতিবাহিত করিবেন। তিনি আপনার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "দেখ্, বুড়ী, তোর জ্বরটা বড় বাঁকা রকমের জ্বর; সাম্‌নের এই অমাবস্যাটা কেটে না গেলে তোর জ্বর ছাড়বে না।"

অমাবস্যা গেল, প্রতিপদ গেল, দ্বিতীয়া গেল, তথাপি বৃদ্ধার জ্বরের উপশম হইল না। তখন ডাক্তার বাবু নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়া, জ্বর আরোগ্য না হইবার কারণ নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কুপথ্যি করিস ?"

বৃদ্ধা। তুমি যা খেতে বল্‌ছ বাবা, তা ছাড়া অন্য কিছুই খাই নি।

ডাক্তার। কি কি খাস বল্।

বৃদ্ধা। দিনের বেলা চারটি ভাত, আর একটু মাছের ঝোল খাই।

ডাক্তার। রাত্রে ?

বৃদ্ধা। রাত্রে একটু খই-দুধ, আর দু' খানা বাতাসা খাই।

ডাক্তার। দিনে কি চা়লের ভাত খাস ?

বৃদ্ধা। তিন বছরের পুরাণো দাদ্‌খানি চালের ভাত খাই।

ডাক্তার। খইয়ের ধান বোধ হয় নতুন ?

বৃদ্ধা। না, তাও তিন বছরের পুরাণো।

ডাক্তার। তবে তুই বেটী ঠিক নিয়মমত অষুধ খাস্‌নে।

বৃদ্ধা। রোজ রোজ ঠিক দু'বার করে' অষুধ খেয়েছি; পয়সা দিয়ে অষুধ কিনে, কেউ কি বাবা তা না খেয়ে ফেলে দেয় ?

ডাক্তার। যে পাত্রে অষুধ খাস্ তা এনে আমাকে দেখা।

বৃদ্ধা অল্পকাল মধ্যে একটি কালো রঙের 'পাথর বাটী আনিয়া ডাক্তার বাবুকে দেখাইল।

তাহা দেখিয়া, ডাক্তার বাবু নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, "এই বেটী, সব মাটী করেছিস্। এত ভাল ভাল অষুধ সব বৃথায় গিয়েছে। কাঁচের পাত্রে অষুধ খাসনি। আমার এ তেজাল' ইংরিজি অষুধ, বেটী, তুই দিশি পাথর বাটীতে খেয়েছিস্! যা', বেটী, আর আমি তোর চিকিচ্ছে করবো না।"

(২) বিনা লাইসেন্সে বন্দুক।

ভগবতীচরণের একটী বন্দুক ছিল; কিন্তু তাহার ঐ বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না।

ভগবতীর বাল্যবন্ধু শশিভূষণ পক্ষীশিকারে বহির্গত হইয়াছিল। সে ভগবতীকে বলিল, "এস, গোটাকতক ঘুঘু মেরে আনা যাক। তোমার বন্দুকটা নিয়ে এস।"

ভগবতী কহিল, "আমার বন্দুকের লাইসেন্স নেই। পুলিশে যদি ধরে ?"

শশিভূষণ কহিল, "তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। সে আমি সাম্‌লে নেব এখন।"

অতএব দুই বন্ধুতে মিলিয়া বাগানে, বনে, মাঠে মাঠে, নানা প্রকার সুস্বাদু পক্ষী সকল হত্যা করিয়া, আপনাদিগের কণ্ঠবিলম্বিত ঝুলি পূর্ণ করিল; এবং দিবাবসান কালে ক্লান্তপদে গৃহাভিমুখে ফিরিল।

প্রত্যাগমন পথে, চৌমাথার এক পাহারাওয়ালা, নীল জামার উপর কটিতটে চামড়ার কোমরবন্ধ বাঁধিয়া এবং তাহাতে রুল ঝুলাইয়া পাহারা দিতেছিল। শিকারীদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া, তাহার লালপাগড়ী মণ্ডিত মস্তকে হঠাৎ কিছু লাভের প্রত্যাশা জাগিয়া উঠিল। সে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া পথরোধ করিয়া কহিল, "আজ কাল লাইসেন্‌ বেগর বন্দুক লে যানেকা হুকুম নেহি হ্যায়।"

কথাটা শুনিয়া ভগবতীচরণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শশিভূষণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তাহাকে পলায়নপর দেখিয়া, সুবুদ্ধি পাহারাওয়ালা তাহার

পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু সে পলায়নপর শশিভূষণকে সহজে ধরিতে পারিল না। শশিভূষণ এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায় এবং তাহার পর আর এক রাস্তায় প্রবেশ করিল। অবশেষে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে, দুই তিন জন পাহারাওয়ালা মিলিয়া শশিভূষণকে ধরিয়া ফেলিল।

ধরা পড়িয়া শশিভূষণ কহিল, "আমাকে ধর কেন? আমার অপরাধ কি?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "পাস বেগর কাহেকো বন্দুক লে যাতা হ্যায়?"

শশিভূষণ হাসিয়া, পকেট হইতে লাইসেন্স বাহির করিয়া, তাহা পাহারাওয়ালার নয়নাগ্রে প্রসারিত করিয়া কহিল, "এই দেখ আমার পাস।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের পেষকার বাবু কর্ম্মাবসানে বাটী ফিরিতেছিলেন। পাহারাওয়ালা তাহাকে চিনিত। সে পেষকার বাবুকে সেলাম করিয়া কহিল, "হুজুর, দেখিয়ে তো এই লাইসেনিঠো ঠিক হ্যায় কি নেই।"

পেষকার বাবু শশিভূষণের হস্তধৃত লাইসেন্সের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ ঠিক আছে।"

তখন শশিভূষণের দিকে ফিরিয়া পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "তব কাহেকো ভাগকে আয়া?"

"ডর হুয়া!—তাই ভাগা।"

"কাহে, ডর ক্যা?"

"দেখ, ছেলেবেলা থেকেই কেমন, পুলিস দেখ্‌নেসে হামারা ভারি ডর মালুম হোতা। তা ছাড়া, সেই যে আর একজন লোক ছিল, তার কাছে পাস নেহি থা। তাই হাম ভাবা, শেষে কি চোরা গাইয়ের সঙ্গে আমি কপিলে গাইও বাঁধা যাব!"

"উস্কো ক্যা নাম?"

"জানিনে।"

"উস্কো কাঁহা মকান?"

"কি জানি।"

তখন ভগবতীচরণকে ধরিবার জন্য পাহারাওয়ালা আবার চৌমাথার দিকে ছুটিল। কিন্তু কোথায় ভগবতী? সে তখন আপন গৃহের ছাদে বসিয়া, ষ্টোভ জালিয়া পক্ষীগুলি রন্ধন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৩) দিদির ভালবাসা।

বসন্তকুমার শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছিল। একদিন দিবাভাগে সে বহির্ব্বাটিতে একাকী বসিয়া ছিল। জামাই বাবুর সহিত কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তাহার দশম বর্ষীয়া শ্যালী তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শ্যালীর নাম সরলা। তার প্রতি তাহার ষোড়শী পত্নীর প্রেমের গভীরতা কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসন্তকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে সরলা, তোর দিদি আমাকে ভালবাসে?"

সরলা কহিল, "তোমাকে, জামাই বাবু? তোমাকে আমার দিদি খুব ভালবাসে।"

বসন্তকুমার আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি করে বুঝলি যে তোর দিদি আমাকে খুব ভালবাসে?"

সরলা কহিল, "দিদি তোমার নিন্দে একটুও সহ্য করতে পারে না। কাল মা তোমার নিন্দে করছিল।"

বসন্তকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি নিন্দে করছিলেন রে?"

সরলা বলিল, "মা বলছিল যে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি ঠিক বাঁদরের মত। কথাটা শুনে দিদি রেগে গেল।"

বসন্তকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "মাকে কি বল্লে?"

সরলা কহিল, "দিদি মুখ ভার করে বল্লে, মা, চেহারা দেখে তুমি কারও বুদ্ধির বিচার কোর না। বাঁদরের মত চেহারা হলেই বাঁদরের মত বুদ্ধি হয় না। দিদির কথা শুনে আমি বুঝলাম, দিদি তোমায় খুব ভালবাসে।"

(৪) বেদব্যাসের নিব।

রসময় ঘোষ বনেদী বড়লোক। তাঁহাদের বাটীতে অনেক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পুরাতন দ্রব্য

সংগৃহীত ছিল। একদিন তিনি তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ঐ সকল পুরাতন দ্রব্য দেখাইতেছিলেন। রামচন্দ্রের মোহর, ভীমের হাতের নিমকাঠের গদা, আলটামাস বাদশাহের পোলাও-রস-রঞ্জিত হস্তের ছাপ, নুরজাহান বেগমের নাকের নোলক, তানসেনের হাতের তানপুরা,—এইরূপ বহু দ্রব্য প্রদর্শিত হইল।

বন্ধু বাবু একটি রৌপ্যবিজড়িত স্ফাটিক করণ্ডক মধ্যে একখানি পুরাতন ডাকটিকিট দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ওহে! এই টিকিট খানা এত যত্ন করে রেখেছ কেন?"

রসময় বাবু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "ওটা বহুমূল্য সামগ্রী, সাত শো টাকা দিয়ে আমি খরিদ করেছি। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য, দু'হাজার বছর আগে পাটলিপুত্রের নন্দরাজাকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার খামে ঐ টিকিট আঁটা ছিল।"

শুনিয়া বন্ধু বাবু, রসময় বাবুর অপেক্ষা মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর করিলেন; এবং গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ওহে রসময়! আমার কাছে একটা খুব পুরাণো জিনিষ আছে; আমার বাবা তা হাজার টাকা দামে কিনেছিলেন। অবস্থা খারাপ যাচ্ছে, আমি এখন তা' পাঁচশো টাকা দামে বিক্রি ক'রতে রাজি আছি। কিন্‌বে? তুমি চার হাজার টাকা দামেও সে জিনিষ কোথাও পাবে না।"

রসময় বাবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিনিষটা কি হে?"

বন্ধু বাবু কহিলেন, "এই দেখ, আমার পকেটেই রয়েছে। এটি একটি পুরাণো নিব। শুনেছি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গণেশকে যখন মহাভারত ডিক্‌টেট্ করতেন, এই নিবটি দিয়ে গণেশ মহাভারত লিখেছিলেন। কিনবে?"

(৫) মির্জ্জা সাহেবের মুর্গী।

কোনও নগরে দুইটি পাশাপাশি বাড়ীতে দুই জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাস করিতেন। উহাঁদের মধ্যে একজন হিন্দু,—নাম শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য; আর একজন মুসলমান,—নাম মির্জ্জা নসীরুদ্দিন আহম্মদ বেগ সাহেব। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও দুই ডেপুটিতে বড়ই সদ্ভাব ছিল। শুনিয়াছি, যৌবনে তাঁহারা কলিকাতায় থাকিয়া একই কলেজে অধ্যয়ন করিতেন।

একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মির্জ্জা সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনার মুর্গীগুলো বড়ই উৎপাত আরম্ভ করেছে। জানেন ত আমরা হিন্দু; আমাদের কোন জিনিষ মুর্গীতে স্পর্শ করলে, তা অপবিত্র হয়ে যায়। তা, আপনার মুর্গীগুলো প্রায় আমাদের উঠানে চরতে যায়।"

মির্জ্জা সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা' আমি বিলক্ষণ জানি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তা কি রকমে জানেন?"

মির্জ্জা সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মুর্গীগুলো অন্য কোনও খানে চরতে গেলে, আবার বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু আপনার বাড়ীর দিকে চরতে গেলে, সেগুলো আর বাড়ী ফেরে না। চরতে গিয়ে যদি বাড়ী না ফেরে, তা হলেই আমরা বুঝতে পারি যে সেগুলো আপনার বাড়ীর দিকেই গিয়েছিল। আমি জানি, মুর্গীর স্পর্শে আপনাদের অন্য সকল জিনিষ অপবিত্র হয়, কেবল মুখবিবর অপবিত্র হয় না।"

(৬) খাঁটী দুধের যোগান।

হারাধন গোয়ালা দুধের কেঁড়ে ও কেঁড়ের মুখে ছোট একটি পরিমাপক ঘটি লইয়া, দুধের যোগান দিবার জন্য পাড়ায় বাহির হইয়াছিল। পথে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, সে দুধের কেঁড়ে মাটিতে রাখিয়া মস্তকে যুক্তকর স্থাপন করিয়া কহিল, "পেন্নাম হই, ভটচায মশাই। শরীর গতিক ভাল ত?"

ভট্টাচার্য্য। আহা আহা! বেঁচে থাক। কেমন আছ হারাধন?

হারাধন। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে আছি ভাল।

ভট্টাচার্য্য। ছেলেপিলে সব ভাল ত?

হারাধন। আজ্ঞে, আপনার ছিচরণের কৃপায় তারা ভাল আছে।

ভট্টাচার্য্য। এখন কোথায় যাচ্ছ?

হারাধন। আজ্ঞে, এই দুধের যোগান দিতে।

ভট্টাচার্য্য। প্রত্যহ কত দুধের যোগান দিতে হয়?

হারাধন। আপনার কল্যাণে, রোজ সতের সের দুধের যোগান দি।

ভট্টাচার্য্য। দুধ কি কিনে এনে যোগান দাও?

হারাধন। কেনা জলমেশান' দুধের যোগান দিলে, আপনার আশীর্ব্বাদে, কি এতগুলি খদ্দের বজায় রাখ্‌তে পারতাম? আমার সব দুধ নিজের গরুর বাঁটের খাঁটি দুধ। আপনার কল্যাণে, আমার নিজের তিনটি গাই আছে।

ভট্টাচার্য্য। তিনটিই কি দুগ্ধবতী?

হারাধন। না, আপাততঃ দুটো গাই দুধ দিচ্ছে।

ভট্টাচার্য্য। দু'বেলায় কত দুধ হয়?

হারাধন। আজ্ঞে, দুটো গাই দু'বেলায় প্রায় ছ'সের দুধ দেয়।

(৭) নির্ব্বোধ ভিক্ষুক।

ষ্টেশনের ফটকের নিকট এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতেছিল। দুই বন্ধু বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে আসিল। তাহাকে দেখিয়া একজন কহিল, "ওঃ! সেই ভিখারীটা এখনও আছে? এস, তোমাকে একটা মজা দেখাই। একে যদি তুমি একটি দু'আনি আর একটি পয়সা একত্র দেখিয়ে বল, এর মধ্যে তোর যেটা ইচ্ছে নে, ও এম্‌নি বোকা যে দুআনিটি ছোট বলে নেবে না; পয়সাটি বড় বলে নেবে, আর দুআনিটা ফেরত দেবে। অনেক লোক এটা বারবার পরীক্ষা করে দেখেছে, কিন্তু লোকটা কখনই দুআনি নেয়নি। এই দেখ।" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি দুআনি ও একটি পয়সা বাহির করিয়া ভিক্ষুকের সম্মুখে ধরিলেন। ভিক্ষুক পয়সাটি লইল, দুআনিটি কোনও মতে গ্রহণ করিল না।

তাহার পর, দ্বিতীয় বন্ধুও ঐরূপ দুআনি ও পয়সা ভিক্ষুকের সম্মুখে ধরিলেন। এবারও সে পয়সাটি মাত্র লইল। তাহা দেখিয়া আরও অনেকগুলি যাত্রী সেইরূপ পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু ভিক্ষুক কাহারও দুআনি স্পর্শ করিল না।

বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিলেন। দেখাদেখি আরও অনেকে, নির্ব্বোধ ভিক্ষুকের নির্ব্বুদ্ধিতার পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই রূপ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিল।

সন্ধ্যার পর ভিক্ষুক দিবসের উপার্জ্জন লইয়া আপন পর্ণকুটীরে ফিরিল। সেখানে তাহার স্ত্রী, দিবসের কায সারিয়া, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। সে তাহার ভিক্ষাপাত্রের পয়সাগুলি গণিয়া দেখিল। সে দিন একটাকা সাত আনার পয়সা লাভ হইয়াছিল। ভিক্ষুক-পত্নী লাভের পরিমাণ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "তুমি যদি রোজ রোজ এমনি পয়সা আন্‌তে পার, তাহলে আমাদের একটা পাকা ঘর হয়, আর আমার একখানা গহনা হয়। আচ্ছা, অন্য ভিখারীরা তোমার মত পয়সা পায় না কেন?

ভিক্ষুক কহিল, "অন্য লোকে আমার মত দুআনি না নিয়ে পয়সা নিতে জানে না।"

ভিখারিণী বলিহ, "কেন তুমি দু'আনি নেওনা কেন? তা হলে ত আমাদের আরও বেশী পয়সা হত।"

ভিক্ষুক হাসিয়া কহিল, "দূর ক্ষেপী! দুআনি নিলে, আমার বোকামীতে আমোদ পাবার জন্যে কেউ আমাকে কিছুই আর দিত না।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পূজার ব্যথা

তোরা যা লো সখি পূজা-মন্দিরে—
　　উলু দিয়া নে লো বরিয়া মায়,
তোদের প্রাণের প্রীতি-উল্লাস
　　চিরদিন যেন রহিয়া যায়!
চেয়ে দেখ কারো জোটেনা অন্ন.
　　লজ্জা ঢাকিতে বসন নাই,
আছে কত শত লুকায়ে নীরবে
　　ব্যথার অনলে ঢালিয়া ছাই!
পড়ে আছে যারা দূরে নির্জ্জনে,
　　ডেকে আনো আজি তাদের সবে;
না মিলিল যদি সব ভাইবোন,
　　তবে যে গো পূজা ব্যর্থ হবে।
বাদল রাতের আঁধার টুটিতে
　　বিজলী যেমন সতত রত,
বাংলা মায়ের এ পূজা তেমনি
　　চাহিছে মুছিতে হিয়ার ক্ষত।
জানি আমি সারা জীবনের জ্বালা
　　ক্ষণ উৎসবে ডুবিতে নারে,—
আকুল পরাণে যাচি তবু যেন
　　সবাই পূজায় মাতিতে পারে।

হরষ হরিয়া, যে যাতনা মোর
　　পরতে পরতে রয়েছে প্রাণে,
শরতে সে ব্যথা দ্বিগুণ হইয়া
　　নূতন করিয়া বেদন হানে।
শারদ শোভায় অতীতের স্মৃতি
　　শতরূপে আজ জাগিছে মনে,
পরাণে বাজিছে পুরাণো কাহিনী
　　বাঁশীর করুণ-রাগিণী সনে।
শিউলির সম শুভ্র বালিকা
　　আকুল পুলকে ডালাটি তারি—
ভরিয়া আনিত শেফালি পুষ্পে
　　রঙাইতে তার ঢাকাই শাড়ী।
সাধ করে' কভু বসিয়া বিজনে
　　মায়ের লাগিয়া গাঁথিত মালা,
মন্দিরে গিয়ে পরাতে যে তায়
　　কত অনুনয় করিত বালা।
গর্ব্বে ও সুখে উঠিত উছসি
　　হেরি গলে মা'র মালাটি তারি;—
অতীত সুখের এ স্মৃতি-কাহিনী
　　কেমনে গো সখী ভুলিতে পারি?

কত বোঝাবুঝি—কত যোঝাযুঝি
　　খোঁজাখুঁজি কত করিয়া সবে—
ধনীর আলয়ে বিয়ে দিনু তার,
　　গৌরী আমার সুখেতে রবে।
সে ছিল মোদের কোহিনুর মণি,
　　আঁধার ঘরেতে চাঁদের হাসি,
মরুভূর বুকে শান্তি-লহর,
　　নিরাশ হৃদয়ে আশার বাঁশী।
ভবিষ্যতের দুর্দ্দশা ঘোর
　　না ভাবিয়া, শুধু করিনু ঋণ;—
যোগ্য বরেতে সঁপিনু তাহারে,—
　　যায় যেন মা'র সুখেতে দিন।
একের চক্র বিশ্বভুবনে
　　ঘুরিছে নিয়ত সবার পিছে,
নিজের জীবনে পরখ করেছি
　　এ কথা কখনো নয়ক মিছে।
পিতা মাতা তার দীন দরিদ্র—
　　তত্ত্ব পাঠাতে পারেনি বলে,
লক্ষ্মী মেয়েটি পেল না আদর
　　স্বামীর বিরাট প্রাসাদ তলে।

অসহ জ্বালায় দহিয়া দহিয়া
দুঃখিনী মেয়ে জানাল মোরে,—
"মরিবার আগে একবার মাগো
দেখিতে কি আর পাব না তোরে ?
এত দিন সব সয়েছি নীরবে,
আর যে বেদনা সহিতে নারি ;
ঘৃণা অপমান গঞ্জনা ভার
কতকাল বল বহিতে পারি ?
সন্ধ্যায় নিতি জ্বর আসে মোর,
তাই নিয়ে কায করিতে হয় ;
রোগ শোক বোধ নাই আর মোর,—
যন্ত্রণা বুঝি করেছি জয় !
লাঞ্ছনা সদা কুড়াইয়া আনি
লুকাইয়া রহি এ বনবাসে,
তবু কেন সবে ফণিনীর মত
শক্তিহীনারে গ্রাসিতে আসে ?
তোমাদের সাথে সব বন্ধন
নিঠুরের মত ভুলিতে কহে ;
বিধির বিধান ভেঙে দিতে চায়,—
এমনও মূর্খ জগতে রহে !
যোগ্য তত্ত্ব না পাঠালে তারা
ফিরায়ে জীবনে দিবেনা হায়,
মোরে বিয়ে দিয়ে পিতা যে ভিখারী—
সে কথা কি কভু বুঝিতে চায় ?
রক্তশোষণ ব্যবসা যাদের,
তারা না শুনিবে বেদন বাণী ;—
আমার যাতনা তুমিই বুঝিবে,
তোমার দুঃখ আমিই জানি।
আশীষ করিও, অভাগিনী মেয়ে
আর যেন বেশী ব্যথা না সয় ;
মরণই যে তার বন্ধু এখন,
সেই হবে মাগো শান্তিময়।
মৃত্যুর পরে বিরাট সভায়
ভগবানে আমি কহিব যেয়ে,
আর যাই হোক—ভুলেও ভুবনে
কারো যেন কভু হয় না মেয়ে।"

প্রাণের রুধিরে লেখা যে আখর,
হতাশ নিশাসে যে লিপি ঢাকা—
কালের সাগরে নাহি লয় তার,
চিরতরে হৃদে রয় যে আঁকা !

যায় যাক সব—ক্ষোভ নাই তাহে,
তবু একবার আনিব মা'রে।
গেল পিতা তার ষষ্ঠীর দিনে
তত্ত্ব লইয়া আনিতে তারে।
সপ্তমী কাটে আসার আশায়,
অষ্টমী গেল উতলা-ভরে ;
নবমী-বাঁশীর করুণ সুরেতে
না পারিনু আর থাকিতে ঘরে।
কোন কাযে মোর বসিল না মন,
গেনু কতবার ঘাটের পাশে ;
দূরে কভু ছোট নৌকা হেরিয়া
ভেবেছি বুঝি বা গৌরী আসে।
পাগলের মত কাটাইনু দিন
বহিয়া পরাণে ভাবনা শত,
বিভীষিকাময় স্বপন দেখিয়া
ভয়ে শিহরিয়া উঠেছি কত !
বিজয়ার দিনে একাকী ফিরিয়া
গৌরীর পিতা আসিল যবে,
আকুল হৃদয়ে শুধাইনু আমি—
মেয়েকে তারা কি দিবে না তবে ?
আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া
বলিল—"গৌরী—হোথায় সে,
বীরের মতন যুদ্ধ জিনিয়া
সিদ্ধি আজিকে পেয়েছে সে।
বনের পাখীটী মুক্তি লভেছে,
ফিরিয়া পেয়েছে শান্তি তার ;

দুঃখ শোকের কঠিন নিগড়ে
কতকাল বাঁধা রহিবে আর ?"
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িনু লুটিয়া,
গৌরী আমার বাঁচিয়া নাই !
নীরবে অসহ জ্বালায় জ্বলিয়া
অকালে মা মোর হল যে ছাই।

তোরা যা লো সখি পূজা-মন্দিরে,
আমি রব একা সবার আড়ে,
কি জানি আমার নীরস পরশ,
তোদের হরষ নাশিতে পারে।
তুষানলে যার দহিছে হৃদয়,
উৎসবে তার নাহি যে ঠাঁই ;—
আনন্দ-হাসি কলরব মাঝে
বল তোরা, আমি কেমনে যাই ?

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বিদেশী

(গল্প)

সরকারী গেজেটে নৃসিংহচন্দ্র সিংহ আজমীড়-মার-ওয়ার বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া বদলি হইলেন।

চক্রবেড়ে রোডের উপর নৃসিংহ বাবুর বাড়ী। নীচের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো ছিল। কিন্তু আজমীড় যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব্বে সে ঘরের শ্রী বদলাইয়া গেল। তাহার আসবাবপত্র ছবি ছত্রী সব অন্য ঘরে বাহিত হইল। আর বড় বড় ট্রাঙ্ক ও প্যাকিংকেসের রাশি ঘরের মেজেতে স্তূপীকৃত হইল।

বিকালের রোদ তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঘরটিতে অন্ধকার কেবল বাসা বাঁধিবার জোগাড় করিতেছিল। এমন সময় একটি যুবক অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতরে কিছু কলরব থাকিলেও বাহিরের ঘরে জনমানবের সাড়া পাওয়া গেল না। এতগুলি লেবেলমারা বিছানা বাক্স সে ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই নাই—আগন্তুক যুবক একটি প্যাকিং কেসের উপর বসিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ নৃসিংহ বাবু এক তাড়া চাবি বাজাইতে বাজাইতে সেই ঘরে আসিলেন। যুবক যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। ঈষৎ অন্ধকারের আবছায়ায় একটি অপরিচিত লোককে এমন নিশ্চিন্তভাবে প্যাকিং বাক্সের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নৃসিংহ বাবু একেবারে চটিয়া লাল হইলেন ; বলিলেন—

"কেহে বাপু তুমি ? তুমি এখানে বসে কি কচ্চ ?"

যুবক একটু থতমত খাইয়া গেল। সে যে বসিয়া থাকিয়া কোনও অপরাধ করিয়াছে, তাহা তার মনে হয় নাই। বাহিরের ঘরে কি লোক আসিতে মানা ? তাহাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে দেখিয়া নৃসিংহ বাবুর স্বর পঞ্চম ছাড়াইয়া উঠিল। তিনি স্বর ও মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ? কে তুমি ?"

এইবার যুবক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল ; একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমি বিদেশী।"

"বিদেশী, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি ; তোমার নাম কি ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম—আমার নাম—আজ্ঞে বিদেশী।"

"তুমি এখানে কি কচ্ছিলে ?"

"আজ্ঞে, এই বসে ছিলাম।"

"বেশ কচ্ছিলে।—বসে ছিলাম! কি কচ্ছিলে বল, নয়ত পাহারাওয়ালা ডাক্‌ব।"

"আজ্ঞে, পাহারা দিচ্ছিলাম।"

নৃসিংহ বাবু ব্যঙ্গের স্বরে 'পাহারা দিচ্ছিলাম', বলিয়া উচ্চস্বরে "পাঁড়ে, পাঁড়ে" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পাঁড়েজি শ্মশ্রুরাজির গ্রন্থি পাকাইতে পাকাইতে আসিয়া হাজির হইল। তখন নৃসিংহবাবু তাহাকে তেমনই উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদন কাঁহা গিয়া? চাপ্‌রাশী ?"

পাঁড়ে একটি চক্ষু একটু উৰ্দ্ধে তুলিয়া বলিল—"তাইত বাবুজি, মদ্‌না ত হিঁ-ই রহা, তার পর কোথা চলিয়ে গেছে।"

এইবারে নৃসিংহ বাবুর স্বর নামিল, তিনি একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "দেখোত পাঁড়ে, ও কাপড়া আপড়া লেকে গিয়া কি নেহি ?" দেখা গেল, কাপড় চোপড় লইয়াই মদন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। নৃসিংহবাবু যেন আপন মনে বলিতেছিলেন, "যাঃ কাল বেটার মাইনে শোধ করে নিয়েছে কি না, আজ ভেগেছে। এই এখুনি আমার রওনা হতে হবে। এখন কোথায় লোক খুঁজি!" নৃসিংহ বাবু আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "কিহে বাপু, তুমি কি চাও ?"

"আজ্ঞে, চাকরীর জন্য আপনার কাছে—"

"কি চাকরী তুমি করবে? লেখাপড়া কতদূর করেছ ?"

"আজ্ঞে সে বড় বেশী দূর নয়। তবে আরদালী গিরি কাম করতে পারব বোধ করি।"

"সে কি! তোমাকে ত ভদ্রলোকের ছেলে বলে বোধ হচ্ছে; তুমি আরদালীর কাজ করবে কি ?"

"হুজুর, তাই জোটে কোথা! ভদ্রলোকের ছেলের কি অন্ন আছে ?"

"তুমি আর কোথায়ও কাজ করেছ ?"

"আজ্ঞে হাঁ, মেটিয়ার কলেজে বনফোড় সাহেবের কাছে কিছুদিন কাজ করেছি।"

"আচ্ছা বেশ! আমার সঙ্গে আজমীড় যেতে রাজি আছ? আজ সন্ধ্যার পরেই যেতে হবে, পারবে ?"

"আজ্ঞে, না পারলে হবে কেন? আপনি যেকালে যাচ্ছেন—"

"মাইনে কত চাও ?"

"আজ্ঞে মদন বার টাকা পেত, আমিও তাই চাই—"

"বেশ! মদনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি ?"

"আজ্ঞে সেই ত আমায় একটিনি দিয়ে চিজবস্তের হেফাজৎ করতে বলে গেল।"

"ওঃ"—বলিয়া নৃসিংহ বাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন। পাঁড়েজি চোখের কোণে হাসির একটু মিঠা মৌড় দিয়া, বনাইয়া আসিয়া বলিল, "তেরা নাম ক্যা রে বাবা ?"

২

নৃসিংহ বাবুর পরিবার বেশী বড় নহে। আজমীড়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও একটি ছোট খাটো পরিবারেরই উপযোগী। তবে সাহেবী ধাঁজে ছোট বাংলোটি বেশ সাজানো। তারের বেড়া দিয়া ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি বৃক্ষলতার নিবিড় কুঞ্জ, তারই মাঝখানে ছোট বাংলাটি। লাল পাথরে মোড়া বারান্দা হইতে একটি লাল মাটির রাস্তা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বরাবর ফটকের বাহিরে আসিয়াছে এবং আনা সাগরের তীরে দুগ্ধফেন সদৃশ শ্বেত মর্ম্মরের যে দোলমঞ্চগুলি আছে, তাহার বেদিকা প্রান্ত চুম্বন করিয়াছে। নৃসিংহ বাবুর পূর্ব্বে যে সাহেব ঐ পদে ছিলেন, তাঁহারই কলানৈপুণ্য বাংলোখানির প্রতি অঙ্গে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাংলোটির একার্দ্ধ আফিস; অপরার্দ্ধ বাসভবন। আফিসের সম্মুখে একখানি টুলের উপর আরদালী বসিয়া থাকে। তাহার আকৃতি নাতিদীর্ঘ হইলেও সে তাহার পাগড়ীটি এমন উচ্চভাবে বাঁধিয়া লইয়াছিল যে, তাহাকে রাজপুতদের মতই লম্বা দেখাইত। তাহার সমস্ত মুখ বসন্তের দাগে এমন করিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার চেহারায় যে কোনও দিন কিছু কমনীয়তা ছিল, তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইত। তাহার শ্যামবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ টেরা হইয়াছে, মস্তকের কেশ বিরল ও পাঁশুটে হইয়াছে। মোটের উপর তাহাকে দেখিলে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আরদালীগিরির যোগ্য বলিয়া মনে হইত না। সে বোধ হয় তাহা বুঝিত, সেই জন্য আরদালীর মত যাহাতে তাহাকে দেখায়, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিত। আজমীড়ে পৌছিয়াই শুভ্র লংক্লথের বুটিদার চাপকান ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইল, এবং সাহেবদের খানসামারা যেমন সাদা জড়ানো পাগড়ী পরে, সেইরূপ পাগড়ীও সংগ্রহ করিয়া লইল। পোষাক পরিয়া সে টুলের উপর সোজা হইয়া বসিত এবং মদন চাপরাশীর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া আপনাকে যতদূর মানাইয়া লওয়া যায়, সে তাহার চেষ্টা করিত।

এ বিষয়ে পাঁড়েজি তাহার শিক্ষাদাতা ছিল। পাঁড়েজি অল্প আলাপেই বুঝিয়াছিল যে এ 'নয়া আদমী' তাহার সাগরেদ হওয়ার বাসনা রাখে। সে বহুদিন নৃসিংহ বাবুর নকরী করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সে সযত্নে বিন্দু বিন্দু করিয়া ওজন পূর্ব্বক নবাগত চাকর ঝি ও চাপরাশীকে বাঁটিয়া দিত। মদন তাহার এই মুরব্বিয়ানার কিছু বিরোধী ছিল, সেই জন্য মদন চলিয়া যাওয়ায় পাঁড়েজির আনন্দই হইয়াছিল বেশী। বিদেশী সকল বিষয়ে ওস্তাদের মুখাপেক্ষী। তাহার কথা সে কোনও দিন ফেলেই না; বরঞ্চ সে সাহেবের চাপরাশী হিসাবে যে খুব বকশিশ পাইত, তাহার অনেক পরিমাণ পাঁড়েজির আফিম ও অন্যান্য সরঞ্জামে ব্যয় করিত। পাঁড়েজি প্রকাশ্যভাবেই বলিত যে "বিদেশী ভালমানুষের ছেলিয়া"। সাধু সন্ন্যাসী যেরূপ চেলাকে বাচ্চা বা বেটা বলিয়া সম্বোধন করেন, পাঁড়েজিও বিদেশীকে সেইরূপ কখনও বাচ্চা, কখনও বেটা বলিয়া আদরে ডাকিত। কোনও কাজ বিদেশীর পক্ষে কিছু শক্ত হইলে পাঁড়েজি নিজে কোমর বাঁধিয়া সেই কাজ করিয়া দিত, তাহাকে বলিয়া দিতে হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে পাঁড়ে বলিত, "ও বাউরা হ্যায়। ওর মেজাজ আচ্ছা নেহি রয়তা।"

বিদেশীর যে একটু পাগলের ছিট আছে, তাহা নৃসিংহ বাবু কিম্বা তাঁহার কন্যারও মনে হইত, কারণ সে কখনও কখনও হাসিয়া খেলিয়া মনের খুসীতে সব কাজ করিয়া যাইত; আবার কখনও কখনও একেবারে গম্ভীর ও বিষন্ন হইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দিয়া কোনও কাজ করান প্রায় একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িত। নৃসিংহ বাবুর মাতা বলিতেন, আহা থাক্, ওকে আর কষ্ট দিওনা। বাছা তোমাদের জন্যে রাত দিন খেটে খেটে পেরে ওঠে না।"

বিদেশীর রাত দিন খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইবার কোনও সম্ভাবনা না থাকিলেও, সে 'ঠাকুরমা'র কাছে নিতান্ত শ্রান্তক্লান্ত ভাবে গিয়া কখনও কখনও ভ্রুটিত এবং খাটুনীর দোহাই দিয়া তাঁহার স্নেহ করুণার ভাণ্ডার লুটিয়া লইত। সে তাঁহার আদর কিছু অতিমাত্রায় পাইয়াছিল অন্য কারণে; তাঁহার বড় আদরের নাতি নাতিনী বিদেশীকে যে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। মা-হারা শিশু দুইটি অবসর পাইলেই বিদেশীর নিকট ছুটিয়া আসিত এবং তাহাকে তাহাদের খেলার উন্মুক্ত আসরে টানিয়া না আনিয়া ছাড়িত না। বৃদ্ধার স্নেহের দুলালেরা বিদেশীর সঙ্গ পাইয়া যেন এক অভিনব আনন্দ রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছিল! অমিয়ার বয়স সাত বছর, প্রসূনের এগারো। গত বৎসর তাহাদের মাতা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, শিশু দুইটি খেলার সময়েও যেন সেই

হারানো স্নেহের সুবর্ণ রেখাটি মাঝে মাঝে দেখিতে পাইত এবং খেলার মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িত। নিদাঘের রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে যেমন কোনও অলক্ষিত মেঘখণ্ডের ছায়া ঘাসের উপর পড়িয়া সে স্থানকে অকস্মাৎ মলিন করিয়া তুলে, তেমনই কোন্ অজ্ঞাত বিষাদের ছায়া এই লীলাচঞ্চল বালক বালিকার হৃদয় হঠাৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা কেবল তাহারাই বলিতে পারে। তবে এ সকল তাহাদের বৃদ্ধ ঠাকুরমার চক্ষু এড়াইত না। সুতরাং বিদেশীকে পাইয়া যখন এই দুইটি বালক বালিকা খেলায় ভুলিল, তখন তিনি যেন কতই শান্তি পাইলেন।

সংসারের ভার এই বৃদ্ধার উপরেই ন্যস্ত থাকিলেও গৃহিণী ছিলেন তাঁহার তরুণী নাতিনী—সুহাসিনী। সুহাসিনী ঠাকুরমার নিকট গৃহিণীপনার শিক্ষানবিশী করিয়া করিয়া যোড়শবর্ষে পাকা গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে শ্বশুরগৃহে কখনও যায় নাই, কিন্তু পিতৃগৃহের আরাম বিলাসও সে জীবনে বড় একটা উপভোগ করিতে পায় নাই। সুহাসিনীর মাতা, কন্যা যাহাতে সংসারের কাজে মন নিবিষ্ট করিয়া থাকিতে পারে, সে জন্য সর্ব্বদা তাহাকে কাজে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার শিক্ষাই দিয়াছিলেন। আজ মা নাই, তাই সে কায়মনোবাক্যে সংসারের কাজের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। শারীরিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিধাতা তাহার প্রতি কৃপণতা করেন নাই। যৌবনের পুলকস্পর্শে তাহার সমস্ত দেহ মন যখন সাড়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনই তাহাতে বাধা পড়িল। পিতার সহিত শ্বশুর-কুলের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় সে স্বামীর সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছে। কাজেই যৌবনের নব নব ভাবোন্মেষে ভাবিত রঞ্জিত হইবার অবকাশ সে পায় নাই। তাহাকে দেখিলে কখনও বালিকা, কখনও তরুণী বলিয়া মনে হইত। সে যখন গৃহকর্ম্মে নিপুণা গৃহিণীর মত নিবিষ্ট থাকিত, তখন তাহাকে পাঁড়েজি পর্য্যন্ত ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু যখন সে ভাই বোনের সঙ্গে খেলায় মাতিত, তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সে একেবারেই আত্মবিস্মৃতা বালিকা। বিদেশীকে লইয়া অমিয়া কিম্বা প্রসূন খেলিতেছে, এমন সময় সুহাসিনী যোগদান করিলে বিদেশী প্রথম প্রথম কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; কিন্তু সুহাসিনী তাহাকে নিষ্কৃতি দিত না। সে কাজের বাহানা করিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেও, ছোটরা তাহাকে জোরজবরদস্তি করিয়া টানিয়া লইত; তাহাতেও যখন সে রাজি হইত না, তখন সুহাসিনী তাহার উপর হুকুম চালাইত। 'মিস্ হুজুরে'র হুকুম বিদেশী তামিল না করিয়া পারিত না। খেলার আসরেও হুকুমের স্বরে সুহাসিনী বিদেশীকে বশ করিয়া ফেলিত। তখন বিদেশী চোখে বালি গিয়াছে কিংবা পা মচকাইয়া গিয়াছে বলিয়া হঠাৎ পলাইয়া যাইত। বিদেশী পরের চাকরী করিতে আসিয়াছে, পাছে কেহ মন্দ দেখে এই জন্য সে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। সে খেলা হইতে ছুটি পাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ছুটি লইত না। কারণ দিনের মধ্যে শত কার্য্যের ছল করিয়া সে "মিস্ হুজুরে"র ছায়াপথের পথিক হইত। সুহাসিনী যখন গৃহকর্ম্ম করিত, তখন নানা অছিলায় বিদেশী তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত। অলক্ষ্যে তাহার কত ছোট ছোট কাজ সে করিয়া দিত। জিজ্ঞাসা করিলে, শুধু হাসিত। বালিকা সুহাসিনী তাহার এই সেবাপরায়ণতায় আমোদ অনুভব করিত। যুবতী সুহাসিনী কখনও কখনও এজন্য নিজকে এবং কখনও বা বিদেশীকে শাসন করিত।

অমিয়া প্রসূন নিবিষ্ট মনে বিদেশীর নিকট গল্প শুনিতে আসিত; সুহাসিনীরও ইচ্ছা হইত, সেও যোগদান করে; কিন্তু সম্ভ্রম আসিয়া বাধা জন্মাইত। সে মাঝে মাঝে এজন্য বিদেশীর উপর রাগ করিত—বিদেশী যেন তাহার ভাইবোনকে তাহার [illegible] হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার পর সারিয়া যখন সে আপনার শয়নগৃহে আ[illegible]

দেখিত অমিয়া প্রহর বিদেশীর ঘরে গল্পে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। খানিকক্ষণ একলা থাকিয়া সে বিরক্ত হইত; একদিন সে বিদেশীর ঘরের নিকটে আসিয়া ডাকিল, "চাপরাসী!"

"জি মিস্ হুজুর" বলিয়া বিদেশী বাহিরে আসিল। সুহাসিনী বলিল, "বিদেশী, তুমি আমায় মিস্ হুজুর বল কেন?"

"ওরে বাপ্ রে! সাহেবও যেমন হুজুর, আপনিও তেমনই হুজুর। বড় সাপও সাপ, ছোট সাপও সাপ, হুজুর।"

"কিন্তু আমি ত মিস্ নই; তুমি আমায় মিস্ কেন বল্‌বে? আর মিস্ বল্‌তে পাবে না, আমি বলে দিচ্ছি।"

"জি, মিস হুজুর!"

"আবার বলে মিস্ হুজুর! আমার যে বে হয়েচে; যার বে হয়েছে, তাকে কি মিস্ বলতে আছে না কি?"

"জি হুজুর, খোদাবন্দ, আমার সেটা জানা নেই।"

"না বাপু, ওসব খোদামন্দ ফন্দ এখানে চল্‌বে না।"

"জি মিস হুজুর।"

"আর খেলে যা; বাবা এলে বলে দিয়ে তোমায় মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।"

"যে আজ্ঞে, গরীব পরবর; মালিক জনাব।"

সুহাসিনী বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল।

পাঁড়েজি সাগ্‌রেদের হিন্দীর দৌড় দেখিয়া খুসী হইল। সে হাসিতে গুম্ফের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বলিল, "ছুঁইছ বোলো, ছুঁইছ বোলো। নেই ত দিদি বাবু বোলো, আওর নেই ত মাই-জি বোলো।"

নৃসিংহ বাবু যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন পাঁড়ে ও বিদেশী তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বিদেশী অল্প দিনের চাকর হইলেও মনিবের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। তবে সে একটু খেয়ালী রকমের লোক ছিল বলিয়া পুরামাত্রায় তাহার উপর নির্ভর করা চলিত না। সংসারের কর্ত্তৃত্ব এক বালিকার স্কন্ধে চাপাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং কাজের খাতিরে মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইলেও, তিনি বাহিরে বেশী বিলম্ব করিতেন না, দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতেন।

কন্যার সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি তখন উড়িষ্যা সার্কেলে কাজ করিতেন। বিবাহের সময় নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কুটুম্বেরা পাড়াগাঁয়ের লোক; সামান্য কারণে কন্যাপক্ষের সঙ্গে গোলমাল করিয়া বিবাহের রাত্রিতেই বর লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। বরযাত্রীরা—বিশেষতঃ যাহারা বরের সমবয়স্ক—বিবাহ-সভায় বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছিল; তার পর স্ত্রী-আচারের সময় যখন তাহারা ঠেলিয়া অন্দর মহলে যাইতে উদ্যত হইল, তখন তাহাদিগকে কেহ কেহ নাকি গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। সেই অভিমানে বিবাহের জলপান করা দূরে থাক, বরযাত্রীরা সেই রাত্রেই বরকে লইয়া পলায়ন করে। বাসর ঘর হইতে বর যে 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল, আর তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। ইহাতে প্রথম প্রথম কন্যাপক্ষ মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। কিন্তু বহুদিন গত হইলেও যখন বরপক্ষ কোনও খোঁজ লইলেন না, বা বধূকে লইয়া যাইবার কোনই প্রসঙ্গ দেখা গেল না, তখন কন্যাপক্ষ বিধিমত ভাবে সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের মান ভাঙ্গিল না। নৃসিংহ বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া 'তত্ত্ব' পাঠাইলেন এবং জামাতাকে আনিবার অনুমতি প্রার্থ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক জামাতাকে পাঠাইবার নামও করিলেন না, 'তত্ত্ব' ফেরত পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন—"কন্যাকে যেন নিজ ব্যয়ে রাখিয়া যায়।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে বৈবাহিকটি গত হইয়াছেন; ছেলেটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। কিন্তু তাহার মেজাজ ঠিক তাহার পিতারই অনুরূপ। সুহাসিনীর মাতা বাঁচিয়া থাকিতে, অনেকবার তিনি তার মেসে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল লাঞ্ছনাই

তাঁহার ভাগ্যে জুটিত। নৃসিংহ বাবুর বিশ্বাস, কন্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই তাঁহার স্ত্রী অকালে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জামাতাকে একখানি মর্ম্মস্পর্শী পত্রও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরে যখন সহানুভূতি সূচক একটি ছত্রও পাওয়া গেল না, তখন তিনি একেবারেই হতাশ হইলেন।

কিন্তু একদিন এই নিরানন্দের মধ্যেও তাঁহার অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি গেজেট খুলিয়া তাঁহার জামাতার এম-বি পাশের সংবাদ পাইলেন; দেখিলেন প্রায় সকল বিষয়েই সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ ছিল যে, সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত-গবর্মেণ্ট যে ভারতীয় ভৈষজ্য কলেজ খুলিয়াছেন, তাহার অধ্যক্ষ ডাক্তার গডার্ট জোনকিলালকে পাঁচ বৎসরের জন্য পাঁচশত টাকা বেতনে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। নৃসিংহ বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মাতার সন্ধানে চলিলেন এবং মাতাকে এই সকল সংবাদ যখন জ্ঞাপন করিলেন, তখন বিদেশীর দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অমিয়া প্রসূন পর্য্যন্ত সেখানে গিয়া জড় হইল। তাহারাও পিতার সঙ্গে আনন্দ করিল; বৃদ্ধা কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সুহাসিনী কুট্‌নো কুটিতে কুটিতে হাত কাটিয়া ফেলিল। সকল চক্ষুই তাহার মুখের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। লজ্জায় তাহার মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিল এবং হাসা কাঁদার সন্ধিস্থলে তাহাকে যেন কেমন একরকম দেখাইতেছিল। বিদেশী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদেশীর ব্যবহার সুহাসিনীর নিকট অনেক সময় বড়ই অসঙ্গত বোধ হইত। যত দিন যাইতেছিল, ততই সে যেন আস্পর্দ্ধা পাইয়া কাছে ঘেঁসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুহাসিনীর ইহা মোটেই ভাল লাগিত না। সময়ে সময়ে সে বিদেশীকে একটু আধটু তিরস্কারও করিত; কিন্তু বিদেশী যেন এইরূপে সুহাসিনীকে বিরক্ত করিয়া আমোদ অনুভব করিত। এক দিন সে সন্ধ্যার পরে কয়েকটি জোনাকি ধরিয়া আনিয়া সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বলুন ত কি? যদি বল্‌তে পারেন হুজুর ত আমার এ মাসের মাইনে আপনাকে দেব।" প্রসূন ও অমিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সুহাসিনীর মুখ গম্ভীর হইল। বিদেশী জবাব না পাইয়া জোনাকী গুলি সুহাসিনীর গায়ের উপর ছুড়িয়া দিল। সুহাসিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল এবং তার পর দুই তিন দিন তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না।

সুহাসিনীর হস্তে জল দিবার জন্য জলপাত্র ও তোয়ালে লইয়া অনাহূতভাবে বিদেশী বারান্দায় অপেক্ষা করে। জল ঢালিয়া দিবার সময় একদিন সে অন্যমনস্ক ভাবে সুহাসিনীর গায়ে জল ফেলিয়া দিল এবং তার পর তাহার রোষদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া যদিও বিদেশী হাত যোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল, তাহা হইলেও সুহাসিনী সেই অবধি আর কখনও বারান্দায় হাত ধুইতে আসিত না। এইরূপ ছোটখাটো অনেক ঘটনায় বিদেশী সুহাসিনীর যৌবনোচিত সুপ্ত সংস্কার গুলিকে জাগাইয়া দিল। সুহাসিনী খেলা ধুলা একে একে সকলই ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া পড়িল।

সুহাসিনী বিদেশীর উপর বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারিত না। ভদ্রগৃহস্থ-সন্তান চাপরাশীর কার্য্য স্বীকার করিয়া আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া বহু দূরে আসিয়া তাহাদের আশ্রয়ে রহিয়াছে, একথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিত না। তাহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে বেশ বুঝা যাইত যে সে নিতান্ত পেটের দায়ে না হইলে এরূপ হীন ভাবে তাহাদের নিকটে পড়িয়া থাকিত না। মাতৃশোকাতুরা বালিকা দুঃখীর দুঃখ ভাল করিয়াই বুঝিতে শিখিয়াছিল। তাহার আরও মনে হইত যে, তাহারই মত কোনও গভীর দুঃখের ছায়ায় বিদেশীর হৃদয়ও অন্ধকার করিয়া দিয়াছে।

বিদেশী মাঝে মাঝে আপন [illegible] গান করিত। একদিন সে কোথা হইতে একটি টিনের বাঁশী সংগ্রহ

করিয়া আনিল। সুহাসিনীর খুব গানের সখ ছিল, সে নিজেও শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া গান শিক্ষা করিয়াছিল। গানের রস আস্বাদন করিবার শক্তিও সে কতকটা পাইয়াছিল। বিদেশীকে বাঁশী কিনিতে দেখিয়া সে বাঁশী শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ করিতে লাগিল।

"এখন একবারটি বাঁশী বাজাও না, বিদেশী।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর"—বলিয়া সে তাহার ঘর হইতে বাঁশী বাহির করিয়া আনিল এবং বসনাঞ্চলে ভাল করিয়া পরিস্কার করিয়া সেটি লইল। সে বার-কতক প্রশংসনেত্রে বাঁশীর চাকচিক্য নিরীক্ষণ করিয়া, আরও বার-কতক সেটাকে কাপড়ে মুছিয়া লইল। তার পরে বলিল—

"কি বাজাব, হুজুর ?"

"যা খুসী একটা বাজাও।"

বিদেশী বার-কতক বাঁশীতে ফুঁ দিল, দিয়া বলিল, "আমিত বাজাতে জানিনে; আপনি বাজাবেন, হুজুর? এইখানে ধরে ফুঁ দিতে হয়; এই দেখুন, হুজুর!" বলিয়া আরও জোরে বাঁশীতে সান দিল। হাসিনী ব্যাপার বুঝিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। আর সে বিদেশীকে কখনও বাঁশী বাজাইতে বলে নাই।

একদিন রাত্রে সে ঘুমাইয়াছে। অমিয়া প্রসূন তাহার দুই পার্শ্বে ঘুমাইয়া আছে। সে যেন স্বপ্নে দেখিল, বিদেশী দূরে গিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। জ্যোৎস্নার অলস মোহে তখন সমস্ত জলস্থল নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। আর তাহার মাঝখান হইতে যেন একটি সুর উঠিতেছে—বড়ই করুণ, বড়ই কোমল। সে যেন এমন কোনও দিন শুনে নাই। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য দিয়া জ্যোৎস্না যেন বাঁশীর সুরের রূপ ধরিয়া কি যে মোহ-প্রবাহ বহাইয়া দিল, তাহা সে অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল বটে, কিন্তু সে জাগিয়া যে সুরটি শুনিল, তাহাও কম মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। গবাক্ষে দাঁড়াইয়া সে খানিকক্ষণ বাঁশী শুনিল। বিদেশীই যে বাঁশী বাজাইতেছে, সে সম্বন্ধে সে সন্দেহ করিতে পারিল না। সে দরজা খুলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারিল যে বিদেশী ঘরের কপাট জানালা বন্ধ করিয়া বাঁশী বাজাইতেছে; সেই জন্যই মনে হইতেছিল যেন বাঁশীর সুর অনেক দূর হইতে আসিতেছে। দূরত্বের জন্য বাঁশী আরও মিষ্ট শুনাইতেছিল।

সুহাসিনী ঘরে ফিরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল এবং যতক্ষণ বাঁশী বাজিল, ততক্ষণ অনন্য মনে তাহা শুনিতে লাগিল। তার পর, যখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন তাহার উপাধান অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। পরদিন একটি কথা বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, বিদেশীর মনে কোনও গভীর দুঃখ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; বিদেশী বড়ই গরীব, বড়ই দুঃখী। কিন্তু সে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল বলিয়া, সুহাসিনী বাঁশীর সম্বন্ধে বিদেশীকে আর কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। তবে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে যখন এমনই বাঁশী বাজিয়া উঠিত, তখন সে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিত না।

•

নৃসিংহ বাবু সফরে বাহির হইয়াছেন। এবারে ফিরিতে চার পাঁচদিন বিলম্ব হইবে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতা সন্ত রোগ হইতে উঠিয়াছেন, তাঁহার কোনও কষ্ট না হয়, এজন্য পুনঃ পুনঃ সুহাসিনীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরমার শুশ্রূষার ভার সুহাসিনীর উপরেই পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন্ সূত্রে বিদেশী নিজস্কন্ধে যে সে ভারটি তুলিয়া লইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। বিদেশী এমনই পরিপাটী ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল যে, নৃসিংহ বাবু ও সুহাসিনী স্বেচ্ছায় তাহার উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; সেও অক্লান্তভাবে সেবা করিয়া বৃদ্ধাকে সে যাত্রা বাঁচাইয়া তুলিল।

কিন্তু নৃসিংহ বাবু যাত্রা করিবার দুই একদিন পরেই সুহাসিনী রোগে পড়িল। তাহাকে দেখিবার মত সামর্থ্য বৃদ্ধার এখনও হয় নাই। সুতরাং বিদেশীই তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে মাঝে মাঝে তাহাকে বাতাস করিতে যাইত; কিন্তু তাহাতে

সুহাসিনী সোয়াস্তি বোধ করা দূরে থাক, অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিত। অথচ বিদেশী তাহার ঠাকুরমার যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই তাহার সেবা প্রত্যাখ্যান করিলে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়, এই জন্য সে বিরক্ত হইলেও সেকথা তাহার মুখের উপর বলিতে পারিত না।

একদিন তাহার অসুখ অত্যন্ত বাড়িল; সে জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে মাঝে মাঝে সে জ্ঞান হারাইতে লাগিল। তাহার অসুখ যে বাড়িতেছে সে তাহা নিজে বুঝিতে পারিল এবং পাঁড়েজিকে ডাকিয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য অবিলম্বে যাইতে বলিল। পাঁড়েজি রাত্রি ১২টার ট্রেণে চিতোরগড় অভিমুখে রওনা হইল এবং তাহার সাগরেদকে সাবধান করিয়া গেল যেন তাহার মুখ রক্ষা হয়। পাঁড়েজির দায়িত্বেই যে বিদেশীর চাকরী —একথা পাঁড়েজি সব সময়ে বিশেষ গৌরব করিয়াই বলিত।

কিন্তু পাঁড়েজি রওনা হইবার পর সুহাসিনীর জ্বর আরও বাড়িতে লাগিল। সুহাসিনী একটু তন্দ্রাভিভূত হইতেই বিদেশী ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল; এবং ডাক্তার যদিও তত রাত্রে পাওয়া গেল না, তাহা হইলেও সে একটি ডাক্তারখানায় গিয়া অনেক কষ্টে কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিয়া আনিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন সুহাসিনীকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিতে গেল, তখন সে চক্ষু মেলিয়া বিদেশীকে দেখিল, তার পর ত্রস্তভাবে ডাকিল—"বিদেশী।"

বিদেশী বলিল, "কোনও ভয় নেই, এই ওষুধটুকু খেলেই ঘুম হবে।"

"ওষুদ আমি খাব না, বিদেশী।"

"কেন খাবেন না? আমি যে কত কষ্ট করে এই দুপুর রাত্রে আপনার জন্যে ওষুদ এনেছি—আর আপনি খাবেন না! তা হলে হুজুর কুঠীতে ফিরে আমায় কি বলবেন?"

"আচ্ছা দাও, খাই। ওতে আমার কিছু হবে না।"

"কেন হবেনা? খেলেই ভাল হয়ে যাবেন, আমি বলছি। খুব ভাল ডাক্তারের ওষুধ, খেয়ে ফেলুন।"

সুহাসিনী বিদেশীর হাত হইতে ঔষধ লইয়া খাইল এবং বলিল, "বাঁচব না বোধ হয়। বাবাকে বলো, আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। আর চাপরাশী,—তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমাও, নইলে তোমার কষ্ট হবে।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর"—বলিয়া বিদেশী বাহিরে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী আবার ডাকিল, "বিদেশী, ভাই, তুমি বারান্দায় ঘুমাও। নয়ত আমার ভয় করবে।"

বিদেশী হাসিয়া বলিল, "ভয় কি? আমি কাছেই আছি। দুঘণ্টা বাদে আবার ওষুধ দিতে হবে যে।"

বিদেশী হাসিয়া বলিল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর যেন ভারী হইয়া উঠিল। সুহাসিনী তাহা বুঝিতে পারিল; রোগের সময় অনুভূতি কখনও কখনও তীক্ষ্ণ হয়।

সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর জন্মে তুমি আমাদের কেউ ছিলে কি না জানি নে; কিন্তু তোমাকে যেন চিরপরিচিত আত্মীয় বলে মনে হয়। ভগবান তোমার ভাল করবেন।"

সুহাসিনী পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল; বিদেশী তাহারই শিয়রে বসিয়া রহিল। আজ এই দুর্দ্দিনে বিছানায় বসিতে সে সংকোচ বোধ করিল না।

রাত্রি যখন আড়াইটা কি তিনটা, তখন একবার ঔষধ দিয়া বিদেশী তাহার ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। শেষ রাত্রে যখন দেখিল ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং রোগিণী ক্রমশ সুস্থ বোধ করিতেছেন, তখন সে ঘুমে ঢলিতে লাগিল। তার পর কখন যে সে শয্যার এক পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বেচারী জানিতে পারে নাই।

ভোর হইতেই সুহাসিনী চক্ষু মেলিল। বিদেশীকে তাহারই শয্যার প্রান্তে দেখিয়া সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। সে প্রস্থনকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিল এবং বিদেশীকে জাগাইয়া দিতে উঠিল। বিদেশী

হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া রোগিণীর দিকে অর্দ্ধ উন্মীলিত নয়নে চাহিয়া দেখিল এবং তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ?"

পরক্ষণেই সে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল এবং পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যার ট্রেণে নৃসিংহ বাবু ফিরিলেন, তখন সুহাসিনী অনেকটা ভাল ছিল। ঔষধ রীতিমত দেওয়া হইতেছিল। দুই চার দিনের মধ্যেই সে অনেকটা সামলাইয়া উঠিল। তাঁহার মাতাও আজকাল একটু একটু করিয়া সংসারের কাজে হাত দিতে পারিতেছেন। একদিন রাত্রে যখন সকলে শয়ন করিয়াছেন, তখন নৃসিংহ বাবু বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে বিদেশীকে ডাকিলেন। বিদেশী তখন ঠাকুরমার নিকট হইতে একখানি দাশুরায়ের পাঁচালী চাহিয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতেছিল।

নৃসিংহ বাবু বলিলেন, "বিদেশী, আমার কাছে তুমি বেশী দিন কাজ করনি বটে, কিন্তু এরই মধ্যে তোমার কাজে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু তোমায় ছেড়ে দিতে হচ্চে আমাকে। এবার মফঃস্বল থেকে এসে দেখলাম, সুহাসি তোমার ব্যবহারে ততটা খুসী নয়। তুমি যে তার সেবাশুশ্রূষা করেছ, এজন্য সে তোমার নিকট খুব কৃতজ্ঞ। অথচ কিসে যে চটে গেল, সেটা আমি বুঝতে পারিনে। এ দিকে তোমার সুখ্যাতি কচ্চে খুব, কিন্তু আবার জেদ ধরেচে যে কিছুতেই তোমাকে রাখা হবে না। মেয়েদের মনের গতি বোঝা ভার। আমি, বাবা, তোমার হিসেব করে রেখেচি, কাল সকালে তুমি অন্যত্র যেতে পার।"

বিদেশী খুব যে দুঃখিত হইল, তাহা বোধ হইল না। সে নৃসিংহ বাবুর স্বাভাবিক সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। আজ সে চাকরীতে জবাব পাইয়া প্রথামতই বলিল, "যে আজ্ঞে, হুজুর।"

পরদিন প্রাতে আর তাহাকে দেখা গেল না। গাড়েজি স[illegible] ন হায় হায় করিয়া কাটাইল। সেদিন অমিয়াপ্রসূন বা সুহাসিনী কাহারও মুখে হাসি ছিল না।

ইহার পর দুইতিন মাস কাটিয়া গেল। একজনের স্থলে তিনজনকে রাখিয়াও কাজের তেমন সুবন্দোবস্ত আর হইল না। নৃসিংহ বাবুর ছেলে মেয়েরা বিদেশীকে যেমন করিয়া পাইয়া বসিয়াছিল, তেমন করিয়া আর কাহারও সঙ্গে মিশিল না। নৃসিংহ বাবু তাহাদের জন্য সকালে বিকালে মাষ্টারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এমনিভাবে নিয়মের লৌহবর্ত্মে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার একরূপ চলিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তিনি একখানি টেলিগ্রাম পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার জামাতা দিল্লী হইতে টেলিগ্রাম করিতেছেন যে তিনি কিছুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছেন; সত্বর তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।

নৃসিংহ বাবু জামাতার অসুখের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যাকে যে লইতে চাহিয়াছে, ইহাতেই তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার মাতাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অমিয়া প্রসূনও সুতরাং যাইবে।

পরদিন প্রাতে জোনাকীর মাতুল সরসীলাল, ইঁহা দিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। বধূবর্জ্জনে ইঁহারই হাত ছিল কিছু বেশী। কিন্তু সময়ের গতিকে ইঁহাকেই দূত সাজিয়া আসিতে হইল। নৃসিংহবাবু ইঁহাকে একবার বৈবাহিক বলিয়া আহ্বান করিলে, ইনি তাঁহাকে কটু কথা শুনাইয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। আজ তিনিই আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রথম অভিবাদন করিলেন। কিন্তু সে সময়ে যে তিনি আপনার ভাগিনেয়কে ঠিক আশীর্ব্বাদ করিতে ছিলেন এমন বোধ হইল না। যাহা হউক, সেই দিনই একজন চাপরাশীকে সঙ্গে দিয়া নৃসিংহ সকলকে পাঠাইয়া দিলেন এবং বৈবাহিককে বলিলেন যে, তিনি ছুটির আবেদন করিয়া উপরে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তাহার জবাব আসিলেই তিনিও দিল্লীতে রওনা হইবেন।

সুহাসিনী ঠাকুরমাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে পৌঁছিল। জোনাকিলালের বাসা চৌকের ধারে দেল-খোস বাগীচার নিকটে ছিল। বাসাটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও বাগীচার জন্য বেশ থটথটে ও ঝকঝকে দেখাইত। একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া ষ্টেশন হইতে সুহাসিনীদের লইয়া গেল। সুহাসিনী সারাপথ কৌতূহল ও আশঙ্কার বেদনা ভরা আবেগ বহিয়া লইয়া চলিল। মিছির ঠাকুরের মুখে যদিও সে সংবাদ পাইল যে ডাক্তার সাহেব কিছু ভাল আছেন, তথাপি তাহার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ যাত্রায় হৃদয় বড়ই অশান্তভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল, একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। সে বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, টুলের উপর একখানি শ্লেট ও পেনসিল লইয়া বিদেশী বসিয়া আছে। তাহার মাথায় তেমনই শুভ্র পাগড়ী শোভা পাইতেছিল। সে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সেলাম করিল। অমিয়া ও প্রসূন ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "তুমি এখানে এসেছ বিদেশী; তা বেশ, এমন করে না বলে কয়ে কি চলে আসতে আছে?"

সুহাসিনী অধরকোণে একটু হাসির আভাস দিয়া অন্দরের দিকে চলিল। তাহার হৃদয় আর একটি প্রত্যাশিত ঘটনার জন্য বড় দুরুদুরু করিতেছিল। মিছির জিনিষপত্র টানিয়া ঘরের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুহাসিনীর চক্ষু প্রতি কক্ষে কাহার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বিদেশী বলিল, "ডাক্তার সাহেব ডাক্তারখানায় গেছেন, এখনই আসবেন। ছির্ পতিয়া গোছলখানামে পাণি দে।"

কিছুক্ষণ বাদে জোনাকীলাল সাহেবী পোষাকে একখানি ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং অতি কষ্টে গড় হইয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মা বলিলেন, "কে বিদেশী?"

জোনাকীলাল সংশোধন করিয়া কহিলেন, "না ঠাকুরমা, আমি শ্রীমান জোনাকীলাল রায়; আপনার নাতজামাই।"

অমিয়া ও প্রসূন একটু সরিয়া গেল; তাহারা ভাল করিয়া ঘটনাটি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা তাহাদের বিদেশীকেই চেনে, এ নূতন বিদেশীকে তাহারা তাহাদের অন্তরের কোণে বসাইতে পারিতেছিল না। ডাক্তার ঝাঁ করিয়া অমিয়াকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আমি সেই বিদেশী রে পাগলী, আবার তেমনই করে ছুটোছুটি করে খেল্‌ব। কেমন, দিদি?"

এইবার ঠাকুরমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ও জোনাকীলালের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সুহাসিনীর ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওমা, আমার কি হবে গো! ও সুহাস, ওরে দেখ, আমাদের বিদেশী, আমাদের চাপরাশী, আমাদের বেয়ারা। ও মা কি হবে!"

জোনাকীলাল ঠাকুরমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কীর্ত্তনের সুরে গান ধরিয়া দিল—

আমি তোমারই কারণে নন্দেরই ভবনে
বাধা রয়েছিনু রাই।

পরদিন নৃসিংহ বাবুর নিকট টেলিগ্রাম গেল "জোনাকী বেশ আছে; তাড়াতাড়ি আপনার ছুটি লইয়া আসিবার প্রয়োজন নাই।"

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

গান

(কীর্ত্তনের সুর)

তাই ভাল, দেবী, স্বপনেই তুমি এসো।
যদি না বসিলে জীবন-আসনে, পরাণ-আসনে বসো।
জটিল পঙ্কিল জগতের পথে,
কেমনে আসিবে নন্দন রথে,
স্বরগ হইতে স্বপনের পথে প্রতি নিশি তুমি এসো।
যে দুদিন তুমি ছিলে দেহপুরে,
নিকটে থেকেও ছিলে বহুদূরে,
আজি দুজনায় কত ব্যবধান—তবু বাধা নাই লেশ।
মরতের গেহ, মরতের স্নেহ,
চঞ্চল অতি—অতি পরিমেয়,
যে ভালবাসা বাসে নাই কেহ সেই ভালবাসা বেসো!
ভবের বন্ধনে পড়িলে না বাঁধা,
তাই না জানিলে বৃথা হাসা কাঁদা;
স্বপনবাসিনী ওগো সুহাসিনী, অমরার হাসি হেসো।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

প্রভাতী

তোমার হাসিটি প্রিয় আমার প্রভাত,
ফুটায় হৃদয়বনে কুসুম-নিচয়!
আঁধার হৃদয়াকাশে হয় প্রতিভাত,
সুনির্ম্মল উষারুণ সুবর্ণ বিভায়।
প্রভাত-সমীরে যবে পুলকে মাতিয়া
আনন্দে নোয়ায় শির তরু লতা ফুল,
আমার হৃদয়-লতা ও হাসি হেরিয়া
শিহরি শিহরি উঠে আবেশে আকুল।

কি মধুর হাসি সখা দেখেছি অধরে—
ত্রিদিবে সঞ্চিত যথা অমৃত ভাণ্ডার,
তুমি বুঝি অধিকারী সেই অমৃতের,
লুকানো রয়েছে তাই অধরে তোমার!
গিরি নির্ঝরিনী সম ওই হাসি-ধারা
হৃদয়-মরুতে মোর প্রীতির ফোয়ারা।

শ্রীগিরিবালা

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পরাজিতা" উপন্যাস প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "কলির কালনিমে" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অধ্যাপকের বিপত্তি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷৷৹

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন উপন্যাস সহচরী প্রকাশিত হইল। মূল্য দেড় টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক-বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। ২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সাময়িক কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব। ৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। ৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। ৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা। ৬। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন। ৭। রামগোপল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা। ৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান। ৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী চিত্র। ১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা' চরিত্র। ১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের ও উপাখ্যানভাগ। ১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্র-সভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৯ম [illegible] বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ১১শ বিষয়ে প্রবন্ধ আগামী পূজার ছুটির মধ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৩১শে চৈত্র মধ্যে পরিষৎ সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না। প্রবন্ধাদি সমস্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



চিত্রপট ভিখারিনী ।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

শিবাজী ও জয়সিংহ

প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ও শঠ আফজল খাঁর সেনাদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া শিবাজী যখন বিজয়গর্ব্বে রাজ্যস্থাপন করিতেছিলেন, তাঁহার বলদৃপ্ত মহারাষ্ট্র সেনা যখন রুস্তম-ই-জমাল এবং ফজল খাঁর মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কোল্‌হাপুর ও রত্নগিরি প্রদেশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতেছিল—সম্রাট্ আরাঙ্গেব তখন অতিমাত্র বিচলিত হইয়া এই "পার্ব্বত্য মুষিক"কে বিচূর্ণিত করিবার জন্য বহু যুদ্ধের নায়ক, বহু বিজয়ের গৌরবমাল্য-ভূষিত শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের কর্ত্তা-স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কি মালবে, কি দাক্ষিণাত্যে, কি গোলকুণ্ডায়—কে শায়েস্তা খাঁর বীরত্বের পরিচয় পায় নাই?

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শায়েস্তা খাঁর সহিত শিবাজীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিক হইতে বিজাপুরের সেনা ও অপর দিক হইতে বাদশাহী ফৌজ শিবাজীকে আক্রমণ করিল। কিন্তু কেহই শিবাজীর গতিরোধ করিতে পারিল না। যুদ্ধারম্ভের তিন বর্ষ মধ্যে শায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজধানী পুনা নগরী জয় করিয়া নিশ্চিন্তমনে তাহা অধিকার করিলেন। পটাবাসের পর পটাবাস স্থাপিত হইয়া পুনায় একটি নবীন রাজধানী শোভিত হইয়া উঠিল। নৃত্য-গীত ও আনন্দকোলাহলে বাদশাহী সেনার মন মাতিল। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দশ সহস্র সেনা লইয়া অদূরে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

একদিন সহস্র মহারাষ্ট্র বীর ক্ষিপ্রগতিতে সিংহগড় হইতে অগ্রসর হইয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারে পুনার সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। শিবাজী তখন উহাদিগের ভিতর হইতে ৪০০ বীর বাছিয়া লইয়া রজনীর অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। লাঞ্ছিত পরাজিত আহত শায়েস্তা খাঁ কোন প্রকারে আরঙ্গাবাদে পলায়ন করিলেন। সম্রাট আরাঙ্গেব দাক্ষিণাত্য জয়ের সুখ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তখন কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। যখন পথিমধ্যে শুনিলেন যে শায়েস্তা

খাঁ পরাজয়ের কলঙ্কলাঞ্ছন বহিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখন সম্রাট রোষে ও ক্ষোভে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং আদেশ দিলেন—শায়েস্তা খাঁকে "নরকতুল্য বঙ্গদেশে" অন্তরিত কর, আমি তাহার মুখও আর দেখিতে চাহিনা।

শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত করিয়াই শিবাজী নিরস্ত হইলেন না। তিনি সুরাট নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্র সেনার ক্ষিপ্রকারিতা ও শৌর্য্য বীর্য্য সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। শিবাজী তাঁহার সেনাদল লইয়া যেরূপ দ্রুতগতিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, তাহাতে লোকে বলিল—শিবাজী মানুষ নহেন, তিনি পক্ষবিশিষ্ট অদ্ভুত জীব! দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যসমাজ তখন একান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। বিজাপুর ও ক্যানারায় যে গৃহকলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই সুযোগে শিবাজী নিজেকে দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় করিয়া তুলিলেন।

সম্রাট আরাঙ্জেবের চিন্তার অবধি রহিল না! তিনি শেষে স্থির করিলেন, তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সেনানায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা তৎকালে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, শিবাজীকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকেই পাঠাইবেন। তাঁহার আদেশে তখন রাজা জয়সিংহ সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অধীনে চলিলেন বীরবর দিলির খাঁ, রণশূর দাউদ খাঁ, অকুতোভয় রাজা রায়সিংহ শিশোদিয়া, ইতিশাম্ খাঁ, শেখজাদা ফুরাদ খাঁ, রাজা সুজন সিংহ বুন্দেলা, জয়সিংহের পুত্র কিরাত সিংহ ও মোল্লা ইয়াহিয়া নোয়াইয়াৎ প্রভৃতি। যে বৃহৎ সেনা-কটক এই সকল প্রথিতনামা সেনাপতিদিগের সঙ্গে চলিল, তাহার সংখ্যা ছিল ১৪০০০। এইরূপ বিরাট সজ্জা করিয়া রাজা জয়সিংহ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদানদী অতিক্রম পূর্ব্বক সগৌরবে অগ্রসর হইলেন। সেনাপদভরে মহারাষ্ট্রদেশ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। রাজা জয় সিংহ তখন ভারতের গৌরবসদৃশ ছিলেন। মধ্য-এসিয়া হইতে সুদূর দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে কান্দাহার হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের পর্য্যন্ত—সর্ব্বস্থানেই তিনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট শাজাহানের কালে বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া এই রাজপুত বীর ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধে রত থাকিয়া জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সম্রাট আরাঙ্জেবের আদেশে সেই বীরাগ্রগণ্য জয়সিংহ শিবাজীকে পরাজিত লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

রাজা জয়সিংহের সহিত শিবাজীর সুদীর্ঘ সমর-কাহিনী বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। জয়সিংহ ক্ষত্রিয়—জয়সিংহ বীর—জয়সিংহ রাজপুত-মুকুটমণি। জয় সিংহ হিন্দু—জয়সিংহ গো-ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণদানেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। জয়সিংহের মান পর্ব্বতের চূড়ার মত ছিল, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অতুলনীয় বলিয়া ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া সেই রাজা জয়সিংহ কিরূপে রাজপুত গৌরবের মুখে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ সেই দুঃখের কাহিনী বলিব। আফজল খাঁ শঠতাচরণ করিয়া শিবাজীকে নিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পক্ষেও কিছু বলিবার থাকিতে পারে। শিবাজী আফজল খাঁর জাতি-শত্রু ছিলেন, আফজলের অন্নদাতার শত্রু ছিলেন। আফজল রণবিশারদ হইলেও, রাজপুত ছিলেন না। কিন্তু জয়সিংহ শিবাজীর স্বগণ না হইলেও, সমধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যে ক্ষাত্রতেজের জন্য রাজপুত পৃথিবী মধ্যে রাজপুত, জয়সিংহের ন্যায় শিবাজীরও তাহা ছিল। সেই জন্যই শিবাজীর সহিত জয়সিংহের ব্যবহার দেখিলে মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়। মনে হয়, তুলনায় সমালোচনা করিলে, আফজাল খাঁও জয়সিংহের উচ্চে আসন লাভ করিতে পারেন।

জয়সিংহের নিকটে নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শিবাজী যখন দুর্গ হইতে দুর্গে, শৈল হইতে শৈলান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, যখন কোন কোন দিন অন্ধকার রজনীতে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেনা বাদশাহী সেনার উপর পতিত হইতেছিল, যখন

তিনি বহু আয়াসে নানা গিরিমূল রুদ্ধ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতেছিলেন, স্থানে স্থানে অনল সংযোগ করিয়া তাহাদের গুপ্ত ও নিরাপদ আশ্রয়স্থানগুলি যুদ্ধকালে বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন তাঁহার এবং অন্যান্য সেনানায়কদিগের পুত্রপরিবার পুরন্দর দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে দুর্গ দুরারোহ গিরিশৃঙ্গের উপর স্থাপিত ছিল। তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে পর্ব্বতগাত্রে আর একটি দুর্গ ছিল। কাহার সাধ্য সহসা তাহার নিকটবর্ত্তী হয়! অদূরে বজ্রগড় অবস্থিত থাকিয়া সচেতন প্রহরীর মত পুরন্দর দুর্গকে রক্ষা করিত।

বিচক্ষণ যোদ্ধা বুঝিলেন যে বজ্রগড় অধিকার করিতে না পারিলে পুরন্দরের শিরে মোগলপতাকা উড্ডীন করা সম্ভব হইবে না। জয়সিংহ তাই বজ্রগড় আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেনাপতি দিলির খাঁ দ্বিপ্রহর রজনীতে আক্রমণ করিয়া বহু আয়াসে বজ্রগড় হস্তগত করিলেন। যখন বজ্রগড় অরাতির করতলগত হইল, শিবাজী তখন দেখিলেন পুরন্দরদুর্গ রক্ষা করা সম্ভব নহে। যদি মুসলমান সেনা সে দুর্গে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নারীমর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। এদিকে সেনাপতি দিলির খাঁ পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন এবং জয়সিংহের জয়োন্মত্ত সেনাগণ অন্য পথে ধাবিত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশের বক্ষোপরি পতিত হইল। মহারাষ্ট্র সেনা প্রাণপণে বাদশাহী সেন্যর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিল না।

পুরন্দর দুর্গের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা ও গুরুভার প্রস্তর রাশি, বারুদ পূর্ণ চর্ম্মথলি ও প্রজ্জ্বলিত তৈলধারা মোগল সৈন্যদিগকে একান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। রাজপুত-বীর জয়সিংহ তখন যেরূপে তোপমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা রাজপুতেরই যোগ্য হইয়াছিল।

দুই মাস যুদ্ধের পর শিবাজীর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কিছুতেই পুরন্দর দুর্গ রক্ষা পাইবে না। তিনি রাজা জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কহিলেন, সন্ধি হইলে তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভারতসম্রাটেরই পতাকা বহন করিবেন। জয়সিংহ প্রথমে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন নাই—কিন্তু পরে হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে শিবাজী সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় নিরাপদে নিজস্থানে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন—কেহ তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জয়সিংহ যখন পুরন্দর দুর্গের নিম্নে কোন স্থানে নিজ পটাবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শিবাজী একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর করিয়া বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। সন্ধি সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল। যুদ্ধনীতির ইহাই নিয়ম যে, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধ থাকে। বিপক্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা, মোগলসমরে মহারাষ্ট্রের প্রাণ তখন জয়সিংহের অতিথি—সন্ধি আয়োজন করিবার জন্য তখন তিনি স্বয়ং জয়সিংহের নিকটে সমাগত—এ সময়ে এরূপ অবস্থায় রাজা জয়সিংহের ন্যায় বীর ও মানী পুরুষ যে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রস্তুত বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার আদেশ দিবেন ইহা কে কল্পনা করিতে পারে? "মারি অরি পারি যে কৌশলে"—আফজল খাঁর সমরনীতি হইতে পারে, তাহা রাজপুতের বীরধর্ম্ম নহে। কিন্তু রাজা জয়সিংহও সেই ঘৃণিত নীতি অবলম্বন করিয়া পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য ইঙ্গিতে আদেশ প্রচার করিলেন। ইঙ্গিত মাত্রেই মোগলসেনা পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে রাজা জয়সিংহ পূর্ব্ব হইতেই সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রাজপুত সেনা দ্বারা পরিপরিবেষ্টিত অতিথি শিবাজীকে প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দী করিয়া, রাজপুত বীর এইরূপে বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন! এইরূপে শরণাগত বীর-অতিথির সেবা করিয়াছিলেন!

মোগল সেনা যখন আক্রমণ করিল, শিবাজীর সেনাও তখন বাধা দিতে ত্রুটি করিল না। জয়সিংহের

পটাবাসে বসিয়া শিবাজী ও জয়সিংহ উভয়েই এই মৃত্যুলীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। শিবাজী কহিলেন, আর কেন অনর্থক নরহত্যা করিতেছেন—আমি পুরন্দর দুর্গ ছাড়িয়া দিলাম। শিবাজী পরাজিত হইলেন—রাজা জয়সিংহ জয়মাল্য লাভ করিলেন ইহা সত্য—কিন্তু এই পরাজয়েও কি সত্য সত্য শিবাজীরই জয় হয় নাই?

আমরা এখন রাজা জয়সিংহের চরিত্রের অন্য একটি দিক দেখিব। সে দিক আরও অন্ধকার।

শিবাজীর সহিত জয়সিংহের সন্ধি হইয়া গেল। সেই সন্ধিসূত্রে শিবাজীর ২৩টী দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। শিবাজী সম্রাটের অনুগত্য স্বীকার করিলেন; উন্নত শৈলচূড়া ভূমিতলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সম্রাট আরঙ্গেব এ সংবাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা জয়সিংহের মনোবাসনা তখনও পূর্ণ হইল না। শিবাজী সত্যসত্যই সম্রাটের পতাকা হস্তে, সম্রাটের জন্য প্রাণপাত করিয়া বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে জয়সিংহ সম্রাটকে জানাইলেন যে, আদিল শাহ ও কুতব শাহ গৃহকলহ মিটাইয়া সম্রাটের সর্ব্বনাশের জন্য সম্মিলিত হইয়াছে;—এখন যে কোন উপায়েই হউক শিবাজীকে হাতে রাখিতেই হইবে। সেই কারণেই শিবাজীকে উত্তর ভারতে প্রেরণ করা প্রয়োজন; সেখানে যাইয়া তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন।

বলা বাহুল্য যে এই সাক্ষাৎলাভের জন্য শিবাজী আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না এবং পুনঃ পুনঃ নিজের অসম্মতি জানাইয়াছিলেন। জয়সিংহ শিবাজী শার্দ্দূলকে ধরিবার জন্য সহস্র ফাঁদ পাতিলেন। ইহা তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি!! শিবাজীকে বুঝাইলেন যে, সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইলে সম্রাট নিশ্চয় তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন এবং তাঁহাকে উপযুক্তরূপে সম্মানিত করিবেন।

দেখা যাউক, শিবাজীকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য জয়সিংহের এত আগ্রহ হইয়াছিল কেন। শিবাজী যখন সম্রাটের পক্ষ হইয়া বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁহার পার্শ্বচর নেতাজি শিবাজীকে ত্যাগ করিয়া বিজাপুর প্রদত্ত ৪ লক্ষ স্বর্ণ গলাধঃকরণ পূর্ব্বক মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। জয়সিংহ ভাবিয়াছিলেন যে, শিবাজীও যদি শেষে নিজের কথা রক্ষা না করিয়া বিজাপুরের পক্ষাবলম্বন করেন, তবেই ত সর্ব্বনাশ ঘটিবে—মহারাষ্ট্রসেনা বিজাপুরের সেনার সহিত সম্মিলিত হইলে কে তাহাদিগকে আঁটিবে? জয়সিংহ তাই নানা প্রলোভনে নেতাজিকে বশ করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন এবং শিবাজীকে মহারাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্যও আয়োজন করিলেন। তিনি চতুর লোক ছিলেন। একথা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে সামান্য কথায় বা অনুরোধে শিবাজী রাজসভায় যাইবেন না, কারণ মুসলমান সম্রাটের সম্মুখে নতশীর্ষ হওয়া শিবাজী-চরিত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণেই "সহস্র ফাঁদ" পাতিতে হইয়াছিল।

ফাঁদ পাতা সফল হইল—বন্য শার্দ্দূল ধরা পড়িলেন। কিরূপে শিবাজী আগ্রার দেওয়ানী আমে সম্রাট আরাঙ্গেব কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন তাহা পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী। যখন তিনি শুনিলেন যে সম্রাট তাঁহাকে ৫ হাজারী মনসব প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি একান্ত বিরক্ত হইয়া রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহকে বলিয়াছিলেন—"কি বলিলেন? পাঁচ হাজারী মনসবদার! আমার ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র যে সম্রাটের দরবারে না আসিয়াই ৫ হাজারী মনসবদার হইয়াছিল। আমার ভৃত্য নেতাজিও যে ৫ হাজারী মনসবদার! এই ক্ষুদ্র সম্মানলাভের জন্যই কি আমি সম্রাটের সেবায় এত শ্রম করিয়াছি, সুদূর মহারাষ্ট্র হইতে এতদূর আসিয়াছি?"

শিবাজীর এই নিরাশ উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি উচ্চতর রাজসম্মান লাভ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এরূপ আশা করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল কি না।

রাজা জয়সিংহ শিবাজীকে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে সম্রাট আরাঙ্গেব শিবাজীর উপর দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবেন!

কিরূপে শিবাজী আগ্রায় বন্দী হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা শেষে সন্দেশের পেটিকা সাহায্যে পলায়ন করিয়া মহারাষ্ট্রে নবজীবন আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে।

শিবাজী পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া আরাঙ্গেব অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে রোষ শিবাজীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা রাজা জয়সিংহের পুত্রের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, শিবাজীর কয়েকজন ভৃত্য অতিশয় নির্য্যাতিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, কুমার রামসিংহের সাহয্যে শিবাজী পলায়ন করিয়াছেন। এই পলায়ন ব্যাপারের সহিত কুমার রামসিংহের যে বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ ছিল এরূপ কথা ইতিহাসে নাই। আর এ কথা সত্য যে, কুমার এবং তাঁহার পিতা রাজা জয়সিংহ শিবাজীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে শিবাজী রাজসভায় আসিলে পর যাহাতে নিরাপদে ফিরিতে পারেন তাঁহারা সেজন্য দায়ী রহিবেন।

যাহা হউক, কুমার রামসিংহের শিরে সম্রাট সকল দোষ অর্পণ করিয়া তাঁহার মনসবদারি কাড়িয়া লইলেন। রাজা জয়সিংহ যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেন। শুধু পুত্রের জন্য নহে, তখন নিজের জন্যও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজা জয়সিংহের যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের একখানি এইরূপ ছিল :—

"শিবাজীকে রাজসভায় প্রেরণ করিবার জন্য আমি যে সকল ছলা-কলা অবলম্বন করিয়াছিলাম, সে সমস্তই দেখিতেছি ব্যর্থ হইয়া গেল। আমার অদৃষ্টে দুঃখের পরিসীমা নাই। কপালের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না—বিধির সঙ্গে বাদ চলে না।"

শিবাজী পুনরায় দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া রাজা জয়সিংহ ঘোরতর চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত দূতগণ শিবাজীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সুপ্রভাতে শিবাজী সুস্থ দেহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ সেই সময় প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ পাঠ করিলেই তাঁহার চরিত্র ও নীতি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে না শুধু এই কথা যে, রাজপুত কেমন করিয়া নিজের সর্ব্বস্বকে এইরূপে চরণে দলিত করিয়া আত্মাবমাননা করিতে পারে!

রাজা জয়সিংহ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং শিবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমি এইরূপে কার্য্য করিতেছি যে দুষ্ট শিবাজীকে আমার সহিত অন্ততঃ একবারও দেখা করিতে হইবে। আমার নিকট আগমন কালে বা আমার নিকট হইতে ফিরিবার পথে আমার চতুর অনুচরগণ সেই হতভাগ্যকে নিহত করিবে। সম্রাটের এই ক্রীতদাস, লোকের নিন্দা বা প্রশংসা উপেক্ষা করিয়া এতদূর করিতেও প্রস্তুত আছে যে, সম্রাটের আদেশ পাইলে আমার পুত্রের সহিত শিবাজীর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিব। শিবাজীর জন্ম এবং বংশ একান্ত হীন। আমার সমাজ শিবাজী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট কোন খাদ্যই আহার করে না—শিবাজী বংশে এতই ছোট। দুর্ম্মতি শিবাজীর কন্যাকে যদি ধরিতেও পারি তাহা হইলে আমার অন্দর মহলে তাহার স্থান হইবে না। শিবাজী যখন নীচকুলোদ্ভব, এইরূপ বিবাহের প্রস্তাব শুনিলেই সে টোপ গিলিবে এবং ধরা পড়িবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা যেন বিশেষ ভাবে গোপন রাখা হয়।"*

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ইংরাজি "শিবাজী" গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

সাহিত্যের অগ্নিসংস্কার

(গল্প)

"চিট্‌ঠি—চিট্‌ঠি বাবু—"

সদর দরজা খুলিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলাম—"দাও।" হাত বাড়াইয়া একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল দিয়া ডাকহরকরা চলিয়া গেল। উপরে নিজের নাম দেখিলাম শ্রীমতী কনকলতা দেবী—দেখিয়া বিস্মিত হইলাম—এ আবার কি! কে আমায় পাঠাইয়াছে? "চিট্‌ঠি" শব্দেই চমকিত হইয়াছিলাম, কারণ এ বাড়ীতে সে বস্তুর শুভাগমন নাই বলিলেও চলে; ক্বচিৎ কখনও হইয়া থাকে মাত্র। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মোড়কের কাগজখানা খুলিয়া ফেলিলাম। একখানা মাসিক পত্রিকা! এ যে এ বাড়ীতে সম্পূর্ণ নূতন! কতদিন এ সব চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা মনেই পড়ে না। বইখানার পাতা উল্টাইতেই একখানা কাগজ মাটিতে পড়িয়া গেল; তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, অন্যান্য কথার পর সুধা লিখিয়াছে—"এই কাগজখানায় আমার একটা গল্প বাহির হইয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে তার একটু ভাগ তোমাকে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি বাল্য-সঙ্গিনীর এ উপহারটি সাদরে গৃহীত হইবে।"

সহসা এই শোকদুঃখময় সংসারের আঁধারপুঞ্জের মধ্যে তড়িল্লেখার মত, বহুদিন-গত একখানি ছবি আমার বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে ফুটিয়া উঠিল। সে ছবি বাল্যকালের খেলাধূলার সঙ্গিনীদের আনন্দপূর্ণ চিরনবীন স্মৃতি দিয়া রচিত।

কিন্তু বাল্যসখীর আনন্দে প্রাণ খুলিয়া উৎসাহ দিতে পারিলাম কৈ? কি যেন ব্যথার মত আমার অন্তরের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। অনুভবে বুঝিলাম ইহা ঈর্ষার জ্বালা ছাড়া আর কিছুই নয়! তাহার বিদ্যার দৌড় যে কতখানি তাহাও আমার জানা ছিল। আমার মত সেও দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়াছে—এই ত! সে কেমন করিয়া গল্প লিখিল? যাক্, আর ভাবিতে পারি না। গল্পের নীচে "শ্রীসুধাময়ী দেবী" যতবার চোখে পড়িতেছে, ততবারই যেন অন্তরে কে হুল ফুটাইয়া দিতেছে!

২

আমার খুড়তুত দেবর রাজকুমার সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে। সে যেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। এ বংশে কেহই "পাশ" করিতে পারে নাই—সেই শুধু এবার বি-এ দিয়াছে। কাজেই আদাবনে শিয়াল বাঘের মত সে এ গ্রামে বিদ্বান বলিয়া পরিচিত। সে দেশে আসিলে সকলেই তাহাকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া নিজকে ধন্য মনে করে।

আমাদের বাড়ীও বাদ গেল না। আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে সে আমার বিছানায় বসিয়া খোকাকে আদর করিতেছিল; সম্মুখে সুধার লিখিত সেই "পরিচিত" গল্পটি খোলা। আমাকে দেখিয়া স্মিতমুখে রাজকুমার বলিল—"আজকাল বুঝি এ কাগজখানা নিচ্ছ? তা বেশ—কাগজখানা ভাল।" পরে বলিল—"এর ভিতর এই গল্পটি অতি সুন্দর হয়েছে, আজকাল এ রকম লেখা প্রায় চোখে পড়ে না।" রাজকুমারের প্রশংসামান দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বইখানা তুলিয়া লইয়া একরকম জোর করিয়া হাসিয়াই বলিলাম—"না, ওখানা সুধা আমায় উপহার দিয়েছে, ও গল্প তারই লেখা।"

"সুধা কে? বাঃ বেশ লিখেছেন ত? এসব চর্চ্চা বুঝি তাঁর আছে?"

আমার হাত হইতে বইখানা তুলিয়া লইয়া রাজু পুনরায় পড়িতে লাগিল। সুধার প্রশংসার ভারে আমার মন যেন নুইয়া পড়িতে লাগিল। আমি তার পরিচয়

দিয়া বলিলাম—সে আমারই মত নগণ্যা; এম্-এ, বি-এ উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলা নয়। রাজকুমার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল, "অসম্ভব! এ যে পাকা হাতের লেখা—দেখ্‌ছো না এর ভাব ভাষা কি সুন্দর।"

এক অব্যক্ত বেদনার নিশ্বাসে বুক যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে স্বামীর মুখেও ঐ কথা শুনিয়াছি; ঈর্ষায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে স্থির করিলাম, আমিও সুধার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব—আমিও গল্প লিখিব। সেগুলি ছাপার হরপে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন সুধা বুঝিবে, আমি তার চেয়ে কম নই।

৩

বহুদিন কলম ধরি নাই। জানি শুধু হাতা বেড়ী ধরিতে—বাসন মাজিতে—ঘর নিকাইতে। এক চিঠিপত্র লেখা, আমার সে বালাইও ছিল না। খুঁজিয়া পাতিয়া হাতবাক্সের তলায় একটা পুরাণো কলম ও মরিচাধরা একটা নিব যোগাড় করিলাম। গল্প লিখিতে বসিলাম। হায় ভগবান! কি লিখিব? কিছুই যে ছাই মনে আসে না। যাহা হউক, বহু কষ্টে, ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে শুইয়া শুইয়া যে সব আজগুবি গল্প শুনিতাম, তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটি গল্প নিজ ভাষায় লিখিলাম। কিন্তু, দেখিয়াই বা দিবে কে? আর উৎসাহই বা দিবে কে? কোনও মাসিক পত্রের আফিসে পাঠান, সে ত দুরাশা।

ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, রাজকুমারেরই শরণাপন্ন হইব। সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, কত বই পড়িয়াছে, সহরে থাকে, কলেজে পড়ে—যদি কিছু উপকার হয় ত তাহার দ্বারাই হইবে। কারণ, আমার ইহপরকালের সুখ দুঃখের মালিক যিনি—সেই স্বামীটির নিকট এ বিষয়ে, সাহায্যের কণামাত্র পাইবার আশা নাই। তিনি পুরা'দস্তুর গণ্ডহিসাবের মানুষ। ছেক্‌রা গাড়ীর ঘোড়ার যদি বা বিশ্রাম সম্ভব, তবু আমার কর্ত্তাটির তাহা অসম্ভব বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। তিনি ৮টার ডেলি প্যাসেঞ্জার, ওয়ার কনট্রোলার আফিসের কেরাণী। দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলম পিষিয়া, রাত্রি সাড়ে আটটায় ঘরে ফিরেন।

নানা ভূমিকা ও আড়ম্বরের পর গল্পটি রাজুকে দেখাইলাম। নিজের নাম যদিও প্রকাশ করি নাই, কিন্তু তবুও সে সর্ব্বজ্ঞের মত খপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ গল্পের লেখিকা বুঝি অজ্ঞাত নাম্নী আমাদের এই বৌদিদিটি!" দেখিলাম তাহার ঠোঁটের কোণ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের রেখায় রঞ্জিত। সে বলিল—"গল্প লেখা তো ছেলেখেলা নয় বৌদি! তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সংসারের কোনও ঘটনা কল্পনায় চিত্রে ফুটিয়ে তুলে লিখতে পারলে, তবেই গল্প উপন্যাস যা বল, তাই হবে।"

নিরুৎসাহ হইলাম না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গল্প লিখিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। কিন্তু এবারেও যখন প্রথমবারের মত ঠাকুরপোর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মাত্র লাভ করিলাম, তখন মন যেন কেমন দমিয়া গেল; মনে হইল—মরুক্‌গে—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কি? কিন্তু বলিলে কি হয়, ভূতে পাওয়ার মত এই গল্প লেখার বাতিক যে আমায় পাইয়া বসিয়াছে!

এবারেও অকৃতকার্য্য হওয়ায় রাজুর উপর কেমন একটা বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিল। আমি তার মুখের উপর বলিলাম, যে সুধার লেখার সে অত প্রশংসা করিয়াছে, সে আমার চেয়ে কোন অংশেই—কি বিদ্যা কি বুদ্ধি কিছুতেই—শ্রেষ্ঠ নয়।

রাজু ধীর সংযত স্বরে বলিল—"তা হতে পারে, কিন্তু ঘরে তিনি নিশ্চয়ই অনেক বই পড়েছেন, আর গল্প কবিতা বা উপন্যাস এসব লেখবার যে ক্ষমতা—যাকে বলে প্রতিভা—তা সকলের থাকে না। যার মধ্যে এই প্রতিভা প্রচ্ছন্ন থাকে, সে অল্প আয়াসেই এ পথে অগ্রগামী হয়। চেষ্টা করে কেউ কখন কবি বা ঔপন্যাসিক হতে পারে না এ নিশ্চয়! তবে সাধনায়

সিদ্ধি হয় বৈকি। লিখতে থাকুন, লিখতে লিখতে আপনিও হয়ত কৃতকার্য্য হতে পারবেন। তবে পড়াশুনাটা দরকার।"

রাজু বলিয়াছে পড়াশুনা দরকার। তাই বহুদিনের ত্যক্ত পুরাতন কয়েকখানা ডিটেক্‌টিভ বইয়ের সন্ধানে বাক্স পেটরা আলমারির মাথায় খুঁজিতে খুঁজিতে, অবশেষে পাইলাম খান কয়েক জরাগ্রস্ত পুঁথি—সেইগুলি মনোযোগ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৪

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস হইতে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলাম, তাহার ফলে যে গল্প রচিত হইল, সেটি এবার রাজুকে না দেখাইয়া, পরম উৎসাহে একেবারে সুধার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। লিখিলাম—"বাণীর চরণে তুমি যে অর্ঘ্য দান করিতে অগ্রসর হইয়াছ, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তুমি তাহাতে সফল হও। কিন্তু আমি এ বিষয়ে দীন ভিখারী হইলেও, এ লোভ সামলাইতে না পারিয়া মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। তুমি তোমার স্বামীকে দিয়া এটি কোনও মাসিকপত্রে যদি স্থান দেওয়াইতে পার, তাহা হইলে আমি ধন্য হই; আমার স্বামীটি এ বিষয়ে যে নিরেট প্রস্তর বিশেষ তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই।"

গল্পটি পাঠাইয়া দিয়া কিছুদিন পর হইতেই আমি আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলাম। পার্শ্বের বাড়ীতে ডাক পিয়নের স্বর শুনিলেও, আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে—মনে হয় এই বুঝি আবার দুয়ারে আসিয়া সে একখানি কাগজে মোড়া অপূর্ব্ব বস্তু দিয়া যাইবে। তখন কম্পিত হস্তে আবরণের পাশ হইতে পত্রিকাখানি মুক্ত করিয়া কি দেখিব? দেখিব, আমার গল্পের নীচে লেখা আমার নামটি—শ্রীকনকলতা দেবী।

একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পত্রিকার পরিবর্ত্তে আসিল—সুধার চিঠি। অন্য অবান্তর কথার পর সে লিখিয়াছে—"যেটা গল্প বলে' পাঠিয়েছ তাতে গল্পের বিষয় কিছুই নেই। ভীষণ রক্তারক্তি, দারুণ খুন জখম, ভূতের খেলা—এসব কি ভাল সাহিত্যে স্থান পেতে পারে? তা ছাড়া স্থানে স্থানে ভাষা তোমার নিজস্ব নয় বলে মনে হল। ভাই, আমার উপর রাগ করো না—তোমার এ গল্প কোন পত্রিকাওয়ালারই মনোনীত হবে না। শুনে সুখী হবে, এমাসে আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হবে। পরে পাঠাচ্ছি।"

ক্রোধে, ক্ষোভে আমি সুধার চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। উঃ—কি গর্ব্ব! বিদুষী রমাবাঈ আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছেন! আমার মূর্খতা আমার অজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে আসিয়াছেন! কে চায় তার উপদেশ? এ নিশ্চয় ঈর্ষা—দারুণ পক্ষপাতিত্ব—নহিলে তাঁহারসব লেখা নিজস্ব, প্রকাশের যোগ্য, আর আমার লেখাই—যাক্। কে চায় তাহার নূতন কবিতা? আমি আজই বারণ করিয়া লিখিব।

রাত্রে বিছানায় শুইয়াও স্বস্তি পাইলাম না। মনের কি উৎকণ্ঠা, কি আবিলতা কেমন করিয়া বুঝাইব?

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম—শ্রেষ্ঠ মাসিক কাগজ যে কয়খানা তাহার গ্রাহক হইব। গল্প পাঠাইবার সময় নামের সঙ্গে গ্রাহক নং দিয়া পাঠাইব। তাহা হইলে অন্ততঃ গ্রাহক সংখ্যা পূর্ণ রাখিবার আশায়ও সম্পাদক আমার লেখা প্রকাশ করিতে পারেন।

৫

"বাণী" ও "সাধনা" এই দুইখানি মাসিক পত্রের গ্রাহিকা হইয়াছি। কাগজের গ্রাহক হইয়াও গল্প ও ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া এ নারীজন্ম সার্থক করিতে পারিলাম না—গল্পগুলি সবই ফিরিয়া আসিত, উপরে লেখা থাকিত—"অমোনীত।" দুঃখে আমার মন যেন কেমন হইয়া উঠিত—চক্ষে জল আসিত। হায়, ভাগ্যগুণে পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরাও আমার বিপক্ষে এমন খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সহসা

বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত একটা কথা আমার মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিল—"আচ্ছা, সুধা ত গল্প কবিতা দুই লিখছে, আমিও এইবার কবিতা লিখে দেখিনা কেন ?"

লিখিতে হইলেই পড়া চাই এও ত বড় দায়! কবিতার বই কোথায় পাই ? ছিল কয়েকখানা বিবাহের "প্রীতি উপহার"। সেগুলিতে দেখিলাম চাঁদের হাসি, মলয় বাতাস ও কোকিলের কুহু ছাড়া আর কিছুই নাই—সে বিবাহরাত্রি বর্ষাতেই হউক আর ঝড় জল, মেঘ, অন্ধকারেই হউক—কোকিল-কূজিত মলয়-সেবিত জ্যোৎস্না রঞ্জিত হইবেই হইবে।

রাজকুমারের বাড়ী হইতে কয়েকখানা কবিতার বই চাহিয়া আনিয়া দিনকয়েক পড়িলাম। শেষে এক দিন, খানিক আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, কিছুক্ষণ মুখে কলম গুঁজিয়া, অবশেষে একটা কবিতা লিখিতে বসিলাম। একটির পর একটি কবিতা লিখিতে লাগিলাম—এইরূপ কবিতা রচনায় কয়েকদিন কাটিল।

আজ রবিবার। খাইতে বসিয়া রাজু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"বৌদি! বরাবর যে প্রশংসা পেয়ে এসেছ, এবার কি তা হারাতে বসেছ নাকি ?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"কি ?"

"এই, রান্না! চিরদিন এটার প্রশংসা আমরা করে এসেছি। কোনটায় নুণ দিতে ভুলে গিয়েছ, কোনটায় হয়ত দুবার নুণ পড়েছে, ভাতগুলা পর্য্যন্ত আধসিদ্ধ।"

আমি কথা কহিবার পুর্ব্বেই আমার স্বামী বলিয়া উঠিলেন—"কাব্যি! কাব্যির নেশা ধরেছে যে।"

স্বামীর সে বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমাদের ঘরে কি ওসব পোষায় ? আমি কেরাণী মানুষ, রাঁধুনী রাখবার ক্ষমতা নেই। এই দু'মাস ধরে কোন দিন আধপেটা, কোনদিন খালি পেটে আমাকে ৮টার গাড়ী ধরতে ছুটতে হয়েছে।"

লজ্জায় ধিক্কারে আমার মাটীতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। সত্যই ত, আজ দুই মাসের মধ্যে স্বামীকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই—লেখার নেশায় অনেক রাত্রি অবধি জাগিয়া থাকিতাম, পরদিন উঠিতে বেলা হইত। তাড়াতাড়ি চারিটি ভাতে-ভাত চড়াইয়া, আবার কাগজ কলম লইয়া বসিতাম। ভাতের ধরা গন্ধে আমার চমক ভাঙ্গিত। সে ভাত, স্বামী দুই গ্রাস মুখে পুরিয়া উঠিয়া পড়িতেন। কোনদিন মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলেন নাই—তিরস্কার ত পরের কথা।

তিনি আরও বলিলেন—"শুধু কি তাই ? ছেলেটার কি হাল হয়েছে দেখছ ? অনিয়মে অযত্নে কি ওঁর শরীর টেকে ?" নিকটেই খোকা একটা কাঠের পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল—তাহার দিকে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। মনে মনে বলিলাম, "আহা, বাছা আমার! কত অযত্নই তোকে করি। কি ভূতেই আমায় পেয়েছে! লিখতে বসলে যে বিশ্বসংসারের কোন কথাই আমার কাণে পৌছায় না:- খিদের জ্বালায় ঘুমিয়ে পড়িস্, নিয়ম মত দুধ খাওয়াতে ভুলে যাই, মনে হয় জেগে কাঁদুক, তখন খাওয়াব।"

আহার সমাধা করিয়া রাজু বলিল—"বৌদিদি, ওসব পাগলামো ছাড়। আগেও বলেছি, আজও বলছি, ওসব বাতিক আমাদের ঘরের মেয়েদের জন্যে নয়। তবে যাদের অবস্থা ভাল, তারা এসব চর্চ্চা করুক।"

রাজু যাহাই বলুক, অল্পভাষী স্বামীর মুখের কয়েকটি কথা আজ সারাদিন বক্ষে গুমরিয়া উঠিতেছে। প্রতিজ্ঞা করিলাম—স্বামীর সুখস্বাস্থ্যের কণ্টক হইয়া আর থাকিব না। গৃহকার্য্য-নিপুণা একটী মেয়েকে উনি বিবাহ করিয়া আনুন—আমি তাহাতে সুখী হৈব দুঃখিত হইব না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া, অনেক ভূমিকা ও যুক্তি-তর্কে স্বামীর মন আয়ত্ত করিয়া বলিলাম—"তবে তিন সত্যি কর যে বিয়ে করবে—করবে—করবে ?"

স্বামী ঠিক প্রতিধ্বনির মতই সেদিন বলিলেন যে তিনি বিবাহ করিবেন।

আমার বুক হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল। শুনিয়া অনেকেই হয়ত হাসিবেন—সতীন আবার কে সেধে ঘরে আনে ? এ পর্য্যন্ত কাব্যে উপন্যাসে সপত্নী

বিদ্বেষই চোখে পড়িত। আধুনিক ফ্যাসানে সে কথাটি আর বলিবার যো নাই। এখন ত গল্প উপন্যাসে সপত্নী সহোদরাকেও অতিক্রম করিয়াছে। স্থির করিলাম, বাস্তব জীবনে সপত্নী প্রেম আমিই দেখাইব।

৬

তখন শারদলক্ষ্মীর শুভ আগমনের প্রথম শঙ্খ-নিনাদে চারিদিকে জড়তার আবেশ কাটিয়া গিয়া একটা আনন্দের লহর উঠিয়াছে। তখনও আশ্বিন মাস শেষ হয় নাই। স্বামী শনিবারে "দুইদিন ঘরে ফিরিবেন না" বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

দিবাভাগে আপিসের সময় ছাড়া, অবশিষ্ট সময় যদিও স্বামীর সান্নিধ্য ছাড়া কখনও হই নাই, তবুও এই দুই তিন মাসে সে সান্নিধ্য সত্ত্বেও স্বামী হইতে অনেক সময় দূরেই থাকিয়াছি। আমার শয়নকক্ষের সংলগ্ন ছোট চোরা কুঠুরিটিই এখন আমার দিবাযামিনীর আশ্রয়—এইখানে বসিয়াই সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন হইয়া থাকি। অন্য সময় হইলে এই দুইটা দিন—২৪ ঘণ্টার বিরহ হয়ত দীর্ঘ যুগের মত ঠেকিত, কেন না বিবাহের পর হইতে এই নয় দশ বৎসর আমরা দুইটী প্রাণী একটি দিনের জন্যও একে অপরকে ছাড়িয়া কোথাও থাকি নাই।

দুই দিনের স্থানে দুই সপ্তাহ অতর্কিতে কাটিয়া গেল। স্বামী ঘরে ফিরিলেন না বা কোন চিঠি লিখিলেন না। ২রা কার্ত্তিক পূজা। আজ ১লা, নিকটেই কোন বাড়ীতে শানাই বোধনের আগমনী গাহিতেছিল। হঠাৎ শানাইয়ের করুণ সুরে আমার মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল—স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা খবর পর্য্যন্ত নাই! কোথায় কেমন করিয়া কাহাকে দিয়া তাঁহার খবর নিই? আমার দুর্ব্যবহারে কি তিনি আমাকে না বলিয়া কোথাও চলিয়া গেলেন?—অথবা—আর ভাবিতে পারি না—মা আনন্দময়ি, তোমার আগমনে আজ সকলকেই আনন্দ হিল্লোলে মাতাইয়াছ—এই ক্ষুদ্র গৃহের আনন্দ-দীপটিও ফিরাইয়া দাও।

পূজা আসিল। মহা দুর্ভাবনায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী কাটিয়া গেল। আজ বিজয়া দশমী। আমি করলগ্নকপোলে নিজ দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছি—এমন সময় ও কি? ও কার নূপুর নিক্কণ? আমার শ্রান্ত চোখের সম্মুখে এক কিশোরী-মূর্ত্তি। মুখখানি আধো ঘোমটার মধ্যে অর্দ্ধলুপ্ত—পার্শ্বে আমার স্বামী।

স্বামী আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বালিকাকে বলিলেন—"অপরা, এই তোমার দিদি।" শয্যার দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ খোকা।"

অপরা? অপরাজিতা বুঝি ঐ মেয়েটির নাম? পরিচয় না পাইলেও বুঝিলাম মেয়েটি কে। ইহাকেই বিবাহ করিবার জন্য স্বামী এতদিন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন! অপরা প্রণতা হইয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল এবং শয্যা হইতে ঘুমন্ত খোকাকে বুকে টানিয়া লইল। আমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

কিসের জ্বালা এ? এযে কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এ কি দারুণ বেদনা! এ কি রুদ্ধ যাতনার অগ্নিস্রাবী দহন!

কল্পনায় যে চিত্র আঁকিয়াছিলাম—স্নেহের গরিমায় প্রেমের মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া যত্নে, আদরে প্রীতিতে "সতীন"কে আপন করিয়া লইব, তাহার বক্ষ-স্পন্দনের সহিত নিজের বক্ষ-স্পন্দন মিশাইয়া এক বিপুল সাম্রাজ্যের বার্ত্তা তাহাকে জানাইয়া দিব—কোথায় সে কল্পনার চিত্র—কোথায় সে মনের বল?

নূতন আসিলেও অপরার এ গৃহ যেন কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত। দুই এক ঘণ্টা পরেই সে গৃহ-কর্ম্মে লাগিয়া পড়িল; আর অল্প সময়ের মধ্যেই ঘর দুয়ারের আবর্জ্জনা দূর করিয়া, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিল। খোকার ভারও আমাকে দিতে সে নারাজ। কিছু বলিলে সে মৃদু হাসিয়া বলে, "এতদিন তো শুধু খেটেই মরেছ, এখন দিন কতক বিশ্রাম কর।"

বিশ্রাম চাহি না আমি। কে রে তুই রাক্ষসী—সরে যা—চলে যা! কিন্তু সে কি যাইতে আসিয়াছে?

ল্য, নিজ ইচ্ছায় আসিয়াছে ? অসহ্য তার রূপরাশি। আর ঐ হাসি হাসি মুখভাব যে আমি সহিতে পারি না! কিন্তু স্বেচ্ছায় যে মরুভূমে শয্যা পাতিয়াছে, তাহার সেই তপ্ত প্রান্তরে শয়ন করিয়া আজীবন ত কাঁদিতেই হইবে!

সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যার পর, দূর হইতে দেখিলাম, গহনা কাপড়ে সজ্জিতা হইয়া অপরা হাসিমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"জন্ম এয়োতি হও—ছেলের মা হও" ইত্যাদি। একটু লজ্জাও করে না? ঐ বেহায়া মেয়েটার আর এ অভিনয় আমার সম্মুখে কি না করিলেই নয়?

তার পর সে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদের কোনও কথাই আমার মুখ হইতে বাহির হইল না। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, আমার হাতটি ধরিয়া বলিল—"চল দিদি, তোমার স্বামীকে বিজয়ার প্রণাম করবে না?"

আমি সবলে তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া, সেখান হইতে সরিয়া গেলাম। "আমার স্বামী!"—তার এ উপহাস কেন?

রাত্রি আটটা বাজিলে, ঘর হইতে মাদুরটা আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া, বেদনায় উদ্বেল চিত্ত লইয়া সেই শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার ম্লান আলোক দূরে অপসারিত করিয়া দশমীর জ্যোৎস্নালোক আমার চারিদিকে একটা করুণার প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছে—বাতাসে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি হা হা করিয়া আমার অন্তর আকুল করিতেছে। ঘরের মধ্যে অপরা খোকাকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—স্বামী কোনও এক গানের মজলিসে গিয়াছেন।

গভীর রাত্রে আমার তপ্তললাটে কাহার শীতল স্পর্শ অনুভব করিলাম। কাহার স্পর্শ এ। এ স্পর্শ যে আমার মনের সকল গ্লানি অবসাদ মুছাইয়া দিয়া, শান্তির প্রলেপ মাখাইয়া দিয়া, শিরায় শিরায় সুখের প্রবাহ বহাইয়া দিল। কত দিন—ওঃ কতদিন—আমি এ স্পর্শসুখে বঞ্চিত! কায নাই আমার চক্ষু চাহিয়া, কি জানি, চাহিলে যদি এ সুখ চলিয়া যায়!

"লতি!"

কি মধুর সম্বোধন—কত কাল পরে!

নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মগরিমায় বিচলিত হৃদয়কে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম—সে শক্তি কোথায় গেল? কণ্ঠমধ্যে এতক্ষণ যে শ্বাস জমিয়া বুকখানা ভারী করিয়া তুলিয়াছিল, স্বামীর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তিনি আমার অশ্রুপ্লুত মুখ তাঁহার বক্ষে চাপিয়া বলিলেন—"এমন করে' সারাটা দিন নিজেকে ব্যথা দিলে, এখনও এ অভিমান কি ভাঙ্গবে না? তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, তা কি জান না লতি?"

কি মিথ্যা অভিযোগ! কি হৃদয়হীনের মত আচরণ! তোমার কেউ নেই? কেন নিষ্ঠুর, অপরাই যে তার রূপের প্রভায় তোমার অন্তর বাহির আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে! এ ছলনা এ প্রতারণা আমার কাছে কেন করা? রুদ্ধ আক্ষেপে ফুলিয়া ফুলিয়া বলিলাম—"কেউ নেই কেন? তোমার তো সব রয়েছে; তোমার অপরা রয়েছে।"

স্বামী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ওঃ, বুঝেছি! অভিমানের কারণ বুঝেছি, অপরা আমার কেউ নয়, সে তোমারই বোন—"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—"বোন? সে কি?"

"হ্যাঁ তোমার পিসতুত বোন; কোনদিন দেখাশুনো নেই তাই চিনতে পারনি; অবশ্য তোমাকে জব্দ করবার জন্যে আমারও একটু ইঙ্গিত ছিল। তাই সেও সারাদিন নিজের প্রকৃত পরিচয় দেয় নি।"

তারপর স্বামী বলিতে লাগিলেন—"অপরার বাবা আমাদের আপিসের বড় বাবুর বন্ধু ছিলেন, মরবার সময়ে তিনি তাঁর মাতৃহীনা মেয়েটিকে বড়বাবুর হাতে দিয়ে যান। বড় বাবুর পীড়া অত্যন্ত বেড়ে ওঠায়, আমি তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়ীতে কালনায়

যাই। যাবার পরের দিনই বড় বাবু মারা যান। লোকটি বড় দয়ালু সৎস্বভাব ছিলেন। বাড়ীতে তেমন কোন অভিভাবক না থাকায়, তাঁর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত আমি সেখানে থাকতে বাধ্য হই। মেয়েটির পরিচয়ে সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। তখন বুঝে দেখলাম, এত বড় আইবুড় মেয়ের এই অভিভাবকহীন বাড়ীতে না থাকাই ভাল। এখানে এনে তাকে কোন সৎপাত্রে দেব; তোমাকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যও যে একটু না ছিল এমন নয়। আর তুমিও এমন ঈর্ষায় আর রাগে অন্ধ হয়েছিলে যে, অপরার সিঁথিতে যে সিঁদুর নেই তা পর্য্যন্ত সারাদিনে লক্ষ্য করনি।"

আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম—"আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় মাফ কর।" বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া, বিজয়া-সন্ধ্যার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইলাম।

পরদিন আমার পুরাতন গল্প লেখা ও কবিতার কাগজগুলি জলন্ত চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, সাহিত্যের অগ্নিসংস্কার কার্য্য সমাধা করিলাম।

শ্রীকিরণবালা দেবী।

বাক্‌পতিরাজ

প্রাচীনকালে এমন অনেক কবি হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কবিসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি এবং সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, অথচ বর্ত্তমানে তাঁহাদের রচিত একখানিও স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে বাক্‌পতিরাজ অন্যতম। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সহিতও ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইঁহার রচিত কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাক্‌পতিরাজকে লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। এই মতভেদের কারণ, বাক্‌পতিরাজ নামক আর একজন কবি ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বাক্‌পতিরাজের বিষয় বর্ণিত হইবে, তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না; কিন্তু "যশস্তিলক" পুস্তকের মতানুসারে কেহ কেহ বলেন যে, ইনি কারাকক্ষে প্রাকৃত ভাষায় "গৌড়বধ" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অমূলক, গৌড়বধ নামক কাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতিরাজ, কণৌজের রাজা যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার স্থিতিকাল। আলোচ্য প্রবন্ধের বাক্‌পতিরাজের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধই নাই।

বাক্‌পতিরাজ মালবের পরমারবংশীয় রাজা দ্বিতীয় হর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র (বা মেরুতুঙ্গের মতানুসারে পালিত পুত্র) ছিলেন। বিদ্বান্ হওয়ায় পণ্ডিত সমাজে ইনি বাক্‌পতিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন; হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকাদিতে এবং শিলালিপিতে ইঁহার বাক্‌পতিরাজ এবং মুঞ্জ এই দুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহার বংশধর অর্জ্জুন বর্ম্মা অমরুশতক গ্রন্থের "রসিক-সঞ্জীবনী" নামক টীকা লিখিয়াছেন। উক্ত শতকের দ্বাবিংশ শ্লোকের টীকায় অর্জ্জুন বর্ম্মা বাক্‌পতিরাজের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "যথা অস্মৎ পূর্ব্বজস্য বাক্‌পতিরাজাপরনাম্নো মুঞ্জদেবস্য। দাসে কৃতাগসি" ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার পূর্ব্বজ বাক্‌পতিরাজ উপাধিধারী মুঞ্জদেবের রচিত শ্লোক দাসে কৃতাগসি ইত্যাদি। "তিলক-মঞ্জরী"তেও ইঁহার মুঞ্জ এবং বাক্‌পতিরাজ উভয় নামই পাওয়া যায়। দশরূপাবলোকের লেখক ধনিক "প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং" এই শ্লোকটি একস্থানে মুঞ্জের রচিত বলিয়াছেন, আবার অন্যস্থানে বাক্‌পতিরাজলিখিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পিঙ্গলসূত্রবৃত্তির টীকাকার হলায়ুধ, মুঞ্জের প্রশংসা করিয়া তিনটি

শ্লোক লিখিয়াছেন। এই শ্লোকত্রয়ের মধ্যে দুইটিতে মুঞ্জ ও একটিতে বাক্‌পতিরাজ নাম লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, একই ব্যক্তির এই দুইটি নাম ছিল।

গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত উদয়পুরের শিলালিপিতে (১) ইঁহার বাক্‌পতিরাজ নামই পাওয়া। উক্তলিপির ত্রয়োদশ শ্লোকে লিখিত আছে,—

পুত্রস্তস্য বিভূষিতাখিলধরাভোগো গুণৈকাস্পদং
শৌর্য্যাক্রান্তসমস্তশত্রুবিভবাধিস্যায্যবিত্তোদয়ঃ।
বক্তৃত্বোচ্চকবিত্বতর্ককলনপ্রজ্ঞাতশাস্ত্রাগমঃ
শ্রীমদ্বাক্‌পতিরাজদেব ইতি যঃ সদ্ভিঃ সদা কীর্ত্ত্যতে॥ ১৩

অর্থাৎ,—হর্ষের পুত্র মহাপরাক্রমী হন; কবি এবং বিদ্বান্ হওয়ায় ইনি বাক্‌পতিরাজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আবার নাগপুরের লিপিতে (২) ইঁহারই নাম মুঞ্জ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। লিপিস্থ শ্লোকটি এইরূপ,—

"তস্মাদ্বৈরিবরূথিনীবহুবিধপ্রারব্ধযুদ্ধাধ্বর-
প্রধ্বংসৈকপিনাকপাণিরজনি শ্রীমুঞ্জরাজো নৃপঃ।
প্রায়ঃ প্রাবৃতবান্‌পিপালযিষয়া যস্য প্রতাপানলো
লোকালোকমহামহীধ্রবলয়ব্যাজান্মহীমণ্ডলম্ ॥২৩

তাম্রপত্রাদিতে ইঁহার "উৎপলরাজ," "অমোঘবর্ষ," "পৃথ্বীবল্লভ" প্রভৃতি অন্যান্য উপনামও পাওয়া যায়।

উদয়পুরের পূর্ব্বকথিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাক্‌পতিরাজ কর্ণাট, লাট, কেরল ও চোল দেশ জয় করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সেননায়কগণকে বধ করেন এবং ত্রিপুরী আক্রমণ করেন। এই সকল ঘটনা উক্ত লিপির চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"কর্ণাটলাটকেরলচোলশিরোরত্নরাগিপদকমলঃ।
যশ্চ প্রণয়িগণার্থিতদাতা কল্পদ্রুমপ্রখ্যঃ॥ ১৪।
যুবরাজং বিজিত্যাজৌ হত্বা তদ্বাহিনীপতীন্।
খড়্গা উর্দ্ধীকৃতো যেন ত্রিপুর্য্যাং বিজিগীষুণা॥" ১৫

মুঞ্জের রাজত্বকালে যুবরাজ দ্বিতীয় চেদী অধিপতি ছিলেন, তাঁহার রাজধানী ত্রিপুরী (বর্ত্তমান জব্বলপুর জেলার তেওয়র নগর) ছিল। চেদীরাজ্য নিকটে হওয়ায় খুব সম্ভব মুঞ্জ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন, কিন্তু সমগ্র চেদীরাজ্য তাঁহার অধীন হয় নাই। ঐ সময় কর্ণাটদেশ চালুক্য তৈলিপের অধীন ছিল, বাক্‌পতিরাজ ইঁহাকেও কয়েকবার জয় করিয়াছিলেন। প্রবন্ধচিন্তামণির লেখকও এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাক্‌পতিরাজ লাটদেশও আক্রমণ করেন। বিজাপুরান্তর্গত হস্তিকুণ্ডীর (আধুনিক হথুণ্ডী) রাষ্ট্রকূট রাজা ধবলের ১০১৩ সম্বতের শিলালিপি (৩) হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাক্‌পতিরাজ মেবারও আক্রমণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব সেই সময় মেবার হইতে অগ্রসর হইয়া তিনি গুজরাট অভিমুখে গিয়াছিলেন। ঐ সময় উত্তর গুজরাট চালুক্য মূলরাজের অধীন ছিল এবং লাট দেশের অধিপতি চালুক্যরাজ বারপ ছিলেন। এই উভয় রাজার সহিতই বাক্‌পতিরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কেরল ও চোলদেশ মালব হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সুতরাং তথাকার রাজগণের সহিত বাক্‌পতিরাজ সত্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বা কেবল মাত্র তাঁহার প্রশংসার জন্য কবি একথা লিখিয়াছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে উক্ত লিপি ছাড়া অন্য কোন স্থানেই বাক্‌পতিরাজ কর্ত্তৃক উক্ত দেশদ্বয় জয়ের কথা পাওয়া যায় না।

প্রবন্ধচিন্তামণির লেখক মেরুতুঙ্গ বাক্‌পতিরাজের যে বিস্তারিত জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; উহা হইতে বাক্‌পতিরাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়।

মালবের পরমারবংশীয় রাজা শ্রীহর্ষ একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে শরবনে এক সদ্যঃপ্রসূত সুন্দর শিশু প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ বালকটিকে লইয়া আসেন এবং

(১) Epg. Indica. Vol. I. p. 235.
(২) Epg. Indica. Vol. II. p. 184.
(৩) Asiatic Society's Journal of Bengal, Vol. LXII, Part I, p. 311

তাহাকে রাণীর হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহারা এই বালকের নাম মুঞ্জ রাখিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে হর্ষের সিন্ধুল (সিন্ধুরাজ) নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজা উপযুক্ত জ্ঞানে মুঞ্জকেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার জন্মকথা আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন যে, তোমার বুদ্ধি ও ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়াই তোমায় রাজ্যভার দিলাম, অতএব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুলের প্রতি কখনও অন্যায় আচরণ করিও না। কিন্তু মুঞ্জের রাজ্যভার গ্রহণের পর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায়, তিনি সিন্ধুলকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। তদনন্তর সিন্ধুল গুজরাতান্তর্গত কাশহ্রদে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় মালবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মুঞ্জ তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেন এবং বন্দী করিয়া রাখেন। এই সময় সিন্ধুলের ভোজ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিছু দিন পরে এই বালকের জন্মপত্রিকা দেখিয়া জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে, এই বালক মহাপ্রতাপশালী রাজা হইবে এবং পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস ও তিন দিন রাজত্ব করিবে। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া মুঞ্জ ভাবিলেন,—যদি এই বালক জীবিত থাকে তাহা হইলে আমার পুত্র রাজ্য পাইবে না; অতঃপর তিনি ভোজকে বধ করিবার আজ্ঞা দেন। বধ্যস্থানে নীত হইয়া ভোজ একটি শ্লোক লিখিয়া মুঞ্জের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং সৈন্যগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, যতক্ষণ মহারাজের নিকট হইতে উক্ত শ্লোকের উত্তর না আসে, ততক্ষণ যেন তাঁহার শিরশ্ছেদ না করা হয়। সৈন্যগণ তাঁহার এ প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিল। ভোজ মুঞ্জকে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন,—

"মান্ধাতা স মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ কাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে।
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মন্যে ত্বয়া যাস্যতি॥"

অর্থাৎ,—হে রাজন্! সত্যযুগের পরাক্রান্ত রাজা মান্ধাতা চলিয়া গেলেন, সমুদ্রে যিনি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ত্রেতাযুগের সেই রাবণহন্তা ভগবান্ রামচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, দ্বাপরে একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য রাজগণ স্বর্গগামী হইলেন, কিন্তু এ পৃথিবী কাহারও সহিত যায় নাই। আমার বোধ হয় এই কলিযুগে সে (পৃথিবী) নিশ্চয় আপনার সহিত যাইবে।—এই শ্লোকটি পাঠান্তে মুঞ্জ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং ভোজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহাকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তৈলিঙ্গদেশাধিপতি তৈলিপ (৪) মুঞ্জের রাজ্য আক্রমণ করেন; মুঞ্জ তাঁহার গতিরোধার্থে অগ্রসর হন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী রুদ্রাদিত্য তখন পীড়িত ছিলেন। তিনি মুঞ্জকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, তিনি যেন কোন ক্রমেই গোদাবরী নদী অতিক্রম না করেন। কিন্তু মুঞ্জ ইতিপূর্ব্বে তৈলিপকে কয়েকবার জয় করিয়াছিলেন; এই অহঙ্কারে তিনি রুদ্রাদিত্যের কথা না মানিয়া, গোদাবরী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। নদীর অপর পারে তৈলিপের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে তৈলিপ ছলে মুঞ্জকে বন্দী করিয়া, নিজের রাজধানীতে লইয়া যান এবং নিজ ভগিনী মৃণালবতীর হস্তে তাঁহার সেবাভার অর্পণ করিলেন।

মৃণালবতী সুন্দরী যুবতী; কিন্তু তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। অল্পদিনে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মিল। অতঃপর একদিন মুঞ্জ মৃণালবতীকে গান্ধর্ব্ব প্রথায় বিবাহ করিলেন। মুঞ্জের মন্ত্রিগণের অদম্য চেষ্টার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার বন্দিগৃহ পর্য্যন্ত সুরঙ্গ প্রস্তুত হইয়া গেল; সুরঙ্গ প্রস্তুত হইবার পর একদিন মুঞ্জ মৃণালবতীকে কহিলেন যে, এই সুরঙ্গপথে আমি পলায়ন করিতেছি, যদি তুমি আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে চল; স্বরাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমি তোমায় নিজের প্রধানা

(৪) ইহার মাতা দ্বিতীয় যুবরাজের ভগিনী ছিলেন।

মহিষী করিব। কিন্তু মৃণালবতী ভাবিলেন, মুঞ্জ স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া যদি তাঁহাকে অপমান বা অনাদর করেন, তখন তিনি কি করিবেন। তিনি মুঞ্জকে কহিলেন, "আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই আমার অলঙ্কারের পেটিকা লইয়া আসিতেছি।" মুঞ্জ নিঃসন্দেহে তাঁহার কথামত সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃণালবতী ভ্রাতার নিকট গিয়া মুঞ্জের পলায়ন করিবার কথা বলিয়া দিলেন। সমস্ত শুনিয়া তৈলিপ পুনরায় মুঞ্জকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া, নগরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করাইলেন। অতঃপর তাঁহাকে বধ্যস্থানে লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। এই সময় মুঞ্জ তৈলিপকে বলিয়াছিলেন—

"লক্ষ্মীর্যাস্যতি গোবিন্দে বীরশ্রীর্বীরবেশ্মনি।
গতে মুঞ্জে যশঃপুঞ্জে নিরালম্বা সরস্বতী॥

অর্থাৎ আমার মৃত্যুতে আমার লক্ষ্মীশ্রী বিষ্ণুর নিকট যাইবেন, আমার শৌর্য্য, বীরের বাহুতে হৃদয়ে অবস্থান করিবে; কিন্তু সরস্বতী আশ্রয়হীনা হইবেন।

ইহার পর মুঞ্জের শিরশ্ছেদ করা হয়। (৫) তৈলিপ মুঞ্জের ছিন্নমুণ্ড বংশদণ্ডে স্থাপন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান, অবশেষে ছিন্নশির সহ ঐ বংশদণ্ড রাজভবনের সম্মুখে প্রোথিত করা হয়। এই সংবাদ যখন মালবের পৌঁছিল, তখন মন্ত্রিগণ মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজকে রাজ-সিংহাসনে অভিষেক করেন। ইহাই মেরুতুঙ্গ লিখিত বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রবন্ধচিন্তামণিকার লিখিত বাক্‌পতিরাজের এই জীবনবৃত্তান্তে কয়েকস্থানে ভ্রমও আছে। মুঞ্জের উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারা সিন্ধুলের চক্ষু উৎপাটন ও তাঁহাকে বন্দী করা, মুঞ্জ কর্ত্তৃক ভোজের প্রাণবধের চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনাগুলি লেখকের কল্পিত ও অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। নবসাহসাঙ্কচরিতের রচয়িতা পদ্মগুপ্ত (পরিমল) মুঞ্জের মুখ্য সভাকবি ছিলেন এবং সিন্ধুরাজের সময়েও ইনি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহার কাব্যের একাদশ সর্গে লিখিত আছে—

"পুরং কালক্রমাত্তেন প্রস্থিতেনাম্বিকাপতেঃ।
মৌর্বীব্রণকিণাঙ্কস্য পৃথ্বী দোষ্ণি নিবেশিতা॥ ৯৮

অর্থাৎ বাক্‌পতিরাজ (মুঞ্জ) যখন স্বর্গগামী হইলেন, তখন রাজ্যভার তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা সিন্ধুরাজকে অর্পণ করিয়া গেলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, উভয় ভ্রাতার মধ্যে কখনও বিবাদ হয় নাই এবং সিন্ধুরাজ অন্ধও ছিলেন না। পণ্ডিত ধনপাল, শ্রীহর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ভোজ পর্য্যন্ত চারিজন রাজার রাজত্বকালেই বিদ্যমান ছিলেন; ইনি স্বরচিত তিলক-মঞ্জরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজকে বাক্‌পতি-রাজ অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এই জন্যই তাঁহাকে তিনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন।

তৈলিপ ও তাঁহার সামন্তগণের লিপি ও রচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে (৬) তৈলিপই বাক্‌পতি-রাজকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেরুতুঙ্গ বর্ণিত ঘটনায় অনেক অমূলক ও অতিরঞ্জিত কথা যোজিত হইয়াছে। বোধ হয় গুজরাট ও মালবের রাজগণের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় শত্রুতা ছিল, এই জন্যই প্রবন্ধচিন্তামণির লেখক বাক্‌পতিরাজের মৃত্যুবৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন। মালবের অসংখ্য শিলালিপিতে, নব-সাহসাঙ্কচরিতে এবং কাশ্মীরনিবাসী বিহ্লন কবি রচিত বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে বাক্‌পতিরাজের মৃত্যুর কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এই কলঙ্ক-কাহিনী গুপ্ত রাখিবার উদ্দেশ্যেই, শিলালিপি ও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। শিলালিপি এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উত্তম ও গৌরবময় ঘটনাই লিপিবদ্ধ করা হইত, পরাজয় এবং ঐ শ্রেণীর ঘটনাবলী পরিত্যক্ত হইত। কিন্তু এই সকল কথা বিজয়ী বিপক্ষ

(৫) কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে, বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া হত্যা করার কথা লিখিত আছে।

(৬) Royal Asiatic Soct. Journal, Vol. IV. p. 12. Asiatic Journal, Vol XXI. p, 168, also Epg. Indica. Vol. II. p. 218.

রাজগণের লিপি ও তদ্দেশীয় গ্রন্থাদি হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়।

বাক্‌পতিরাজ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি ও বিদ্বান্‌গণকে প্রতিপালন করা, ইঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ইঁহার সভায় ধনপাল, পদ্মগুপ্ত, ধনঞ্জয়, ধনিক প্রভৃতি অনেক সুকবি ছিলেন। বাক্‌পতিরাজ লিখিত কোন পুস্তকই অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু হর্ষদেবের পুত্র বাক্‌পতিরাজ, মুঞ্জ ও উৎপলের লিখিত অনেকগুলি শ্লোক সুভাষিতাবলী নামক গ্রন্থে এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়। (৭) পদ্মগুপ্ত বাক্‌পতিরাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, বাকপতিরাজ বিদ্যারূপী কল্পবৃক্ষের মূল এবং কবিগণের প্রকৃত আশ্রয়দাতা ছিলেন; বিক্রমাদিত্যের পর সরস্বতী তাঁহারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনপাল তাহাকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বলিয়াছেন, যথা—"যঃ সর্ব্ববিদ্যাব্ধিনা শ্রীমুঞ্জেন" ইত্যাদি। (৮) অন্যান্য বিদ্বান্‌গণও বাকপতিরাজের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাঘব-পাণ্ডবীয় মহাকাব্যের লেখক কবিরাজ তাঁহার কাব্যের প্রথম সর্গে বাক্‌পতিরাজের ধন ও বিদ্যার সহিত নিজের আশ্রয়দাতা কামদেব রাজের বিত্ত ও বিদ্যার তুলনা করিয়াছেন। (৯)

খুব সম্ভব ১০৩১ সম্বৎ হইতে বাক্‌পতিরাজের রাজত্বকাল আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ তাঁহার যে দুইখানি তাম্রপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একখানি (১০) ১০৩১ সম্বৎ (৯৭৪ খ্রী অব্দ) ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন লিখিত, অপরখানি ১০৩৬ সম্বতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার (৬ই নভেম্বর, ৯৭৯ খ্রী অব্দ) দিন চন্দ্রগ্রহণ পর্ব্ব উপলক্ষে গুণপুরায় লিখিত হয় এবং ভগবতপুরায় উহা দান করা হয়। (১১) প্রথমখানি উজ্জয়িনীতে লিখিত হইয়াছিল। এই তাম্রপত্রদ্বয় পাঠে জানা যায় যে, বাক্‌পতিরাজ শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। জৈন পণ্ডিত অমিতগতি ১০৫০ সম্বৎ পৌষ শুক্লা পঞ্চমীর দিন তাঁহার রচিত সুভাষিতরত্নসন্দোহ নাম গ্রন্থ শেষ করেন, এই সময় বাক্‌পতিরাজ বিদ্যমান ছিলেন, একথা উক্ত গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। ১০৫৭ সম্বতের একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, যাদব রাজ দ্বিতীয় ভিল্লম বাক্‌পতিরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। (১২) কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ১০৫৪ সম্বতে তৈলিপের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং বাক্‌পতিরাজেরও মৃত্যু ১০৫১ হইতে ১০৫৪ সম্বতের মধ্যেই হইয়াছিল।

প্রবন্ধচিন্তামণির রচয়িতা লিখিয়াছেন, গুজরাটের রাজা দুর্লভরাজ ১০৭৭ সম্বৎ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশীর দিন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, তীর্থদর্শনেচ্ছায় কাশী অভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি মালবে উপস্থিত হইলে, তথাকার রাজা মুঞ্জ তাঁহাকে বলেন যে, হয় তুমি ছত্র তরবারি প্রভৃতি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক বেশে যাও, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর! তীর্থযাত্রায় বিঘ্ন হয় দেখিয়া দুর্লভরাজ ভিক্ষুক বেশ ধারণ করিয়া প্রস্থান করেন এবং এই অপমানজনক ঘটনার কথা পত্রদ্বারা ভীমকে জানাইয়া, তাঁহাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে আদেশ করেন। অতঃপর ভীম বাক্‌পতিরাজকে আক্রমণ করেন। কিন্তু এই ঘটনাটি ভিত্তিহীন ও অমূলক, ইহা লেখকের কল্পিত। ১০৫১ সম্বৎ হইতে ১০৫৪ সম্বতের মধ্যে বাক্‌পতিরাজের মৃত্যু হয়, আর ১০৬৬ ১০৭৮ সম্বৎ পর্য্যন্ত দুর্লভরাজের রাজত্বকাল, সুতরাং বাকপতিরাজের নিকট দুর্লভরাজ অপমানিত হন নাই, বোধ হয় তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট অপমানিত

(৭) Epg. Indica. Vol. I. p. 227.

(৮) তিলকমঞ্জরী, ৬ পৃষ্ঠা।

(৯) শ্রীবিদ্যাশোভিনো যস্য শ্রীমুঞ্জাদিয়তী ভিদা।
ধারাপতিরসাবাসীদয়ং তাবন্ধরাপতিঃ॥
১৮ সর্গ, ১ম।

(১০) Indian Antiquary. Vol. VI p. 51.

(১১) Indian Antiquary. Vol. XIV. p. 106.

(১২) Epg. Indica. Vcl. II. p. 217.

হইয়াছিলেন। বাক্‌পতিরাজের প্রধান মন্ত্রীর নাম রুদ্রাদিত্য ছিল, ইহা তাঁহার শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়। (১৩)

বাক্‌পতিরাজ পুষ্করিণী এবং সৌধাদি নির্ম্মাণের জন্যও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধারা নগরীর নিকটস্থ মুঞ্জ সাগর ও মাণ্ডুর জাহাজ মহল এবং "মুঞ্জতালাও" ও অন্যান্য পুষ্করিণী ও সৌধাদি বাক্‌পতিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এইবার বাক্‌পতিরাজের সভায় প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকর্ত্তৃগণের উল্লেখ করিয়া, প্রবন্ধ শেষ করিব।

কবি ধনপাল কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেবর্ষির পৌত্র এবং সর্ব্বদেবের পুত্র ছিলেন। সর্ব্বদেব উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী বিশালা গ্রামে বাস করিতেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ধনপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ধনপাল জৈনদিগকে ঘৃণা করিতেন। কিছুদিন পরে ইনি উজ্জয়িনী হইতে ধারায় চলিয়া আসেন এবং রাজা শ্রীহর্ষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে ইনি ১০২৯ সম্বতে অমরকোষের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় "পাইয়লচ্ছীনামমালা" নামক একখানি অভিধান, তাঁহার ভগিনী অবন্তীসুন্দরীর জন্য রচনা করেন। অবন্তীসুন্দরীও বিদুষী রমণী ছিলেন, তাঁহার রচিত প্রাকৃত কবিতা অলঙ্কার..গ্রন্থাদিতে অনেক পাওয়া যায়। রাজা ভোজের আজ্ঞায় ধনপাল তিলকমঞ্জরী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বাক্‌পতিরাজ ইঁহাকে সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত দুইখানি পুস্তক ছাড়া, একখানি সংস্কৃত অভিধানও ইনি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি উহা পাওয়া যায় নাই।

মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন যে, ধনপাল তাঁহার ভ্রাতার অনুরোধে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিলকমঞ্জরীতে তিনি আপনাকে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার বুলার ও টনি সাহেব ভোজের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ধনপালের বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করেন না; কিন্তু যদি তাঁহারা ধনপাল কৃত তিলকমঞ্জরী দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় একথা বলিতেন না। ঋষভপঞ্চাশিকা নামক গ্রন্থখানিও ধনপাল রচনা করিয়াছিলেন।

নবসাহসাঙ্ক চরিতের রচয়িতা পদ্মগুপ্ত বাক্‌পতিরাজের প্রধান সভাকবি ছিলেন; ইঁহার অন্য নাম পরিমল। বাক্‌পতিরাজের মৃত্যুর পর ইনি গ্রন্থ রচনা ছাড়িয়া দেন। পরে সিন্ধুরাজের অনুরোধে নবসাহসাঙ্কচরিত নামক কাব্য রচনা করেন; একথা তিনি উক্ত পুস্তকের প্রথম সর্গে উল্লেখ করিয়াছেন:—

"দিবং যিয়াসুর্ম্মম বাচিমুদ্রামদত্ত যাং বাকপতিরাজ দেবঃ।
তস্যানুজন্মা কবিবান্ধবস্য ভিনত্তি তাং সম্প্রতি সিন্ধুরাজঃ॥৮

ইঁহার লিখিত অনেকগুলি শ্লোক কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্রের "ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা"য় পাওয়া যায়, কিন্তু এই শ্লোকগুলি নবসাহসাঙ্কচরিতে নাই। উক্ত শ্লোকগুলিতে মালব-রাজগণের কীর্ত্তিকথা বর্ণিত হইয়াছে। খুব সম্ভব তিনি আরও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুভাষিতাবলী, সার্ঙ্গধরপদ্ধতি, সুবৃত্ততিলক প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার রচিত বিস্তর শ্লোক পাওয়া যায়। ইঁহার রচনা অত্যন্ত সরল ও মনোহর। নবসাহসাঙ্কচরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষে ইনি আপনার পিতার নাম মৃগাঙ্কগুপ্ত লিখিয়াছেন—"ইতি শ্রীমৃগাঙ্কসূনোঃ পরিমলাপরনাম্নঃ পদ্মগুপ্তস্য কৃতৌ নবসাহসাঙ্কচরিতে মহাকাব্যে"—ইত্যাদি।

দশরূপক নামক কাব্যের রচয়িতা ধনঞ্জয়, বাক্‌পতিরাজের সভাকবি ছিলেন; ইঁহার পিতার নাম বিষ্ণু।

ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা ধনিকও বাক্‌পতিরাজের সভাকবি ছিলেন। ইনি ধনঞ্জয় রচিত দশরূপক কাব্যের দশরূপাবলোক নামক টীকা প্রণয়ন করেন এবং কাব্যনির্ণয় নামে একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বাক্‌পতিরাজ ইঁহাদের উভয়ের নামে একখানি গ্রাম দান করেন; পূর্ব্বেই এ দানপত্রখানির কথা উল্লেখ করিয়াছি।

(১৩) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 160.

পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনী-টীকার হলায়ুধও বাক্‌পতিরাজের সভাকবি ছিলেন। এই নামের আরও দুইজন কবি ছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে কবিরহস্য ও অভিধানরত্নমালার লেখক হলায়ুধ ৮৬৭ সম্বতে দক্ষিণ রাষ্ট্রকূট-রাজগণের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ১২৫৬ সম্বতে বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায়ও এই নামের এক কবি ছিলেন। মান্ধাতার অমরেশ্বর মন্দিরের শিবস্তুতি বোধ হয় ইঁহারই লিখিত। ডাক্তার বুলারের মতানুসারে, তৃতীয় হলায়ুধ বাক্‌পতিরাজের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মৃতসঞ্জীবনী টীকা ব্যতীত রাজব্যবহারতত্ব নামক আর একখানি পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছিলেন। বাক্‌পতিরাজের রাজত্বকালে ইনি কিছুদিন উজ্জয়িনীর ন্যায়াধীশ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মাথুর সঙ্ঘের দিগম্বর জৈন সাধু অমিতগতি বাক্‌পতিরাজের সভাকবি ছিলেন। ১১৫০ সম্বতে ইনি সুভাষিতরত্নসন্দোহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১০৭০ সম্বতে ধর্ম্মপরীক্ষা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার গুরুর নাম মাধবসেন ছিলেন।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গমহিলার বদরিকাশ্রম দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমস্ত রাত্রিই বৃষ্টি হইতেছে। হরিদ্বার ছাড়িয়া অবধি এক দিনের জন্য বৃষ্টির বিরাম নাই।

১৩ই বৈশাখ ভোর ৫টা। আমরা সেই বৃষ্টিতেই ব্যাস চটি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চটি ছাড়িয়া একটু আসিয়াই ব্যাসদেবের তপস্যার স্থান। বড় সুন্দর বড় শান্তিময় স্থানটী। সেই স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে উমরাসু চটি, এইস্থানে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। এই চটিটী বেশ বড়, অনেক লোকের স্থান হয়। এই পথের প্রথম তিন মাইল তত খারাপ নয়, আমরা এ তিন মাইল হাঁটিয়াই চলিলাম। উমরাসু চটী হইতে দুই মাইল দূরে সউড় চটী। এই চটী খুব ছোট, ভাল নয়। এই চটীর সামনে দিয়া যে রাস্তা ক্রমে পাহাড়ের শিখরে উঠিয়াছে, তাহার নাম "চিত্তভঙ্গ" বা মনভাঙ্গা —অর্থাৎ এই ভয়ানক রাস্তা দেখিলেই ভয়ে লোকের মন ভাঙ্গিয়া যায়, আর আগে যাইতে কাহারও সাহস হয় না, এইখান হইতেই ফিরিয়া আইসে। সউড় বা সিউড় চটী হইতে দুই মাইল দূরে দেবপ্রয়াগ। এই পথের প্রথম মাইলে যে সকল পাহাড় আছে, তাহা লাল মাটী ও নানা রঙের নানা আকারের নুড়ীর। এই রাস্তাটী একটু চওড়া। নেপালের রাজা এই সকল পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া রাস্তা চওড়া করিয়া দিতেছেন। তবে যতটা ঐরূপ মাটী ও নুড়ী, সেই সেই স্থানেই প্রশস্ত হইতেছে, আর যে যে স্থানে পাহাড় কাটা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সে সকল পথের ভীষণতা কথায় বা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। দ্বিতীয় মাইল আরও ভয়ানক, এক এক স্থানের পর্ব্বত এত উচ্চ যে সূর্য্য ঢাকিয়া যান। বেশ রৌদ্রে চলিতেছি, একটা মোড় ফিরিতেই মেঘ করার মত অন্ধকার হইয়া গেল— পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যদেব গা ঢাকা দিলেন। পাহাড়ের গর্ভ দিয়া চলিতেছি, কখনও বামে কখনও দক্ষিণে গভীর খদের ভিতর দিয়া মা গঙ্গা চলিতেছেন, মনে হইতেছে যেন পাতাল দিয়া যাইতেছেন। উঃ সে যে কত নীচে, আর কি খরস্রোত! এক এক স্থানে নীচে দিকে চাহিয়া দেখা যায় না, চোখ আপনি বন্ধ হইয়া আসে। দেবপ্রয়াগের আধ মাইল দূর হইতেই

প্রয়াগসঙ্গমের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দুই রঙের দুই ধারা ঠিক পাশাপাশি চলিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, কি সুন্দর সে দৃশ্য! এক ধারা নীল কাঁচের মত স্বচ্ছ, ইনি অলকানন্দা; অন্য ধারা ঘোলা, অল্প লাল—ইনি ভাগীরথী। সরস্বতী কোথায় তাহা বুঝা যায় না।

দেবপ্রয়াগে পৌঁছিয়া, বাসায় জিনিষপত্র সকল ফেলিয়া আমরা সঙ্গমে স্নান করিতে ছুটিলাম। ১৮০টা সিঁড়ি নামিয়া সঙ্গম-স্থানে উপস্থিত হইয়া, সঙ্গমের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ কি দৃশ্য! উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া গভীর গর্জ্জনে অলকানন্দা ছুটিয়া আসিতেছেন, ঠিক সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফেনময়। অপর দিক হইতে ভাগীরথীও প্রবল বেগে আসিতেছেন, তবে অত ফেনময় তরঙ্গ তুলিয়া নয়, কিন্তু কি খরস্রোত, কুটা পড়িলেও চূর্ণ হইয়া যায়। দুই ধারা আসিয়া যেখানে মিলিত হইতেছে, সে স্থানে শব্দে কাণ পাতা যায় না, কাণে তালা লাগিয়া যায়। কিছুক্ষণ তরঙ্গের দিকে চাহিয়া থাকিলে মাথা ঘুরিতে থাকে। আমরা পাথর ধরিয়া ধরিয়া সঙ্গমের ঠিক উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এইখানে আমরা পরস্পরের কথাও শুনিতে পাইতেছিলাম না, এবং হাওয়ার এত জোর যে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব, মনে হয় এখনি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে। এই স্থানে পাহাড়ের গায়ে খুব মোটা লোহার শিকল লাগানো আছে। যাত্রীরা পাথরের উপর বসিয়া, সেই শিকল এক হাতে ধরিয়া, অন্য হাতে জল তুলিয়া স্নান করে। এখানে জলে নামিয়া স্নান করা কল্পনাতেও আসে না। এই সময় বরফ গলিতে আরম্ভ হয়; কি ঠাণ্ডা জল, মাথায় ঢালিয়া মনে হইল যেন সব অসাড় হইয়া গেল!

জলের ভিতর হইতে উঠিয়া পাহাড়গুলি আকাশ ভেদ করিয়াছে। উপরে বড় বড় গাছ ও জঙ্গল, মাথায় বরফের মুকুট। এই সঙ্গম যে কত সুন্দর তা বলিতে পারি না। এলাহাবাদের সঙ্গম এত পরিষ্কার বুঝা যায় না।

স্নান দান ইত্যাদি কার্য্য সকল শেষ করিয়া, বাসায় আসিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার ত সেখান হইতে উঠিতেই ইচ্ছা হইতেছিল না। আমি আমার করণীয় কার্য্যসকল শেষ করিয়া, জলের খুব নিকটেই একখানি প্রকাণ্ড পাথরের উপরে গিয়া বসিলাম, সেইখানে বসিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন একলা দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছিল না। এই স্বর্গীয় দৃশ্য সকল দেখিতে দেখিতে আমি সবই ভুলিয়া গেলাম। কতক্ষণ এইরূপ অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া ছিলাম তাহা জানি না; পাণ্ডা এবং আমার দুই তিন জন সঙ্গিনীর ডাকাডাকিতে উঠিয়া পড়িলাম। উপরে আসিয়া দেখি যে দুই তিন জন আগেই বাসায় গিয়াছেন, আর ইঁহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, আমি পূজায় বসিয়া জপে মগ্ন হইয়া গিয়াছি। কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া, অবশেষে ডাকিয়াছেন। পাণ্ডা মহাশয় একটি ছোটখাট লেকচার দিলেন, তার মানে এই যে, পথে বা বনজঙ্গলে এরূপ জপে ডুবিয়া যাওয়া ভাল নয়, বিশেষ এই বদরীর মত রাস্তায়। আমি তাঁহাদের বলিলাম যে আজ আমি জপে ডুবিয়া যাই নাই, আমি নারায়ণের অনন্ত রূপ, অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া জ্ঞানহারার মত বসিয়া ছিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। তখনকার মত একটু একটু মিছরীর সরবত খাইয়া, সহরটা দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

দেবপ্রয়াগ বেশ ছোট একটী সহরের মত, এখানে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, ডাক্তারখানা এ সবই আছে। কাপড় হইতে সমস্ত জিনিষ পত্র পাওয়া যায়, সব রকম খাদ্যদ্রব্য মিষ্টান্ন ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। সহরটী দুই খণ্ডে ভাগ করা; মধ্যে একটী সেতু, সেতুর একদিক ইংরাজ রাজ্য, এই দিকেই ডাক্তারখানা ইত্যাদি, এই অংশটীই সহরের মত। অপর দিকটা গাড়োয়াল রাজ্য, এই দিকে পাণ্ডাদের বাড়ী ঘর ও তীর্থাদির স্থান। ঘুরিতে ঘুরিতে অলকানন্দার ধারে একটী পাহাড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই পাহাড়ে

দুইটী অতি সুন্দর গুহা আছে, কোনও তপস্বীর তপস্যার স্থান ছিল, এখনও তাহাতে যজ্ঞধূমের চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। অলকানন্দা পার হইয়া অপর পারে যাইবার জন্য একটী দড়ির ঝোলা এখনও আছে। লছমন ঝোলা পার হইবার পর হইতে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ছোটবড় পাঁচটী ঝোলা আমরা পার হইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ঝোলা ব্যাসগঙ্গার উপর।

এখানে আমরা যে বাসাটী পাইয়াছিলাম, সেটী বড় সুন্দর যায়গায়, ঠিক গঙ্গার উপরেই, কিন্তু গঙ্গায় নামিতে হইলে ৮০টী সিঁড়ি নামিয়া তবে জলের কাছে যাওয়া যায়। সহরটী সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া, বাসায় আসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়াই, সন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের আরতি দেখিতে গেলাম। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার উপর মন্দির, সিকি মাইল পাহাড়ে উঠিবার পর কতকগুলি সিঁড়ি, তারপর মন্দির প্রাঙ্গণ, এই সিঁড়িগুলি যে কি, তাহা না দেখিলে বোঝানো যায় না। কিন্তু কি সুন্দর আরতি! দেখিয়া এত আহ্লাদ হইল যে, মন্দিরে উঠিবার কষ্টের কথা মনেই রহিল না।

মন্দির হইতে ফিরিতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। বাসায় আসিয়া সকলে আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, আমি একখানি কম্বল বিছাইয়া বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে শুইয়া পড়িলাম। সঙ্গিনীদের ভিতর দুই একজন ডাকাডাকি করিয়া, আমার উঠিবার কোনই লক্ষণই নাই দেখিয়া, রান্নায় মন দিলেন। রান্না হইল—ধান ও চালে মিশ্রিত ভাত ও আলু ভাতে। সমস্ত দিনের পর তাহাই বেশ আনন্দে খাওয়া গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও ঘুমে আমার শরীর তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই এক একখানি কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলাম। এক ঘুমেই সকাল হইয়া গেল।

এইখানে একটা মজার কথা বলি। এখানে নাকি গরুদান না করিলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। পাণ্ডা আমার সব সঙ্গিনীদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে হয় দেবপ্রয়াগে নয় ত বদরিকাধামে—যেখানেই হউক "গো-দান চাহিয়েই" নহিলে স্বর্গের পথ বন্ধ। আমি বেড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া এই কথা শুনিলাম, এবং সকলেই রাজীও হইয়াছেন দেখিলাম। আমি পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গরু নহিলে স্বর্গ বন্ধ কেন? পাণ্ডা বলিলেন "গরুর লেজ ধরে তবে ত স্বর্গে উঠিবে মা!" আমি বলিলাম, "গরুর লেজ ধরে" স্বর্গে যাওয়া ছাড়া যদি অন্য কোনও উপায় না থাকে, তা হলে আমার স্বর্গে দরকার নাই ঠাকুর! আমি আমার চোখে যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি এবং হৃদয়ে অনুভব করছি এই যথেষ্ট সৌভাগ্য বলে' মনে করছি, এর বেশী আমি কিছুই চাই না, আমি গরু দিব না।" সে এই কথা শুনিয়া মহা হেঙ্গাম লাগাইয়া দিল। অনেক কষ্টে তাহার সহিত ১৫্ পনের টাকায় রফা হইল। সকলে মিলিয়া কিছু কিছু করিয়া দিয়া ১৫্ পনের টাকা তাহাকে দেওয়া হইল। এই স্বর্গে যাইবার বন্দবস্তের জন্যই রাত্রিতে ধানে চালে মিলানো ভাত খাইতে হইল, কারণ স্বর্গ পথের বন্দবস্ত করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল, পাণ্ডা মহাশয় রাত্রিতে আর ওপারে না গিয়া, তাঁহাদের রাজ্যে যাহা পাওয়া যায় তাহাই আনিয়া দিলেন। নচেৎ দেবপ্রয়াগে কোন জিনিষেরই অভাব নাই।

১৪ই, বেলা ৯টা। আমরা দেবপ্রয়াগ ছাড়িয়া বাহির হইলাম। রাস্তা ক্রমেই ভয়ানক। তিন মাইল আসিবার পর এক স্থানে পাহাড়ের উপর মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের তপস্যার স্থান। এই খানে একটী প্রকাণ্ড পাহাড় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। চারি গাছা ঘাসের দড়ি এ শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে বাঁধা। দড়ির যে স্থানটা শূন্যে ঝুলিতেছে, সেই খানে একটী ডুলির মত ঝুলানো আছে, তাহাতেও দড়ি বাঁধা। অপর পারে যাইতে হইলে একটীমাত্র লোক তাহাতে বসিবে, আর অপর দিক হইতে দুইজন লোকে দড়ি ধরিয়া টানিতে থাকিবে। দড়ির টানে টানে ডুলিটা দুলিতে দুলিতে একটু একটু করিয়া চলিতে চলিতে অপর পারে পৌঁছিবে। ঠিক নীচেই [illegible]

দড়ি ছিঁড়িয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ মানুষ ও ডুলির চিহ্ন লোপ হইয়া যাইবে। চোখে না দেখিলে ইহার ভীষণতা বোঝা যায় না। এই ডুলির মত জিনিষটার নাম "ডোঁডা।"

এই পথের বাম দিক দিয়া গঙ্গা চলিতেছেন। এইখানে এক একটি পাহাড় এরূপ ঝুঁকিয়া আছে এবং এক একখানি পাথর এরূপ ভাবে ঝুলিতেছে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে এখনি খসিয়া মাথায় পড়িবে। কিন্তু কে জানে কত যুগ যুগান্তর হইতেই হয়ত ঐ অবস্থাতেই আছে। তবে শুনিলাম, বেশী ঝড় বা বর্ষা হইলে খসিয়া পড়ে, এবং যাত্রীও চাপা পড়ে।

এইরূপ তিন মাইল আসিবার পর, একটি জঙ্গলময় উপত্যকা দেখা গেল। উপত্যকার চারিদিকেই পাহাড় ও গভীর জঙ্গল। এই পথ বড় কষ্টকর। উপত্যকাটী দুই মাইল, এই দুই মাইলের মধ্যে ছায়া নাই, বড় গাছ নাই, ছোট ছোট কাঁটার জঙ্গল, এবং পাথর, নুড়ী ও বালির পথ। মাথা রৌদ্রে ফাটিয়া যাইতেছে; গরম বালিতে পায়ে ফোস্কা পড়িয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় বুক অবধি শুকাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু একবিন্দু জল পাইবার উপায় নাই—অর্থাৎ এই পথে একটিও ঝরণা নাই। কি সঙ্কটময় পথ! শুনিলাম জলাভাবে কথনও কখনও এ পথে যাত্রী মারা যায়। আমাদেরও মনে হইতেছিল যে বুঝি এই খানেই থাকিতে হইল, আর চলিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ভয় বা নিরানন্দ একবারের জন্যও আসে নাই, তবে শারীরিক কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।

সাড়ে সাত মাইল আসিয়া যখন রাণী চটিতে পৌছিলাম তখন বেলা একটা। আমরা চটীতে পৌছিয়াই, যে যাহার কম্বল পাতিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম, অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতেছিলাম। আমাদের সঙ্গের ঝাপানী ও কুলীরা পর্য্যন্ত শুইয়া পড়িল। জলের জন্যই অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে জল খাইতে পাইলে ঝাপানীরা কোন কষ্টই বোধ করে না। এই রাণী চটিতে ভয়ানক মাছির উপদ্রব। ইহারা স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে দিতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সকলে উঠিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু অত শীঘ্র আজ উঠিতে পারিলাম না। মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুখ অবধি ঢাকা দিয়া শুইয়া রহিলাম। বেলা ৪টার সময় রান্না হইল—মোটা চালের ভাত, আলু ভাতে।

পাণ্ডা এবং ঝাপানীরা বলিল যে, এইবার হইতে দুই বেলাই পথ চলিতে হইবে—কারণ রাস্তা বড়ই বিপজ্জনক ও সঙ্কটময়। অতএব এক বেলায় বেশী চলিতে পারিব না, অল্প অল্প করিয়া দুই বেলাতেই চলিতে হইবে। অগত্যা ক্লান্ত শরীর লইয়াই বেলা ৫টার সময় আমরা রাণী চটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অল্পদূর আসিবার পরেই একটু একটু মেঘ দেখা দিল। মেঘ দেখিয়া ঝাপানীরা ভয় পাইল, কারণ এইবার যে দেড় মাইল পথ আমরা চলিব, তাহা আরও ভয়ঙ্কর, আরও সঙ্কটপূর্ণ। এইখানে এক একটি পাহাড় যেন ঠিক দুই হাত বাড়াইয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া বলিতেছে—যাইও না, বড় ভীষণ—বড় সঙ্কটময় স্থান! ঝাপানীরা "জয় গরুড় মহারাজকী জয়" বলিয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। এই পাহাড় পথটী দুই হাতের বেশী চওড়া হইবে না। সেইটুকু রাস্তার উপর লোহা বাধানো লাঠিতে ভর দিয়া, নিজের পায়ের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অতি সাবধানে চলিতে হয়। উপর হইতে বরফ গলিয়া পড়িয়া রাস্তাটিকে অত্যন্ত পিছল করিয়াছে। বামদিকে অতলস্পর্শ খদ, যদি কেহ একটু অসাবধান বা অন্যমনস্ক হন তাহা হইলে আর রক্ষা নাই!

এই অতলস্পর্শ খদের নীচে উপলব্যথিতা ক্ষীণকায়া অলকানন্দা,—তাঁহার আর সে আস্ফালন গর্জ্জন এখানে কিছুই নাই।

এইরূপ স্থানে ঝাপান ডাণ্ডি চলে না, যাত্রীদিগকে পদব্রজে যাইতে হয়, ঝাপানীরা সঙ্গে থাকে। এইরূপ আধ মাইল চলিবার পর সেই মেঘ অন্ধকার হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। আমরা তখন একটি পাহাড়ের গর্ভ দিয়া চলিতেছি। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, বড় বড় পাথর সকল এরূপ ভাবে

ঝুলিতেছে যে, যদি একখানি খসিয়া পড়ে ত আমাদের দলটীর আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। উপর হইতে ছোট বড় পাথর সকল গড়াইয়া আসিয়া আমাদের কাছে পড়িতে লাগিল: ঝাপানীরা "জয় গরুড় মহারাজকী জয়" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, যেন এখনি আমাদের সব শেষ হইয়া যাইবে। আমাদের একজন সঙ্গিনী গাইয়া উঠিলেন 'ভবের লীলা সাঙ্গ হলো একবার সবে হরি বল'। তখনও কিন্তু আমার মনে ভয় বা ভাবনা নাই, বেশ একটা আনন্দ আসিতেছে। পরমুহূর্ত্তে ঝড় এমনি প্রবল বেগে আসিল যে, বড় বড় গাছের ডাল সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, মেঘে এবং ছোট বড় পাথর ও ধুলায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সেই সময়ে আমার সঙ্গীরা যে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িলেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। একে অন্ধকার, ঝড়ে বড় বড় পাথর সকল গড়গড় শব্দে গড়াইয়া পড়িতেছে, মেঘের গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া যাইতেছে, আমার ঝাপানী দুই জন ঝাপান সুদ্ধ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়াছে দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি দুজন ঝাপানী ও একলা আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া—আর কেহই নাই। এইবার প্রবল বেগে বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে শিল পড়িতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর স্থানে সেই ঝড় বৃষ্টি শিলাপাত ও মেঘের গর্জ্জন সে যে কি ভয়ানক, তাহা না দেখিলে না ভোগ না করিলে বুঝা বা বুঝানো যায় না। আমি একখানি প্রকাণ্ড পাথরের নীচে মাথা রাখিয়া, সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকিয়া, আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া ভগবানের এই বিরাট মূর্ত্তি ও তাঁহার বিশ্বসংহারক তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, দেব! কখনও শান্ত কখনও ভীষণ এই অনন্তরূপ তোমার দেখাইবার জন্যই কি এত দূরে, কিংবা তোমার এত কাছে আনিয়াছ দয়াময়?

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাত হইয়া ক্রমে থামিয়া আসিল, প্রকৃতি দেবী আবার শান্তরূপ ধারণ করিলেন। আমি সেই গুহার মত স্থান হইতে বাহির হইলাম। শিলার আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছে, কম্বলখানি ভিজিয়া ভারী হইয়াছে। ঝাঁপানীদের নিকট ভিজা কম্বলখানি দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম, ঝাপানীরা সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। দু'চার পা চলিতে চলিতে দেখিলাম, আমার ঝাঁপানী দুইজন, ঝাঁপান লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আর একটু আসিয়া আমি ঝাঁপানে উঠিলাম, আর চলিতে পারিতেছিলাম না। ঝাঁপানীরা অতি সাবধানে ঝাঁপান লইয়া চলিল।

প্রায় এক মাইল আসিয়া একটী চটী পাওয়া গেল, নাম রামপুর চটী। রাণী চটী হইতে আমরা তিন মাইল আসিলাম। চটিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আমাদের কতকগুলি লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কতকগুলি এখনো আসে নাই। ক্রমে এক এক করিয়া সকলেই আসিলে দেখা গেল, সকলেই খুব ভিজিয়াছে, সঙ্গের কাপড় এবং বিছানা ইত্যাদিও কতক কতক ভিজিয়া গিয়াছে। সেই ভিজা কম্বল পাতিয়াই সকলে শুইয়া পড়িলাম। এবেলা আর রান্না খাওয়া হইল না—সকলেই অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

সেই ভিজা কম্বলের বিছানায় শুইয়া এক ঘুমেই ভোর হইয়া গেল।

এ পথের চটী জিনিষটা কি, তা একটু বলি। তিন দিক খোলা, সামনে কতকগুলি বড় বড় গাছ কাটিয়া পুঁতিয়াছে, তাহার উপর কতকগুলি ডাল পালা বা কতকগুলি বড় বড় স্লেটের মত পাথরের চাপ চাপাইয়া দিয়াছে। ইহাই হইল ছাদ। আর কতকগুলি বড় বড় পাথরের টুকরা তিন হাত উচ্চ ও খানিকটা লম্বা ভাবে উপরি উপরি সাজাইয়াছে, ইহাই দেওয়ালের কায করিতেছে। ইহার নামই চটী। কোনও স্থানে ইহা অপেক্ষা একটু ভাল চটীও পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশই এই রকম। কিন্তু কতদিন কত ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কত ব্যাকুল ভাবে ঐ রূপ একটু চটী বা আশ্রয় পাইবার জন্যই ছুটিয়া আসিয়াছি!

১৫ই ভোর ৪টা। আমার রাম চটী ছাড়িয়া যাত্রা করিলাম। পাণ্ডা বলিল এখন হইতে রাত্রি ৩।৪ টার সময় যাত্রা করিতে হইবে, এবং বেলা ৯টার সময় যে চটী পাওয়া যাইবে তাহাতে স্নানাহার সারিয়া লইয়া, যত শীঘ্র সম্ভব বাহির হইয়া আসিয়া বেলা ৫টা নাগাইদ যে কোনও চটীতে আশ্রয় লইতে হইবে। নচেৎ এই সময়ে এই পাহাড় পথে রোজই এইরূপ ঝড়বৃষ্টি ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য আমরা আজ ভোর ৪টাতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। এই পথটি অনেক ভাল। দার্জ্জিলিঙের মত চড়াই, উৎরাই, পাহাড়ের কোলে কোলে ক্ষেত, তবে জঙ্গল ক্রমেই বেশী বেশী দেখা যাইতে লাগিল। উপত্যকায়ও ছোট ছোট ক্ষেত—যব, গম, তামাক ইত্যাদি দেখা গেল। এখানে গঙ্গা একেবারে অদৃশ্য। এইরূপ দেড় মাইল আসার পর আবার গঙ্গা দেখা গেল। গঙ্গার ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র ও একখানি গ্রাম। গ্রামখানি দেখিতে অতি সুন্দর। এই পর্ব্বত বেষ্টিত গ্রামখানির নাম 'জানাসু'। উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে বোধ হইতেছিল যেন নীচে একখানি খেলাঘর সাজানো রহিয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় যখন আমরা বাহির হইলাম, তখনও চতুর্থীর চাঁদ দেখা যাইতেছে। এই অম্বরচুম্বিত পর্ব্বতশিখরে চন্দ্র দেখিয়া বুঝিলাম, শিবের মাথায় চন্দ্রকলার উপমা কেন।

পাণ্ডবেরা যে পথে ও যে স্থানে গিয়াছিলেন আমরা এখন সেই পথে ও সেই স্থানে যাইতেছি। খুব শীত। শীতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছি। গঙ্গা কখনও পাতালবাহিনী, কখনও বামদিক দিয়া চলিতেছেন, কোথাও বা পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিতেছেন। কত রকম পাখী, কত রকম স্বরে ডাকিতেছে। কি মিষ্ট সে ডাক! এই স্থানের শোভা কি অপূর্ব্ব, অথচ কি ভয়ঙ্কর! আরও আধ মাইল চলিয়া আবার একখানি গ্রাম। এই গ্রামটী ঠিক পাড়াগাঁর মত দেখিতে, এবং এই পথটির ভীষণতা নাই, দার্জ্জিলিঙের মত, আবার কখনও বা পাড়াগাঁর পথের মত দেখিতে। দুই পাশে শস্যক্ষেত্র ও ছোট ছোট গ্রাম।

এইরূপ পাঁচ মাইল ও এক সেতু পার হইয়া আমরা বিশ্বকেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে বিশ্বকেদার মহাদেব আছেন। এই মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই স্থানে অর্জ্জুন পাশুপত অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রস্থানকালে তাঁহারা কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ। আর শুনিলাম, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অর্জ্জুন যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম শিবপ্রচণ্ডা। এই শিবমন্দিরটি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। চারিদিকে একটু বনের মত, এবং সেই বনভূমি ভেদ করিয়া মন্দিরের বাম পার্শ্ব দিয়া অলকানন্দার একটি ধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহার নাম 'খাণ্ডবধারা'। এই ধারার নিকটেই উচ্চ পাহাড়ের উপর মহর্ষি খাণ্ডবের তপস্যার স্থান। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিয়া অলকানন্দার আর একটি ধারা আসিয়া ঐ ধারার সহিত মিলিত হইতেছে, তাহার নাম মার্কণ্ড ধারা। এই ধারার উপর-পাহাড়ে মার্কণ্ড ঋষির তপস্যার স্থান। এই মিলিত ধারার নাম শিবপ্রয়াগ।

এই বিশ্বকেদার সঙ্গমে স্নান, তর্পণ সারিয়া, পাণ্ডবপূজিত শিব পূজা করিয়া মানবজন্ম সার্থক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পূজায় বসিয়া মনে যে কত আনন্দ কত শান্তি বোধ করিতেছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পূজা করিতে করিতে আমি এরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আমার সঙ্গীরা খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে এইখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া ডাকিয়া উঠাইলেন।

পূজা শেষ করিয়া, অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে আমরা বিশ্বকেশ্বর হইতে যাত্রা করিলাম। তখন বেলা ১০টা। এ রাস্তাটি বেশ ভাল, পথের দুই পাশেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ও ছোট ছোট গ্রাম। কিছু দূর আসিয়া দেখিলাম—অলকানন্দা খুব প্রশস্ত—যদিও মধ্যে মধ্যে চড়া পড়িয়াছে, তাহা হইলেও স্থানে স্থানে খুব প্রশস্ত। ধারে ধারে ক্ষেতে শস্য

সকল পাকিয়া যেন সোণা ঢালিয়া দিয়াছে। আরও কিছুদূর আসিবার পর, একখানি বড় সুন্দর গ্রাম দেখা গেল। গ্রামখানির নাম ছৈলা, যেন একখানি আঁকা ছবি। এই গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কমলেশ্বর মহাদেব আছেন। ইনি কপিলমুনি-পূজিত, এই স্থানে তাঁহার সিদ্ধাসনও আছে। পথের উপর হইতে আধ মাইল নীচে নামিয়া আমরা দর্শন করিলাম। ইহার কিছু পরে একটী পাহাড়ের উপর মহর্ষি নারদের তপস্যার স্থান, চারিদিকে ভগ্নস্তূপের ভিতর একটি ভগ্ন মন্দিরে কালো পাথরের নারদ ঋষির প্রতিমূর্ত্তি আছে। আরও তিন মাইল আসিয়া আমরা শ্রীনগরে পৌছিলাম। বিল্বকেশ্বর হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত সমস্ত পাহাড় অভ্রমিশ্রিত, রৌদ্র লাগিয়া সমস্ত পাহাড় যেন রূপার মত চকচক করিতেছে, দেখিতে অতি সুন্দর। আমি কতকগুলি টুকরা সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

রাম চটি হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত সবসুদ্ধ আট মাইল আসা হইল। স্থির হইল, আজ এইখানেই থাকা হইবে। কারণ পর্শু হইতে পাণ্ডার জ্বর হইয়াছে, পথে একটি কুলির কলেরা হওয়ায় তাহাকে সেইখানে চটিতে রাখিয়া একটি ঘোড়া যোগাড় করিয়া কোন রকমে কাল আসা হইয়াছে। আমাদেরও একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। শ্রীনগরে বাজার হাট দোকান খুব, এবং ফল হইতে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এখানে কুলির বন্দোবস্ত করা হইল। বারো দিনের পর আজ খুব ভাল খাওয়া হইল। অর্থাৎ আজ বেগুন পাওয়া গিয়াছিল, আলু ও বেগুন দিয়া ঝোল আর ভাত রান্না হইল, ২টার পর খাওয়া হইল। আজ এখানে থাকা হইবে বলিয়া আহারাদির পর সকলেই শুইয়া পড়িলাম। কেহ কেহ গল্প করিতে লাগিলেন। আমি আজ একটু ঘুমাইয়া লইলাম।

বেলা ৫টার সময় আমরা সকলে মিলিয়া সহর দেখিতে গেলাম। এখানেও সব জিনিষ পত্রই পাওয়া যায়। সহরের ঠিক মাঝখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। সন্ধ্যার সময় আরতি দেখিয়া বাজার হইতে পাঁপর ভাজা, জিলাপী, মিঠাই ও রাবড়ী কিনিয়া আনা হইল। রাত্রিতে তাহাই খাওয়া হইল। আমাদের একজন বলিলেন, "আজ ভাই আমাদের রাজভোগ।"

১৬ই রাত্রি ৪টা। শ্রীনগর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আজ অন্ধকার। এখান হইতে ৩ মাইল পথ বেশ ভাল। গ্রাম্য পথের মত পথের দুই ধারে শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের কোলে এবং বামদিকে গঙ্গার ধারে ধারে ক্ষেত্র সকল বড় সুন্দর দেখাইতেছে। পথের দুই পার্শ্বেই ফণিমনসার বেড়া। এই তিন মাইলের মধ্যে একখানি মাত্র গ্রাম, নাম শ্রীকোট। এই গ্রাম ছাড়িয়া আবার ছোট বড় পাহাড় ও কাঁটাপূর্ণ জঙ্গল। তবে রাস্তাটী তত কষ্টদায়ক নয়। এইরূপ আরও আধ মাইল আসিবার পর, আবার সেইরূপ বড় বড় পাহাড় ও জঙ্গল আরম্ভ হইল। এখানে গঙ্গা বামদিক দিয়া চলিতেছেন বটে কিন্তু পাতালভেদী। শ্রীনগর হইতে চার মাইল দূরে একখানি বেশ ভাল চটি দেখিলাম, নাম সুকুল চটি, বেশ পরিস্কার কিন্তু খুব ছোট। এখানে বরাবরই দেখিতেছি, যেখানে ঝরণা কাছে বা সহজে গঙ্গায় নামিতে পারা যায়, সেই খানেই ইহারা চটি বাঁধে। অনেক স্থানেই দেখিলাম, ঝরণার মুখে পাইপ লাগানো আছে। তাহাতে রাস্তাও খারাপ হয় না, অথচ কলের জলের মত খুব জোরে সর্ব্বদাই জল পড়িতেছে এবং চৌবাচ্চার মত বাঁধানো স্থান দিয়া জল একেবারে নীচে চলিয়া যাইতেছে।

এই সুকুল চটীতে আমরা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, সেই সময়ে একটি অন্ধ আসিয়া তুলসীদাসের দোহা গাহিতে গাহিতে ভিক্ষা করিতে লাগিল। সে যে কি সুন্দর এবং এই সকাল বেলাতে যে কি মিষ্ট গাহিতে লাগিল তা বলিতে পারি না। আমি দুই একটি লিখিয়াও লইয়াছিলাম, কোথায় হারাইয়া গিয়াছে তাহা কে জানে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার বাহির হইলাম। এখান হইতে আট মাইল আসিয়া ভীমসের চটী। এই চটীটা বেশ বড়, জলেরও খুব সুবিধা, নিকটেই

পাহাড়ের উপর হইতে একটী ঝরণা স্বাভাবিক ভাবে প্রবল বেগে পড়িতেছে। ইহার উপর মানুষের কারিগরি মোটেই নাই, তাই দেখিতেও অতি সুন্দর লাগিতেছে। যেখানে চটী, সেইখান হইতে খানিকটা উপরে উঠিয়া সেই ঝরণার নীচে একখানা খুব বড় ঢালু পাথরের উপর বসিয়া স্নান করিতে লাগিলাম। মাথার উপর সহস্র সহস্র ধারায় জল পড়িতে লাগিল। সেই অমৃতধারায় স্নান করিতে করিতে এই গানটি মনে হইল, "তাঁহারি অমৃত ধারা জগতে যেতেছে বয়ে।" স্নান ছাড়িয়া আর উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। এবার আমি একলা নই, দুই একজন গম্ভীর প্রকৃতি সঙ্গিনী ছাড়া আমরা সকলেই মাতিয়া গিয়াছিলাম! প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্নান শেষ হইল। মনে হইতে লাগিল যে শরীরের সঙ্গে মনেরও ময়লা যেন কাটিয়া গেল। শরীর ও মন, দুই যেন হাল্কা হইয়া গেল। বড় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল।

চটীতে ফিরিলে পাণ্ডা মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এৎনা ঘড়ি ঠাণ্ডি পানিমে রহেনেসে বহুত মুস্কিল হো যায়গা মা।" বলিলাম আমরা স্বয়ং নারায়ণের কোলের ভিতর রহিয়াছি, আমাদের কোনও অসুখ হইতে পারে কি ঠাকুর? ঠাকুর জবাব দিলেন, "আপকা উপর ভগবানকো বহুত কৃপা দেখতে মা।"

এইবার সকলেই রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি সেই অবসরে চটীর ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যান্য যাত্রীদের রান্না খাওয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের এই লম্বা চটীতে আজ অনেক দেশের অনেক যাত্রী আসিয়া জমিয়াছে। কেহ রাঁধিতেছে, কেহ খাইতেছে। একস্থানে কতকগুলি মারহাট্টা স্ত্রী পুরুষ জমা হইয়াছে, তাহারা অড়হর ডাল ও মোটা মোটা রুটি করিয়া তাহাদের স্বামীদের খাওয়াইতেছে।

একটী ৭৫ বৎসরের বুড়ী বাঙ্গালী, তার কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কপর্দ্দক-শূন্য নিঃসহায়, সে একলা এই ভয়ানক পথে নারায়ণ দেখিতে চলিয়াছে—সেও আজ আমাদের এই চটিতে আশ্রয় লইয়া রাঁধিতেছে। সে যে কি রকম কোমর ভাঙ্গা বুড়ী তা বলিতে পারি না। নারায়ণ যদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে এই দুর্গম পথে কে তাহার সহায়, কে তাহাকে লইয়া চলিতেছে? এই বুড়ীর ভিক্ষার ঝুলীর ভিতর আছে—২টা নারিকেলের মালা, আধখানি ভাঙ্গা লাউয়ের খোল, একখানি ভাঙ্গা লোহার কড়া, একসের আন্দাজ জল ধরে এইরূপ একটি কুঁপি, একগাছি হরিনামের মালা ও দুই আনা পয়সা। গায়ে একটি ছেঁড়া তুলার জামা, ঐরূপ ছেঁড়া একখানি কম্বল ও একখানি ছেঁড়া চট। এই সম্বল লইয়া এই ভয়ানক পথে বুড়ী চলিয়াছে! কি নির্ভর ভগবানের উপর! দেখিলাম, দুইখানি ইটের উপর সেই ভাঙ্গা কড়াখানিতে, কিছু চাল ও জল দিয়া, আহ্নিক করিতে বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া, সেই আধসিদ্ধ ভাতগুলি সেই ভাঙ্গা লাউয়ের খোলাতে ঢালিল। অল্প নুণ দিয়া, ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া অতি তৃপ্তির সহিত খাইতে লাগিল! আমি তখন চটীওয়ালার নিকট হইতে কিছু দুধ, এবং আমাদের সঞ্চিত পেঁড়া হইতে কিছু পেঁড়া আনিয়া তাহাকে দিলাম। সে প্রথমে কোনও মতে লইবে না, খালি বলে, "মা, আমার ত দরকার নেই, আমার হরি যখন আমাকে যা দেন তাই আমি খাই, আমার কোনও কষ্টই নেই মা।" আমি হাত যোড় করিয়া বলিলাম, "নাও মা, নাও, তুমি খেলে আমি বড়ই তৃপ্তি পাব।" বুড়ীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। খাইতে খাইতে বারবার বলিতে লাগিল, "আজ তুমি আমার জন্যে এই জঙ্গলে দুধ মিষ্টি নিয়ে এলে দয়াময়! এত দয়া তোমার!" তার তখনকার ভাব দেখিয়া প্রথমে আমার সঙ্গিনীরা, ক্রমে অন্যান্য লোক আসিয়া তাহাকে খাদ্যদ্রব্য দিতে লাগিল। বুড়ী অত্যন্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আর "এ কি করলি মা" এই কথা বারবার বলিতে লাগিল। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম, সে বামুনের মেয়ে।

এখানে আজ অনেক রান্না হইল—ডাল ভাত আর

একটা তরকারী। খাওয়া হইলে, বিশ্রাম না করিয়াই আজ এখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বেলা তখন ৩টা। সকাল হইতেই পাণ্ডা বলিতেছিল যে আজ দেড় মাইল পথ বড়ই খারাপ, যদি ঝড় বৃষ্টি হয় ত সে দিনের মত বিপদে পড়িতে হইবে। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। চটি হইতে একটু আসিয়াই দেখা গেল, সামনে কি ভয়ানক চড়াই—একবারে পাহাড়ের শৃঙ্গে উঠিতে হইবে। এত দিন চড়াই দেখিতেছি, কিন্তু আজকার চড়াই কি ভয়ানক—একবারে ঠিক সোজা উঠিতে হইবে। গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া, পাহাড়ের গায়ের পাথর ধরিয়া এবং ঐরূপ পাথরের উপর পা রাখিয়া, ঠিক সোজা শৃঙ্গ উঠিয়া অপর দিকে নামিতে হইবে; এখানে রাস্তা একেবারেই নাই। বামদিকে জঙ্গলপূর্ণ খদ—যেন পাতাল অবধি চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বত আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই জঙ্গলের ভিতর পথ করিয়া আমরা চলিতেছি। কোথাও গাছের ডাল ধরিয়া, কোথাও গাছের শিকড়ের ভিতর দিয়া, কোনও স্থানে পাথর টপকাইয়া চলিতে হইতেছে। এইরূপ চলিয়া যখন আমরা পর্ব্বতশৃঙ্গের কাছে পৌঁছিয়াছি, সেই সময়ে সেই স্থান হইতে গভীর স্বরে ওঙ্কারধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। কি সুন্দর স্বর, কি মিষ্ট সে ধ্বনি! প্রায় এক মিনিট ধরিয়া ঐ স্বর শুনা যাইতে লাগিল। আবার চুপ হইয়া গেল। যখন শৃঙ্গের উপর পৌঁছিয়াছি, তখন আর একবার ঐরূপ ধ্বনি শুনা গেল। সে যে কি স্বর, তা বুঝানো যায় না। এখনও মনে হইলে সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, এই গভীর জঙ্গলে এইরূপ 'প্রণবধ্বনি' কোথা হইতে আসিতেছে? শুনিয়াছিলাম বদরিকাশ্রমের পাহাড়ে পাহাড়ে দেব কন্যারা সঙ্গীত করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইহা কি তাই? আমার এক সঙ্গিনী বলিলেন, বোধ হয় গহ্বরবাসী কোনও মহাত্মা স্তবগান করিতেছেন।

আরও এক মাইল উঠিলাম। এইবার 'উৎরাই' অর্থাৎ নামিতে হইবে। গড় গড় করিয়া নামিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, কে যেন পিছু হইতে ঠেলিয়া দিতেছে। কিছুতেই পা ঠিক রাখা যাইতেছিল না। এক হাতে লাঠিতে জোর দিয়া, অন্য হাতে ঝাপানীদের হাত ধরিয়া অনেক কষ্টে এই আধ মাইল পথ নামিলাম। এখানে ঝাপান চলিল না। এই আধ মাইল আসিবার পর হইতে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতে লাগিলাম। এইখানে আবার ঝাঁপানে উঠিলাম। এইবার কখনও 'চড়াই', কখন, 'উৎরাই'—এইরূপ কিছুদূর আসিয়া একটা চটী পাওয়া গেল। চটীর নাম 'থাকড়াচটী'। আজ এইখানে রাত্রিতে থাকা হইবে স্থির হইল। ভাটিসের চটী হইতে তিন মাইল আসা হইল।

চটীতে পৌঁছিবার কিছু পরেই খুব জোরে ঝড় আসিল। পথের ধূলা কাঁকড় পাথরে আমাদের সর্ব্বশরীর ও বিছানা ভরিয়া গেল। আমরা মুখে কম্বল ঢাকা দিয়া দিয়া শুইয়া রহিলাম। অন্য এক দল লোক আমাদের পূর্ব্বে এই চটীতে আসিয়া লুচি ভাজিয়া খাইতেছিল; বেচারাদের 'দাল ও পুরী' ঝড়ের ধূলায় ভরিয়া গেল। ঝড় থামিলে, চটীওয়ালার দোকান হইতে কিছু ছোলা ভাজা কিনিয়া তাহাই ও পেড়া খাইয়া সে রাত্রির মত শুইয়া পড়িলাম।

১৭ই, ভোর ৫টা। আমরা থাকড়া চটী ছাড়িলাম। এখান হইতেই খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। চটীর নিকট হইতেই একেবারে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, আমরা ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম। উঃ—কত উচ্চ শৃঙ্গ উঠিলাম! ঠিক খদের উপর পা রাখিয়া চলিতে হইতেছে, শত শত হাত নিম্ন খদের দিকে চাহিতে পারা যায় না। সম্মুখে অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে। হঠাৎ বহুদূরে একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। আমরা আশ্চর্য্য বোধ করাতে এদেশী সঙ্গীরা বলিল, সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন; সম্মুখে যে শৃঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছে উহাই 'কুমেরু পর্ব্বত'। সে যে কি শোভা তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। ক্রমে যখন এই কুমেরুশৃঙ্গে উঠিলাম, তখন এই অনন্ত তুষারশ্রেণীর শেষ প্রান্তে তুষারমণ্ডিত 'কেদারনাথ' পর্ব্বতের একটু অংশ দেখা গেল। এদেশী

লোক হইতে সকল যাত্রীই এক সঙ্গে 'বম্ বম্ কেদার' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তখন আমাদের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা ভক্তিনত হৃদয়ে সকলেই প্রণাম করিয়া, উঠিলাম।

কিছুদূর আসিয়া আমার একজন ঝাপানওয়ালার পায়ে হোঁচট লাগিল। ঝাপান সুদ্ধ সে একবারে খদের উপর আসিয়া পড়িল। আর একটু হইলেই ঝাপানসুদ্ধ অতল গহ্বরে সমাধি লাভ করিতাম। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণ, যাত্রীরূপে আমার ঝাপান রক্ষা করিলেন। চকিতের ন্যায় কোথা হইতে একটী যাত্রী আসিয়া আমার ঝাপান ধরিয়া ফেলিল; নচেৎ বদরাভ্রমণ সেই খানেই শেষ হইত, এ কাহিনী আমাকে আর লিখিতে হইত না! আর একদিনও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল। সেদিনও তিনিই যাত্রীরূপে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কথায় আছে যে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে"—এই কথাটী যে কত ঠিক তাহা এই পথে আসিয়া বিশেষভাবে বুঝিয়াছি।

আরও আড়াই মাইল উঠিয়া একটী চটী, নাম 'নরকোট'। এইখানে একটু বিশ্রাম করিয়া, আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইবার আমরা ক্রমেই উপরে উঠিতেছি, শীতও খুব বোধ হইতেছে। ঝাপানে বসিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছি। এইরূপ আরও এক মাইল উঠিবার পর, চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সকল পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, সে সবই তুষারময়। এই তুষার একটু দেখিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে কত দিন ভোরে উঠিয়া কত ছুটাছুটী করিয়াছি! আর আজ আমার সম্মুখে কি অনন্ত তুষারমালা সূর্য্যালোকে জ্বলিতেছে! যত উপরে উঠিতেছি, জঙ্গল ততই বৃদ্ধি হইতেছে। কতরকম ফুল যে ফুটিয়া রহিয়াছে তা বলিতে পারি না। কি সুন্দর সুন্দর সব ফুল, গন্ধে বনভূমি আমোদিত করিতেছে। এরূপ সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুল ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই। মাতা প্রকৃতি দেবী, এখানে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন। এই জঙ্গলে কত রকম ফলের গাছ—আম, জাম, ডালিম, পিচ, কলোদ ইত্যাদি এবং কত রকম বনফলের গাছ যা আমি চিনি না। কত গাছে ফল ধরিয়াছে। আবার বনবাসীদের বল্কল রং করিবার জন্যই বুঝি অসংখ্য পলাস গাছ এই সকল বন আলো করিয়া রহিয়াছে। নানারূপ পাখী সকল নানাস্বরে ডাকিতেছে। এইখানে দেখিলাম, ছোট ছোট থলিয়াতে করিয়া ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে, খাদ্য দ্রব্য সকল যাইতেছে। এত উচ্চ এত সঙ্কীর্ণ পথ যে, ছাগল ও ভেড়া ভিন্ন খাদ্য লইয়া যাইবার অন্য কোনও উপায়ই নাই। শত শত বন্য ছাগল ও ভেড়া পৃষ্ঠে বোঝাই লইয়া চলিয়াছে; তাহাদের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লইয়া আমরা চলিতেছি। যখন পথ দিয়া মাল লইয়া পশুপাল চলে, তখন আর ঝাপান চলিবার উপায় থাকে না। সেই পশুপালের সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া যাইতে হয়। আবার দয়া করিয়া তাহারা যদি একটু ধাক্কা দেন, তা হলে একেবারে অতলে সমাধিলাভ কিছু বিচিত্র নয়। তবে বিদেশী লোকের, যাত্রীদের যথাসম্ভব সাবধানে ও যত্নে লইয়া যায়। পাহাড়ী লোকের সঙ্গ ছাড়া এ সকল পথে চলা একেবারে অসম্ভব। দেখিতেছি, বদরীর পথে মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, তবে সময় পূর্ণ না হইলে লইয়া যান না ইহাও স্থির।

এইবার উৎরাই। সেই উচ্চ শিখর হইতে আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। এক মাইল নামিবার পর আবার অলকানন্দা দেখা দিলেন—এতক্ষণ বরফের ভিতর অদৃশ্য হইয়া ছিলেন। এই ২॥ মাইলের ভিতর জল বিন্দুমাত্র নাই—সব জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। আরও ১॥ মাইল নামিবার পর, 'গোলাপ চটী'। এইখানে স্নানাহার হইল। রান্না হইল আলু-কুমড়া-ভাতে ভাত। এবেলা এই খানেই বিশ্রাম। নরকোট হইতে গোলাপ চটি অবধি সমস্ত রাস্তাটাই প্রশস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং যতদূর সাধ্য করিতেছেন। তবে যেখানে অসাধ্য তাহার উপায় নাই। কিন্তু একটু

খারাপ হইতেছে এই যে, পাহাড়ের গহ্বরে যে সকল সাধু মহাত্মা বাস করিতেন, তাঁহাদের আর দেখা যায় না। পাহাড়ের সঙ্গে তাঁহাদের গহ্বরেরও খানিক খানিক কাটা গিয়াছে—কাযেই তাঁহারা ঐ সকল স্থান ছাড়িয়া কোনও গভীর জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত গুহায় এখনও কালী ও ধোঁয়ার দাগ রহিয়াছে। হরিদ্বার হইতে এত দূরে আসিলাম, কিন্তু প্রকৃত সাধুর আশ্রম একটিও দেখিতে পাইলাম না। এই রাস্তা বাড়াইবার হাঙ্গামে সকল সাধুই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার স্বামীর সহিত যখন লছমন ঝোলা অবধি আসিয়াছিলাম, তখন হৃষীকেশ হইতে লছমন ঝোলা পর্য্যন্ত কত সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম, কত সাধনরত মহাত্মা দেখিয়াছিলাম। এবার তাঁহাদের বদলে সাধু-বেশধারী অনেক ভিখারী দেখিলাম মাত্র।

আজ রাত্রিতে খানকয়েক পাঁপড় ভাজা ও একটু হালুয়া তৈয়ারী করিয়া খাওয়া হইল। অবশ্য সুজি ও পাঁপড় আমাদের সঙ্গেই ছিল। ও সব জিনিষ সহর ভিন্ন এসকল চটীতে মিলে না। তা ছাড়া, আহারাদির বন্দোবস্তের কোন ওজরই আমার ছিল না। খাবার তৈয়ারী করিয়া ডাকিলে আমি গিয়া খাইতাম—আমার স্নেহময়ী ভগিনী জগৎমোহিনী আমার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাল সকালে আমরা রুদ্রপ্রয়াগ যাত্রা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীসুশীলা বসু।

হেমচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন,—রাজনীতিক ও অন্যান্য সাময়িক কবিতা।

জয়মঙ্গল গীত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সমগ্র ভারতবর্ষ এক নূতন আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। লর্ড লিটনের শাসনকালে প্রচণ্ড আফগান সমর প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সাধারণ লোকমত উপেক্ষা করিয়া দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল, অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশীয়গণের পক্ষে অস্ত্র রাখা দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, এবং এই সকল কারণে দেশে অশান্তি এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে যখন উদারনীতিক মার্কুইস্ অব রিপণ ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য এদেশে পদার্পণ করিলেন, তখন ভারতবর্ষ এক অপূর্ব্ব আশায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, ভারতবাসী যথার্থই মনে করিল—

"বৃটিশের বেশে ঋষিতুল্য নর
এ দেশে উদয় হবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে আবার
ভারতে উদয় হবে।"

—এবং এই আশা বিফল হয় নাই। বেণ্টিঙ্কের ও ক্যানিঙের নামের সহিত পুণ্যশ্লোক রিপণের নামও ভারতবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি ও অপূর্ব্ব ন্যায়পরতা কৃতজ্ঞ ভারতবাসী কখনও বিস্মৃত হইবে না। রিপণের শাসনকালেই লিটনের প্রজ্বলিত সমরানল নির্ব্বাপিত

হইয়া শান্তিসংস্থাপিত হয়, দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদত্ত হয়, শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রসারিত হয়, স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়।

যদিও পুণ্যস্মৃতি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণী অনুসারে রাজকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে দেশী ও বিদেশী-গণের মধ্যে পার্থক্য দূরীকৃত হইয়াছিল, যদিও ভারত-বর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে ভারতবাসী বিচারপতির পদে বৃত হইয়াছিল, তথাপি উক্ত ধর্ম্মাধিকরণে এ পর্য্যন্ত প্রধান বিচারপতির আসনে কোনও ভারত-বাসীকে বরণ করা হয় নাই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ কিছুকালের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিলে লর্ড রিপণ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রদান করেন। এই নিয়োগের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু যোগ্যতা থাকিলে লর্ড রিপণের নিকট দেশীয় ও বিদেশীয়ের পার্থক্য ছিল না। বলা বাহুল্য রমেশচন্দ্রের এই নিয়োগে ভারতবাসীমাত্রেই আনন্দিত এবং রিপণের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। এই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের আন্তরিকতাপূর্ণ 'জয়মঙ্গল গীতে' প্রতিভাসিত হইয়াছিল—

কাছে এসো ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চির সুখে হয় কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল॥
উজল আজি হে বাঙালীর নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥

* * *

আনন্দে বাজ্‌রে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্‌রে ভেরি।
"রিপণের জয় রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি॥

* * * *

কৈ বরণ ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে রিপণের গলে
পরে প্রিয়জনে সাজাব॥



৺রমেশচন্দ্র মিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু (এক্ষণে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নামে সুপরিচিতা) ও শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেমচন্দ্র এতদ্দেশীয় মহিলাগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারের জন্য চিরদিনই আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীনা ছিলেন বলিয়া তিনি নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্যসুখ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। শিক্ষিতা মহিলাগণকে তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বলা বাহুল্য এই দুইজন বঙ্গরমণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি লাভ করিলে হেম-চন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই আনন্দ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্ত উপলক্ষে রচিত উৎসাহপূর্ণ কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছিল—

> সেদিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
> নারী হবে পুরুষের জীবন আধার।
> গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
> ছড়াইবে সুখ রাশি চাহিয়া সবারে!—
> হবে কি সেদিন, ফিরে যবে এ বাঙালী
> অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী!—
> কি আশা জাগালি হৃদে, কে আর নিবারে?
> ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।



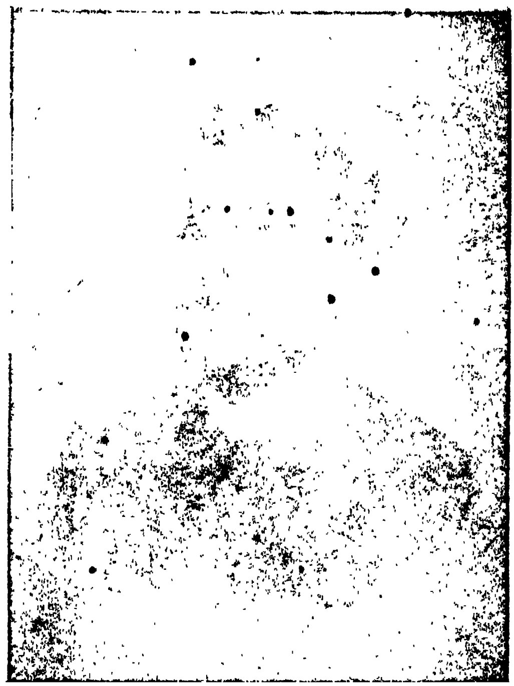
৺সুরবালা দেবী

মধ্যমা কন্যার বিবাহ। লর্ড রিপণের শাসনকালে যে রাজনৈতিক ঘটনায় হেমচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই ইলবার্ট বিলের মহা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণিত করিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হেমচন্দ্রের মধ্যমা কন্যা সুরবালার সহিত কৃষ্ণনগরের ডেপুটি কলেক্টর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় * মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (এক্ষণে মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেক্রেটারী) মহাশয়ের শুভ বিবাহ সংঘটিত হয়। যদুনাথ হেমচন্দ্রের পুরাতন কুটুম্ব ছিলেন, কারণ, যদুনাথের এক নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র

* যদুনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।—
ইং ১৮২৮ সালে বর্দ্ধমান জেলায় অন্তঃপাতী মেমারী ষ্টেসনের নিকট বড়র নামক এক ক্ষুদ্রগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আরও দুই সহোদর ছিলেন, ইনি কনিষ্ঠ। ইঁহার পিতা স্বকৃতভঙ্গ, বলরাম ঠাকুরের সন্তান ছিলেন, তাঁহার অনেকগুলি বিবাহ ছিল, সুতরাং যদুনাথ তাঁহার বৈবাহিক হেমচন্দ্রের ন্যায় মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন। যদুনাথের মাতুলবংশ অতি সম্ভ্রান্ত ছিল এবং ঐ বংশের কয়েকজন তদানীন্তন উকীল ও সদর আমিন আলা (সবজজ) ছিলেন। তাঁহার এক মাতুল বাঁকুড়ায় ওকালতী করিতেন, সেইস্থানে থাকিয়া যদুনাথ বাঁকুড়া জেলাস্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন ও জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন কিন্তু সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই অবস্থানুরোধে চাকুরীর চেষ্টা করিতে হয়। এই সময় তাঁহাকে বর্দ্ধমানে থাকিতে হয় এবং তথায় তিনি ৺রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও ৺রামতনু লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হন এবং উভয়ের স্নেহ লাভ করেন। তিনি প্রথমে বর্দ্ধমান কলেক্টরীতে সামান্য কেরাণী হইয়া প্রবেশ করেন। কিন্তু অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে কলেক্টরের সেরেস্তাদার হন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হন। একাদিক্রমে ১৬ বৎসর মেদিনীপুরের Canal Revenue এর chargeএ ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত খ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া এবং তৎপরে কিছুদিন বৈদ্যনাথে ও কৃষ্ণনগরে থাকিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী উপলক্ষে বহুদিন মেদিনীপুরে অবস্থিতি করায় যদুবাবু সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি চারিত্র্যে গরীয়ান, ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান এবং দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র গোবিন্দচন্দ্র, আশুতোষ ও সন্তোষনাথ। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতির সহপাঠী গোবিন্দচন্দ্র কিছুকাল মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ইঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অকালে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে হেমচন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া আশুতোষকে লিখিয়াছিলেন, "এমন বিপদ্ যেন পরম শত্রুরও কখনও না হয়।"

নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের ভগিনী নৃত্যকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যদুনাথের সহিত হেমচন্দ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যদুনাথ হেমচন্দ্রকে আজীবন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন, হেমচন্দ্রও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। যদুনাথ ইংরাজী, বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন। গত শতাব্দীতে এদেশে যে সকল রাজনীতিক আন্দোলন হইয়াছে তন্মধ্যে বোধ হয় ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল সেরূপ আর কখনও হয় নাই। যদিও ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-সচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্টের নামের সহিত উহা জড়িত, তথাপি ইলবার্ট উহার যথার্থ প্রবর্ত্তক নহেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংস্কার যখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছিল, সেই সময়ে বিহারীলাল গুপ্ত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটর এবং রমেশচন্দ্র দত্ত বাঁকুড়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদানীন্তন ব্যবস্থানুসারে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ য়ুরোপীয় আসামীর বিচার করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু কোনও মফঃস্বলস্থ দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট য়ুরোপীয় আসামীর বিচার করিতে পারিতেন না। রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই, সুতরাং এতকাল কোন গোলযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যখন রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল—দুইজন দেশীয় ব্যক্তি—ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইলেন, তখন এই ব্যবস্থার অসঙ্গতি স্পষ্টভাবে প্রতীত হইল। জিলার অধিবাসী য়ুরোপীয়গণ যদি জিলার শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন না হন, তাহা হইলে সেই জিলায় কিরূপে তাঁহার পক্ষে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে? অধিকন্তু দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ য়ুরোপীয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীর সে ক্ষমতা থাকিবে না, ইহাই বা কিরূপ সঙ্গত? ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংস্কারকালে রমেশচন্দ্র বিহারীলালকে এই অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের এই অক্ষমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিহারীলাল তখন কলিকাতাতেই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার তদানীন্তন



শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সহৃদয় স্যর এশলি ইডেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং তাঁহারই পরামর্শে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের Bengal under the Lieutenant Governors নামক বহুতথ্যপূর্ণ গ্রন্থে বিহারীলালের এই মন্তব্য অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা কৌতূহলী পাঠকগণকে এই গ্রন্থে বর্ণিত ইলবার্ট বিলের ইতিহাসটি পাঠ করিতে অনু-

বোধ করি। স্যর এশলি ইডেন বিহারীলালের মন্তব্যটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখ সম্বলিত একটি পত্রের সহিত ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন এবং বিহারীলালের যুক্তির সমর্থন করেন। বলা বাহুল্য উদার-হৃদয় রিপণ দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের এই অক্ষমতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ব্যবস্থাসচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্ট সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ অব্দে ৩০শে জানুয়ারী দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত একটি নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এই খসড়াটি ইলবার্ট বিল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।



৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

উক্ত বৎসর ৯ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার প্রণীত খসড়াটি উপস্থাপিত করিলে স্থির হয় যে সাধারণে উহা বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হইলে পরে উহার সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হইবে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ইহার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ইলবার্টের বিলের ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বৎসর ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিবসে কলিকাতা টাউন হলে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয়গণ এই বিলের প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় মিঃ জে জে কেস্‌উইক্, মিঃ জে এইচ এ ব্রান্সন, এ বি মিলার প্রমুখ সঙ্কীর্ণচেতা এংলোইণ্ডিয়ান নেতৃগণ কটূক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় যে হলাহল উদ্‌গিরণ করেন, তাহার ফলে সমগ্র ভারতময় ঘোর বিদ্বেষ দাবানল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। একজন নির্ভীক এবং স্পষ্টবাদী ইংরাজ লেখক উইলফ্রিড ব্লাণ্ট তদ্বিরচিত India under Ripon নামক গ্রন্থে এই যুক্তিহীন ও অন্যায় আন্দোলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The Ilbert Bill was in itself but a very poor instalment of that promised equality between her English and Indian subjects which he (Ripon) had been sent to give. Its object was to put a stop to the impunity with which non-official Englishmen, principally of the planter class, ill treated and even on occasion did to death their native servants. It was to give for the first time jurisdiction over Englishmen in criminal cases to native judges instead of to judges and juries only of their own countrymen. Trifling remedy however though it was, it roused at once the anger of the class aimed at, and a press campaign was opened against Lord Ripon of unusual violence in the Anglo-Indian journals. The Ilbert Bill was described as a revolutionary measure which would, [illegible] every Englishman and every

English woman at the mercy of native intrigue and native fanaticism. The attacks against Lord Ripon were certainly encouraged by the Anglo-Indian officials; and presently they were repeated in the press at home and to the extent that the bill became a question in which the whole battle of India's future was being fought over and embittered. The "Times" took up the attack; the cabinet was alarmed for its popularity, and the Queen was shaken in her opinion of her Viceroy's judgment. Lord Ripon was left practically alone to his fate." •

উক্ত সভায় আর্গিনিয়ান ব্যারিষ্টার ব্রান্সনের বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা অভদ্রোচিত ও কটূক্তিপূর্ণ হইয়াছিল। ঐ সকল দুর্ব্বাক্য ব্রান্সন সাহেব পরে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সময়ান্তরে পুনরায় উক্তবিধ মন্তব্য প্রকাশ করায়, বাগ্মিপ্রবর লালমোহন ঘোষ ঢাকা নগরীতে আহূত একটি সভায় তাহার যে বিরাশিসিক্কা ওজনের উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এখনও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে এবং এতদ্দেশীয় বাগ্মিতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রান্সন সাহেবকে আর অধিক দিন এদেশে ব্যারিষ্টারী করিতে হয় নাই। দেশীয় উকীল ও এটর্ণিগণ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বয়কট করেন * এবং বৎসরকালের মধ্যেই তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। *

ব্রান্সন প্রমুখ স্বদেশীয় নেতৃবর্গের উক্ত প্রতিবাদ সভা এবং ইংলিশম্যান প্রভৃতি এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্রের যুক্তিহীন আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া হেমচন্দ্রের "নেভার—নভার" কবিতা রচিত হয় †—

* "কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলেরা সভা করিয়া ব্যারিষ্টার ব্রান্সন সাহেবের কাজ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। আবার দেশীয় আটর্নিরা মঙ্গলবার একটী সভা করিয়া উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে রেজলিউসন করিয়াছেন। যথা :—

"গত ২৮এ ফেব্রুয়ারী টাউনহলের সভায় ব্রান্সন সাহেব দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগের বিদ্বেষপূর্ণ যে বক্তৃতা করেন, এই বক্তা সেই অন্যায় নিন্দাবাদের জন্য তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইতেছেন। ব্রান্সন এই কটূক্তির নিমিত্ত গত ৩রা মার্চ্চ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত যে ভ্রমাত্মক তাহা স্বীকার করেন নাই বলিয়া সভা তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত বিবেচনা করেন না। ফলতঃ তিনি দেশীয়দিগকে যেরূপ অপমান করিয়াছেন, তজ্জন্য সভা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন তাঁহারা কোন প্রকারে তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের সংশ্রব রাখিবেন না।" সোমপ্রকাশ, ২৯এ ফাল্গুন ১২৮৯ ; ইং ১৮৮৩, ১২ মার্চ্চ।

* "কেবল সোমপ্রকাশের নয়, যাবতীয় সংবাদ পত্রেরই পাঠকবর্গকে আর পরিচয় করিয়া দিতে হইবে না যে,—ব্রান্সন সাহেবটী কে? ইনি ন্যায় অন্যায় বিবেকশূন্য, ইলবার্ট বিলের ঘোরতর বিরোধী, পক্ষপাতদোষে ইহার হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার নিশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আছে ; ইনিই হিতাহিত বোধহীন হইয়া কলিকাতার টাউনহলে ভারতবাসিদের নিন্দাবাদ করিয়া স্বদেশীয় আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ববর্গের মনোরঞ্জন করেন। ইনিই অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিয়া ইলবার্ট-বিদ্বেষী ইংরাজদিগের উকীল হইয়াছিলেন, সেই অপরাধে ইনিই ভারতবাসীর অশ্রদ্ধেয় হইয়া হা অন্ন যো অন্ন করিতে করিতে জাহাজে চড়িয়া তর তর করিয়া ভাসিতে ভাসিতে আজ সাগরপারে চলিয়া যাইতেছেন।

"আহা! ব্রান্সন সাহেবের শেষ দশাটা ভাবিলে প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠে। এতকাল হাইকোর্টে থাকিয়া যিনি তর্কবিদ্যায় অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁর অন্তিমদশায় এই ঘটিল। অর্থ যাহাকে অহরহঃ অনুসন্ধান করিত, রাশি রাশি মকদ্দমা দিবার জন্য লোক যাহার কত আরাধনা করিত, সেই ব্রান্সন অবশেষে আর একটিও মকদ্দমা পাইলেন না ; গললগ্ন বস্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তবু তাঁহার অদৃষ্টচক্র আর ঘুরিয়া আসিল না। সুতরাং 'দনপাতের আর উপায় কি? —কাজেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।"—সোমপ্রকাশ, ২৫এ বৈশাখ ১২৯০, ইং ১৮৮৩, ৭ই মে।

† 'বাজিমাতে'র কবির রাজনীতি বিষয়ক ইহাই প্রথম

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে রান্‌শন্, কেশুয়িক, মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার।"
নেভার—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্মান, আমাদের জানানা?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না।



৺বিহারীলাল গুপ্ত

লালমোহন তাঁহার ঢাকার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ব্রাম্সনের নাম কেবল আমাদের কবির গানে চির স্মরণীয় হইবে—

"Our poets shall sing of his infamy until his name shall become a bye word and a hissing reproach to after-ages and to generations yet unborn."

রামশর্ম্মার (নবকৃষ্ণ ঘোষ) ইংরাজী ও হেমচন্দ্রের বাঙ্গালা কবিতাবলীতে উক্ত কথার সার্থকতা প্রমাণিত হইতেছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অভিমতাদি সংগৃহীত হয়। যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট উদার ও সমদর্শী সার এশলি ইডেন মহোদয়ের শাসনকালে উক্ত বিলের সূচনা করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টই এক্ষণে সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী সার রিভার্স টমসনের আমলে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় আন্দোলনকারিদিগের অন্যায় প্ররোচনায় উক্ত বিলের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। সে সময়ে উক্ত আন্দোলনকারিগণ যে কিরূপ উন্মত্তপ্রায় ও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়াছিল তাহা ভারতবন্ধু সার হেনরি কটন মহোদয়ের Indian and Home Memories নামক পুস্তকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

A public meeting of protest by the European community was held at the Town Hall in Calcutta; members of the Bar abandoned the noble traditions of their profession, and speakers and audience frenzied with excitement were lost to all sense of moderation and propriety, The Viceroy was personally insulted at the gates of Government House. A gathering of tea-planters assembled and hooted him at a Railway Station as he was returning from Darjiling, when "Bill" Beresford, then an A. D. C., was with difficulty restrained from leaping from the Railway carriage into their midst to avenge the insult to his chief. The non-official European community almost to a man boycotted the entertainments at Government House. Matters had reached such a pitch that a conspiracy was formed by a number of men in Calcutta, who bound them-

রহস্য-কবিতা নহে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্যর রিচার্ড টেম্পল মিউনিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করিলে হেমচন্দ্র "সাবাস হুজুক আজব সহরে" শীর্ষক যে রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন তাহা আজিও ভোটপ্রদানকালে বাঙ্গালীর মনে পড়ে;

"ছেলাম টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
তোজং দিয়ে ভোটিং খুলে, মিউনিসিপ্যাল বিলে॥"

selves, in the event of Government adhering to the proposed legislation, to overpower the sentries at Government House, put the Viceroy on board a steamer at Chandpal Ghat, and deport him to England round the cape."

এই আন্দোলনের বিশাল তরঙ্গ উচ্চপদস্থ ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণের উত্তেজনা-পবনে স্ফীত হইয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে নাই, পরন্তু ইংলণ্ডের শক্তিশালী সংবাদপত্র সমূহকে এবং মন্ত্রিসভাকে পর্য্যন্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে লর্ড রিপণের মঙ্গল চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইল এবং সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন্ ভারতীয় রাজস্বসচিবের পদপ্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এবং য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে Concordat নামক সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাদানুবাদ হয় এবং অবশেষে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে যে আকারে বিলটি বিধিবদ্ধ হইল তাহাতে বিলটী প্রথমে যে উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেশন জজগণ জাতি নির্ব্বিশেষে য়ুরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাগণের অপরাধ বিচারের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ অপরাধিগণ যে কোন লঘু অপরাধে অভিযুক্ত হউক না কেন, ইচ্ছা করিলেই জুরিগণের দ্বারা বিচারিত হইবার দাবি করিতে পারিবে এবং উক্ত জুরিগণের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর য়ুরোপীয় বা আমেরিকান হওয়া আবশ্যক এইরূপ বিধান হইল। সুদূর মফঃস্বলে য়ুরোপীয় ও আমেরিকানের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং জুরিদ্বারা বিচারের প্রার্থনা হইলে সেই জেলায় উপযুক্ত সংখ্যক জুরির অভাবে অনেক সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জজকে বাধ্য হইয়া মোকদ্দমাটি অন্য জিলায় পাঠাইতে হয়। ইহাতে বিচার ও শাসন কার্য্যের কত দূর ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনা হইবার সম্ভাবনা তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ভারতবাসিগণ ইলবার্ট বিলের এই বিপরীত পরিণাম দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও আশাহত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যেও দেশবাসিগণের শিক্ষার উপকরণ আহরণ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। 'মন্ত্রের সাধন' নামক কবিতাটি এই সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়।

সুধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা।
সুধন্য তোমার স্বর্বীর্য্য-গরিমা।

*　　*　　*

দিলে শিক্ষাদান ভারত-নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্র সাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
　　বাসনা সফল করিতে পায়।
শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা—
একদিকে কোটী প্রাণী কাতরতা
　　শ্বেতাঙ্গ কজন বিপক্ষ তায়।
তবুও কজনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি রাজমন্ত্রিদল—
স্বজাতি-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল
　　এমনি তাদের অমিত বল।
শেষরে এখন ভারত-সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি ক্ষুণমান—
　　রাজস্তুতি গান সব বিফল।
যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ ধারা,
　　হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—
তবে অগ্রসর হৈও কভু আর
করিতে এরূপে স্বজাতি উদ্ধার
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
　　নতুবা যাঁ আছ তাহাই থাকো।*

* হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে এই কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে "publicএর উপর ইহার কি effect হয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলেন।"

এই কাব্যটির শেষভাগে কবি মনের দুঃখে লর্ড রিপণের প্রতি কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"শুনহে রিপণ—ভারতের লাট,
আর নাহি করো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলা।
অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা॥
সুধাছলে তুমি দিলে হলাহল
সম্প্রীতি করিয়ে সহ নিজ দল
বাড়ালে তাদের শতগুণ বল
"প্যেটোরিয়া" পার্ড রোমেতে যথা।"

কিন্তু লর্ড রিপণ যেরূপ দশচক্রে পড়িয়া তাঁহার উচ্চ অভীপ্সিত পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা হেমচন্দ্রের অবিদিত ছিল না। তিনি বহুদিন পরে তাঁহার মধ্যম জামাতার সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এ অবস্থায় বেচারা আর কি করিতে পারিত?"

'রিপণ উৎসব।' ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু, পুণ্যশ্লোক মার্কুইস অব রিপণ ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সঙ্কীর্ণমতাবলম্বী কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া—প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া—যদিও উদার-হৃদয় রিপণ ইচ্ছামত শাসন সংস্কারাদি সাধিত করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে ও প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অপূর্ব্ব ন্যায়পরতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসিগণ তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে ইলবার্ট বিলের সময়ে যে জাতিবিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, রিপণের প্রতি দেশবাসীর এইরূপ গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে সেই অনলরাশি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর ফল উৎপাদিত করিত। বাস্তবিক রিপণের ন্যায় কোনও বিদেশীয় শাসনকর্তা দেশবাসীর নিকট এরূপ হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে ভারতবাসিগণের হৃদয়ে যে একতার স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, রিপণের বিদায়গ্রহণ কালে সেই একতা আরও সুস্পষ্ট ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত নগরে ও গ্রামে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশবাসিগণ মিলিত হইয়া রিপণের প্রতি কৃতজ্ঞতার যে উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ বিবরণ কৃতজ্ঞতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবাসীর ইতিহাসেও বিরল। স্যর হেনরি কটন লিখিয়াছেন—

"The date of his (Lord Ripon's) departure is the natal day of a New India. 'His journey from Simla to Bombay', writes Meredith Townsend, 'was a triumphal march, such as India has never witnessed—a long procession in which seventy millions of people sang hosannas to their friend!' The homage that was tendered to Lord Ripon by all classes and creeds was never before tendered to any foreign ruler. The spectacle of a whole nation stirred by one common impulse of gratitude was never before beheld in Indian history. I took my share in the great demonstration in Calcutta. No public movement could have been more characterised by unanimity and spontaneity. No sign could have shown more clearly that the germ of nationality had already sprung into life."

রিপণের এই বিদায় উপলক্ষে, হেমচন্দ্রের "রিপণ উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ" রচিত হয়। হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত কবিতাটির রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"লর্ড রিপণের বিদায় উপলক্ষে কলিকাতায় এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে এক বিরাট শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার ছাত্রবর্গ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এক একজন বয়স্ক ছাত্রের নেতৃত্বে শিক্ষিত প্রথায় পদক্ষেপ করিতে করিতে শিয়ালদহ হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমিও সেই সময় একদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এই সঙ্গে চলিয়াছিলাম। হেমচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীতে বসিয়া ইহা দেখিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলেন 'তোমরা, যখন দলবদ্ধ হইয়া ভারতের জয়গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলে তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার অন্তরে ভারতের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।' ইহার পরেই 'রিপণ উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' কবিতাটি লিখিত হয়।"

'রিপণ-উৎসব' ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবনের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ) প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র এই কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পায়োনিয়ারে সর জন ষ্ট্রাচি কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে 'রিপণ-উৎসব' ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, ১২৯১ সালের পৌষে নবজীবনে প্রকাশিত হয়।" কিন্তু কবিবর স্বয়ং দেশবাসীর নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া যে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করাই কি সঙ্গত নহে ? স্যর জন ষ্ট্রাচি রিপণ উৎসবের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি যে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণের পর এই সময়ে পায়োনিয়রে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুনা যায় ভারতবর্ষের রাজস্বসচিব স্যর অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন্—(যিনি বহুদিন হইতেই পায়োনিয়রের লেখকরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন *)—এই সময়ে ভারতবাসীর অপূর্ব্ব একতা সন্দর্শন করিয়া "If it be real what does it mean ?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পায়োনিয়রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পায়োনিয়রের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া যে কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানের কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রিপণ-উৎসবে কবি হেমচন্দ্র কেবল ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হন নাই, কিন্তু যে ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গের উদ্দেশ্যে বহুদিন হইতে তাঁহার পাঞ্চজন্যের গভীর আরাব উত্থিত হইয়াছিল, সেই ভারতবাসীর শব-পঞ্জরে জীবনের স্পন্দন সন্দর্শন করিয়া কবি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় দেশবাসিগণকে চিরদিন একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

আর ঘুমাইওনা বলে কতদিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার॥

* * *

জীবনের বিন্দু না হেরি কোথায়
সব শূন্যময়—সকলি খালি
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে বালি॥
উঠ গো জননী দেখ চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে॥

* * *

ভুলো না ভারত 'রিপণ-উৎসব'
ছিঁড়োনা যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত সন্তান
যেখানে যে থাকো—পরো যে সাজ॥
মনে কর সবে বিভূতে—উৎসবে
'রিপণ বিদায়' নহে এ খালি,

* See Blunt's 'India under Ripon.'

সম আশা ভয় ভারত অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি !!

দূরদর্শী কবির এই উপদেশবাণী নিরর্থক হয় নাই। 'রিপন বিদায়ে'র সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্য লক্ষিত হইয়াছিল, সেই একতার বলে পর বৎসর (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) হেমচন্দ্রের অন্তম বন্ধু ৺উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ কর্তৃক জাতীয় মহা সমিতির (কংগ্রেসের) ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একাদশী চক্রবর্ত্তীর তৃতীয় পক্ষের
তিন শালা।

একাদশী চক্রবর্ত্তী যখন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া, সংসারের নিকট বিদায় লইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন সেই বৃহৎ প্রাসাদের স্থানান্তরে এক কক্ষমধ্যে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের তিন শালা, এক বৃহৎ চক্রান্তের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল।

এই আখ্যায়িকায়, আমরা এই শ্যালকত্রয়কে বহুবার দেখিব; অতএব তাহাদিগের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন পল্লীগ্রামে, কোন পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের মহাকুলে চারিটি পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশু প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই শিশুগণের মধ্যে বড়টি কন্যা;—তাহার চৌদ্দবৎসর বয়ক্রমে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে যখন স্বামিগৃহে আসিয়াছিল, তখন তাহার কনিষ্ঠ সহোদরদিগকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। তদবধি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাদের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন;—সে প্রায় বাইশ বৎসর আগেকার কথা। তিনি তাহাদের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়া, তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহেই অবস্থিতি করিতেছে। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের ভগিনীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই ঘটনায় সহোদরত্রয়ের অবস্থানের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; তাহারা পূর্ব্ববৎ পরম সুখে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশায় পত্নীর ইচ্ছামত ব্যয় জন্য তাঁহার হস্তে মাসিক দুই হাজার টাকা প্রদান করিতেন; এই অর্থের বেশীভাগ তিনি তাঁহার কনিষ্ঠগণকে দান করিতেন। এইরূপে তাহারা উৎকৃষ্ট আহার্য্যের দ্বারা কিছু অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছিল, ভগিনীর কৃপায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃপায় কিছু বিদ্যালাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহারা ভগিনীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা অত্যন্ত গোপনভাবে সম্পাদিত হইলেও, সর্ব্বানুসন্ধানী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট অবিদিত ছিল না; কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তিনি পত্নীর সহিত বাদানুবাদ করা আবশ্যক মনে করিতেন না। একবার তিনি একটি উৎকৃষ্ট মুক্তাহার ক্রয় করিয়া তাহা পত্নীকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন; কয়েক দিন পরে শুনিলেন যে, ঐ হার হারাইয়া গিয়াছে; শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ভ্রাতৃগণ উহা প্রাপ্ত হই-

য়াছে ; ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু নীরবে ঐ ক্ষতি সহ্য করিয়া, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন, অর্থশালী ও কৃতবিদ্য শ্যালকত্রয়ের জ্যেষ্ঠ, একজন পঁয়ত্রিশ বর্ষীয় হৃষ্টপুষ্ট নধর ভদ্রব্যক্তি। তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণশ্মশ্রুর দ্বারা সম্যক্ পরিশোভিত ছিল। তাহার নাম কেদারনাথ রায়; কিন্তু স্বামী কেদারেশ্বরের সহিত ভ্রাতা কেদারনাথের নামের মিল থাকায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী তাহাকে বেদারনাথ বলিতেন। বেদারনাথ নিশাচর; দিবাভাগে সে কখন বাটীর বাহির হইত না; নিশীথে সকল ভদ্রব্যক্তি নিদ্রিত হইলে সে নৈশভ্রমণে বাহির হইত। এজন্য কোন ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না; এমন কি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কেদারনাথ কিঞ্চিৎ বিদ্যার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিলাভ করিতে পারে নাই। বাটীর পরিচারক ও পরিচারিকাগণ তাহাকে বেদারবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত।

শ্যালকত্রয়ের দ্বিতীয় বা মধ্যমটীর নাম অঘোরনাথ রায়। সে সুন্দর যুবাপুরুষ। সে যত্নপূর্ব্বক তাহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন রাখিত। সে কথা কহিবার সময় প্রায় একটা উপমার অবতারণা করিত। সেও জ্যেষ্ঠের ন্যায় দিবাভাগে বাহির হইত না; এজন্য কোন ভদ্রলোকেই তাহাকে চিনিত না।

কনিষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। সে সম্পূর্ণ শ্মশ্রুগুম্ফহীন, বিশাল চক্ষু, চশমাবিভূষিত নাসা, বি এ পাশকরা, অষ্টাবিংশতিবর্ষীয় যুবা। তাহার আকুঞ্চিত কেশদাম সর্ব্বদা অতি যত্নে বিন্যস্ত থাকিত। তাহার নাম সুধীরনাথ। সেও দিবাভাগে লোকলোচনের অন্তরালে থাকিত, এবং নিশাগমে শীকার অন্বেষণে বাহির হইত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচারিকাগণ বলিত, তাহার মুখশ্রী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নীর অনুরূপ ছিল।

কেদারনাথ, অঘোরনাথ ও সুধীরনাথ এ যাবৎ 'অনাথ' ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিল। 'অনাথ' অর্থে সচরাচর বুঝায়, যাহার নাথ বা অভিভাবক নাই; কিন্তু এখানে অনাথ অর্থে বুঝিতে হইবে, যে কাহারও নাথ বা পতি নহে। এই নাথত্রয় দ্বারা কোন ভাগ্যবতীত্রয়কে অনাথা করিবার জন্য কেহ কখন উদ্যোগ করে নাই। একবার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী তাহাদের বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ বিবাহ করিতে একবারেই সম্মত হইল না; তাহারা বুঝিয়াছিল, বিবাহ করিলে, তাহাদের নৈশভ্রমণ রহিত হইয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব তাহারা অনাথই থাকিয়া গিয়াছিল।

যদু খানসামা এই নাথত্রয়ের বিশেষ বন্ধু। তাহাদের সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিসন্ধি কি, তাহা জানিবার জন্য, এবং তাহা জানিয়া, কি উপায়ে তাঁহার অর্থ হস্তগত করা সম্ভব হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য তাহারা যদুকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। ধূর্ত্ত যদু একাদশী চক্রবর্ত্তীর শয্যাকক্ষের সমুদয় সংবাদ শ্যালকত্রয়কে আনিয়া দিত।

যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন উদরদেশে দুই অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, আগন্তুক দুই জনের জন্য আহারের আয়োজন করিতে যদুকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে আরও এক গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। তিনি যদুকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন যে যদু তাঁহার শ্যালকগণের বেতনভোগী; কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করাই তাহাদের কায। যদু অত্যন্ত ধূর্ত্ত হইলেও, তীক্ষ্ণদৃষ্টি একাদশী চক্রবর্ত্তীর চক্ষে যে কখন ধূলা নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গূঢ় অভিসন্ধি সকল অবগত হইবার জন্যই, সে যে অহরহ ছায়ার ন্যায়, তাঁহার শয্যাকক্ষের সীমার মধ্যে বিচরণ করিত, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অজানিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার শেষ উইল সম্বন্ধে বিশেষ কথাটি কি, তাহা এটর্ণি বাবুকে বলিবার আগে, আহারের আয়োজনে

যদুকে নিয়োজিত করিয়া, তিনি কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে একবার, সাবু আনিতে বলিয়া, যদুকে' স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এজন্ত, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যদু তাহা জানিতে পারে নাই।

তথাপি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাক্যের শেষাংশ যদু কিছু বিকৃত ভাবে শুনিয়াছিল। সে যাহা শুনিয়াছিল তাহা নিম্নে বিকৃত ভাবে পুনর্লিখিত হইল।—"* আমার * প্রায়শ্চিত্ত * করবে। * আমার * প্রার্থনা-অনুযায়ী * * * সমস্ত সৌদামিনীকে দেবে। তারক, তুমি একটু পরিষ্কার করে উইলে লিখবে। কাল * * যেন উইল প্রস্তুত হয়। * সম্পত্তি যতদিন 'ওর' উত্তর না পাও, ততদিন * তোমার জিম্মায় থাকবে। * * * বুঝিয়ে দেবে। * * * * 'যদু' দু হাজার * * * ।"

উপরিউক্ত' বাক্যাংশ শুনিয়া যদু বুঝিয়াছিল যে, বৃদ্ধ মরণকালে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ডেপুটী বাবুর নাতিনী সৌদামিনীকে দিয়া যাইবেন, এবং তাহাকে, তাহার প্রভুভক্তি ও কার্য্যদক্ষতার জন্য, দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন। এই সংবাদটি যদু অনতিবিলম্বে শ্যালকত্রয়কে শুনাইয়াছিল।

উহা শুনিয়া, নৈশ ভ্রমণের আনন্দ ত্যাগ করিয়া, এক কক্ষমধ্যে বসিয়া কেদার, অঘোর ও সুধীর—তিন ভাই গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইল।

আকুঞ্চিত ললাটে অনেক চিন্তা করিয়া, তাহার কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, জ্যেষ্ঠ কেদার কহিল, "এমন পাগল কখন দেখিনি। মরণকালে বুড়োর ভীমরথী ধরেছে। ডেপুটি বাবুর নাতনী তোর কোথাকার কে? তাকে সমস্ত সম্পত্তি কেন দিলি? পাগল, পাগল!"

দ্বিতীয় ভ্রাতা অঘোরনাথ হাই তুলিয়া, এবং তিনটি তুড়ি দিয়া, আপন মনে বলিল, "মরণ কালে মরণ বুদ্ধি! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে!—কার জিনিষ, কে পেলে!"

কনিষ্ঠ সুধীরনাথ ধীরে ধীরে বলিল, "এখন-এই—উপায়? বুড়োর—এই—মৃত্যুর পর, আমাদের—এই—পথে দাঁড়াতে হবে।"

কেদার। উঃ, কি ঘোর কলি! আমরা তোর সহধর্ম্মিণীর ভাই, তুই ছেলেবেলা থেকে, ছেলের মত আমাদিকে হাতে করে' মানুষ করেছিস্! আজ তুই মরণকালে আমাদের একবারে বঞ্চিত করলি, এটা কি তোর ধর্ম্মে সইবে? এর জন্যে তোর অক্ষয় নরক-ভোগ করতেই হবে।

অঘোর। আমি মনে করেছিলাম যে আমাদের তিন ভাইকে অভাব পক্ষে দু' লক্ষ টাকা হিসাবে, ছ' লক্ষ টাকা দিয়ে যাবে। এ যে বাবা একবারে মূলের ঘরে শূন্য!

সুধীর। এই—দু লক্ষ চাইনে। এই—এক লক্ষ পেলে বেঁচে যেতাম, তাতেই এই কোন রকমে ভাত কাপড় চলে যেত। এই—এই সৌদামিনী ছুঁড়ীটেকে তুমি দেখেছ, বড়দাদা? এই কলকাতার মাঝখানে এই—এই—এই বাড়ী, আর—এই—দু কোটি টাকা নগদ! এই—এই—শালীকে তুমি বিয়ে করে ফেল বড়দাদা!

কেদার। চক্রবর্ত্তী বামুনের শালার সঙ্গে কুলীন কুমারীর কি বিয়ে হয়, ভায়া? আমাদের মত বামুনের হাতে, অনেক কুলীন বামুন ভাতই খায় না।

সুধীর। এই—ভাত খায় না, তুমি বল কি, বড় দাদা? এই কলকাতায় যদি—এই—মেথর গলায় পৈতে ঝুলিয়ে আসে,—এই তা হলে,—এই—সেও—এই—বামুন হয়ে যায়। তখন,—এই—বড় বড়—এই নৈকষ্য, তাকে—এই—আট টাকা মাইনে দিয়ে রাঁধুনি রেখে—এই—দু বেলা তার হাতে খেয়ে—এই তরে যায়। তা ছাড়া—এই কলকাতায় কুলীন হতে কতক্ষণ? কি বল মেজদাদা?

অঘোর। একটা ভাল ঘটক পেলে, আমি বড় দাদাকে দু ঘণ্টার মধ্যে ভগীরথ বাঁড়ুয্যের সন্তান করে' দিতে পারি। বাবা, ঘটকের মুখের কথা যেন সঞ্জী-

বলী মন্ত্র !—তাতে অতি পচা ফুলও সজীব হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ ভাবিতে লাগিল। নিঃসন্দেহ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতি মধুর প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছে। একটা যক্ষের ঐশ্বর্য্যের সহিত একটি সুন্দরী ভদ্রকন্যা তাহার অঙ্কগতা হইলে নিশ্চয়ই সে একটা অক্ষয় মহানন্দ লাভ করিতে পারিত; তাহার জীবনোদ্যানে, অফুরন্ত সুখের ফোয়ারা উৎসারিত হইত। কিন্তু ভগবান তাহার অদৃষ্টে সে সুখ লেখেন নাই; সে এই মহানন্দ লাভ করিতে পারিবে না। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম, তাহার যে বয়স হইয়াছে, তাহাতে ডেপুটী বাবু তাহাকে নাতিজামাতা করিতে স্বীকৃত হইবেন না; আর তাহার বিদ্যাও ডেপুটী বাবুর নাতিজামাতার উপযুক্ত নহে,—তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নাই। ইহার উপর কেদারনাথের আর একটি দ্বিতীয় বাধা ছিল। সেই বাধারূপিণী দুর্দ্দান্ত উপপ্রণয়িনীকে স্মরণ করিয়া কেদারনাথ শিহরিয়া উঠিল। সে, তাহার বিবাহ হইবে জানিতে পারিলে, এমন একটা মহা অনর্থ বাধাইবে যে তাহাতে স্ত্রী এবং অর্থ সমস্তই হাতছাড়া হইয়া যাইবে। অতএব কেদারনাথ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সৌদামিনী লাভের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সৌদামিনীর আশা ত্যাগ করিলেও, সে অর্থলাভের আশা ত্যাগ করিল না। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সে একটা অভিসন্ধি স্থির করিল; এবং তাহার কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমার মত বিদ্যা নিয়ে কেউ ডেপুটী বাবুর নাতজামাই হতে পারে না। ঘটক আমাকে কুলীন করে দিলেও, তারা আমার বিদ্যের পরিচয় নিয়ে কোন মতেই বিয়ে দিতে স্বীকৃত হবে না। সে চেষ্টা করতে গেলে, সকল দিক পণ্ড হবে। তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে; এই বয়সে—"

সুধীর। এই—রেখে দাও তোমার—এই বয়স। এই—এই কত ষাট বছরের বুড়োর বিয়ে হচ্ছে,—আর তোমার—এই বিয়েটা আর হবে না? কি বল মেজদাদা?

অঘোর। আমি ত স্পষ্ট আগেই বলেছি যে আসল কায হচ্ছে, একটা ভাল ঘটক যোগাড় করা। তারা ইচ্ছা করলে বুড়ো নারদ ঋষিকে, বাইশ বছরের বর বানাতে পারে।

কেদার। ডেপুটী বাবুর নাতনীর সঙ্গে আমার বিয়ে না হলেও, সুধীরের বিয়ের কথা তুলেছি, তা ভাববার জিনিষ। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, ঐ নাতনীকে বিয়ে করতে পারলে, এই অগাধ টাকাটা যেমন সহজে হস্তগত হয়, তেমন আর কিছুতেই হবার নয়। কিন্তু এই বয়সে, এই বিদ্যে নিয়ে, আমার বর সাজা হবে না। তা করতে গেলে, আমাদের মতলব সব মাটি হয়ে যাবে। সুধীর! এ কায তোমাকেই করতে হবে। তোমার রূপ আছে, বয়স আছে, আর 'বি-এ পাশের সার্টিফিকেট' আছে। তার উপর, কুল আর বংশ সহজেই তৈরী করে নিতে পারব।

অঘোর। তার উপর একটা ভাল ঘটক যোগাড় করতে পারলে, একবারে সোনায় সোহাগা।

কেদার। শুধু ঘটক নয়। কলকাতায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিতে হবে।

অঘোর। তা হলে ত একবারে কেল্লা ফতে। আর শোন বড়দাদা, ঘটককে শিখিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের ষাট হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে।

কেদার। সে সব আমি ভেবে ঠিক করেছি। দেখ, আজ থেকে আমরা ভাবিব যে আমরা হরিহরপুরের জমীদার, আমরা যেন কলকাতায় বেড়াতে এসেছি। দেশে আমাদের প্রায় একলক্ষ টাকা আয়ের জমীদারী আছে।

সুধীর। আর—এই—দোল—এই—দুর্গোৎসব—এই সব হয়।

অঘোর। বাবা! একে লক্ষ টাকা আয়ের জমীদারী, তার উপর দোল দুর্গোৎসব,—এ যেন অর্জ্জুনের হাতে গাণ্ডীব! এ যেন আতর মাখান গোলাপ ফুল!

কেদার। সুধীর! তুমি তোমার মনটাকে চাঙ্গা

করে নাও, এ বিবাহ তোমাকেই করতে হবে। এ বিয়েতে যাতে কোন রকম বাধা উপস্থিত না হয়, তার বন্দোবস্ত আমি করব। তোমাকে কেবল বিয়ে করতে হবে।

সুধীর। তুমি যখন করলে না, তখন—এই—আমাকেই করতে হবে। এই কুবেরের—এই—অগাধ টাকা, এ কি—এই—হাত ছাড়া করা যায়? কি বল, মেজদাদা?

অঘোর। টাকাটা ছুঁড়ীর হস্তগত হবার আগেই, বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে। ডেপুটী বাবুকে একবার আমাদের চারে এনে ফেলতে পারলে, ব্যস্ নিশ্চিন্ত, তার পর টোপ্ ফেল্লেই ডেপুটী-কাৎলা ধরা পড়বে। কাল সকালেই একটা ভাল ঘটক ঠিক করতে হবে।

কেদার। আমি কালই ভবানীপুরে একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিই। আর বুড়ো বেঁচে থাকতে থাকতে, কতক আসবাব ও অন্যান্য জিনিষ সেই খানে সরিয়ে ফেলতে হবে। বুড়ো মরলে, সব চাবি বন্ধ হবে, আর কিছুই নিয়ে যেতে পারব না।

সুধীর। আর—এই কিছু টাকা।

কেদার। টাকা সরাবার কোনও উপায় নেই; আর আপাততঃ টাকায় কিছু আবশ্যকও নেই। দিদি বেঁচে থাকতে, দিদির কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছিলাম. অবশ্য তার বেশী ভাগই আমরা খরচ করে ফেলেছি। তবু তাঁর মৃত্যুকালে, আমার হাতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মজুদ ছিল; তার মধ্যে আমাদের খামখেয়ালীতে, হাজার দশেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এখনও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা মজুদ আছে। এই বিবাহটা শেষ করতে দেড় মাস কিম্বা বড় জোর দু মাস লাগবে। এই দু মাসে এই পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করব। তা হলেই, হরিহরপুরের জমীদারের মত খরচ করা হবে।

অঘোর। একটা ভাল ঘটক, আর তার উপর মাসিক দশ বার হাজার টাকা হিসাবে খরচ। ব্যস্, তা হলে আর দেখতে হবে না। এ যেন তপ্ত ভাতের উপর গব্য ঘৃত হয়ে যাবে। বড়দাদা, তুমি ঘটককে আগেই ঝনাৎ করে পঁচিশটে টাকা ফেলে দিও; বেটা খুসী হয়ে কাযে লেগে যাবে।

সুধীর। এই—ছুঁড়িটাকে কাল সকাল বেলা—এই—একবার ভাল করে দেখতে হবে। কেবল শুয়ে শুয়ে দু কোটি টাকার স্বপ্ন দেখা!—বাবা! এ যেন গল্পের রাজকুমারী, আর রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব! এ যেন ভীমের হাতে সুঁদরী কাঠের গদা!

কেদার। এই ব্যাপারে যদুকে নিতে হবে; বেটার ভারি বুদ্ধি। আমরা হব হরিহরপুরের জমিদার, আর যদু হবে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র দাস, ম্যানেজার, হরিহরপুর এষ্টেট। যদুর জন্যেও ভবানীপুরে একটা ছোট গোছের বাড়ী নিতে হবে। বুড়ো মরলে, সেই বাড়ীতে যদু তার সেই মাগীটাকে নিয়ে থাকবে। মাগীটা হবে ম্যানেজার গিন্নী।

অঘোর। আমাদের হরিহরপুর এষ্টেটের আয় কত হবে?

কেদার। সদর মালগুজারি বাদে সাতানব্বই হাজার টাকা।

অঘোর। সাতানব্বই হাজার! নয়ের পিঠে সাত সাতানব্বই! বাবা, যেন ঘোড়ার পিঠে রঞ্জিৎ সিং।

সুধীর। আর—এই দোল,—এই দুর্গোৎসব ইত্যাদি।

কেদার। বুদ্ধিটা ভাল রকম করে খেলাতে পারলে——

অঘোর। এবং তার উপর একটা ভাল ঘটক লাগাতে পারলে——

কেদার। শুধু ঘটক নয়, আরও দুই একটা লোক লাগাতে হবে। তারা সত্যিই আমাদিকে হরিহরপুরের জমিদার মনে করবে; এবং আমাদের দেওয়া অর্থে হৃষ্ট ও আহারে পুষ্ট হয়ে, এই শেয়ালদহে, ভবানীপুরে ও লালবাজার আদালতের কাছে, আমাদের

সম্বন্ধে নানারকম গল্প করে ঘুরে বেড়াবে। সেই সকল লোকের মধ্যে কেউ বলবে যে, আমাদের দেশের বাড়ীর সদর দরজায় সর্ব্বদা দুটো হাতী বাঁধা থাকে। কেউ বলবে যে, আমাদের খিড়কীর বাগানে রত্নসরোবর নামে একটা প্রকাণ্ড পুকুর আছে; তার জল কাকের চক্ষের মত; তাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ ঘুরে বেড়াচ্চে; কোন কোন মাছের নাকে মুক্তোর নলক আছে। কেউ বলবে, আমাদের রূপোর পাল্কীতে কিংখাবের বিছানা আছে। কেউ বলবে আমাদের ঠাকুরবাড়ীর দরদালানে, শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চার মাঝখান থেকে ফোয়ারাতে গোলাপজল উছলে উঠে' চৌবাচ্চায় জমা হয়, আর ঐ জলে দুটো রূপোর রাজহংস হংসী ভেসে বেড়ায়। কেউ বলবে, আমাদের প্রকাণ্ড গোশালা; তাতে এমন একটি নধর ভাগলপুরী গাই আছে, তার একটানে ত্রিশ সের দুধ হয়। কেউ বলবে যে আমাদের মাঠাকুরুণের কাছে তিনটে রূপোর কলসীতে ষাট হাজার অকবরি আশরফি আছে। কেউ বলবে যে, সে স্বচক্ষে আমাদের জমীদারীর হস্তবুদ দেখেছে—সদর মালগুজারী ও সেস্ বাদে আমাদের জমিদারীর নেট আয় সাতানব্বই হাজার, চারশো বাহান্ন টাকা, তের আনা সাত গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি।

সুধীর। এই—এই রকম কড়া ক্রান্তি ধরে বল্লে—এই কেউ আর সন্দেহ করবে না। সকলেই এই—মনে করবে, যে—এই—আমাদের—এই—ঠিক আয়।

অঘোর। কিন্তু, বড়দাদা, আমি তোমার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেছি। তোমার পেটে এত বুদ্ধি! বাবা! যেন বৃহস্পতির একটা বরপুত্র—যেন বিসমার্কের একটা দ্বিতীয় সংস্করণ—যেন নিউটনের একটা অবতার।

কেদার। ভাই, বুদ্ধিটা খেলাতে পারলে, সুধীর ভায়ার বিয়ে দেওয়া এবং নগদ দু' কোটি টাকা হস্তগত করা, দু' সপ্তাহের কায। এমন করে চারিদিক বেঁধে চলতে হবে যে, সকল লোকই আমাদের হরিহরপুরের ধনী জমীদার মনে করবে; এবং শতমুখে আমাদের সুখ্যাতি করবে। এই সুখ্যাতিটা আর এই ধনগৌরবের কথাটা কোন রকমে ডেপুটী বাবুর কাণে তুলে দিতে পারলেই—ব্যস্।

অঘোর। আর তার উপর, একজন ঘটক গিয়ে যদি বলে যে আমরা যথার্থই কুলীন-সন্তান, তা হলে, একবারে সোণায় সোহাগা হয়ে যাবে।

কেদার। দেখ, আর একটা কায করতে হবে। আমাদের নামগুলোকে জাঁকাল করবার জন্তে ওর আগে 'কুমার' আর পিছনে 'চৌধুরী' জুড়ে দিতে হবে।

অঘোর। তা হলে আমি হব, কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় চৌধুরী; তুমি হবে কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় চৌধুরী; আর সুধীর হবে, কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত সুধীরনাথ রায় চৌধুরী! বাহবা কি বাহবা! এ যেন সন্দেশের উপর পেস্তার বুকনি—ছাঁদার উপর চকচকে নূতন টাকার দক্ষিণা!

কেদার। আমাদের নামগুলো একেবারে বদলাতে পারলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু তাতে দুই একটা অসুবিধা আছে। যদিও এ অঞ্চলের কোন ভদ্রলোকই আমাদিকে চেনে না, তবু দৈবের কথা কে বলতে পারে? হঠাৎ যদি কেউ আমাদিকে চিনে আমাদের নাম ধরে ডাকে! তা ছাড়া সুধীরের বি-এ পাশের সার্টিফিকেটে যে সুধীর নাম আছে, তারও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। কাযেই পুরানো নামের আগে পাছে একটু একটু উপাধি জুড়ে পুরানো নামই বজায় রাখতে হবে। ওতেই আমাদের কার্য্যোদ্ধার হবে। ওতেই দু' সপ্তাহের মধ্যে সুধীরের বিবাহ ও দু' কোটি টাকা হস্তগত হবে। সে টাকাটা হস্তগত হলে তুমি ত দাদাদের বঞ্চিত করবে না ভায়া?

সুধীর। এই—আমি? এই—এখনই লিখে দিচ্চি। এই—লেখাপড়া শিখেছি বটে,—কিন্তু—এই অধর্ম্ম জানিনে। এই—আমাদের—এই ভাইয়ে ভাইয়ে কখন বিচ্ছেদ হবে না। তুমি কি বল, মেজদাদা?

অঘোর। বড়দাদা জ্যেষ্ঠ, গুরুলোক; বড়দাদা যখন বলছে, তখন একটা লেখাপড়া থাকা ভাল। কিন্তু আমি জানি আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কখনও বিরোধ হবে না। বাবা! আমরা যেন ভট্টাচার্য্য মশায়ের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যেন কবিরাজ মহাশয়ের বায়ু পিত্ত কফ!

কেদার। লোকে বলে বেড়াবে যে, হরিহরপুরের জমিদারেরা হরিকরাত্মা।

অঘোর। এবং পাণ্ডবদের মত মাতৃভক্ত। বড়দাদা, কুন্তীর মত একটা বিধবা মা আমদানি করতে হবে ত!

সুধীর। এই তারই কাছে—এই তিন ঘড়া—এই আসরফি থাকবে।

কেদার। আর সে নাকে চন্দনের তিলক কাটবে, তার গলায় সোণার মোটা বেনন হারে ছোট একটি তামার মাদুলীতে বিশ্বেশ্বরের বিল্বপত্র থাকবে। সে বাঁ হাতের তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি পরবে। তার হলদে মখমলের ঝুলিতে সোণার তার দিয়ে বাঁধান তুলসীর মালা থাকবে। তার হাতে সোণার তৈরী তারকেশ্বরের তাগা থাকবে। আর সে রূপোর কোশাকুশী নিয়ে রাতদিন পুজো করবে।

সুধীর। আর—এই—লোকে বলবে, এমন পুণ্যময়ী দেখিনি!

অঘোর। এ রকম একটা বিধবা কোথা থেকে আমদানি করবে বড়দাদা?

কেদার। সে আমি আগেই ভেবে রেখেছি। এই কলকাতাতে কিসের অভাব আছে? বদ্রুর সেই মাগীটা বৌবাজারের যে বাড়ীতে থাকে, তোমরা জান, সেই বাড়ীতে একটা বুড়ী থাকে; বদ্রুর মাগীটা তাকে মাসী মাসী বলে। এই মাসী বুড়ী বেশ মোটাসোটা, আর তার রংটাও ফরসা; তার উপর সে খুব চালাক চতুর। সেবার সেই বৌবাজারের ব্যাপারটায় আমি কি মুস্কিলে পড়েছিলাম জান ত? মাগী খুব একটা চাল চেলে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে; সেবার শালীকে একশো টাকা দিয়েছিলাম। এবারও সেই বেটীকে কিছু টাকা কবুল করে, বিধবা মা সাজাব।

অঘোর। সেবারে তুমি ভারি অস্থির হয়ে পড়েছিলে। ছুঁড়িটা এক রাত্রের মধ্যে কলেরা হয়ে মারা গেল, তাই তুমি রক্ষা পেলে;—বাবা! যেন নাগপাশের বন্ধন খুলে গেল।

কেদার। থাক্, থাক্, পুরোনো কথা আর তুলে কায নেই। এখন সেই বুড়ীকে হস্তগত করতে হবে। বোধ হয়, একশো টাকাতেই রাজি হবে।

অঘোর। খুব—খুব। বাবা! চোব্যচুষ্য লেহ্য পেয় আহার; আবার তার উপর একশো টাকা নগদ দক্ষিণা, এ কি আর রক্ষা আছে? ব্রাণ্ডির উপর বরফের মত মাগী গলে যাবে।

কেদার। সেই মাগী হবে মস্ত কুলীন কন্যা, এবং মহিমান্বিত জমীদারের মহিমান্বিতা বিধবা, এবং আমাদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণী।

সুধীর। আর—এই রূপোর কোশাকুশী নিয়ে,—এই—রাতদিনই পুজো করবে।

অঘোর। কিন্তু, কিন্তু বড়দাদা, আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

কেদার। কি কথা?

অঘোর। মাগীকে মাতাঠাকুরাণী করার একটা মস্ত বাধা আছে।

কেদার। কি বাধা?

অঘোর। শুনেছি, মাগী কাঁচা পেঁয়াজ না খেয়ে থাকতে পারে না। যা খাবে, তাতেই কাঁচা পেঁয়াজের দরকার। মুড়ি খায়, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে; কাঁচা পেঁয়াজে কামড় না দিয়ে পান্তা ভাত খেতে পারে না; পচা মাছ খায়, তাতেও সরসের তেল আর কাঁচা পেঁয়াজ মেখে নেয়। পুণ্যময়ী মহিমান্বিতা কুলীনকুমারীর মুখে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ! বড়দাদা, সর্ব্বাগ্রে এর একটা প্রতিকার চাই।

কেদার। পনের দিন বৈত নয়! পনের দিন মাগীকে পেঁয়াজ খেতে দেওয়া হবে না। আর এক

কাব করতে হবে। আড়গড়া থেকে দু' তিন খানা ভাল গাড়ী ভাড়া নিতে হবে। একখানা ল্যাণ্ডো; তাতে চড়ে সুধীর এই অঞ্চলে প্রত্যহ বেড়াতে আসবে। একখানা ক্রুহাম; তাতে চড়ে' আমরা দু'পরবেলা সাহেবদের দোকানে জিনিষ কিনতে যাব। আর একখানা বড় পাল্কী গাড়ী; তাতে বড় বড় দুটো কালো ঘোড়া জুড়ে, আমাদের পুণ্যময়ী মা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতে যাবেন।

সুধীর। আর—এই—কালীঘাট দর্শন করতে যাবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একাদশী চক্রবর্ত্তীর স্বর্গভোগের আশা ভস্মীভূত হইল।

পরদিন অপরাহ্নে, তারক বাবু একাদশী চক্রবর্ত্তীর উইল প্রস্তুত করিয়া, রোগীর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। একাদশী চক্রবর্ত্তী চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই হাত বাড়াইলেন; বলিলেন, "দাও।"

তারক বাবু বলিলেন, "তুমি যখন উইল পাঠ করে' এতে স্বাক্ষর করবে, তখন অন্ততঃ দু'জন সাক্ষী উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তারক বাবুর কথার কোন উত্তর না দিয়া মুদিত নেত্রে ডাকিলেন, "যদু।"

যদু নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে কি ইঙ্গিত করিলেন, তারক বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তিনি উইলটি রোগীর হস্তে প্রদান করিয়া, আপন বাক্যের উত্তর-প্রত্যাশায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, যদু প্রত্যাগমন করিল। তাহার পশ্চাতে চারিজন বাহক, চামড়ার গদি আঁটা তিনখানি ক্ষুদ্র চেয়ার ও একখানি ক্ষুদ্র টেবিল লইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং যদুর নির্দ্দেশ মত ঐ গুলি শয্যার নিকট সংস্থাপিত করিল। যদু টেবিলখানির উপর কিছু লিখনোপকরণ রক্ষা করিল। কার্য্য সমাধা করিয়া, যদু ও ভৃত্যগণ চলিয়া গেল। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, যদু আবার মার্জ্জারবৎ পদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার মুদিত নয়নদ্বয়ের একটি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া যদুকে দেখিলেন এবং সে কোনও আজ্ঞা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিন জনই এসেছেন?"

যদু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

তিনি উন্মীলিত চক্ষুটি আবার নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "আসতে বল।"

আর এক মুহূর্ত্ত পরে তিনটি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের একজনকে আমরা চিনি, ইনি আমাদের পরিচিত গতরাত্রের সেই যুবা ডাক্তার। অপর দুইটির মধ্যে একজন ইংরাজ;—ইনি কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার; ঐ যুবার সহিত, এই ইংরেজ ডাক্তারও এই মরণোন্মুখ বৃদ্ধকে চিকিৎসার জন্য দেখিয়া থাকেন। তৃতীয়টি একজন ধনী মাড়ওয়ারী ব্যাঙ্কার;—ইঁহার বিশেষ কোন পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই।

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আসন তিনটিতে উপবিষ্ট হইলে, তারকবাবুকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তারক, দু জন নয়, এই তিনজন সাক্ষীর সমুখে, আমি আমার উইলখানিতে সই করব। আমার সইয়ের পর, ওঁরা সাক্ষীস্বরূপ ওতে সই করবেন। তুমিও একজন সাক্ষী হবে এবং সই করবে। পরে ওটা জমা রাখবার জন্যে আমি আমার ম্যানেজার-বাবুর দ্বারা ওটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব। যে বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে উইলখানি ব্যাঙ্কে পাঠান হবে, তার চাবিটি তোমার কাছে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর তিন চার মাস, অথবা তদপেক্ষা যথাসম্ভব অল্পকাল, আমার সম্পত্তি তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। যে দলিলের বলে, তুমি আমার প্রদত্ত এই ক্ষমতা লাভ করবে, তাও প্রস্তুত হয়েছে।—যদু!"

যদু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি কাগজের মোড়ক তারক বাবুর হস্তে প্রদান করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদিত নয়নেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ঐ দলিল। তারক, ওখানা তুমি তোমার কাছে রাখ।—ম্যানেজার বাবু!"

চোগা ও চাপকান পরা একজন 'প্রবীণ' ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি উপস্থিত আছি।"

চক্রবর্ত্তী। আপনাকে আমার কিছু উপদেশ দেবার আছে।

ম্যানেজার। আজ্ঞে!

চক্রবর্ত্তী। তা আমি এই উপস্থিত ভদ্রলোকদের সমুখেই বল্‌ব।

ম্যানেজার। আজ্ঞে।

চক্রবর্ত্তী। আমার সম্পত্তি যতদিন না আমার উত্তরাধিকারী—

ম্যানেজার। আপনি কাকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেছেন?

চক্রবর্ত্তী। ম্যানেজার বাবু, আমার কথায় বাধা দিয়ে, ইতিপূর্ব্বে আপনি ত কখন আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেন নি! করেছিলেন কি? আমার কথার উত্তর দিন।

ম্যানেজার। না, আমি কখনও আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি।

চক্রবর্ত্তী। তবে আজও কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত না করে, আমার উপদেশ শুনে জান, এবং তা প্রতিপালন করবার জন্যে মনস্থির করুন।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে, আপনি অনুমতি করুন।

চক্রবর্ত্তী। আমি বলছিলাম যে, যতদিন না আমার সম্পত্তি আমার উত্তরাধিকারীর হস্তগত হয়, ততদিন তা এটর্ণি শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর—

ম্যানেজার। সে আশঙ্কা নেই। আপনি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করবেন।

চক্রবর্ত্তী। এই দু'ইজন বড় বড় চিকিৎসক, তাঁদের সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও বুঝতে পারছেন না, যে আমি আরোগ্যলাভ করব কি না। আর আপনি চিকিৎসক না হয়ে এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বর্ণজ্ঞানশূন্য হয়ে, এবং আমার রোগের ও দেহের কোন প্রকার পরীক্ষা না করে' কি করে' বুঝলেন যে আমি নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করব? ম্যানেজার বাবু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; বুঝতে পারবেন, এখন আর চাটুকারের স্তুতিবাক্যে মোহিত হবার অবসর আমার নেই। আমি আমার মনের মধ্যে বুঝতে পারছি যে আমার মরণ নিকটবর্ত্তী হয়েছে; যমদূতদের পায়ের শব্দ আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। তাই বলছিলাম যে, আমার মৃত্যুর পর, আপনি ও আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, ভৃত্য, সেবক, রক্ষক, পাচক, গোয়ালা, মাঝী, সহিস, কোচম্যান, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তারক বাবুর তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম করবে, এবং আমার আদেশের মত তাঁর আদেশ প্রতিপালন করবে। যার যার জিম্মায় যে যে জিনিষপত্র আছে, সেই সকল জিনিষের জন্যে তারা তারকবাবুর নিকট দায়ী থাকবে, এবং তাঁর কথামত, তাঁকে বা তাঁর নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের তা বুঝিয়ে দেবে। খাতাঞ্চির কাছে যে টাকা, আমার মৃত্যুর পর মজুদ থাকবে, সে তার জন্যে আপনার ও তারকবাবুর কাছে দায়ী থাকবে। আমার মৃত্যুর পর আস্তাবল, গোশালা, চিড়িয়াখানা, পুকুর, বাগান প্রভৃতিতে যে সকল খরচ হবে, তারকবাবুর কাছে তার হিসাব দাখিল করতে হবে। বুঝলেন?

ম্যানেজার। আজ্ঞে হাঁ।

চক্রবর্ত্তী। এই উপদেশ মত একটা হুকুমনামা প্রস্তুত করে' কাল সকালে, আমার স্বাক্ষর করাবার জন্যে পাঠাবেন।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে।

চক্রবর্ত্তী। আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনার কিছু বলবার আছে?

ম্যানেজার। তা অন্য সময় নিবেদন করব।

চক্রবর্ত্তী। আপনি পাগল হয়েছেন! নিবেদনের

আর সময় পাবেন না। যা নিবেদন করবার আছে তা এখনই করুন।

তারকবাবু। বোধ হয় কোন গোপন কথা; আমাদের সম্মুখে বলতে পারছেন না। আমরা কি অন্য ঘরে যাব?

চক্রবর্ত্তী। না। ম্যানেজার বাবু, আমার শেষ কথাগুলি, আমি দু' চারিজন ভদ্রলোকের সমুখেই বলতে ইচ্ছা করি। সাক্ষিদের সমুখে বল্লে, পরে কোন বিষয়ে কোন তর্ক উপস্থিত হলে সহজেই তার মীমাংসা হতে পারবে। আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে বলুন।

ম্যানেজার। কেদার বাবু, অঘোর বাবু ও সুধীর বাবু সম্বন্ধে কোন কথা নিবেদন করবার ছিল।

চক্রবর্ত্তী। আর নয়; তাদের তুচ্ছ কথা নিয়ে এই মৃত্যুকালে আমাকে আর পীড়িত করবেন না। আমার উইল লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই উইল অনুযায়ী এই সম্পত্তি আর আমার নহে। এ থেকে কোন অর্থ আমি তাদের দিতে পারব না; আমার উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য এক কপর্দ্দকও আমি অন্য কার্য্যে ব্যয় করতে পারব না। তবে, আমি ইতিপূর্ব্বে তাদের ব্যবহারের জন্যে, তাদিকে যে সকল সামগ্রী দ্রব্য দিয়েছি, তারা ইচ্ছা করলে, তা নিয়ে স্থানান্তরে যেতে পারে। আমি জানি, তাদের কিছু অর্থ আছে, তাতে তারা সহসা কষ্ট পাবে না। পরে তারা উপার্জ্জন করে' গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করবে।

ম্যানেজার। আজ কাযে এসে শুনলাম যে তাঁরা তাঁদের ব্যবহারের আসবাবের কতকগুলি আজ সকালে স্থানান্তরিত করেছেন।

চক্রবর্ত্তী। খাট, বিছানা; টেবিল, চেয়ার, আহারের বাসন, পরিচ্ছদ ইত্যাদি যা তারা ব্যবহার করছে, তা তাদেরই; তা তারা নিয়ে যাক; তাতে আমার নিষেধ নেই। কিন্তু, আমার মৃত্যুর পর, তারা এই বাড়ী থেকে কোন দ্রব্য সরাতে পারবে না; এবং এই বাড়ীতে, আমার উত্তরাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত, বাস করতে পারবে না। এ বিষয়ে তাদের সাবধান করে দেবেন। আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?

ম্যানেজার। আজ্ঞে না, এখন আর কিছু বলবার নেই।

চক্রবর্ত্তী। তবে আসুন। আপনার সঙ্গে বোধ হয় আর আমার সাক্ষাৎ হবে না। আমি আপনার কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করছি। কার্য্যচালনা উপলক্ষে আমি সময় সময় আপনার প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার করেছি, তা একবার ভুলে গিয়ে আমাকে প্রীত মনে শেষ বিদায় দিন। আপনি আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী; এবং সেই জন্যে প্রধান কর্ম্মচারী; বহুকাল ধরে আপনার সঙ্গে একত্রে কায করেছি। আমার কার্য্য অপকার্য্য, —তা অর্থসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন ও পরপীড়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে একত্রে কায করলেও, আপনার কার্য্য-অপকার্য্য নয়;—কেন না আপনি প্রভুর কার্য্য বিশ্বস্তভাবে সম্পাদিত করেছেন; তাই বেতনভুকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমি আমার অধর্ম্ম নিয়ে প্রস্থান করছি;—আপনি পৃথিবীতে থেকে আপনার ধর্ম্ম পালন করুন। বিদায়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার উত্তরে ম্যানেজার বাবু একটি বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রায় উনিশ বৎসর কাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আজ্ঞাপালন করিয়াছেন; প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তাঁহার নিকট কখন পুরস্কৃত, কখন বা তিরস্কৃত হইয়াছেন। এবং এইরূপে আজ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাঁহার শেষ বিদায় প্রার্থনায় বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। রুদ্ধকণ্ঠে নয়নাসার ত্যাগ করিতে করিতে, তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গণ্ড বাহিয়াও দুইটি অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হৃদয়োদ্বেগ দমন করিলেন। পরে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিয়া, ডাক্তারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উঠে' বসব, সাহায্য কর।"

ডাক্তার তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন; এবং উপাধান রাখিয়া, তাঁহার চারিদিকে অবলম্বন রচনা করিয়া দিলেন।

বালিশে ঠেস দিয়া, একাগ্র মনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উইলখানি আগাগোড়া পাঠ করিলেন; এবং বলিলেন যে উইল লিখন তাঁহার মনোমত হইয়াছে। তাহার পর, তাহার পৃষ্ঠায় তিনি স্বাক্ষর করিলেন। তাঁহার হইলে, দুইজন ডাক্তার ও মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কার সাক্ষীরূপে তাহাতে সহি করিলেন। সর্ব্বশেষে তারকবাবু তাহাতে স্বাক্ষর সংযুক্ত করিলেন। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাকিলেন, "যদু।"

যদু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, তিনি উপাধান হইতে একটি ক্ষুদ্র চাবি লইয়া, তাহা যদুকে দেখাইলেন। এক মুহূর্ত্ত পরে, যদু একটি ক্ষুদ্র ডীডবাক্স আনিয়া দিল।

বাক্সটি উপাধানের উপর রাখিয়া, তিনি তাহার আবরণ উন্মোচন করিলেন। ঐ বাক্সের মধ্যে কতকগুলি চাবি ছিল। ঐ চাবিগুলির প্রত্যেকটিতে এক একটি রিং লাগান ছিল; এবং প্রত্যেক রিঙে এক একটি পত্রাকার অস্থিফলক সংযোজিত ছিল। চাবিগুলি কি কাজে লাগিবে তাহা ঐ অস্থিফলকসকলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। ঐ লিখনের দিকে এটর্ণি বাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "এই বর্ণনা সহ ঐ চাবিগুলিও, এই উইলের সঙ্গে থাকবে।" এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় উইলখানি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া, উহার চাবি বন্ধ করিলেন; এবং চাবিটি এটর্ণি বাবুর হাতে দিয়া, আবার বলিলেন, "তুমি ছাড়া এ জীবনে আর কখনও কাকেও বিশ্বাস করি নি; তাই আজ আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সমর্পণ করলাম।"

এটর্নি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সকল চাবিদ্বারা বদ্ধ, কক্ষ, সেফ্, আলমারি বা বাক্সে যে সকল সামগ্রী আছে, তার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে কি? সে তালিকা কার কাছে পাব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তা আমার ম্যানেজার বাবুর সেরেস্তায় পাবে। আমার বাড়ীতে, বা বাগানে যত জিনিষ আছে তার সকল গুলিরই নাম ও বর্ণনা তালিকতে লেখা আছে; আমার এমন কোন দ্রব্য নেই, যার নাম ও বর্ণনা তালিকাতে লেখা হয় নি। এই সকল তালিকাতে আমার সহিও আছে, তা দেখে নেবে। আর একটা কথা…

এটর্নি। কি?

চক্রবর্ত্তী। আমার সম্পত্তি সকল আমার উত্তরাধিকারীকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, উইলের পুরস্কার ছাড়া, তুমি আরও দু হাজার টাকা নেবে। এ সম্বন্ধে আগে আমার খাতাঞ্চিকে লিখিত উপদেশ দিয়েছি।

এটর্নি। তোমার কাযটা…

চক্রবর্ত্তী। থাক তারক, থাক। আমার আজকের কায শেষ হয়েছে। তোমরা আগামী কাল আবার এস। তখন আমার আর যা বলবার আছে বলব। আজ আমি ক্লান্ত হয়েছি, তোমরা অনুমতি করলে, কয়েক ঘণ্টা একলা বিশ্রাম করব।

আগন্তুকগণ প্রস্তুত হইলেন। যদু আসিয়া, উপাধানগুলি সরাইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শয্যায় শায়িত করিয়া, দিল। বৃদ্ধ কৃপণ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় সঞ্চিত ধনরত্ন সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্ত সম্পন্ন করিতে পারিয়া, মনোমধ্যে কতকটা শান্তিলাভ করিয়া মুদ্রিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, সেই ভঙ্গুর দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া, কখন তাঁহার প্রাণপক্ষী অনন্ত আকাশে উড়িবে?—উড়িয়া কোথায় যাইবে? নিবিড় অন্ধকার ব্যতীত তিনি মানস নয়নে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। অন্ধকারের পর অন্ধকার, যেন ঘন মসীবৃষ্টির ন্যায়, তাঁহার নয়নাগ্রে মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া, যেন তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিল। সহসা সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কোমল মুখখানি, সুনীল আকাশে শুক্ তারার মত ফুটিয়া উঠিল।

বালকের অনিন্দ্য কান্তি মানসচক্ষে দেখিতে দেখিতে তিনি আপনার মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার ভুবনেশ্বরের ছেলেকে, আমার অশ্রুকুমারকে আমি দশ বৎসর দেখিনি। না জানি এখন সে দেখতে কেমন হয়েছে। আমি তাকে দেখব। তাকে ডেকে পাঠালে, সে নিশ্চয় আমার মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে এসে আমাকে জেঠামশায় বলে ডাক্‌বে। আমি তাকে চিঠি লিখব। একলা কলকাতায় এলে বিপদের সম্ভাবনা আছে; গ্রামের অন্য কাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবার জন্যে লিখব। সে নিশ্চয় আসবে; এসে আমাকে জ্যেঠামশায় বলে ডাকবে। ডেকে, তার স্নিগ্ধ করস্পর্শে আমার বুকে স্বর্গসুখ বইয়ে দেবে। গঙ্গাজলে আপন নিষ্পাপ অঞ্জলি পূরে আমাকে সুধার মত তা পান করাবে। মৃত্যুর পর আমার ভাগ্যে অক্ষয় নরক আছে; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার স্বর্গসুখ উপভোগ করে নেব।"

চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন, "যদু।"

যদু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "চিঠি লিখব।"

যদু পার্শ্বের বৃহদাকার গবাক্ষ খুলিয়া দিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তাভ রশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, শয্যাপার্শ্ব আলোকিত করিল। যদু সেই আলোকে হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র টেবিল রাখিল; তাহাতে মূল্যবান লিখনোপকরণ সকল সজ্জিত ছিল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ধর, উঠে বসব।"

যদুর সাহায্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়া বসিলেন; এবং উপাধানে ভর দিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে কম্পিত ও দুর্ব্বল হস্তকে দৃঢ় করিয়া লিখিলেন,—

"প্রাণাধিকেষু,—

আমি পীড়িত হইয়াছি। বাঁচিবার আশা নাই। তুমি গ্রামের কোন লোককে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিও; কদাচ একাকী আসিও না, সঙ্গে অবশ্য একজন লোক লইবে। কিন্তু আসিও; আমি তোমার আগমন প্রত্যাশায় কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, এবং মাতাঠাকুরাণীকে দিবে। ইতি

তোমার জ্যেঠামহাশয়
শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী।"

পত্রলিখন সমাপ্ত করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহা যদুর হাতে দিলেন; বলিলেন, "এটা এখনই কোন হুঁসিয়ার লোক দিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দাও; একটুও দেরী করো না।"

যদু পত্র গ্রহণ করিয়া, উহা ডাকঘরে পাঠাইল না। সত্বরপদে শ্যালকত্রয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া উহা তাহাদিগকে দেখাইল।

তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ বলিল, "না না, এই চিঠি পাঠান হবে না। এই চিঠি পেয়ে যদি সে এসে পড়ে!"

কনিষ্ঠ সুধীরনাথ ধীরে ধীরে বলিল—"আর যদি—এই—তাকে দেখে, যদি—এই—বুড়োর মতির পরিবর্ত্তন হয়! যদি—এই—উইল বদলে,—এই সম্পত্তিটা তারই নামে লিখে দিয়ে যায়?"

মধ্যম অঘোরনাথ বলিল, "মর না মতিভ্রম! চিঠিখানা পাঠান হবে না। এটা পেলে, সে নিশ্চয় আসবে। তখন তাকে দেখে—বাবা! রক্তের টান, সহজ টান নয়, যেন জগন্নাথের রথের কাছি—বুড়ো তাকেই সব দিয়ে যাবে।"

কেদারনাথ বলিল, "তার মুখ দেখে বুড়ো, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, সৌদামিনী সব ভুলে যাবে; আর তাকেই সব দেবে।"

সুধীরনাথ বলিল, "এই—তখন—এই—মুস্কিল! সৌদামিনীকে—আর বিয়ে করা—এই—হবে না। এই—বিয়ে করলেও,—এই—টাকা পাওয়া যাবে না।"

অঘোরনাথ বলিল, "তা হলে বাবা! এই মাঝ দরিয়ায় জাহাজ ডুবি!"

অতএব তাহারা পত্রখানা ডাকঘরে পাঠাইল না। তাহারা যেখানে বসিয়াছিল, তাহার নিকটে টেবিলের উপর, চুরুটের ছাই ফেলিবার জন্য, একটা পিত্তলপাত্র ছিল। পত্রখানি মোড়কসহ, তাহার উপর স্থাপিত করিয়া, পকেট হইতে দীপশলাকা লইয়া, সুধীরনাথ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল; এবং লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমানের ন্যায় মহা হর্ষে দন্ত সকল বিকশিত করিয়া সেই ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ড অবলোকন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ একাদশী চক্রবর্ত্তী আপন কক্ষে শুইয়া, মুদিত নয়নে যে সুখ-স্বর্গ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, ঐ অগ্নিকাণ্ডে তাহা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বৃদ্ধের অদৃষ্টে পৃথিবীতে থাকিয়া আর স্বর্গভোগ হইল না; তাঁহার মৃত্যুকালে, তাঁহার নিকট আসিয়া, অশ্রুকুমার তাঁহাকে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিল না।

যদুর হস্তে পত্র প্রদান করিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, যদু যদি পত্রখানা না পাঠায়! যদু অল্পক্ষণ পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কক্ষে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য প্রবেশ করিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠিখানা ডাকঘরে পাঠান হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কে নিয়ে গেছে?"

"দর্প সিং চাপরাসী।"

"সে ফিরে এলে, তাকে আমার কাছে ডাকবে।"

"আজ্ঞে।"

যদুর নিকট চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কতকগুলি কাগজ ও খাম ছিল; সে সময় মত সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। যদু অতি সত্বর আপন কক্ষে যাইয়া, তদ্দ্বারা বৌবাজারের এক ঠিকানায় এক পত্র লিখিয়া দর্প সিং চাপরাসীর জিম্মা করিয়া দিল। তৎপরে দর্পসিং ঐ পত্র ডাকঘরের ডাকবাক্সে দিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, যদু তাহাকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নে সে বলিল, "হাঁ, আমি ডাকঘরে এইমাত্র একখান চিঠি দিয়ে এসেছি।"

"চিঠিখানা কিরকম ছিল?"

"বড় চৌকা খাম।"

"কি রং?"

"ফিকা নীল রং।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। যদুর উপর আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না; তিনি বুঝিলেন, এ ক্ষেত্রে যদু অবিশ্বাসের কার্য্য করে নাই।

আমরা এ অধ্যায়ের উপসংহারে, একটা কৈফিয়তের কথা বলিব। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদু খানসামাকে অবিশ্বাসী, এবং তাহার শ্যালকগণের বেতনভোগী গুপ্তচর বলিয়া জানিতেন। জানিয়াও তিনি তাহাকে অপসারিত করেন নাই কেন? তাহার কারণ ছিল। তিনি জানিতেন যে, যদু অবিশ্বাসী হইলেও অত্যাজ্য। সেই ক্ষিপ্রহস্ত, দক্ষ এবং সুচতুর ভৃত্য ব্যতীত, তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। তাঁহার ইঙ্গিত ও মনোভাব, তাহার ন্যায় আর কেহ বুঝিতে পারিত না; তাঁহার দেহে কোথায় কি বেদনা আছে, তাহা যদুর ন্যায় আর কেহ অবগত ছিল না। কোন্ খাদ্য তিনি কোন্ সময় খাইতে ভালবাসেন, কোন্ বস্ত্র তিনি কোন্ সময় পরিধান করিতে চাহেন, কোন্ দ্রব্যটি তিনি কখন অনুসন্ধান করিবেন, যদু তাহা তাহা সমস্তই জানিত; জানিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত সেবা ও শুশ্রূষায় যদুর ন্যায় পারদর্শী ভৃত্য, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যাইত না; পাওয়া গেলেও অন্য কেহ যদুর ন্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কর্কশ তিরস্কার সহ্য করিতে পারিত না। কাযেই রুগ্ন বৃদ্ধ, যদুকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাহাকে অন্যান্য বিষয়ে অবিশ্বাসী জানিয়াও, আপন সেবায় নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বজ্রাসনের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান

১৩২২ সালের 'ভারতবর্ষে' "বঙ্গে বৌদ্ধতীর্থ" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায় যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে; খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পঞ্চদশ সম্বৎসরে গৌড়-বঙ্গ-মগধের প্রথিতকীর্ত্তি নরপাল প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থের লিপি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল;—মূলগ্রন্থ কতদিনের বলা যায় না—এই পুস্তকে বঙ্গদেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থের চিত্র আছে। পুস্তকখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই, তবে এই পুস্তক অবলম্বনে ফরাসী পণ্ডিত ফুসে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন—আর সেই ফরাসী পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে "বঙ্গে বৌদ্ধতীর্থ" প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলা দেশে প্রাচীনকালে অনেক বৌদ্ধতীর্থ ছিল। কোথায় কোথায় ছিল বলিতে পারি না—কেননা যে যে স্থানে ঐ সকল তীর্থ ছিল, সেই সকল স্থানের নাম বর্ত্তমান বঙ্গের জনগণের নিকট সুপরিচিত নহে।"

উক্ত প্রবন্ধে অনেকগুলি তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই অবস্থান এক্ষণে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। উক্ত তীর্থস্থানগুলির অবস্থান নির্ণয়ের কোনও চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা জানিনা, তবে আমি নিজে রাঢ়দেশে অবস্থিত তীর্থগুলির সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। রাঢ়প্রদেশে আমার জন্মভূমি এবং এই প্রদেশের সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলিয়াই সাহস করিয়া এই দুঃসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি 'বজ্রাসন' নামক বৌদ্ধ-তীর্থের অবস্থান সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহাই বলিব। এই তীর্থ সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল—"রাঢ় দেশের অন্তর্গত 'বজ্রাসন' মহাতীর্থ। বোধিসত্ত্ব শাক্যমুনি। তিনি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত। মন্দির সন্নিকটে ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। তালীবন-কুঞ্জমধ্যে মন্দির রহিয়াছে।"

এই বজ্রাসন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে যে চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল তাহা এই—যদি প্রাচীনকালে রাঢ় প্রদেশে বজ্রাসন নামে কোনও বিখ্যাত গ্রাম ছিল, তাহা হইলে সে গ্রামের নাম হয়ত একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও হইতে পারে—হয়ত বজ্রাসন গ্রাম কোনও বিকৃত নামে রাঢ়ের কোনও স্থানে এখনও বিদ্যমান আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক বজ্রাসন নাম বিকৃত হইলে কি হইতে পারে। এই শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও স্বাভাবিক বিকৃতি হইতেছে 'বাজাসন'। তৎপরে দেখিতে হইবে বাজাসন নামে কোনও গ্রাম রাঢ় প্রদেশে আছে কি না। আছেই ত। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে—কান্দি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে—এই বজ্রাসন। এই গ্রামের ঠিক এক মাইল কি দেড় মাইল পূর্ব্বে ভাগীরথী প্রবাহিতা। এই গ্রামের নাম এক্ষণে এতদঞ্চলে বাজাসন, বাজাস, বাজারসন ও বাজারস এই চারি প্রকারে উচ্চারিত হয়। এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইন চলিয়া গিয়াছে এবং এই গ্রামেই একটা ষ্টেশন হইয়াছে। তবে, এই ষ্টেশনটীর নামকরণে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ষ্টেশনটীর নাম দেওয়া হইয়াছে, "বাজারসহু"। এই 'বাজারসহু' নামের কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এখানকার সাধারণ লোকে বাজারসহু নাম বুঝিতে পারে না—তাহারা জানে গ্রামের নাম বাজাসন, বাজাসোঁ, বাজারসন অথবা বাজারসোঁ।

তবে রেলওয়ে কোম্পানি 'বাজারসহু' নাম পাইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, এই 'বাজারসহু' কথাটা সাধুভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—'বাজারসোঁ'কে পরিমার্জ্জিত করিয়া এই অদ্ভুত সাধু-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কি প্রণালীতে এই সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই এক্ষণে বলিতেছি। এ অঞ্চলে শৌণ্ডিকগণের সাধারণ উপাধি সোঁ, শৌ অথবা শহু। চলিত কথায় এই শৌণ্ডিকগণকে শৌ বা সোঁ বলা হয়, কিন্তু সাধুভাষায় ইঁহাদের উপাধি সহু বা শহু। এই অপরূপ যুক্তির বলে 'বাজারসোঁ' শব্দের 'সোঁ' অংশ 'সহু' শব্দে পরিণত হইয়াছে। ইহাই হইতেছে 'বাজারসহু' শব্দের ইতিহাস। অবশ্য এই পরিণতির কৃতিত্ব রেল ওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের প্রাপ্য, অথবা স্থানীয় সাধুভাষাপ্রিয় মাতব্বরগণের প্রাপ্য, সে বিষয়ে কোনও সংবাদ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বিখ্যাত প্রাচীন নামগুলি সম্ভবতঃ অনেক স্থলে উল্লিখিত প্রণালীতেই রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে—সেই জন্যই অনেক প্রাচীন স্থানের বর্ত্তমান অবস্থান নির্দ্দেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে যাহা হউক, এই 'বাজাসন' বা 'বাজারসন'কেই আমি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ 'বজ্রাসন' বলিয়া মনে করিয়াছি। কি কি কারণে এই অনুমান—অনুমান কেন, বিশ্বাস—আমার মনে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে এক্ষণে বলিতেছি।—

(১) প্রথমতঃ বজ্রাসন ও বাজাসনের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য যথেষ্ট। অনেক প্রাচীন নাম ও আধুনিক নামের মধ্যে এরূপ সন্তোষজনক সাদৃশ্য অধিকাংশ স্থলেই পাওয়া যায় না।

(২) কেবলমাত্র নাম-সাদৃশ্যে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। বৌদ্ধযুগের কোনও নিদর্শন এই বাজাসন গ্রামে পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। মৃত্তিকা খনন না করিয়া এতকাল পরে এ স্থলে যে কোন বৌদ্ধ চিহ্ন পাওয়া যাইবে, ইহা আমি আশা করিতে পারি নাই। তবুও সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রামে বৌদ্ধযুগের কিঞ্চিৎ নিদর্শন আমি পাইয়াছি। এই গ্রামে ডোমেদের কালী নামে একটী দেবমূর্ত্তি আছেন। কোনও ব্রাহ্মণ এই দেবতার পূজা করেন না—স্থানীয় ডোমগণ এই বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। এই মূর্ত্তি কালীমূর্ত্তি নহে—আমার পরিজ্ঞাত অপর কোনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিও নহে। ইহা নিশ্চয়ই কোন বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি—তবে ইহা "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" বর্ণিত শাক্যমুনির মূর্ত্তি কিনা সে কথা আমি আর একবার বিশেষরূপে মূর্ত্তিটী পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া বলিতে পারি না। আমি যখন প্রথম এই মূর্ত্তিটী দেখি, তখন ইহা সিন্দুর চন্দনে এমনভাবে পরিলিপ্ত হইয়াছিল যে, বিশেষ সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ তখন হইয়া উঠে নাই। যত শীঘ্র পারি প্রবন্ধান্তরের সহিত এই মূর্ত্তির একটি আলোক চিত্র পাঠকগণকে উপহার দিব, ইচ্ছা আছে। আলোকচিত্র দেখিলে বিশেষজ্ঞ পাঠক এতৎ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

(৩) এই বাজাসন গ্রামের উত্তরপশ্চিম কোণে ৪।০ মাইল দূরে বিহারবাড়ী (রাণীপুর বিহারবাড়ী) নামক একটী গ্রাম আছে। ঐ স্থলে প্রাচীনকালে কোনও বৌদ্ধবিহার ছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বর্ত্তমানকালে বাজারসন ও বিহারবাড়ীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে অন্য কোনও গ্রাম নাই—কেবলমাত্র জলভূমি ও ধান্যক্ষেত্র। বোধ হয় বজ্রাসনে সমাগত তীর্থযাত্রী বৌদ্ধগণের অবস্থানের জন্য ঐ বিহারভূমি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদী এই বাজাসনের পশ্চিমদিকে প্রায় ৪।০ ক্রোশ দূরে প্রবাহিত হইত—একথা আমি "গঙ্গারাঢ়ের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান" * সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। যে সময়ে বজ্রাসন বৌদ্ধতীর্থ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সে সময়ে সম্ভবতঃ ভাগীরথীর একটি শাখা বর্ত্তমান পথে অর্থাৎ বাজাসনের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্যথা, বজ্রাসন রাঢ়দেশের অন্ত-

* এতৎ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ গত আষাঢ়ের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

র্গত বলিয়া উল্লিখিত হইত না। (ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডকেই রাঢ় বলা হয়) বজ্রাসনের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ এই শাখাই ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়াছে—ভাগীরথীর পূর্ব্বতন পথ এখন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর এই দুই পথের মধ্যবর্ত্তী স্থানের অধিকাংশই এখনও জলভূমি, বিল ও নিম্নভূমি। সেকালেও বজ্রাসন বোধ হয় প্রায় চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত সংকীর্ণ স্থান ছিল। এই সংকীর্ণ চরভূমির উপর সমাগত বৌদ্ধযাত্রিগণের স্থান না হওয়াতে বোধ হয় অদূরবর্ত্তী 'বিহারবাড়ী'তে বিহারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই বিহারবাড়ীও সম্ভবতঃ তৎকালে জলবেষ্টিত স্থান ছিল ও এখনও আছে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। এই বিহারবাড়ী গ্রামে কোনও বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা সে অনুসন্ধানের সুযোগ আমার এখনও হয় নাই। আমি কেবলমাত্র একবার নৌকাযোগে ঐ গ্রামে গিয়াছিলাম —তাহাও ভাদ্রমাসে; তখন চতুর্দ্দিক জলপ্লাবিত বলিয়া অনুসন্ধানের সুবিধা হয় নাই। পুনরায় যত শীঘ্র পারি এই সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিব ইচ্ছা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের প্রথম অবস্থায় সম্ভবতঃ এ ধর্ম্ম এত জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। কোন্ নূতন ধর্ম্মই বা পারে? সেইজন্য হিন্দুদিগের বিরাগ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আদিম বৌদ্ধগণ যে তীর্থস্থানের জন্য বজ্রাসনের ন্যায় একটা জলভূমি-বেষ্টিত নির্জ্জন স্থান পছন্দ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। বজ্রাসন মহাতীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে—ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই তীর্থ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রথম অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং রাঢ়দেশস্থ অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থ ইহার পরে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধতীর্থগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার মনে হয়, রাঢ়ের অন্যান্য তীর্থগুলি যখন স্থাপিত হয় তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জনবিদ্বেষের ভয়ে আর তেমন সন্ত্রস্ত হইত না। বজ্রাসনের পর আমি রাঢ়ের অন্যতম বৌদ্ধতীর্থ 'কণ্যারামে'র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বজ্রাসন সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যেটুকু অনুসন্ধান সম্ভবপর হইয়াছে তাহারই ফল এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। এতৎ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, তাহা ঐতিহাসিক সত্যের আখ্যা পাইবে কি না জানিনা। তবে আমার অনুমান যে ঠিক সে বিষয়ে আমার নিজের কোনও সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যের পরিসংখ্যা-বিদ্যা

(১) প্রত্যয় সর্গ।

সাংখ্যের অপবর্গ-বাদ প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে এইটুকুমাত্র দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি যে কিরূপে অচেতন 'চিত্ত সত্তা' বা মন (mind as a unity), চেতন অহং-পুরুষ বলিয়া অভিমান করতে সমর্থ হইয়া থাকে। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, সেই চিত্ত বিন্যাসের (system of mind) যাহা ব্যক্তি-গত পৃথক ভাবনিচয় (aspects) তাহা হইতে কিরূপে, সাংখ্যমতে, জীবের পক্ষে স্বতঃই বন্ধ ও মুক্তি বিহিত হইয়া থাকে। মুক্তি প্রসঙ্গে ইহাই সব চেয়ে বড় কথা।

অতএব প্রথমে প্রণিধান করা আবশ্যক, সাংখ্যের মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা কিরূপে মনের ভাব সকলকে বিভাগ ও শ্রেণীবদ্ধ (classify) করিয়াছিল। এবং সেই শ্রেণীবিভাগকে আমরা বর্ত্তমান কালের আলোকে কত-

দূর সঙ্গত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার আশা করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যদিও এ ক্ষেত্রে সাংখ্যের বিশ্লেষণ শক্তির চরম পরাকাষ্ঠা আমরা দেখিতে পাই, এবং তাহার বুদ্ধিভাব সকলের বিভাগ ও উপ-বিভাগ এবং তস্য বিভাগের 'থৈ' পাওয়াও দুরূহ হইয়া উঠে, তথাপি সেই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ভাব-বিভাগের' কোন বিভাগকেই আমরা বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের (psychology) কোনই চিহ্নিত শ্রেণীর (category) অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না।

কেন পারি না, তাহার কারণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইবার প্রয়োজন হয় না। সাংখ্যের এই যে মনস্তত্ত্বের বিভাগ, ইহা কোনই বিশুদ্ধ (pure) মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রের (psychology) শ্রেণী-বিভাগ মাত্র নহে। এই বিচিত্র বিভাগ ও পরিমাণের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা স্বতন্ত্র। এখানে যে বাটখারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা কোনই বৈজ্ঞানিক বাটখারা নহে। ইহার তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি কোনই বরফ কিম্বা পারদের চরম শৈত্যকে নির্দ্দেশ করে না,—তাহা অপবর্গের চরম শৈত্যকেই পরিমাণ করে। এবং ধর্ম্ম, বৈরাগ্য প্রভৃতি বুদ্ধি-ভাব সকল আপেক্ষিক ভাবে, সেই আপবর্গিক উত্তাপকেই পরিমাণ করিয়া থাকে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, ত্রিগুণের বৈষম্য ও তারতম্য দেখিয়া সাংখ্য, চিত্ত বা বুদ্ধির অষ্টবিধ প্রধান পরিণাম গণনা করিয়াছিলেন। এই অষ্টবিধ বুদ্ধি পরিণাম হইতেছে,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান বৈরাগ্য ও অ-বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বুদ্ধি-ভাব যে কি তাহার কোনই বিস্তৃত সংজ্ঞা (definition) বর্ত্তমান সাংখ্যের মধ্যে নাই,—তবে তাহার একটা মোটামুটি রকমের বিবরণ মাত্র আমরা পাইয়া থাকি, যথা—

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ ভবতি অধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ, বিপর্য্যয়াৎ ইষ্যতে বন্ধঃ॥
বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ, সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ, বিপর্য্যয়াৎ বিপর্য্যাসঃ॥

—কারিকা

—অর্থাৎ কারিকা-কর্ত্তা ধর্ম্মা-ধর্ম্ম প্রভৃতি বুদ্ধি-ভাব যে কি তাহার কোনই 'বাঁধি' সংজ্ঞা দিলেন না। কিন্তু বলিলেন কি, না,—বুদ্ধির ধর্ম্মাখ্য পরিণাম দ্বারা স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকে গতি হয়, এবং অধর্ম্ম-পরিণাম বশতঃ লিঙ্গ-দেহের পশু-পক্ষী প্রভৃতি নিম্ন-যোনিতে গমন হয়। কেবলমাত্র বুদ্ধির বৈরাগ্য-পরিণাম দ্বারা জীবের দেবত্ব ও প্রকৃতি-লীনতা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, এবং অবৈরাগ্য বা 'রাজসিক রাগ' হইতে 'সংসার' বা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গতাগতি চলিয়া থাকে। জ্ঞানাখ্য বুদ্ধি পরিণাম দ্বারা অপবর্গ সিদ্ধ হয়, এবং অজ্ঞান হইতে বন্ধ উপচিত হয়। বুদ্ধিতত্ত্বে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধি থাকিলে তাহা হইতে ইচ্ছার অভিঘাত হইয়া থাকে,—জীব যা খুসী করিতে পারে, এবং যেথায় ইচ্ছা যাইতে পারে। তাহা না থাকিলে ইচ্ছার ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

'ইহা-হইলে-ইহা-হয়'—এইরূপে কার্য্য-কারণের নির্দ্দেশ করিয়া কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করিলে, তাহাকে পণ্ডিতেরা "নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে" ব্যাখ্যা করা বলেন। সাংখ্য এখানে ঐরূপ 'নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে' ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অষ্টবিধ প্রধান বুদ্ধিভাবের মোটামুটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এবং সেই ব্যাখ্যা অনেকটা লিঙ্গ-দেহের গতির উপর নজর রাখিয়াই ব্যাখ্যা হইয়াছে। লিঙ্গদেহ কিরূপে বুদ্ধির 'ভাব' সকলের দ্বারা "অধিবাসিত" হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রস্থিত হয় ইহা আমরা সাংখ্যের লিঙ্গ-দেহ প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া লইয়াছি। এবং সেখানে দেখিয়াছি, বিবশ জন্তুগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বুদ্ধিভাব সকলই লিঙ্গ-দেহের গতিকে নিয়মিত করিয়া থাকে।

এই অষ্টবিধ প্রধান বুদ্ধিভাব নিরূপণ দ্বারা আমাদের বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বের পুঁজি এতটুকুও বাড়ে নাই। কিন্তু মুক্তি সাধকের চক্ষের সামনে এক মস্ত পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছে।

এই অষ্টবিধ বুদ্ধিভাবকে সাংখ্য কারিকা 'প্রত্যয়-

সর্গ বা 'বুদ্ধি-সৃষ্টি' নাম দিয়াছেন। এই প্রত্যয়-সর্গের আবার উপ-বিভাগ আছে—যথা "তস্য চ ভেদাঃ পঞ্চাশৎ"—তাহার আবার পঞ্চাশ রকম ভেদ। সেই পঞ্চাশ রকমের ভেদের ফর্দ্দ হইতেছে—বিপর্য্যয়জ্ঞান ৫ দফা, তুষ্টি ৯ দফা, সিদ্ধি ৮ দফা, অশক্তি ২৮ দফা, মোট ৫০ দফা।

এই পঞ্চাশ দফার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পাঠক মহাশয়ের ধৈর্য্যের দফাকেও আমরা রফা করিতে চাহি না। তবে এই পঞ্চাশ দফা প্রত্যয় সর্গের ভেদ নিরূপণই, প্রাচীন সাংখ্য-সাধকের মরণ-জীবনের কাঠি ছিল—ইহাই তাহার সম্প্রদায়ের মুখ্য-সাধন কাণ্ড ছিল—ইহা তাহার 'মানস যজ্ঞের' হব্য কব্য ও হুত, হুতাশন ছিল এ কথা আমরা দেখাইতে ও দেখিতে বাধ্য। এবং সে কথাই বিশদভাবে দেখিবার জন্য উপস্থিত সাংখ্যতত্ত্ব আলোচনার ঢেঁকিকলকে বন্ধ রাখিয়া কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক শিবের গীতে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন হইতেছে।

(২) লুপ্ত সাংখ্য ও ষষ্ঠিতন্ত্র।

কোন এক বৃহদায়তন প্রাচীন সাংখ্য শাস্ত্র যে লোপ পাইয়াছে, এবং আমাদের বর্ত্তমান কালের সাংখ্য যে সেই লুপ্ত সাংখ্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র—ইহার যথেষ্ট প্রমাণ ও আভাস আমরা চারিদিক হইতে পাইয়া থাকি।

পাঁচ কিম্বা ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানভিক্ষু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"জ্ঞান-সুধাকর সাংখ্য শাস্ত্র কালরূপ অর্ক দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে।" ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য। ঈশ্বরকৃষ্ণের তারিখ ৩০০ খৃষ্টাব্দ। তিনি সাংখ্যকারিকা লিখিয়াছিলেন। ঐ কারিকার শেষে এই ভনিতা আছে—"এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ সাংখ্য জ্ঞান মুনি (কপিল) অনুকম্পা করিয়া আসুরিকে প্রদান করেন। আসুরি আবার ঐ জ্ঞান পঞ্চশিখকে দান করেন। পঞ্চশিখ ঐ জ্ঞানকে বহুধাকৃত তন্ত্র করিয়াছিলেন।"—ঈশ্বরকৃষ্ণ কথিত পঞ্চশিখের বহুধাকৃত সাংখ্যতন্ত্র লোপ পাইয়াছে,—কেবল যোগদর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে কয়েকটি পঞ্চশিখ-বচন রক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল বচনের ভাষা ও ভাব যে এক প্রাচীন দার্শনিক যুগকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইবে না। এবং মূল সাংখ্য অনুশীলনের পক্ষে ঐ সকল বচনের মূল্য যে অমূল্য, ইহা বলিলেও কোন অত্যুক্তি হইবে না।

ঈশ্বরকৃষ্ণ সত্তরটি মাত্র শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কারিকার শেষে আরও দুইটি বাড়তি শ্লোক দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের বিরচিত নহে,—তাহা কোনও তদানীন্তন লেখকের ভনিতা হইবে। ঐ ভনিতা বলিতেছে—"আর্য্যমতি ঈশ্বরকৃষ্ণ শিষ্য-পরম্পরা দ্বারা আগত (সাংখ্য বিষয়ক) সিদ্ধান্ত সম্যক বিজ্ঞাত হইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে, এই সকল আর্য্যা-শ্লোকের দ্বারা (সিদ্ধান্তকে) বলিয়াছেন। এই সত্তরটি শ্লোকের মধ্যেই ষষ্ঠিতন্ত্রের কৃৎস্ন অর্থ (topics) উল্লিখিত হইয়াছে। (ষষ্ঠিতন্ত্রের) আখ্যায়িকা এবং পরবাদ সকল কারিকায় বর্জ্জিত হইয়াছে।" এই ভনিতা ঈশ্বরকৃষ্ণের স্বরচিত না হইলেও, পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই এই উক্তির সত্যতায় অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই ভনিতার উক্তি হইতে দেখা যায় ঈশ্বরকৃষ্ণের (৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্ব্বেও ষষ্ঠিতন্ত্র নামে কোন বৃহৎ-সাংখ্য ছিল যাহার সংক্ষিপ্তসার-সঙ্কলন হইতেছে সাংখ্য-কারিকা।

এই লুপ্ত 'ষষ্টিতন্ত্র' লইয়া বর্ত্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার Regius Professor ডাঃ A. B. Keith সাহেব বলেন যে, ষষ্টি-তন্ত্র বলিতে যে কোনও লুপ্ত বিশেষ-পুঁথিই বুঝাইয়াছিল, তাহা না হইতেও পারে। সাংখ্য শাস্ত্রেরই সাধারণ নাম হইতেছে, ষষ্টি-তন্ত্র বা ষাটটি আলোচ্য বিষয়ের তন্ত্র ('a system of sixty topics')।* এ জন্য ষষ্টি-তন্ত্র কোন বহি

* A. B. Keith's Sankhya System p. 60

না হইয়া সাধারণ সাংখ্যশাস্ত্র হইলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর Garbeর অবধারিত মত হইতেছে ষষ্ঠি-তন্ত্র একখানি বিশেষ বহিরই নাম ছিল।* ফলে আমরা বলি Garbe সাহেবের কথাও সত্য এবং ডাঃ Keith সাহেবের কথাও সত্য। এ বিষয়ে স্পষ্ট (direct) প্রমাণ যখন নাই, তখন অনুমান করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাই যদি হয়, বরং আমরা খুসীর সহিত অনুমান করিয়া লইব যে ষষ্ঠিতন্ত্র সাংখ্যের এমনি এক প্রামাণ্য পুঁথি ছিল, যে সাংখ্য বলিতে ষষ্টিতন্ত্র ও ষষ্ঠিতন্ত্র বলিতে সাংখ্যই বুঝাইয়াছিল।

যে গ্রন্থকে কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই, শুধু যাহার 'বাঁশী শুনিয়াছে', তাহার রচয়িতা কে হইতে পারে ইহা লইয়াও গ্রন্থ ইতিহাসে কখন কখন তর্ক বাধিয়া যায়। সেইজন্য পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক লাগিয়াছিল, ষষ্ঠিতন্ত্রের রচয়িতা কে। এক পক্ষের মত হইতেছে, ঈশ্বর-কৃষ্ণ যে পঞ্চশিখাচার্য্যের 'বহুধা-কৃত তন্ত্রের' কথা বলিয়াছেন তাহাই ষষ্ঠিতন্ত্র। অন্য-পক্ষ বলেন 'বার্ষগণ্য' নামে একজন সাংখ্যাচার্য্যই ষষ্ঠি-তন্ত্রের প্রণেতা। বার্ষগণ্য-পক্ষে, কর্ণেল Jacob বোধ হয় প্রথম দেখাইয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্র এই মতকে ক্ষীণভাবে—অতি ক্ষীণভাবে—সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।† ব্যাস, পাতঞ্জল ভাষ্যে একটি শ্লোক (৪।১৩) উদ্ধার করিয়াছেন। বাচস্পতি উহার টীকায় বলিয়াছেন ইহা ষষ্ঠিতন্ত্রের শ্লোক। বাচস্পতি আবার বেদান্তের ভামতী টীকাতে (২।১।৩) সেই শ্লোকই উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন 'ইহা বার্ষগণ্য বিরচিত শ্লোক'। কাযেই ষষ্ঠিতন্ত্রের সঙ্গে বার্ষগণ্যের কিছু সম্পর্ক বাঁধিয়া যাইতেছে। আবার ইহাও দেখা যায়, ব্যাস পাতঞ্জল ভাষ্যে একস্থানে বার্ষগণ্যের উক্তি উদ্ধার করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন 'ইতি বার্ষগণ্যঃ' (৩।৫৩)। ইহা হইতেও বুঝা যায় বার্ষগণ্য কোন সাংখ্যাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠিতন্ত্রের মতন বৃহৎ তন্ত্রে যে শুধুই একজন আচার্য্যের হাত ছিল এমন কোন কথা নাই। হয়ত তাহাতে বার্ষগণ্যের উক্তিও সংগৃহীত হইয়াছিল। কারণ, দেশান্তরের ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে আমরা পাইয়া থাকি, ষষ্ঠিতন্ত্র সাংখ্যের এক অষ্টাদশ পর্ব্বের বিপুল মহাভারত ও বিশ্বকোষ অভিধান গ্রন্থ ছিল। এখন সেই প্রমাণের উল্লেখ করিব।

চীনদেশে 'লিয়াং' বংশের রাজার নাম ছিল 'ও-উও-টি'। সে রাজা পরম নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধরাজ কুমারগুপ্তের (মতান্তরে প্রথম জীবিত গুপ্তের) সভাতে এক দূত পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে মগধরাজ, বৌদ্ধ মহাযানের পুঁথির সহিত এমন একজন পণ্ডিতকে চীন দেশে পাঠাইয়া দিউন, যিনি ঐ সকল পুঁথিকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করিতে পারিবেন। তদনুসারে মগধরাজ, পরমার্থ নামে এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে, বিস্তর পুঁথিপত্রের সহিত চীনা মুল্লুকে পাঠাইয়াছিলেন। ৫৪৬ খৃষ্টাব্দে পরমার্থ ক্যান্টন্ নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হয়েন।

পরমার্থ চীন ভাষায় যে সব গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বর-কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা একখানি। শুধু মূল কারিকা নহে, কারিকার একটি টীকায়ও তিনি অনুবাদ করেন। মূল টীকাটি যে কাহার বিরচিত তদ্বিষয়ে এখনও পরিস্কার মীমাংসা হয় নাই। বোম্বাই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেন্‌ভার-কার সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা 'বিন্ধ্য-বাস' নামে একজন স্বতন্ত্র সাংখ্যাচার্য্যের টীকা।* কিন্তু সেই বিখ্যাত পণ্ডিত—ডাক্তার 'টাকাকুসু'—যাঁহার নিকট সভ্যজগৎ ঐ চীনা টীকার বিবরণের জন্য ঋণী, তাঁহার মত হইতেছে, খোদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণই এই মূল টীকার প্রণেতা।†

* Sankhya Philosophie, pp. 58-59

† J. R. A. S—1905

* Bhandarkar, C. Volume p. 175

† J, R, A, S, 1905, p. 35

ফলে যিনিই ঐ টীকার প্রণেতা হউন, তিনি যে এক জন প্রাচীন টীকাকার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ টীকাকার বলিয়াছেন—কারিকার মধ্যেই কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ প্রভৃতির বচন নিহিত আছে। ষষ্টিতন্ত্র পঞ্চশিখেরই তন্ত্র। তাহাতে করিকার স্থায় ষাট হাজার গাথা গোড়াতে ছিল। তাহা হইতেই ঈশ্বরকৃষ্ণ সত্তরটি মাত্র গাথা বাছিয়া লইয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ পরম্পরা-ক্রমের একজন সাংখ্যাচার্য্য। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চীনা টীকার কথিত ষাট হাজার গাথার সেই বিপুল সাংখ্য মহাভারত এখন আর নাই। তাহা লোপ পাইয়াছে।

শুধু এবম্বিধ 'ঐতিহাসিক' প্রমাণ হইতেই নহে, 'পৌরাণিক' প্রমাণ হইতেও আমরা জানিতে পারি সাংখ্য 'কালবিপ্লুত' হইয়াছিল; শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

পঞ্চমঃ কপিলো নাম, সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।
প্রোবাচ আসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্ব-গ্রাম-বিনিশ্চয়ং ১।৩

—নারায়ণের যে পঞ্চম অবতার কপিল, তিনি সিদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন। তিনি তত্ত্বসকল বিশেষ রূপে নির্ণয় পূর্ব্বক, 'কালবিপ্লুত' * সাংখ্য আসুরিকে বলিয়া ছিলেন। এবং এই 'কালবিপ্লুত' সাংখ্যই যে কালে, 'পঞ্চশিখ-তন্ত্র' বা 'ষষ্টি-তন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়াছিল এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে। এবং ষষ্টি-তন্ত্রই বোধ হয় সাংখ্যের লুপ্ত বিশ্ব-কোষ অভিধান ছিল।

আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর-কৃষ্ণের সময়েও, অর্থাৎ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগেও, ষষ্টি তন্ত্রের লোপ পাইয়াছিল এবং ষষ্টিতন্ত্রের এক বিচ্ছিন্ন স্মৃতিমাত্র বিরল-সংখ্যক 'শিষ্যপরম্পরা'র মধ্যেই নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্যই ভণিতা-কর্ত্তা বলিয়াছেন—"শিষ্য পরম্পরা দ্বারা আগত (অর্থাৎ কোন গ্রন্থ দ্বারা আগত নহে) সিদ্ধান্তকে সম্যক্ জানিয়া" ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্য কারিকা লিখিয়াছিলেন। তিনি যদি কোন প্রামাণ্য সাংখ্য গ্রন্থ দেখিয়া সাংখ্য লিখিয়া থাকেন তবে "শিষ্যপরম্পরা দ্বারা আগত সিদ্ধান্ত" কি তাহা জানিবার তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনই ছিল না। তাহার পরে ভনিতা-কর্ত্তা পাঠকবর্গকে জানাইয়া দিতেছেন এই সত্তরটি করিকার মধ্যেই 'ষষ্টিতন্ত্রের কৃৎস্ন অর্থ' নিহিত হইয়াছে। কেন?—কারণ তদানীন্তন জনশ্রুতি ছিল, এক বিপুল ও বিস্তীর্ণ ষষ্টিতন্ত্রই সাংখ্যের নষ্টকোষ্ঠী। তদানীন্তন পাঠক সন্দেহ করিতে পারিতেন সত্তরটি মাত্র শ্লোক তাহার ষাটটি তন্ত্রের একটী তন্ত্রেরও ঠিকুজী-পত্র তৈয়ারি হয় নাই। এবং সাংখ্যের একটি মাত্র প্রদেশের বিবরণ শুনিতে সেই বৌদ্ধযুগের প্রতিক্রিয়ার (reaction) সময়ে কাহারই আগ্রহ ছিল না। ভণিতা কর্ত্তা সেই সন্দেহের সম্ভাবনার জড় মারিয়া দিয়া বলিতেছেন, "এই সত্তরটি শ্লোকের মধ্যেই ষষ্টিতন্ত্রের কৃৎস্ন অর্থ নিহিত হইয়াছে।"—আমরা এ কথা বলিতেছি না যে ইহা ভণিতা কর্ত্তার সর্ব্বৈব মিথ্যা স্তোকবাক্য মাত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নিজের মতের সঙ্গে গরমিল হইলেই পুরাতন দলিলকে প্রায় মিথ্যা বলিয়াই গণ্য করেন। আমরা তাহাতে রাজি নহি। তবে হইতে পারে,—শ্রাদ্ধ-পাঠ্য, 'দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুম' ইত্যাদি পাঠের মধ্যে যেমন অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের 'কৃৎস্ন অর্থ' নিহিত হইয়াছে, তেমনি ঈশ্বরকৃষ্ণের এই 'সুবর্ণ সপ্ততির' মধ্যেও ষষ্টিতন্ত্রের 'কৃৎস্ন অর্থ' নিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে নিহিত রহিয়াছে।

তাহার পরে দেখা যাউক, সাংখ্যের এই "শিষ্য পরম্পরার" কোনও কিনারা পাওয়া যায় কি না। তিনটি নাম আমরা পরম্পপরা-ক্রমে প্রায় অনেক পুরাণ ও ইতিহাসে পাইয়া থাকি,—কপিল, আসুরি ও পঞ্চশিখ। আর নাম বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্যের চীনা টীকায় এই শিষ্য-পরম্পরায় এক ফর্দ্দ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চীনা ভাষায়

* ডাঃ F. Hall ইহার অর্থ করেন "Revived by Kapil" কিন্তু কপিলই সাংখ্যের 'আদি বিদ্বান্'—ইহার সমস্ত সাংখ্যস্মৃতির উক্তি।

আল্‌খেল্লার মধ্যে ভারত বর্ষীয় সাংখ্য গুরুগণকে চিনিয়া লওয়া এক মহা অসাধ্য ব্যাপার। চীনা টীকার মতে কপিল হইতে ঈশ্বরকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত সাতজন সাংখ্যগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা—(১) কপিল, (২) আসুরি, (৩) পঞ্চশিখ, (৪) 'হো চি-এ' (৫) 'উও-টাউ-চিঙ' (৬) 'পো-পো-লি' (৭) ঈশ্বর-কৃষ্ণ। এই ফর্দ্দের মধ্যে (৪) (৫) ও (৬) নং যে কোন্ ভারতবর্ষীয় নামের অপভ্রংশ তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ডাঃ টাকা-কুসুর ন্যায় এত বড় দরের চীনা 'স্কলার', দুইটি মাত্র নামের অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'হো-চি এ' গার্গ্য হইতে পারেন। এবং চীনা হরফের মারপ্যাচে 'পো-পো-লি', 'ব্রস-গন্' (মানে নাকি 'rain host') বা বার্ষগণ্য বলিয়াও পড়া যাইতে পারে। কিন্তু এ পক্ষের চীনা বিদ্যা কোন মতেই বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটকে অতিক্রম না করায়, এই অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়স্কর হইতেছে।

কিন্তু ভগবান কপিলের এই শিষ্য পরম্পরার মধ্যে, একজনের নাম সাংখ্যের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। তিনি পঞ্চশিখ। এবং তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যতটুকু পাই, সেইটুকুই পাঠককে নিবেদন করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে আছে, পঞ্চশিখ 'ধর্ম্মযুগ' বা সত্যযুগে সম্ভূত হয়েন। এবং কপিলের প্রথম শিষ্য যে আসুরি, তিনি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। আসুরির কপিলা নাম্নী এক কুটুম্বিনী ছিলেন। পঞ্চশিখ তাঁহার স্তন্য পান করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্য এক নাম হইয়াছিল 'কাপিলেয়'। এবং তাহা হইতেই তাঁহার 'নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি' প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল 'মানস-যজ্ঞের' অনুষ্ঠানে দ্বারা "পঞ্চজ্ঞ, পঞ্চকৃৎ, পঞ্চগুণঃ, পঞ্চশিখ ইতি স্মৃতঃ" হইয়াছিলেন। মিথিলার জনকবংশীয় রাজর্ষিগণের মধ্যে কাহারো কাহারো তিনি গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি জগতীতলে যদৃচ্ছা পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি একজন চিরজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। যোগ ও সাংখ্য মার্গের ঋষিরা পরম সমাদরে তাঁহার উপদেশ সকল গ্রহণ করিতেন। এবং তাঁহারা বলিতেন, জগতে যিনি এক মাত্র মুনি হইয়াছিলেন, সেই কপিল মুনিরই তিনি যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। তাঁহার কোন কোন উপদেশ প্রসঙ্গক্রমে মহাভারত-কর্ত্তা "পুরাতন ইতিহাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নীলকণ্ঠের মতে তিনিই মার্কণ্ডেয় ও সনৎকুমার নামে প্রসিদ্ধ ঋষি। *

এইটুকু মাত্র আলোক, পঞ্চশিখ সম্বন্ধে মহাভারত হইতে পাওয়া যায়। আসুরি, যিনি পঞ্চশিখের গুরু ছিলেন,—তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তবে আসুরি সম্বন্ধে, তাঁহার খোদ্ শিষ্য পঞ্চশিখ যাহা বলিয়াছেন, সেই বচনের এক ক্ষুদ্র অংশ দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছে। পাতঞ্জলের (১।২৫) ভাষ্যে ব্যাস, একটি পঞ্চশিখ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"আদি বিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষি (কপিল), জিজ্ঞাসমান শিষ্য আসুরির 'নির্ম্মাণ কায়ে' (যোগবলে) অধিষ্ঠিত হইয়া, অনুকম্পা প্রযুক্ত (সাংখ্য) তন্ত্র প্রকৃষ্ট রূপে বলিয়াছিলেন।" বোধ হয় ঈশ্বর-কৃষ্ণ তাঁহার বিরচিত শেষ কারিকায় এই বচনেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

অতঃপর দেখা যাউক, প্রাচীন ষষ্টিতন্ত্রে কোন্ কোন্ তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন স্মৃতি বর্ত্তমান কালেও বিদ্যমান আছে কি না।

(৩) ষষ্টিতন্ত্রের সূচিপত্র,—তত্ত্বসমাস।

ষষ্টিতন্ত্রের ষাটটি তন্ত্র যে কি কি ছিল তদ্বিষয়ে এ দেশের দুইখানি সাংখ্য গ্রন্থ—সাংখ্যদর্শন কিংবা সাংখ্য কারিকায় কিছুই স্পষ্ট বলা নাই। কিন্তু বারাণসী অঞ্চলে তত্ত্ব-সমাস নামে যে একখানি অতীব সংক্ষিপ্ত সাংখ্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার বৃত্তি ষষ্টিতন্ত্রের ষাটটি তন্ত্র সম্বন্ধে জবাবদিহি করিয়াছে। বৃত্তিকার

* মহাভারত—১২।২১৮।১৬ টীকা।

সূত্র ধরিয়া দেখাইয়াছেন, ৬০ তন্ত্র = ১০ মৌলিকার্থ + ৮ সিদ্ধি + ৯ তুষ্টি + ২৮ অশক্তি + ৫ অবিদ্যা। অর্থাৎ কারিকায় যাহাকে 'প্রত্যয়-সর্গের পঞ্চাশৎ ভেদ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা, এবং দশ মৌলিক অর্থ (Fundamental topics of Sankhya) এক সঙ্গে মিলিয়া ষষ্টিতন্ত্রের ষাটটি তত্ত্ব হইয়াছিল।

এই তত্ত্বসমাসের পুরাতত্ত্ব লইয়া আবার পণ্ডিতে পণ্ডিতে দারুন মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। Max Muller সাহেব বলিতে চাহিয়াছিলেন—"The Tatwa samasa is the oldest record that has reached us of the Sankhya Philosophy * কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ডাঃ কীথ সাহেব সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন, না,—তত্ত্বসমাস একদম নূতন গ্রন্থ, এবং ইহার রচনার তারিখ ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের পরেও হইতে পারে। †

কিন্তু আমাদের বোধ হয় Max Muller সাহেবের মতই পাকা মত। এবং Keith সাহেবের বিরুদ্ধতর্কের মধ্যে এমন কোনই অকাট্য যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে Max Muller সাহেবের মত ভ্রান্ত বলিয়া সংশয় উপস্থিত হইতে পারে।

Max Muller প্রধানতঃ বিজ্ঞানভিক্ষুর এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্বসমাসের প্রাচীনত্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন :—"তত্ত্বসমাস নামে যে সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শন আছে, তাহারই যোগ দর্শন এবং ষড়ধ্যায়ী (বৃহৎ) সাংখ্য দর্শন প্রকর্ষ পূর্ব্বক নির্ব্বাচন (= প্রবচন) বলিয়া, যোগদর্শন ও বৃহৎ সাংখ্যদর্শন একত্রে 'সাংখ্য প্রবচন' নামে অভিহিত হয়। ‡ মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে তত্ত্বসমাস কিংবা সাংখ্যদর্শনের নাম করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে যে যোগদর্শন 'সাংখ্য-প্রবচন' নামেও অভিহিত হয়। *

সাংখ্যের প্রচলিত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে একমাত্র এই তত্ত্বসমাসের মধ্যে ষষ্টিতন্ত্রের বিষয়-সূচির উল্লেখ থাকায়, আমাদের বিবেচনায় তত্ত্বসমাসের প্রাচীনত্ব দাবি বলবৎ সমর্থন লাভ করিতেছে। যে সব পণ্ডিতেরা অমনি এক 'আন্দে মৌন্দে' ভাবে বলিয়া থাকেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কোনও ধূর্ত্ত লিপিকার সাংখ্যকারিকা দেখিয়া এই তত্ত্ব-সমাস সূত্র লিখিয়া লইয়া তাহাকেই মূল কপিল-সূত্র বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—তাঁহাদের পাণ্ডিত্য সর্ব্বথাই উপেক্ষণীয়। কারণ, এই তত্ত্বসমাসে এমন অনেক তত্ত্বের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাহার নাম পর্য্যন্তও কারিকা, কিংবা সাংখ্য দর্শনে নাই। কোন্ পণ্ডিত সাংখ্য দর্শন কিংবা কারিকা পাঠ করিয়া বলিতে পারেন, সাংখ্য বিহিত 'পঞ্চ কর্ম্মযোনি' কিংবা 'পঞ্চ কর্ম্মাত্মা' কিংবা 'পঞ্চ অভিবুদ্ধি' কিংবা 'ত্রিবিধ বন্ধ' কিংবা 'ত্রিবিধ মোক্ষ' কিংবা, 'দশ মৌলিকার্থ' কি ? মনে রাখিবেন তত্ত্বসমাসের সূত্র সংখ্যা মোটে চব্বিশটি মাত্র, এবং তাহার মধ্যে এতগুলি সূত্রের বিষয়ের, কারিকায় প্রায় কোনই উল্লেখ নাই। তথাপি কারিকা দেখিয়াই তত্ত্ব-সমাস লেখা, এই কথা পণ্ডিতের উক্তি বলিয়াই আমাদের মানিতে হইবে। ডাঃ Keith অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তত্ত্বসমাসকে কারিকার সূচি-পত্র বলা কিছুতেই সাজে না। তবুও তিনি বলিতেছেন—"It (The Tatwsamasa) represents one of the several forms ofarranging sankhya principles, of which another is preserved in the Sastitantra list of topics." †

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাঃ Keith এটা লক্ষ্য করেন নাই যে কারিকার চীনা টীকা যে "Sastitantra list of topccs" দিয়াছেন, এবং বাচ-

* Six Systems, pp, 242

† A, B, Keith's Sankhya System pp, 91

‡ সাংখ্যদর্শনভাষ্য ভূমিকা

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে পাতঞ্জলদর্শন

† Sankhya System, pp. 91

স্পতি মিশ্র কৌমুদী ভাষ্যে যে 'list' অবিকলভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ঠিক সেই 'list'ই তত্ত্বসমাস সূত্রের মধ্যে নিহিত হইয়াছে।' এবং ১৪ সংখ্যক তত্ত্বসমাস সূত্র হইতে ১৮ সংখ্যক তত্ত্বসমাস সূত্র পর্য্যন্ত, পর পর পড়িয়া যাইলে আমরা সেই 'Sastitantra list of topics'ই পাইয়া থাকি। অতএব তত্ত্বসমাস যে "Form of arranging sankhya principles," 'represent' করিতেছে তাহা ষষ্টিতন্ত্রেরই 'Form' এবং কেবল মাত্র ষাটটি তত্ত্বের উল্লেখ হইতেও তাহা কোনও ব্যাপক 'Form'।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন তত্ত্বসমাসকে সাংখ্য বলা যায় না, তাহা সাংখ্যের সূচিপত্র মাত্র। ইহা আমরা একশ' বার মানি। কিন্তু তাহা কোন্ সাংখ্যের সূচিপত্র? অবশ্যই তাহা কারিকার সূচিপত্র নহে, কিংবা সাংখ্য দর্শনেরও সূচিপত্র নহে। অতএব তাহা কোনও লুপ্ত সাংখ্যের সূচিপত্র হইবে। এক লুপ্ত সাংখ্যের নাম হইতেছে ষষ্টি-তন্ত্র এবং দ্বিতীয় লুপ্ত সাংখ্যের কোনই স্মৃতি বা উল্লেখ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। অতএব ইহা মনে করা কি সঙ্গত নহে যে তত্ত্বসমাস ষষ্টিতন্ত্রেরই সূচিপত্র?

ইহাতেও হয়ত কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, বলিবেন তত্ত্ব-সমাসে শুধুই ত' আর ষষ্টিতন্ত্রের নির্দ্দেশ নাই, ইহার মধ্যে পঞ্চবিংশতি সাংখ্য তত্ত্বেরও ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে, অভিব্যক্তিবাদেরও উল্লেখ আছে, বন্ধ মোক্ষের ভেদ সকলের সংখ্যার উল্লেখ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ইহাকে ষষ্টিতন্ত্রের সূচিপত্র বলি কি করিয়া?

উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি—সাংখ্যের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা বিভাগ, উপবিভাগ এবং অবান্তর বিভাগ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। এ মতে তাহার মূল গ্রন্থে ষাটটি মাত্র প্রধান অংশ বা ভাগ (parts) থাকিলেও সেই সকল ভাগ যে পর্ব্ব, অধ্যায়, কাণ্ড প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল না এ কথা বলা যাইতে পারে না। পঞ্চরাত্র দর্শনের একখানি গ্রন্থে যে ষষ্টিতন্ত্রের ফর্দ্দের কথা ডাঃ Keith উল্লেখ করিয়াছেন—তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই ষষ্টিতন্ত্র দুই কাণ্ডে বিভক্ত ছিল—এবং তাহার প্রথম কাণ্ডের নাম ছিল 'প্রকৃতি' এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম 'বিকৃতি'। আমাদের তত্ত্ব-সমাসেরও প্রথম সূচি-সূত্র হইতেছে "প্রকৃতি অষ্ট" এবং দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে "বিকৃতি ষোড়শ।" এইরূপে ষষ্টিতন্ত্রের কাণ্ড, অধ্যায়, পর্ব্ব প্রভৃতির শিরোনামা ও (Headings) তত্ত্ব-সমাসের মধ্যে আছে ইহা মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট হেতু আছে। বর্ত্তমান কালের সূচিপত্রও এইরূপই হইয়া থাকে।

ইহা ইহাতে আমাদের মনে হয়, তত্ত্বসমাসই সাংখ্যের আদিম বীজপুট। এবং আদি বিদ্বান্, আদিতে এই বীজ-পুটের মধ্যেই সাংখ্য জ্ঞানকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাংখ্যবীজকেই আসুরির চিত্তক্ষেত্রে, অনুকম্পার অমৃতধারায় তিনি প্রথম অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। এই অঙ্কুরই পঞ্চশিখ প্রমুখ শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে বিশাল বনস্পতি রূপে পরিণাম লাভ করিয়াছিল। এই বনস্পতিই ষষ্টি যোজন ব্যাপ্ত, ষষ্টি সহস্র পল্লব বিভূষিত, ষষ্টিতন্ত্রের বিপুল ক্রমায়তন রূপে পরিণাম লাভ করিয়া, অবশেষে কালের অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সাংখ্য কারিকা ও সাংখ্য দর্শন তাহারই শিষ্যপরম্পরা-আগত ঐতিহ্য ও স্মৃতি। এবং তাহারই কাণ্ড, শাখা প্রশাখার এক তালিকা এই সংক্ষিপ্ত তত্ত্বসমাসের মধ্যে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রাচীন সাংখ্য বিদ্যা যে ষাটটী বিষয় বা তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিল তাহার মধ্যে পঞ্চাশটি তত্ত্ব ব্যবহারিক (practical) মনতত্ত্ব বিদ্যার অনন্ত খুটীনাটী লইয়াই কাটাইয়াছিল। এবং মাত্র দশটি তত্ত্বে তাহার মৌলিক অর্থ (fundamental theories) সকলের বিচার হইয়াছিল। ইহাতে আমাদের সহজেই মনে হইতে পারে, মানসিক ভাব সকলের এইরূপ ভেদ, তস্য ভেদ, আবার তস্য ভেদের 'কুচ কটালে' ব্যাপার হইতে সাংখ্যের অবশ্যই কোন 'ফায়দা' বাহির হইয়াছিল। এবং তাহা সে সমগ্র

তন্ত্রের মধ্যে প্রায় সওয়া চৌদ্দ আনা স্থান দখল করিয়াছিল তাহারও গূঢ় কারণ আছে। বর্ত্তমান সাংখ্য তন্ত্রের বিষয়-সন্নিবেশ প্রথা নিশ্চয়ই ইহা নহে। সাংখ্যের কারিকাতেই বলুন, কিংবা দর্শনেই বলুন, সাংখ্যের মতবাদ (theory) কি, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি, এই সব বিষয়ই আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং বুদ্ধিসৃষ্টি বা প্রত্যয় সর্গের ভেদ সকলের বড় জোর উল্লেখ মাত্র হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যে এই সকল ভেদের উপর এক এক 'তন্ত্র' খাড়া করিবার কোন্ প্রয়োজন হইয়াছিল ?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে, আমাদের দেখা প্রয়োজন, সাংখ্য যখন এক জীবিত সাধন-বিদ্যা ছিল, তখন সাংখ্যের সাধনবিধি কি ছিল। সেই সাধন-বিধি মহাভারতকার পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন।

যাঁহারা মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় যথোচিত শ্রদ্ধা এবং ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারা অবগত আছেন যে মহাভারতের কালে এক বহুধা আচরিত বহুজন সেবিত জীবিত সাংখ্য-বিদ্যা বর্ত্তমান ছিল। এবং সেই বিদ্যা, যোগ ও সাংখ্য নামে দুই পৃথক বিদ্যালয়ে পৃথক ভাবে পঠন পাঠন হইত। এই দুই স্কুলের পড়ুয়ারা মুক্তি বা অপবর্গ নামে একই সাধারণ গন্তব্য স্থানে যাইতে চাহিতেন বটে, —"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে'—ইহা সত্য ভগবদ্বাণী বটে, তথাপি সেই সাধারণ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পথ দুজনেরই এক ও অভিন্ন ছিল না। তাহাদের দুজনের 'পন্থাভেদ' ও নিষ্ঠাভেদ বিভিন্ন ছিল। সেই নিষ্ঠাভেদ বা পন্থাভেদ হইতেছে—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥
—গীতা।

এবং সাংখ্যগণের 'ধারা' হইতেছে—

জ্ঞানেন পরিসংখ্যায় সদোষান্ বিষয়ান্ নৃপ।
প্রাপ্নুবন্তি শুভং মোক্ষং সূক্ষ্ম ইব নভঃপরম্॥
মহাঃ—১২।৩০১।৪-১৭

সূক্ষ্মবুদ্ধি সাংখ্যেরা জ্ঞানের দ্বারা সদোষ বিষয় সকলকে পরিসংখ্যা করিয়া, 'আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম মোক্ষকে লাভ করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ তাঁহাদের বিশেষ নিষ্ঠা ভেদ ও সাধনা পদ্ধতি হইতেছে—"জ্ঞানের দ্বারা সদোষ বিষয় সকলের পরিসংখ্যা।" এবং যোগগণের বিশেষ নিষ্ঠাভেদ হইতেছে, কেবল সেই "পরিসংখ্যা" নহে কিন্তু—

রাগং মোহং তথা স্নেহং কামং ক্রোধঞ্চ কেবলং।
যোগাৎ ছিত্ত্বা ততঃ দোষাণ্ পঞ্চৈতান্ প্রাপ্নুবন্তি তৎ॥
মহাঃ—১২।৩১১।১১

—রাগ মোহ, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ এই পঞ্চদোষকে কেবলমাত্র যোগবলের দ্বারা ছেদন করিয়া, তাহা হইতেই যোগেরা সেই মোক্ষকে লাভ করিয়া থাকেন।"

অর্থাৎ সাংখ্যের পন্থা ও নিষ্ঠাভেদ হইতেছে তত্ত্ব আলোচনা। এবং সেই আলোচনা হইতেছে কাম ক্রোধাদি সদোষ বিষয় লইয়া। সেই সকল দোষাক্রান্ত মনোভাব সকলকে গণনা ও পরিসংখ্যা করা, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ নির্দ্ধারণ করা, তাহাদের কার্য্যকারণ অবধারণ করা, তাহাদের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির ক্রম নির্দ্ধারণ করা, তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য অবধারণ করা প্রভৃতিই সাংখ্যের সাধনা কাণ্ড। এবং এই সাধনা কাণ্ডের অন্তর্গত হইয়াছিল ষষ্টি তন্ত্রের পঞ্চাশটি তন্ত্র,—"প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধিসৃষ্টির পঞ্চাশৎ ভেদ।" এই সকল ভেদকে স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম দ্বারা, ইহাদের গুণ দোষের তুলনার দ্বারা, অপবর্গের চিন্মাত্র জ্ঞানের তুলনায় ইহাদে আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা, ইহাদিগকে নানা শাখা প্রশাখা নানা বিভাগ ও উপভাগকে বিশ্লেষণ দ্বারাই সাংখ্যের তত্ত্ব জ্ঞানের

বিকাশ হইত। এবং অবশেষে সেই "জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ"—তাঁহার লাভ হইত। এই জন্তই মহাভারতকার অন্তত্র বলিয়াছেন—"প্রতক্ষহেতবঃ যোগাঃ, সাংখ্যাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়াঃ।"—যোগেরা ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সাক্ষাৎ ফলপ্রদ হেতু অবলম্বন করেন—কিন্তু সাংখ্যেরা শাস্ত্র ও বিচার দ্বারা নিশ্চয় বুদ্ধিলাভ করেন। কাযেই যে শাস্ত্র সাংখ্যকে নিশ্চয় বুদ্ধি দান করিবে, সেই শাস্ত্র প্রধানতঃ "সদোষ বিষয়-সকলের পরিসংখ্যায়" লইয়া ব্যাপৃত হইবে ইহা কিছু বিচিত্র কথা।

এইরূপ ষষ্টিতন্ত্রের পঞ্চাশটি তন্ত্র যে এই সদোষ বিষয়ের পরিসংখ্যাতেই লাগিয়া ছিল—ইহা কোনই আশ্চর্য্য কথা নহে। কেননা ইহা যখন সাংখ্যের কর্ম্ম-কাণ্ড,-ও মানস-যজ্ঞের বিধান—ইহাই যখন তাহার অপবর্গলাভের রাজকীয় পথ,—তখন তাহার প্রয়োজনের তুলনায় তাহার রকম সওয়া চৌদ্দ আনার মর্য্যাদা কোনই অযথা মর্য্যাদা নহে।

এই ছিল পুরাতন জীবিত সাংখ্যের তন্ত্র সকলের বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু বৌদ্ধযুগের প্রতিক্রিয়া-কালে যে সাংখ্য পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিল, তাহার তন্ত্র সন্নিবেশ ব্যবস্থা অন্য প্রকার হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা আজ থাকুক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার

আঁধারের শিউলি

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মামী ত বলিয়া গেলেন মুকুলের কাছে সুভদ্রাকে লইয়া যাইতে, কিন্তু দেবকুমার বড় মুস্কিলে পড়িল। মামীর কাছে এতটা মিথ্যা বানাইয়া বলিতে পারিলেও, এতবড় একটা সাংঘাতিক সত্যকে ছলনায় ঢাকিয়া লইয়া মুকুলের সম্মুখে যাইতে দেবকুমারের পা উঠিতেছিল না। সে দূর হইতে মুকুল যে ঘরে ছিল সেই ঘর দেখাইয়া বলিল—"ঐ ঘরে যাও—সে আছে!" সুভদ্রার কাছে মুকুলের উদ্দেশে 'সে'র উল্লেখেই দেবকুমার কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—সে আর ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা করিল না।

মুকুলের সম্মুখে যাইতে সুভদ্রারও মনে প্রথমটা যেন কেমন একটা অপরাধী মনের সঙ্কোচ ভাব জাগিয়া উঠিল—কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। সে ভাবিল—"আমি ত আমার সমস্ত অধিকার এ জনমের মত ভাসিয়ে দিয়েছি—আমার কিসের সঙ্কোচ?" সুভদ্রা আপনাকে সংযত করিয়া নিঃশব্দে গিয়া মুকুলের ঘরে দাঁড়াইল। দেখিল, মুকুল একটি ঘুমন্ত শিশুর পাশে বসিয়া কি ভাবিতেছে—সে সরল সুন্দর মুখের সহজ আনন্দটুকু যেন ঈষৎ মলিন!—মুকুলের মূর্ত্তি দেখিয়া সুভদ্রার মনে একটা ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিল—"কেন?"

হঠাৎ সুভদ্রার দিকে দৃষ্টি পড়ায় মুকুল একটু চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা?"

সুভদ্রার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল—তাহার কণ্ঠে যেন ভাষা যোগাইল না—সে মুহূর্ত্ত-কাল নীরব হইয়া পরে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল—"আমি সুভদ্রা।"

মুকুল জিজ্ঞাসা করিল—"কোত্থেকে আসচ?"

"আপনার স্বামীর অনুগ্রহে এখানে এসেছি"—বলিতে গিয়া সুভদ্রার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। সে একটা

চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এখানে আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি। আমার অশৌচ—প্রণাম করতে পাল্লাম না।" মুকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—"কম্বলখানা আনি।" মুকুল কম্বল আনিলে সুভদ্রা তাহার হাত হইতে লইয়া নিজেই পাতিয়া বসিল।

মুকুল দেখিল সুভদ্রা সধবা, অথচ বলিতেছে নিরাশ্রয়া! মুকুলের আর একটা বিষয় আশ্চর্য্য ঠেকিতে লাগিল—এমন প্রতিমার মত রূপ, তবে স্বামী কেন বিরূপ? আরও অনেক প্রশ্ন মুকুলের মনে উঠিলেও, জিজ্ঞাসা করিতে কেমন সঙ্কোচ হইল। মুকুল ভাবিল, একটা কাযের ছলে গিয়া স্বামীর নিকট সব বুঝিয়া আসিবে। ঠিক সেই সময়ে নীচে দেবকুমারের কথা শুনিতে পাওয়া গেল। সে একবার ভাবিল, এখনি যাই। কিন্তু তখনি মনে হইল সেটা শোভন হইবে না। শেষে স্থির করিল, রাত্রে সব খোঁজ লইলেই হইবে!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মুকুল সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কি?"

সুভদ্রা বলিল—"বামুন।"

মুকুল আর একটা কি কথা "আপনি" দিয়া বলিতে যাইতেছিল সুভদ্রা বলিল—"আমাকে 'আপনি'র বদলে তুমি বল্লেই আমার মিষ্টি লাগে!"

মুকুল বলিল—"তুমি ভাই গোড়া থেকে 'আপনি আপনার' করতে আরম্ভ করলে, আমিই তাই করছিলাম—নয়ত আমারও তুমি ডাকই ভাল লাগে।"

সুভদ্রা মৃদুহাস্য করিল।

মুকুল ভাবিয়াছিল রাত্রে স্বামীর নিকট হইতে সুভদ্রার সম্বন্ধে সব খোঁজ লইবে কিন্তু তাহা হইল না। দেবকুমার মামীকে বলিল—"তাড়াতাড়ি আমার খাবার যোগাড়টা করে দিন!"

মামী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কেন, আবার কোনও নিরাশ্রয়ার সন্ধান পেয়েছ নাকি?"

দেবকুমার বলিল—"কি যে বলেন—তার মাথামুণ্ড নেই!"

মামী বলিলেন—"এত তাড়াতাড়ি কিসের শুনি?"

"থিয়েটার দেখতে যাব।"

"এই নটার সময়? কাল ত রবিবার—কাল নয় যেও!"

"আজ যে আমাদের মলিয়ের দাহিয় প্লে হবে—না গেলে ভারি চটবে—দুঃখ করবে!"

মামী বলিলেন—"তবে যাও—কখন আসবে?"

"মস্ত বড় প্লে—অনেক রাত্রে ভাঙবে—আজ আর বাড়ী আসচি না—কাছে শচীনদের বাড়ী আছে আশ্রয় নেওয়া যাবে।"

মামীমা আবার হাসিয়া বলিলেন—"আজ খালি আশ্রয় দেওয়া নেওয়ারই পালা দেখছি!"

দেবকুমারের মুখ ক্ষণেকের জন্য লাল হইয়া উঠিল! মামী সেটুকু লক্ষ্য করিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

সে রাত্রে দেবকুমার বাড়ী আসিবে না জানিয়া মামী মুকুলের ঘরেই সুভদ্রার শুইবার ব্যবস্থা করিলেন। সুভদ্রার অশৌচ, সুতরাং নীচেই শুইল। মুকুলও সুভদ্রার শয্যার পাশে শয্যা পাতিল। সুভদ্রা বলিল—"এ কি ভাই! তুমি আবার নীচে বিছানা করতে গেলে কেন।"

মুকুল বলিল—"কাছাকাছি না শুলে গল্প করে ভাই সুখ হয় না!"

"তুমি বুঝি বড় গল্প করতে ভালবাস?"

মুকুল বলিল—"খুব!—কিন্তু এমন কপাল—শ্বশুরবাড়ীতে না আছে একটা 'যা' না আছে একটা ননদ!"

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—"আছেন কে?"

"থাকবার মধ্যে আছেন এক বুড়ো পিসশাশুড়ী, তা তিনি তাঁর নারায়ণ নিয়েই আছেন!"

মুকুল হঠাৎ অসাবধানে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"তোমার?"

সুভদ্রা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার?—কেমন করে বলব!"

মুকুল বিস্মিত হইয়া বলিল—"কেমন করে বলব মানে?"

সুভদ্রা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমি যে ভাই কখনো শ্বশুরবাড়ীর মুখো হতে পাইনি!"

মুকুল আরও আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া বলিল—"কি রকম? তোমার স্বামী?"

"বিবাহের পরই আমায় ত্যাগ করেছেন!"

মুকুলের মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া বিমর্ষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ত্যাগ করলে কেন?"

মুকুলের সেই সন্দিগ্ধ কুঞ্চিত দৃষ্টিতে সুভদ্রার প্রাণে বড় বাজিল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"কেন তা ঠিক জানি না—তবে বাবার সঙ্গে তাঁর কথাই ছিল—আমায় ত্যাগ করবেন।"

"তবু তোমার বাবা রাজী হলেন?"

"বাবা রাজী না হয়ে তাঁর আর উপায় ছিল না!"

"উপায় ছিল না, সে কি ভাই?"

"সত্যি-ই ভাই তাঁর উপায় ছিল না—নইলে এমন করেন?"

মুকুল ম্লানমুখে বলিল—"কি জানি—এমন কখন শুনিনি!

সুভদ্রা বলিল—"আর যেন কারুর এমন শুনতেও না হয়।"

মুকুল বলিল—"ভাই তোমার সব কথা একদিন খুলে বলবে?"

সুভদ্রা কোন জবাব দিল না। কেবল মনে মনে বলিল—"হায়; জান না, তো তোমার পক্ষে সে কথা কত সাংঘাতিক!"

মুকুল সুভদ্রাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া বলিল—"কি ভাই চুপ করে রইলে যে? কোন বাধা আছে?"

সুভদ্রা এ কথার উত্তরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল দেখিয়া মুকুল ভাবিল, সুভদ্রা নিজের অদৃষ্ট-স্মরণে এই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বলিল—"থাক, বাধা থাকে ত পীড়াপীড়ি করচি না।" সুভদ্রা তখন ভাবিতেছিল—"ভগবান, এ কি করলে? কেন আমাকে এ বেচারীর সুখের কাঁটা করে এখানে পাঠালে? যদি কোনদিন এ ছদ্ম আবরণ খসে যায়—যদি কোন দিন দুর্ব্বলতার বশে জানিয়ে ফেলি আমি কে—হায় হায় কি হবে তা হলে! নিজের সুখে তো জলাঞ্জলি দিয়েছি, পরের শান্তি-টুকুও কি বজায় থাকতে দেব না!"

হঠাৎ সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা ভাই কত দিন এখানে থাকবে?"

মুকুল বলিল—"ওঁর শরীরটা একটু সারলেই যাব—তুমি—"

সুভদ্রা মুকুলের অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁর (কথাটা বলিয়াই সুভদ্রা থতমত খাইয়া গেল)—কি অসুখ?"

মুকুল সুভদ্রার সে বিচলিত ভাবটা অত লক্ষ্য করে নাই। সে সুভদ্রার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"ডাক্তারে বলে কি মনের অসুখ—একবার কাশীতে বেড়াতে গেছলেন, সেখান থেকে আসার পর থেকেই"—

"সুভদ্রা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আমার মাথাটা বড় ব্যথা করছে, পিছন ফিরে শুলাম—আলোটা বড় চোখে লাগচে—কিছু মনে করোনা ভাই!"

মুকুল বলিল—"তোমার গলাটা ভার ভার ঠেকচে, সর্দ্দি হবে বোধ হয়!"

সুভদ্রা উত্তর করিল—"হবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মুকুল স্বামীকে বলিল—"তুমি বেশ যা হোক্! আমি কত আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকে সব শুনবো, ওমা; তুমি কি না সুট করে থিয়েটার দেখতে চলে গেলে! যা রাগ হয়েছিল তোমার উপর!"

দেবকুমার বলিল—"কেন, যার খবর জানতে চাও তাকে ত হাতের কাছে পেয়েছিলে, তার কাছ থেকেই ত জানতে পারতে—আমি ত আর তার চেয়ে বেশী বলতে পারতাম না!"

মুকুল বলিল—"জিজ্ঞেস করেছিলাম—সে তেমন খুলে কিছু বলতে চায় না!—তার মুখের কাতর ভাব

দেখে তাকে আর বেশী পীড়াপীড়ি করতেও ইচ্ছা হল না।"

দেবকুমার মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"তা পীড়াপীড়ি কর নি ভালই করেছ—আর কিছু জিজ্ঞেস করো না!"

মুকুল বলিল—"তা তো করব না, কিন্তু তুমি কি জান বল!"

দেবকুমার তখন শ্মশানে সুভদ্রার বিপন্নাবস্থার ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বলিল। সুভদ্রা যে তাহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল এবং আসিবার সময় গাড়ীতে যে কথা হইয়াছিল তাহা চাপিয়া গেল। সুভদ্রার পূর্ব্ব-ইতিহাস যে দেবকুমারের একরূপ অজ্ঞাত তাহাও বলিতে ছাড়িল না।

মুকুল স্বামীর এই অনভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া সাগ্রহে বলিল—"আহা ওর স্বামী আছে, কিন্তু কখনো স্বামীর ঘর করতে পায় নি—বিয়ে করেই ত্যাগ করেছে—ঐ রকম নাকি ওর বাপের সঙ্গে কথা ছিল!—এও কি সম্ভব—হ্যাগা?"

দেবকুমার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"অসম্ভব এ সংসারে কিছুই নেই!"

মুকুল গভীর দুঃখে বলিয়া উঠিল—"মাগো কি নিষ্ঠুর!"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"নিষ্ঠুর কাকে বলছ—বাপকে—না স্বামীকে?"

মুকুল ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"দুজনকেই বলছি!"

দেবকুমার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"প্রকৃত ঘটনা কিছুই জান না, অথচ দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেল্লে!"

মুকুল দৃঢ়তার সহিত বলিল—"ঘটনা যাই হোক—তা কিছু এমন গুরুতর হতেই পারে না যার জন্যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করবে!"

দেবকুমার বাধা দিয়া বলিল—"তবে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন কেমন করে?"

মুকুল হাসিয়া বলিল—"সে না হয় রাজ-কর্ত্তব্যের অনুরোধে!"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল—"কর্ত্তব্য শুধু রাজ-রাজড়ার কুঠিতেই পরওনা জারি করে তা নয়, সে গরীবের কুঁড়ে ঘরেও এসে হাজির হয়!"

মুকুল বুকভাঙ্গা স্বরে বলিল—"এমন কি সে কর্ত্তব্য যার জন্যে মানুষ ত্যাগ করবার কড়ারে বে' করে, আর বাপ হয়ে সেই কড়ারে বিয়ে দিতে রাজী হয়—তা'র চেয়ে বিয়ে নয় নাই হত!"

দেবকুমার একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা হলে যে আবার জাত থাকে না।"

"আর ছুটো মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিয়ে হাঁকিয়ে দিলেই বুঝি জাত রক্ষে হয়?—এই, আজ যদি তুমি না গিয়ে পড়তে, তবে ও বেচারী কি বিপদেই না পড়ত? তখন জাত মাত থাকৃত কোথায়?"

"তাইত মনে হয়, এ বিশ্বসংসারের উপর একজন বিধানকর্ত্তা আছেন—তিনি যেখানে যাকে দরকার তাকে পাঠিয়ে দেন।—নয়ত আমার সঙ্গে বা হঠাৎ দেখা হবে কেন?"

"তা যদি থাকেন, তবে বিয়ে না হলেও তিনি ওর জাতরক্ষা কর্ত্তেন!"

"তা কর্ত্তেন। কিন্তু বিয়ে না হলে সমাজের চোখে জাত যায় যে!"

মুকুল ব্যঙ্গকুটিল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"ধন্যি তোমার সমাজ!"

এদিকে মামী সুভদ্রার আনার পর হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, দেবকুমারের মুখ হইতে সে বিরস অবসাদকালিমা যেন অনেকটা ধুইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটায় তিনি সুখীও হইলেন, আবার একটা অস্বস্তিও চোরা কাঁটার মত তাঁর বুকের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে মুকুল মামীর ছোট ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইতেছিল, আর ভাঁড়ারের খোলা ছাদে বসিয়া সুভদ্রা ও মামীতে তেঁতুল কাটিতেছিলেন। কি একটা কথায়, সুভদ্রা কাশীর উল্লেখ করিল। মামী জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি—"কাশী গেছলে নাকি?"—সুভদ্রা

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সেইখানে গিয়ে আমার বে' হয়।"

সুভদ্রার সম্বন্ধে দেবকুমার তাহার মামীকে যতটুকু বলিয়াছিল, তাহার বেশী জানিবার বাসনায় তিনি এ পর্য্যন্ত সুভদ্রাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। সামান্য কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য নিরাশ্রয়া দুঃখিনীকে তাহার দুঃখের কাহিনী আবৃত্তি করাইয়া তাহার অতীত বেদনাকে জাগাইয়া তুলিবার নির্ম্মম আগ্রহ তাঁহার কখন হয় নাই। কিন্তু আজ কয়দিন হইতে যে একটা অস্বস্তি তাঁহাকে নিয়ত বিঁধিতেছিল—সেটার একটা যথার্থ কারণ আছে কিনা জানিবার উদ্দেশ্যেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে তোমাদের কেউ আছেন?"

"না,—আমরা এক পাণ্ডার বাড়ীতে উঠেছিলাম।"

"কাশীর পাণ্ডাগুলো শুনেছি বড় বদ্।"

সুভদ্রা বলিল—"আমরা যাঁর বাড়ীতে ছিলাম—তিনি বড় ভাল—"

মামী অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—"তাই নাকি? —তার নাম?"

সুভদ্রা তাঁহার নাম বলিতেই মামীর মুখখানা ক্ষণেকের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল—তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত সুভদ্রার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। সুভদ্রা বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি মামীমা?"

মামী কথাটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"চুপ কর—বাইরে কে যেন ডাকচে!"

"কৈ—না!"

মামী বলিলেন—"আমার মনে হ'ল—কে যেন ডাকচে!" এই বলিয়া মামী নিবিষ্ট মনে তেঁতুল কাটিতে লাগিলেন।

সুভদ্রা ভাবিল, মামী কাহার কণ্ঠস্বর অনুমান করিবার জন্যই এইরূপ উৎকর্ণ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দেবকুমার বলিল—"আমিও তো তাই বলেছিলাম আপনার আশ্রয়েই থাকবে, কিন্তু ওদিকে যে নেহাৎ জেদ্ করচে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে।"

মামী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওদিকে মানে?—মুকুল?"

দেবকুমার সংক্ষেপে উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

মামী বলিলেন—"তোমার কি মত?"

দেবকুমার বড় মুস্কিলে পড়িল। যদি বলে, "সুভদ্রা আপনার কাছেই থাক", তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে সুভদ্রার যাওয়া না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু সেটা দেবকুমার—মুখে যাই বলুক—মোটেই চাহেনা। অথচ সুভদ্রার মতে তারও মত—এটাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছিল না। অবশেষে বলিল—"এঁ্যা—আমার ত ইচ্ছে ছিল আপনার কাছেই—তা নিয়ে যেতে চাচ্চে—না—হয়—চলুক।"

মামী দেবকুমারের কথায় বাকীটুকু পূরণ করিয়া বলিলেন—"কি? চলুক!" তিনি দেবকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া খুব খানিকটা ধারাল হাসি হাসিয়া লইলেন। দেবকুমারের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—মামী তাহা ইচ্ছা করিয়াই লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন—"কিন্তু সুভদ্রা যে নিজেই যেতে নারাজ!"

হঠাৎ দেবকুমারের মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, সে নিজেকে যথাসাধ্য সামলাইয়া লইয়া সহজ সুরে বলিতে চেষ্টা করিল—"তবে আর মতামতের দরকার! কেউ যদি যেতে না চায় তাকে পীড়াপীড়ি করে কায কি?"

কথাটা শেষ হইতে একটা ছোট্ট চাপা নিশ্বাস কিছুতেই দেবকুমারের শাসন মানিল না। দেবকুমারের অবস্থা দেখিয়া মামীর হাসিও পাইল দুঃখও হইল, শেষটা দেবকুমারের উপর রাগ হইল—পরস্ত্রীর প্রতি তার এ কি অন্যায় অনুরাগ! এ ত ভাল লক্ষণ নয়! তিনি দেবকুমারের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—"কাল যে যাবে বলছ—কাল ত দিন ভাল নয়—আমি—"

দেবকুমার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"না হক্ গে ভাল—"

মামী মনে মনে হাসিলেন এবং হঠাৎ এই বিরক্তির হেতুটা যে কি তাহা বুঝিতে তাঁর বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন—"না, দিন একটা দেখে যেতে হবে বৈকি!"

"যা ইচ্ছে হয় করুন" বলিয়া দেবকুমার সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দেবকুমার চলিয়া গেলে মামী মনে মনে বলিলেন—"এ নিশ্চয়ই কাশীর সেই ছুঁড়ি—কোথা থেকে আপদ এসে জুটলো দেখ!"

এদিকে দেবকুমার মামীর কাছ হইতে আসিয়া সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সুযোগও একটা শীঘ্র মিলিল। মুকুল মামী-শাশুড়ীর সঙ্গে সংসারের কাজে ব্যাপৃত এবং সুভদ্রা উপরের ছাদে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছিল, তখন সহসা সেখানে দেবকুমার গিয়া উপস্থিত হইল। সুভদ্রা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"এ কি?—না-না তুমি নীচে যাও—কেউ এসে পড়লে—"

দেবকুমার বাধা দিয়া বলিল—"কেবল একটা কথা বলতে এসেচি।" সুভদ্রা আরও চঞ্চল, উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল—"কি?"

"তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?"

সুভদ্রা গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"না।"

দেবকুমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মুহূর্ত্তের ভুলে যে অপরাধ করে ফেলেচি—তার কি ক্ষমা নেই সুভদ্রা—স্ত্রীর কাছেও নেই?"

সুভদ্রা অশ্রুসংযত স্বরে কহিল—"না, না—সে তুমি ঠিকই করেছিলে, আর তোমার কাছে অকপট মনে বলচি—তার জন্যে আজ একটুও আমার অভিমান নেই!"

"তবে তুমি যাবে না কেন?"

"আমায় ক্ষমা কর—আমি আমার জন্যে অপরের সুখ শান্তি জ্বালিয়ে দিতে পারব না।"

"কেন তোমারও কি সেখানে কোন দাবী নেই?"

"কোনও দাবী নেই।"

"কেন, তোমাকে কি বিয়ে করিনি—"

"করেছ—দয়ার অনুরোধে!"

"শুধু—দয়া?"

"তার বেশী আর কিছু থাকতে পারে না।"

"সেই একদিনের চিঠিতে কি আমাকে তোমার চোখে এত প্রেমহীন করে তুলেচে?"

"সে প্রেমে সুভদ্রার কোন দাবী থাকতে পারে না!"

দেবকুমার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভালবাসা যে বুক চিরে দেখাবার নয়!"

সুভদ্রা তীব্র দৃষ্টিতে দেবকুমারের পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি একথা আন্তরিক বলছ?"

দেবকুমার আবেগভরে বলিল—"বুকের ভালবাসা মুখ দিয়ে বোঝাব কেমন করে!"

সুভদ্রা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"আমি ভাবতাম দিদি বড় ভাগ্যবতী!—এখন দেখচি আমার চেয়েও তার কপাল ভাঙা—ছলনার চোরা-বালিতে সে দাঁড়িয়ে আছে!"

"কেন সুভদ্রা, এক আকাশে কি দুটি তারা ফোটে না, এক সাগরে কি দুটি নদী মেশে না—"

দেবকুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সুভদ্রা বলিল—"রক্ষা কর—থাম! দিদির মত স্ত্রী যার, তার মুখে ওগুলো বড় নিষ্ঠুর, বড় কদর্য্য শোনায়।"

দেবকুমার বলিল—"আশ্চর্য্য!—মুকুল তোমায় কি মন্ত্রে যাদু করেছে জানিনে!"

সুভদ্রা বলিল—"তার চেয়ে আরও আশ্চর্য্য নয় কি, যে, তুমি তার স্বামী হয়ে সেই মন্ত্র কি জান না!"

সুভদ্রার মুখরতায় দেবকুমার ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল—বলিল—"আর আমায় জেনে কাষ নেই! এখন তোমার মত শুনি—আমার সঙ্গে যাবে কি না?"

এবার সুভদ্রা ম্লান নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া

বলিল—"আর যা বল সব পারব—কেবল ঐটি ক্ষমা কর!"

দেবকুমার অভিমানের সুরে বলিল—"আসল কথা বল—তুমি আমায় ভালবাস না!"

সুভদ্রা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দেবকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি, যাবে?"

সুভদ্রা পূর্ব্বের মত তেমনি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"তোমার পায় পড়ি—আমায় ক্ষমা কর!"

দেবকুমার তীব্র অভিমানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

সুভদ্রা ছাদের উপর বক্ষ চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল! জাগিয়া দেখিল মামী বলিতেছেন—"ওমা! রোদে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ? চোখ মুখ অমন টস্‌টস করছে কেন?"

সুভদ্রা ভারি গলায় বলিল—"সর্দ্দি মতন হয়েছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সেদিন বুকের মধ্যে কি তুমুল ঝড়ই না লইয়া সুভদ্রা বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করিল। সে যেন আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া সমুদ্রের কূলে বসিয়া শুষ্ক নৈরাশ্যে প্রতি মুহূর্ত্ত দগ্ধ হইতেছিল। সুভদ্রার আমিত্ব বলিল—স্বামীর প্রেম বারবার এমন করে প্রত্যাখ্যান করোনা-করোনা! সুভদ্রার 'মহত্ব'—ত্যাগের রুদ্রাক্ষমালা জপিতে জপিতে বলিল—নিজের সুখের আশায় অপরের সুখে আগুন দিও না! আমিত্ব বলিল—এ সংসারে কেউ ত তোমার দিকে চায়নি—তুমি কেন পরের দিকে চাইতে নিজের দাবী ছেড়ে দেবে? মহত্ব বলিল—দাবী কার?—তোমার না তার! আমিত্ব বলিল—সুভদ্রা, তুমিও তার বিবাহিতা পত্নী—সমান দাবী তোমার। মহত্ব বলিল—দাবী যদি সত্য থাকত, তবে এত সঙ্কোচে সংগোপনে থাকত না। তোমার দাবী চোরাই মাল ক্রেতার দাবীর চেয়ে একটুও বেশী নয়! এই বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে তাহার শরীর মন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সুভদ্রার মুখখানা বর্ষার মেঘে আকাশের মত বড় গম্ভীর বড় বিষণ্ণ দেখাইতেছিল!

আজ মুকুলদের দেশে যাইবার কথা। সুভদ্রা মুকুলের সহিত যাইতে অসম্মত শুনিয়া সে অভিমান করিয়া সুভদ্রার সহিত গতকল্য হইতে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। এই অভিমানের ভার লইয়া মুকুল যদি দেশে চলিয়া যায়, সুভদ্রার দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। তাই সে কি করিয়া মুকুলের মন হইতে অভিমানের বেদনাটুকু নামাইয়া লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে গিয়া কেবলই ব্যর্থকাম হইতেছিল। সুভদ্রার আজ প্রত্যেক কাযে ভুল হইতেছিল। মামী সুভদ্রাকে উপর হইতে একটা জিনিষ আনিতে বলিলেন, সুভদ্রা উপরে গিয়া নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি আনতে বল্লেন মামীমা!" মামী বলিলেন—"এই বড় আলুগুলো, দমের জন্যে কুটো, আর ছোট গুলো ঝোলের জন্যে নিয়ো।" সুভদ্রা বড় বড় বাছিয়া ঝোলের মত করিয়া কুটিয়া বসিয়াছে! উপরি উপরি এইরূপ ভুল হওয়ায় মামী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আজ এ কি হয়েছে তোমার?" সুভদ্রা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"কি জানি, মরণ হয়েছে আমার।" মামী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আজ সঙ্গীটি ছেড়ে যাচ্ছে বলে বুঝি"—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া যে বেদনা সুভদ্রার চোখে টল্‌টল্ করিতেছিল তাহা আর শাসন মানিল না। এই দৃশ্যে মামীর চক্ষেও অশ্রু ঘনাইয়া আসিল; তিনি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"তা মুকুলও ত কত পীড়া-পীড়ি করচে—যাওনা কেন তার সঙ্গে—যাবে?" সুভদ্রা ঘাড় নাড়িল। মামী মনে মনে হাঁফ ছাড়িলেন। তিনি সুভদ্রাকে কথাটা বলিয়াই ভাবিলেন—"এ কি করলাম! মুকুলের কতখানি অনিষ্টের সম্ভাবনা যে তাতে তা ভুলে যাচ্ছি!" সুভদ্রার অসম্মতিতে তিনি মনে মনে সুখী হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ আমারও ইচ্ছে নয়—পরের বাড়ীতে কে কোন্ দিন একটা কথা বলবে।" সুভদ্রার হৃদয়ের শীর্ষস্থল হইতে একটা গভীর নিশ্বাস

বাহির হইল—পরের বাড়ী! মামীর মনে হইল ঐ নিশ্বাসটা যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আর এ জায়গাটা?—আপনার? পরক্ষণেই সেই কল্পিত প্রশ্নের উত্তরছলে মামী বলিলেন—"যদি বল এও পরের বাড়ী—তা আমি বাছা তোমায় আর পর ভাবি নে।"

সুভদ্রা গাঢ়স্বরে বলিল—"আমিও কখনও ভাবি নি!"

বিদায়ের সময় মুকুল আর সুভদ্রার উপর অভিমান পুষিয়া রাখিতে পারিল না। মোট-ঘাট বাঁধা হইয়া সব প্রস্তুত; গাড়ীও আসিয়াছে। দেবকুমার বলিল—"মামীমা, আর বেশী সময় নেই।"

মামী ছলছল নেত্রে মালপত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"না, আর দেরী করে কি হবে—জিনিসপত্র-গুলো গাড়ীতে তুলে দেওয়াও!"

দেবকুমার মামীকে প্রণাম করিয়া, একবার চকিতে চারিদিকে চাহিয়া একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিল। মুকুল মামীশাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—"সুভদ্রা কি উপরে?"

মামী বলিলেন—"বোধ হয়।" তার পর সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন—"নীচে এস—মুকুলের সঙ্গে দেখা করে যাবে।" মুকুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তার আজ সকাল থেকে মুখখানা বিবর্ণ-বিমর্ষ—বোধ হয় মন-কেমন কচ্চে। এতদিনে ছুটিতে এক জায়গায় ছিলে কি না!—তা আমি বল্লাম না হয় দিন কতক তোমাদের সঙ্গে যাক—তা রাজী নয়!"

মুকুল একটা নিশ্বাস ফেলিল। দেবকুমার বিরক্তির স্বরে বলিল—"হ্যাঃ মন কেমন করছে না আর কিছু!—তা হলে আর—" বলিয়া দেবকুমার থামিয়া গেল। মামী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেবকুমারের মুখের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন—"এটা হচ্ছে অভিমান!"

সুভদ্রা নীচে আসিলে মুকুল তাহার কাছে গিয়া প্রভাতের চাঁদের মত তার সেই পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"তবে আসি।"

সুভদ্রা মুকুলকে নত হইয়া প্রণাম করিতে গিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুকুলেরও হৃদয়ের কাণায় কাণায় বেদনা টলমল্ করিতেছিল—সেও আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। মুকুল সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"এত ভাল বাসিস যদি তোর দিদিকে—চল না ভাই আমার সঙ্গে!—যাবি?"

অশ্রুপূত স্নেহের এ দৃশ্য দেখিয়া মামীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"আহা এত ভাব, যাক্ না সঙ্গে!"

মুকুল আবার বলিল—"যাবে সুভদ্রা?" মামী মুকুলের দিক হইতে বলিয়া ফেলিলেন—"আগ অত করে বলচে মুকুল!"

দেবকুমারের বুকের মাঝে আশা ও নিরাশার ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। সে যেন জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কি হয়—কি হয়।

দেবকুমারের সে ভাব মামীর চক্ষু এড়াইতে পারিল না। আবার তাঁর মনে গোল বাধিল—ভাবিলেন, "আবার এ কি কল্লাম?" আবার ভাবিলেন, "না, সুভদ্রা হতে মুকুলের আমার কিছু অনিষ্ট হবে না; সুভদ্রা এত বেইমান হবে না।"

তবু যাইবার সময় মামী মুকুলকে চুপি চুপি বলিল, "মনে থাকে যেন, আগুন সঙ্গে নিয়ে গেলে,—খুব সাবধান!" মুকুল বিস্মিত হইয়া মামীর দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু বুঝিল না, ভাল করিয়া বুঝিবার শক্তি ছিল না—তবু কিন্তু ঐ কথাটায় কেমন বিষণ্ণ হইয়া গেল।

দেবকুমারের আশ্রয়ে আসিবার মাসখানেক পরে সুভদ্রা একদিন মুকুলকে বলিল—"এখন দেখছি; এখানে না এলেই ভাল করতাম!"

মুকুল উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই, কি হয়েচে?"

"আমার ভাই এ রকম আরামের আসনে বসে-বসে নিত্যি ঠাকুরের মত নৈবিদ্যি ভোগ ভাল লাগে না! একটু কায করতে গেলে অমনি 'হা হা' করে আসবে, আর সকালে একবাটি মিছরির পানার

পর গণ্ডা-দুই সন্দেশের ব্যবস্থা করে, দশটা না বাজতে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খাইয়ে চারটার আগেই এক রেকাব জলখাবারের জুলুম। আবার দশটা বাজতেই এক গোছা ফুল্কো লুচির ফ্যাসাদ! এক-দিন সহ্য হয়, কিন্তু নিত্যি এই রকম! এ যেন ঐশ্বর্য্যের হাস্‌পাতালে হাত-পা-বাঁধা রোগী! বড় অশান্তি বোধ হয়!"

মুকুল হাসিয়া বলিল—"কি করব ভাই! তোমার ভগিনীপতির ব্যবস্থা।"

সুভদ্রার মনে হইল, তাহার বুকের ভিতরে কোথায় একটা বেদনা কাঁটার মত খচ্‌ করিয়া উঠিল। সে ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল—"তা কাষ করতে না দেওয়াটাও কি তাঁর ব্যবস্থা?"

মুকুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"না; ওটা আমার!"

সুভদ্রা বলিল—"মন্দ নয়—দুজনে মিলে বেশ ধনের আর মনের বিভব দেখাতে বসেছ! তিনি ভাবলেন আহা বেচারা বড় গরীব, পেটভরে দুটো ভাল জিনিষ খাক, আর তুমি ভাবছ আহা স্নেহের কাঙাল, ও কাষকর্ম্ম রেখে দুদিন আমার স্নেহ ভোগ করুক।"

মুকুল বলিল—"সত্যি সুভদ্রা, কেন জানিনে তোর জন্যে প্রাণ বড় কাঁদে। ইচ্ছে হয়—"

মুকুলের কণ্ঠ আর ফুটিল না! সুভদ্রা বলিল—"ইচ্ছে হয় কি?"

"ইচ্ছে হয় তোর ব্যথা আমি বুক দিয়ে তুলে নিই, তুই দুদিন সুখী হ!"

কথাটা বলিয়াই মুকুল মনে মনে শিহরিয়া উঠিল—উঃ কি ভয়ানক সে ব্যথা! সুভদ্রা হাসিয়া বলিল—"তুমি ইচ্ছে কল্লেই আমার ব্যথা নিতে এস কেন? আমার ব্যথার দাম্‌ নেই বুঝি?" পরে মুকুলকে সুভদ্রা মনে মনে উদ্দেশ করিয়া বলিল—হায়, কি ভুলে ঘেরা সুখের প্রজাপতি, আমার ব্যথার মূল্য কি দারুণ তা ত জান না!

ক্ষণকাল নীরব রহিয়া বলিল—"সত্যি ভাই, তোর ব্যথার কথা ভাবতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখি!"

সুভদ্রা বলিল—"আমি কৈ তা দেখি না। দেখতে পারলে বোধ হয় সুখী হতাম। এমন করে নিষ্ঠুর সত্যের আলোয় ঝলসাতে হত না!"

মুকুল একটা নিশ্বাস ফেলিল। সুভদ্রা বলিয়া উঠিল, "তা ও দুঃখের কথা চাপা দেও ভাই! ও এক-টানা নদী বারবার ফিরে দেখতে আর চাই না।—এখন যদি আমায় থাকতে দিতে চাও, এখানে আমায় অমন ঠুঁটো করে রাখলে চলবে না। মামীমা আমার বেশ! কেমন কাষকর্ম্মে লাগিয়ে দিতেন।"

মুকুল বলিল—"এখানে আর ভাই অমন বা কি কায যে তুমি না করলে চলবে না! আমাদের ত এই ক'জনের সংসার।"

সুভদ্রা বলিল—"কেন, এই ত বামুন ছেড়ে গেছে আর বামুন এনে দরকার নেই, আমি রাঁধতে বড় ভালবাসি।"

মুকুল এবার অভিমান ভরে সুভদ্রার পানে চাহিয়া বলিল—"দিদির ভাত গতর না খাটিয়ে খেতে আপত্তি আছে বুঝি?"

সুভদ্রা বলিল—"কিম্বা অজানা সুভদ্রার হাতের রান্না খেতে তার দিদির যে আপত্তি না আছে তাই বা কে বলে?"

মুকুল বলিয়া উঠিল—"হায় মানুষ ভাই, কাল থেকে তুই রাঁধিস।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

অবনীন্দ্রনাথ ও ভারত-শিল্প

ইহা চিত্রশালা—য়ুরুপের মধ্যযুগে Renaissance Epoch যে সমুদ্রমন্থন আনিয়া দিয়াছিল, সে মন্থনের ফলে ইন্দিরা হেমপাত্রে কুঙ্কুম লইয়া প্রথম ইটালীর ভালে রাজ-তিলক পরাইয়া দিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্রদীপ্তি ফরাসী প্রভৃতি দেশে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই Renaissance যুগের panorama দেখিয়া Symonds কহিয়া উঠিলেন, "They did by means of pictures what Dante had done by means of poetry"—এ কথা বড় সুন্দর কথা। ভগবানের বিভূতি লইয়া দুইটি লোক আসিয়াছিলেন—এক কবি এক চিত্রকর। কালের স্রোতে সময়ের প্রয়োজন-বোধে আর একজন ভাসিয়া আসিলেন—ইনি বক্তা। প্রতিভার এই তিন শিশু পৃথিবীর আলোকময় দিনের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের ভাব-রাজ্য গড়িয়া আসিয়াছেন; সহসা শব্দযোজনায় সহস্র কালির আঁচড়ে রাশি রাশি পাতার বুকে কবি আপনার ভাব আঁকিয়া দেন। একটী ভূর্জ্জ-পত্রে একটী তুলির টানে রামধনুর সপ্ত-বর্ণের হিল্লোলে শিল্পী তাঁহার অন্তরের গোপন-রাজ্যে যে বিশ্বের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে তাহার রূপ খুলিয়া দেন, অমনি সেই চিত্র 'চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্ব-যোগাৎ', হৃদয়ের প্রচ্ছদপট হইতে ধীরে ধীরে ভূর্জ্জ-পত্রের উপর যাইয়া চির-আশ্রয় লাভ করে। বক্তা সহস্র শব্দ-সংযোগে আপনার মনের ভাব জনগণের মনে অধিষ্ঠিত করেন। এইরূপে সাধনার ত্রিমূর্ত্তি জগৎ-সংসার ব্যাপিয়া চিরদিন প্রতিষ্ঠা পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শিল্পের সাধনা দুরূহ, কবি নিজের ভণিতা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন, কালিদাসের 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া রঘুবংশ আরম্ভ হইল, ভবভূতি সালঙ্কারে আত্ম-প্রশস্তি যোজনা করিয়া এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, যে এই কথাটা পর্য্যন্ত কবির মুখে বাহির হইল,

'যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌ বশ্যেবানুবর্ত্ততে।'

আমাদের যুগেও শুনিয়াছি 'রচিব মধু-চক্র গৌড়-জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' বক্তার সুবিধা আরও বেশী, শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে নিজের চেহারা লইয়া, বাজখাঁই গলা খুলিয়া 'কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি'র সুযোগ ত কবির ভাগ্যেও ঘটে না। সর্ব্বশেষ চিত্রকর; এ চিত্রসাধনা এমনই দুরূহ যে আত্মপ্রচারের আয়োজন এ পক্ষে অসম্ভব। ছবি আঁকিবে একখণ্ড কাগজে, নিজের নামটী লিখিবে এমন এক কোণে যে হেঁয়ালীর মত এ নামও সাধারণের চক্ষে প্রচ্ছন্ন রহিবে। মহাকবি কালিদাস উমার মাতৃরূপ যে ভাবে যে কালি কাগজ খরচ করিয়া ফুটাইয়াছেন, তাহা কি র‍্যাফেলের ম্যাডোনায় নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে বিকশিত হয় নাই? শিল্পীর সাধনা এক নির্ব্বাক স্তোত্র, প্রকৃতি কথা কহে না, কেবল রঙের ছাপে ছবি আঁকিয়া দেখায়, তাই চিত্রকর চিত্রে সে মৌন-সঙ্গীত ছড়াইয়া দেয়।

আমাদের ভারতবর্ষে এ তিনের সাধনা পূর্ণাঙ্গ হইয়া সুদূর অতীত হইতে ভারতীয় জ্ঞানের মুকুট রচনায় ব্যস্ত রহিয়াছে। এ মুকুটের মণি দেশান্তর হইতে গৃহীত হয় নাই, এ দেশের মাটীর ভিতরেই মণির উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্ম জাতি-জীবনকে এমনভাবে গঠন করিয়াছে যে, সে জাতির অঙ্গে বৈদেশিক আভরণ কুলক্ষণের মত ভাসিয়া উঠে—তেলজলের মত দু'ভাগ হইয়া থাকে। ভারতের ধর্ম্ম অন্তরের মণিদীপ হইয়া লোকের মনে দিবানিশি জ্বলিয়া থাকে—সে দীপাধারে পরের ঘরের জিনিস নিষ্প্রভ ঠেকে, তাই ভারত গ্রহণ-যোগ্য দেখিতে পায় নাই! গ্রীসের ধর্ম্ম, উপকথায় চলিয়া আসিয়া, হোমরের কাছে প্রথম সেই দেব-দেবী, তাঁহার কাব্যের পাতায় রূপ পাইল, আর Perikles এর যুগে Phidias এর হাতে সে দেব-দেবী কলা-শিল্পের সরোবরে স্বর্ণকমল

হইয়া ফুটিল, এই প্রথম গ্রীস দেব-দর্শন করিল, ইহার পূর্ব্বে সে সৌভাগ্য তার হয় নাই। হোমরের সময় হইতে দেব-দেবীর উপাখ্যান পাঠোপযোগী হয়, আর Phidiasএর যুগে সেই দেব-দেবী চিত্ররূপে গ্রীসিয়-দিগের নয়ন-পাতে সমুদ্ভাসিত হয়—যে দেব-চিত্র তাহাদের মানস-লোকে এতকাল ছায়ার মত কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তাহা মহাশিল্পীর অতুলনীয় হস্তস্পর্শে অনবগুণ্ঠিত হইয়া মধ্যাহ্ন-সৌরকরোদ্ভাসিত দিবালোকে অনবদ্য সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল। শিল্পীর স্বপ্নে গ্রীসের দেব-জগৎ Olympus হইতে নিম্নে অবতরণ করিল। এই নূতন সংসারের স্থষ্টিকর্ত্তা Phidias শিল্পী সর্ব্ব-প্রথম দেখাইল, 'এই দেবতা'—গ্রীস আনন্দে নাচিয়া উঠিল; যে দেবতার আবাস তাহারা অলিম্পাসের চূড়ায় গাড়িয়া রাখিয়াছিল; তাহারা নামিয়া আজ মানুষকে ধন্য করিয়াছে। তাই শিল্প-জগতে Phidias-'এর স্থান এত উচ্চে। তিনি যে শুধু শিল্পী নহেন, তিনি যে গ্রীসকে প্রথম দেবতা দেখাইয়াছেন। এথেন্স জানিত যে তাহাদের পুর-লক্ষ্মী ছিল—পেলাস্ এথেনী (Pallas Athene), তাঁহারই মুগ্ধ আঁখির দৃষ্টিতে এথেন্স উদ্ভাসিত, তাঁহার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির চমকে গ্রীসের চির-শত্রু পারস্য চমকিত, আর তাঁহার বরাভয়-মূর্ত্তির পুলকে এথেন্স পুলকিত। এমন নগর-রাণীকে তাহারা এতকাল স্বপ্নময়ী করিয়া রাখিয়াছিল, এত-দিনে শিল্পের সাধনায় সে স্বপ্নচারিণী দেবী অঙ্গসুষমায় ফুটিয়া উঠিল। গ্রীস দেখিল এ দেবী বটে, কারণ ইঁহার আলেখ্য মানুষের সঙ্গে বাহিরে খাপ খাইলেও মানুষের নহে, অমানুষী মূর্ত্তি ইঁহার দেহলতা ঘেরিয়া রহিয়াছে। এথেন্সের জনগণ-নায়ক Periklesএ দেবীর প্রতিমা স্থাপনের জন্য এক অভিনব মন্দির গড়িয়া তুলিলেন—ইহার নাম পার্থেনন্, এই দেবালয়ে দেবী প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা সমর অন্তে একদিন বাসন্তী-সূর্য্যের তলে মহামায়ার শ্রীময়ী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, পার্থেননের দেব-পাটে দেবীর সম্বর্দ্ধনায় তেমনি করিয়া গ্রীস নাচিয়া উঠিল। ইহার কিছুদিন পরে শিল্পীরাজ ইলিয়ানদিগের নিকট হইতে সোণার তাবিজে জড়িত এক আমন্ত্রণ পাইলেন। তাহারা অলিম্পিয়াতে চিত্রকরের সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া গেল। সেই গ্রীসের তীর্থভূমে ফিডিয়াস্ গড়িলেন জিয়সের (Zeus) মূর্ত্তি, উহার প্রতি অঙ্গ হোমরের সূর্য্যদেবের বর্ণনা পাঠে গঠিত হইল। এই মূর্ত্তি এক সোণার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় গ্রীসের শিল্প জন্মলাভ করিল। ইহা ক্ষুদ্র মানবের বিলাস-লাস্যের আনন্দে জন্মে নাই, পরন্তু জাতীয় জীবনের স্বপ্নময়ী আকাঙ্ক্ষার ফলে, সমস্ত জাতির প্রাণের পরশ লইয়া গ্রীসীয় শিল্প জন্মিল। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্পের ইতিহাস ইহা হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের পরশমণি ছোঁয়াইয়া ভারত আঁখির মত আঁখি পাইল, সে যোগ-লব্ধ, তপোবল-সিদ্ধ আঁখির দৃষ্টিতে দুমুঠা ভরিয়া আনিবার মত বিশ্ব-জগতে কিছু দেখিল না। বুঝিল বুঝি দুমুঠ খুলিয়া, 'মুঠো মুঠো করি লুঠিয়া ছড়ায়' এ বিতরণ-বন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্রোতে ভারতের চিত্র-দীপ পীত দেশের কূলে কূলে যাইয়া ঠেকিল, আঁধার চীন-জাপানের আঙ্গিনায় চিত্র-দীপালী জ্বালাইয়া তুলিল, স্বর্ণলঙ্কার তীর হইতে শিল্পীর সে ভাসান দীপ, ভারত-জলধি ছন্দে ছন্দে হিল্লোলিত করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সে আলোর দীপান্বিতায় ভরিয়া তুলিল। এ শিল্পের জন্মকথা জানা প্রয়োজন। ভারতের তপোবনে প্রভাতে সন্ধ্যায় যে হোমানল জ্বলিয়া উঠিত, আর উহার শিখার প্রতি শাখে যে কজ্জল ফলিত, তাহার মধ্যে আসন রচিয়া যোগ-নিদ্রায় যোগী ধ্যানস্থ হইয়া ভূর্লোকের চক্রবাল-রেখা ভেদ করিয়া ভুবর্লোকের ও স্বর্লোকের শীর্ষ পর্য্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছাইত, তাহার প্রখরতার দ্বারা নিদানসময় ভগবানের যে রূপ প্রত্যক্ষ হইত, উহার অবিকল প্রতিবিম্ব বেদের সূক্তে শ্লোকে শব্দে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই ধ্যানলব্ধ রূপের মূর্ত্তি ঋষিকুমারেরা পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। সংসার অঙ্গনে সে মন্ত্র জপ করিয়া আরণ্যক জীবনে আবার

সেই রূপ আত্মার মুকুরে ফলাইবার জন্য তেমনি করিয়া তাঁহারা পরম পুরুষের পার্শ্বে আসন পাতিয়া যোগানন্দ-লেখায় জীবনের যজ্ঞাগ্নি জ্বালিতেন—এই শিল্পত্ব দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎই উপনিষদ। প্রতি জীবনে, সাধনায় সেই মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইত। রামায়ণের কবি বল্মীকের অন্তরালে যাইয়া সংসার ছাড়িয়া অসীমে ডুব দিলেন, নারায়ণের যে রূপ দেখিতে পাইলেন, তাহাই চন্দ্রালোকের মত শ্রীরামচন্দ্রে ছড়াইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ এক গ্রীষ্মের অবকাশে লিখিয়া ফেলেন নাই। ভারতের বক্তা শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের সত্ত্বা নিজের জীবনে সংযোগ করিয়া তবে বৌদ্ধবিরোধী বক্তৃতার তরঙ্গে দেশ প্লাবিত করিয়াছেন। প্রতিভার এই দুই পুত্রের ন্যায় শিল্পী-তনয়ের সাধনা কি কম? ব্রাহ্মণ-যুগে (Pre-Buddhistic) যে শিল্পী ভূর্জ্জপত্রে শ্যামজলধর মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলেন, তিনি কি শাস্ত্রপাঠে শুধু সে রূপ জানিয়াছিলেন? যে চিত্রকর 'রুদ্ররূপ' তুলিত করিয়াছিলেন, তিনি কি কালো মেঘের ছায়া দেখিয়া সে রূপ দিয়াছিলেন? এ চিত্র-সাধনার জন্য তাঁহাকে তেমনি করিয়া যোগী হইতে হইয়াছিল, তাঁহাকে তপোবলের শক্তিমার্গে বিচরণ করিতে হইয়াছিল, যোগের স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া, তিনি নিজের ধ্যানচক্ষে যে বিশ্বেশ্বরের রূপ পূর্ণোজ্জ্বল দেখিতেন, তাহাই ধ্যানভঙ্গ হইলে চিত্ররূপে ফুটাইয়া তুলিতেন। এইখানে দেখিলাম ভারতশিল্প ধ্যানলব্ধ-ধর্ম্মের হৃদয়-সরোবরে এক অভিনব কনক-অরবিন্দাকৃতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঋষিপ্রচারিত ধর্ম্মের অন্তস্তলে এক মণিদীপের মত অবিনশ্বর দ্যুতিতে জল্ জল্ করিতেছে। গ্রীসীয় শিল্প ত ইহা নয়, ফিডিয়াস্ও এ পদ্ধতিতে শিল্প আঁকেন নাই। তাঁহার শিল্প দেব-দেবীর মূর্ত্তির খোঁজ লইয়াছে। প্রথম মানুষের মুখে গাল-গল্পে, তারপর বয়সের সঙ্গে তিনি যখন হোমরের বর্ণনা পড়িলেন, তখন মূর্ত্তির আকার-প্রকার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল হইল। তিনি ত ধ্যান করিয়া জানিতে চাহেন নাই দেবতার রূপ কেমন? হোমরও যোগী ছিলেন না—তবে ভাবুক ছিলেন। উপকথার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার মহাকাব্যে তিনি মনগড়া রূপ গড়িয়া দিলেন, এই রূপে দেব-দেবীর পত্তন হইল। গ্রীসের ধর্ম্মাধিনায়কের দেবরূপ ত তপোবল-লব্ধ নহে, সাধনার দ্বারা মিলে নাই, legend এ উহার উৎপত্তি, কল্পনার প্রভাবে রচনায়, শেষে চিত্রে উহার পরিণতি। ফিডিয়াস চিত্র গড়িলেন, গ্রীসের কেহ ধ্যান-সংযোগে তলাইয়া দেখিয়াছিল কি, ইহা ঠিক দেব-মূর্ত্তি কি না? তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল—দেবতা পাইয়াছে। কিন্তু দেবতা যে কেহ দিতে পারে না, পরন্তু প্রত্যেকের ধ্যান-নেত্রে উহা আপনি সমুদ্ভাসিত হইবে, তাহা ত তাহারা জানিত না। বুদ্ধদেবের ধ্যান-মূর্ত্তি যে শিল্পী অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তিনি ধ্যান-তন্ময় হইয়া সে মূর্ত্তির চিন্তা করিতে করিতে যেরূপ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই শেষে চিত্রে ফলাইলেন। তবে সে মূর্ত্তি হইল। ভারতে যাঁহার মধ্যে সেই ধ্যান-তৎপর আর্যরক্ত বিন্দুমাত্রও আছে, তিনি বুঝিতে পারিবেন, জগতের panorama-তে এ চিত্রের স্থান কোথায়? আজিকার দিনে যে বিলাসের দেবতাকে, পুণ্যশ্লোক ঋষিরা লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দেবতা সেই নিগড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার তরল জোয়ারে চারিদিক মাতাইয়া বিশ্ব ভরিয়াছে—এমন দিনে এ মূর্ত্তির কি আদর হইবে? ব্রাহ্মণ্য-চিত্রে চতুর্ভুজ বিষ্ণু, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখিয়া এ জগতে একটা শ্লেষের ইঙ্গিত চারিদিকে চকিতে খেলিয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? য়ুরোপের শত দরজা দিয়া উপেক্ষার হাসি এ ভারত-শিল্পকে ব্যঙ্গ করিতে তৎপর হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি জোর করিয়া বলিব না, ইহা রুচি-বিকার! ভারতের বেদে, বেদান্তে উপনিষদে শ্রীময় ভগবানের রূপ কত অভিনব চিত্রে না অঙ্কিত হইয়াছে—ঋষিরা শব্দের অলঙ্কারে ছন্দের মঞ্জরীতে কি নিটোল চিত্রই না অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন! হইতে পারে ব্রাহ্মণ্য চিত্র—আধুনিক Connoisseur ফোসের (Foucher) কথায় a clean

white sheet of paper, কিন্তু এই সাদা কাগজের আলিপনা কি বেদ-বেদান্তের অক্ষয় অনন্ত ভাবের বুকে চিরদিন দীপ্তিশালিনী হইবে না? হোমর হইতে যেমন ফিডিয়াসের কল্পনা পরিপুষ্ট হইল, নূতন জন্মলাভ করিল, সেইরূপ বেদের দশটী মণ্ডলে ভারত-শিল্পের সুতিকাগৃহ, সেই মানবের মহা-সঙ্গীতের বুকে ভারত-শিল্প অলক্ষ্যে চিত্রিত রহিয়াছে। বাল্মীকি ধ্যানান্তে সেই বেদ-জগৎ হইতে কাব্য-দীপ আনয়ন করিলেন, আর চিত্রকরও তেমনি করিয়া ভারত-শিল্পের মূর্ত্তি বেদায়তন হইতে নামাইয়া আনিলেন। ভারতের কলা-ভবনে এই 'কমলাসনা'র আসন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহার অলক্তক রাগে এ মন্দিরপথ চিরহাস্যরেখায় বিকশিত, তাহার মঞ্জীরাবৃত চরণ-ধ্বনিতে বরাভয়ধ্বনি চির উত্থিত। এ কলানিকেতন বৌদ্ধ-যুগে ভক্তের আরতিতে সারা ভারতের কেন, অর্দ্ধ এসিয়ার পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিল। তারপর ভারতের দুঃখের দিন ঘনাইয়া আসিল, সেই সময়ের পরে মোগলযুগে বিদেশীর উদ্বোধনে আরতির শঙ্খ বাজিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে বিদায়ের কাঁসর বাজিয়া কলা-ভবন নিশীথ-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল। আজ এই ইংরেজের মৃগ-তৃষ্ণিকার যুগে যুরুপের মায়ামৃগ লইয়া বিদেশী রাবণ এই ভারতের পঞ্চবটীতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর অমনি দিকে দিকে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা ব্যাকুল ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই স্বর্ণকুজ্ঝটিকার মধ্যে মায়ের কলাভবনের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। দার্জ্জিলিঙ্গের সে দুর্জ্জয় কুয়াসা সরাইয়া একজন মায়ের মন্দির খুঁজিতে বাহির হইলেন, অনেক সাধনায় খুঁজিয়া পাইলেন। দেখিলেন মায়ের আবাসে কমলদল শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে, সে শঙ্খ ধূল্যবলুণ্ঠিত—"তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইব?" সে কাঁসর ঘণ্টা একধারে মাতৃহীনের ন্যায় সরিয়া পড়িয়াছে! চারিদিকে রোদনের আর্ত্তস্বর।

নয়নের অশ্রু মুছিয়া যিনি জগন্নাথের নবকলেবর গ্রহণের ন্যায় মাতার নবসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন—মাতার পূজা করিয়া আবার তাঁহার ভালে চন্দন তিলক পরাইয়া দিলেন—সে পূজারী অবনীন্দ্রনাথ। তাঁহার শিল্প-সাধনায় ভারতের ব্রাহ্মণ্য সুপ্তশিল্প যুগান্তের নিদ্রা হইতে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

ভারতবর্ষে যাঁহারা স্বদেশ প্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের স্থান বড় দেখা যায় না, কারণ তাঁহার ধর্ম্ম আচারভ্রষ্ট ডিপ্লোমেসির সন্তান পলিটিক্স নহে, কারণ তিনি নিজে সাহেবী পোষাকে সাজিয়া, বিলাতী বুলি আওড়াইয়া স্বদেশের প্রাণকে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া জাগাইতে যান না; তিনি ঘরে বসিয়া শিল্পের ভিতর দিয়া ভারতের আর্য্যজীবন আর্য্য সাধনা ফুটাইতেছেন। স্বদেশ প্রেমের চিহ্ন কে যজ্ঞভস্মের মত আজ ভারতের শুভ্র ভালে লগ্ন করিয়াছেন? যজ্ঞের রাজ-টীকা পরিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের স্বদেশ রাণী আজ বিংশ শতাব্দীর কুয়াসা কুজ্ঝটিকার মধ্যে অর্দ্ধ বিগতশ্রী হইয়া, স্খলিতভূষণ হইয়াও, 'প্রশিথিল মৃণালৈকবলয়ং সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্' পরিলক্ষিত হইতেছে। বক্তৃতামঞ্চে শুধু কথার তুবড়ি ফুটাইলে দেশ জাগে না—দেশের পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ মলিন বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার দীপটী জ্বালিতে হয়।

সেদিন আমাদের সেনেটের বিপুল মণ্ডপ সজাগ করিয়া ফরাসী অতিথি বলিয়া গেলেন, 'European influence has never been poison but food to Indian architects'—তাঁহার এ উক্তি গান্ধারের 'supposed 'Europeon School of Art' সম্পর্কে। তিনি pre-Buddhist Artকে বলিয়াছেন 'White sheet of paper—অর্থাৎ তাহাতে এখনো কালির আঁচড় লাগে নাই'। তারপর দেখাইয়াছেন যে 'ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের সকল ছবি জড় করিয়া বৌদ্ধ শিল্পের সমাবেশে Exhibition করিলে দেখা যাইবে, গ্রীসের আর্ট ঐ শিল্পের পরতে পরতে লীলায়িত গতিতে নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছে; গ্রীক্ horn of plenty—যাহাকে আমরা Cornucopia বলিয়া থাকি, উহা জাভার মূর্ত্তির শিরোভাগে দেখা গিয়া থাকে। এই সব সঙ্কেত আমাদিগকে

গ্রীক শিল্প গ্রহণের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেয়।' তিনি আমাদিগকে প্রবোধ দিয়া গিয়াছেন, ক্ষোভের কারণ নাই, কারণ "at base there is common humanity" ইহা খাঁটি ফিলজফারের কথা! কিন্তু কথাগুলি ঘুরাইয়া বলিবার ইচ্ছা কি আমাদের হইতে পারে না? তিনি horn of plentyকে ইউরোপের গুপ্তধন পাইয়া গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিয়া চোরকে স-মাল চালান দিতে গিয়াছেন, কথাটা ত এই! ইংরেজী শব্দের মুখোস না পরিয়া সাদা বাঙ্গলা কথায়ও ব্যবহারে হইতে পারে। ইহাকে আমরা শিবের শিঙা বলিতে পারি না? আমাদের শিবকে দিয়া কি এই শিঙা তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সনাক্ত করাইতে পারি না? শিবের মূর্ত্তি কল্পনা গ্রীক-শিল্প কেন, গ্রীক জাতির অঙ্কুর না হইতে হইয়াছে। আগুনের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিব জুপিটার হইয়া, তাঁহার শিঙা horn of plenty হইয়া গ্রীসদেশে ভৃগুবংশের সঙ্গে গিয়াছিল ইহা বলা কি ন্যায়-বিরুদ্ধ? সেই connoisseurএর আর এক নজির —Holy mother, holy son—পুত্র ক্রোড়ে জননী —এ চিত্রও এখানে মিলিয়াছে। কিন্তু ইহা যে গণেশ-জননী নয়, চিত্রকর নাম ব্যতীতও অপর কেহ কেহ সন্দেহ তুলিতে অবশ্যই পারে। আচার্য্য ত্রিবেদী Eucharist বর্ণনায়, তাহারা যে incarnation of the Logos—God in flesh—Transubstantiation উৎসবে পরিণত করে বলিতে গিয়া বৈদিক যজ্ঞ-বিধি হইতে ইহার উৎপত্তি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এইরূপে ভারতের আচার-অনুষ্ঠান যে বহির্জ্জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-কল্পদ্রুমে কুঁড়ি মেলিয়াছে, তাহারই প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। গান্ধারের সেই School of artএ তিনি চাহেন ব্রাউন-এর ন্যায় অপর কোন গ্রীক্ শিল্পীকে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে। মনে করেন, আজিকার চৌরঙ্গীর শিল্পের টোলে যেমন ভারতীয় পড়ুয়ারা মনঃসংযোগ করে, তেমনি তখনকার দিনেও ভারতীয় ছাত্র গ্রীক অধ্যাপনায় পরিবর্দ্ধিত হইত। এই সাদৃশ্য হইতে যত অনর্থের উৎপত্তি। রোমের চিত্রবিদ্যায় হাতে খড়ি দেখিলে এ প্রসঙ্গের নির্ণয় সহজে হইয়া থাকে। মম্‌সেন (Mommsen) রোমের চিত্রের পাতা খুলিয়া লিখিয়াছেন, এ অঙ্ক একেবারে শূন্য, কেবলি রোমের গায়ে পিতৃপুরুষের ছবি আঁকিবার ক্ষমতা চিত্র নিদর্শন। তখনও গ্রীসের ললিত-কলার আস্বাদ রোম পায় নাই। পিউনিক্ সমরের পূর্ব্বভাগে যখন ভেলেরিয়স্ মেসেনা জয় করিলেন, তখন সেই বিজয় স্মরণীয় করিতে রোমে আসিয়া সেনা-নায়ক, গণ-তন্ত্র মণ্ডপ—সেনেটের গায়ে ছবি আঁকিতে চিত্রশিল্পীর আহ্বান করিলেন—এইরূপে একদিন লক্ষ্মণ লঙ্কাসমরের চিত্রশালা খুলিয়াছিলেন। এ শিল্পীর নাম পিওডটাস। এসিয়া মাইনর হইতে আর এক শিল্পী আসিলেন—লিসো। ইঁহার হাতে জুনোর মন্দির শিল্প-সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইল। রোম খুসি হইয়া চিত্রকরকে মহা পুরস্কার দিলেন। আদেশ হইল, শিল্পীর মুক্তি দাও, যে দেশ এমন শিল্প প্রসব করে, সে দেশের রোমান্ নাগপাশ কাটিয়া দাও। শিল্পীর দেশ স্বাধীন হইল। একদিন ইউরিপাইডাসের (Euripides) কবিতার আবৃত্তি শুনাইয়া এথেন্স বন্দীরা জেলখানার কারাশৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, সিরাকিউজানেরা হাতের লৌহ-বলয় তরবারির মুখে কাটিয়া দিয়াছিল। রোমের হাতে খড়ি হইতে লাগিল গ্রীসীয় আর্টিষ্টের হাতে—কিন্তু হাতে-খড়ি পর্য্যন্তই, কারণ গ্রীক হস্ত ভিন্ন রোমান হস্ত শিল্প ফুটাইতে সাহস পাইত না। যখন তাহারা করিন্থে ও এথেন্সে মন্দির রচনা দেখিল, রোমান চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া পলক হারাইল—এত সুন্দর! ঘরে আসিয়া তাহাদের দেওয়ালে গ্রীক আদর্শে পরিচালিত ভিন্ন দেশীয় শিল্পীর কারুকার্য্য মনে ধরিত না, যে রূপ দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার কাছে এগুলি কুশ্রী ঠেকিত। তাচ্ছিল্যের অঙ্গুলি হেলাইয়া বক্র দৃষ্টিতে কহিত "Terra cotta figures"! পলাস্ ও কনসল্ কেটো (Cato) ফিডিয়াসের জিয়স্ মূর্ত্তি দেখিয়া Connoisseur হইতে বাধ্য হইলেন—এই সময় রোমের রাজপুরুষ সম্প্রদায়ে গ্রীক-শিল্পের

পূজা আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে রোম চিত্রস্বাদে এত নিপুণ হইল যে একটা রীতি হইয়া গেল যুদ্ধ হইয়া গেলে শিল্প-মূর্ত্তি 'spoil' মধ্যে গণ্য হইবে। ঠিক এই পদ্ধতিতে রোম পরধন-মত্ত হইয়া বিশ্বের দিকে হাত বাড়াইয়া ছুটিল—বিদেশীর পশ্চাতে রোম্কে ধাবিত দেখিয়া দেশ-ভক্ত ফেবিয়াস্ টেরেণ্টাস অধিকারের পর সে রীতি উল্টাইয়া দিলেন, রোমান্ সেনাবাহিনীকে মূর্ত্তি সকল স্পর্শ করিতে ভীমকণ্ঠে নিষেধ করিলেন। তিনি রোমের প্রাণের ভিতর এই কথাটা ঢ়ুকাইয়া দিলেন, 'পরের দেবমূর্ত্তি আনিয়া রোম বোঝাই করিও না, ক্রুদ্ধ দেবতা শক্রপুরীতে আসিয়া আগুন লাগাইয়া সব ছারখার করিয়া দিবে।' বস্তুতঃ এই আগুনে দেশশিল্পের প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে তিনি এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। জর্ম্মান ঐতিহাসিক তাই সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'No attempt even was made to develope a native art.' কিন্তু ফেবিয়াসের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। রক্ত-পিপাসী Sullaর সময়ে পূজাভ্যাস পূর্ণোদ্যমে চলিল; এতদিনে গ্রীস স্বাধীনতার স্বর্ণমুকুট হারাইয়া বিশ্ববিজয়ী রোমের গোচারণের মাঠ, (আধুনিক outer platform of trade on the waves) হইয়া বসিয়াছে। গ্রীসের শিল্প জগৎ বেওয়ারিশ মাল পাইয়া রোমের প্রলোভনস্পৃহা বড়িয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রোমান্ কেপিটলে ফিডিয়াসের সেই অতুল Zeus মূর্ত্তি আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এসিয়া মাইনরের মেগা গ্রীসীয়া (Greater Greece) হইতে আর এক ভাস্কর আসিয়া, রোমের দেবালয়ে দেবালয়ে হস্তিদন্তে দেবমূর্ত্তি গড়িয়া বসাইলেন। এইরূপে Græco-Roman cultureএর প্রথম অঙ্ক সুরু হইল, গ্রীক শিল্পী গৃহ-হারা হইয়া রোমের গৃহে গৃহে চিত্র-বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। এতদিন শিল্প সাধনায়, গ্রীক চিত্র দর্শনে, গ্রীক অধ্যাপকের অধ্যাপনায় যে বিদ্যা রোম ২৬৪ হইতে ৭০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত আয়ত্ব করিয়া উঠিতে পারিল না, সে বিদ্যা ভারতীয় চিত্রকর গান্ধারের শিল্পকেন্দ্রে একাদনে সহসা আয়ত্ত করিয়া বসিল—ইহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অভিধানে খুঁজিলে 'Transcendental nonsense' রূপে পাওয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ ৩০০ তে মেগাস্থিনিসের শুভাগমন হয়। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ভারতের Scientific frontier পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন গ্রীস তুলি হাতে করিয়া গান্ধারে পা ফেলে কি সাধ্য! অশোকের রাজত্ব গ্রীণের ভাষায় বলিতে গেলে, 'has flowered in the poetry of Mayurya architecture.' অশোকের সময় সে রাজত্বসীমা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার সারনাথের স্তম্ভে যে মূর্ত্তি পাওয়া যায়, উহা কি গ্রীক নকল-নবিসীর ফল? তখন গ্রীক আর্ট দেশে ঢ়ুকিবে কি করিয়া? অশোকের মৃত্যুতে ধীরে ধীরে গান্ধার পর্য্যন্ত গ্রীক খণ্ড-রাজ্য ছাউনির মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কখনো pure Greek নয়—Bactrian Greek, যেন ঠিক আজিকার Americanদের মত—তাহাদের রাজ্য স্থায়ী হইলে তাহারাও Americaর ন্যায় একটা নামান্তর গ্রহণ করিত না কে বলিবে? এই গ্রীক-নামধারী ব্যক্তিরা গ্রীসের আর্ট পাইল কোথায়? ফিডিয়াস বড় জোর চন্দ্রগুপ্তের একশত বর্ষের আগের লোক, তখনো হয়ত আর্ট এই সময়ের মধ্যে তেমন জাগিয়া উঠে নাই, আর সেই আর্ট এখানে আসিল কিরূপে? সেই মূর্ত্তিগুলির প্রতিকৃতি করিয়া বুঝি উপনিবেশিক গ্রীক স্কন্ধে বহন করিয়া ভারতের সীমান্তে আনিয়া নামাইয়াছিল? যদি আসল গ্রীক্ আর্টিষ্টেরা দুইশত বৎসরেও রোমকে কলাজ্ঞান বুঝাইতে না পারিয়া থাকে, তবে বুঝি এই গ্রীক জাতির নকল 'ট্যাস' ফিরিঙ্গিরা ভারতকে সে মন্ত্র দু'দিনে শিখাইয়া দিল? আশ্চর্য্য বটে। অনুকরণে ভারতের কৃতিত্ব প্রচার করিতে যুরুপ পরাঙ্মুখ নহে, ইহা স্পষ্ট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত এমন চক্ষু পাইয়াছে যাহা দ্বারা অপরের ঘরের দ্রব্য তাহার কাছে নিষ্প্রভ ঠেকে; এ রত্ন-লোভ ভারতে করিতে যাইবে কেন? তবুও যদি গান্ধার-শিল্প-বিপণিতে গ্রীসীয় আদর্শের ক্রয় [illegible]

সমাজে ঠাঁই পায় নাই,* ইহা অতি সত্য কথা। ব্রাহ্মণ্য-সমাজে পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ, কাজেই গ্রীসীয় আর্ট সমাজ-চ্যুত হইতে বাধ্য। এই গ্রীসদেশের সাহিত্য ও শিল্প এক এক করিয়া ফরাসী, ইংলণ্ড, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশকে মানুষ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ আপন দীপ্তিতে গরীয়ান্। ভারতীয় culture ভারতের সূতিকা-গৃহে জন্মিয়াছে, অন্য দেশের ধাত্রীকেও ভারত চাহে নাই, কারণ ভারত-মাতার অপর নাম জগদ্ধাত্রী। ভারতবর্ষকে মানুষ করিয়া এ মাতা বিশাল বিশ্বকে স্তন্যপান করাইয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পের শৈশব-জীবন যথাযথ বলিবার সময় এখনো না আসিলেও, সে শিল্পকলার প্রমাণ যে আমরা ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থের পাতায় পাতায় পাইয়া থাকি, তাহার কতক আভাস জুটিয়াছে। বেশী কথা কি, উত্তর রাম-চরিতে চিত্র-দর্শন পাঠ কি মনে হয়? লঙ্কার চিত্রগুলি দেওয়ালের উপর কেমন অঙ্কিত হইয়াছিল ভবভূতি তাহার কি বর্ণনাই করিয়াছেন! ইহা কি ব্রাহ্মণ্য আর্ট নয়? বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের পটের স্তরে স্তরে যে চিত্র-কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা কি ব্রাহ্মণ্য আর্ট নয়? কালিদাসের শকুন্তলায় যেখানে দুষ্মন্ত কহিতেছেন 'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ব-যোগাৎ'—বিধাতা যেন শকুন্তলা মূর্ত্তি প্রথম চিত্রে অঙ্কিত করিয়া লইলেন —এইখানে কি সেই নিদ্রামগ্ন শিল্পের আভাস পাই না? যখন একবাক্যে এই কথা ধ্বনিত হইতেছে যে মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে শিল্পের চিহ্ন কোথাও দৃষ্টি হয় না, তখন, যে পাণিনি অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের দুই একটা কথা উল্লেখ করিলে এ বিষয়ে একটু বিস্ময়ের উদ্রেক হইবে কি? পাণিনির 'ইবে প্রতিকৃতৌ' (৫।৩।৯৬) এবং 'জীবিকার্থে চাপণ্যে' (৫।৩।৯৯) সূত্রে শিল্পমূর্ত্তির আভাস স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। অধ্যাপক চন্দ এদিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

দেখিয়া আসিয়াছি কেমন করিয়া Græco Roman culture আরম্ভ হইল। কিন্তু রোমের পতনের সঙ্গে সে সভ্যতার যজ্ঞগৃহে বর্ব্বরেরা অগ্নি সংযোগ করিয়া উহাকে ভস্মীভূত করিল। প্রায় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত য়ুরোপের আর্ট মরিয়া গিয়া প্রেত হইল। সেই প্রেতভূমে সতীবিহীন দক্ষযজ্ঞে যে আর্ট-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিল, তাহা কয়েকটি typeএ বিভক্ত—যথা Byzantine, Lombard, Saracenic pre-Scthic, Romanesque। শেষোক্ত typeটী রোমের শিল্প কিঞ্চিৎ মাত্র জনিত বলিয়াই ইহাই অপর সকলের উপর রাজত্ব করিত! ভেটিকান প্রাসাদে পোপ হুকুম বাজাইতেন, 'সাবধান pagan চিত্র আঁকিও না, inquisitionএ দগ্ধ হইবে।' একদিকে পেত্রার্ক আর একদিকে র‍্যাফেল রোমের সাহিত্য ও শিল্প খুঁজিয়া খুঁজিয়া সুপ্ত সাধনার পরিচয় পাইলেন, সেই সাধনার বীজমন্ত্র return to nature আওড়াইয়া এই দুই শক্তি-শালী পুরুষ সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন, ইহারই ইংরাজী নাম renaissance। পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন, গ্রীসীয় মূর্ত্তির পুনরুত্থান অসম্ভব, কারণ খৃষ্টধর্ম্ম পৌত্ত-লিক নহে। এইজন্য ভাস্কর্য্যের বিদ্যা অর্পিত হইল চিত্রবিদ্যার উপর। পিসানো, র‍্যাফেল প্রভৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন গ্রীসীয় শিল্প বাইবেলের faith, hope, ecstasy, suffering প্রভৃতিতে আরোপ করিয়া তুলির সাহায্যে চিত্রে ফুটাইলে, পোপ শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে, তাঁহার নিষেধাজ্ঞা সত্বেও প্রাচীন শিল্পের পুন-রুত্থান সম্ভব হইবে। তাই chiselএর পরিবর্ত্তে তুলির আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পোপ সে চিত্রবিদ্যায় মোহিত হইয়া সম্মতি জানাইলেন, আর অমনি paganism আসিয়া ইটালীর দেশ দেশান্তর ভরিয়া তুলিল। Symonds কহেন, "How could the Last Judgment be expressed in plastic form?" লিও-নার্ডো The Last Supper আঁকিয়া চির-যশস্বী হইলেন। র‍্যাফেল তাঁহার ম্যাডনা চিত্রে ফিডিয়াসের পেলাস্ এথে-নীর পুনর্জ্জন্ম দিলেন। পোপ এ অন্তর-রহস্য বুঝিতে না পারিয়া চুপ রহিলেন। 'His Madonnas are counted among World's treasures" । Symondsএর

সেই Last Judgment আঁকিলেন মাইকেল এঞ্জেলো। রোমের সিষ্টাইন্ চ্যাপেলে এ অবিনশ্বর শিল্প রহিয়াছে। ভাস্কর্য্য শিল্পেও তাঁহার হাত অতি চমৎকার ছিল। এইরূপে ধীরে ধীরে গ্রীক শিল্পের সরঞ্জাম লইয়া মধ্যযুগের চিত্র-জগৎ মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। এতদিন যে কালো মেঘে শিল্প-সূর্য্য আচ্ছন্ন ছিল; সে মেঘ কাটিয়া গেল। ইটালী হইল য়ুরুপের panorama—এ সাজঘরে শিল্প দেবতা রাজপাটে বসিলেন, কিন্তু য়ুরুপের দেশে দেশে সে চিত্র-সাধনা ত প্রসার লাভ করিল না! Reformation-এর অগ্নিঝড় জর্ম্মানী ফরাসী প্রভৃতি পুড়াইয়া মারিতে-ছিল, শিল্প সাধনার সময় তাহাদের ছিল না। ইটালী য়ুরুপের মধ্যে কলা-সৌন্দর্য্যে রূপপ্রভা ছড়াইয়া বসিল। বিদ্যাধরীর তরল লাবণ্য, অপ্সরার রূপোচ্ছ্বাস ফ্লরেন্সের অঙ্গে চলোর্ম্মি তুলিয়া দিয়াছিল। এত রূপ দেখিয়া ফরাসী, জর্ম্মানি, অষ্ট্রীয়া লালসার বিলোল কটাক্ষপাত করিতে করিতে অবশেষে একদিন সেই পরী লাভের জন্য সে তুলি ও রঙের দেশে রণানল জ্বালাইয়া দিল। এই যুদ্ধে ইটালীর চিত্র-বিদ্যা বেয়নেটের মুখে মুখে য়ুরুপের বিভিন্ন দেশে প্রথম প্রবেশ করিল। তারপর সেই ফরাসী বিপ্লবের আগ্নেয় গিরির মাথায় বসিয়া নেপোলিয়ন এ কলাসুন্দরীর অঙ্গনে আসিলেন; Sullaর ন্যায় ইটালীর অমূল্য চিত্র সংগ্রহ করিয়া প্যারিসে ফিরিয়া গেলেন। বাইরণ ইটালীর এই উন্মাদকর রূপ ভাবিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন;

Italia! O Italia! thou hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past.

আমাদের রাজপুতানার কৃষ্ণকুমারীর কথা মনে পড়ে না কি? এই ত ইউরোপের চিত্র। গ্রীসকে লুণ্ঠন করিয়া রোম বড় হইল, গ্রীস ও রোমের মিলিত রত্ন পাইয়া ইটালী কলাশিল্পে চক্ষুদান পাইল, সেই কলাশিল্প কাড়িয়া লইয়া ইউরোপীয় আধুনিক চিত্র-বিদ্যার জন্ম। এই য়ুরুপের তরফ হইতে গ্রীসের নিকট ভারতকে ঋণী করিবার চেষ্টা হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

ভারতবর্ষের চিত্র-জগৎ ভারতের অমর ধর্ম্মের মণিহার ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ভারত-শিল্প ঋষিদের ধ্যান-সরোবরে স্বর্ণকমল হইয়া ফুলদল মেলিয়া জগতের আলোতে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় করিয়াছিল। এই পদ্মের বিবর্ণ পাপড়ী, আজ শিল্প-ঋত্বিক অবনীন্দ্রনাথ যজ্ঞের বেদীর উপর ন্যস্ত করিয়া মায়ের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন। ভারত-শিল্পের যে স্তর ঠাকুর মহাশয় খুলিয়া-ছেন, তাহার অচপল আলোক আমাদের শাসনকর্ত্তাদের চক্ষে ঠেকিয়াছে; ইহা বড় সুখের বিষয়। এই অল্প দিনের মধ্যেই ইহার সুনাম জনসমাজের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে, এবং এ দেবালয়ের শঙ্খঘণ্টার রোল য়ুরুপের প্রতি বাতায়ন পথ সজাগ ও সচকিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের চিত্র-পথে এ নব জাগরণ কি ইউরোপের renaissance নহে? পেত্রার্ক গ্রীসের সাহিত্য পাঠে এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, জগৎ সংসার তাঁহার কাছে সেই আলোর দীপ্তিতে নিষ্প্রভ ঠেকিত। তাঁহার এই গ্রীসপ্রীতি সময়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে সেই গ্রীসীয় সাহিত্যিকের কাছে লইয়া যাইত। অতীতের মহাপুরুষ-দের সহিত এইভাবে মনের তার বাঁধিতে হয় পেত্রার্ক জানিতেন—অবনীন্দ্রনাথও জানেন। এইভাবে গুরুর কাণ মন্ত্র পাওয়া যায়। ভারত-শিল্পের কলা-সরস্বতীর চরণে অবনীন্দ্রনাথ ফুল-তুলসী দিয়াছেন। মায়ের অঙ্গাভরণ মায়ের পটমণ্ডপের চারিদিকব্যাপী চিত্রাঙ্কণ—হয়ত এখনো হয় নাই, বা সমাপ্তির রেখার দেখা পাইতে শতাব্দীর উপাসনা প্রয়োজন। কিন্তু নূতন করিয়া তাহার যে গোড়া পত্তন হইয়াছে, ইহা বোধ হয় বুঝিবার কাহারও বাকী নাই। যাঁহারা মনে করেন অবনীন্দ্রনাথ গুরুগিরির জন্য এ পথে পা ফেলিয়াছেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহাদের মনে অভিমান তপ্ত হইয়া ফুটিয়া

উঠিতেছে অবনীন্দ্রনাথ হাতের মুঠা হইতে এ শিল্পের উৎস দিয়াছেন, এবং যাঁহারা এ শিল্পের চাষ করিবে, তন্মুহূর্ত্তে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া মিছামিছি দলিত দ্রাক্ষার মত নিষ্পেষিত হইতেছেন। আমি বহুদিন ধরিয়া এরূপ শোচনীয় ভাবের পরিচয় পাইয়াছি বলিয়া এটুকু লিখিতে গিয়াছি। একটা কথা বিদ্যুতের বর্ণে সকলের মনের মর্ম্মে তড়িতের মত কি খেলিয়া যাইবে না যে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ মায়ের পূজারী, তিনি কখনো দেশকে দশকে জানাইতে যান নাই যে ভারত-শিল্পের স্রষ্টা আমি। যাঁহারা এ মন্দিরে পূজার্থী হইয়া আসিবেন, মায়ের পূজায় তাঁহাদের সকলের সমান অধিকার। বেদের যুগে ব্রাহ্মণ্য শিল্প দেশের পূজা পাইয়া আসিয়াছে, আজ সেই শিল্পমাতার উদ্বোধনে অবনীন্দ্রনাথ ডাকিতেছেন সকলে ছুটিয়া এ মন্দিরে এস। তাঁহার এই করুণ আহ্বান দেশের মাঝে বাজিয়াছে। তিনি বিলাতী পদ্ধতির বাহিরে water colour-এর যে রঙের ভাঁজ খুলিয়াছেন, তাহা বৈচিত্র্যময়— কাগজের উপর তিনি লঘু জ্যোৎস্নার মত যে নির্ম্মল বর্ণপাত করিয়া যান উহার তুলনা পৃথিবীর চিত্রসমাজে নাই। চৈতন্তদেব জ্যোৎস্না-বিধৌত নীল আকাশে— সাদা নীলের মিলনে রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখিয়াছেন। বিলাতী tinselএর ন্যায় ঝলঝল্ চিত্র একটা প্রাণহীন রূপের হাহাকার জাগাইয়া তোলে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপটে সেই সাদা নীলে অসীমের প্রেম তুলির টানে ফুটিয়া উঠে। আর একজন এ চিত্র ফুটাইতে গিয়াছেন—ভারত-শিল্পের দ্বিতীয় ঋত্বিক নন্দলাল। বিলাতে হইলে এ চিত্র-সমালোচনা লইয়া নূতন পুস্তকের উদ্ভব হইত। আর একজন অজিত-কুমার, ইঁহার প্রতিভার ফুল কোন্ নিভৃতে নিকুঞ্জে ফুটিয়াছে, কে খোঁজ লইয়াছে? তিনি যে আমাদের স্বদেশ-দেবীর চরণে শুভ্র মন্দার গাঁথিয়া দিতেছেন, আমরা ত তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেও যাই না। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত অপর যাঁহারা ভারতের আকাশ ধ্রুব সত্যে ভরিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদের নমস্কার সর্ব্বক্ষণ আমরা জানাইতে গিয়াছি কি? অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে ভাব-জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে transcendental touches দ্বারা। তিনি ধ্যান লোকের চিত্র ফুটাইয়াছেন। তিনি সাত্ত্বিক চক্ষুদান দিয়া তাঁহার চিত্রময়ীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। Sublime ফুটাইতে যাইয়া তিনি subliminal self এর উপর নিজেকে দাঁড় করাইয়াছেন। তাঁহার চিত্র দেখিয়া যাহারা শত ঝলসিত রাজসিক সৌন্দর্য্য ও ফুল্লেন্দীবর বিলোল কটাক্ষকারিণীর সাক্ষাৎ পান না, এবং শিল্পীকে দোষ দেন, তাঁহারা যে ভাবের মর্য্যাদা অন্তরে পোষণ করেন না এবং রজোগুণানুকারী সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আজিকার ভারত-শিল্প একটা ভাবের ফুল, একটি কবিত্বের বিহ্বল হইয়া জগতের চিত্রশালায় এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। এমন দিন আসিবে যখন এই ভাবের চিত্র ক্রমে সংসারের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কুঁড়ি মেলিতে যাইবে, জীবনের সুর আসিয়া উহাতে সংযুক্ত হইবে; ইহাতে dramatic artএর যে অভাব তাহা অতুল প্রতিভাবান্ রবিবর্ম্মার শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র শাসন-রূপ মূর্ত্তচিত্র দ্বারা চারিদিকের শূণ্যাঙ্ক শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভরিয়া দিতে যাইবে। ইউরোপের realism এ তুলির পরশে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ রচয়িতাগণের চিত্র অঙ্কনে হার মানিয়া যাইবে। ইতিহাস চাহিতেছে ভারতের পুণ্যপুরুষের মর্ম্ম জাতির চোখে জাগাইতে। চিত্র তাঁহাদিগকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহা দেখাইয়া দিবে এ আশা আমাদের প্রাণে সোণার স্বপ্নের মত জাগিয়া রহিয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন

দূর হইতে কয়েকটি বক্তৃতা শোনা ছাড়া জীবনে যাঁহাকে কখনও ভাল করিয়া চোখে দেখিবার সুযোগও হয় নাই, বালকসুলভ ঔৎসুক্যের প্রেরণায় যাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার প্রাসাদতুল্য 'বান্ধবকুটীরে'র চারিদিকে অনেকবার ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু যাঁহার সঙ্গে কখনও বাক্য বিনিময় করিবার অবকাশ ঘটে নাই, হঠাৎ তাঁহারই সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আপাততঃ ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইতে পারে। আমরা যখন সুশীল ও সুবোধ বালকের মত বেঞ্চের উপর বসিয়া অধ্যাপকের বক্তৃতা গলাধঃকরণ করিতাম, সেই সময়ে কালীপ্রসন্নের 'ছায়াদর্শন' 'বান্ধবে' ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইত। তাঁহার যশের ঢাক তখন চারিদিকে বাজিয়া উঠিয়াছে; লোকে তখন তাঁহার চিন্তাশীলতা ও জ্ঞানগরিমা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। শুধু লেখক হিসাবে নয়, বাগ্মী হিসাবেও তখন তিনি সকলের বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এ হেন লোকপূজ্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষা কাহার না হইয়া থাকে? কিন্তু সমীপস্থ হইবার সাহস আমাদের কখনও হয় নাই। কাজেই চাক্ষুষ পরিচয় এবং সমুখীন আলাপ তাঁহার সহিত আমাদের ঘটিতে পারে নাই।

কথাবার্ত্তায় এবং চাক্ষুষ পরিচয়ে মানুষের চরিত্রের একটা দিক বেশ জানিতে পারা যায়, এবং তিনি কি প্রকারের লোক, তাহা জানিবার ইহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু তথাপি, ব্যক্তির জীবনের কোন বিশিষ্ট ঘটনা, তাঁহার কোন বিশিষ্ট কাজ দেখিয়াও আমরা তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি।

একজন কেমন কবি, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহার আহার প্রণালী বিশ্লেষণ করার কোনই প্রয়োজন নাই;—কাব্যেই তাহার পরিচয় মিলিবে। কাহারও সঙ্গীতজ্ঞানের পরিচয় তাঁহার সঙ্গীতচর্চ্চায় পাওয়া যাইবে, জন্মপত্রিকায় নহে।

অবশ্যই, সাধারণতঃ আমরা কবি ও দার্শনিকদিগের জীবনের বৃত্তান্তগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে চাই। তাহার কারণ, ইঁহাদের সৃষ্টি ইঁহাদের চরিত্রের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ রূপে সম্বদ্ধ। যেখানে বুদ্ধি ও অনুভূতির মিশ্রণ থাকে, সেখানে এরূপ সম্বন্ধ অনিবার্য্য। দার্শনিক বা কবি শুধু বিচার-বুদ্ধির ক্রিয়াই প্রদর্শন করেন না, তাঁহাদের গভীরতম চিত্তবৃত্তি তাঁহাদের বুদ্ধিকে রঞ্জিত করিয়া তুলে। কঠোর বৈজ্ঞানিকদের বেলায় হয় ত এ কথা খাটে না। ডলটন যদি অকৃতদার না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'আণবিক সিদ্ধান্ত' অন্যরূপ হইত, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। নিউটনের বাড়ী ইংলণ্ডে না হইয়া জার্ম্মনীতে হইলে তাঁহার গণিতের আবিষ্কার অন্যরূপ যে হইত না, তাহাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু কবি ও দার্শনিকদের বেলায় সে কথা খাটে না। ইম্যানুয়েল কাণ্ট বা শোপেনহোর যদি গৃহী হইতেন, যদি শিশুদের কলহাস্যে তাঁহাদের গৃহ মুখরিত থাকিত, যদি পত্নীর পরিচর্য্যা ও সাহচর্য্যের সুখ সম্ভোগ তাঁহাদের ঘটিত, তাহা হইলে তাঁহাদের দার্শনিক প্রচেষ্টার ভিতর এত কঠোরতা থাকিত না। যে সব চিত্তবৃত্তি মানুষের জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে, যে স্নেহ যে প্রীতি ভালবাসা জীবনকে জীবিতব্য করিয়া রাখিয়াছে, সে সব যদি ইঁহাদের জীবনে বিকশিত হইতে পারিত, তাহা হইলে ইহাদের জীবনের আদর্শটা এত কঠোর, এত মরুসদৃশ হইয়া যাইত কি না সন্দেহ।

ভারতীয় ও পাশ্চত্য দর্শনের আদর্শের মধ্যে যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, তাহারও কারণ শুধু প্রাচী ও প্রতীচীর সাধারণ প্রভেদ মাত্রই নহে; উভয় দেশের দার্শনিকদের জীবন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যও সেজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। প্রাচ্যের দর্শনশাস্ত্র যোটের

উপর আরণ্যক সাহিত্যের অন্তর্গত, লোকালয়ের বাহিরে নগরাদি হইতে দূরে সংগীত, এবং মঠবাসীদের সেবায় সংবর্দ্ধিত। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের জন্মস্থান পৃথক ;—এথেন্স, রোম, প্যারিস, কনিগসবার্গ, হাইডেলবার্গ, বার্লিন, লণ্ডন, এ'ডনবার্গ, হার্ভার্ড প্রভৃতি সমস্তই নগর ; এবং দার্শনিকেরাও অধিকাংশ নগরবাসী। মধ্যযুগ বাদ দিলে, ইউরোপের দর্শন এবং দার্শনিক মোটের উপর সকলই নগরের আব্‌হাওয়ায় বর্দ্ধিত। এই সব কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে যে সব প্রভেদ দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটী এই যে, যদিও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্বন্ধে ন্যূনাধিক চিন্তা করিয়াছেন—যদিও প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া হার্বার্ট স্পেন্সার পর্য্যন্ত সকলেরই প্রায় একটা Political theory রহিয়াছে, অথাপি শঙ্করে, রামানুজে, সাংখ্যে, পাতঞ্জলে তাহার নাম-গন্ধও নাই। সুতরাং দার্শনিকের জীবনধারা তাঁহার দর্শনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

সাহিত্যের বেলা এই কথাটা আরও সত্য। বায়রণের জীবনটা যদি একটা উদ্দাম লালসা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য যে অন্যরূপ হইত, তাহা এক রকম জোর করিয়াই বলা চলে ; অন্ততঃ ডনজুয়ান তিনি লিখিতে পারিতেন কি না না সন্দেহ। আর বার্ণস যদি বড় ঘরের ছেলে হইতেন এবং বড় চাকরী করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে অন্যরূপ কবিতা লিখিতেন, এরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে না। টেনিসনের দেশ যদি ফ্রান্স হইত এবং তিনি যদি রুসোর সময়ে জন্মিতেন, তবে অন্ততঃ তাঁহার রাষ্ট্র সম্বন্ধে কবিতাগুলি অন্যরূপ হইতই। কালিদাস যদি উজ্জয়িনীতে না থাকিয়া বাইমারে (Weimar) থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি শকুন্তলা না লিখিয়া ফাউষ্টই লিখিতেন। এরূপ বিপর্য্যয় যে সম্ভব তাহার হেতু এই যে, সাহিত্যিকেরা শুধুই শুষ্ক তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, যে সব সুখ দুঃখ তাঁহারা জীবনে অনুভব করেন, সেগুলিই বেশী করিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোনও গণিতের সেবক যদি বিবাহ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার বেলায় দুইয়ে দুইয়ে চার হইবে না, এমন নহে ; কিন্তু কোনও কবি যদি মিল্টনের মত দাম্পত্য জীবনে অসুখী হন, তবে তাঁহার সে দুঃখের ছায়া তাহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিবেই।

সুতরাং কাব্যালোচনায় কবিদের জীবন আলোচনা একটী কর্ত্তব্য বিষয়। এবং প্রকৃতপক্ষেও সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সমালোচকদের প্রায় সকলেই কাব্য আলোচনায় কবির জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিয়া থাকেন ;—কখন্ কি অবস্থায় কোন্ ছত্রটি লিখিত হইয়াছিল, যথাসম্ভব তাহা জানিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। শুধু কবির বেলায়ই এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে, এমনও নহে ; সকল সাহিত্যিকের সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। প্রথমে ব্যাপক ভাবে সমস্ত জীবনটী পর্য্যালোচনা করিয়া, তারপর সাহিত্যিকের সাহিত্য প্রচেষ্টার বিচার গবেষণা করাই গৃহীত রীতি।

কথাটা বোধ হয় মণ্টেস্কিউই (Montesquieu) প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোনও দেশের সভ্যতা সে দেশের জল বায়ুর উপর নির্ভর করে। তারপর অবশ্যই বাক্‌ল (Buckle), গীজো (Guizot) প্রভৃতি অনেকেই এই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে গিয়া দেশের ভূতত্ত্বকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। আজকাল সমস্ত বিচার তর্কেই কার্য্যকারণের পরম্পরা-সঙ্গত একটা বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। যাহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকেই কার্য্য মনে করিয়া, তাহার কারণ অনুসন্ধান করাই আধুনিক প্রথা। কোনও দেশের সভ্যতার বিচার যদি করিতে হয়, তবে সেইটি কি কি কারণ-সমবায়ে উৎপন্ন হইল, সে বিচারই প্রধান হইবে।

সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিকেও তেমনই কারণ প্রসূত

মনে করায় কোন দোষ নাই। কোনও এক সাহিত্যের সহিত অপর সাহিত্যের যদি পার্থক্য থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহার একটা হেতুও থাকিবে। এবং বিশ্বজনীন ইতিহাসের কারণ-পরম্পরা ছাড়া সাহিত্যিকদের জীবন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যেই এই হেতুটি মিলিবে।

সাধারণ ভাবে এইরূপ একটা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক রীতি সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইতেছে। কবি ও দার্শনিকদের জীবন আলোচনার উপযোগিতাও এই খানেই।

কিন্তু তথাপি একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কি হেতু-পরম্পরায় কোনও একটি বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা জানিলেই সেই বস্তুটী সম্বন্ধে যথেষ্ট জানা হইল না; বস্তুটীর স্বরূপ কি তাহাও জানিতে হইবে। কেন বাঙ্গালা দেশে কোনও একটা বিশিষ্ট যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য দেখা দিল, তাহা জানা এক কথা; আর বৈষ্ণব সাহিত্য জিনিষটা কি, তাহা জানা আর এক কথা। অবশ্যই পরিপূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে উভয়টিই দরকার; কিন্তু একটিতে আর একটি অন্তর্ভুক্ত নহে।

তেমনই কবির জীবন তাঁহার কাব্য বুঝিবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, কাব্য-চেষ্টাও কবির জীবনের একটা দিক্। এবং অন্য দিকটি জানা হইলেই এ দিকটাও জানা হইয়া গেল, এমন নহে। কোনও একব্যক্তি কিরূপ মনীব, তাহা তাঁহার চাকরের প্রতি ব্যবহারেই জানিতে হইবে, পুত্রের প্রতি ব্যবহারে নহে। সেইরূপ কোনও এক ব্যক্তি কিরূপ সাহিত্যিক, তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায়ই তাহা জানিতে হইবে, তাঁহার পরিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নহে। একথা অবশ্যই অস্বীকার করা হইতেছে না যে, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কবির কাব্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; কিন্তু তথাপি কাব্যের বিচারটি স্বতন্ত্র ভাবে না করিলে, কবির জীবনের জ্ঞানই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বিশেষতঃ অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা এমন কি জানি? হোমর, বাল্মীকি প্রভৃতির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কালিদাস, সেক্সপীয়র সম্বন্ধেই বা এমন কি বিশেষ জানি? কিন্তু তথাপি কাব্যে তাঁহাদের সহিত যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই সম্ভব, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কবির অন্যবিধ ক্রিয়া কলাপ হইতে তাঁহাকে যেমন চিনিতে পারা যায়, কাব্য হইতে তেমনি তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইতে পারে। শুধু তাই নয়, কবির বিচার প্রধানতঃ তাঁহার কাব্যেই পাওয়া উচিত। তবে যখন জানিতে চাই কেন তাঁহার কাব্যটী সে বিশিষ্ট আকার ধারণ করিল, তখন অবশ্যই তাঁহার জীবনের দিকে দৃক্‌পাত অপরিহার্য্য।

বাঙ্গালা দেশে কবির জীবন আলোচনা করার দস্তুর নাই। আর করিলেও, সে সম্বন্ধে সত্য কথা বলার নিয়ম নাই। আমাদের বোধ হয় একটা বিশ্বাস আছে যে, যিনি ভাল কবি, তিনি সব রকমেই ভাল—তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক থাকিতে পারে না। এ বিশ্বাস অবশ্যই কবির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কিন্তু তথাপি ইহা ভুল। যিনি ভাল উকীল, তিনি খুবই ধার্ম্মিক, সর্ব্বদাই ত এরূপ দেখা যায় না; কিংবা যিনি খুব বড় রাজনৈতিক নেতা হইতে পারেন, পুত্র হিসাবে তিনি খুব মাতৃভক্ত এমন মনে করিবারও কোন হেতু নাই। অথচ যিনি ভাল কাব্য লিখিতে পারেন, তাঁহাকে যে কেন আমরা সকল গুণেরই আধার মনে করি তাহা জানি না। কিন্তু এইরূপ একটা ধারণা আছে বলিয়াই কবির জীবন চিত্রিত করিতে গিয়া আমরা তাঁহাকে সর্ব্বগুণে মণ্ডিত করিয়া তুলি। ইহা কি সমীচীন? বায়রণের অতিবড় ভক্তও তাঁহার জীবনের কলঙ্কগুলি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন না—কেন না তাহা নিষ্প্রয়োজন। বেকনের মত লোকের জীবনী-লেখকেরাও তাঁহার বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগটী পর্য্যন্ত যবনিকার অন্তরালে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই; বরং ইহার একটা নিরপেক্ষ বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্যই কোনও

একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সমস্ত কুৎসিৎ ঘটনা টানিয়া আনিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করায় কোন বাহাদুরী নাই; এবং ইহাতে কাহারও কোন উপকারও হয় না। কিন্তু সত্যেরও ত একটা মর্য্যাদা আছে; যেখানে যে কালার দাগটা রহিয়াছে, তাহাই অস্বাভাবিক আবরণে ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা সঙ্গত নহে। কাব্য বুঝিতে হইলে কবির জীবনের সকল ঘটনাই জানিতে হইবে এমন কোন যুক্তি নাই; কিন্তু আলোচনা করিতে গিয়া সত্য কথা বলিতে হইবে না, এমনও কোন যুক্তি নাই।

লম্‌ব্রোসো (Lombroso), নিসবেট (Nisbet) প্রভৃতি এক নিয়ম করিয়াছেন যে, সাধারণ পাতকী কিংবা উন্মত্ত ব্যক্তি যেমন নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে, প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনেও সে আদর্শ তেমনি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। অবশ্যই এরূপ বিচ্যুতি তেজীয়সাং ন দোষায়। প্রতিভাবান বলিয়াই—সাধারণ লোক হইতে অনেকটা উচ্চ বলিয়াই—সাধারণ মানদণ্ডে তাঁহাদের তেজস্বিতার পরিমাণ করা চলে না। কোনও একদিকে প্রতিভার বিকাশ হয় বলিয়া অন্য দিকে দোষ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে; বরং তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু ইন্দুর কিরণে তাহার কলঙ্কলোপের ন্যায়, প্রতিভাতেও অনেক ত্রুটি নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে।

দোষ ত্রুটি কাহার জীবনেই বা নাই? সাহিত্যিকদের তাহা থাকিতে পারে না, এমন কোন কথাই নাই। কালীপ্রসন্নও জীবনে কখনও ভুল করেন নাই এ কথা তাঁহার অতি ভক্তেরাও কেহ বলেন না। তিনি প্রবল জমীদারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; সেই অবস্থায় কোনও প্রজার প্রতি ভুলিয়াও যে তিনি অবিচার করেন নাই, তাহাই বা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? যে বড় পদে আরূঢ়, তাহার পক্ষে বড় ভুল করাও আশ্চর্য্য নহে; অন্ততঃ তাঁহার সামান্য ভুলেরও ফল বড় হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনিই; এ সকলের সহিত তাঁহার প্রচেষ্টার কোন সম্বন্ধ নাই। নিশ্চয় না জানিলেও ইহা কল্পনা করা কঠিন নয় যে, হয়ত বা তিনি কোন প্রজার লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার কবিতার ছন্দঃপতন হইবে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ন্যায়তঃই হউক আর অন্যায়তঃই হউক, যদিই বা কোন ব্যক্তি তাঁহার ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া থাকে, তথাপি সেজন্য তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার ভঙ্গি বদলাইয়া যাইবে, এমনও নহে। এ সব খুটিনাটির সহিত সাহিত্য চেষ্টার কোনই সম্বন্ধ নাই; এ সকল না জানিলেও তাঁহার সৃষ্ট জিনিষগুলি বুঝিতে পারা যাইবে; কিন্তু এ সকল জানিলে তাঁহার সাহিত্য বুঝিবার কোনই সুবিধা হইবে না। সুতরাং ইহা অযৌক্তিক নহে যে, কালীপ্রসন্নের কোন ভক্তই তাঁহার জীবনের এরূপ সব ঘটনা সংগ্রহের প্রয়াস পান নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বৈদেশিকী

জাপানের ভবিষ্যৎ।

অক্টোবর মাসের Quarterly Review পত্রে প্রকাশিত "Japan and the War" শীর্ষক প্রবন্ধটী জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

জাপান যদি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারে, অর্থাৎ চীনকে ছলে-বলে হস্তগত করিয়া, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এসিয়া হইতে ফরাসী ও ইংরাজকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করে, এই সমস্যায় পাশ্চাত্য রাজনীতিক ধুরন্ধর-

গণ বিচলিত হইয়াছেন। ১৯০৫ সালে রুশিয়াকে বিধ্বস্ত করিবার পরে রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য জাপান যে সকল মতলব আঁটিয়াছে, ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের ফলে য়ুরোপের সর্ব্বনাশ ও জাপানের পৌষ মাস আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কয় বৎসরে জাপানের বাণিজ্য-পোতের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং জাপানী ব্যাঙ্ক ও কারখানায় পূর্ব্বেকার তিনগুণ টাকা খাটিতেছে। ১৯১৪ সালে জাপানে সাড়ে তিন কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল; ১৯১৯ সালে মজুত স্বর্ণের মূল্য কুড়ি কোটী পাউণ্ড। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে জাপানের ইয়েন (Yen) মুদ্রার দাম ছিল দুই শিলিং আধ পেনি, ১৯১৯ সালে উহার দাম দুই শিলিং নয় পেন্স হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বোর্ণিও, সুমাত্রা, যাবা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, মিসর, কেপ কলনি ও দক্ষিণ আমেরিকায় জাপানের যে পরিমাণ মাল রপ্তানি হইত, একমাত্র ১৯১৮ সালে তাহার দশগুণ মূল্যের জিনিস চালান গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপান দেশের পার্লামেণ্ট সভায় Oshikawa Hogi নামক সভ্য বলিয়াছিলেন যে, জাপানকেই ভবিষ্যতে অপর সমস্ত দেশের শিক্ষা-দানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং জাপানীরাই ক্রমশঃ পৃথিবীর অপর সমস্ত দেশের মুরুব্বি হইবে। ("We Japanese are the nation which has the responsibility of instructing and teaching the rest of the world, and is finally destined to become its dominant factor.") ১৯১৯ সালের ৮ই মে তারিখে জাপানের "Niroku" নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিল যে, মহাহব-জনিত সর্ব্বনাশ হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যে শান্তি-সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা জাপানের রাজবংশ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই সফল হইবে। ("The League of Nations proposes to save mankind from the horrors of the war, but it can only attain its real object by placing the Imperial Family of Japan at its head.") এই সকল কথা প্রলাপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ছয় কোটী জাপানবাসী নর-নারী এই ভাবে ভোর।

উত্তর আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই য়ুরোপীয়দিগের প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য দল বাঁধিয়া চেষ্টা হইতেছে। পশ্চিম এসিয়া, ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব এসিয়ায় এই য়ুরোপীয়-বিদ্বেষ যথাক্রমে মুসলমান-সমবায় (Pan-Islam), অশান্তি (Unrest), এবং 'এসিয়া এসিয়াবাসীর জন্য' ('Pan-Asiatic Principle) এই তিন নামে পরিচিত। এই বিদ্বেষানল হু হু করিয়া বাড়িতেছে এবং জাপান ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইন্ধন যোগাইতেছে। ("...Japan as leader of the tide of anti-European feeling, which is rising with ever vaster volume....")

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের একদল লোক বলিতেন যে, সামরিক বল বাড়িলেই ব্যবসা বাণিজ্যের পথ খুলিয়া যায়; আর এক দল বলিতেন যে, 'ট্যাক ভারি' না করিয়া সামরিক বল বাড়ান পণ্ডশ্রম মাত্র। চীন যুদ্ধের অবসান হইতে জাপানের অধিকাংশ লোকের ঘাড়ে সামরিক ভূত চাপিয়াছে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান দেখিল যে কামান দাগিয়া য়ুরোপীয়দের নিকট যে সম্মান পাওয়া যায়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না, এবং চীনের বাণিজ্য হস্তগত করিবার উহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ("Japan's unexpected success in the Chinese War secured a recognition from the European Powers, which years of peaceful progress had been unable to obtain.")

১৮৭৫ সালে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, ১৮৭৬ সালে লুচু দ্বীপপুঞ্জ, ১৮৯৫ সালে ফর্মোজা দ্বীপ, ১৯০৪—৫ সালে পোর্ট আর্থার ও দক্ষিণ সাখেলিয়ন এবং ১৯১০ সালে কোরিয়া দেশ অধিকার করিয়া, জাপান পূর্ব্ব-এসিয়ায় এমন ভাবে জাল বিস্তার করিয়াছে যে; চীন এখন জাপা-

নের মুঠার মধ্যে আসিয়াছে বলিলেই হয়। অর্থাভাবে ও লোকাভাবে য়ুরোপ এখন অর্দ্ধমৃত, সুতরাং চীনদেশে য়ুরোপীয় প্রভাব লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ("This control of China by Japan is the meaning of the Monroe Doctrine for the Far East. The steady whittling away of all European influence out of that enormous country is a policy upon which Japan has unquestionably embarked.")। যে দেশে চল্লিশ কোটি মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী লোকের বাস, শত শত বর্গক্রোশ জুড়িয়া যে দেশে লোহের খনি, সেই চীন দেশে পুরা-মাত্রায় প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য জাপান ক্রমাগত সৈন্য, কামান ও রণপোত বাড়াইতেছে।

য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিতেই জার্মানির কবল হইতে শিংটাও (Tsingtao) উদ্ধারের জন্য জাপান ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে নাই। ইংরাজের বন্ধুত্বে বিহ্বল হইয়াই জাপান যুদ্ধের আসরে নামিয়াছিল তাহা নহে। পাছে শিংটাও চীনের হস্তগত হয়, এই ভয়ে জাপান ঐ চাল চালিয়াছিল। জাপানীরা বরাবর বলিত যে জার্মান ও ইংরাজের রেষারেষি য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ এবং তাহারা দুই দলকেই সমান দোষ দিত। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ ('Fight for Right'), গণতন্ত্রের জন্য চেষ্টা ('Struggle for Democracy'), এই সকল বাক্‌চাতুরিতে জাপানীরা কখনও কর্ণপাত করে নাই। মার্কিন যখন ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত যোগ দিল, তখন জাপান বলিয়াছিল যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অছিলায়, ভবিষ্যতে জাপানকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যেই মার্কিণ এত প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের সরঞ্জাম বাড়াইতেছে। মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের এত অর্থাগম ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী য়ুরোপীয়দের এত অর্থ ও লোক ক্ষয় হইতেছিল যে, যুদ্ধ থামিলে জাপান সন্তুষ্ট হয় নাই।

জাপানের লোকসংখ্যা প্রতি বৎসরে সাড়ে সাত লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে। কিরূপে এই ষষ্ঠীর কৃপায় খাড় পাতিবে, জাপান গভর্মেণ্ট এই ভাবনায় অস্থির। হাওয়াই দ্বীপে এক লক্ষ, ক্যালিফর্ণিয়ায় আশী হাজার, কানাডায় তের হাজার, ব্রেজিলে কুড়ি হাজার, পেরুতে, ছয় হাজার, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পনের হাজার, মালয় উপদ্বীপে দশ হাজার, চীনে একলক্ষ ষাট হাজার এবং কোরিয়াতে তিন লক্ষ জাপানী বাস করে। উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডে নূতন জাপানীর প্রবেশ বন্ধ হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকাও ক্রমে ঐ পথাবলম্বী হইতেছে। জাপান এখন আত্মরক্ষার জন্য ভিন্নদেশে জবরদখল করিতে বাধ্য। ("The Japanese are forced to be expansionists.")। অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা অল্প এবং পতিত জমির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ঐ দেশ যে ভবিষ্যতে জাপানী উপনিবেশে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ("Australia, that vast uninhabited continent, weakly held by the pretensions of a mere handful of white people, and waiting for the coming flood of Asiatic immigration under the leadership of the Mikado.")।

শ্রীগৌরহরি সেন।

পত্র

(গদ্য-কবিতা)

ওগো,

তোমাকে যে আমি আজও চিন্‌তে পারলাম না গো! বসন্তের নবীনতা নিয়ে আমার শীত-জীর্ণ জীবনের পরে কখন বা লাবণ্যের প্লাবন বইয়ে দাও, আবার পরক্ষণেই অনুতাপের হোমানল জ্বেলে সরসতার শেষ স্মৃতিটি পর্য্যন্ত সযত্নে মুছে ফেলে নিষ্কৃতির নিশ্বাস ছাড়। সে নিশ্বাসে স্বস্তি আছে—কিন্তু সে রুদ্রের স্বস্তি। তুমি তো আমার রুদ্র নও গো।

পলকের ভর সয় না—তোমার অনুতাপ আবার জেগে ওঠে। এ অনুতাপ কিন্তু অন্য ধাঁচের। রুদ্র সাম্য হয়ে, শ্যামলতার সৃজন করে। ধারার পর ধারা—অশ্রুর ধারা। এত ধারা তোমার কোথায় ছিল গো! সাধে বলি তুমি আমার অচেনা?

তোমার স্নেহধারার ধার যখন শুধতে পারব না মনে ভাবি—অমনি তুমি হেসে ফেল—আলোকে পলক পড়ে। ভাবি, ছি ছি কি পরিহাস! অবোধ পেয়ে কি এমনই করে গো? অভিমানে গুমরে উঠি, চোখ কিছুতেই খুল্‌তে চায় না! লজ্জার মাথা খেয়ে যখন চোখ খুলি—তখন মরি মরি!

"কত ছল জান বঁধু কত ছল জান—"

এ আলোকে দীপ্তি নাই, আভা আছে—কঠোরতা নাই, কমনীয়তা আছে। এ নিশীথিনী উদাসিনী নয়, বৈরাগিণী—"মধুপুর-নাগরী" নয়, ব্রজপুর কাঙ্গালিনী। এর মাদকতা নাই, মধুরের কাছে এ যে সব বিলিয়েছে!

আনন্দে অধীর হয়ে যখন জপি "সহজ সহজ!" পিছন থেকে হিমের হাওয়া লাগে, উৎস শুকিয়ে গিয়ে সব কঠিন হয়ে ওঠে। সেই পুরাণো খেলা—পুরাণো না নতুন?

সাধে কি বলি গো, তোমাকে আমি এক তিলও চিন্‌তে পারলাম না। কে জানে কবে চিন্‌ব? খাম-খেয়ালীর বশে, সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যেদিন বাউলের বাজারে আশ্রয় নেব—বোধ হয় সেইদিন তোমার স্বরূপের সন্ধান মিল্‌বে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন এই রকমই পাওয়া না পাওয়ার মধ্যেই আমাদের খেলা চল্‌বে। এতও মান!

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

হীরার আংটী

(গল্প)

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "কই গরুর গাড়ী তো একখানিও দেখছি নে।"

আমি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম যে রাত্রি প্রায় পৌনে দুইটা। আমাদের গন্তব্য স্থান সেখান হইতে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ। রাস্তাটি কাঁচা তো বটেই, তার উপর পথিমধ্যে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল আছে, তাহাতে সর্পের প্রসিদ্ধি তো চিরদিনই ছিল, সম্প্রতি আবার গুজব রটিয়াছে যে বাছুর সমেত একটা গরু বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে নাই,—যাহার গরু সে দূর হইতেই ফেউয়ের ডাক শুনিয়া গাভীটির পরিণাম সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিল।

স্বামীজির কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তাই তো, তা হলে উপায়? আমার নিজের গরুর গাড়ী আসবার কথা ছিল, তাও তো আসেনি দেখছি!"

স্বামীজি বলিলেন, "খাসা ফুটফুটে জ্যোৎস্না, সাড়ে তিন ক্রোশ রাস্তা বই তো নয়, চল হেঁটেই যাই।"

মন বলিতেছিল, স্বামীজির কথার প্রতিবাদ করিয়া রাত্রিটুকু ষ্টেশনের ভাঙ্গা বেঞ্চের উপরেই যাপন করা যাক, তার পর প্রভাত হইলেই যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শেয়ালদহ হইতে সমস্ত পথ স্বামীজির সহিত কেবল বীরত্বের গল্প করিতে করিতেই আসিয়াছি—কবে বন্দুক লইয়া সুন্দরবনে বাঘ তাড়া করিয়াছিলাম, লাঠির ঘায়ে কবে বন্য বরাহের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলাম—এই সকল কাল্পনিক কাহিনীর পরে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইতে বড়ই লজ্জাবোধ হইতেছিল, কাযেই তাঁহার অনুগমন করিতে হইল।

পল্লীগ্রামের অসমতল রাস্তা, এক মাইল পথ অতিক্রম না করিতেই আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। গ্রামে আসিবার সময় বরাবরই গরুর গাড়ীতে আসিয়াছি; পদব্রজে যাওয়ার উদ্যম আমার এতখানি বয়সের মধ্যে এই প্রথম।

চক্রবর্ত্তীদের বাঁধা ঘাটের সম্মুখে আসিয়া বলিলাম, "স্বামীজি, আসুন ঐ চাতালে একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া যাক। এতখানি রাস্তা হেঁটে এসে—"

স্বামীজি হাসিয়া সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের চাতালের উপর তাঁহার কম্বল বিছাইলেন। বসিয়া যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। শুক্লা প্রতিপদের চাঁদ তাহার পূর্ণ যৌবন লইয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর জলে মুখ দেখিতেছিল, দীঘির পাড়ের খেজুর নারিকেল ও তালগাছগুলির ছায়া জলের উপর পড়িয়া পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ অঞ্চলে কি পূর্ব্বে কখনও আপনার আসা হয়েছিল?"

স্বামিজী বলিলেন, "না।"

কেমন একটা কৌতূহল হইল। পল্লীগ্রামে সচরাচর যে শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীজিকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকে সে শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হইতেছিল না। বেশ একটা তেজ ও দীপ্তি তাঁহার গম্ভীর মুখশ্রী হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—দেখিলে মন আপনিই নত হইয়া আসে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কলকাতা থেকেই বরাবর আসা হচ্ছে বুঝি?"

স্বামীজি বলিলেন, "না, আসছি আমি হৃষীকেশ থেকে।"

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। হৃষীকেশ হইতে একজন তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী এই রাত্রে পল্লীপথ হাঁটিয়া কি না আমাদের গ্রামে যাইতেছেন। ইহার ভিতরে যে একটা খুব রহস্য লুকায়িত আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

সাধু সন্ন্যাসীদের গৈরিকের অন্তরালে যে তাঁহাদের সাংসারিক জীবনের একটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা আমার চিরদিনের বিশ্বাস, এবং সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও অনন্ত প্রবল। কাযেই স্বামীজিকে প্রশ্ন করিলাম, "মাগুরপোতার ঠাকুরের কি প্রয়োজনে পায়ের ধুলো দেওয়া হচ্ছে, সেটা শুনতে পাই নে? মাগুরপোতায় তো কোন ঠাকুর দেবতার স্থানও নেই।"

স্বামীজি বলিলেন, "কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই এত দূর আসতে হয়েছে বাবা। ঠাকুর দেবতা দর্শন করবার জন্যে নয়।"

আমার বিস্ময় এবার সত্য সত্যই সীমা অতিক্রম করিল। এমন কি কর্ত্তব্য আমাদের মাগুরপোতার বনজঙ্গল ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে থাকিতে পারে, যাহার জন্য এই সন্ন্যাসীকে সুদূর হৃষীকেশ হইতে ছুটিয়া আসিতে হয়? কৌতূহল দমন করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি?"

কথাটা আমার নিকটে প্রকাশ করিবেন কিনা তাহাই কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া স্বামীজি ভাবিলেন, তার পর ব্যাপারটা গোড়া হইতে সুরু করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজি বলিলেন, মাগুরপোতায় অনেকদিন আগে বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ নামে একব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার অবস্থার কথা বলিতে গেলে পল্লীগ্রামের পক্ষে বেশ ভালই বলিতে হইবে। লোকটির পুত্র সন্তান ছিল না, একটিমাত্র মেয়ে, তাঁর নাম জয়দুর্গা।

মেয়েটীর রূপ ছিল না, কিন্তু তার কৃষ্ণবর্ণের ভিতরে গুণের যে অক্ষয় ভাণ্ডারটী ঈশ্বর তাহাকে দিয়াছিলেন, তার দাম রূপের চেয়ে ঢের বেশী।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। জয়দুর্গা আমাদেরই গ্রামের মেয়ে সুতরাং তাহাকে আমি ভালরূপই জানিতাম। তাহার কুৎসিৎ চেহারার সম্বন্ধে অবশ্য আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু গুণের সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যাকথাটাকে স্বীকার করিতে মনের ভিতর দ্বিধা অনুভব করিলাম। কিন্তু স্বামীজিকে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাঁহার গল্প শুনিয়া যাইতে লাগিলাম।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, "গ্রামের জমীদার ছিলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। তাঁর জীবনের একটিমাত্র কার্য্য ছিল, সেটি বিষয় বৃদ্ধি করা। এই নেশাটাই তাঁর সারা জীবনটাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল।

বৈকুণ্ঠ ঘোষের জোৎ জমা এবং নগদ টাকাগুলির উপরে বিশ্বনাথের অনেকদিন হইতেই একটু দৃষ্টি ছিল, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে ঘোষ মহাশয়ের সহিত তিনি একটু বেশী করিয়াই ঘনিষ্ঠতা করিতেন। বৈকুণ্ঠ ঘোষ আগে এতটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। গ্রামের জমিদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবটা চিরদিন বজায় থাকে, ইহা নানাকারণেই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

সেবারে শস্য না হইয়া দেশে হাহাকার উপস্থিত হইল। তাহার ফলে খাজনার আদায় টাকা হইতে লাটের কিস্তির সঙ্কুলান হইল না। সেকালের লোকেরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অপেক্ষা কোম্পানীর কাগজই বেশী পছন্দ করিত, কারণ খুব গুরুতর প্রয়োজন না হইলে সেগুলি খরচ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। বিশ্বনাথ চৌধুরী যখন কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া কিস্তি রক্ষা করিবেন কি না তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না, তখন হঠাৎ বৈকুণ্ঠ ঘোষের কথা স্মরণ হইল। ঘোষ মহাশয়কে ডাকাইয়া বিশ্বনাথ জানাইলেন যে আপাততঃ সাড়ে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ চাই, নচেৎ কিস্তি রক্ষা করিতে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

ঘোষ মহাশয় হাসিয়া জানাইলেন যে টাকা তিনি এখনই আনিয়া দিতেছেন, কিন্তু আর এ রকম করিবার দরকার কি? তাঁহার যাহা কিছু আছে তাহা তো আর তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন না। ছেলেও নাই, সুতরাং সব মেয়েটিই পাইবে। জয়দুর্গাকে ঘরে তুলিয়া লইয়া চৌধুরী মহাশয় এ বৃদ্ধকে একেবারে অব্যাহতি দিন না কেন!

এই প্রস্তাবটির কল্পনা বিশ্বনাথ চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে কখনও করিতে পারেন নাই। সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে কথাটা শুনিয়া তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জানাইলেন যে, এ তো সুন্দর প্রস্তাব। হইলই বা মেয়েটির রং একটু ময়লা—তিনি তো আর আলমারিতে সাজাইয়া রাখিবেন না।

লাটের কিস্তি সেবার রক্ষা হইল বটে, কিন্তু অন্য ব্যাপারটার শেষ এত সহজ হইল না। বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলে বিনোদ চৌধুরী তখন কলিকাতায় থাকিয়া এল, এ পড়িতেছিল, টেষ্ট একজামিন দিয়া বাড়ী আসিয়া সে শুনিল এই ব্যাপার। শুনিয়া সে তো একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! ঐ কালো কুচকুচে মেয়েটা—ছেলেবেলায় কতবার যাহার কাণ মলিয়া দিয়াছে, গায়ে কাদা ছিটকাইয়া দিয়াছে, তাহাকেই কি না বিয়ে করিতে হইবে? কি ভয়ানক কথা! এতদিন নাটক, নভেল, প্রহসন পড়িয়া, থিয়েটার দেখিয়া, অবশেষে তাহার জীবন নাটকের জমাট জায়গাটিতে নায়িকা কি না কৃষ্ণবর্ণা জয়দুর্গার মূর্ত্তিতে আসিয়া সব ওলট পালট করিয়া দিবে? কখনই নয়!

রাগের মাথায় বিনোদ চৌধুরী প্রতিজ্ঞা করিয়া

বসিল যে সে সন্ন্যাসী হইবে, গুহায় গিয়া বাস করিবে, গেরুয়া কাপড় পড়িয়া, কম্বল গায়ে দিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইবে।

ছেলের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বাপ শিহরিয়া উঠিলেন। অনেক বুঝাইয়া ছেলেকে কলিকাতায় পাঠাইয়া, বৈকুণ্ঠ ঘোষকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে তিনি যেন হতাশ না হন, ছেলেকে যেমন করিয়া হউক মত করাইতেই হইবে।

কিন্তু কার্য্যতঃ বিশ্বনাথ দেখিলেন যে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এই বিবাহ সম্বন্ধে যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতা লইয়া পিতাপুত্রে যখন ঘোর তর্ক চলিতেছিল, তখন হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে বিশ্বনাথের মৃত্যু হইল। বিনোদ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া মাগুরপোতায় আসিয়া একেবারে কর্ত্তা হইয়া বসিল।

৩

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইয়া গেলে বৈকুণ্ঠ ঘোষ বিনোদের কাছে আসিয়া একদিন বিবাহের প্রস্তাবটা পুনরায় উত্থাপন করিয়া জানাইলেন যে, আর তো অপেক্ষা করা চলে না, মেয়েটি দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, এখন এই ব্যাপারের যাহা হয় একটা কিছু বিহিত না করিলে পাড়াগাঁয়ে তো আর লোকের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা যায় না।

প্রসঙ্গটা পুনরায় উত্থাপিত হওয়াতে বিনোদ যে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা বৈকুণ্ঠ ঘোষ বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেই একজন পারিষদকে বিনোদ বলিল, "দেখছ হে লোকটার আস্পর্দ্ধা! সেই কালো মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার মতলব এখনও ছাড়েনি।"

পারিষদেরা মুখভঙ্গি করিয়া জানাইল, এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার কথা তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনে নাই! বিনোদ বলিল যে এমন একটি মতলব আঁটিতে হইবে, যাহা দ্বারা বৈকুণ্ঠ ঘোষকে বেশ একটু শিক্ষা দিতে পারা যায়। সভ্যতার লেশমাত্র বর্জ্জিত, ভদ্রোপাধিধারী কৃষকশ্রেণীর ঐ সামান্য লোকটাকে জব্দ না করিলে আর চৌধুরী বংশের মান থাকিবে বলিয়া তো বোধ হয় না!

পারিষদের মধ্যে নবীন বসু নামধারী একব্যক্তি বৈকুণ্ঠ ঘোষের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়াছিল, বৈকুণ্ঠ ইদানীং সেই টাকাটার জন্য একটু তাগাদা সুরু করিয়াছিলেন, সেকারণে এই লোকটী তাঁহার উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিল। সে এই অবসরটুকুর সুযোগ পাইয়া বিনোদকে জানাইল যে, এমন প্ল্যান তাহার মাথায় আছে যাহার দ্বারা সে এক ভারি মজার কাণ্ড করিতে পারে।

এই মজার প্ল্যানটী যে কি তাহা শুনিবার জন্য সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইল। নবীন বলিল, "এক কায করুন গিয়ে। আপনি বৈকুণ্ঠ ঘোষের সঙ্গে এমন ভাবটা দেখাতে আরম্ভ করুন, যেন ওর মেয়েকে দেখে আপনি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছেন। বিয়ের কথাবার্ত্তা চলুক, চাই কি একটা কম দামের জিনিষ টিনিষ প্রেজেন্ট করলেও হয়। তারপর কথাটাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে—একেবারে ভরাডুবি করলেই খুব গ্র্যাণ্ড হবে—"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, ঘোষজার সঙ্গে একটা খিটিমিটি বাধিয়ে দিয়ে, ওরই বাড়ীর সামনে দিয়ে কলকাতার খাস গোরার বাদ্যি বাজিয়ে আপনি অন্য জায়গায় বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবেন। তা হলে সে সময়টা—ওঃ—"

"কি রকম মজাটা"—বলিয়া নবীন নামে সেই লোকটি হাসিয়া একেবারে কুটাকুটি হইয়া গেল।

মতলবটী বোধ হয় বিনোদের খুব পছন্দ হইল। কারণ ইহার কয়েক দিন পরেই সকাল বেলা বিনোদ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ ঘোষের বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া জয়দুর্গাকে ডাকিয়া বলিল—"কি রে খেঁদী, ঘুঁটে দিচ্ছিস দেখছি যে!"

জয়দুর্গা আর লজ্জায় দাঁড়াইতে পারিল না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া সেই গোবরমাখা হাতেই ঘরের ভিতর পলাইয়া গেল। বিনোদ বলিল, "হাতটা ধুয়ে একবার এদিকে আয় তো।"

খেঁদী ওরফে জয়দুর্গা যে তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ প্রতিপালন করিল তাহা নহে। বৈকুণ্ঠ তখন বাড়ীতে ছিলেন না, সেকথা জানিয়াই তবে বিনোদ আসিয়াছিল।

বিনোদ বলিল, "কৈ এলিনে রে খেঁদী! শেষে দেখছি এই বালতীশুদ্ধ জল আমাকে নিজেই তোর হাতে ঢেলে দিতে হবে।"

জয়দুর্গা তখন হাত ধুইয়া জড়সড়ভাবে ঘাড় নিচু করিয়া বিনোদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইতেছিল যে পৃথিবীটা হঠাৎ দ্বিধা হইয়া যদি তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তবেই যেন সে এ লজ্জার হাত হইতে বাঁচে! বিবাহ সম্বন্ধের কোনও কথাটাই তাহার অজ্ঞাত ছিল না, তাই সে লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া গেল। তাহার পিতার ময়লা একখানি ধুতি কাপড় পরিয়া সকালবেলায় তাহাদের বাড়ীর ভিতরে নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুঁটে দিতেছিল, এমন সময়ে কি না তাহার ভাবী বর সাজসজ্জা করিয়া সুগন্ধের ঢেউ খেলাইয়া যেন তাহার ময়লা ধুতিখানি ও গোবরমাখা হাত দুখানিকে পরিহাস করিবার জন্যই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! অদৃষ্টদেবতার কি এমনি নিষ্ঠুরভাবেই পরিহাস করিতে হয়!

জয়দুর্গা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র বিনোদ বলিল, "তোর বাবা বুঝি কামারহাটীতে গিয়েছেন?"

জয়দুর্গা তাহার রুক্ষ মাথাকে ঈষৎ নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তোর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হচ্ছে রে খেঁদী।"

খেঁদীর ঘাড়ের শিরাগুলি যতখানি নীচু হইবার তাহা হইল। বিনোদ পকেট হইতে একটা ভেলভেটের ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া বলিল, "দেখি রে খেঁদী তোর হাতখানা।"

খেঁদী হাতখানার যে অংশটুকু বাহির হইয়াছিল, সেটুকুও কাপড়ের ভিতর লুকাইল। বিনোদ তাহা দেখিয়া হাতখানাকে এক রকম জোর করিয়াই নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, সেই বাক্সটী হইতে একটী চকচকে আংটী বাহির করিয়া তাহার হাতে পরাইয়া দিয়া বলিল, "বাঃ দিব্বি হয়েছে তো রে! আমি ভেবেছিলাম যে হয় ছোট না হয় বড় হবে বুঝি।"

আংটীটার উপর যে সাদা জিনিষটা চক্‌চক্ করিতেছিল উহা দেখাইয়া বিনোদ বলিল এটা হীরা, কিন্তু উহা যে কি তাহা তাহার অন্তরাত্মাই জানিল। তিন দিন পূর্ব্বে আড়াই টাকা দিয়া এই আংটীটা একটা বিলাতী দোকান হইতে সে কিনিয়াছিল, ভেলভেটের বাক্সটি স্বতন্ত্র কিনিবার জন্য তাহাকে আরও আট আনা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

আংটীটা হাতে পরাইয়া বিনোদ জয়দুর্গার হাতখানি ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "এটাকে যত্ন করে রেখে দিস খেঁদী। তোকে যে কতখানি ভালবাসি তা ঐতেই বুঝতে পারবি?"

পাড়ার মুখুয্যে গিন্নী বৈকুণ্ঠ ঘোষের কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। সুদের কয় আনা পয়সা হাতে করিয়া ঠিক এই সময়টীতে "কৈ গো খেঁদীর বাবা" বলিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই, সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিনোদ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সুতরাং তাহাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহা না পারিলেও তাঁহার চোখের উপর ১৩।১৪ বৎসরের অবিবাহিতা মেয়েটীর যে অবস্থাটা দেখিলেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র জয়দুর্গা তাড়াতাড়ি হাতখানা ছাড়াইয়া লইল এবং চমকিত হইয়া বিনোদ যখন পশ্চাতে চাহিল, মুখুয্যে গিন্নী তখন অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

৪

বলাই বাহুল্য এ ব্যাপারের জের অল্পে মিটিল না। বৈকুণ্ঠ ঘোষ বাড়ী আসিয়াই কথাটাকে নানা ভাবে

শুনিলেন, কিন্তু মেয়ের কাছে আংটিদাতার নাম শুনিয়া আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। বিনোদ নিজে আসিয়া তাঁহার মেয়ের হাতে আংটী দিয়া গিয়াছে ইহাতে দূষণীয় কিছুই তিনি দেখিলেন না।

কিন্তু গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপারটাকে ঠিক সে চক্ষে দেখিল না। পিতার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা যে একজন পুরুষের সহিত হাত কাড়াকাড়ি করিতেছিল এ কথাটা ক্রমেই বেশী রাষ্ট্র হইতে লাগিল; এবং বিনোদ চৌধুরী কালাশৌচের আপত্তি করিয়া বিবাহের প্রস্তাবটাকে যতই উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, জনরবের হাওয়াটা ততই উষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে লোকের মুখে মুখে সেদিনকার সেই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা গুরুতর ভাবে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

অবশেষে বৈকুণ্ঠ আসিয়া একদিন বিনোদ চৌধুরীকে বলিলেন, "আর তো অপেক্ষা করা চলে না বাবা। গ্রামের ভিতরে মস্ত একটা ঢি ঢি পড়ে গেছে।"

বিনোদ চৌধুরী মনে মনে হাসিয়া উত্তর দিল যে তাহার তো কোন অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু মেয়েটির সম্বন্ধে একটা কুৎসা সূচক জনরব উঠায় তাহার পিসীমা একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছেন, এবং অন্য আর এক জায়গায় বিবাহের ঠিকঠাক করিয়া ফেলিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠ ঘোষ একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ। তুমিই যে তাকে আংটী দিয়ে—"

বিনোদ মুখখানাকে খুব ভারি করিয়া জানাইল যে তাহার এখন অনেক কায আছে—বাজে খরচ করিবার মত সময় এখন তাহার নাই।

বৈকুণ্ঠ ঘোষের চোখে জল আসিল। বলিলেন, "ও যে বাগ্‌দত্তা হয়ে গিয়েছে। মেয়েটির তা হলে কি হবে?"

বিনোদ সে কথার উত্তর দেওয়ার কোন আবশ্যকতা মনে না করিয়া, একখানি খাতা লইয়া এমনি নিবিষ্টভাবে তাহার লেখাগুলি দেখিতে লাগিল যে বৈকুণ্ঠ বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। বিনোদের এই আচরণে তাঁহার অন্তরে বড়ই আঘাত লাগিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কন্যার নিকট তিনি সমস্ত বিবরণ বলিয়া বলিলেন, "মা, কিছু চিন্তা নেই, দূর করে ও আংটী নর্দমায় ফেলে দাও গে, আমি এখনই যাচ্ছি সোনাগাঁয়ে, সেখানকার মিত্তিরদের বাড়ী যে সম্বন্ধটা আর বছর হয়েছিল, দেখিগে এখন তারা রাজি হয় কি না। হলেই বা তারা গরীব, তোমার কপালে থাকে তুমি রাজরাণী হবে।"

অপরাহ্নে সোনাগাঁ হইতে ম্লানমুখে যখন বৈকুণ্ঠ ঘোষ ফিরিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু দুইটি একেবারে বসিয়া গিয়াছে। অবিবাহিতা কন্যার সম্বন্ধে এই অলীক কুৎসা যে মাগুরপোতার গণ্ডী ছাড়াইয়া সেখানেও পৌঁছিয়াছে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সেদিন জীবনের মধ্যে প্রথম ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমস্যায় তাহাকে ম্রিয়মাণ দেখা গেল।

৫

কিন্তু এমন করিয়াও ব্যাপারটার শেষ হইল না। বাঘে রক্ত খায় তাহার কারণ রক্তের প্রতি তাহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কিন্তু মানুষ যে মানুষের রক্তপান করিতে পারে ইহার কোন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বিনোদ চৌধুরী তাঁহার সেই পারিষদটীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে এইবার আর একটা মজা করা যাক না কেন।"

মতলব যাহা স্থির হইল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন বাধা হইল না এবং মজা তাহাতে খুব বেশী করিয়াই হইল।

সেই ছোকরাটী আসিয়া দুই একদিন পরে বিনা আড়ম্বরেই বৈকুণ্ঠ ঘোষকে বলিল, "ঘোষ মশাই, আপনি যদি দেনাটা থেকে আমায় রেহাই দেন, আর যদি আপ-

নার কোন অমত না থাকে তা হলে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে পারি।"

চিন্তায় এই দুই দিন বৈকুণ্ঠ ঘোষের শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছিল। এই প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত সম্মতি দিলেন, এবং মনে ভাবিলেন যে ভালই হইল, গ্রামের মধ্যেই বিবাহ দিয়া বিনোদ চৌধুরীকে দেখাইয়া দিবেন যে সহস্র কুৎসার ভিতরেও তাহার মেয়ের বিবাহ আটকাইয়া থাকিবার নয়।

দিন স্থির এবং আশীর্ব্বাদ অবিলম্বে হইয়া গেল এবং ক্রমে বিবাহের দিনও আসিয়া পড়িল। বিবাহোৎসব অবশ্য জাঁকালো রকমের হয় নাই, কারণ গ্রামের বৃদ্ধমণ্ডলীর কেহই এই ব্যাপারে যোগ দেন নাই।

বিবাহ সভায় বর সভাস্থ হইয়াছে। পুরোহিত বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। লগ্নের সময়ও আর বড় বেশী দেরী নাই, এমন সময় কোথা হইতে বরের এক শুভাকাঙ্ক্ষী মামা আসিয়া উচ্চ চীৎকারে গগন ফাটাইয়া জানাইলেন যে কিছুতেই এ বিবাহ হইতে পারিবে না, কন্যার সম্বন্ধে অনেক কথা গ্রামে রটনা হইয়াছে, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিলে এ প্রহসনের যবনিকা অনেক পূর্ব্বেই পড়িত।

বৈকুণ্ঠ ঘোষ একেবারে কাঠের পুতুলের মত এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিতে যাইতেছিলেন যে, স্বয়ং বর সকল কথাই জানে এবং সে ইচ্ছা করিয়াই এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু কথাগুলি আর মুখ দিয়া বাহির হইল না। আলো নিবিল, বাজনা থামিল এবং বিবাহোৎসবের সমস্ত কোলাহল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই থামিয়া গিয়া জনহীন উঠানটা যেন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বৈকুণ্ঠ ঘোষ দেখিলেন যে, চেলির কাপড় পড়িয়া তাঁহার কালো মেয়েটি ঘরের এক কোণে অন্ধকারে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া মেয়ের পাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া মেয়েটার মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন। পিতা ও কন্যা উভয়েরই অশ্রু নীরবে ঝরিতে লাগিল।

* * * *

এই ঘটনায় বৈকুণ্ঠের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জমীজমাগুলি সিকি দামে বিক্রয় করিয়া, এক সপ্তাহের মধ্যেই কন্যাকে লইয়া তিনি কাশীযাত্রা করিলেন। বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, বোধ হয় এতদিনে মাটীর ঢিবিতে পরিণত হইয়াছে।

কাশীতে আসিয়া বৈকুণ্ঠ ঘোষ আর বড় বেশী দিন জীবিত রহিলেন না। দুইমাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কন্যার বিবাহের ভাবনা বোধ হয় বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া বৃদ্ধ ইহসংসারে বাঁধন ছিঁড়িলেন।

৬

স্বামীজি এইবার থামিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কাহিনী শুনিতে যাইতেছিলাম, কোন কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। স্বামীজির মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার চক্ষুপ্রান্তে যেন এক বিন্দু অশ্রু চাঁদের আলোতে চক্ চক্ করিতেছে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"তোমরা ছেলেমানুষ, হয় তো ঈশ্বর মান না, কর্ম্মফল মান না। কিন্তু আমার যতটা বিশ্বাস তাহাতে, জানি যে ঈশ্বরও যেমন ধ্রুব, কর্ম্মফলও তেমনি নিশ্চিত। বৈকুণ্ঠ ঘোষ তো ইহসংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইল, কিন্তু বিনোদ চৌধুরীর কি হইল জান?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. "কি?"

স্বামীজি বলিলেন, "ইহকালের ফলভোগ ইহকালেই করিতে হয়। যে পাষণ্ড কেবল নিজের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া একটা নিরীহ জীবনকে ব্যর্থ করিয়া

দিতে পারে, তুমি কি মনে কর ঈশ্বর তাহাকে কোন শাস্তি দিবেন না?"

এ কথায় আমার কিছু বলিবার ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, "একজন নায়েব একটা দলিল জাল করিয়া নিজেও মোকদ্দমায় পড়িল বিনোদকেও তাহাতে জড়াইল। অনেক চেষ্টা করিয়া বিনোদ জেলে যাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল।

আক্রোশের বশে বিনোদ সেই নায়েবকে কর্ম্মচ্যুত করিল। সে প্রতিবেশী এক জমীদারের সহিত চক্রান্ত করিয়া গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাহার অনেক অনিষ্ট করিল, এমন কি খাজনার দায়ে তাহার বিষয় নীলামে উঠিবার উপক্রম হইল।

মাগুরপোতার মুখুয্যেদের একটী স্ত্রীলোক কাশীবাস করিতেন, তিনি আমার মন্ত্রশিষ্যা। পিতার মৃত্যুর পর জয়দুর্গা তাঁহারই নিকটে থাকিত। তাঁহার এক দেবর গঙ্গাস্নান করিতে কাশী আসিয়াছিলেন, বিনোদ চৌধুরীর বর্ত্তমান অবস্থাটা জয়দুর্গা তাঁহারই নিকট সব শুনিল।

কাশীতে আমার শিষ্যার বাড়ীতে প্রথমে যেদিন এই মেয়েটীকে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই দিনই তাহার চক্ষু-কোণে একটা রুদ্রতেজের শিখা দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহাকে বলিয়াছিলাম, "মা তোমাকে আমি দীক্ষা দিব।"

আমার প্রস্তাবটা শুনিয়া সে এমন করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, আমি মনে করিয়াছিলাম যে তাহার মস্তিষ্কের কোন দোষ আছে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সে আমার কাছে আসিয়া তাহার জীবনের এই ঘটনাগুলি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া গেল যে আমি অবাক্ হইলাম। তাহাকে বলিলাম, "মা, তোমার বাপ্ তোমাকে বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তোমার ভিতরে অনেকখানি জিনিষ লুকান আছে।"

কিন্তু তাহার সেদিনেরই একটা আচরণে বড়ই বিস্মিত হইলাম। সন্ধ্যাবেলা ১৫টী শিষ্যর সম্মুখে বসিয়া গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। তর্ক এবং গবেষণা এই দুইটাই যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, তখন সমস্ত রসভঙ্গ করিয়া আমাদের মাঝখানে আসিয়া জয়দুর্গা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল যে, মুখোপাধ্যায় গৃহিণীর দেবরের সহিত সে মাগুরপোতায় যাইবে।

"গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মুহূর্ত্তমধ্যে উড়িয়া গেল এবং মুখোপাধ্যায় গৃহিণী ও তাঁহার দেবর দুজনেই চমকিয়া উঠিয়া তাহাকে স্থির হইতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু সে স্থির হইল না। তাহার মনের মধ্যে যে আগুনটার উপর এতদিন ভিজা কম্বল চাপা দেওয়া ছিল, সেটাকে হঠাৎ যেন কে উঠাইয়া লইল। জয়দুর্গা মুখ গোঁজ করিয়া দুইদিন রহিল; কাহারও সহিত একটী কথাও কহিল না। মাগুরপোতানিবাসী সেই দেবরটী মাগুরপোতায় ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণী তখন আমাকে বলিলেন, "বাবা, মেয়েটার তো বিয়ে হল না, ওকে তুমি দীক্ষা দাও।" জয়দুর্গাকে ডাকিয়া তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলাম। সে হাঁ না কিছুই বলিল না।

তার জীবনের সব কথাগুলিই শুনিয়াছিলাম, সুতরাং টানটা যে কোথায় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "মা এইটুকু বয়সের মধ্যে সৌন্দর্য্যটাকেই দেখিয়াছ, সুন্দরকে তো এখনও দেখিতে পাও নাই। সুতরাং তোমার দীক্ষা লওয়া অত্যাবশ্যক।"

তাহাকে দীক্ষা দিলাম। এই মেয়েটীকে ভবিষ্যতে গড়িয়া তুলিবার অনেকগুলি উপায় সেদিন আমি কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরদিন ভোর বেলায় উঠিয়াই আমাকে বড় হতাশ হইতে হইল।

সকালে উঠিয়াই দেখা গেল যে জয়দুর্গা বাড়ীতে নাই। পাড়ার মধ্যে, গঙ্গার ঘাটে, বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে অনেক অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। এত সহজে যে সে আমাকে

ফাঁকি দিতে পারিবে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই।

তার পর—প্রায় পাঁচ বৎসর পরে হৃষীকেশে আমার আশ্রমে জয়দুর্গার এক পত্র পাইলাম। আমার নূতন আশ্রমের ঠিকানা সে কেমন করিয়া জানিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পত্রখানি পড়িয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম।

কেমন করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া ষ্টেশনে আসিয়া, এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়িয়া পুনরায় কাশীতে যায় এবং তার পরে কি কি উপায়ে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আসিয়া সেইখানেই পরম শান্তিতে সে দিনযাপন করিতেছে, তাহার একটা বিবরণ লিখিয়া জয়দুর্গা আমাকে পত্রখানিতে অনুরোধ করিয়াছিল যে, পত্রের সহিত বিনোদ চৌধুরীর প্রদত্ত যে হীরার আংটাটি সে পাঠাইল, সেটা যেন গুরুদেব দয়া করিয়া মাগুরপোতায় তাহার প্রদাতার নিকট পাঠাইয়া দেন। যদি সে সুযোগ তাঁহার না ঘটে, তাহা হইলে গঙ্গার জলে যেন সেটি ফেলিয়া দেন।

বুঝিলাম, তাহার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে যে কাঁটাটির শেষ অংশটুকু বাধিয়া ছিল, সেটুকুও সে দূর করিতে চায়। মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। উদ্দেশে জয়দুর্গাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আংটাটি হাতে লইয়া দেখিলাম যে তাহার পিত্তল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হীরক বলিয়া যে কাঁচখানি তাহাতে বসান হইয়াছিল সেটা তখনও চক্ চক্ করিতেছে। আংটাটি লইয়া সেইদিনই মাগুরপোতার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

* * * * *

এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া স্বামীজির গল্প শুনিতেছিলাম, এইবার চমকিয়া উঠিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে আংটাটা কি আপনার সঙ্গে এনেছেন ?"

স্বামীজি বলিলেন, "এনেছি বৈ কি। তা আনবো না!"—বলিয়া নিজের আঙরাখার পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র পুটুলি টানিয়া, সেটি খুলিয়া একটী আংটী বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। চাঁদের আলোতে সেটি চিকমিক করিয়া উঠিল।

আংটাটা লইয়া কয়েকবার নাড়াচাড়া করিলাম। তারপর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর জলে সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

স্বামীজি হাঁ হাঁ করিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি বলিলাম, "ঠাকুর, জয়দুর্গার ধর্ম্ম-পথে অবশ্য বাধা দিতে চাইনে। কিন্তু সব শুনেও আপনি আমাকে ক্ষমা করুন !"

স্বামীজি বিস্ময়ের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন ?"

কি উত্তর দিব ? ঘাড় হেট করিয়া বলিতে হইল —"এই অধমের নামই বিনোদবিহারী চৌধুরী।"

স্বামীজি চমকিয়া কয়েকপদ পিছাইয়া গেলেন। আমি সেইভাবেই বসিয়া রহিলাম। ঘাড় আর তুলিতে পারিলাম না। সর্ব্বাঙ্গে কে যেন চাবুক মারিতেছিল।

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

কলির কালনিমে।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৪এ নং রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸৹

ইহা একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। লেখক আমাদের বঙ্গীয় পল্লী-সমাজের একটি গার্হস্থ্য চিত্র অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, সাহিত্য-সমাজে তিনি একজন সুলেখক বলিয়াই প্রখ্যাত। উপন্যাসাকারে "পল্লীজীবনের গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কনের" এই তাঁহার "প্রথম চেষ্টা" হইলেও আমরা ইহা পাঠ করিয়া নিরাশ হই নাই। পল্লীর গার্হস্থ্য জীবনে ইহা একখানি নিখুঁত চিত্র। আজকাল উপন্যাসে অনাবিল ভাবে কিছু কিছু অলৌকিক, বিস্ময়কর, লোক-

হর্ষণ ইত্যাকার ঘটনা না থাকিলে যেমন সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা চিত্তাকর্ষক হয় না, সুখের বিষয়, আমাদের আলোচ্য উপন্যাসখানি সেরূপ নহে। বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত কোনখানেই স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করে নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন একটি বাস্তব সত্য ঘটনাই পাঠ করিতেছি। ইহা উপন্যাসখানির একটি বিশেষত্ব বলা যায়। গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কনে লেখকের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসে সেকালের গ্রাম্য পাঠশালাগুলি এবং গুরুমহাশয় ও পড়ুয়াগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও আচরণ কিরূপ কৌতুহলজনক ব্যাপার ছিল, পাঠকগণ তাহার একটি অবিকল চিত্র বর্ণিত দেখিবেন। তারপর ধনী পিতার "সবে ধন নিলমণি" একমাত্র পুত্র বিদ্যাশিক্ষা ও সৎশিক্ষার অভাবে আত্মীয় স্বজনের নিকট কেবল অযথা আদর ও প্রশ্রয় লাভ করিলে কিরূপ দুর্ব্বিনীত ও অসচ্চরিত্র এবং পরিণামে কিরূপ দুর্গতিগ্রস্ত হয়, শয়তানের অবতার শ্যামসুন্দরের চরিত্রে তাহাও সুপরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন। এই কুলাঙ্গার শ্যামসুন্দরের পৃষ্ঠপোষক, যথা—তার পিতা চক্রধর, ভগিনী মনোমোহিনী, পত্নী তড়িতাসুন্দরী ও শাশুড়ী রাসমোহিনী প্রভৃতির চরিত্রগুলিও যথাযথভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অপর তিনটি চরিত্র শ্যামসুন্দরের ভগিনীপতি ইন্দুভূষণ ও তাঁহার ভ্রাতা যামিনীভূষণ এবং জমীদার হরিমোহন বাবু। এই তিনটি চরিত্রই আদর্শ বা দেবচরিত্র। পাঠকগণ এই তিনটি চরিত্রকাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন। লেখক মহাশয় উপন্যাস বর্ণিত কুচরিত্র ও সুচরিত্র এই দ্বিবিধ চরিত্রেরই ভিতর দিয়া আমাদিগকে প্রভুত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন। চরিত্র ও ঘটনা বৈচিত্র্য এবং ভাষা সৌন্দর্য্য ও রচনানৈপুণ্যে গ্রন্থখানি বেশ সুপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। সেকাল ও একালের স্ত্রীলোকদিগের তুলনায় চরিত্র সমালোচনা খুব হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। এরূপ পুস্তক সকলেরই পাঠ করা উচিত।

মর্ম্মস্মৃতি।—শ্রীমতী সুরুচিবালা রায় প্রণীত। কলিকাতা ১২নং নারিকেল বাগান লেন, "লক্ষ্মীবিলাস" যন্ত্রে মুদ্রিত ও ১৫ নং নারিকেল বাগান লেন হইতে শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

এখানি গল্পপুস্তক, আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। পুস্তকখানি ঠিক গল্পেরই উপযোগী স্বচ্ছ ও সরল ভাষায় বেশ গুছাইয়া লেখা হইয়াছে। প্লট্‌গুলি নূতন না হইলেও লিখিবার ভঙ্গী ও পরিপাট্যে গল্পগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা, যেমন সরস ও ঝরঝরে, তেমনি সুরুচিমার্জ্জিত। পুস্তকখানির ভাষা ও রচনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। লেখিকার গল্প লিখিবার যেমন শক্তি আছে, চরিত্র পর্য্যবেক্ষণেও তেমনই অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প কয়টির মধ্যে "মর্ম্মস্মৃতি", "দুকুলহারা", "প্রবাসের পত্র" ও "কমলা" এই চারিটি আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। "প্রবাসের পত্র" গল্পে জাপানী বালিকা চন্নার চরিত্র ও করুণ কাহিনী অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। এই উপন্যাস ও গল্পের যুগে আলোচ্য পুস্তকখানি যে পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট উপেক্ষিত হইবে না, তাহা সাহস করিয়া বলা যায়।

ষড়-অবতার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ষ্টাণ্ডার্ড ড্রগ্‌ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ; ৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸৹

ইহা একখানি হাস্যরসাত্মক সচিত্র গল্পের বহি, ছোট ছোট ছয়টি গল্পের সমষ্টি। ছয়টি গল্পে ছয় রকমের ছয়টি অবতারের কৌতুকাবহ কীর্ত্তিকাহিনী বেশ সরস করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গল্পগুলি পাঠ করিতে করিতে আমরা সত্য সত্যই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। গল্প কয়টিতে লেখকের পরিহাসনিপুণতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের হাসাইবার ক্ষমতা আছে। ভাষাটি গল্পেরই মত স্বাভাবিক, বেশ স্বচ্ছ, সরল ও ঝরঝরে। "নূতন জামাই", "বিষম স্বদেশী" এবং "খুড়োর বরাত" এই গল্প তিনটি সব চেয়ে উপভোগ্য হইয়াছে।

হাস্য-রসাত্মক রচনা অনেক সময় একটু অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই শ্লীলতা রক্ষা করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা গল্পগুলির একটি বিশেষত্ব বলা যায়।

গ্রন্থ-সংযোজিত ছয়খানি ছবির চিত্রকর সুবিখ্যাত শিল্পী স্বয়ং শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন, সুতরাং চিত্রের আর পরিচয় দিতে হইবে না।

বাঘের বাচ্চা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম্‌-এস্‌ প্রণীত। কলিকাতা, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীবিজয়কুমার মৈত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী, ৩৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥৹

ইহা একখানি সুবৃহৎ "ডাক্তারী উপন্যাস"। "ডাক্তারী উপন্যাস" শুনিয়া হয়ত পাঠকগণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিবেন, এ আবার কি? এজন্য গ্রন্থকার মুখপত্রেই বলিয়াছেন—"নভেল বলিতে লোকে যাহা বুঝে, 'বাঘের বাচ্চা' ঠিক সে শ্রেণীর

উপন্যাস নহে। প্রেমের কথা না থাকিলে নভেলই হয় না, 'বাঘের বাচ্চায়' তাহার অভাব নাই। ইহার উপর, ইহাতে আদর্শ চিকিৎসকের চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।" আশা করি, ইহা হইতেই পাঠকগণ উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। গ্রন্থকার নিজে চিকিৎসক। তিনি তাঁহার এই "ডাক্তারী উপন্যাস"খানিতে বেশ একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। তার মধ্যে দীননাথ, সুখলতা, সুশীলা, মন্মথ ও মাখনের চরিত্রই প্রধান। এই কয়টি চরিত্রের ভিতর দিয়া গ্রন্থকার অনেক রকম তত্ত্বের অবতারণা ও তাহার দোষগুণের আলোচনা করিয়াছেন। সুখলতা ও ডাক্তার দীননাথের চরিত্র তিনি আদর্শ রূপেই গড়িয়াছেন। দুইটি চরিত্রই বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। আনুসঙ্গিক চরিত্রগুলিও যথাসম্ভব পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থকার আজকালকার চিকিৎসাপ্রণালী ও চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে ও স্পষ্ট বাক্যে যে তীব্র কটাক্ষ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা একটুও অন্যায় ও অসঙ্গত হয় নাই। আলোচ্য উপন্যাসে দীননাথের চরিত্রই উচ্চ চরিত্র এবং এই উপন্যাসের নায়ক দীননাথই যে "বাঘের বাচ্চা" পাঠকগণ গ্রন্থপাঠে তাহা বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত ও প্রীত হইয়াছি।

"কমলাকান্ত।"

সাহিত্য-সমাচার

শোক-সংবাদ।

"নব্যভারত" মাসিক পত্রের প্রবীণ সম্পাদক, নানা সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাধু সৎকর্ম্মশীল দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়, বিগত ১৮ই আশ্বিন দেওঘরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে "নব্যভারত" তিনি ৩৮ বৎসর কাল সম্পাদন করিয়া উহাকে সুধী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী সে "নব্যভারত" খানি যাহাতে লুপ্ত না হয়, সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করিবেন।

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যার সাহিত্য-সমাচারে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে যে বারটি পদক পুরস্কার প্রভৃতির সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল "১১শ বিষয়ে প্রবন্ধ আগামী পূজার ছুটির মধ্যে এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ৩১শে চৈত্র মধ্যে পরিষৎ সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।"—সম্প্রতি ১১শ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রেরণ সম্বন্ধেও, ৩১শে চৈত্র শেষদিন ধার্য্য হইয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে প্রবন্ধ প্রেরণের শেষ দিন—আগামী ৩১শে চৈত্র।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্প-গ্রন্থ "দেওয়ালী" প্রকাশিত হইল—মূল্য ৸০

মাইকেল লাইব্রেরী, খিদিরপুর :—আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাসন্তী-পঞ্চমী দিবসে কবিবর মধুসূদনের স্মরণার্থ উক্ত পাঠাগারের অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিক "মধুমিলন" উৎসব সম্পাদিত হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দুইটি বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধ ও কবিতা লেখকদ্বয়কে দুইটি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে।

১। প্রবন্ধ—"ভারতীয় শিল্পের অভ্যুদয় ও ভবিষ্যৎ।"

২। কবিতা—"মেঘনাদে প্রমীলা।"

প্রথম প্রবন্ধ ফুলস্কেপের ১২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ৬ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। আগামী ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে রচনাগুলি উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



কণ্বমুনি ও সংজ্ঞাহতা শকুন্তলা

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৭

২য় খণ্ড
৫ম সংখ্যা

াগ

প্রয়োগ ব্যতীত সকল বিদ্যাই বৃথা। বিদ্যাকে শুধু অর্জ্জন করিলেই কেহ বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ না করিলে যেমন তাহা জীবনধারণের কোন সহায়তা করে না, বিদ্যাকেও মানসিক পাকযন্ত্রে জীর্ণ করিয়া আপনার রক্তমাংসে অঙ্গীভূত না করিলে তাহাও মানবজীবনের পক্ষে একটুও হিতসাধন করিবে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির চালনা ব্যতীত যেমন ভুক্ত পদার্থ হইতে অর্জ্জিত দৈহিক শক্তি আবার জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং নূতন আহার্য্য গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মে না, সেইরূপ প্রয়োগ ব্যতীত সকল বিদ্যাই জড়ীভূত হয়, বিদ্যোন্নতিরও উপায় থাকে না।

অন্তর যখন সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় লাভ করিয়া ভাবকে সমাদরে গ্রহণ করে, তখনই তাহা জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। যে বিদ্যাকে মস্তিষ্কে কেবল ক্ষণকালের জন্য স্থান দেওয়া হইয়াছে—তাহার সহিত আত্মীয়তা করা হয় নাই—সে অপরিচিত অনাত্মীয়, সে জীবনের কোনও কার্যেই সহায় হইবে না। যে সকল বিষয় জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহারা জীবনের প্রত্যেক বিকাশেই আত্মপ্রকাশ করিবে এবং জীবনের প্রতি কার্যেই সহায়তা করিবে। বিদ্যা যখন জীবনের অঙ্গীভূত, তখন তাহা জীবনের বর্ণে প্রতি ভঙ্গিতে প্রতি পদক্ষেপে প্রতি বাক্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইবে। এই প্রকাশই বিদ্যার সার্থকতা ও পূর্ণতা। এই প্রকাশই বিদ্যার প্রকৃত পরীক্ষা।

বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যা মনোগুহায় নিহিত থাকিতে পারে না, তাহা প্রকাশলাভ করিবেই—কারণ প্রকাশেই তাহার জীবন। বিদ্যাকে কিছুকালের জন্য মস্তিষ্কে স্থান দিয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে সগর্ব্বে প্রকাশ করাও যাইতে পারে। তাহাকে 'বিদ্যে ফলানো' বলে। এই বিদ্যেফলানো দেখিয়া বিদ্বানের বিচার হয় না। বিদ্বানের বিদ্যা আপনিই সহজ সরল ও স্বাভাবিকভাবে আপনিই প্রকাশিত হইবে—তাহাকে জোর করিয়া প্রকাশ করিতে হয় না। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন—

তব আহ্বান আসিবে যখন,
সে কথা কেমনে করিবে গোপন?
সকল বাক্য সকল কর্ম্ম
প্রকাশিবে তব আরাধনা।

—বিদ্যা সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে বিদ্বানের বিদ্যা আপনিই আত্মপ্রকাশ করিবে। কথা ও কর্ম্মগুলিকে বাহন করিয়া বিদ্যা মস্তিষ্ক হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইয়া আসিবে না—সকল কর্ম্ম ও সকল বাক্যকে বিদ্যা অন্তরের সিংহাসনে বসিয়াই আপনার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া বিশ্বে প্রেরণ করিবে।

বিদ্যার নানাবিধ শাখা আছে। নানাভাবে বিদ্যাকে বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি বিদ্যা কর্ম্মে, কতকগুলি বাক্যে এবং কর্ম্মে, কতকগুলি বাক্যে সম্যক্ প্রকাশ লাভ করে। যে বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে তাহা বাক্য ও কর্ম্ম উভয়েই সমান ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যে বিদ্যা শুধু কর্ম্মে বা শুধু বাক্যে প্রকাশিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ জীবনগত না হইলেও, কতকটা আয়ত্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্র না পাইলে বিদ্যা চিন্তার মধ্য দিয়া বাক্যেই শুধু প্রকাশিত হইতে থাকে। যাঁহারা উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পান নাই তাঁহাদের চিন্তাশীলতা ও বিদ্যার উজ্জ্বলতা বাক্যে প্রকাশিত হইলেও আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া থাকি। কারণ ভাব ও চিন্তাই অধিকতর শাশ্বত ও কাম্যধন। কর্ম্মে প্রকাশিত না হইলেও জীবনে তাহার প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য হইয়াছে ইহাও কম লাভ নহে।

বাক্য বিদ্যাকে দুইভাগে প্রকাশিত করে—লিখনে ও কথনে। বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যা সে হিসাবে গ্রন্থ প্রবন্ধ পত্র ইত্যাদি প্রণয়নে, বক্তৃতা অধ্যাপনা বিচার বিতর্ক কথোপকথন ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

বিদ্যার্থী যখন বিদ্যা আহরণ করে তখন সে তাহাকে মস্তিষ্কে কষ্টচেষ্টায় স্থান দিয়া তাহার মনের অন্যান্য ভাবনিচয়ের সহিত অপরিচিত করিয়া রাখিতে পারে; আবার তাহাকে অন্তরে স্থান দিয়া তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত ভাব ও চিন্তাপুঞ্জের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া দিয়াও রক্ষা করিতে পারে; আবার তাহাকে জীবনের রসরক্তের মধ্যে ডুবাইয়া দিতেও পারে। প্রথমোক্তভাবে আহৃত বিদ্যাকে সে প্রয়োজন হইলে অবিকৃত ভাবে আবৃত্তি করিয়া জানাইতে পারে, দ্বিতীয়োক্ত ভাবে অর্জ্জিত বিদ্যাকে সে জীবনের নানা উপলক্ষে তাহার সুপরিচিত ভাবপুঞ্জের সঙ্গে প্রকাশ করিতে পারে, তৃতীয়োক্ত ভাবে আহৃত বিদ্যা তাহার জীবনের সকল বাক্য ও কর্ম্মে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে—তাহা জীবনের মধ্যেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

যাহার সকল বিদ্যা প্রথমোক্ত ভাবে আহৃত, সে ভারবাহী মাত্র। পরের বিদ্যা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যাইয়াও পরেরই হইয়া আছে—তাহার উপর বাহকের কোন দাবী দাওয়া নাই। এবং তাহার প্রকাশের স্থান ও অবসর জীবনে ঘটে কি না সন্দেহ। সে নানা জনের নানা ভাব তত্ত্ব ও চিন্তার সংগ্রহকারী। তাহার মস্তিষ্ক একখানি অভিধানমাত্র।

দ্বিতীয়োক্ত ভাবে আহৃত বিদ্যা বিদ্বানের কতকটা নিজস্বীকৃত। যাহা পরের ছিল তাহা তাহার নিজেরই হইয়াছে, সে ভারবাহীমাত্র নহে। এইভাবে অর্জ্জিত বিদ্যার অনশনে প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা নাই—কারণ তাহারা তাহাদের নূতন নিলয়ে সন্তান-স্নেহেই প্রতিপালিত হইতে থাকে। প্রতিপালক তাহাদিগকে অন্তরের রসদানে নূতনভাবে গঠিত করিতে থাকে; ভাষার সজ্জা পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজের গৃহের ভাষা-সজ্জা দান করিয়া সাজাইয়া রাখে এবং জীবনের নানা উপলক্ষেই তাহাদের বহির্গমন ঘটে। ইহারা প্রতিপালকের মনোগঠনে সাহায্য করে।

তৃতীয়োক্ত ভাবে আহৃত বিদ্যার ভাষা-সজ্জা ত থাকেই না, দেহও থাকে না; কেবল আত্মাটুকু বিদ্বানের আত্মায় মিশিয়া যায়। ইহারা শুধু মনোগঠনের সাহায্য করে বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, ইহারা তাহার মনের organic অংশ। বিদ্বানের মনের মধ্যে তাহারা সর্ব্বস্ব হারায়—তাহাদের প্রকৃতি গতি রীতি ভঙ্গি ইত্যাদি মনের শিরা উপশিরা দিয়া ভাব ও রসের শোণিতরূপে বহিতে থাকে। বাহির হইতে যে রূপ

ধরিয়া তাহারা বিদ্বানের মনে প্রবেশ করে, প্রথমে তাহাদের সেইরূপই থাকে; দ্বিতীয়ে কিছু রূপান্তর ঘটিলেও তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা যায়; তৃতীয়ে কিন্তু তাহাদের কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সব রূপই ভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যা পার্শ্বে রহিয়া বচনকে মনোহর করে; তৃতীয় প্রকার অন্তরে রহিয়া বচনকে মহিমান্বিত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পতাকা শীর্ষে ধরিয়া শত শত ছাত্র প্রথম প্রকার বিদ্যার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আবার আহৃত বিদ্যা অবিকৃতভাবে মুখস্থ বলিয়া শত শত অধ্যাপক ছাত্রগণের জীবনকে নষ্ট করিতেছেন।

অন্নসমস্যা এই জয়পতাকার দাম বাড়াইয়াছে। জয়পতাকার লোভে ছাত্রগণ মা-সরস্বতীকে প্রবঞ্চনা করিতে শিখিয়াছে। অন্তর যাহাকে চাহে না, যাহাকে কখনও ভালবাসে নাই, যাহার প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক ও সহজ টান নাই তাহাকেই জোর করিয়া অনিচ্ছায় মস্তিষ্কে স্থান দেয়। ইচ্ছা থাকিলেও আহৃত বিদ্যার সহিত অন্তরের ও অন্তঃপুরের পরিচয় ও আত্মীয়তা স্থাপনের অবসর নাই। এইরূপ নানা কারণে তাহাদের মস্তিষ্ক নানাপ্রকার চিন্তার অস্পষ্ট রূপের গতায়াতের পান্থনিবাস মাত্র; ঐ সকল মস্তিষ্কের প্রতি উহাদের কোন মমতা নাই—উভয়ই উভয়কে দুদিনেই ভুলিয়া যায়।

পরীক্ষা-সাগর তরাইবার জন্য অধ্যাপক নোট দেন, ছাত্র তাহাই মুখস্থ করে। ছাত্রের যাহা কিছু পরিচয় ভাষার সঙ্গে—ভাবের সঙ্গে পরিচয় অতি ক্ষীণ। নির্ব্বিচারে ভোজন, তাহার পরই উদ্গিরণ—রোমন্থনের অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। মনের পুষ্টি বিশেষ কিছু হয় না। যাহা কিছু অন্ন সংস্থানের জন্য প্রয়োজন, তাহা থাকিয়া যায়। বাকী সবই দুই দিনে হারাইয়া যায়। যাহারা বিদ্যার জন্য বিদ্যা অর্জ্জন করে, তাহারা বিদ্যার সহিত এ ভাবে পরিচয় সাধন করে না। যাহারা অন্নসংস্থানের জন্য বিদ্যাকে করণ বা উপকরণ মনে করে, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়-জননীকে এই ভাবে ফাঁকি দেয়। কিন্তু পরে কর্ম্মজীবনে আহৃত কোনও বিদ্যারই সাহায্য না পাইয়া বা প্রয়োগের জন্য কোনও বিদ্যাই খুঁজিয়া না পাইয়া অনুতপ্ত হয় কি না জানি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াও তাহারা যদি বিদ্যার সর্ব্বাঙ্গ অনুশীলন করে এবং ধীরে ধীরে নির্ব্বিচারাহৃত পরবিদ্যাকে নিজস্ব করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহারা সত্যই বিদ্বান্ হইতে পারে। সে জন্য অনেকে ছাত্রাবস্থায় বিশেষ কিছু শিখিতে না পারিয়া, পরে অধ্যাপকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত বিদ্যা আহরণ করিয়া থাকেন। অধ্যাপনা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিলে বিদ্যার্জ্জন করা সহজ ও সুবিধাজনক হয় না। অবশ্য সকল নিয়মেরই কিছু কিছু না ব্যত্যয় আছে। অধ্যাপনা ব্যতীত অন্য জীবনযাত্রাতেও বিদ্যালোচনা চলে না তাহা নহে—তবে সাধারণতঃ অধ্যাপকের জীবনে এই সুযোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই প্রকারে অর্জ্জিত বিদ্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যার প্রয়োগ স্থল মাত্র দুই এক বার জীবনে ঘটে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামন্দিরে। জীবনের সহিত যাহার কোনও প্রকার সংযোগ ঘটে নাই, তাহা স্মৃতিপথে বিদ্যমান থাকিলেও জীবনের কোনও উপলক্ষে তাহাদের প্রয়োগ ঘটিয়া উঠে না। যদি কোনও ধনুর্দ্ধর ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার পর কোন গুরুতর অপরাধের জন্য গুরুর নিকট বিদায়কালে অভিশাপ প্রাপ্ত হয় যে সংগ্রামকালে তাহার প্রয়োগ-মন্ত্র বিস্মৃত হইবে, তাহার যে অবস্থা হয়, বহুছাত্র গ্রন্থভারানত স্কন্ধে মুক্তিপত্র লাভকালে গুরুকুলবাসের অন্তে সেইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। ধনুর্দ্ধর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াও প্রয়োগ-জ্ঞান-শূন্যতার জন্য তূণভার বহন ক্ষত্রিয়ের বিড়ম্বনা মাত্র। ঐ প্রকারের বিদ্বানের বিড়ম্বনাও এই জাতীয়। লোকে অনেক সময় প্রবঞ্চিত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যাশূন্য বিদ্বান্ আপনার অক্ষমতা ও জ্ঞানদৈন্য কি বুঝিতে পারে না? আত্মবঞ্চনা শেষে আত্মলাঞ্ছনাতে পরিণত হয়।

প্রথম প্রকারের বিদ্যাহরণ শুধু মেধার সাহায্যেই

হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্যাহরণে মেধার সহিত ধীশক্তির প্রয়োজন। Association, assimilation, integration ইত্যাদি উপায়ে ধীশক্তি পরের জ্ঞানকে নিজের করিয়া লয়। সমান সমানকে চায়, এক অংশ অপর অংশকে চায়, এক ভাব তাহার বিপরীত ভাবটিকে চায়। এইরূপ চিন্তা ও ভাবপুঞ্জের মধ্যে একটা মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে। ধীশক্তি ঐ মিলন ঘটাইয়া দেয়। ধীশক্তি অন্তরেই কতকগুলি ভাবের পূর্ব্ব হইতেই উদ্বোধন করিয়া রাখে। এ মনে এই প্রকারের কতকগুলি মৌলিকভাব না জন্মে যে মনে বাহিরের জ্ঞান সহজে অন্তরের আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারে। ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে যে সকল চিন্তা-পুঞ্জ deductively evolve করিতে থাকে তাহারাই বহির্গত বিদ্যাকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এইভাবে বাহিরের বিদ্যা ও ভিতরের উদ্বুদ্ধ ভাবগুলি এবং পূর্ব্ব হইতে স্বীকৃত ভাবগুলি একত্র মিলিয়া একটি আত্মীয় সংসার সৃষ্টি করে—জ্ঞানের একটি organism নির্ম্মিত হয়। পরের কোনও বিদ্যা বা চিন্তা বিদ্বানের মনে সেই সংসারের বাহিরে অপরিচিত বা অনাত্মীয় হইয়া একাকী বাস করে না। এইরূপ ভাব ও অনুভাবের সংসারটি বিদ্বানের বাক্য ও কর্ম্মকে সাহায্য করিয়া থাকে, সমান ধর্ম্মাপন্ন বিষয় বা ভাবকে দেখিলেই তাহারা বাহিরে আসে। এই জন্য তাহার বিদ্যা বেশ সুপ্রযুক্ত হয়। ঠিক যে বিষয়টির সহিত যে জ্ঞানটির ভাবসাম্য আছে, সে বিষয়টির আহ্বানে সে জ্ঞানটি বিদ্বানের মন হইতে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই বিদ্যার প্রকৃত প্রয়োগ। বিদ্বানের মনে যে সকল ভাব ও অনুভাব একত্র ঘনসন্নিবদ্ধ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে বাস করে, তাহাদের একটির প্রকাশে অন্যগুলিও সেই টানে টানে প্রকাশিত হয়। এই প্রকার প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করিয়াই সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করিতে পারে। যেমনটি মনে গড়িয়া উঠিয়াছে, বাহিরেও তাহার ক্রমিক সুবিন্যস্ত প্রকাশেই সাহিত্যের সৃষ্টি। বক্তার বক্তৃতায় তাহাদের অনর্গল প্রকাশ—বক্তৃতায় বক্তব্যের অভাব হয় না। কবির কবিতায় মালা এই ভাবে গ্রথিত হয়। এই ভাবে উপমাদি অলঙ্কারের বহুল সমাগম—অনুপ্রাস ও মিল কবির পক্ষে এই জন্যই সহজ ও সুলভ। এইরূপে বিদ্যার্জ্জন করিলে অধ্যাপকের অধ্যাপনাও নীরস চর্ব্বিতচর্ব্বণ হয় না—অধ্যাপক অধ্যাপিত বিষয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ না করিয়া সমভাবাপন্ন চিন্তা ও তত্ত্বপুঞ্জের মুহুর্মুহুঃ অবতারণা করিয়া অধ্যাপনাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারেন এবং ছাত্রের চিত্তেও ঐরূপ জ্ঞানের সংসার সৃষ্টি করিতে পারেন। বিচারক হইলে তাঁহার বিচার, তার্কিক হইলে তাঁহার তর্ক সুযুক্তি-সঙ্গত হইবে। কথোপকথনে তাঁহার বিশেষত্ব থাকিবে—তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া লোকে শিক্ষালাভ করিবে। সকল জিনিষই গুছাইয়া সাজাইয়া শৃঙ্খলার সহিত বিশদভাবে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার বিদ্যমান থাকিবে। এই সুবিন্যাসিনী শক্তিই বিদ্যা আহরণের প্রধান সার্থকতা। এজন্য ধী ও মেধা উভয় শক্তির সমধিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন। এই সকল বিদ্বান ব্যক্তি এক শাস্ত্রের তত্ত্ব অন্য শাস্ত্রানুশীলনে প্রয়োগ করিতে পারেন। বিদ্যার মূল তত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীনতা ও সর্ব্বজনীনতা আয়ত্ত হইলে সকল বিষয়েই অন্যান্য বিদ্যার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

তৃতীয় প্রকারের বিদ্বান্ ব্যক্তির মেধা অপেক্ষা ধীশক্তির প্রাবল্য অধিকতর বর্ত্তমান থাকে। এই অসাধারণ ধীশক্তিকে অশেষ শেমুষীশালিতা বা প্রতিভা বলা যাইতে পারে। মহামানবের বিরাট মন যেখানেই বর্ত্তমান আছে, সেইখানেই বিরাট মনের আয়ত্তীভূত সকল জ্ঞানই বীজের মধ্যে বৃক্ষত্বের সম্ভাবনার মত গুপ্ত ও সুপ্ত ভাবে নিহিত থাকে। মানবমনমাত্রেই মানব জীবনের সকল জ্ঞানের বিকাশের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। অশেষ ধীশক্তি যাহার আছে, তাহারই সম্যক্ বিকাশ লাভের আশা। বাহির হইতে সমাগত জ্ঞান ধীশক্তির সাহায্যে এই মনকে জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ, বিকসিত ও প্রকটিত

করিয়া তুলে। মেধাশক্তিকে কৃচ্ছ সাধন করিয়া তাহাকে মস্তিষ্কে ধরিয়া রাখিতে হয় না। উহা প্রতিভাবানের মনে আত্মবিলোপ-সাধন করে। উহার সূক্ষ্ম মনোময় প্রকৃতি চিত্তশতদলের এক একটি দলে রূপান্তরিত হইয়া চিত্তকে সৌগন্ধ ও সুষমায় পূর্ণ করিয়া তুলে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তির তাই নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি পরের আহৃত তত্ত্বকে তাহারই ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না বা করিতে চাহে না, বা তত্ত্বকে অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করে না—তাহার শক্তিটি শুধু আপনার চিত্তের অঙ্গীভূত করিয়া লয়। তাই এই প্রকারের বিদ্বানের মনে ইতিহাস তাহার দর্শনটুকু, সাহিত্য তাহার রসটুকু বা রসানুভূতিটুকু, গণিত তাহার তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিটুকু তর্কশাস্ত্র তাহার বিচার সিদ্ধান্তের ক্ষমতাটুকু, অলঙ্কার শাস্ত্র তাহার রসানুভূতির ভঙ্গিটুকু, দর্শন তাহার সমগ্র দৃষ্টির দীক্ষাটুকু দিয়াই অপসৃত হয়। এই সকল শাস্ত্র তাহাদের আপন আপন বিরাট সংসার লইয়া শেমুষীশালীর চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া বসিয়া থাকে না। ছত্র যেমন রৌদ্র হইতে মস্তককে রক্ষা করে বটে, কিন্তু হস্তের ক্লান্তি জন্মায়, এই সকল শাস্ত্রও তেমনি চিত্তকে বিকসিত হইতে সাহায্য করিলেও, নিয়ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিলে চিত্তের ও মস্তিষ্কের ভার বৃদ্ধি করে। প্রতিভাবান ব্যক্তি পরের রচিত বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা না করিয়া নিজেই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি পরের আহৃত বিদ্যা বা জ্ঞানকেও অন্তঃকরণে রক্ষা করিয়াও পরকে বিতরণ করিতে পারেন, তাহাতে নিজস্ব যোগ দিয়াও অলঙ্কৃত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব নহে। তাঁহার প্রধান গৌরব তাঁহার মৌলিকতায়। প্রত্যেক প্রকার পুষ্পের যেমন বর্ণ ও গন্ধ পৃথক পৃথক এবং তাহাই তাহাদের নিজস্ব, প্রতিভাবানের চিত্ত-প্রসূনের বর্ণ গন্ধও তেমনি তাহার বিশেষত্ব ও মৌলিকতা। ইঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্ম ও বাক্যই এই গন্ধে ভরপুর। তাঁহার অন্তঃকরণের প্রত্যেক বিকাশেই তাঁহার নিজস্ব মুদ্রাঙ্ক। এই সকল বিদ্বান্‌ই জ্ঞানী ও ঋষিকল্প। বহু অধ্যয়ন না করিলেও ইঁহারা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অধ্যয়নের ফললাভ করেন। ভাবুকতা, ধ্যান, নিদিধ্যাসন ও সমাধির দ্বারা ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞানকে মনেই জন্মদান করিতে পারেন। মহাকবি উমার প্রবুদ্ধ সংজ্ঞা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ইঁহাদের সম্বন্ধেও তাই বলা যায়—

তং হংসমালাঃ শরদিব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥

দেহার দেহের মধ্যেই রোগনিবারণী শক্তি বর্ত্তমান আছে, ঔষধ সেই শক্তিকে যেমন সাহায্য করে—প্রতিভাবানের অন্তঃকরণে বাহিরের জ্ঞান তেমনি অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া অন্তরের বিকাশ শক্তিকে সাহায্য করে। এই প্রকার প্রতিভা লইয়া সকলে জন্মায় না—তাই দ্বিতীয় প্রকারে আহৃত বিদ্যার সাহায্যে অনেকের মনে প্রতিভার সঞ্চার হয়। তাই Genius is nothing but the capacity for taking infinite pains. যদি পরজন্ম থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্বান্ পরজন্মে প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহাদের চিত্ত-বিকাশ সহজ হইয়া উঠিবে।

বিদ্বান্ ব্যক্তি আহরণ অপেক্ষা উদ্বোধন যত বেশী করিতে পারিবেন, ততই তিনি মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহাদের আপন চিত্ত হইতে জ্ঞানের উদ্বোধনের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের আহৃত বিদ্যাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত নহে—কারণ সযত্নে তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে তাহার প্রতি মমতা জন্মিয়া যায় এবং চিত্ত হইতে তাহাকে নবভাবে পুনর্জ্জন্ম দেওয়ার স্পৃহা কমিয়া যায়। অধিক অধ্যয়ন এবং নিয়ত চর্ম্মচক্ষের পর্য্যবেক্ষণ সেজন্য প্রতিভার বিকাশকে ব্যাঘাত প্রদান করে। তাঁহার অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ধ্যান ধারণার প্রয়ো-

জন আরও বেশী। শিবাজী বড় পণ্ডিত হইলে মৃত মহারাষ্ট্রজাতিকে গঠন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ—গ্রে আর একটু অল্প বিদ্বান হইলে বড় কবি হইতেন ইহাও অনেক সুধীর অভিমত। শেক্সপীয়রের অধ্যয়ন ছিল না পর্য্যবেক্ষণ ছিল, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ধ্যান সমাধিই অধিক ছিল। বাল্মীকি ও কালিদাসের তপস্যা অধ্যয়নাদিতে নহে—আত্মোবোধনে। এপিক্‌টেটস্ অধ্যয়নাদির অবসর পান নাই। জগতের বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা ধ্যানযোগী। রণবীর, রাজনীতিবীরগণের ধ্যান সাধনাই যে প্রবল তাহা ইতিহাস হইতে দেখান যাইতে পারে।

সকল প্রকার বিদ্যার্জ্জনের শেষ পরিণতি প্রতিভার গঠনে—চরম সাফল্য আত্মার উন্মেষণে বা Self-realisationএ। এক জীবনেই হউক একাধিক জীবনেই হউক, এই আদর্শের সহিত চিত্তকে মিলিত করাই সকল বিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানব-মনই মহামানসের ক্ষুদ্রতম অবিকশিত স্বরূপ। প্রত্যেক মানব মনই ক্রমে মহামানসগম্য সকল জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। বিদ্যাকে শুধু মস্তিষ্কের সহিত মিলাইলেই বিদ্যা আয়ত্ত হয় না, শুধু অন্তরের সহিত ক্ষণিক মিলনেও উহা অধিকৃত হয় না, জীবনের সহিত যোগসাধনেও উহা আত্মস্থ হয় না,—জীবনের গঠনের মধ্যে উহাকে স্থান দিতে হইবে। জীবনের অঙ্গীভূত হইলে উহার সার্থকতা। জীবনের বিকাশেই জ্ঞানের বিকাশ। প্রতি কর্ম্মে প্রতি বাক্যে এই প্রকার জ্ঞানীর জীবনের আত্মপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশই বিদ্যার প্রকৃত প্রয়োগ।

শ্রীকালিদাস রায়।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘটনাচক্র। ভবদেব উকীল ও রামতনু বাবু।

কোষ্ঠীর ফল ফলিয়া গেল; যথাসময়ে, অর্থাৎ বাষট্টি বৎসর, চারিমাস, আটদিন বয়সে একাদশী চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু ঘটিল।

১৩১৮ সালের ১৬ই ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যাকালে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। এই দিন এটর্ণি বাবু আপিস হইতে ফিরিয়া, তাঁহার প্রেত-কার্য্যের ব্যবস্থা করিলেন। পরে তিনি বাটী ফিরিয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতের মৃত্যু সংবাদ দিয়া অশ্রুকুমারকে এক পত্র লিখিলেন। এই পত্রে কলিকাতায় আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য তিনি অশ্রুকুমারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পত্র পূর্ব্বকথিত পত্রের ন্যায় কখনই অশ্রুকুমারের নিকট পৌঁছে নাই।

ইহাতেও কি যদু খানসামার কৌশল ছিল? না। এটর্ণি বাবুর চাপরাসী, রাত্রি নয়টার পর, বাড়ী ফিরিবার জন্য এটর্ণি বাবুর অনুমতি প্রার্থনা করিল। এটর্ণিবাবু অনুমতি প্রদান করিলেন; এবং তাহার হাতে, অশ্রুকুমারের নামিত পত্রখানি দিয়া বলিলেন যে তাহা যেন সে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেয়। এই চাপরাসী আইনজ্ঞের আপিসে কার্য্য করায়, আপনাকে অত্যন্ত বিজ্ঞ মনে করিত; বিচার না করিয়া, সে কোন কার্য্য করিত না। সে পত্র লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল যে একটি ডাকবাক্স পাইতে হইলে, একটু উজান যাইতে হয়; তাহাতে বাড়ী ফিরিতে আরও পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইবে; আর এখন সকল ডাকই চলিয়া গিয়াছে, এখন ডাকবাক্সে পত্র দিয়া কোন ফল হইবে না কাল সকালে

উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিবে সুতরাং সে পত্রখানি পকেটে লইয়া বাড়ী ফিরিল; এবং উহা তাহার চিরস্থায়ী শয্যাতলে রাখিয়া দিল। সেই স্থানেই উহা চিরকাল পড়িয়া রহিল।

শ্রাদ্ধের দিন অশ্রুকুমারকে অনাগত দেখিয়া তারক বাবু পুরোহিতের দ্বারা কোনরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন; এবং পুনরায় অশ্রুকুমারকে পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রখানি পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞ চাপরাসীর হস্তে দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঠিকানায় দশ দিন আগে একখানা চিঠি লিখে আমি রাত্রে তোমার হাতে দিয়েছিলাম, তা ঠিক ডাকবাক্সে দেওয়া হয়েছিল ত?"

চাপরাসী শয্যাতলস্থিত পত্রের কথা স্মরণ করিয়া ঈষৎ বিবর্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই বিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ, তাহা সেই রাত্রেই ডাকবাক্সে দিয়াছিলাম।" এই বলিয়া সে দ্বিতীয় পত্রখানি লইয়া ডাকবাক্সে দিতে গেল। কিন্তু আমরা ত বলিয়াছি যে এই চাপরাসীটি বিজ্ঞ লোক; সে বিচার না করিয়া কোন কার্য্য করে না। সে বিচার করিয়া দেখিল যে, এই পত্র পাইয়া সে যদি লেখে যে সে প্রথম পত্র পায় নাই, তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে কতকটা অসুবিধা-জনক হইবে। অতএব 'অশুভস্য কালহরণং' এই নীতির অনুসরণ করিয়া, সে চিঠিখানা আপাততঃ ডাক বাক্সে ফেলিল না। ক্রমে তাহা প্রথম পত্রের সহিত চাপরাসীর সেই শয্যাতলে চিরস্থায়িত্ব লাভ করিল।

যখন দ্বিতীয় পত্রেরও উত্তর আসিবার সময় অতি-বাহিত হইল, তখন এটর্ণি বাবু স্থির করিলেন যে তিনি রজণঘাটে যাইয়া নিজে অশ্রুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবেন।

একাদশী চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর প্রায় পনের দিন পরে, একদিন সৌদামিনী ডেপুটি বাবু বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার অনতিদূরে রাস্তায় একটি ভদ্রবেশী লোক যাইতেছিল। তাহার পশ্চাতে বৃহৎ ঘোটক সংযুক্ত এক ল্যাণ্ডো গাড়ী তীব্রবেগে আসিতেছে দেখিয়া, লোকটা রাস্তার পার্শ্বে সৌদামিনীর অত্যন্ত নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ীতে এক সুসজ্জিত সুন্দর যুবা বসিয়াছিল। গাড়ীটা চলিয়া গেলে পথপার্শ্বস্থ পথিক আপন মনে বলিল—"ওঃ! হরিহরপুরের জমিদার ছোট বাবু!"

শুনিয়া সৌদামিনী ছুটিয়া গৃহমধ্যে তাহার দাদা মহাশয়ের নিকট আসিল; সেখানে তিনি একটা মোকর্দ্দমার নথি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন; নাতিনী নিকট আসিলে, তিনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন। সৌদামিনী বলিল, "দাদা মশায়, একটা ভাল গাড়ীতে কেমন একটা লোক গেল, দেখলে? লোকটা হরিহরপুরের জমীদার। হরিহরপুর কোথায় দাদা মশায়?"

এই কাল্পনিক হরিহরপুর কোথায়, ডেপুটি বাবু কিরূপে তাহা জানিবেন? তিনি বলিলেন, "হরিহরপুর কোথায় তা ত বলতে পারিনে দিদিমণি।"

সৌদামিনী চটিয়া গেল; বলিল, "তুমি কিছুই জাননা দাদামশায়; তুমি বড় বোকা!"

ডেপুটি বাবু মানিয়া লইলেন যে তাঁহার মত বোকা লোক পৃথিবীতে আর একটিও নাই। তখন সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা মশায়, তুমি বাবুটিকে দেখেছ?—ভারি সুন্দর।"

ডেপুটী বাবু হরিহরপুরের জমীদারকে দেখেন নাই, কিন্তু নাতিনীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ভারি সুন্দর।"

শুনিয়া হৃষ্টা হইয়া, সৌদামিনী আবার দরজার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল।

* * *

সেদিন রবিবার ছিল। আহারাদির পর, দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা নিবারণ জন্য ডেপুটী বাবু প্রভাকর কর্ম্মকারের সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। খেলিতে খেলিতে প্রভাকর বলিল, "আজ সকালে বাজার করতে গিয়ে একটা ভাল ঘটকের সঙ্গে আলাপ হল।"

ডেপুটি বাবু একটি বড়ে চালিয়া বলিলেন, "ঘটক ? ঘটক কে ? এই বার তোমার ঘোটকের প্রাণ বাঁচাও।"

প্রভাকর তাহার মূল্যবান ঘোটকের প্রাণের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গজের কিস্তি দিল।

ডেপুটি বাবু বলিলেন, "ইস্ এ যে সঙ্গিন কিস্তি! আচ্ছা আমি বড়েটা চালব না; আমার রাজাকে এক পদ নীচে বসাব।"

প্রভাকর। তাই করুন; কিন্তু এ বাজী আপনি মাৎ হবেন। ঘটক ঠাকুরের সন্ধানে অনেক ভাল ভাল পাত্র আছে।

ডেপুটি। ভাল ভাল পাত্র নিয়ে কি করব?

প্রভাকর। আপনি সেদিন দিদিমণির বিয়ের কথা বলেছিলেন।

ডেপুটি। ওঃ! সে এখনও অনেক দেরী আছে।

প্রভাকর। কিন্তু ঘটক যে সব পাত্রের কথা বল্লে, তা হাতছাড়া করলে তত ভাল পাত্র শীগ্গির পাওয়া যাবে না। সম্বন্ধটা পাকা করে রাখলে, বিয়েটা ছ' মাস কিম্বা এক বৎসর পরেও দেওয়া যেতে পারে। আমি ঘটককে কাল সকালে আসতে বলেছি।

ডেপুটি। কাল সকালেই দিদিমণিকে দেখবে না কি?

প্রভাকর। আগে কথাবার্ত্তা ঠিক হবে; তার পর কনে দেখবার একটা দিন স্থির করা যাবে।

ডেপুটী। ঘটক কোন্ কোন্ পাত্রের কথা বল্লে?

প্রভাকর। সে অনেক পাত্রের নাম করেছে; আপনার কাছে এসে সে তাদের পরিচয় দেবে। এই সকল পাত্রের মধ্যে একজন পাত্র হরিহরপুরের জমীদার।

আবার হরিহরপুর! প্রভাকরের কথা শুনিয়া ডেপুটী বাবু বিমনা হইলেন; এবং খেলায় হারিয়া গেলেন। তিনি আর খেলিলেন না। বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন। কোথায় হরিহরপুর? তাহার ভাবি সুন্দর জমীদারের সহিত যদি সত্যই সৌদামিনীর বিবাহ হয়, যদি বিবাহের পর সৌদামিনী সত্যই তাহার ভাবি সুন্দরের সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সৌদামিনী-শূন্য বাটীতে তিনি কিরূপে বাস করিবেন? তাহাকে না দেখিয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? মহা আশঙ্কায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

* * *

দিবাবসানকালে মুখ হাত ধুইয়া, ডেপুটী বাবু বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পাড়ার এক পরিচিত যুবক উকিল আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মশায়ের কাছে একটা উপদেশ গ্রহণ করতে এসেছি।"

ডেপুটী বাবু আগন্তুককে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

আগন্তুক উকিল পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, তাহা ডেপুটী বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"আগে আপনি এই চিঠিখানি পড়ুন, তার পর সকল কথা বলব।"

ডেপুটি বাবু পত্রখানি হস্তে লইয়া দেখিলেন যে, উহা মূল্যবান সুগন্ধি কাগজে লিখিত। তিনি উহা পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, এই একদিনের মধ্যে তিনবার তাঁহাকে হরিহরপুরে কথা শুনিতে হইল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

হরিহরপুর এষ্টেট, ভবানীপুর
৩১শে ভাদ্র, ১৩১৮।

মহাশয়,

আপনি আমার নমস্কার ও চিরকৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। আপনি, আপন জীবন বিপন্ন করিয়া, আমাদের পরম পূজনীয়া বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা আপনার নিকট চিরঋণী থাকিব। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আপনাকে সামান্য কিছু পাঠাইলাম; গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

মহাশয় এ অঞ্চলে বেড়াইতে আসিলে মাতাঠাকু-

রাণী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং নিজমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীকেদারনাথ রায় চৌধুরী (কুমার)

পত্র পাঠ করিয়া ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জান হরিহরপুর কোথায় ?"

উকিল। না।

ডেপুটী। তাঁরা সামান্য কিছু—কি পাঠিয়েছেন ?

উকিল। এই সোনার ঘড়িটি আর এই সোণার চেন।

এই বলিয়া তিনি একটি ঘড়ি ও এক ছড়া চেন ডেপুটী বাবুর হাতে দিলেন। ডেপুটী বাবু ঘড়ির ঢাকন খুলিয়া দে'খলেন। ঐ ঢাকনের ভিতর পৃষ্ঠে লেখা ছিল,—"কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বাবু ভবদেব মুখোপাধ্যায়কে।" অন্য ঢাকনের ভিতর পৃষ্ঠে লেখা ছিল,—"কেদারনাথ রায় চৌধুরী ও ভ্রাতৃদ্বয়, হরিহরপুর।" উহা এবং চেনটি দেখিয়া, উহা ভবদেব বাবুকে পুনরর্পণ করিয়া, ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁরা এ উপহার কেন দিলেন ? তুমি কি রকমে তাঁদের মাঠাকরুণের জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলে ?"

উকিল বাবু ঘড়ি ও চেন পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "ঘটনাটা বলি শুনুন। গত রবিবার দিন সকালে গঙ্গা-স্নান করতে গিয়েছিলাম। গাড়ী থেকে নামছি, এমন সময় দেখলাম, ঘাটের চাঁদনির সমুখে একটা প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ীর কোচবাক্সে কোচ-ম্যানের সঙ্গে রূপোর তক্‌মা আঁটা একজন চাপরাসী, সাদা ধবধবে পোষাক পরে, রূপোর বাঁটওয়ালা, সালু-কাপড়ের প্রকাণ্ড একটা ছাতা নিয়ে বসে ছিল। গাড়ী থামবামাত্র, একজন সহিস গাড়ীর দরজা খুলে দিলে, আর চাপরাসীটা কোচবাক্স থেকে নেমে রূপোবাঁধা প্রকাণ্ড ছাতাটা খুলে গাড়ীর দরজার সমুখে ধরলে। তার পর একটি বিধবা স্ত্রীলোক একখানি শাদা ওড়না গায়ে দিয়ে, বাঁ হাতে একটি রূপোর কমণ্ডলু ধারণ করে ধীরে ধীরে নামলেন; আর চাপরাসীর সেই ছাতার নীচে নীচে আস্তে আস্তে গঙ্গাজলে নামলেন। প্রথমে মনে করেছিলাম যে স্ত্রীলোকটী যুবতী। কিন্তু জলে নামলে বুঝলাম যে স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধা। চাপরাসীটা ছাতা নিয়ে সিঁড়ির উপরে চাতালে দাঁড়িয়ে ছিল; হঠাৎ সে চীৎকার করে' উঠল। তার চীৎকারের কারণ অনুসন্ধান করে আমি চেয়ে দেখলাম যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বেশী জলে পড়ে' গেছেন। সমুখে স্ত্রীহত্যা হয় দেখে' আমি তীরবেগে সাঁতার দিয়ে তাঁর ওড়না ধরে ফেল্লাম; আর সহজেই তাঁকে তীরে উঠিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলাম। চাপরাসী কোচ-বাক্সে ওঠবার আগে, তার পকেট থেকে পকেট বই আর পেন্সিল বার করে আমার নাম ঠিকানা লিখে নিলে। আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে স্ত্রীলোকটি হরিহরপুরের জমীদারদের মা। এখন আপনার কাছে জানতে এসেছি, এই উপ-কার নেওয়া উচিত কি না। আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে আমি কোন রকম পুরস্কারের লোভে ঐ স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিনি; কেবল মাত্র তাঁকে বিপন্ন দেখেই বিচলিত হয়ে ও কাষ করে-ছিলাম।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝতে পারছি। মানুষকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোককে বিপন্ন দেখলে, পাষণ্ড ব্যতীত কেউই স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা যা পাঠিয়েছেন, তা না নিলে তাঁরা দুঃখিত হবেন। অতএব আমার মতে নেওয়াই ভাল।"

"আপনি যখন বলছেন তখন নেওয়াই ভাল।"—এই বলিয়া, চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে উকিল বাবু চলিয়া গেলেন।

উকিল বাবু প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই রামতনু বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া ডেপুটি বাবু বলিলেন, "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।"

রামতনু বাবু পূর্ব্বে পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করিতেন।

অর্থ সংগ্রহ করিয়া, এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার মত সদ্বক্তা ও মজলিসি লোক বড় একটা দেখা যায় না। তিনি ডেপুটি বাবুর বন্ধু ও প্রতিবেশী। তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ডেপুটী বাবুর বাটীতে আসিতেন, এবং সতরঞ্চ খেলার সময়, ডেপুটী বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রভাকরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস রে! ও রে, ও চিন্তামণি, তামাক দিয়ে যা। ডেপুটী বাবু, আপনার মত গুণবান লোকের ঐ একটা দোষ, আপনি তামাক খান না; আমার মত মহৎ লোকের সঙ্গলাভ করেও আপনার এই সৎ শিক্ষাটা হল না। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক বুঝতেই পারে না, তামাক না খেয়ে মানুষ কি করে' মানুষ হয়—কেমন করে' বেঁচে থাকে! গরু, কুকুর, ইঁদুর, শেয়াল প্রভৃতি কোন পশুই তামাক খায় না। বিড়াল, মানুষের চেয়ে মাছ ও দুধ খেতে বেশী ভালবাসে বটে, কিন্তু সেও তামাক খায় না। কেবল মানুষই ঐ রসে রসিক। আপনি তামাকটা না খাওয়ায় পশুভাবাপন্ন হয়ে রইলেন। জানবেন ডেপুটী বাবু, শত পুণ্য করলেও আপনার কখন মোক্ষ হবে না। এই তামাকের জন্যে আবার আপনাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। তামাক না খেলে মোক্ষের জ্ঞানই জন্মায় না। ভগবান বলবেন, তুমি যখন তামাক খাওনি, তখন তোমার পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ হয় নি; যাও পৃথিবীতে ফেরত যাও, তামাক খেয়ে পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ করে স্বর্গে এসো।"

ডেপুটী বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তামাকের জন্মে পৃথিবীতে ফেরত আসতে হবে কেন? স্বর্গে কি তামাক পাওয়া যায় না?"

রামতনু। আমার সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। স্বর্গে নন্দনকানন আছে বটে, কিন্তু গয়া বিষ্ণুপুর ফৌজদারি বালাখানা নেই; সুধা আছে বটে, কিন্তু গুড়ুক তামাক নেই; কল্পতরু আছে বটে, কিন্তু গড়গড়া নেই। এই জন্যেই ত স্বর্গে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না;—নানা রকম ওষুধপত্র খেয়ে পৃথিবীর পরমায়ু বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করি। ভগবানের ঐ নিয়মটা অত্যন্ত বিশ্রী, ডেপুটী বাবু, যে স্বর্গে যেতে হলে আগে মরতে হয়। গৃহিণীর এয়োত অক্ষয় হোক, স্বর্গ মাথায় থাকুন, আমি সেখানে যেতে রাজি নই। আমাদের মত তামাকখোরের পক্ষে, গয়া বিষ্ণুপুর ফৌজদারি বালাখানা ওয়ালা তামাকু গন্ধ সুবাসিত এই পৃথিবীই ভাল।"

ডেপুটি বাবুর উড়িয়া ভৃত্য চিন্তামণি তামাকু সাজিয়া গড়গড়া লইয়া আসিলে ডেপুটি বাবু বলিলেন, "এই নিন, পৃথিবীতে থেকে স্বর্গসুখ উপভোগ করুন।"

রামতনু বাবু গড়গড়াটি লইয়া সাদরে তাহার গাত্রে হাত বুলাইলেন; তাহার পর ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও বাবা চিন্তামণি, আগে যন্ত্রটা ঠিক আছে কি না দেখে নিই, তার পর তুমি কাযে যেও।"

রামতনু বাবুর গড়গড়া পরীক্ষা শেষ হইল; কিন্তু চিন্তামণি কাযে গেল না। সে কক্ষের বাহিরে যাইয়া, দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে এরূপ করিল, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

ধূমপান করিতে করিতে রামতনু বাবু বলিলেন, "আমি যখন রংপুর থেকে পাবনা—না না—যখন বক্সার থেকে আমার বদলি হয়ে আসি, তখন—"

ডেপুটী বাবু। ভাল, রামতনু বাবু, আপনি ত চাকরি উপলক্ষে অনেক স্থানে গিয়েছেন—

রামতনু। চাকরীর ঘানিগাছে আপনিও ত কম ঘোরেন নি।

ডেপুটি বাবু। তা অনেক স্থানে যেতে হয়েছে বটে. কিন্তু আপনার ঘুর্ণী আর আমাদের ঘুর্ণীতে অনেক তফাৎ আছে। আপনারা চোখ চাইবার অবসর পেয়েছিলেন; আমরা চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরেছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনি কি বলতে পারেন হরিহরপুর কোথায়?

রামতনু। হরিহরপুর যে ঠিক কোথায়, তা আমি ঠিক বলতে পারি নে। বোধ হয় রংপুর জেলায় হবে।

কিন্তু সম্প্রতি হরিহরপুরের জমীদারদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনতে পাচ্ছি। আমার গৃহিণী সর্ব্বদা তাঁদের কথা কয়ে থাকেন। কাল শনিবার ছিল, রত্নাঙ্কুর যোগ ছিল, তাই তিনি কালীঘাটে স্নান করতে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। শুনে এসেছেন এ হরিহরপুরের জমীদারদের মা পাঁচটি সোণার জবা ফুল দিয়ে শ্রীশ্রীকালী মাতার শ্রীচরণ পুজো করে' ব্রাহ্মণকে একশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে গিয়েছেন।

ডেপুটি। তাঁরা কি অত্যন্ত ধনী?

রামতনু। ঐ কালীঘাটেই আমার গৃহিণীর সঙ্গে তাঁদের ম্যানেজার বাবুর স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। গৃহিণী তাঁর মুখে শুনেছেন যে জমীদারের মার কাছে ছেলেদের অজানিত পাঁচ ঘড়া আকব্বরি মোহর আছে।

ডেপুটি। বলেন কি?

রামতনু। আরও শুনুন। ঐ জমীদারদের পুকুরে মাছের নাকে মুক্তোর নলক আছে। জলে সেই মাছেরা যখন নলক নেড়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন বোধ হয় জলদেবীদের জলক্রীড়া মনে পড়ে যায়। সেই নলক নাড়া মাছ খেতে না জানি কত মধুর!

ডেপুটী। ঐ জমীদারেরা আমাদের পাড়ার ভবদেব উকিলকে একটা সোনার ঘড়ি চেন দিয়েছেন।

রামতনু। বটে?

ডেপুটি। জমীদারদের মা গঙ্গাস্নানে গিয়ে জলে ডুবে যাচ্ছিলেন, ভবদেব তাঁকে উদ্ধার করেছিল। তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ঘড়ি চেন উপহার দিয়েছেন।

রামতনু। শুনেছি তাঁরা ভবানীপুর একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করছেন। অনেক দাসদাসী গাড়ী ঘোড়া আছে। আর চৌরঙ্গীতে একটা ভাল বাড়ী কেনবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। জমীদার হওয়া, আর কলসী পূর্ণ মোহর থাকা—

রামতনু বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে আলুলায়িতবেণী শ্লথবেশা সৌদামিনী কক্ষমধ্যে বেগে প্রবেশ করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—"দাদামশায়, দাদামশায়!"

তাহাকে দেখিয়া রামতনু বাবু বলিলেন, "এই যে দিদিমণি! কোথায় আছ দিদিমণি?"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া, বাতায়নপথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "ঐ দেখ দাদামশায়! ঐ সকালের সেই গাড়ী! গাড়ীর ভিতর ঐ দেখ সেই সুন্দর জমীদার বাবু।"

ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবু উভয়েই তাড়াতাড়ি চক্ষে চশমা লাগাইয়া, সৌদামিনীর অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুযায়ী গবাক্ষপথে রাস্তায় দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, একটি সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো গাড়ী আচ্ছাদন খুলিয়া ছুটিয়াছে। দেখিলেন, তাহাতে দুইটি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ ও তেজঃপূর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। দেখিলেন, শকট মধ্যে এক যুবক বসিয়া রহিয়াছে। দেখিলেন, তাহার পরিধানে শুভ্র ও সূক্ষ্ম ধুতি; অঙ্গে শুভ্র ও সূক্ষ্ম রেশম রচিত ঈষৎ সুবর্ণখচিত চুড়িদার পিরাণ; স্কন্ধের মস্লিন উত্তরীয় শকটচালনবেগে ও সন্ধ্যাকালীন মৃদু মারুত স্পর্শে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। সেই উত্তরীয়ের গোলাপপুষ্পবৎ সুন্দর সৌরভ তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কিন্তু শকট দ্রুতবেগে নয়নপথের বহির্ভূত হওয়ায় তাঁহারা কেহই যুবকের মুখশ্রী অবলোকন করিতে পারিলেন না।

কিন্তু বালিকা সৌদামিনী, তাহার তরুণ নয়ন লইয়া যুবককে ভাল করিয়া দেখিল। এবং তাহার উত্তরীয় উদ্গিরিত সৌরভে মুগ্ধ হইয়া গেল।

গাড়ীটা চলিয়া গেলে রামতনু বাবু বলিলেন, "ওঃ! ইনিই হরিহরপুরের জমীদার!"

সৌদামিনী বলিল, "ইনি ছোট ভাই—ছোট বাবু। বাবুটি দেখতে বেশ; নয় দাদামশায়?"

ডেপুটী বাবু সৌদামিনীর প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তুমি ভেবো না দিদিমণি, আমি পৃথিবী খুঁজে তোমার জন্যে ওর চেয়েও একটি সুন্দর বর এনে দেব।"

সৌদামিনী ভ্রুকুটি করিল; বলিল, "দূর, তা

কেন! আমার জন্যে এখন বর খুঁজতে হবে না। তা হলে তোমার দশায় কি হবে? কে তোমায় আদর করবে? কে তোমার পাকা চুল তুলে দেবে? না, দাদামশায় এখন আমার বর খুঁজো না। কিন্তু ঐ রকম বড় বড় ঘোড়া, আর ঐ রকম গাড়ী! ঐ রকম গাড়ী চড়তে আমার বড় ইচ্ছে করে।"

রামতনু বাবু বলিলেন, "এর পর কত জুড়ি, কত চৌঘুড়ীতে চড়বে। কত সোণা রূপো, হীরে মুক্তো পরবে। তোমার কোন ভাবনা নেই দিদিমণি! তোমার যে ভগবতীর মত রূপ আছে, কত রাজপুত্র এসে তোমার রাঙ্গা পায়ের তলায় মাথা পেতে দেবে; কত দেবতা এসে ফুলচন্দন দিয়ে তোমার পূজা করবেন, তখন তোমার বুড়ো দাদামশায়কে—আর এই আমাদের —একটু মনে রেখো।"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর কথার কোনও উত্তর করিল না; কিন্তু তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গুম্ফ ধরিয়া টানিয়া দিল। তাহার পর ধুলিলুণ্ঠিত অঞ্চল তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া ভিতর বাটীতে পলাইয়া গেল।

ডেপুটি বাবু বলিলেন, "দিদিমণির মনটা খুব সরল; কিন্তু বড় দুরন্ত।"

রামতনু বাবু বলিলেন, "একটু বয়স হলেই সব সেরে যাবে। বিয়ের জল গায়ে পড়লেই একবারে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

ডেপুটী বাবু। শীঘ্র একটা সুবিধামত পাত্রের অনুসন্ধান করতে হবে। কাল সকালে একজন ঘটকের আসিবার কথা আছে। কাল সকালে সেই সময় আপনি একবার আসবেন।

রামতনু। নিশ্চয় আসব। আজ তবে উঠি।

ডেপুটি। সন্ধ্যার পর আসবেন ত? প্রভাকরের কাছে এক বাজি হেরে আছি; সন্ধ্যার পর শোধ দিতে হবে।

রামতনু। আজ সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আমার একটু কায আছে; আজ আর আসতে পারব না। কাল সকালে অতি অবশ্য আসব। আমার আসবার পূর্ব্বেই যদি ঘটক এসে পড়ে, আপনি প্রভাকরকে দিয়ে একটু খবর পাঠাবেন। ওরে চিন্তামণি, গড়গড়াটা নিয়ে যা।

চিন্তামণি দরজার বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল; আসিয়া গড়গড়া লইয়া গেল। রামতনু বাবু প্রস্থান করিলেন।

ডেপুটি বাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন—"হরিহরপুরের সুন্দর জমীদারকে আমার দিদিমণির পছন্দ হয়েছে! জমীদার বাবু আমাদের স্বঘর কি না, আর লেখাপড়া কিরূপ শিখেছেন বলতে পারিনে। জমীদার বাবু বিবাহিত কি না, তাও বলতে পারি নে। কিন্তু অমন ঐশ্বর্য্য, অমন রূপবান কোথাও পাওয়া যাবে না। কাল ঘটক এলে তাকে অনুসন্ধানে লাগাব। অত বড় জমীদার— তাঁরা কি আমাদের মত সামান্য ঘরে বিবাহ করবেন? কিন্তু আমার দিদিমণির মত সুন্দরী, বুদ্ধিমতী তাঁরা কোথায় পাবেন? দিদিমণি আমার ভুবনমনোমোহিনী— তাকে দেখলে, তাদের নিশ্চয় পছন্দ হবে। দিদিমণির বিয়ের ফুল ফুটেছে। আমার মন বলছে যে দিদিমণির ঐ হরিহরপুরেই বিবাহ হবে। তা না হলে, আজ হঠাৎ হরিহরপুরের নাম এতবার শুনব কেন? এ জীবনভোর বাঙ্গালা দেশের সকল যায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু হরিহরপুরের নাম কখন শুনি নি। আজ হঠাৎ হরিহরপুরের নামে প্রাণ ভরে গিয়েছে।"

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দুর্ভিক্ষের খাদ্য

এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে বাঙ্গালা প্রদেশের তথা ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে বস্তুতই হৃদয়ে পরিতাপ জন্মে। কিন্তু পরিতাপ জন্মিলে কি হইবে, আমরা নিজেই শক্তি ও সামর্থ্য শূন্য, পরের উপকার করিবার ক্ষমতা কোথায়? যিনি দেশের রাজা, যিনি প্রজাদের মা বাপ, তাঁহার সদয় দৃষ্টি না পড়িলে আমাদের করুণ ক্রন্দনে কি হইবে? শুধু অরণ্যে রোদন!

এই দুঃসময়ে নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় প্রজাবর্গ কি খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে তাহার একটা স্থূল চিত্র নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে নিম্নে অঙ্কিত করিতেছি।

বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গে মাঠ ভরা বিস্তর পাটের ক্ষেত। দরিদ্র কৃষকেরা অন্নাভাবে পাটের পাতা সিদ্ধ করিয়া উহা দ্বারাই কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে; উহার সঙ্গে লঙ্কা, লবণ বা তৈলের সংস্রব নাই, অথচ অন্নাপেক্ষা পাটপাতার ভাগই বেশী। খালে বিলে পুকুরে নালায় মাঠে ঘাটে বর্ষাকালে পর্য্যাপ্ত শাপলা জন্মিয়া থাকে। নিঃস্ব গৃহস্থগণ সামান্য ভাতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শাপলা সিদ্ধ খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যাহা হউক তথাপি ওগুলি খাদ্য পদার্থ। পাটপাতায় বা শাপলার ডাটায় কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থ আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসিগণ কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? এতদ্দেশে বর্ষাকালে মাছের সের চৌদ্দ আনা ও একটাকা। তাহাও আবার কচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় পাটের চাষ এই দেশে হয় না, কাযেই শাক সব্জীর জন্য সামান্য পাটের পাতা ব্যতীত উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। শাপলা সম্বন্ধেও সেই কথা। বর্ষাকালে এতদ্দেশীয় লোকের প্রধান অবলম্বন আমড়া ফল। আমড়ায় একটা টক হইলে সামান্য একটু কলায়ের ডাল বা ডাল বাঁটার সঙ্গে এক থালা ভাত অনায়াসেই উঠিয়া যায়। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বাজারে আমড়ার অভাব কোন দিনই দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন ডুমুরও এই দেশে বেশ চলে। বড় বড় ডুমুর হইলে পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানেই তাহাদ্বারা সরস সুক্তা পাক হয়। কিন্তু এতদ্দেশে বড় ছোট বাছাবাছি নাই, অথচ সুক্তার আস্বাদও খুব কমলোকেই জানে। ছোট বড় মাঝারী সকল প্রকার ডুমুরই বিক্রয় হইতেছে এবং তদ্দ্বারা দরিদ্র গৃহস্থের তরকারীর কায চলিতেছে।

তরকারীর প্রসঙ্গে এই স্থলে অপরাপর দুই এক প্রকার খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহস্থগণ কাঁচা বা পাকা কোন প্রকার তেলাকুচা তরকারীরূপে ব্যবহার করে কি না জানি না। বরং তেলাকুচা ফলগুলি দেখিতে কামিনীগণের ওষ্ঠাধরের মত অতিশয় সুন্দর হইলেও পাকা মাথালের ন্যায় বর্জ্জন করিয়া থাকে। বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ সেই তেলাকুচা ধামায় ধামায় বাজারে বিক্রয় করে এবং ইহা "কুঁদরী" আখ্যায় তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। তেলাকুচার মধ্যে হেয় ও উপাদেয় অংশ কতটুকু আছে তাহা কৃষিবিদ্যাবিশারদগণ বলিয়া দিবেন।

জল মাটি বায়ু ও স্থান বিশেষে কৃষিপদার্থেরও যে তারতম্য হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু কৃষিপদার্থ ও লতাপাতা নহে, মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই কথা। এই নিমিত্তই পাটনাই হরীতকী, পাটনাই মুগ মটর, ছোলা, খেসারী, মুসরী, ভুট্টা প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। ভাগলপুরে গাই প্রবাদ-বচনের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। মালদহ, বগুড়া, গোঁয়ে, লিংড়া, দ্বারভাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির আম, শ্রীহট্টের কমলালেবু, কাশ্মীরের লিচু, কাবুলের

আপেল নেসপাতি ও বেদানা প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত। ঢাকা জেলায়

"ভাওয়ালে তালে কাঁঠালে,
মহেশ্বরদীতে আখিগুড়।
সোণারগাঁয়ে নবাবী পাণ,
কলা খাবি ত বিক্রমপুর।"

এই ছড়া এখনও প্রচলিত আছে। ঢাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল, মহেশ্বরদী, সোণারগাঁ এবং বিক্রমপুর এই চারি পরগণায় কোন্ কোন্ পদার্থ ভাল উৎপন্ন হয় তাহাই ঐ ছড়া দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ষাকালে, "প্রস্ফুটিত নীপ কদম্ব পুষ্পে" বনস্থলী প্রফুল্ল হইয়া উঠে; প্রকৃতি উজ্জ্বল ও মনোহর শোভা ধারণ করে। শিশুগণ শত শত কদম্ব পুষ্প আহরণ করিয়া বাল্যক্রীড়া উপভোগ করিয়া থাকে; গাছে গাছে হাজারে হাজারে কদম ফুল ফুটিয়া আছে, সেই সমস্ত কদম ফুলের পাপড়ীতে খেলেনার জলপানি তৈয়ার করিয়া ভিতরের বিচিগুলি দিয়া লাড়ু মোয়া কল্পনা করে। সেই কদম ফুল বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে পয়সায় বিক্রীত হয় এবং সর্ব্বসাধারণে অতি আগ্রহের সহিত ঐ ফুল কিনিয়া তরকারী রূপে ব্যবহার করে। পচা কদমফুলের টক্ নাকি তাহাদের নিকট খুব একটা আস্বাদের জিনিষ; তাই ইহার এত আদর ও কদর।

দারুণ দুর্ভিক্ষ কি আমাদিগকে অন্নভোজী হইতে তৃণভোজী জন্তুতে অথবা উদ্ভিদ্‌ভোজী হবিষ্যাশী প্রাণীতে পরিণত করিবে?

আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ পরিচয়ে বহু বহু তৃণ-গুল্ম-লতা-পত্র-ফল-মূল-ফুল-শাক-সব্জীর দোষগুণ উভয়ই উল্লিখিত আছে। ঔষধ নির্ম্মাণে, পাচন ব্যবহারে এবং খাদ্য ও পথ্যের বিচারে সেই সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব দোষ গুণ প্রকাশ করে। বর্ত্তমান সময়ে পেটের দায়ে লোকে নানা ফন্দিতে নানা রকমের খাদ্য আবিষ্কার করিতেছে। "না ঠেকিলে শেখে না" (Necessity is the mother of invention) এই প্রবচনের সার্থকতা খাদ্য দ্রব্যের ভিতর দিয়াও অনুভূত হইতেছে। দূর্ব্বার শিকড় দ্বারা কবিরাজী ঔষধের অনুপান তৈয়ার হয় বটে, কিন্তু কোমল দূর্ব্বাঘাস দ্বারা ইদানীং বহুঘরে শাক খাওয়া চলিতেছে। সরিষা গাছের ফুলে ও পাতায় উৎকৃষ্ট শাক ও ভাজি তৈয়ার হয়। সেই অনুকরণে গাঁদা ফুলের পাপড়ি ও পাতা দ্বারা শাক এবং ভুজ্জি রান্না চলিতেছে—৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের পাক-প্রণালীতেও বোধ হয় এ সমস্ত বস্তুর উল্লেখ নাই। ভূমি ভেদ করিয়া সদাঃ আকাশে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে এমন ধারা কোমল কচি বাঁশের শিশুকে হাঁড়ি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া, তদুপরি গুরুভার অর্পণ করিয়া, দিন কতক পরে সেই হাঁড়ি তুলিয়া ফেলিলে সুন্দর শুভ্র একটি বাঁধা কপির ন্যায় তরকারী পাওয়া যায়, উহার ব্যঞ্জন নাকি অতীব উপাদেয়। পাকা কাঁঠালের ভিতরকার স্থূল মোথাটী কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ও ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পাক করিলে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নারিকেল ফলের যে প্রকার কোন অংশই অব্যবহার্য্য নহে, কাঁঠাল ফলও তদ্রূপ সর্ব্বাংশেই মানবের উপভোগ্য। লাউ, কুমড়া ও গোল আলুর খোসায় রসনাতৃপ্তিকর ভাজি ও ছেচ্‌কি প্রস্তুত হয়। সাগরকন্দ আলুতে ভাতের অনুরূপ সারবত্তা অংশ কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের সময় ঢাকা জেলার বহু বহু গরীব কাঙ্গাল একমাত্র সিদ্ধ সাগরকন্দ আলু দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তদ্দেশে একমণ সাগরকন্দ আলু কখনও কখনও ছয় আনা কিংবা সাত আনা পয়সায় বিক্রয় হয়। অর্থাৎ এক সের আলুর দাম এক পয়সারও কম।

গাছের আমে এবং লতার আমে কথঞ্চিৎ আস্বাদনের পার্থক্য আছে। সেই প্রকার জ্যৈষ্ঠ মাসের আমে এবং কার্ত্তিক মাসের আমে আস্বাদনের বহু পার্থক্য অনুভূত হয়। আম যদিও বারো মাসই ফলে, তথাপি কালের আম এবং অকালের আম বলিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসই আমের কাল। তদ্‌ভিন্ন অপর সমুদয়

মাস অাঁকাল। অন্যান্য ফল সম্বন্ধেও একই কথা। "বারো মাসের তেরো ফল" ভোগ করা ঠিক সময়ানুযায়ী হওয়া চাই। নতুবা ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে যে গাছে কুল (বদরী) জন্মে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও সেই সেই গাছে কুল জন্মিয়া থাকে, অথচ ক্রমে ক্রমে বড় হয় এবং পাকে। কিন্তু শ্রাবণ ভাদ্রের কুল কখনও কি ফাল্গুন চৈত্রের কুলের ন্যায় স্বাদু হইবে? ইহা বরং উপকারী না হইয়া অপকারই জন্মাইয়া থাকে, কেননা কালের জিনিষ, আর অকালের জিনিষ! শ্রাবণ মাসের কুল খাইতে তিক্ত বোধ হয়। কার্ত্তিক মাসের আম বা মাঘ মাসের কাঁঠাল, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের ন্যায় সুস্বাদু নহে। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড খাইবে না দ্বিতীয়াতে বৃহতী (শাক) ভক্ষণ নিষেধ ইত্যাদি এই যে হিন্দুদিগের নিষেধ বচন, ইহার মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে কিনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোনও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ বা রাসায়নিক বলিয়া দিবেন কি?

"মাঘে ন বদরী মূলা"—অর্থাৎ মাঘ মাসে বদরী ও মূলা খাইবেনা, এবং শ্রাবণী সংক্রান্তির পূর্ব্বে কেহ শাপ্‌লা ভক্ষণ করিবেনা, "চৈতাল্যা লাউ" গরুকে খাওয়াইবে, কখনও মানুষে খাইবেনা; এই সমস্ত নিষেধ বচন কি আদবেই মেয়েলী শাস্ত্র এবং ভ্রমাত্মক কুসংস্কার, অথবা ইহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যতত্ত্ব বা শারীর তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে হিন্দু সাধারণের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। এই বিজ্ঞানের যুগে কোন প্রকার অবৈজ্ঞানিক শাস্ত্রীয় বচন মানিয়া চলিতে বিজ্ঞব্যক্তিগণ কখনও সম্মত হইবেন না—অজ্ঞদের কথা স্বতন্ত্র।

আর একটী কথার অবতারণা করিয়াই এই নীরস তরকারী পরিবেশনে বিরত হইব। একই বস্তু স্থানভেদে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া থাকে; তরকারীর ক্ষেত্রেও এই রীতি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। পূর্ব্ববঙ্গে যে তরকারী সোণা কুমড়া বা মিট্‌ কুমড়া (মিষ্টি কুমড়া) নামে পরিচিত, অন্যত্র উহা ডিংলা বা সূর্য্য কুমড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লাউ, অলাবু এবং কদু একই তরকারী। পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে কাঁকুড় বলে, বীরভূমে তাহাকে বলে ঝিঙে, অথচ শশা তরকারীকে বলে কাঁকুড়োল। ঝিঙা ফুলের স্বতন্ত্রতা দেখিয়াও কি এই ভ্রম দূর হইবার নহে? চাল কুমড়া, গিমি কুমড়া (বা কুষ্মাণ্ডের) পরিবর্ত্তে বীরভূম অঞ্চলে 'খেড়ো' নামে এক প্রকার তরকারী খুব প্রচলিত। ইহা দেখিতে কালো-রঙের ফুটির মত। ঢাকা জেলায় ফুটিকে চিনাল বা বাঙ্গিও বলা হয়; অবশ্য উহাতে কথঞ্চিৎ প্রকারভেদ আছে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

অৰ্দ্ধেন্দু-প্রসঙ্গ

প্রায় ২২।২৩ বৎসর হইল, কলিকাতা যোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে একটি 'ক্লাব' ছিল—তাহার নাম ছিল "খামখেয়ালী মজলিস্।" প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন করিয়া যোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর সুধী মহোদয়গণ বন্ধুবান্ধব সহ "খামখেয়ালী ভাবে" সাহিত্যালোচনা, সঙ্গীতচর্চ্চা, নাটকাভিনয় ও হাস্যামোদে সন্ধ্যাযাপন করিতেন। প্রচ্ছন্ন ভাবে আর একটা উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল—বিলাত-ফেরতগণকে ইংরাজি পোষাক ছাড়াইয়া ধুতি চাদরে সুশোভিত করা—দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া মেঝের উপর আসনে বসিয়া, করাঙ্গুলির সাহায্যে আহার করিতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেওয়া। ঠাকুর-বাড়ীর সে সময়ের আহারের ঘটা এবং আহার্য্য দ্রব্যের বাহার

দেখিয়া স্বতঃই মনে হইয়াছিল, উহা ইংরাজি ডিনার এবং বিলাতী ডাইনিং টেবিলের মোহ অনায়াসেই বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

একদিন খামখেয়ালী মজলিসের পক্ষ হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম।

যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, খামখেয়ালী মজলিসে গোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। রবি বাবু বিষণ্ণ মনে চিন্তাযুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন—নিমন্ত্রিত অতিথিগণও সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া যাহা শুনিলাম, তাহার মর্ম্ম এই—

রবিবাবু বঙ্গভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় স্বজাতীয়দিগের নিকট পত্র লেখেন না। মিষ্টার অমুক তখন একজন ঘোর সাহেব, তাঁহাকেও বাঙ্গলাতেই নিমন্ত্রণপত্র লিখিয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোক এত দিন যে ঠিকানায় বাস করিতেন, কিছুদিন পূর্ব্বে সে বাড়ী হইতে উঠিয়া অন্য বাড়ীতে গিয়াছেন। মজলিসের খাতায় মিষ্টার অমুকের যে ঠিকানা লেখা ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এ সংবাদ মজলিসে তাঁহার দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই। যে দ্বারবান নিমন্ত্রণপত্র বিলি করিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিয়াছে, উক্ত ঠিকানায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাস করেন, তিনি নিমন্ত্রণপত্রখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"ওঃ—রবীন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ? বেশ বেশ। তিনি যে একজন খুব বড় লোক। কিন্তু সে বাবুটি ত এখন এখানে থাকেন না; বাড়ী বদলেছেন। তা হোক গে, আমিই যাব এখন। আচ্ছা দরোয়ান, রবিবাবুর বোলো, যে আমি ঠিক সময়ে আসবো।" দরোয়ানজী গোপনে আরও প্রকাশ করিয়াছে—বাবুটি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিয়াছেন, এজন্য তথায় কোনও লোকের গতায়াত পছন্দ করেন না। তাঁহার দ্বারবান ছাড়া অন্য কেহও বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না।

রবি বাবু এই সকল কথা শুনিয়া, খোঁজ লইয়া তখন জানিতে পারিলেন যে মিষ্টার অমুক অন্য বাড়ীতে আছেন। সেখানে পুনরায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে লইয়া কি করিবেন, এই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন। যে লোক বিনা দ্বিধায় গায়ে পড়িয়া নিমন্ত্রণ লয়, সে কি রকম ভদ্রলোক? এবারকার মজলিসের আমোদটাই বা মাটি হয়, এই আশঙ্কায় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণও বিষণ্ণ এবং কি উপায় হইতে পারে, তাহারই পরামর্শ হইতেছে।

রবিবাবু তখন নিমন্ত্রিতগণের পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, "যখন অমুক মহাশয় বাসস্থান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে খামখেয়ালী মজলিসে জানান নাই, তখন এই আপদের জন্য তিনিই দায়ী। শাস্তিস্বরূপ আজ তাঁহাকে "রবিবাবু" সাজিয়া, host এর কার্য্য করিতে হইবে।

অ—মহাশয় কিছু পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, অগত্যা তিনি রবিবাবু সাজিয়া host এর অভিনয় করিতে স্বীকৃত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বারান্দার নিম্নে এক ছক্কর গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল। আমরা উঠিয়া গিয়া গ্যাসের আলোকে দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর এক ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ময়লা একখানা পুরাতন বালাপোষে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দস্তুরমত মুড়ি দিয়া কে একজন তাহার মধ্য হইতে অবতরণ করিয়া, গ্যাসের আলোকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পয়সা গণনা করিতেছে। সেই পয়সাগুলি গাড়োয়ানকে দিবামাত্র তাহার সঙ্গে ঝগড়া বচসা বাধিয়া গেল। সে এক টাকার কমে লইবে না, ইনিও আট গণ্ডার বেশী দিতে চাহেন না। অবশেষে অনেক কথা-মাজার পর গলার জোরে পরাভূত হইয়া গাড়োয়ান আরও কিঞ্চিৎ পাইয়া প্রস্থান করিল। আমরা বুঝিলাম, সেই আপদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চটিজুতা ফটাস ফটাস্ করিতে করিতে বৃদ্ধ তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। আসিয়াই,

তাঁহার ধূলিকণা-শোভিত ছেঁড়া চটিজুতা কোন স্থানে রাখিতে হইবে ইহাই উচ্চস্বরে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমুক বাবু অর্থাৎ জাল "রবি ঠাকুর" তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জুতা সুদ্ধই ভিতরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ এই সুশোভিত বৈঠকখানায় চটি জুতা লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—"রাম বলেন রবি বাবু! এমন সাহেবী বৈঠকখানায় আমার চটিজুতা? ইহা কখনও হইতে পারে না।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, জুতাযোড়াটি দরোয়ানজীর হাওলা করিয়া রাখাই নিরাপদ।

সভায় আসিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে বসিয়া অ—অর্থাৎ জাল "রবি বাবু"র সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমারই নাম রবি ঠাকুর? তা, তুমি বেশ পদ্য লেখ শুনেছি। আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হয়েছিল বল দেখি? আচ্ছা বোধ হয়—অমুক জায়গায় কি?"— বলিয়া বৃদ্ধ কতকগুলি স্থানের ও ঘটনার নাম করিতে লাগিলেন যাহা কখনও রবিবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না— এমন কি তাঁহার জন্মিবার বহু পূর্ব্বের ঘটনা। নিমন্ত্রিত-গণ পরস্পরের মধ্যে গোপনে বৃদ্ধের আহম্মুকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে লাগিলেন।

তথাকথিত "রবিবাবু"কে বৃদ্ধ "ছিনাজোঁকের" মত ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার সেকেলে রসিকতার প্রশ্নে ও মন্তব্যাদিতে অ—বাবুকে ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেনই, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা কেহ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিতেছেন, কেহ বা মুখ টিপিয়া টিপিয়া ঘৃণার হাসি হাসিতেছেন। হঠাৎ অ—বাবুর কিঞ্চিন্মাত্র পীত গেলাসটি (হুইস্কি পেগ কি না জানি না) লইয়া বুড়া চক্ চক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিলেন এবং আরও আনিবার জন্য পরিচারকগণকে আদেশ করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই স্তম্ভিত!

এতক্ষণে অ—বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বিরাগ ভরে উঠিয়া গিয়া করযোড়ে আসল রবিবাবুকে বলিলেন —"দোহাই আপনার, এ মুস্কিল হইতে আমায় আসান করুন। আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না।" রবি বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তাও কি সম্ভব হয়? আপনি যখন হোষ্ট সাজিয়াছেন, তখন এতদূর আসিয়া সে দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিবেন কি করিয়া? সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই।"

অ—বাবু সেখান হইতে উঠিয়া বৃদ্ধের কাছে আর না গিয়া, গগনেন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার আলবোলায় ধুমপান করিতে লাগিলেন। নাছোড়বান্দা বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিতান্ত অশিষ্টভাবে আলবোলার নলটা অ—বাবুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"এতক্ষণ তামাক না খেয়ে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছে। আঃ—বেশ তামাকটি ত!" গগন বাবু হাসিতে লাগিলেন। আর একটা আলবোলা আনাইয়া অ—বাবুকে দিলেন। ধুমপান করিতে করিতে বৃদ্ধের মাথাটি ঢ়লিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, আফিমখোর নিশ্চয়।

ক্রমে "আহার প্রস্তুত" বলিয়া পরিচারক আসিয়া উপস্থিত হইল। আহারের স্থান হইয়াছিল রবি বাবুদের বাড়ীতে, ড্রয়িংরুমের পাশে। আমরা গগন বাবুর বাড়ী হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছি। অ—বাবু বৃদ্ধের ভয়ে ভিড়ে মিশিয়া আগে আগে নামিতে-ছেন। তখন বৃদ্ধ ডাকাডাকি সুরু করিলেন—"ওগো রবি বাবু, আমায় ফেলে তুমি যাচ্ছ কোথায়? আমি তোমাকে ধোরে ধোরে নীচে নামতে চাই। বুড়োমানুষ সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে মরব?" সুতরাং অ—বাবুকে দাঁড়াইতে হইল। বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে এই অবস্থায় চলিতে চলিতে, অ—বাবুর প্রতি বৃদ্ধ যে সকল "বিদ্যাসুন্দরী" রসিকতা ঝাড়িতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বৃদ্ধ সহসা বাত্যাহত কদলীবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। কেবল তাহা নহে। অ—বাবুর শালের অঞ্চল ধরিয়া, মিউনিসিপালিটির রোলারের মত গড়াইতে

গড়াইতে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়া পৌছিলেন। কোনও মতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, আশ্রিত ব্যক্তিকে এরূপভাবে সিঁড়িতে গড়াইতে দেওয়ার জন্য অ—বাবুকে অতি করুণ ভাবে বিস্তর অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে আহারের স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং স্ব স্ব স্থানে বসিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ মহাশয় তখনও বারেন্দায় দাঁড়াইয়া মুখ ধুইবার জল ফরমাইস করিতেছিলেন। জল পাইয়া সশব্দে মুখ ধুইয়া আহারের স্থানে আসিলেন। তথাকার সজ্জা দেখিয়া তাঁহার মুখখানি আশ্চর্য্য রসের একটি প্রতিমূর্ত্তির মত হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন এবং জাল রবিবাবুকে (অ—বাবুকে) প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। কখনও হাস্যরস, কখনও করুণরস এবং কখনও দর্প রসের অভিনয় চলিতে লাগিল; "এত ফুল, এত পাতা, এত পাথরের বাটী, গ্লাসের বাটী আর এতখানা পাথরের ঝকঝকি, এ সমস্ত জোগাড় করা কি সোজা কথা!" এইরূপ নানা মন্তব্য প্রকাশের পর তিনি জাল রবিবাবুর পার্শ্বের আসনে আহারার্থ বসিয়া গেলেন।

বসিয়াই উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"গিন্নী বলে দিয়েছেন তাঁর জন্য ভাল খাবার কিছু ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে। একখানা সরা চাই মশায়—এখনই চাই। কোনও জিনিষ উচ্ছিষ্ট না হতে হতেই চাই, কারণ গিন্নী রোজ পূজো আহ্নিক করেন কি না!" অ—বাবু তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া এমনি ভাবে কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন যে, আমার মনে হইল তিনি বুঝি চপেটাঘাত করিয়া বসেন।

একজন পরিচারক একখানি সরা লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ উভয়পার্শ্বস্থ অতিথিগণের পাত হইতে টপাটপ মিষ্টান্ন তুলিয়া সরা বোঝাই করিতে লাগিলেন। সরাটি সামনে নামাইয়া রাখিয়া, বৃদ্ধ তখন নিজ গাত্র হইতে সেই ময়লা বালাপোষখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং যোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়গণ আমাকে মাপ্ করবেন। আপনাদের সকলকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছি—আর না। এবার নিজের প্রকৃত পরিচয় দিই—'আমি আপনাদের সেই অর্দ্ধেন্দু-শেখর।"

আমরা সকলে দেখিয়া অবাক্—বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ আর কেহ নহেন, কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। মেঘের পিছনে "রবি" আমাদিগকে দিন-কাণা করিয়া দিয়াছিলেন এবং খামখেয়ালী মজলিসকে আজ একটা অভিনব আমোদ দিবার জন্য তিনিই অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই অপূর্ব্ব অভিনয়টির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দু বাবুর অপরিচিত অ—বাবুকেও, তাঁহার তদানীন্তন সাহেবিয়ানার জন্য একটু জব্দ করার উদ্দেশ্য ছিল। বিলাত-ফেরত ইঙ্গবঙ্গগণকে সুপথে আনয়নও খামখেয়ালী মজলিসের একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া সবেমাত্র অবসর জীবন লাভ করিয়াছেন, তাই অসাধারণ ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গরসের মঞ্চে তিনি প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমরা পাঠদ্দশায় মুস্তফী মহাশয়ের রঙ্গরসের সমুদ্রে অনেক ঢেউ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতাম। সেই মুস্তফীকে অদ্য সশরীরে পাওয়া গিয়াছে। তিনি অ—বাবুর নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন; অ—বাবু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পদধূলি পর্য্যন্ত লইলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয়।

সেদিন খামখেয়ালী মজলিসের কি বাহার যে হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। আহারের ঘটা ছিল বাছা বাছা নানাদেশীয় খাদ্য। কাশ্মীর, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রন্ধন ছিল এবং ছোট বড় গ্লাসে মাদক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে নানাদেশীয় সরবতে বরফ সংযোগে শীতল পানীয় ছিল। নানা দেশীয় পুষ্প পত্রের দ্বারা

আহার স্থানের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র (miniature) একটি বাগান; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র পুষ্পে সুশোভিত।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আহারান্তে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত 'ডাক্তারখানা' অভিনয় করিলেন। ডাক্তার-খানা বিষয়ে বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্ম-বাণী'তে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে অতিরঞ্জিত নহে তদ্বিষয়ে আমি হলফান সাক্ষ্য দিতে পারি।

সে রাত্রে আমার একটি পারিবারিক কথা অর্দ্ধেন্দু বাবু নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এখন তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। অর্দ্ধেন্দু বাবুর মাতামহ ছিলেন যজ্ঞেশ্বর বসু। এই যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ত্রিপুরার স্বনামধন্য (বীরচন্দ্র তদানীন্তন "যুবরাজ" Defacto Ruler অর্থাৎ উত্তরাধিকারি-প্রশ্ন মীমাংসা পর্য্যন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজা) কলিকাতা হইতে আনা-ইয়া তাঁহার "খাসমুন্সী" (Private Secretary) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বীরচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য যখন ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষার্থ কলিকাতা যাইতে বাধ্য হন, তখন তিনি ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের অতিথি স্বরূপ ঠাকুর মহাশয়দের সাতপুকুর বাগানে অবস্থান করিতেন। তখন যজ্ঞেশ্বর বাবু যুবক ছিলেন এবং কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া-ছিলেন, তাঁহারই পরিশ্রমে ও যত্নে এবং ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণকিশোর নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। নিম্নে এ সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিলাম—

The Raja has an in indendent Hill Territory; that your propositions for its resumption are *totally inadmissible.*"

(Govt. letter to the Commissioner of Chittagong. Dated the 27th December 1838)

অর্দ্ধেন্দু বাবুর নিকট তাঁহার মাতামহের অনেক পুরাতন কাগজ পত্র ছিল, তাহাও তিনি আমাকে জানাইলেন এবং তিনি ঐসব পুরাতন কাগজপত্র আমাকে দেখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। খামখেয়ালী করিতে আসিয়া অদ্যকার রাত্রে আমি যাহা পাইলাম তাহার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিবে। যজ্ঞেশ্বর বাবুর কার্য্যকুশলতায় একটী স্বাধীন রাজ্যের ধ্বজা ভূলুণ্ঠিত না হইয়া ঊর্দ্ধ আকাশে বিরাজ করিতে পারি-য়াছে ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের A. D. C. স্বরূপ আমার পিতৃদেব তাঁহার সূ'চটি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসিংহাসনের তত্ত্ব রাখিতেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট আসিয়া তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুও অনেক সময় ত্রিপুরায় বাস করিতেন। ইনি বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞ ত ছিলেনই, তাহা ছাড়া একজন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু অভিনয় ব্যাপারে দৌহিত্র হইতে দক্ষতায় কম ছিলেন না। আমার পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি, আগড়তলা রঙ্গমঞ্চে যে দিন "একেই কি বলে সভ্যতা?" নাটক অভিনীত হইয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন বাবাজী আর যজ্ঞেশ্বর বাবু ছিলেন পুলিস সার্জ্জন। তাঁহারা অভিনয় করিয়া-ছিলেন আগড়তলা-প্রবাসী কলিকাতা ও বর্দ্ধমান নিবাসী কয়েকজন ভদ্রলোকের সম্মুখে। আমাদের কুটুম্ব ছিলেন বর্দ্ধমান-নিবাসী অমৃত অদ্বৈতলাল বর্ম্মণ। তাঁহার ও পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি, যজ্ঞেশ্বর বাবুর ন্যায় ইংরাজী সার্জ্জন সাজিতে কলিকাতায় কাহা-কেও দেখেন নাই।

এই পুরাতন কাগজগুলি আমার হস্তগত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুস্তফী মহাশয় মাতামহের চিহ্ন বলিয়া সেগুলি হস্তান্তরিত করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে আমাকে সেগুলি তিনি নকল করিয়া দিবেন বলিয়া-ছিলেন। রাজসেবায় ব্যস্ত থাকায় আমার সময়াভাব ও তাঁহার জীবনের কাল রবি অস্তমিত হইতে-

ছিল—কাযেই আমার সাধ তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

অর্দ্ধেন্দু বাবুর স্মৃতি দিবসে "মানসী" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন এবং বিশদভাবে শ্রীযুক্ত ললিত-চন্দ্র মিত্র যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে যে উৎস উঠিয়াছিল তাহাই এখানে বর্ণনা করিলাম। প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক হইল তাহার বিষয় আমি ভাবি নাই—সম্পাদক মহাশয় এবং পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিয়া লইলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

সন্ন্যাস

(গল্প)

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আকিয়াব শহরে মৌংপে নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি এ নগরের বিচারক পদে আসীন থাকিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। আপামর সাধারণ সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত।

মৌংপের যুবতী সুন্দরী ভার্য্যা ও একটি পুত্র ছিল। তাঁহার অর্থ ও সম্পত্তির অথবা সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। অধিকন্তু, সময়ে তিনি যে প্রধান বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিবেন, সে সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ ছিল না। প্রধান বিচারকের পদ লাভ করিলে তিনি একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারদেশে সুবর্ণাক্ষরে "মৌংপে, প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক এত সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত" লিখিয়া দিবেন এরূপ চিন্তাও তিনি মধ্যে মধ্যে করিতেন। ভাবিতেন, "পুত্রটি বড় হইতেছে; সে এক্ষণে মাত্র দুই বৎসর বয়স্ক হইলেও বেশ বুদ্ধিমান। উপযুক্ত বয়সে সেও ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করিবে এবং ধর্ম্মাধিকরণ শোভা করিবে। আর আমার সহধর্ম্মিণী যদি একটি কন্যা প্রসব করেন, তবে তাহাকেও বড় ঘরে বিবাহ দিব। কি আনন্দ হইবে!" মৌংপে আহ্লাদে অধীর হইলেন।

একদিবস প্রাতঃকালে মৌংপে প্রাতরাশে বসিয়াছেন। এটী তাঁহার নিত্য কার্য্য ছিল। পূর্ব্ব রাত্রে তাঁহার আহার কিছু গুরুতর হইয়াছিল—রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই, তথাপি তিনি প্রাতরাশ গ্রহণে বিরত হইলেন না। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে সুপক্ক আম্র ছিল, তিনি তাহারই একটি গ্রহণ করিয়া অন্যমনস্কভাবে কামড় দিলেন। দাঁত কটকট করিয়া উঠিল, দাতে আঁঠি লাগায় তিনি গুরুতর বেদনা অনুভব করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাঁত একটি পড়িয়া গেল। বেদনা দূর হইল, কিন্তু দাঁত দেখিয়া তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন—"এই প্রকারেই আমাদের দেহাবসান হয়! এও ত এক আংশিক মৃত্যু! আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছি, অথচ সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখি না। আমাদের এই দেহ কি কদর্য্য!"

মৌংপে প্রাতরাশ গ্রহণে বিরত হইলেন। কাছারী যাইবার পথে পরিদর্শনার্থ তিনি এক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে গমন করিলেন। সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীতে যাইয়া তিনি শিক্ষয়িত্রীকে বালিকাগণকে কয়েকটী প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলেন।

শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের জন্ম হইয়াছে কেন?" সুকুমারমতি অল্পবয়স্কা বালিকাগণ উত্তর দিল, "কেন? মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে।" মৌংপের বোধ হইতে লাগিল যে কক্ষস্থ প্রাচীরগুলিও যেন বালিকাদের সহিত সমস্বরে বলিতেছে—"মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে।" শিক্ষয়িত্রী আর যে সকল প্রশ্ন করিলেন তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন না; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে চতুর্দ্দিকে কেবল একই প্রতিধ্বনি হইতেছে—"মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে।"

অন্যান্য দিন পরিদর্শনান্তে তিনি শিক্ষয়িত্রীকে প্রশংসা করিতেন; বালিকাদিগকে পুরস্কার দিতেন—কিন্তু আজ আর তিনি কিছুই করিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া বিদ্যালয় গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে শিক্ষয়িত্রীগণ আজ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে আসিলে, তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কে বলিয়া উঠিল—"হে পদ্মাসনাসীন প্রভো! তোমার করুণার অবধি নাই! কি পরিস্ফুট ভাবে, কি সুন্দর উপায়ে, আমাদের যাহা জানা আবশ্যক তাহা তুমি জানাইয়া রাখিয়াছ! অথচ, হতভাগ্য আমি ইহাতে দৃষ্টিপাত করি নাই! আমি প্রত্যহই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই ভগবানের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথচ আমি তাহার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও প্রস্তুত হইতে পারি নাই। আমরা মানুষরা কি নির্ব্বোধ! আমরা যৎসামান্য দ্রব্যাদির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করি, কিন্তু যাহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয়, সে বিষয় একবারও চিন্তা করি না! কি গভীর আক্ষেপের বিষয়! কখন্ সে বিষয় চিন্তা করিব? কখন্? নির্ব্বোধ! আজই, এক্ষণেই!" অজ্ঞাতসারে তিনি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ঠিক এমনই সময়ে ভূমিতলে আসীন একটি ভিক্ষুক তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। চিত্তচাঞ্চল্য লইয়া তিনি তাঁহার পকেটে হাত দিয়া টাকা পয়সা পরিপূর্ণ থলিয়াটি ভিক্ষুককে প্রদান করিলেন। "সর্ব্বাগ্রে দান—দানের ন্যায় কার্য্য নাই। উচ্চে আরোহণের পূর্ব্বে দান করিতে হয়।"—মৌংপে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

মৌংপের সহধর্ম্মিণী সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার স্বামীর ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি ইহার কারণ নির্দ্ধারণের জন্য অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন না। তিনি ইহা জানিতেন যে তাঁহার নিজের কোন ত্রুটিতে তাঁহার স্বামীর ভাবান্তর হয় নাই। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও মনান্তর হয় নাই। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। এবং তাঁহারা উভয়েই পৃথিবীর অন্য কাহারও প্রতি দৃক্পাত করিতেন না। নিজেদের সংসারই চিনিতেন, জানিতেন। এযাবৎ সংসারের বহির্দ্দেশস্থ কাহারও সহিত যেন তাঁহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু এক্ষণে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে; কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের কারণ সহধর্ম্মিণী বুঝিতে পারিতেছিলেন না। মৌংপে এক্ষণে অযাচিত দান করিতেন। মৌংপে-গৃহিণীর মনে হইতেছিল এখন যে স্বামীর চক্ষে স্ত্রী, পুত্র আর বহির্জ্জগতের সব এক—কোন প্রভেদ নাই। ইহার কারণ কি?

একদিন স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, "তুমি কেবলই দান করিতেছ। তোমার যে একটী পুত্র রহিয়াছে তাহা ত তুমি মনেও কর না! সবই যদি দান কর তবে তাহার কি হইবে? আর কে জানে, যদি আমাদের একটি কন্যা হয়। তবে তাহার যৌতুক কোথা হইতে আসিবে?"

স্বামী প্রত্যুত্তর করিলেন, "আর আমাদের সন্তান হইবে না।"

স্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন—স্বামী যাহা বলিলেন তাহা সম্যক্‌রূপেই বুঝিতে পারিলেন। স্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন, "মঠেই ধার্ম্মিকগণ বাস করেন। সংসারে যাহারা থাকে তাহাদের পক্ষে ইহা কি সম্ভব?"

একবৎসর অতিবাহিত হইল। মৌংপে কায়মন বাক্যে সংযত হইয়া এই দীর্ঘ এক বৎসর কাটাইলেন। তিনি অবিশ্রান্ত দান করিতে লাগিলেন—ফলে তাঁহার অর্থ নিঃশেষ হইতে লাগিল।

একদিবস একটি গুরুতর মোকর্দ্দমা বিচারার্থ তাঁহার নিকট আসিল। একজন নিজ-স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

একহস্ত-বিহীন পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এক ব্যক্তি এক্‌বৎসর-পূর্ব্বে-বিবাহিত নিজ স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র সপ্তদশ বৎসর। এক রাত্রিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া বৃদ্ধ তাহার যুবতী স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে।

বিচারালয়ে অপরাধী আনীত হইলে, মৌংপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছ?"

অপরাধী অম্লানবদনে নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, করিয়াছি।"

"এরূপ করিবার কারণ কি? হতভাগ্য! তুমি কি জান না যে ইহাতে তুমি নিজের পরকাল ও ইহকাল উভয়ই নষ্ট করিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়, আমি জানিয়া শুনিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু আমার যে উপায়ান্তর ছিল না। আপনার স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হইত এবং অপর পুরুষ যদি তাঁহাকে চুম্বন করিত, তবে আপনিও কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেন?"

এমন সময়ে আদালতগৃহে উপস্থিত হত্যাকারীর শাশুড়ী চীৎকার করিয়া বলিল, "বুড়ো মিন্‌সে! এরূপ হওয়া কি আশ্চর্য্য? তুই ষোল বছরের মেয়ে বিবাহ করিলি কেন? রাত দিন তুই আমার মেয়েটাকে জালাতন করিয়াছিস্।"

হতভাগ্য হত্যাকারীও চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার নিকট অর্থ লইয়া কি তুই তোর কন্যাকে বিক্রয় করিস নাই?"

মৌংপে আদালতে গোলযোগ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বল।"

হত্যাপরাধী বলিতে আরম্ভ করিল—"আমার জন্ম হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতাকে হত্যা করা হইয়াছিল। মা বলিবার পূর্ব্বেই আমি মাতৃহারা হই। যতদূর মনে পড়ে, আমি ভিক্ষা করিয়াই জীবিকার্জ্জন করি। আমার এক হাত নাই, সুতরাং আমি কোন কাযেরই উপযোগী ছিল না। আপনাকে বলিতে বাধা নাই যে আমি শুধু পঙ্গু নই, আমি মৃগী রোগাক্রান্ত। যখন এই ব্যাধি বৃদ্ধি পায়, তখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। ভিক্ষার্থ বহির্গত হইবার সময় একদিন এই স্ত্রীলোকের দোকানের সম্মুখে অজ্ঞান হইয়া পড়ি—"

এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি পুনর্ব্বার বাধা দিয়া বলিল, "হুজুর, আমি ফল বিক্রয় করিয়া সদুপায়ে জীবন ধারণ করি এবং প্রতি সপ্তাহে বৃদ্ধের নাম করিয়া দুই আনা দান করি।"

মৌংপে স্ত্রীলোকটীকে পুনর্ব্বার চুপ করিতে আদেশ করিলেন। অপরাধী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আমি যখন ইহার দোকানের সম্মুখে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন ইহার কন্যা—আমার স্ত্রী—যাহাকে আমি হত্যা করিয়াছি—আমার দুর্দ্দশায় দয়ার্দ্র হয়। সে আসিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেই সময় আমার হস্তবিহীন স্কন্ধদেশের সহিত তাহার অঙ্গ-সংস্পর্শ হইল। এই আমার সর্ব্বনাশের মূল।"

মৌংপে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না—"ইহাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল কেন?"

সে বলিতে লাগিল, "মহাশয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন! আমার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর, ইতিপূর্ব্বে আমি কোন দিন স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করি নাই।"

হত্যাকারীর শাশুড়ী বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিতে লাগিল, কিন্তু অপরাধী উহা লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, উহা অদৃষ্টের ফের। উহাই আমার সর্ব্বনাশের মূল। ইহার পূর্ব্বে আমার কোন অভাব ছিল না, কোন ক্লেশ ছিল না। কিন্তু এই

কু সংস্পর্শে সব বদলাইয়া গেল। ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ অন্নে আর আমার তৃপ্তি হইত না। আমার মনে অশান্তি জন্মিল। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম।"

আদালতে উপস্থিতা সেই শাশুড়ী পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, "প্রত্যহ ও আমার দোকানের নিকট দিয়া যাইত এবং আমার কন্যার প্রতি চাহিয়া থাকিত।"

অপরাধী বলিতে লাগিল, "ও সত্য কথাই বলিতেছে। আমি ওরূপ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। একদিন আমি ভিক্ষার্থ মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন দাতা তথায় উপনীত হইলে আমি ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি প্রচুর অর্থপূর্ণ থলিয়া আমাকে দিয়া চলিয়া গেলেন। থলিয়া খুলিয়া আমি তন্মধ্যস্থ মুদ্রা গণিয়া দেখিতে লাগিলাম—এক—দুই—আড়াই শত টাকা। আমি বসিয়া রহিলাম—সে স্থান ত্যাগ করিতে সাহসী হইলাম না। ভাবিলাম, দাতা ভ্রমক্রমেই অর্থপূর্ণ থলি আমাকে দান করিয়াছে; নিশ্চয়ই এক্ষণই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিবে—সুতরাং এস্থানে বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। আবার মনে করিলাম, স্থান ত্যাগ করি। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু দাতা আর ফিরিল না। আমি আজ দুইশত পঞ্চাশ টাকার মালিক। আমি উঠিয়া এই স্ত্রীলোকটির নিকট উপস্থিত হইলাম। বলিলাম, "তোমাকে এক শত টাকা দিব—তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও।"

আদালতে উপস্থিতা শাশুড়ী পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী বুড়ো! তুই প্রথমে পঞ্চাশ টাকা মাত্র দিতে চাহিয়াছিলি। আমি অনেক কষ্টে তোর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছি।"

মৌংপে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নিজের গ্লানির কথা কেন তুমি প্রকাশ করিতেছ?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "মহাশয়! আমি যে বিধবা তাহা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? আমি কি প্রতি সপ্তাহে দুই আনা করিয়া বুদ্ধের নামে দান করি না? এ সব আসিবে কোথা হইতে?"

পুনর্ব্বার চীৎকার করিলে তাহার জরিমানা হইবে মৌংপে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়া অপরাধীকে তাহার বক্তব্য বলিতে বলিলেন।

সে বলিল, "আমি উহাকে শত মুদ্রা ও উহার কন্যাকে সুবর্ণবলয় প্রদান করিলাম। তিনদিন পরে আমাদের বিবাহ হইল।"

মৌংপে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি সে তোমাকে ভালবাসিত?"

সেকথা বলিতে না বলিতে শাশুরী উত্তর করিল, "অর্থ দ্বারা আমার কন্যাকে বশীভূত করিয়াছিল। লোহার ন্যায় ভারী সুবর্ণ-বলয়ের মায়া কি সহজ?"

মৌংপে অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি সে তোমাকে ভালবাসিত?"

অপরাধী উত্তর করিল, "মহাশয়! সে স্বেচ্ছায়ই আমাকে বিবাহ করিয়াছিল।"

"তুমি কি একবারও ভাবিয়া দেখ নাই যে সে তোমার নিকট একটি বালিকা বই কিছুই ছিল না?"

"মহাশয়, ও সব আমি কিছুই ভাবি নাই। অপর কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার কথা আমার মনেই আসে নাই। ইহা অদৃষ্টের ফল। আমি আর অন্য কোন বিষয়ই ভাবি নাই।"

"ভাল, তার পর কি হইল?"

"হয়ত সবই ভাল হইতে পারিত। আমি যে তাহাকে কত ভালবাসিতাম তাহা আপনি অনুমান করিতে পারিবেন। আমি তাহাকে অমূল্য হীরকের ন্যায় জ্ঞান করিতাম।"

শাশুরী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তাহাকে তুমি বাক্সে পুরিয়া রাখিতে পারিলে নিশ্চিন্ত থাকিতে, তাহা হইলে আর সে কাহারও চক্ষুতে পড়িত না।"

অপরাধী বলিয়া যাইতে লাগিল—"আমরা ছোট একখানি দোকান খুলিলাম—সবই ভাল ভাবে চলিতে লাগিল। অবশেষে দীর্ঘকেশ-বিশিষ্ট একটি লোক

এখানে আসিল—এখন সে মৌলমেন্ কি অন্যত্র গিয়াছে। সে একদিবস আসিয়া আমার স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিল। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অতক্ষণ উঁহার সহিত তুমি কথা বলিলে কেন?" সে উত্তর করিল, "এত মহৎ ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে যে আমি অন্য কাহার'ও সহিত কথা কহিব না?"

শাশুড়ী বলিল, "সে আমার আত্মীয়। বাল্যকাল হইতে সে আমাদের সহিত পরিচিত। ব্যাঙ্কক গিয়াছিল, চারিবৎসর পরে সে তথা হইতে আসিয়াছিল। তাহার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিলে কি অপরাধ হইতে পারে? আমার কন্যা আমাকে সকল কথাই বলিয়াছে। আমার কন্যা সতী ছিল। কেবল উহার পাগলামীর জন্যই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।"

মৌংপে বলিলেন, "তবে তুমি স্বীকার করিতেছ যে তোমার কন্যা অপরাধিনী?"

শাশুরী উত্তর করিল, "মহাশয়, একটি অসহায়া স্ত্রীলোক এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর কি করিতে পারে?—দিবারাত্র তাহাকে সন্দেহ করিত।"

মৌংপে অপরাধীকে তাহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

"মহাশয়, আর অধিক বলিবার কিছুই নাই। একদিন এই স্ত্রীলোকের গৃহে আমি উভয়কে একত্র দেখিতে পাইলাম। আমি কিছুই দেখি নাই, এইরূপ ভাব দেখাইলাম; অন্যথা সে পলায়ন করিত।"

বিচারক বলিলেন, "তুমি তাহাকে পলায়ন করিতে দিলেই ত ভাল হইত।"

অপরাধী বিচারকের দিকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিয়া বলিল, "তাহাও কি সম্ভব হয়, মহাশয়? আমার স্ত্রীকে পলায়ন করিতে দিব? সে ত তাহা হইলে অপরকে গ্রহণ করিত।"

"তাহাতে কি যাইত আসিত? সে ত দুশ্চারিণী ছিল।"

"মহাশয়, যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া একধার বিবেচনা করিয়া দেখুন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আমি বিবাহ করিয়াছি, আর সেই স্ত্রী অপরকে দিব?"

"তুমি ত এখন আর তাহাকে পাইবে না।"

"মহাশয়, সবই সত্য; তথাপি আমি অপরকে নিজ স্ত্রী দিতে পারিতাম না।"

মৌংপে কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, অপরাধীকে বলিলেন, "আচ্ছা তোমার বক্তব্য শেষ কর।"

"মহাশয়, পরে এইরূপ ঘটিয়াছিল। রাত্রি না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি যেন কিছুই জানি না এইরূপ ভাণ করিলাম। সে আজ আমার প্রতি অত্যধিক আদর দেখাইতে লাগিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক দিন আমার প্রতি যেরূপ আদর যত্ন দেখাইয়াছিল, আজও সেইরূপ করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি, আমি যে সব জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম না। সে বলিল, "তুমি বোধ হয় ভাব যে, আমি উহাকে ভালবাসি।" আমি আরও চতুরতা করিলাম—কিছুতেই তাহার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলাম না। গভীর রাত্রে যখন তাহাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা দেখিলাম, তখন একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া তাহার বক্ষের বস্ত্র অপসারিত করিলাম। তাহার অঙ্গের যে স্থানে আমার সহিত তাহার প্রথম সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহাকে সেইস্থানে আঘাত করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, দুই দুইবার সেই স্থানে ছুরিকা লইয়া গেলাম। কিন্তু কি জানি কেন দুইবারই আঘাত করিতে পারিলাম না। অবশেষে কি করিলাম, বা কি ঘটিল, আমার মনে নাই; কিন্তু আমি তৎপরে তাহার গলদেশ চাপিয়া তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিলাম।"

"এক হাতেই তুমি পারিলে?"

"হাঁ মহাশয়, এক হাতেই হইল। কি প্রকারে ইহা করিলাম, তাহা আমিই জানি না। সে নড়েও নাই। আমি ত তাহাকে অপরকে দিতে পারিতাম না।"

শ্বাশুড়ী এই সময়ে আদালতগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যে, সে অপরাধীকে পাইলে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। একজন চাপরাসী তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

মোৎপে অনেকক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "তুমি যে আত্মদোষ স্বীকার করিলে,তাহা তোমার ইহকাল পরকাল উভয়ের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। সকল সময়েই সত্যানুসরণ করিবে। যদি মিথ্যা বলিতে, তবে সে মিথ্যা আমাদিগকে বলিতে না—নিজের প্রতিই নিজে ছলনা করিতে। আচ্ছা, তুমি এই আড়াই শত টাকা কোথায় পাইলে? তুমি নিশ্চয়ই উহা চুরি করিয়াছিলে?'

অপরাধী বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "পিতৃপুরুষগণের পবিত্র নাম লইয়া বলিতেছি, আমি জীবনে একদানা চাউলও চুরি করি নাই।...যে সময়ে আমি উহা পাই, তাহা আমি এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি—মনে হইতেছে যেন গত কল্য উহা পাইয়াছি। যিনি দিয়াছিলেন, তিনি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ব্যক্তি। তিনি সে সময়ে মঠের সন্নিকটস্থ বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছিলেন।"

মোৎপে শিহরিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ তিনি অপরাধীকে খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে বিশেষ করিয়া অপরাধীকে দেখিলেন। অপরাধীও তাঁহার প্রতি বিশেষ করিয়া চাহিয়া থাকিল। বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ন্যায় উভয়েই স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। অবশেষে অপরাধী ধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আপনিই সেই দাতা! আপনার দানই এই অভিশাপের মূল।"

মোৎপের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—আদালত-গৃহে আর "টু" শব্দও শ্রুত হইতেছিল না। মোৎপে অপরাধীকে পুনর্ব্বার কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আমার কোন অধিকার নাই; কিন্তু আইনে ইহার একমাত্র শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—মৃত্যু। বিচারকরূপে ইহার প্রতি এই শাস্তি ব্যতীত অন্য শাস্তি দিবার বিধান নাই। উপায় কি? হয় ইহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে—অথবা চাকুরী পরিত্যাগ করিতে হইবে! মানুষ কি একে অপরের বিচার করিতে পারে? কিন্তু সাধারণের সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমার প্রশ্ন এই—'আমি কি ইহার বিচার করিতে পারি?' একমাত্র উত্তর—না। আমার নিজ অপরাধের জন্য আমি নিজেকে দিবারাত্র বিচার করিতে পারি।"

মোৎপে গৃহে উপস্থিত হইয়াই স্ত্রীকে বলিলেন, "আজই আমি পদত্যাগ করিব। আমি কাহাকেও বিচার করিতে পারিব না।"

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

স্বামী উত্তর করিলেন, "অপরকে বিচার করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই।"

স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমা অপেক্ষা নিন্দনীয় ব্যক্তিগণও ত বিচারাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।"

স্বামী বলিলেন, "আমার তাহাতে কি যায় আসে? সময়ে তাহারাও বুঝিতে পারিবে।"

স্ত্রী বলিলেন, "তোমার বিচারক পদে আসীন থাকা উচিত কি না তাহা আমি জানি না। তবে ইহা জানি যে, তোমাকে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিতে হইবে। পদত্যাগ করিলে আমাদের চলিবে কিসে? তুমি ত সর্ব্বস্বই দান করিয়াছ।" স্বামী উত্তর দিলেন, "দেশে ত আমাদের যৎসামান্য সম্পত্তি আছে।"

স্ত্রী এবার শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "তা ত আছেই। তুমি কি কৃষাণের ন্যায় ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারিবে? আর সে সম্পত্তিতে কি আমাদের দিন চলিবে? যাহা পাইবে তাহাতে ত ভাতও কুলাইবে না।"

মোৎপে কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু সেইদিনই তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। পদত্যাগের তিনি কোন কারণই নির্দ্দেশ করিলেন না।

কয়েকদিবস পরে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এই আকস্মিক পদত্যাগের কারণানুসন্ধানের জন্য মোৎপের নিকট আসিলেন। বার্দ্ধক্য বা ব্যাধির জন্য কেহ পদত্যাগ

করিলে পেন্সন পাইতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এরূপ কোন কারণ অবগত ছিলেন না।

মৌংপে কর্ম্মচারীর প্রশ্নে উত্তর দিলেন, তিনি আর বিচারকের কার্য্য করিতে পারিবেন না। কর্ম্মচারী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৌংপে প্রত্যুত্তর করিলেন, অপরকে বিচার করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই। কর্ম্মচারীর সন্দেহ হইল, মৌংপে কি অকস্মাৎ বাতুল হইয়াছেন? তিনি শান্ত ভাবে বলিলেন, "মৌংপে, তুমি সরকারী কর্ম্মচারী। বহুদিন তুমি সরকারের নুন খাইয়াছ এবং সরকারের মঙ্গলের জন্য তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" সরকারের মঙ্গলের জন্য যে সকল আইন প্রতিপালন করা আবশ্যক, তাহা তুমি প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক কেন?"

মৌংপে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, "সরকার আইন প্রতিপালনের জন্য অনেক লোক পাইবেন। সত্যানুসন্ধানই প্রধান পুরুষার্থ, অনুসারে তৎপরে অন্য কায।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "যখন তোমার বিবেক অনুসারে তুমি বিচার কর, তখন কি তুমি সত্যানুসন্ধান কর না?"

মৌংপে উত্তর করিলেন, "দিবারাত্র নিজের কার্য্যেরই বিচার করা বিধেয়।"

কর্ম্মচারী বুঝিলেন, তিনি বৃথাই তর্ক করিতেছেন। স্থান ত্যাগ করিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে ইহা হইতে তোমার কোন মঙ্গলই হইবে না।"

মৌংপের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইল—তিনি কোন পেন্সন পাইলেন না।

মৌংপে পরিবার এখন আর সহরের বাড়ীর ভাড়া দিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুখ ও শান্তিময় গৃহ পরিত্যাগ-কালে মৌংপে-পত্নী আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি মনে মনে পুত্রের উদ্দেশে বলিলেন, "তোমার পিতার জন্যই আজ তোমার এই দুর্গতি।" তাচ্ছিল্যসহকারে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি সহর ত্যাগ করিলেও ভিক্ষুকদের আহারের অভাব হইবে না।" স্বামী উত্তর করিলেন, "আমি ভিক্ষুকদের কিছুই দিই নাই—নিজকেই দিয়াছি।"

স্ত্রী এবার উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, মৌংপে পত্নীকে ক্রন্দন সংবরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "তুমি একথা কোন্ প্রাণে বলিলে? তোমার জন্যই ত এই সব হইল।"

মৌংপে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্ত্রীর হাত জোরের সহিত ধরিয়া কর্কশ-স্বরে তাহাকে থামিতে বলিলেন। হাতে টান ও সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হওয়াতে স্ত্রী চমকিতা হইলেন। বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ হস্তে-বদনাবৃত করিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া পড়িলেন। পুত্রও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। সে পথিপার্শ্বস্থ ফুল ছিঁড়িয়া মায়ের কোলে ফেলিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বালসুলভ চপলতার সহিত মায়ের আঙ্গুল ফাঁক করিয়া মায়ের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের জন্য মৌংপেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তৎপরে তিনি হঠাৎ নিজপুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল আমরা দুইজনেই যাইব।"

কিন্তু তিনি হাতে বল পাইতেছিলেন না—তাঁহার কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা ছিল না। পুত্রও কাঁদিতে লাগিল এবং মায়ের কাছে গেল—মাও তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মৌংপে কিন্তু এতক্ষণে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, "এরূপ করিলে চলিবে না। কাহারও উপর নির্ভর করা যায় না।" অকস্মাৎ স্ত্রীও তাঁহার প্রতি চাহিলেন—তিনি পুত্রকে স্বামীর দিকে ঠেলিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার নিকট যাও। আমরা তিনজনেই যাইব।"

মৌংপে পুত্রের হস্ত ধরিয়া, বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অগ্রসর হইয়া পল্লীগ্রামস্থ নিজ গৃহে উপনীত হইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীভিক্ষু-সুদর্শন।

উপন্যাস ও মনোবিজ্ঞান

কিছুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি "মনোবিজ্ঞান-সম্মত (Psychological) উপন্যাস"। ইহার যথার্থ অর্থ অনেক চিন্তা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না। মনোবিজ্ঞান এক জিনিষ, উপন্যাস বা গল্প আর এক জিনিষ। এই দুইটার খিচুড়ী করিবার উদ্দেশ্যব্যাখ্যা কে করিবেন? বিজ্ঞাপন-দাতা? অথবা উপন্যাস-লেখক? অথবা বিজ্ঞাপন-দাতারূপ ঔপন্যাসিক-ধুরন্ধর? সকল জিনিষের মধ্যেই এখন মনোবিজ্ঞান যোগ করিয়া দেওয়া লোকের একটা বাতিক হইয়াছে। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" হইলেও, পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করা বড় শক্ত। তাই বিষয়টা সত্য হউক বা ভ্রান্ত হউক সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া লেখা হইয়া থাকে "Psychological উপন্যাস" অথবা "Psychology বা মনোবিজ্ঞান অনুসারে লিখিত উপন্যাস।" উদ্দেশ্য—লোককে সহজে বিস্ময়ে অভিভূত করা। যখন সেক্সপিয়র নাটক লিখিয়াছিলেন, বা আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র অমর-উপন্যাসমালা রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে উপন্যাসের সহিত মনোবিজ্ঞান জড়াইয়া দিবার অথবা মনোবিজ্ঞানের দ্বারে সভয়ে আশ্রয় লইবার কোন নাম গন্ধও শোনা যায় নাই। যখন কোন পদার্থ অন্তঃসারশূন্য ও মেকি বলিয়া বুঝা যায়, তখনই এইরূপ মিথ্যা কারিকুরি করিবার প্রয়োজন হয়।

উপন্যাস ও মনোবিজ্ঞানের এইরূপ অসঙ্গত খিচুড়ি করায় দুইটার মৌলিক প্রভেদ বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে উভয়ের সীমাও ধরিতে পারা যাইবে। সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে কোন একটির অনধিকার-প্রবেশ শিক্ষিত পাঠকগণের নিকট অবশ্যই সনাতন নিয়মে দণ্ডনীয় হইবে। মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান বা দর্শন, উপন্যাস একটি শিল্প বা আর্ট। বিজ্ঞান জগৎ-রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া, সূত্র বাহির করিয়া দেখায়; শিল্প জগৎরহস্যকে বিচিত্ররূপে গড়িয়া দেখায়। সেই জন্য বিশ্বস্রষ্টাকে কবি বা শিল্পী বলা হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান মানব-জীবনকে কতকগুলি অংশের সমষ্টিরূপে ভাগ ভাগ করিয়া বর্ণনা করে ও ব্যাখ্যা করে। যেরূপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) প্রাকৃতিক দ্রব্যকে ছেদন করিয়া দেখিতে চায়, সেইরূপ মনোবিজ্ঞানও জ্ঞান-সমষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রচার করে। প্রাকৃতিক দ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডিত দেখিয়া প্রশংসাপর হইবার আকাঙ্ক্ষা যেরূপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নাই, সেইরূপ সম্পূর্ণ মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত-প্রকাশ বা ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়। সাধারণ লোকে চায় মানসিক অবস্থার অর্থ শুনিতে, মনোবিজ্ঞানবেত্তা চায় সেই মানসিক অবস্থার গঠন বুঝিতে। সুতরাং শিল্পীর ক্ষেত্র ও মনোবিজ্ঞানবেত্তার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। শিল্পী অপূর্ব্ব মানুষ গড়িতে চায়, বৈজ্ঞানিক মানুষের কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞানবেত্তার কার্য্যও বৈজ্ঞানিকের কার্য্য, তিনিও মানসক্ষেত্রের কঙ্কালরূপ দেখিতে চাহেন।

প্রকৃত শিল্প দেখিলে আমরা ভুলিয়া যাই যে এ একখানি চিত্র, অথবা একখণ্ড বস্ত্র মাত্র, হ্যামলেট যুবরাজ অথবা সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্বন্ধ ছাড়াইয়া পদার্থের স্বরূপ দেখিতে দেখিতে ভাবে রসে তন্ময় হইয়া যাই। প্রকৃত শিল্প নিদর্শন দেখিলে আমরা শিল্পীর সহিত একভাবে চিন্তা করি, ইচ্ছা করি, কার্য্য করি, তাহার সহিত এক হইয়া যাই। (১) শিল্পী বৈজ্ঞানিকের আসন লইবামাত্র আমরা

(1) "And if we enjoy the great works of art, the essential function is not the individual enjoyment of our senses and feelings, like the enjoyment in eating and drinking; no, it is the volitional acknowledgment of the will of the artist. We will with him........" H. Munsterberg's 'Psychology and Life, pp 145-178.

তাঁহার নিকট বিদায় লইব, আমাদের রসবোধ তখনই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—আমরা প্রকৃতির পাহাড়, নির্ঝরিণী, লতাগুল্ম প্রভৃতির সুরম্য উদ্যান বা স্নেহ, মায়া প্রেমপূর্ণ সংসার হইতে একেবারে বিদ্যুৎ-গ্যাস-পূর্ণ "ল্যাবরেটরী"তে বিতাড়িত হইয়া অবরুদ্ধ হইব।

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞান-বেত্তা অধ্যাপক মুনষ্টারবার্গ (Dr. H. Munsterberg) তাঁহার Psychology and Life নামক গ্রন্থে মনোবিজ্ঞানের সীমা ও অধিকারের ক্ষুদ্রত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষেই ইহা যথোপযুক্ত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপন্যাসের অসারতা দেখাইয়া তিনি ঘৃণার স্বরে লিখিয়াছেন—

"We detest the psychologically absurd creations of the stage villain and the stage hero in third class melodrama, the psychological marionettes of newspaper novels, and the frequent cases of insanity in poor fiction………"

সমালোচক মনোবিজ্ঞানবেত্তা হইলে ক্ষতি নাই (২) কিন্তু কবি বা ঔপন্যাসিকের মনোবিজ্ঞানের কথা ভাবিবারও প্রয়োজন হয় না। বিলাতে যেরূপ Morality Plays প্রভৃতি ছিল, সেইরূপ আমাদের দেশেও প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি দুই একখানি নাটক প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে পাপ পুণ্য ইত্যাদি নাটকে পাত্র পাত্রী-গণরূপে বর্ণিত হইত। এ সব নাটক অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর অপেক্ষাও হেয়, সন্দেহ নাই। "মনোবিজ্ঞান-সম্মত" উপন্যাসও তাহাই, একজন শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞান-বেত্তা ইহা বলিতেছেন।

এইবার মূল উদ্দেশ্য লইয়া শিল্প বা উপন্যাস ও মনোবিজ্ঞানের প্রভেদ বুঝা যাউক। প্রত্যেক শিল্পেরই একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে—সেই উদ্দেশ্য অনুসারে তাহার বহু কর্ত্তব্যও আছে। মানুষকে উন্নত করা, সৎপথে লইয়া যাওয়া, উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের চিত্র দেখাইয়া সত্য শিব সুন্দরের সাক্ষাৎ করান শিল্প বা উপন্যাসের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। মনোবিজ্ঞান কর্ত্তব্যের ধার ধারে না, সে বরং সত্য ও ন্যায়ের অর্থের সংহার সাধন করে, সে শুধু যথাযথ অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া থাকে। (৩) শিল্প মানুষকে অন্যায় পথ হইতে বাঁচাইয়া থাকে, তাহার কর্ত্তব্য কঠোর ও সুকুমার। বালকগণকে চিত্রবিদ্যা শিখাইতে হইলে কতকগুলি নিয়মের অধীন করিতে হয়, এই নিয়মগুলি তাহাদিগকে বিশ্রী অসুন্দর চিত্র করিতে বাধা দিয়া তাহাদের উপকার করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিতকর অভ্যাস ও প্রবৃত্তি স্থাপিত করে। মুনষ্টারবার্গ লেখিয়াছেন—

"Nobody will underestimate the value of the fact that our children learn through training a thousand habits which keep them, as a matter of course, out of conflict with the laws, and that police and jails remind them again and again, Do not leave the safe tracks."

পুলিস ও জেলের ভয় না থাকলে অল্প লোকই দুর্নীতি-মার্গ হইতে বিরত থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে সৎকাব্যের প্রয়োজন, প্রকৃত উপন্যাসের প্রয়োজন! সৎকাব্য ও উপন্যাস বন্ধুর ন্যায়, পতিতপাবনের ন্যায় মানুষকে উন্নত করে। সত্যের নামে "আর্টের দোহাই দিয়া দুর্নীতির যশোগান করা অথবা দুর্নীতিকে দার্শনিক মর্য্যাদা দান করা (Dogmatic philosophisation of immorality) ঘোরতর মহাপাতক! আটল্যান্টিক

(২) "The poet creates mental life in suggesting it to the soul of the reader only the man who decomposes it afterwards is a psychologist."

H. Munsterberg.

(৩) "Whoever understands art as will-function believes in art and appreciates it as a world of duties……. Psychology must destroy the deepest meaning of art, just as it disregards the deepest meaning of truth and morality."

—Psychology and Life.

মহাসাগরের পরপার হইতে একজন বিদেশী মনোবিজ্ঞানবেত্তা বলিতেছেন—

"Do not forget however, that æsthetical life also needs not only the policeman's function, but above all the minister's and helper's function; in other words, not technical rules, but duties; not easy production, but convictions; not knowledge of psychological effects, but belief in absolute values."

রামায়ণ মহাভারতের দেশে, কালিদাস ভবভূতির দেশে, গীতা মনুসংহিতার দেশে এ কথা কি আবার নূতন করিয়া বলিতে হইবে?

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রাখালী

(গল্প)

গোকুলদাস বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর তাহার হাত চারেক দূরে একটি পনের ষোল বছরের ছেলে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল। দাওয়ার সমুখেই খানিকটা খালি জায়গা, তাহাতে গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই; কেবল একপাশে গোয়ালঘরের গা ঘেঁসিয়া পাঁশগাদার ধারে একটা চামেলীর ঝাড়, গরিবের ঘরের অবিবাহিতা কন্যার মত সমস্ত অনাদর ও অবহেলার মধ্যেও আপনার যৌবনকে নীরবে পত্রপুষ্পে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। গোকুলদাসের আট বছরের মেয়ে রাখালী ফুল তুলিয়া তুলিয়া কোঁচড়ে জড় করিতেছিল, আর আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাইতেছিল।

হুঁকাটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া, খক্‌খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে গোকুলদাস ডাকিল, "এক ঘটি জল দিয়ে যা ত রাখালী।"

ফুল তুলিতে তুলিতে রাখালী উত্তর দিল, "আমি এখন পারবো না, নীলুদাদা ত রয়েছে, তাকে বল না।"

"সে যে পড়ছে।"

"আর আমি যে ফুল তুলছি।"

"যাবি নে ত?"

"নীলুদা যাক্ না।"

গোকুলদাস এবার তাড়া দিয়া উঠিল, "তুই যাবি কি না তাই বল্।"

রাখালী এবার আর কোন কথা বলিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলু বলিল, "আমি এনে দেবো?"

"না ওকেই আনতে হবে"—বলিয়া গোকুলদাস গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "যা বলছি শিগ্‌গির।" রাখালী তবুও নড়িল না।

"আনবিনে ত? আচ্ছা তুই কত বড় মেয়ে তাই দেখছি"—বলিয়া গোকুলদাস উঠিয়া দাঁড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, এমন সময় রান্নাঘর হইতে রাখালীর মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রে রাখালী?"

গোকুলদাসের আর উঠা হইল না। রাখালী এতক্ষণ কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, মার গলার সাড়া পাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—"একটু জল নিয়ে এলে নীলুদা যেন খয়ে যায়, আমি কক্ষণো যাবো না, কিছুতে যাবো না।"

রাখালীর মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া

হাতমুখ নাড়িয়া সুরু করিয়া দিল, "আমার মেয়েকে বকবার তুমি কে বল ত ? কেন, নীলে কি জল আনতে পারতো না, তার গতরে কি পোকা ধরেছে, না হাত দুখানা একবারে খসে গেছে ?"

গোকুলদাস না রাম না গঙ্গা; চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং গিন্নীর সুরটা উদারা মুদারা হইতে ক্রমে তারার দিগে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

রাখালীর মা এবার নীলুর উপর পড়িল। সে নানান রকম মুখভঙ্গি করিয়া বলিতে লাগিল, "নবাব পুত্তুরের মতন বসে বসে গেলবার জন্যে তোমাকে রাখা হয়নি ; গতর খাটিয়ে খেতে পার থাক, নইলে নিজের পথ দেখ,—এখানে ওসব নবাবী চলবে না।"

নীলমণি একটি কথাও বলিল না,—সে নীরবে বসিয়া রহিল ; তাহার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটা দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটাগুলা টপটপ করিয়া কোলের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

পালা সাঙ্গ করিয়া রাখালীর মা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলে, রাখালী পা টিপিয়া টিপিয়া নীলমণির কাছে আসিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "আমি আর কখনও এমন কায করবো না নীপুদা, তুমি চুপ কর— তোমার পায়ে পড়ি।"

রান্নাঘর হইতে রাখালীর মা বলিয়া উঠিল, "রাখালী!" সে কোন উত্তর দিল না। রাখালীর মা আবার ডাক দিল, "রাখালী।" খুব বিরক্তভাবে রাখালী উত্তর দিল, "কি ?"

"ওখান থেকে এখুনি চলে আয় বলছি।"

সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি কক্ষণো যাব না, বেশ করব এখানে থাকব, খুব করব এখানে থাকব।"

২

সে আজ তের চৌদ্দ বৎসর আগেকার কথা। গোকুলদাসের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যশোদা তখন বাঁচিয়া আছে। ওপাড়ার হরিশমণ্ডল আসিয়া একদিন একটি দুই বছরের কচি ছেলে গোকুলদাসের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "তোমার ত ছেলেপুলে হল না ভাই, তা এটিকে যদি মানুষ কর।"

গোকুল বলিল, "কাদের ছেলে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই—হঠাৎ—"

বাধা দিয়া হরিশ বলিল, "সে সব না জেনে কি আর আমি এনেছি গোকুলদা ? ও আমাদেরি স্বজাত, এমন কি ওর মার সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতে পর্য্যন্ত আছে।"

যশোদা ছিল বন্ধ্যা—সেও খুব ঝুঁকিয়া পড়িল, কাযেই ছেলেটিকে গোকুলদাস বাড়ীতেই রাখিয়া দিল।

হরিশ চলিয়া যাইতেছিল, পিছু ডাকিয়া গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "ওর বাপ-মায়া পরে গোলমাল করবে না ত ?"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কেন না ওর বাপ মা কেউই বেঁচে নেই—"

হরিশ মণ্ডল চলিয়া যাইতে গোকুল ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "আহা, অনাথ ছেলে!"

তার পর যশোদার নীলমণি, "যশোদার নীলমণি"র মত করিয়াই আদরে আদরে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সে সুখ অনাথ বালকের কপালে বেশী দিন সহিল না। নীলমণি যখন পাঁচ বছরের সেই সময় হঠাৎ একদিন তিনদিনের জ্বরে যশোদার মৃত্যু হয় ; তাহার একবৎসর পরে যশোদার এক মাসতুতো বোনকে গোকুলদাস হঠাৎ একদিন বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়া তোলে এবং আরও দুই বৎসর পরে রাখালীর জন্ম হয় ; ইহাই নীলমণির ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

গোকুলদাস সেদিন সকালে উঠিয়া হাটের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় পথে ননী মাষ্টারের সঙ্গে দেখা। গোকুলদাস পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতে সে বলিল, "ওহে গোকুল, কাঁদিয়া কোথা

তোমাকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি—তা আর হয়ে ওঠেনি।"

হাত যোড় করিয়া গোকুল বলিল, "আজ্ঞে করুন মাষ্টার মশাই।"

"বলছিলাম কি, নীলমণিকে এখানে আর না রেখে, কলকাতায় পাঠালে আমার মনে হয় খুব ভাল হয়। ওর পড়াশুনোর ধার যে রকম, তাতে মনে হয় ও পরে একটা মানুষ হবে।"

"অত পয়সা কোথা থেকে—"

কথাটা সমাপ্ত হইতে না দিয়া ননী মাষ্টার বলিল, "সেও একটা কথা বটে।" তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, জমিদার বাবুকে বলে' কিছু করতে পারি কি না দেখি।"

গোকুলদাস সেদিন আর হাটে গেল না, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে ডাকিল, "নীলু!"

পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া নীলমণি তাহার সমুখে দাঁড়াইল। রাখালী অদূরে একটা বিড়াল ছানার ল্যাজের সঙ্গে একটু রসিকতা করিতেছিল; সেও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। গোকুল বলিল, "তুই খেলা করগে যা না রাখালী।"

সে বলিল, "না যাব না।"

আজ কয়দিন হইতে রাখালী এই একটা জিনিষ ক্রমাগত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে, তার বাপ যখন তখন চুপিচুপি নীলমণির সঙ্গে কি সব কথাবার্তা কহেন। এটা তার মোটেই ভাল লাগিত না এবং ইহাতে কেমন একটা ভয়ও তাহার হইত।

গোকুলদাস আবার বলিল, "যা না রাখালী!"

"আমি থাকি না বাবা।"—কথাটা রাখালী এমন কাতরভাবে বলিল যে গোকুলদাস আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। সে মনে মনে ভাবিল, সেই ত একদিন শুনবেই, তার চেয়ে আগে থাকতেই শুনে রাখুক। তার পর গোকুলদাস ননী মাষ্টার যে সব কথা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার কাছে বলিয়াছিল, সে সমুদয়ই নীলমণিকে বলিল। নীলমণি চুপ করিয়া রহিল।

গোকুলদাস বলিল, "কি করবি বল্।" সে তবুও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখালী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ ভাঙ্গা গলায় কাঁপা সুরে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কক্ষণো ঝগড়া করব না, নীলুদা তুমি কোথাও যেও না তোমার পায়ে পড়ি।"

গোকুল রাখালীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল—নীলমণির চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল।

৩

তার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রাখালীর মার মৃত্যু হইয়াছে, গোকুলদাসও আর ইহজগতে নাই। নীলমণি এখন কলিকাতায় থাকিয়া ওকালতি করিতেছে।

সেদিন রবিবার। বেলা তখন প্রায় বারোটা হইবে; জানালা দিয়া শীতকালের মিহি রৌদ্রটুকু ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। নীলমণি সেইখানটিতে বসিয়া একখানা খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছিল। এমন সময় রাখালী আসিয়া ডাকিল, "ভাত যে জুড়িয়ে গেল।"

"এই যাই" বলিয়া খবরের কাগজের উপর হইতে চোখ দুইটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি রাখালীর মুখের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এবং খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তাই ত, তুই যে খুব বড় হয়েছিস রাখালী!"

একটু হাসিয়া রাখালী উত্তর দিল, "চিরকালই বুঝি কচি খুকিটি থাকব?"

"তোর বয়স কত হল?"

হিসাব করিয়া রাখালী বলিল, "এই ফাগুনে পনের পড়বে।"

"বলিস কিরে! না, আর চুপ করে বসে থাকা চলে না দেখছি, একটা ঘটক টটকও যে ছাই পাই নে!"

"কেন, ঘটক কি করবে ?" বলিয়া বিরক্তভাবে রাখালী নীলমণির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

"কি করবে কি বল,—পাত্রের সন্ধান করবে।"

"কেন আমার ত—" কথাটাকে শেষ না করিয়াই রাখালী বলিল, "ভাত জুড়িয়ে গেল যে !"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া নীলমণি দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল রাখালী সেখানে নাই—সে কখন চলিয়া গিয়াছে।

ভাত খাইতে বসিয়া নীলমণি দেখিল, রাখালী প্রতিদিনকার মত সেখানে বসিয়া নাই। বুড়ো ঝি কলের ধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, নীলমণি বলিল, "রাখালী কোথায় গেল জান ঝি ?"

সে বলিল, "দিদিমণি ত ঘরে শুয়ে আছেন।"

"এমন অবেলায় ?"

"মাথাটা নাকি বড্ড ধরেছে।"

ভাত খাইয়া উঠিয়া, নিজের ঘরে আসিয়া নীলমণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাখালী তাহার উপর রাগ করিয়াছে এবং সে রাগের কারণটা যে কি তাহা বুঝিতে নীলমণির বেশী দেরি হইল না।

মরিবার সময় গোকুল দাস নীলমণিকে বলিয়া যায়, সে যেন রাখালীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হয় ; রাখালীকে অন্যের হাতে দিবার কথা পাড়িয়া সে যে আজ খুবই অন্যায় করিয়াছে. সেটা সে নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে যে বিবাহই করিবে না ঠিক করিয়াছে। যদি সে রাখালীকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিত, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ছিল ; কিন্তু সে ত আর তা করিতেছে না !

রাখালীর শুইবার ঘরে ঢুকিয়া নীলমণি ডাকিল, "রাখালী !"

রাখালী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। সে কোন উত্তর দিল না।

নীলমণি আবার ডাকিল, "রাখালী।"

সেইভাবে থাকিয়া সে উত্তর দিল, "কি ?"

"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ ?"

সে বিরক্তভাবে উত্তর দিল, "যাও মিছে বিরক্ত করতে এস না—আমার মাথা ধরেছে—ঘুমোতে দাও।"

নীলমণি আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

পরদিন নীলমণির ভাত খাইবার সময় রাখালী আসিল না ; আদালতে যাইবার সময় নীলমণি অনেক সাধ্যসাধনা করিল, সে কিন্তু উঠিল না—এবং কেন যে রাগ করিয়াছে তাহাও বলিল না।

কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণি রাখালীর ঘরে ঢুকিয়া দেখে রাখালী সেখানে নাই ; ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বুড়ো ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাখালী কোথায় জান ঝি ?"

"দিদিমণি ত এখানে নেই।"

"সে কি !"

"কেন, তিনি ত আজ তিনটের গাড়ীতে দেশে চলে গেছেন।"

"দেশে ?—মহেশপুরে ?—কার সঙ্গে ?

"রামহরির সঙ্গে।"

নিজের ঘরে আসিয়া, জামা কাপড় না ছাড়িয়াই নীলমণি তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল।

৪

গোকুলদাস ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর নীলমণি সেই যে রাখালীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল, তার পর আর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। সেই হইতেই রাখালীর দূর সম্পর্কীয়া এক মাসী তার বিধবা কন্যাকে লইয়া গোকুলদাসের ভদ্রাসনখানিতে বাস করিয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরি নাই। রাখালীর মাসী তুলসী তলায় বসিয়া মালা ফিরাইতেছিল, এমন সময় অন্ধকারে রাখালী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া রাখালীর মাসী বলিল, "কে গা বাছা তুমি ?"

"আমি রাখালী"—বলিয়া রাখালী সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"রাখালী? বলা কওয়া নেই হঠাৎ যে—নীলমণি ভাল আছে ত?"

"এই তোমাদের দেখতে এলাম।"

"তবু ভাল, মাসীকে যে ভুলেও মনে পড়েছে এই না আমাদের ভাগ্যি"—কথাটাকে শেষ করিয়াই মাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বিন্দি, কে এসেছে দেখে যা!"

বিন্দু রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই মাসী বলিল, "কে, বল্ দেখি?"

সে বলিল, "কে ত চিনতে পারছি নে।"

"চিনতে পারছিস নে? ও যে আমাদের রাখালী! আহা, দিদি যদি আজ"—মাসী কাপড়ের খুঁটটা শুকনো চোখের উপর বারবার ঘষিতে সুরু করিয়া দিল।

"আমি তোমাকে সেই একরত্তিটি দেখেছিলাম, তার পর ত আর দেখিনি"—বলিয়া বিন্দু রাখালীর কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল।

মাসী আবার আরম্ভ করিল, "আহা, দিদি আমাকে কত ভালই বাসতো—মার পেটের বোনও এত করে না।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "এমন মানুষও যায় গা! তাও কি বুড়ো হাবড়া হয়েছিল? সবই ভগবানের খেলা! তা না হলে—" কথাটাকে শেষ না করিয়াই সে বলিল, "তা, তুই কার সঙ্গে এলি? তোর নীলুদা সঙ্গে করে এনেছে বুঝি?"

"না, আমি রামহরি দাদার সঙ্গে এসেছি।" কথাটা রাখালী এতই নীরস ভাবে বলিল যে, অন্য কেহ হইলে তার পর আর সে সম্বন্ধে কোন কথা তুলিত না। মাসী কিন্তু তবু বলিল, "কেন সে কি নিজে আসতে পারতো না? এতই কাযের লোক হয়েছে সে?"

রাখালী কোনও উত্তর দিল না, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মাসী আবার আরম্ভ করিল, "একেই বলে নেমখারাম রে, একেই বলে নেমখারাম। যার খেয়ে মানুষ—"

কথাটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না দিয়া বিন্দু বলিল, "তোমার সে কথায় কায কি মা? জান না শোন না, ফস করে একজনের নামে যা-তা বলাটা বড় দোষ।"

সে তখন রাখালীর একটা হাত ধরিয়া বলিল, "এস বোন, আমার সঙ্গে এস।"

৫

বিন্দুবাসিনীর জীবনটা নিতান্তই একঘেয়ে ধরণের ছিল। তার যখন আট বছর বয়স সেই সময় এক পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় এবং দশ বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটে এবং সেই হইতে সে এমনি কঠোর ভাবে নিজেকে বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সুরু করিয়াছিল যে, পাড়ার কেহই জানিতে পারিত না সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে। তার পর ক্রমে সে পঁচিশে পা দিয়েছে, কিন্তু এখনও সে ঠিক তেমনটিই আছে—একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তার মা ছিল কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। সে সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিত। মুখটা কিন্তু তার ভারি মিষ্ট ছিল।

রান্নাঘরে গিয়া প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে রাখালীর মুখের দিকে চাহিয়া বিন্দু চমকিয়া গেল,—তার চোখ দুইটা একেবারে জবাফুলের মত লাল হইয়া রহিয়াছে।

একটা পিঁড়ি সরাইয়া দিয়া বিন্দু বলিল, "বোস বোন।"

অনেকক্ষণ দুই জনে চুপ করিয়া রহিল, কাহারও মুখে কথা নাই; কিছুক্ষণ পরে বিন্দু বলিল, "এখানে ক'দিন থাকবে তুমি?"

অন্যমনস্কভাবে রাখালী উত্তর দিল, "ঠিক বলতে পারি নে।" বিন্দু চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া রাখালী আপনার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গীর উপর একরাশ ছেঁড়া বই এবং খাতা জড় করা ছিল, সে সেইগুলিকে নামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল। এসব নীলমণির ছেলেবেলাকার বই। রাখালী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেগুলিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তার পর হঠাৎ কি মনে করিয়া সেগুলিকে একজায়গায় জড় করিয়া ঘরের জানালা দিয়া পাশের পোড়ো জমিতে ফেলিয়া দিল এবং আস্তে আস্তে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিকালে বিন্দু আসিয়া দরজায় ঘা দিতে রাখালী দরজা খুলিয়া দিল; বিন্দু বলিল, "আয়, চুলটা বেঁধে দিই।"

"না, আজ আর চুল বাঁধবো না," বলিয়া রাখালী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু তাহার হাতটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা না হয় চুল নাই বাঁধলি, তা বলে' ঘরের ভিতর আসতে ত কোন দোষ নেই।" বলিয়া সে রাখালীকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

"আমি তোর দিদি হই, আমার কাছে কোন কথা লুকোস নে—তোর কি হয়েছে বল।"

রাখালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"বলবি নে" বলিয়া বিন্দু রাখালীর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। রাখালী ছোট মেয়ের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কেন কে জানে, রাখালীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত বিন্দু তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তাহার একঘেয়ে জীবনটার মাঝখানে হঠাৎ সে যেন একটা বৈচিত্র্যের সুখস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেটা কোন্ দিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহার আশঙ্কায় সে মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠে।

পরদিন প্রাতঃকালে বিন্দু এবং রাখালী রান্নাঘরে কুটনা কুটিতেছিল, এমন সময় বিন্দুর-মা আসিয়া সেইখানে বসিল এবং হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তা হ্যাঁরে রাখালী, তুই কি মনে করিছেস্ চিরকাল এইভাবেই থাকবি, বিয়ে থা বুঝি আর করতে হবে না? আচ্ছা পাগলী মেয়ে ত!"

বিন্দু বলিল, "সে ও নিজে বুঝবে মা।"

"ঐ ত হয়েছে একালের মেয়েদের দোষ। নিজেরাই হয়েছেন সব কর্ত্তা, গুরুজনদের কথা তো আর শুনবেন না; তা যাক্, এখন একটা কথা শোন দিকি বিন্দি, ও-পাড়ার রাধেশকে চিনিস ত?"

"কে রাধেশ, সেই ঘাড়ছাঁটা ছোঁড়াটা?"

"তোর যেমন কথার ছিরি!" বিন্দুর মা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "তা, আসল কথাটা কি তাই খুলে বল না"।

"বলছিলাম কি, ছোঁড়ার বিষয় আশয় বেশ আছে"—বলিয়া বিন্দুর মা কটাক্ষে একবার রাখালীর মুখের পানে চাহিয়া লইল। তারপর আবার আরম্ভ করিল, "দেখতে শুনতেও বেশ, আর তা ছাড়া—"

বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি মা?"

"না, আমাদের আর কি! তবে বলছিলাম কি, রাখালীর সঙ্গে তার—"

"চুপ কর মা—ও কথা তুমি আর কখনো মুখে এনো না বলছি। তোমার কি একটু আক্কেলও নেই!"

বিন্দুর-মা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কেন বল্ ত, ও বুড়োহাতি মেয়েকে সে যে নিজে থেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এই না ওর ভাগ্যি! পাড়ার লোকে কি বলে জানিস?—বলে ও মেয়ে—"

গলার স্বরটাকে যতদূর সম্ভব কড়া করিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "পাড়ার লোকের কথা শোনবার জন্তে আমরা বসে নেই মা। অন্য কথা থাকে ত বল, আর নইলে এখান থেকে উঠে যাও।"

সুরটাকে একটু নামাইয়া লইয়া বিন্দুর-মা আবার

আরম্ভ করিল, "আহা, পাড়ার লোকে বলে বলেই কি আর আমরা তাই বিশ্বাস করছি? না আমরা রাখালীকে চিনিনে? সতীসাধ্বীর মেয়ে ও, ওর নামে কুচ্ছো যারা রটাবে তাদের জিভ্ খসে' পড়বে; তবে কি না বলছিলাম, রাধেশ ছেলেটি—"

"রাধেশের নাম তুমি মুখে এনো না মা—সে একটা অতি হাড়হাবাতে ছোঁড়া।"

"তোর ঐ কেমন এক কথা বিন্দি—সে হাড়হাবাতে কিনা তুই কি করে জানলি?"

"সে আমি খুব জানি মা—হাড়ে হাড়ে জানি। সে দিন সন্ধ্যের সময় ঘাট থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, সে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সব কথা বলতে লাগলো, ছি ছি ছি!" বলিয়া বিন্দু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

"ওটা কিছু নয়, বয়সের সময় অমন দোষ পুরুষ মানুষের একটু না একটু থাকেই। অত কথায় কায কি, তোর বাপের:—"

"তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি এখান থেকে উঠে যাও।" বলিয়া বিন্দু নিজেই ঘর হইতে চলিয়া গেল।

৬

কাছারী হইতে ফিরিয়া নীলমণি নিজের ঘরের জানালার ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে চলিল রাখালী চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু ইহার মধ্যে সে তাহাকে একখানিও পত্র দেয় নাই এবং সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, আগে সে কখনই পত্র লিখিবে না। আজ কিন্তু তাহার মনটা হঠাৎ কেমন হইয়া গিয়াছে।

সমুখের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিরিবিলিতে পুঁতুল খেলিতেছিল। নীলমণি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তার পর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাগজ কলম লইয়া রাখালীকে পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল, "তুমি চলে' এস, আমার উপর রাগ করে থাকতে আছে?"

লিখিতে লিখিতে নীলমণির চোখ দুইটা জলে একবারে ভরিয়া আসিতে লাগিল; ছেলেবেলাকার সেই অভিমানিনী রাখালীর মুখখানি আজ তার মনের মধ্যে বারবার করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল।

সমুখের বাড়ীর সেই ছেলেটি আর মেয়েটি তখন পর্য্যন্ত খেলা করিতেছিল। নীলমণির মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাহাদের দুইজনকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে।

নীলমণি যে বিবাহ করিবে না স্থির করিয়াছিল, রাখালীই ছিল তার মূল কারণ। গোকুলদাসের কথা যে তাহার মনে ছিল না তাহা নয়; কিন্তু রাখালীকে স্ত্রীভাবে দেখিতে তাহার মন কোন দিন রাজি হয় নাই। তাহার বুকের মাঝখানে স্ত্রীর জন্য যে অংশটুকু যৌবন নিজের হাতে খালি করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে সে রাখালীকে তার ত্রিসীমার মধ্যে এক দিনের তরেও আনিতে পারে নাই। কাযেই সে ঠিক করিয়াছিল, জীবনে কখনও সে বিবাহ করিবে না; এবং কোন একজন বিলাত ফেরত বা ঐ রকম একটি সুপাত্র দেখিয়া তারই হাতে রাখালীকে দিয়া সে নিজে নিশ্চিন্ত হইবে, এমনিটাই সে বরাবর মনে করিয়া আসিয়াছিল। সেদিনকার সেই ঘটনাতে সে কিন্তু রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। রাখালী যে চুপে চুপে ভিতরে ভিতরে তাহাকে স্বামীর আসনে নিশ্চিন্তভাবে বসাইয়া দিয়াছে, এমন একটুও আভাস ত সে তার ব্যবহারের মধ্যে বা কথাবার্ত্তার মধ্যে পূর্ব্বে একদিনের তরেও টের পায় নাই।

নীলমণি চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এখন তার কি করা কর্ত্তব্য।

৭

পুকুরঘাট হইতে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া রাখালী দেখে, তার নামের একখানা চিঠি দাওয়ার

উপর পড়িয়া রহিয়াছে; সে সেখানা তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর গিয়া খিল আঁটিয়া দিল। তারপর সে যখন ঘর হইতে বাহিরে আসিল, তখন তার চোখ দুইটা একবারে জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বরাবর ভাঁড়ার ঘরে গিয়া একটা বঁটি লইয়া আলু ছাড়াইতে বসিয়া গেল।

রান্নাঘর হইতে বিন্দু ডাকিল, "রাখালী।" চাপা গলায় সে উত্তর দিল, "কি!"

"ওখানে একলাটি না বসে, এইখানে আমার কাছে এসে কুটনো কোট্ না বোন্।"

রাখালী বঁটি এবং আলুর চুবড়ি লইয়া রান্নাঘরে গিয়া বসিল।

রাখালীর মুখের দিকে চাহিয়া বিন্দু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল একটা কিছু হইয়াছে। তাহার নামে যে একটা চিঠি আসিয়াছে সে খবরও বিন্দু জানিত এবং তার চোখ দুটা হঠাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিবার কারণও যে ঐ চিঠিরই মধ্যেই আছে, এ কথাও সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথাই সে তুলিল না।

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে দাওয়ায় বসিয়া রাখালী বিন্দুর একখানা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিল; এমন সময় হঠাৎ কার জুতার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সমুখে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

যে লোকটি তাদের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দরজার আড়াল হইতে তার চেহারাখানা দেখিয়া সেই দুঃখের সময়ও রাখালীর হাসি পাইতে লাগিল। লোকটির বয়স বেশি নয়—ত্রিশের ভিতর; রংটা মেটে মেটে, মাথার সমুখ দিকে লম্বা লম্বা চুলগুলা চোখ অবধি আসিয়া পড়িয়াছে, পিছন দিক কিন্তু একবারে খুর দিয়া কামানো। গায়ে কালো রঙের একটা পাঞ্জাবী—স্ত্রীলোকের সেমিজের মত হাঁটু ছাড়াইয়াও আধহাতটাক ঝুলিয়া রহিয়াছে। পায়ে বার্ণিস করা অয়েলক্লথের একযোড়া পম্‌সু, তাতে আবার সোণালী রঙের বগলস আঁটা; হাতে একগাছা মহিষের শিঙের ছড়ি, তার ধরিবার জায়গাটাতে একগাছা বেলফুলের মালা জড়ানো। লোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া ডাক দিল, "মাসী আছ?"

"এই যাই গো" বলিয়া রান্নাঘর হইতে মাসী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "কি খবর বাবা?"

"কাল বারোয়ারী তলায় যাত্রা হবে—বিদ্যেসুন্দরের পালা। আমি সুন্দর সাজছি—দেখতে যেও মাসী।"

"যাবো বৈকি বাবা।"

"যাবো বৈকি নয়, নিশ্চই যাওয়া চাই—আর মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে যেও।"

লোকটা চলিয়া যাইতে বিন্দুর মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখে বিন্দু মুখখানা হাঁড়ির মত ভারি করিয়া একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। সে ঘরে ঢুকিতেই বিন্দু খুব কঠোর ও দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "রাধেশ কার হুকুমে আমাদের বাড়ীর ভিতর অমন করে বলা কওয়া নেই ঢোকে মা?"

"ও যে আমাদের আপনার জন রে"—বলিয়া বিন্দুর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু বাধা দিয়া বলিল, "একটা কথা শুনে যাও মা।"

"কি বল্ না।"

"ও যদি ফের আমাদের বাড়ীর ভিতর অমন করে ঢোকে ত আমি তা সহ্য করবো না বলছি।"

"আচ্ছা তাই হবে লো" বলিয়া সে আবার পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, বিন্দু আবার বাধা দিয়ে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা লো নয় মা; বিন্দু বেশি কথা বলে না, কিন্তু সে যে কথা একবার মুখ দিয়ে খসায়, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে, এটা যেন মনে থাকে।"

৮

নীলমণির চিঠির জবাবে রাখালী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা পড়িয়া নীলমণি স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে লিখিয়াছে,

আর যেন সে তাহাকে পত্র না লেখে এবং ভবিষ্যতে সে যেন তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের দাবি না করে। পত্রখানা পড়িয়া নীলমণি এবার সত্য সত্যই বড় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া আবার পত্র লিখিতে বসিল। রাখালী কিন্তু তার কোন জবাবই দিল না। নীলমণি আবার একখানা পত্র লিখিল। সে লিখিল—"এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এ রকম করে রাগ করে থাকা কি উচিত,—লক্ষ্মীটি ফিরে এস।" এবারও রাখালী কোন জবাব দিল না।

নীলমণির শেষ পত্রখানা যখন রাখালীর হাতে পড়িল, সে তখন খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘরের ভিতর মাদুরের উপর পড়িয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। বিন্দু আসিয়া তাহার হাতে চিঠিখানা দিয়া চলিয়া গেল। চিঠিখানা সে তিন চারিবার করিয়া শেষ করিল। শেষ কালে কি ভাবিয়া, দোয়াত কলম এবং কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল। দুই চারি ছত্র লিখিয়াই সে কি ভাবিয়া কাগজখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানলা দিয়া ফেলিয়া দিল এবং দোয়াত ও কলমটা কুলুঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিয়া, আবার মাদুরের উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল।

রাখালী মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, নীলমণি নিশ্চয়ই তাহাকে স্ত্রীর আসনে বসাইবার উপযুক্ত মনে করে নাই এবং সেই জন্যই অন্য লোকের স্কন্ধে তাহাকে চাপাইয়া দিয়া সে নিজে রেহাই পাইতে চায়। আজ অবশ্য সে ক্ষমা চাহিতেছে, কিন্তু তিরস্কারের ভয়ে ত আর মানুষের ভিতরটা কিছু বদলাইয়া যায় না। আজ যে নীলমণি তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য এত অনুনয় বিনয় করিতেছে, ইহার মধ্যে আছে শুধু কর্ত্তব্যের শুষ্ক তাগিদ, প্রাণেরও নয়—বুকেরও নয়। সে একদিন তাহার বাপের কাছে অনেক উপকার পাইয়াছে, ইহারই জন্য মানুষ মানুষকে যেটুকু খাতির করিয়া চলে, তার চেয়ে এক চুলও বেশী দরদ ত ইহার মধ্যে নাই! নীলমণি লিখিয়াছে, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত দিন ধরে রাগ করে থাকাটা কি উচিত?" নীলমণি যে এই ঘটনাটীকে এত সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিয়াছে, ইহার অসোয়াস্তিটাই রাখালীর বুকের ভিতর বিষফোড়ার মত টন্ টন্ করিয়া উঠিতে লাগিল।

৯

এই ঘটনার চারি পাঁচদিন পরে একদিন সকালে পুকুর হইতে স্নান করিয়া রাখালী ভিজাকাপড়ে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় পথের মাঝখানে রাধেশ তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কতকগুলি রসিকতা করিতে লাগিল। সে বাড়ী ফিরিয়া, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না, এবং ইহার জন্য সে নীলমণিকেই শত সহস্রবার স্মরিয়া অভিশাপ দিতে লাগিল।

সেই দিনই বিকালের দিকে বিন্দু ও রাখালী দাওয়ায় বসিয়া তেঁতুল ছাড়াইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "রাখালী"।

বিন্দুর মা গোয়াল ঘরে দুধ দুহিতেছিল, বাহিরে আসিয়া সাড়া দিল—"কে গা?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল—"আমি নীলমণি"।

"কে, আমাদের নীলু?—তা বাইরে কেন বাবা, ভিতরে এস, ঘরের ছেলে তোমরা"—বলিয়া বিন্দুর মা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

বিন্দুর মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, "রাখালী কোথায় মাসী?"

"সে ত এইমাত্র এইখানেই ছিল"—বলিয়া সুর টানিয়া বিন্দুর মা হাঁকিয়া উঠিল, "ওলো অ—রাখালী, তোর নীলুদা এসেছে যে—বেরিয়ে আয় না লো।"

ভিতর হইতে কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বিন্দুর মা তখন ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সে দেখা করতে চাইছে না বাপু, আমি কি করবো বল।"

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি বলিল, "তাকে বলুন একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে"—তার পর কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "না থাক্‌গে—কায নেই"।

নীলমণি চলিয়া যাইতে বিন্দু বলিল, "এটা কিন্তু তোর খুবই অন্যায় হয়েছে রাখালী।"

রাখালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল, চাপা গলায় রাখালী বলিল, "আমাকে কোন কথা বোলো না দিদি; দোহাই তোমাদের।"

১০

তার পর আরও একমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ ক'দিন নীলমণির শরীরটা বড় ভাল যাইতেছিল না। প্রত্যহ রাত্রে তার একটু একটু ঘুসঘুসে জ্বর হইতেছিল। সেদিন রবিবার, আদালত বন্ধ—সে খাওয়া দাওয়া সারিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একটা পোষ্টকার্ড তার হাতে দিয়া গেল। পোষ্টকার্ড আসিতেছে মহেশপুর হইতে, লিখিয়াছেন হরিশ ভট্টাচার্য্য। নীলমণি পত্রখানা একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল—"পত্রপাঠ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিবে, বিশেষ দরকার আছে।"—বাস্ এইটুকু পত্র। নীলমণি দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। হরিশ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তার কি এমন দরকার থাকিতে পারে?—তবে কি রাখালীর কোন—নীলমণির মাথাটা ঘুরিতে লাগিল; ছেলেবেলাকার সেই দুরন্ত রাখালী তার চোখের সম্মুখে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিন্দুর মা সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের গা হইতে শুষ্ক ঘুঁটেগুলাকে খসাইয়া খসাইয়া একটা চুবড়ির মধ্যে জড় করিয়াছিল, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে নীলমণি আসিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিলে, "বাড়ীর সব খবর ভালো ত মাসী?"

তিন চারি হাত তফাতে সরিয়া গিয়া বিন্দুর মা বলিল, "তুমি বাপু আমাদের এখানে আর এস না, একদফা ত জাতজন্ম সব খেয়েছ—তার উপর"—

কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই বিন্দু কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি চুপ কর মা, তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না।" তার সে সময়কার চেহারা দেখিয়া বিন্দুর মা চমকিয়া উঠিল; তার এই লাজুক মেয়েটি, যে নাকি কখন অন্য পুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখিত না, সে আজ হঠাৎ এমন নির্লজ্জ ভাবে একজন অপরিচিত যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে কথা কহিতে পারে এটা তার কাছে আজ ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল।

তার মার দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া বিন্দু বলিল, "রাখালী ভাল আছে নীলমণি; তুমি তাকে মাফ্ কর।" তার স্বর কম্পিত এবং খুব গাঢ়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীলমণি বলিল, "আমি তবে এখন আসি।"

"না যেতে পারবে না, কক্ষণো না,—তা হলে রাখালী আপশোষে মরে যাবে।"

"কেন, তার কি কোন—"

বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "না না অসুখ করেনি—সে বেশ ভালই আছে—তবু তুমি যেতে পারবে না।"

নীলমণি কিছুই বুঝিতে পারিল না—সে হতভম্বের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—চারিদিক নিস্তব্ধ—কাহারও মুখে কথা নাই—তিনজনেই নিস্তব্ধ। এই সময় সহসা পিছন দিক হইতে আসিয়া কে একজন খুব কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম—মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার জন্যে নয়!"

নীলমণি কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "সে জন্যে অন্য কাউকে মাথা ঘামাতে আমরা ডাকি নি—আপনি এখান থেকে চলে যান্।"

হরিশ ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া গেল—সে আজ সত্য সত্যই ভয় পাইল। মেয়েমানুষের গলার আওয়াজে যে এতটা তেজ থাকিতে পারে, ভট্টাচার্য্য তা কখনও

স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে তবু চেঁচাইয়া উঠিল, "একটা জারজের সঙ্গে গেরস্থ ঘরের মেয়েরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কথা কয়, এটা খুব পৌরুষের কথা, নয়? তাই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করা হচ্ছে!"

বিন্দুর মা এই সময় কি বলিতে যাইতেছিল, বিন্দু দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তুমি চুপ কর মা। সে তবু কি বলতে যাইতেছিল; বিন্দু চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার হুকুম তুমি চুপ কর।" তার পর খুব গম্ভীর এবং দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "পারেন ত একঘরে করে দিন গে, যান হরিশকাকা, এর বেশী ত আর কিছু করতে পারেন না।"

নীলমণি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে এইবার বলিল, "কি হয়েছে তাই খুলে বলুন না কেন মশাই।"

হরিশ ভট্টাচার্য্য কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "কাউকে কোন কথা বলতে হবে না, আমি নিজেই সব বলছি।" তার পর গলাটাকে আরও গম্ভীর এবং আরও দৃঢ় করিয়া লইয়া সে বলিতে লাগিল, "তবে শোন নীলমণি। কেমী বেশ্যাকে মনে পড়ে? সেই ছিল তোমার মা। এতদিন এ কথা কেউ জানত না—সেদিন মরবার সময় সে বিকারের ঝোঁকে সব কথা বলে ফেলেছে।" এই অবধি বলিয়াই বিন্দু ডাকিল —"রাখালী।"

নীলমণি রাস্তার উপর বসিয়া পড়িল। ঝড়ের মত রাখালী আসিয়া তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাকে মাপ কর নীলুদা—এমন কায আর কক্ষণো করবো না; আমায় তোমার কাছে কলকাতায় নিয়ে চল। তুমি অমন করে বসে থেকো না নীলুদা, তোমার পায়ে পড়ি।"

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাজ সংস্থানকে বিধির বিধান মনে করি বলিয়াই হউক, কিংবা পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস করি বলিয়াই হউক, আমাদের একটা ধারণা আছে যে, যে ব্যক্তি ধন যশঃ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অধিকারী হয়, সে তাহা সুকৃতের ফলেই লাভ করিয়া থাকে। এ কথা যদি একেবারেই ভিত্তিহীন না হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে কালীপ্রসন্ন প্রভৃত ক্ষমতাশালী এবং ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। সাধারণ কেরাণীগিরিতে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি যে ক্রমে উচ্চপদ, রাজকীয় এবং লৌকিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র বরেণ্য ও যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে শুধুই ফক্কিকারী নহে,—ইহার মূলে নিশ্চয়ই কৃতিত্ব রহিয়াছে।

তাঁহার অন্যবিধ ক্ষমতা যাহাই হউক না কেন, সে দিকে আমরা দৃষ্টি দিতেছি না; এমন কি তাঁহার যে বাগ্মিতার এত সুখ্যাতি ছিল, তাহার সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। বাগ্মিতা জিনিষটাই কতকটা জলবুদ্বুদের মত—ইহার সাময়িক উপযোগিতা যতই হউক না কেন, ইহাকে স্থায়ী কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ডিমোস্থেনিস, সিকিরো, গ্লাডষ্টোন্ প্রভৃতির সে সুযোগ হইয়াছিল; তাঁহাদের হাতে এক

একটা ব্যবস্থাপক সভা ছিল, বাগ্মিতার বশীকরণ শক্তিতে সে সকল ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাদের অনুসরণ করিত এবং একটি সাম্রাজ্যের শক্তি তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইত। কিন্তু কালীপ্রসন্নের সে সুযোগ হয় নাই। তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ কিছু করিবার শক্তি বা সুবিধা ছিল না, কিংবা তাঁহাদের সেরূপ ইচ্ছাই হয় নাই।

অনেকে বাগ্মিতার গুণে একটা বিশিষ্ট মতের প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়ান, এবং লোকের মনে একটা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা অনেকেই এই শ্রেণীর বক্তা। কিন্তু এথেন্সে সেন্ট পল কিম্বা কলিকাতায় কেশব সেন এবং বাঙ্গালা দেশে সুরেন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, ঢাকায় কালীপ্রসন্ন তাহা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার শক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা হইতেছে না. শুধু সুযোগের এবং উপাদানের যে অভাব ছিল, তাহাই সূচিত হইতেছে।

তাঁহার বক্তৃতার জলদগম্ভীর নিস্বন এখনও আমাদের কাণে বাজিতেছে। কাযেই আমরা ইহার মূল্য সম্যক্ বিচার করিতে পারি কি না সন্দেহ। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পরে যদি কেহ বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে বসেন, তবে এই যুগে যে সকল উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনটাতেই কালীপ্রসন্নের বাগ্মিতার চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না।

সুতরাং তাঁহার যে যশঃ এবং প্রতিপত্তি এখনও রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, সে তাঁহার বাগ্মিতার জন্য নহে। তাঁহার সে শক্তি ছিল, কিন্তু কোন একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে তাহা প্রয়োজিত হয় নাই। তাঁহার হয়ত তেমন সুযোগও ছিল না;—যে জন্যই হউক, তাঁহার সে শক্তি কার্য্যকরী হয় নাই। এবং শুনিবার সময় তাঁহার বক্তৃতা আমাদিগকে, যতই মোহিত করিয়া থাকুক না কেন, সে জন্য তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

বিধির লিখনে কালীপ্রসন্নের স্থায়ী আসন পড়িয়াছে সাহিত্যিকদের মজলিসে। আমাদের পরবর্ত্তীরা যখন কালীপ্রসন্নকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত স্মরণ করিবে, তখন সেটা ভাওয়াল রাজের ম্যানেজার হিসাবে নয়—সেটা তাঁহার সাময়িক বক্তৃতার জন্যও নয়—সাহিত্য সাধনাই তাঁহাকে বাঙ্গালীর নিকট বরণীয় করিয়া রাখিবে।

কালীপ্রসন্নের সাহিত্যচেষ্টায় তাঁহার চিত্তের যে একটী চিত্র আমরা দেখিতে পাই, সেইটাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কোথায় কোন্ ব্যক্তি সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল, কোথায় কে তাঁহাকে কি বলিয়াছে, কোথায় কবে তিনি কি একটী দান করিয়াছিলেন কিংবা করিতে স্বীকৃত হন নাই—তাহাতে তাঁহার সম্যক পরিচয় মিলিবে না। চারিত্রনীতির একটি গৃহীত পদ্ধতি এই যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে যাহা করে তাহা দ্বারাই তাহার চরিত্রের বিচার করিতে হইবে না, কেন না কায করা না করা অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; ঘটনাচক্রে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কায করিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক সে যাহা করিতে ইচ্ছা করে, সম্পূর্ণ হউক বা না হউক, তাহা দ্বারাই তাহার জীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

কালীপ্রসন্ন প্রকৃতপক্ষে কি কি কায করিয়াছিলেন তাহা জানিয়াই যে আমরা সম্যকরূপে তাঁহাকে চিনিতে পারিব, এমন নহে; সেভাবে বিচার করিতে গেলে তখনকার দিনের সামাজিক অবস্থা লোকমত প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তিনি কি ভাবিতেন, তিনি কি বিশ্বাস করিতেন, কিরূপ ছিল তাঁহার ইচ্ছা—সে সবের সোজা পরিচয় মিলিবে তাঁর লেখায়। ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন এবং বক্তা কালীপ্রসন্নের চেয়ে, আমরা লেখক কালীপ্রসন্নকেই বড় বলিয়া মনে করি, এবং লেখক কালীপ্রসন্নই প্রকৃত কালীপ্রসন্ন।

সাহিত্য সমালোচকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যের যে



স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সমস্ত শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন, তাহা ছাড়া বিশ্বের সাহিত্যের দিকে চাহিলে আমরা দুইটী প্রধান শ্রেণী দেখিতে পাই। এক প্রকার সাহিত্য আছে যাহা সাময়িক সমস্যা নিয়াই ব্যস্ত। সময়ে যাহা উৎপন্ন হয় সময়ে যাহা আবার লোপ পাইবে, অথচ চলিত সময়ে যাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে—এরূপ সব উত্তেজক সমস্যা লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি। এরূপ সাহিত্যের যে একটা মোহ আছে, একটা উত্তেজনা আছে, একটা হৃদয়-গ্রাহিতা এবং এবং হৃদয়গ্রাহিতা আছে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রশ্নটির সমাধান হইয়া গেলে—উত্তেজনার আগুন নিবিয়া গেলে পরেও—ইহার সে মোহ থাকিবে কি না সন্দেহ।

পর্য্যান্তরে বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাটবপু এই প্রকার উপাদান লইয়া নির্ম্মিত হয় নাই। মানুষের কতকগুলি সনাতন আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, কতকগুলি সুখ-

দুঃখের অনুভূতি আছে—সে সকলকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানুষের সমাজে গতি ও স্থিতি উভয়ই রহিয়াছে। যখন কোনও একটা বিশিষ্ট দিকে সমাজের গতি আরব্ধ হয়, যখন কোনও একটা বিপুল সমস্যায় সমাজের মন আলোড়িত হয়, তখন যে একটা নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় তাহাকে আশ্রয় করিয়াও এক প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য, ইউরোপের নব্যতন্ত্রের নাট্য সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি এই প্রকারের সাহিত্য।

কিন্তু যখন কোন প্রশ্নের আন্দোলনে সমাজ-মন বিক্ষুব্ধ নহে, তখনও যে একটা অনুভূতি যে একটা আনন্দ মানুষের মনে জাগিতে পারে, তাহার প্রকাশও সাহিত্যে হইয়া থাকে; সেটা সাময়িক সমস্যার নহে, সনাতন সত্যের প্রকাশ, ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতায়—বিশেষতঃ কবিদের অভিজ্ঞতায় যে একটা সার্ব্বজনীন সত্য থাকে, তাহার প্রকাশ।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর সাহিত্যিক। জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ লইয়া আমাদের সংসার; ইহার মধ্যে কত চিরন্তন অনুভূতি কত চিরন্তন প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা রহিয়াছে—কত আকাঙ্ক্ষা, কত প্রীতি, কত ভীতি ও ভক্তি রহিয়াছে—এ সকল লইয়াই কালীপ্রসন্নের সাহিত্য-চেষ্টা। কোন নূতন পথের প্রবর্ত্তন, নূতন প্রশ্নের উত্থাপন তিনি করেন নাই। সেক্সপীয়রও তাহা করেন নাই, সাহিত্যিক হিসাবে লর্ড বেকনও তাহা করেন নাই। সুতরাং কালীপ্রসন্নকে খাটো মনে করিবার কোন হেতু নাই।

যে সকল চিন্তা সর্ব্বদা আমাদের মনে জাগে, যে সব ভাব সর্ব্বদা আমাদের মনে উদিত হয়, তাই লইয়া যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁহারা অনেক সময় নূতন নূতন মানস-মূর্ত্তি সৃজন করিয়া থাকেন। ওথেলো, হ্যামলেট, দুষ্মন্ত, ফৌষ্ট, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি সেই প্রকারের সৃষ্টি। ইঁহারা কবির ভাবময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষের সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন এরূপ কোন সৃষ্টি করেন নাই—তিনি নাটক বা উপন্যাস লেখেন নাই।

ছন্দের লহরে কবি যে ভাবসমূহকে ভাষাময়ী মূর্ত্তি দান করেন, কালীপ্রসন্ন সে শিল্পে একেবারে অপারগ ছিলেন না। তাঁহার লিখিত বহু সঙ্গীত রহিয়াছে। আর,শিশুদের জন্য যিনি মধুময় কবিতা লিখিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে বৃদ্ধদের জন্যও কবিতা লিখিতে পারিতেন—ইহাও শুধু অনুমান নহে; প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরেজীতে দুইটী প্রসিদ্ধ ছত্র আছে—

I slept and dreamt that life was beauty,
I woke and found that life was duty.

কালীপ্রসন্ন ইহার ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

"নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন
কি সুন্দর সুখময় মানব জীবন!
জাগিয়া মেলিনু আঁখি
চমকিনু পুন দেখি—
কঠোর কর্ত্তব্যব্রত—জীবন যাপন।"

ছন্দের যে বিচিত্র ভঙ্গি, যে বিপুল নৃত্য আমরা রবীন্দ্রের কাব্যে পাই, তাহার সাক্ষাৎকার অবশ্যই এখানে মিলে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রের প্রতিভা তখনও সম্যক্ বিকশিত হয় নাই, ভাষাভঙ্গি তখনও গঠিত হইয়া উঠে নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, কালীপ্রসন্নের প্রতিভা তাঁহার কাব্যে নহে, তাঁহার প্রবন্ধেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নাটক লেখেন নাই, উপন্যাস লেখেন নাই, পদ্যকাব্য লেখেন নাই—এ সমস্তই আমরা স্বীকার করিব; তিনি যে কবিতা ও গান লিখিয়াছেন, সেগুলিকেও আমরা বাদ দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ইহাতেও তিনি খর্ব্ব হইবেন না। লর্ড বেকনও ত উপন্যাস নাটক লেখেন নাই—কাব্যও তাঁহার কিছু নাই; তথাপি সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি ন্যূন নহেন। লর্ড বেকনের যদি ইংরেজী সাহিত্যে প্রতিপত্তি হইবার হেতু থাকে, তবে বাঙ্গালা

সাহিত্যে কালীপ্রসন্নেরও সেই প্রতিপত্তি হইবে না কেন? বেকন যেমন তাঁহার প্রবন্ধ রচনার জন্য বিখ্যাত, কালীপ্রসন্নও তেমনি তাঁহার প্রবন্ধের জন্য বঙ্গদেশে বিশ্রুতনামা। আর তাঁহার এই প্রবন্ধও তাঁহার বান্ধবকে আশ্রয় করিয়াই বেশীর ভাগ রচিত হইয়াছিল।

ঢাকাতে সাহিত্যচর্চ্চা ইহার পূর্ব্বেও হইয়াছে এবং পরেও হইতেছে। হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির লীলাক্ষেত্র ঢাকা, সাহিত্য সম্পদে কোন দিনই একেবারে হীন নহে। কিন্তু "বান্ধব" যখন ঢাকায় বাঁচিয়া ছিল, তখন সাহিত্যের যে নূতন ভঙ্গি নূতন ভাব-প্রবাহ চলিয়াছিল, তেমনটী বোধ হয় আর শীঘ্র হইবে না। আমরা তখন ছাত্র, সবেমাত্র কলেজে ঢুকিয়াছি। কিন্তু আজিও আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ে, কত উদ্‌গ্রীব ভাবে আমাদের "বান্ধবে"র আবির্ভাবের অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম। আর যখন নূতন কলেবরে 'ছায়াদর্শনে'র আর এক নূতন স্তবক বুকে লইয়া 'বান্ধব' আবির্ভূত হইত, তখন কি যে বিস্ময় এবং ভক্তির সহিত সেই কাগজখানা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। একবার বিজ্ঞাপিত হইল, নূতন মাসের বান্ধবে অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে অধ্যাপক হরিনাথ দের একটী কবিতা থাকিবে। একে বান্ধব, তায় আবার কবিতা—সেও আবার বহু ভাষাবিৎ হরিনাথ দের লেখা—না জানি সে কেমন জিনিষ হইবে! আশায় আশায় দিন আর ফুরায় না—বান্ধবও আর দেখা দেয় না! অবশেষে আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া, বান্ধব কুটীরের আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম এবং যে ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, "মহাশয়, বান্ধব বাহির হইবে কবে?" তারপর অবশ্যই "বান্ধব" বাহির হইল—কবিতাটীও দেখিলাম—একটী আরবী কবিতার বঙ্গানুবাদ। শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই। বিস্ময়ে আকুল হইয়া ভাবিয়াছি, ইহা বান্ধবের উপযুক্তই হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের তখন যে একটা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল, তাহাতেই আমরা ভীত, বিস্মিত ভাবে তাঁহাকে দূর হইতে শ্রদ্ধা করিয়াছি। কাযেই তাঁহার হাত হইতে যে বান্ধবটি বাহির হইয়া আসিবে, তাহাতে অপণ্ডিতের দন্তস্ফুট করা অসম্ভব ইহা আমরা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইতাম। কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন এতই বিস্তৃত ছিল যে, তিনি যদি কোন শব্দকে অপাণিনীয় বলিতেন, তবে স্বয়ং পাণিনী বলিলেও তাহা শুদ্ধ হইত না; কালীপ্রসন্ন যদি কোন প্রবন্ধের সমালোচনায় বলিতেন, ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, তবে না পড়িয়াই লোকে মানিয়া লইত যে, ইহা তাহাই হইবে।

বান্ধবের প্রবন্ধাবলীতে কালীপ্রসন্নের যে কেবল পাণ্ডিত্যের ছটাই বিকীর্ণ হইত, তাহা নহে। সাধারণে যাঁহাদিগকে কবি কহে, যাঁহারা তাঁহারই ভাষায়, "শ্রুতি-সুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া, শুধু কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন", কালীপ্রসন্ন অবশ্যই তাঁহাদের কেহ ছিলেন না। কিন্তু কাব্যানুভূতি যে তাঁহার ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে রহিয়াছে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষর লেখা পাঠ করিতে থাকে এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে, যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায় এবং বুদ্ধি অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়া, তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়, তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়;—কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব।" ইত্যাদি।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট কাব্য যিনি অনুভব না করিয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইতে পারে না। কিন্তু কাব্যানুভূতিই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে—সেটাই তাঁহার চিত্তের প্রধান এবং স্থায়ী ভাব

নহে। প্রথম বয়সে হয়ত তিনি জ্ঞান-পথের পথিক ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে যে ভক্তিই তাঁহার চিত্তের প্রধান অবলম্বন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'ঈশ্বরে ভক্তি' 'ভক্তির জয়' প্রভৃতি লইয়াই তিনি বেশীর ভাগ ব্যাপৃত থাকিতেন। এটা তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, "রক্তমাংসের স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেই বেশী, কিন্তু প্রীতি অথবা ভক্তির আকর্ষণ-জনিত মমতা মনুষ্যেরই বিশেষ সম্পত্তি।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"নদী যেমন সাগরের উদ্দেশে দেশে দেশে গমন করে, মনুষ্যহৃদয়ের সজীব প্রীতি ও সজীব ভক্তিও সেইপ্রকার, নিজ নিজ বিকাশের অনুরূপ আবেগভরে পঁহুছিবার জন্য, কোথাও কঙ্কর পথের ন্যায় ক্ষুদ্রতর বিঘ্ন, কোথাও বা কঠোরতম পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় বিপদ পরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া, অপূর্ব্ব ঘূর্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়।"

যাঁহার মন ভক্তির কথা ভাবিতে এত ভালবাসে, নিজের চিত্তে সর্ব্বদা ভক্তি জাগরূক রাখিতে তিনি যত্নবান, তিনি যে ধর্ম্মহীন নহেন, এ কথা বুঝা যায়। আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ যে হিন্দু ছিলেন, এ কথায়ও কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু হিন্দু বলিতে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি অনেক জিনিষই বুঝায়, জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ প্রভৃতি অনেক পন্থার কথাই মনে উঠে। কালীপ্রসন্ন ইহার মধ্যে কোনটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? কি ভাবে তিনি বিশ্বপিতার সমীপস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

অবশ্যই যিনি ভক্তির কথা এত ভাবে কহিয়াছেন, ভক্তিই যে তাঁহার অবলম্বিত পথ ছিল, তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আযৌবন যিনি জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, যিনি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের এত পক্ষপাতী ছিলেন, ধর্ম্মচিন্তার চেয়ে যাঁহার দার্শনিক গবেষণার সুখ্যাতি বেশী, তিনি যে কখনও জ্ঞানকে পরিহার করিতে পারেন নাই, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "মা—না মহাশক্তি" নামক গ্রন্থে তিনি জ্ঞান ও ভক্তির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও দর্শনের এবং বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতের এক বিরাট সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কথায়, "আগে বিজ্ঞান গাইত এক গীত, ভক্তি গাইত আর এক গীত; বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল এক সুর। এখন ভক্তি, প্রেমবদ্ধ দম্পতীর মত, এক প্রাণ হইয়া—একে অন্যের কণ্ঠস্বরে স্বর মিশাইয়া, মনুষ্য মাত্রকেই কহিতেছে, 'মনুষ্য, তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য সেই অনন্তরূপিণীরই অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভা মাত্র।'" অন্যত্র তিনি, কহিতেছেন—"এই জগন্ময়ী জগজ্জীবন-রূপিণী মাতাকে প্রাচীন কালের ঋষিরা পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং "পিতা নোঽসি" ও "পিতা নো বোধি" ইত্যাদি মহামন্ত্রে স্তুতি করিয়াছেন। কালিদাস প্রভৃতি অনুপ্রাণিত কবিরা তাঁহাকে, বাক্য ও অর্থের ন্যায়, অভিন্নভাবাপন্ন জ্ঞানে, একই আধারে জগতের পিতা ও মাতা বলিয়া ধ্যান করিয়াছেন। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিয়া আহ্বান করিয়া প্রাণের নিদারুণ পিপাসা পূর্ণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন জগৎপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মগুরু তাঁহাকে একবার 'পিতা' বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং যেন তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া, পরক্ষণেই আবার মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মা আমাদের সকল সম্ভাষণেই এক অখণ্ড, সচ্চিদানন্দরূপিণী জগন্মূর্ত্তি।"

ইহা হইতে বুঝা যায় কালীপ্রসন্ন ধর্ম্মে কতকটা উদার ছিলেন। অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে, ভাববিশেষের সীমার ভিতরে তিনি ভগবানকে খোঁজেন নাই। বিশ্বের বিরাট কাব্যে, মানবের দীর্ঘ ইতিহাসে, বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায়, ব্যক্তির সাধারণ ও বিশিষ্ট অনুভূতিতে সর্ব্বত্রই তিনি ভগবানের সত্তা অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের দার্শনিক জ্ঞান তাঁহার পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান নিদর্শন। সাহিত্যিকেরা কদাচিৎ কোন নূতন দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা কিংবা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেক্সপীয়রের ভক্তেরা যদিও তাঁহার আইনের জ্ঞান,

জ্যোতিষের জ্ঞান প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা ঠিক যে, আইন বা জ্যোতিষের চর্চ্চায় অষ্টিন বা নিউটনের পার্শ্বে সেক্সপীয়র কখনও বসিতে পাইবেন না। সুতরাং কালীপ্রসন্নের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা নহে যে, দর্শন-চর্চ্চায় তিনি শঙ্কর রামানুজের সঙ্গে এক শ্রেণীস্থ নহেন। তথাপি, ইহা আমরা না মানিয়া পারি না যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইউরোপীয় দর্শন—বিশেষতঃ গ্রীক্ দর্শন—তিনি তেমন ভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; কিন্তু আগষ্ট কোঁৎ এবং হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির মত বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং হিন্দু দর্শনের মধ্যে তিনি বেদান্তের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

দর্শনের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যেমন রহিয়াছে, তেমনই প্রমাণ খণ্ডও রহিয়াছে। জ্ঞানের উৎপত্তি কোথায়, প্রতিষ্ঠা কিসে, অর্থ কি, পরিদৃশ্যমান জগতের মানে কি—এ সকল বিচারও দর্শনের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেদিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। শেষ বয়সে তিনি আত্মার গতি, মৃত্যুর পর তাহার জীবন-অনুভূতি প্রভৃতি লইয়া বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন; এবং তাহারই ফলে তাঁহার 'ছায়াদর্শন' গ্রন্থ। অবশ্যই ছায়া-দর্শনে এমন কোন নূতন আবিষ্কার নাই, যাহা ইংরেজী গ্রন্থবিশেষে না রহিয়াছে। তথাপি এ সব বিষয়ের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে জোর কলমে প্রথম তিনিই চালাইতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশেও ভৌতিক ঘটনা ঘটে; তিনি যদি নিজের চেষ্টায় এবং অন্যের সহায়তায় সে সকল সংগ্রহ করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য পাইতেন তবে একটা মস্ত কায হইত। কিন্তু তখন বার্দ্ধক্যের বোঝা তাঁহার মস্তকে চাপিয়া বসিয়াছে।

যাঁহার কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল না, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞানের সহিত খুবই নিকট পরিচয় ছিল বলা কঠিন। তথাপি বিজ্ঞান যে "জড় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, আগুনে পোড়াইয়া, জলে ভিজাইয়া, তাপে গলাইয়া, এবং আরও অশেষ তন্নচ্ছেদে বিশ্লেষ করিয়া" তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে, তাহা তিনি জানিতেন। আরও বিশেষ করিয়া জানিতেন, বিজ্ঞানের সেই সার কথা, যেখানে বিজ্ঞান দর্শনে পরিণত হইয়া, স্যর উইলিয়ম ক্রুকসের ভাষায় বলিতেছে "জড়বস্তুর যত প্রকার মূর্ত্তি আছে, আমি প্রাণ ও চৈতন্য শক্তিতেই তাহার আশা ও অঙ্কুর নিহিত দেখিতেছি।" (In life I see the promise and potency of all forms of matter.")

কালীপ্রসন্ন ছিলেন সাহিত্যিক; তিনি যে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ছিলেন, সেটা তাঁহার গৌণ চেষ্টার ফল। সুতরাং তাঁহার দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞানের চেয়ে সাহিত্যের জ্ঞান যে ঢের বেশী হইবে, আপাততঃ তাহাই মনে হয়। বাস্তবিকও ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে—বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে—তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত হইতে তিনি ভাষা ভঙ্গি উপমা রূপক প্রভৃতির ধারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় ছিল এমন মনে হয় না। যদিও তিনি ফরাসী বা জার্ম্মান দার্শনিকদের মত অনেক স্থানে আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি সেই সব দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে কদাচিৎ কিছু বলিয়াছেন। আর কাব্য উপন্যাস নাটক প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্য অপেক্ষা তিনি যে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ সাহিত্যেরই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তাঁহার আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনার ভঙ্গি দেখিলেই বুঝা যায়। জানকীর অগ্নি পরীক্ষা তিনি শুধুই একটা কাব্যের ঘটনা বলিয়া মনে করেন নাই; এবং কাব্যের সঙ্গতি অসঙ্গতির দিক হইতেও ইহার বিচার করেন নাই। জানকীর অগ্নি পরীক্ষার তিনি নামান্তর দিয়াছেন "কাব্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান।" তাহার অর্থ এই যে, ঘটনাটী যদিও কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে তথাপি ইহা ঐতিহাসিক সত্য; এবং অগ্নি হইতে

নহে। প্রথম বয়সে হয়ত বা তিনি জ্ঞান-পথেরই পথিক ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে যে ভক্তিই তাঁহার চিত্তের প্রধান অবলম্বন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'ঈশ্বরে ভক্তি' 'ভক্তির জয়' প্রভৃতি লইয়াই তিনি বেশীর ভাগ ব্যাপৃত থাকিতেন। এটা তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, "রক্তমাংসের স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেই বেশী, কিন্তু প্রীতি অথবা ভক্তির আকর্ষণ জনিত মমতা মনুষ্যেরই বিশেষ সম্পত্তি।" অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—

"নদী যেমন সাগরের উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে, মনুষ্যহৃদয়ের সজীব প্রীতি ও সজীব ভক্তিও সেইপ্রকার, নিজ নিজ বিকাশের অনুরূপ ভাবসাগরে পঁহুছিবার জন্য, কোথাও কঙ্কর পথের ন্যায় ক্রূরতাব বিঘ্ন, কোথাও বা কঠোরতম পর্ব্বতবর্ত্মের ন্যায় বিপদ পরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া, অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়।"

যাঁহার মন ভক্তির কথা ভাবিতে এত ভালবাসে, নিজের চিত্তে সর্ব্বদা ভক্তি জাগরূক রাখিতে যিনি যত্নবান, তিনি যে ধর্ম্মহীন নহেন, এ কথা বুঝা যায়। আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ যে হিন্দু ছিলেন, এ কথায়ও কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু হিন্দু বলিতে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি অনেক জিনিষই বুঝায়, জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ প্রভৃতি অনেক পন্থার কথাই মনে উঠে। কালীপ্রসন্ন ইহার মধ্যে কোনটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? কি ভাবে তিনি বিশ্বপিতার সমীপস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

অবশ্যই যিনি ভক্তির কথা এত ভাবে কহিয়াছেন, ভক্তিই যে তাঁহার অবলম্বিত পথ ছিল, তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আযৌবন যিনি জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, যিনি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের এত পক্ষপাতী ছিলেন, ধর্ম্মচিন্তার চেয়ে যাঁহার দার্শনিক গবেষণায় সুখ্যাতি বেশী, তিনি যে কখনও জ্ঞানকে পরিহার করিতে পারেন নাই, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "মা—না মহাশক্তি" নামক গ্রন্থে তিনি জ্ঞান ও ভক্তির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও দর্শনের এবং বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতের এক বিরাট সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কথায়, "আগে বিজ্ঞান গাহিত এক গীত, ভক্তি গাইত আর এক গীত; বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল এক সুর। এখন ভক্তি, প্রেমবদ্ধ দম্পতীর মত, এক প্রাণ হইয়া—একে অন্যের কণ্ঠস্বরে স্বর মিশাইয়া, মনুষ্য মাত্রকেই কহিতেছে, 'মনুষ্য, তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য সেই অনন্তরূপিণীরই অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভা মাত্র।" অন্যত্র তিনি, কহিতেছেন—"এই জগন্ময়ী জগজ্জীবনরূপিণী মাতাকে প্রাচীন কালের ঋষিরা পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং "পিতা নোঽসি" ও "পিতা নো বোধি" ইত্যাদি মহামন্ত্রে স্তুতি করিয়াছেন। কালিদাস প্রভৃতি অনুপ্রাণিত কবিরা তাঁহাকে, বাক্য ও অর্থের ন্যায়, অভিন্নভাবাপন্ন জ্ঞানে, একই আধারে জগতের পিতা ও মাতা বলিয়া ধ্যান করিয়াছেন। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিয়া আহ্বান করিয়া প্রাণের নিদারুণ পিপাসা পূর্ণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন জগৎপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মগুরু তাঁহাকে একবার 'পিতা' বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং যেন তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া, পরক্ষণেই আবার মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মা আমাদের সকল সম্ভাষণেই এক অখণ্ড, সচ্চিদানন্দরূপিণী জগন্মূর্ত্তি।"

ইহা হইতে বুঝা যায় কালীপ্রসন্ন ধর্ম্মে কতকটা উদার ছিলেন। অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে, ভাববিশেষের সীমার ভিতরে তিনি ভগবানকে খোঁজেন নাই। বিশ্বের বিরাট কাব্যে, মানবের দীর্ঘ ইতিহাসে, বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায়, ব্যক্তির সাধারণ ও বিশিষ্ট অনুভূতিতে সর্ব্বত্রই তিনি ভগবানের সত্তা অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের দার্শনিক জ্ঞান তাঁহার পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান নিদর্শন। সাহিত্যিকেরা কদাচিৎ কোন নূতন দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা কিংবা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেক্সপীয়রের ভক্তেরা যদিও তাঁহার আইনের জ্ঞান,

জ্যোতিষের জ্ঞান প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা ঠিক যে, আইন বা জ্যোতিষের চর্চ্চায় অষ্টিন বা নিউটনের পার্শ্বে সেক্সপীয়র কখনও বসিতে পাইবেন না। সুতরাং কালীপ্রসন্নের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা নহে যে, দর্শন-চর্চ্চায় তিনি শঙ্কর রামানুজের সঙ্গে এক শ্রেণীস্থ নহেন। তথাপি, ইহা আমরা না মানিয়া পারি না যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইউরোপীয় দর্শন—বিশেষতঃ গ্রীক্ দর্শন—তিনি তেমন ভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; কিন্তু আগস্ত কোঁৎ এবং হার্ব্বাট স্পেন্সার প্রভৃতির মত বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং হিন্দু দর্শনের মধ্যে তিনি বেদান্তের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

দর্শনের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যেমন রহিয়াছে, তেমনই প্রমাণ খণ্ডও রহিয়াছে। জ্ঞানের উৎপত্তি কোথায়, প্রতিষ্ঠা কিসে, অর্থ কি, পরিদৃশ্যমান জগতের মানে কি—এ সকল বিচারও দর্শনের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেদিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। শেষ বয়সে তিনি আত্মার গতি, মৃত্যুর পর তাহার জীবন-অনুভূতি প্রভৃতি লইয়া বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন; এবং তাহারই ফলে তাঁহার 'ছায়াদর্শন' গ্রন্থ। অবশ্যই ছায়া-দর্শনে এমন কোন নূতন আবিষ্কার নাই, যাহা ইংরেজী গ্রন্থবিশেষে না রহিয়াছে। তথাপি এ সব বিষয়ের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে জোর কলমে প্রথম তিনিই চালাইতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশেও ভৌতিক ঘটনা ঘটে; তিনি যদি নিজের চেষ্টায় এবং অন্যের সহায়তায় সে সকল সংগ্রহ করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য পাইতেন তবে একটা মস্ত কায হইত। কিন্তু তখন বার্দ্ধক্যের বোঝা তাঁহার মস্তকে চাপিয়া বসিয়াছে।

যাঁহার কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল না, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞানের সহিত খুবই নিকট পরিচয় ছিল বলা কঠিন। তথাপি বিজ্ঞান যে "জড় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, আগুনে পোড়াইয়া, জলে ভিজাইয়া, তাপে গলাইয়া, এবং আরও অশেষ তত্ত্বচ্ছেদে বিশ্লেষ করিয়া" তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে, তাহা তিনি জানিতেন। আরও বিশেষ করিয়া জানিতেন, বিজ্ঞানের সেই সার কথা, যেখানে বিজ্ঞান দর্শনে পরিণত হইয়া, স্যর উইলিয়ম ক্রুকসের ভাষায় বলিতেছে "জড়বস্তুর যত প্রকার মূর্ত্তি আছে, আমি প্রাণ ও চৈতন্য শক্তিতেই তাহার আশা ও অঙ্কুর নিহিত দেখিতেছি।" (In life I see the promise and potency of all forms of matter.")

কালীপ্রসন্ন ছিলেন সাহিত্যিক; তিনি যে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ছিলেন, সেটা তাঁহার গৌণ চেষ্টার ফল। সুতরাং তাঁহার দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞানের চেয়ে সাহিত্যের জ্ঞান যে ঢের বেশী হইবে, আপাততঃ তাহাই মনে হয়। বাস্তবিকও ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে—বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে—তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত হইতে তিনি ভাষা ভঙ্গি উপমা রূপক প্রভৃতির ধারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় ছিল এমন মনে হয় না। যদিও তিনি ফরাসী বা জার্ম্মান দার্শনিকদের মত অনেক স্থানে আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি সেই সব দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে কদাচিৎ কিছু বলিয়াছেন। আর কাব্য উপন্যাস নাটক প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্য অপেক্ষা তিনি যে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ সাহিত্যেরই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তাঁহার আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনার ভঙ্গি দেখিলেই বুঝা যায়। জানকীর অগ্নি পরীক্ষা তিনি শুধুই একটা কাব্যের ঘটনা বলিয়া মনে করেন নাই; এবং কাব্যের সঙ্গতি অসঙ্গতির দিক হইতেও ইহার বিচার করেন নাই। জানকীর অগ্নি পরীক্ষার তিনি নামান্তর দিয়াছেন "কাব্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান।" তাহার অর্থ এই যে, ঘটনাটী যদিও কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে তথাপি ইহা ঐতিহাসিক সত্য; এবং অগ্নি হইতে

অদগ্ধ দেহে বাহির হইয়া আসা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে। এ সকলই তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের সহিত প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জানকীর অগ্নিপরীক্ষার সময়ে দশরথের প্রেতাত্মা যে দেহীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাও বিজ্ঞানসম্মত। বিশ্বাস করা না করা আমাদের ইচ্ছা; কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচারকৌশলের প্রশংসা আমাদিগকে করিতে হইবেই।

বাঙ্গালা দেশে রাজনীতির মৌখিক চর্চ্চা খুবই চলিতেছে; কালীপ্রসন্নের সময়েও ছিল। কিন্তু রাজনীতি যে শুধু একটা মুখের ব্যাপার নহে, ইহার ভিতরেও যে তথ্যাতথ্য আছে, সে কথাটা বাঙ্গালাদেশে বড় বেশী বিচার করা হয় নাই; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে সে বিচার খুবই কম। কালীপ্রসন্নও সেদিকে বড় বেশী মন দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রাজনৈতিক বক্তৃতা তিনি অনেক করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। রাজনৈতিক প্রবন্ধ তিনি খুব বেশী লেখেন নাই। 'রাজা ও প্রজা' নামক প্রবন্ধে তিনি রাজশক্তি ও রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এবং অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে 'রাজতন্ত্র, মিশ্রতন্ত্র, প্রাকৃততন্ত্র এই তিনটির কোনটি বিধি নির্দ্দিষ্ট?' কোনটি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলকর? এ প্রশ্নেরও বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই তিনের সংমিশ্রণই সকলের চেয়ে ভাল শাসন পদ্ধতি। এ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা গভীরতর বিচার তিনি করেন নাই।

চারিত্রনীতি সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক লেখাও রহিয়াছে। পরনিন্দা, চাটুকারিতা, মিতব্যয়িতা, বিনয়, মহত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্যই এই রকম সব বিষয়েই নূতন কথা বলা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে। মানুষ এতকাল যাবৎ এ সকলের সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিয়াছে, মোটের উপর প্রায় সকল প্রশ্নেরই একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি কালীপ্রসন্নের বিবৃতির ভঙ্গি, তাঁহার ভাষার পারিপাট্য এবং যথাযোগ্য দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য্য তাঁহার প্রবন্ধগুলিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। সত্য, চরিত্র, বিনয় প্রভৃতির সম্বন্ধে ইস্কুলের ছেলেরাও রচনা লেখে; এবং এই সব লিখিয়াই তাহারা হাত পাকায়। কিন্তু পাকা হাতও যে এই সকল বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে পারে, এবং লিখিলে যে তাহা কাঁচা হইয়া যায় না, তাহার উদাহরণ ইংরাজীতে Francis Bacon, আর বাঙ্গালাতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ। আমরা অনেক সময় প্রাজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলি, "এগুলি ত ছেলেদের জন্য।" অবশ্যই বেকনের এবং কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধগুলি যে ইস্কুলের ছেলেরা পড়িয়াছে এবং আরও বহুকাল পড়িবে, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু অনেক সময় ছেলেদের পিতা পিতামহদেরও এই সকল কথা শোনা দরকার। সেই জন্যই Seneca, Epictetus, Marcns Aurelius প্রভৃতি রোমান ষ্টোইকদের এত আদর, সেই জন্যই ইরাস্মসের আহাম্মুকির প্রশংসা (Praise of folly) এত আদর পাইয়াছে; সেই জন্যই বেকন ও কালীপ্রসন্নের স্থান সাহিত্যে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা কালীপ্রসন্নের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা, বিপুল অধ্যয়ন এবং প্রচুর পাণ্ডিত্যে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু একটা কথা আমরা জিজ্ঞাসা করি নাই—কালীপ্রসন্নের জীবনে কি হাস্যপরিহাস ছিল না? সেটা কি শুধুই একটা বিরাট অধ্যয়ন এবং অপ্রতিহত চিন্তাস্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে?

তিনি যে প্রচুর হাস্যের অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার 'প্রমোদলহরী' ও 'ভ্রান্তিবিনোদই' সাক্ষ্য দেয়। এই দুই গ্রন্থে তিনি 'ষট্‌কারক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'দেবতার বাহন', 'বিবাহ' ও 'ঘোমটা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বুৎপত্তিবাদ' প্রভৃতি অনেক বিষয়েই নিজের রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি শুষ্ক পাণ্ডিত্যের খোসার ভিতরে এতই হাস্যরস ভরিয়া রাখিয়াছেন যে, যে সাহস করিয়া হস্তগত

করিতে চেষ্টা করিবে, সেই আকণ্ঠ রস পান করিয়া হাসিয়া আকুল হইবে। দুই একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বক্তব্য অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

(১) তিনি 'স্ত্রী' শব্দটি দুই প্রকারে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। 'স্তু' ধাতু হইতে উৎপন্ন স্ত্রী শব্দের অর্থ "যিনি জ্ঞানদাতা ও ইষ্টদেবতার ন্যায় সতত ভক্তির ভাবে পূজনীয়া", আর স্ত্যৈ ধাতু হইতে উৎপন্ন স্ত্রী শব্দের অর্থ "যিনি একটু বেশী শব্দ করিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বা আর দশজনের জিহ্বা হইতে একটু বেশী চলে।"

(২) ডাক্তার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ডক্ ধাতু হইতে। "ডক ছেদনে, ভেদনে, কুন্তনে, বিলুণ্ঠনে চ।" সুতরাং ডাক্তার, ডাকাত ও ডাকিনী—একই ধাতু হইতে প্রায় একই অর্থে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) হাকিম—হক্ ধাতু হইতে; অর্থ—"যিনি তর্জ্জন, গর্জ্জন, ভ্রূকুঞ্চন, লোকপীড়ন প্রভৃতি করিয়া থাকেন'। ইত্যাদি।

ইংরেজদের নামকরণ লইয়াও তিনি অনেক রসিকতা করিয়াছেন। প্রস্তর, ভূমি, বৃক্ষ, বন্য জন্তু প্রভৃতির নামে ইহাদের নাম হয়, সেই দিকেই কালীপ্রসন্ন কটাক্ষ করিয়াছেন।

সাহিত্য রসাত্মক বাক্য; সুতরাং সাহিত্যিক মাত্রেই ন্যূনাধিক রসবিশেষের অধিকারী। কিন্তু হাস্যরস লইয়া সকলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। হাস্যরস প্রয়োগের বিপদ দুইটি—প্রথমতঃ ইহা সহজেই গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সাধারণ কথাবার্ত্তায়ও দেখা যায়, রসিকতা ও অশ্লীলতা অনেক সময়েই মিশিয়া যায়। সাহিত্যেও একাধিক স্থলে এরূপ হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে হাস্যরস তেমন নাই—যাহা আছে, তাহাও প্রায়ই গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। 'হাস্যার্ণব' বলিয়া একখানা আধুনিক বই আছে—তাহার সম্বন্ধে সোজাসুজি বলা চলে যে, ইহা অপাঠ্য। তাহা ছাড়া বিদূষক শকার প্রভৃতি লইয়া যে রগড় আছে, তাহাও সব সময় সাধুসমাজের উপযোগী নহে। ইউরোপেও Boccaccio, Voltaire, এমন কি Anatole France পর্য্যন্ত এই দোষ হইতে একেবারে মুক্ত নহেন।

হাস্যরস ব্যবহারের দ্বিতীয় বিপদ—সঙ্কীর্ণতা। হাস্যরসকে বিশ্বজনীন করিয়া প্রয়োগ করা বড়ই কঠিন। সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ বা শব্দ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া যে হাসির সৃষ্টি হয়, তাহা সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। মানুষের সাধারণ ভুল কিংবা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান কোন পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া যেখানে রসিকতা জন্মগ্রহণ না করে, সেখানে সে রস সকলে ভোগ করিতে পারে না; এবং রস যত কম লোকের উপভোগ্য হইবে, ততই উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে। অনুপ্রাসে যে রসিকতা থাকে, তাহাও সেই ভাষা-ভাষীর যতই উপভোগ্য হউক না কেন, ভাষান্তরিত হইলেও উহা লোপ পাইবে; এবং যাহারা সে ভাষা জানে না, তাহারা কখনও উহা উপভোগ করিতে পারিবে না।

Aristophanes কিংবা Moliere প্রভৃতির হাস্যরসের সে দোষ নাই। ইঁহারা এমন সব সাধারণ ঘটনা, সাধারণ অবস্থা আশ্রয় করিয়া হাসির অবতারণা করিয়াছেন যাহা সর্ব্বত্রই ঘটিতে পারে, সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারে। ভাষান্তরিত হইলেও সে রসের কোন হানি হয় না।

কালীপ্রসন্নের হাস্যরস সম্বন্ধে এতটা বলা যায় কিনা, সন্দেহ। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ধাতুপাঠ প্রভৃতির ধার ধারেন না, তাঁহারা 'ব্যুৎপত্তিবাদে'র রস গ্রহণ করিতে পারিবেন না; আর অনুবাদে এ রস রক্ষা করা কঠিন।

কচ্‌কিমি আমরা যতই করি না কেন, খাঁটি হাসি জিনিষটা আমাদের জীবনে যথেষ্ট আছে কিনা, সন্দেহ। অন্ততঃ আমাদের সাহিত্যে হাস্যরস খুব বেশী নাই। রবীন্দ্রের বিরাট প্রতিভা বাদ দিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল একজন হাস্যরসের প্রধান প্রবক্তা। কালীপ্রসন্নকে ইঁহাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আনিলে অবিচার করা হইবে। যে কোন একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে

পারি যে, রবীন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র মত হাস্য রসাত্মক কোন জিনিষ কালীপ্রসন্ন লেখেন নাই।

বাস্তবিক কালীপ্রসন্নের প্রতিভা সেদিকে ধাবিত হয় নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে গম্ভীর হইয়া যাইতেন—তিনি রসিকতা করিতে আরম্ভ করিয়া তথ্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতেন। বিবাহ লইয়া ঠাট্টা আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন, "বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? ব্যাকরণের উত্তর, সংবাহে। সংবাহ শব্দের প্রচলিত অর্থ পাদমর্দ্দন"—ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার এই রসিকতার 'শেষ পরিণতি' কিসে? "বিবাহ কত প্রকার" এই বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মীমাংসায়। অবশ্যই, এই মীমাংসার ভিতরেও তিনি প্রচুর রসসিঞ্চন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কঠোর গবেষণা বাস্তবিক সরস হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কারণ আণবিক আকর্ষণ লইয়া বৈজ্ঞানিক রহস্য করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষে তাহা উপভোগ করিতে পারিবে না। কঠোর বিষয়ে রস সিঞ্চিত হইলে, তাহা বুদ্ধির পক্ষে সুগম হইতে পারে; কিন্তু সেটা প্রকৃত হাস্যরস নহে। তাহা হইলে Huxleyর সর্ব্বসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাগুলিকেও কাব্য মনে করিতে হয়। বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করিতে প্রয়াস পাইলেই উহা কাব্য হয় না। কালীপ্রসন্নের নিকট আমরা হাস্যরসে একেবারে বঞ্চিত হই নাই বটে; কিন্তু প্রকৃত হাসি তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট দিয়াছেন এমন নহে।

ইতিহাসে দেখিতে পাই, বিশ্বমানবের এক অপ্রতিহত গতি। দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিয়া যাইতেছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কোথায় যে গিয়া শেষ হইবে, তাহারও কোন ঠিকানা নাই। কালস্রোতে মানুষের মানসতরণীর এই যে এক বিরাট গতি, তাহাতে নাবিক হইয়া থাকেন সাহিত্যিকেরা। যুগে যুগে ইঁহারাই নূতন ভাবের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দেন; যুগে যুগে ইঁহারাই আমাদের মনের গতি ও মতি পরিচালিত করিয়া থাকেন। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন, উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা—প্রভৃতির মূলশক্তি সাহিত্যে। সাহিত্যের যে এই প্রচণ্ড শক্তি, তাহা সকল সাহিত্যিকই প্রয়োগ করিতে পারেন, এমন নহে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা যাঁহাদের প্রতিকূল, তাঁহাদের সে শক্তি দেখাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কালীপ্রসন্ন যে সেরূপ কিছু করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার যশের পক্ষে হানিকর নহে। কবিরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন; স্বপ্ন দেখেন—মানবসমাজের দুঃখের অবসান, বিবাদের পরিসমাপ্তি, অনন্ত সুখের আগমন; স্বপ্ন দেখেন, সেই অনাগত বিশ্বের যেখানে আছে শুধু সৌন্দর্য্য, সুখ ও শান্তি; স্বপ্ন দেখেন, সেই অলকাপুরীর যেখানে ষড়ঋতু সমান বর্ত্তমান, যেখানে "বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি"; স্বপ্ন দেখেন মানবজাতির স্বাধীনতার, সাম্যের, শক্তির ও সৌভ্রাত্রের। এরূপ স্বপ্ন কালিদাস দেখিয়াছিলেন,—শেলি বায়রণও দেখিয়াছেন, টেনিসন ও দেখিয়াছেন, হুগো, টলষ্টয়ও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ছায়াদর্শনে এমন কোন মায়াপুরীর ছায়া দেখা যায় না। কালীপ্রসন্ন যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় ইউরোপের ভাবের বন্যা এত সহজে এদেশে পৌঁছিতে পারিত না; এবং তখন এ দেশে নূতন সৃষ্টির অনুকূল মালমসলা বিশেষ কিছুই ছিল না। তখন চিন্তার চেয়ে চিন্তার বাহনের, ভাবের চেয়ে ভাষার প্রয়োজনই ছিল বেশী। এবং এই ভাষা সৃষ্টিতে কালীপ্রসন্নের দান প্রচুর।

কালীপ্রসন্নের ভাষার ভঙ্গি ও তাঁহার সংস্কৃতপ্রিয়তা প্রবাদের মত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি নিজে যে বহু শব্দ তৈয়ারি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় তেমন পরিজ্ঞাত নহেন। অবশ্যই যাঁহারা বাঙ্গালা রচনা করেন, তাঁহাদিগকে এখনও মাঝে মাঝে শব্দ তৈয়ারি করিতে হয়—বিশেষতঃ যখন পাশ্চাত্য ভাষা হইতে পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে গঠিত একটি ভাষার উত্তরাধিকারী; আমাদেরই যখন এই অবস্থা, তখন যাঁহারা প্রথম এই ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা যে প্রত্যেকটী শব্দই

সংস্কৃত অভিধানে তৈয়ারি পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। "বিবাহ কত প্রকার" নামক নিবন্ধে তিনি অনেক নূতন কথার আমদানী করিয়াছেন—যথা মৃগয়িক, সলিলিক. তাণ্ডুলিক ইত্যাদি বিবাহের নাম।

শব্দ যোজনায় কালীপ্রসন্নের একটা বিশেষত্ব ছিল—ঘোরালো জমকালো শব্দ চয়ন করা। তিনি যে অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন নাই এমন নহে; এমন কি অনেক সময় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন—যথা রূপাভিমানিনী শব্দের অনুকরণে জ্বালাতনকারিণী শব্দের, কিংবা মধুমিশ্রিত শব্দের পরিবর্ত্তে মধুমাখা শব্দের ব্যবহার। কিন্তু সংস্কৃতই হউক আর অসংস্কৃতই হউক, শব্দটী দুরুচ্চার্য্য, সুতরাং গালভরা ও কাণভরা হওয়া চাই। যেমন, তিনি সর্ব্বত্রই 'মানুষ' না বলিয়া 'মনুষ্য' বলিয়াছেন। মানুষ কথাটা অসংস্কৃত নহে, কিন্তু ইহা উচ্চারণ করিতে বাতাসে তেমন ঢেউ খেলে না, কাণে তেমন গুরুগম্ভীর আওয়াজ হয় না।

আমাদের ভাষা এখন অনেকটা হালকা হইয়াছে। সংস্কৃতের দুর্ব্বহ গুরুতার আমাদিগকে ততটা আর বহন করিতে হয় না। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার আমরা কখনই ত্যাগ করিতে পারিব না; কিন্তু সে সকল শব্দ বাণভট্টের অনুকরণে সমস্ত-ভাবে ব্যবহার না করিয়া ব্যস্ত-ভাবে ব্যবহার করি। কালীপ্রসন্নের ভাষার যে কাঠিন্য, তাহা শুধু সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের জন্য নয়, তাঁহার সমাসপ্রিয়তাই ইহার মূল কারণ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ যে শুধু লিখিবার সময়েই সংস্কৃত-প্রিয় হইয়া উঠিতেন, তাহা নহে। যাঁহারা কথিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চান, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, কালীপ্রসন্নের কথিত ভাষা আর তাঁহার গ্রন্থের ভাষায় বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। আমরা যেখানে বলি, 'রূপোর জিনিস', সেখানে তিনি বলিতেন, 'রাজত দ্রব্য'; আমরা যেখানে বলি 'সম্পর্ক নাই', সেখানে তিনি বলিতেন 'সম্পৃক্ত-নহে'।

বিদ্যাসাগরের ভাষার ন্যায় কালীপ্রসন্নের ভাষা কঠিন বটে; কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বতন গদ্য লেখকদের ভাষার কাছে ইহা মাখনের মত মোলায়েম। এমন দিনও গিয়াছে, যখনকার স্বামী স্ত্রীর পত্রের ভাষা এখনকার লোকে বুঝিতে পারিবেন না। স্ত্রীর পত্রের শিরোনামার নমুনা—

"ঐহিক-পারত্রিক-ভবার্ণব-নাবিক

শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয়

পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু"—

স্বামীর উত্তর—"পরম-প্রণয়ার্থী গম্ভীরনীরতীর-নিবসিত কলেবরাব্জসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত" ইত্যাদি। আর একটি প্রসিদ্ধ নমুনা—

"যে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড তণ্ডন করিতেছ।" ইত্যাদি। অন্যত্র—

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি ভাষার এই বাদ্যভাণ্ডের কাছে কালীপ্রসন্নের ভাষা বীণার সুরের মত মিষ্ট।

অনেক উক্তি প্রবাদ-বাক্যের মত লোকমুখে প্রচারিত হইয়া থাকে। সেক্সপীয়রের বহু প্রবচন আছে, বেকনের আছে, কালীপ্রসন্নেরও রহিয়াছে। "সংসারের এক দৃশ্য সূতিকা-গৃহ আর এক দৃশ্য শ্মশান" প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক বাক্যের জন্য তিনি চিরপ্রসিদ্ধ।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে কয়জন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কালীপ্রসন্ন যে তাঁহাদের মধ্যে একজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার বিপুল মনের অভিব্যক্তির কতকটা আভাস আমরা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন কিরূপ ছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি;—জীবনে তিনি কেমন ছিলেন, সে বিচার করিবেন তাঁহার জীবনী-লেখকেরা।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আঁখির ভাষা

নব বসন্তের হাসি উঠেছিল যবে ফুটি
পুষ্পকুঞ্জে বনবীথি মাঝে,
বিমল জ্যোছনা ধারা ধরার বুকের 'পরে
ঝরেছিল যে মধুর সাঁঝে,
সেই সে প্রথম দেখা পুষ্পিত বকুলতলে—
নিমেষের চোখের মিলন—
পলকে সে আঁখি দুটি শিখায়েছে ভালবাসা,
শিখায়েছে আত্মবিসর্জ্জন।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

পতিহীনার মৃত্যু

কাঁদিস্‌নে সই এমন দিনে, ফেলিসনে আর চোখের জল,
আয় লো কাছে—আরো কাছে আয়!
হাত বুলিয়ে বুঝ্‌বি কি সই গভীর সুখে উঠ্‌ছে দুলে
কোন্ কথা এই বুকের কিনারায়?
এল কি আজ পাঁচ বছরের পথ-চাওয়া মোর শুভক্ষণ?
এবার তবে বাজা লো শাঁখ বাজা!
এই বুঝি তার গায়ের সুবাস, ওই বুঝি তার পায়ের ধ্বনি,
এই এল মোর আঁধার বুকের রাজা!
কাণ পেতে তুই শুনিস্ কি সই কি আনন্দ মহোৎসব
পাঁজর জুড়ে কাঁপছে তালে তালে?
জানিনে আজ কেমন করে সইব এত সুখের দোলা,
এত ভাগ্য লিখলো বিধি ভালে!

মনে পড়ে আজকে আমার পাঁচবছরের আগের কথা
মিলিয়ে আসা বাঁশীর সুরের মত;
সেই আঁখি সেই পরশটুকু ছড়িয়ে গেল শিরায় শিরায়,
কি আবেশে নয়ন হল নত!

এক নিমেষে উঠল জেগে ফাগুন বনের মুঞ্জরণ
শিউরে-ওঠা সকল দেহে মনে,
ধন্য হল পনেরোটি মধুমাসের ফুলের মালা
পা ছুঁয়ে এই প্রাণের সিংহাসনে!
হয়নি সখি পূজা আমার রিক্ত করে অর্ঘ্যডালা,
লজ্জা এসে সাধলো বড়ই বাদ,
ফুলের সাজি রইল তোলা, মিটল না আর অভাগিনীর
চিরযুগের স্বপন-গড়া সাধ।

জানিস্ কি সেই একটি মাসে কি লভেছি হৃদয় ভরে'
—ভাবতে যে আজ উথলে ওঠে বুক!
আজ বুঝি তাই নতুন করে সেই স্বপনের পরশ পেয়ে
প্রাণে আমার এত গভীর সুখ!
বলিস্‌নি লো এমন কথা—কেউ আসেনি ঘরের পাশে,
কেমন করে আসবে ওরা বল?

বলিস্‌নি লো—একটু এসে সুধায়নি কেউ কেমন আছি,
দেয়নিক কেউ একটি ফোঁটা জল ;—
এনেছি যে সর্ব্বনাশী মহামারীর আগুন শিখা,
বাইরে এসে তাই নিয়েছি ঠাঁই।
আহা ওদের চাঁদের মেলা, কেমন করে আসবে সখি!
ভাবতে ভয়ে আকুল হয়ে যাই!
এই গৃহে এই সুখের নীড়ে পাঁচটি বছর ছিনু হেথা
একটা দারুণ অভিশাপের মত,
অমঙ্গলের বোঝা লয়ে সবার হেলা দৃষ্টি-আড়ে
ছিলাম সদা লজ্জা ভয়ে নত ;
এই আনন্দকুঞ্জে আমি এনেছিলাম দুর্ভাগিনী
সবার প্রাণে নীরব হাহাকার,—
মুছে যাই আজ ভবন হতে অমঙ্গলের চিহ্নরেখা,
সব কালিমা, সকল অন্ধকার।

দিস্ লো দিদির খোকার মুখে কাকীমায়ের স্নেহের চুমা,
একটুখানি ফেলিস্ চোখের জল,
আহা যখন সকাল বেলা কাঁদবে আমায় ডেকে ডেকে
কেমন করে প্রবোধ দিবি বল্!

বলিস আমার মায়ের কাছে অভাগিনী মেয়ের কথা
মাথা রেখে শূন্য বুকের 'পরে,—
কেমন করে নিবিড় সুখে এ জনমের দুঃখ আমার
ধন্য হল চিরজনম তরে।
খুলে দে সব জান্‌লা সখি, ধর্‌লো তুলে আলোর কাছে
বুকের 'পরে এই যে ছবিখানি,
দেখে দেখে দিবসরাতি মিটলনাক চোখের তৃষা,
লুকিয়ে দেখা কত সরম মানি'!
ঐ আঁখিটির স্নেহের ডাকে বড় সুখের যাত্রা আজি ;
এল এবার এল শুভক্ষণ!
শুনিস্ কি তার পায়ের ধ্বনি, ঘুরে বেড়ায় পাশে পাশে,
শুনিস্ কি তার নীরব সঞ্চরণ?

কাঁদিসনে আর এমন ক্ষণে,—সাজা, আমার বাসর সাজা,
আশীর্ব্বাদের চুমা দে মোর মাথে!
মরণ?—এ কি মরণ সখি? এ যে চিরজীবনভরা
মিলন আমার প্রিয়তমের সাথে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

আঁধারের শিউলি

(উপন্যাস)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবকুমার ডাক্তার মানুষ। সে দেহের কোথায় কোন শিরা উপশিরা আছে তাহার বিশেষ তত্ত্ব রাখিলেও, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে সে নেহাৎ আ-নাড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই সুভদ্রা যখন দেবকুমারের একান্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া, মুকুলের সামান্য একটু স্নেহসম্বোধনে তাহাদের সহিত আসতে সম্মত হইল, তখন দেবকুমার ভাবিল—'মেয়েদের জাতে-জাতে কি টান্! আমি অত করে বল্লাম তখন হল না, আর 'মুকুল যেই বল্লে অমনি স্বীকার।"—দেবকুমার স্থির করিল, সুভদ্রা যেমন তাহার অনুরোধ অবজ্ঞা করিয়া মুকুলের কথাতে আসিয়াছে, সে-ও সুভদ্রার প্রতি যতদূর পারে ঔদাসিন্য দেখাইতে ত্রুটি করিবে না!—যতই সে বলুক,—তবু দেবকুমার তাহার স্বামী! চোখের সামনে স্বামীর উপেক্ষা কোন্ স্ত্রী কতদিন সহিতে পারে?

আন্তরিকতার অভাবে মুখের ভালবাসা যেমন বুকে গিয়া পৌঁছায় না, তেমনি কপট উপেক্ষাও বুকে গিয়া বিঁধে না। দেবকুমার যতই সুভদ্রার প্রতি নীরব উপেক্ষা উদাসীনতার ভাব দেখাইতেছিল, সুভদ্রার

ততই মনে হইতেছিল—হয় ও শুধু মুকুলের কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে দেবকুমারের ছলনা,কিংবা নিষেধাজ্ঞার ছলে দুরন্ত ছেলেকে দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার ফন্দির মত একটা কিছু। দেবকুমারও অনেক সময় নিজের মনে নিজের ফাঁকি ধরিয়া ফেলিত। মুকুল যখন বলিল, "সুভদ্রার জন্তে যোড়া দুই কাপড় যে আনবে তা যেন একটু ভাল গোছের হয়" তখন দেবকুমার যদিও বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"কি,ফরাসডাঙ্গার শাড়ী ?" কিন্তু যে ডাঙ্গার শাড়ী আসিল, তাহা দেখিতে ফরাসডাঙ্গার না হইলেও তাহা উচ্চতর.ডাঙ্গার। এবং মুকুল বস্ত্রের জাতিকুলের বিবরণ শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল যে বিলাতের কলে এত অল্পমূল্যে এমন ঠিক হুবহু ঢাকাই কাপড়ের মত কাপড় তৈরি হইতে পারে!

দেবকুমারের সংসারে রাত্রে রুটির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সুভদ্রা আসার পর হইতে হঠাৎ তাহার রুটিতে রুচি না হওয়ায় লুচির ব্যবস্থা করিতে বলিল; এবং লুচি রুটি দুরকম ব্যবস্থাটা ভাল দেখাইবে না তাহাও জানাইয়া দিয়া বলিল—"যে-কদিন থাকে, একটু বেশী খরচ হবে আর কি করা যাবে?"—নিতান্ত অনিচ্ছায় এই ব্যবস্থাটা করিতে হইল এমন ভাবই প্রকাশ করিল। মুকুলের এ ভাবটায় বড় দুঃখ হইল। সে স্বামীকে বলিল, "তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবকে মাসে তিনবার খাওয়াতে কত পয়সা খরচ কর, আর আমার একজন ভাবের লোকের বেলায় তুমি এমন করচ!—সে না হয় রুটিই খাবে!"—অভিমানে মুকুলের চোখ দুটো ছলছল করিয়া উঠিল! দেবকুমার যেন অপ্রস্তুত হইয়া "না, না—তা বলচি নে, তবে কিনা, এই জান তো, লুচিতে আপত্তি আর কি কচ্ছি"—এই রূপ করিতে লাগিল। পরদিন যে ময়দা ও ঘৃত আসিল তাহা শুধু পরিমাণে দেড়া নহে, রকমেরও সেরা! মুকুল ভাবিল, কালিকার কথায় অপ্রতিভ হইয়া স্বামী এইরূপ করিয়াছেন।

এইরূপে দেবকুমার একদিকে মুকুলের আড়ালে থাকিয়া সুভদ্রাকে যত্ন করিতে লাগিল, অন্তদিকে তাহার অভিমান মনের আড়ালে রহিয়া সুভদ্রাকে উপেক্ষার শর হানিতেছিল। সুভদ্রা যখনও হাসিত কখনও কাঁদিত, কখনও বা তার নিজের উপর বড় রাগ হইত—কিন্তু শিকলকাটা পাখী আর ধরা দিল না।

হঠাৎ একদিন দেবকুমার বুঝিতে পারিল যে উপেক্ষাও বিনি মাহিনার উপবাসী থাকিয়া বেশীদিন খাটিতে চাহে না,—নাচার হইয়া খাটিলেও শ্রান্ত হইয়া পড়ে। সুভদ্রার প্রতি দেবকুমারের নীরব উপেক্ষা কেবলই খাটিয়াই মরিয়াছে, সুভদ্রার বুকের বেদনার তীব্ররসের একবিন্দুও সে আস্বাদ করিতে পায় নাই। প্রথম প্রথম দেবকুমার সুভদ্রার বাহিরে সহজ প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া ভাবিত যে ওটা মিথ্যা, অন্তর তার নিশ্চয়ই বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু বেদনার বোঝা বুকে লইয়া কেহ কি সব সময় এমন সহজ প্রসন্নতায় দিনের পর দিন কাটাইতে পরে—এ সন্দেহও দেবকুমারের মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারিত। দেবকুমার আরও ভাবিত—সে কি চায়? উপেক্ষার তীক্ষ্ণশরে সুভদ্রাকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলাই তার চরম উদ্দেশ্য? যদি তাহাই হইত, তবে তো কলিকাতায় সেইদিনই "সঙ্গে লইয়া যাইব না" বলিয়া তাহাকে ফেলিয়া আসিতে পারিত। যাহারই অনুরোধে হউক, সুভদ্রা যে তাহাদের সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিল ইহাতেই ত সেদিন দেবকুমার পরম লাভ গণিয়াছিল, উপেক্ষার ব্যবস্থাটা তো হারিৎপুরের—আর তার মূলে ত উৎকট অভিমান—কাছে আসিয়াও ধরা দিল না বলিয়াই ত যত গোল! কিন্তু অন্তরে ভালবাসা পুষিয়া বাহিরে উপেক্ষা দেখাইয়া কে কবে কাহাকে ধরিয়াছে! দেবকুমারের মনে হইতে লাগিল, এ যেন চার-ফেলা জল আলোড়িত করিয়া মাছ ধরিবার চেষ্টা!—হায় হায়, কি ভুলই সে করিয়াছে! সে শরদেহেরই হৃদপিণ্ডের ব্যবচ্ছেদ করিতে শিখিয়াছিল! নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেরই উপর দেবকুমারের কেমন রাগ হইতে লাগিল। তখন আবার নূতন উপায়ে

পলাতক হৃদয়কে বন্দী করিবার আশায় সে নূতন পথে চলিল।

আজ আহারে বসিয়া দেবকুমার বলিল, "সুভদ্রা রাঁধে বেশ।" এতদিন দেবকুমার সুভদ্রার উদ্দেশে 'উনি' 'তিনি' 'তোমার বন্ধু' বলিয়া উল্লেখ করিত। সুতরাং হঠাৎ দেবকুমারের মুখে 'সুভদ্রা' শুনিয়া মুকুল প্রথমে একটু চমকিত হইয়া, পরে আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল, এতদিনে নামটা মুখে এল, আর রান্না ভাল বল্লে!—কি, বড্ড ঝাল হয়েছে নাকি? কাণদুটো যে লাল হয়ে উঠেছে!"

দেবকুমার কাণের বর্ণ পরিবর্ত্তনের হেতুটা ব্যঞ্জনের ঘাড়ে চাপাইয়া বলিল, "তা ঝাল একটু হলেও—স্বাদ বড় সুন্দর হয়েছে!"

অদূরে রান্না ঘর হইতে সুভদ্রা তাহা শুনিতে পাইল। সেই সময় যদি কেহ তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিত, তবে ভাবিত, ব্যঞ্জনে ঝালের আধিক্যে ভোক্তার কর্ণপ্রান্ত রক্তিম হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে রাঁধে তাহারও সমস্ত মুখখানা রাঙা হইয়া উঠে কেমন করিয়া? এ দুর্ব্বলতার জন্য সুভদ্রা নিজের মনকে খুব চোখ রাঙাইল; কিন্তু মন আজ কোন শাসনই মানিল না—কি একটা অবুঝ আনন্দে সে তাহার একান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিল।

দিন কয়েক পরে দেবকুমার এক যোড়া সোণার রুলি মুকুলের হাতে দিয়া বলিল, "সুভদ্রাকে পরিয়ে দাও।" মুকুল বিস্মিত হইয়া বলিল, "হঠাৎ এ কি?" দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "ভাল রান্না খেয়ে লোকে বলে না—সোণা দিয়ে হাত বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছে করে'—আমি তাই কাযে করলাম!" মুকুল ভাবিল, এতদিনে নিরাশ্রয়ার প্রতি তাহার স্বামীর স্বাভাবিক করুণা দেখা দিয়াছে! বাস্তবিক সুভদ্রার অঙ্গে একখানিও গহনা নাই। এবং মুকুল যে তাহা জানা সত্ত্বেও গহনার প্রস্তাবটা প্রথম তাহার মনে উদয় হয় নাই, ইহাতে সে আপনার কাছে আপনি লজ্জিত হইল!

সুভদ্রা প্রথমটা ঘোর আপত্তি করিল—শেষে মুকুলের হাত ধরিয়া একান্ত কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিল। মুকুল কিছুই শুনিল না; সে জোর করিয়া সুভদ্রার হাতে রুলি পরাইয়া দিল। সুভদ্রা তখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—সুভদ্রার এই ব্যবহারে মুকুল মনে বড় আঘাত পাইল। সে অভিমানের অশ্রু চাপিয়া বড় দুঃখের সহিত বলিল, "আমাদের এত পর ভাবিস্ সুভদ্রা? কিন্তু আমরা—অন্ততঃ আমি ত—কৈ তা ভাবিনে!"

মুকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পরে বলিল, "তা ভাই কেঁদে কায কি, খুলে ফেল্। কিন্তু বড় ব্যথা পেলাম আজ সুভদ্রা!"

সুভদ্রার দুই চোখ দিয়া হুহু করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মুকুল এবার শুষ্কভাবে বলিল, "তা খুলে ফেল না ভাই।"

সুভদ্রা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, তুমি পরিয়ে দিয়েচ—থাক!—তোমার মনে ব্যথা দেব না!—কিন্তু আমি যে কেন কাঁদচি—তা যে কাউকে বোঝাবার নয় দিদি!—তা' যদি হত, তা হলে অভিমান করতে পারতে না!"

মুকুল ভাবিল, সুভদ্রা তার স্বামিভাগ্যের দুর্দ্দশার ইঙ্গিত করিল। সে একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানাটা কতবার বলতে বল্লাম—তা'ত বল্লেনা ভাই।"

সুভদ্রা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবকুমার সুভদ্রার জন্য রুলি কিনিয়া আনায় মুকুল স্বামীর উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং স্বামীর পূর্ব্বেই তাহার যে একথা মনে হয় নাই, সে জন্য মনে মনে বরং লজ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামীর এই সদয় ব্যবহারে তাহার মনে যে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, বরং তাহার মনের ভিতরটা কি জানি কেন অপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই ভাবান্তরে মুকুল নিজেই বিস্মিত হইল। মনের সঙ্গে

মুকুলের তর্ক বাধিল। মুকুলের মন বলিল, "তা হোক, এতটা ভাল দেখায় না!" মুকুল বলিল, "এতটা আর কি হল—দুগাছা রুলি বৈত নয়!" মন বলিল, "তোমার অনুরোধে যদি দশভরির হার দিতেন, তাতেও কিছু কথা ছিল না!" মুকুল বলিল, "আমার ত বলা উচিত ছিল, কিন্তু যদি সে ক্রটি উনি সেরে নেন—তাতে আর দোষ কি?" মন বলিল, "তোমার ক্রটি যদি সেরে নেবার উদ্দেশ্য হত, তবে রুলি আনবার আগে তার প্রস্তাব করতেন—এ উনি নিজের টানেই এনেছেন!" মুকুল বলিল, "স্ত্রীর প্রিয়জনকে টান করলেই বা দোষ কি?"—মন রাগের ভরে বলিল, "তবে মর, যত পারো আগুনে কাঠ যোগাও!"

মুকুল একবার মনে করিল স্বামীকে মনের কথাটা জানাইবে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—ছিঃ!

ইহার পর হইতে কিন্তু মুকুল সুভদ্রার প্রতি স্বামীর যত্নের ভাবটা আর পূর্ব্বের চোখে দেখিয়া উঠিতে পারিল না। তা ছাড়া, মুকুল আরও লক্ষ্য করিল যে, তাহার প্রতি দেবকুমারের হৃদয়ের প্রীতি পূর্ব্বের মত শুধু নিঃশব্দে হৃদয়ের তলে তলে বহিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সে যেন এখন কতকটা চাটুকারের মত মুকুলের কাণের কাছে গুঞ্জরণ করিতে শিখিয়াছে! মাঝে মাঝে মুকুলের মনে হইত, এ সমস্ত তার মনের বিকারের ফল—সে নিজের মনের কালীতে তার অমন স্বামীকে কালো করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু এ আত্মসান্ত্বনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিত না। নারীর মন—যাহা বিনা যুক্তিতর্কে শুধু অনুভূতির পাখা মেলিয়া সত্যের দ্বারে উপনীত হয়—মুকুলের সেই নারীমন দেবকুমারের ভাবান্তর ধরিয়া ফেলিল। মুকুল মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না, ভিতরে ভিতরে শুকাইতে লাগিল।

এই সময়ে মুকুল মামীশাশুড়ীর এক পত্র পাইল। মামী লিখিয়াছেন—"তোমাদের হয়েছে কি?—চিঠিপত্রের উত্তর একেবারে বন্ধ করে দিলে! সঙ্গী পেয়ে বুড়ী মামীশাশুড়ীকে কি একেবারে ভুলে গেলে?—সুভদ্রা ত শুনেছি লিখতে পড়তে জানে, সেও একবার মনে করে না? দুজনে একজোট হয়ে ধর্ম্মঘট করেছ নাকি? দেবকুমারের ডাক্তারী কেমন চলছে? বোধ হয় খুব ভালই, রুগীর ভিড়ে সেও বোধ হয় তার মামীকে দুছত্র লেখবার সময় পায় না! তা বেশ ভাল! যাই হোক্, যদি সময় হয় তোমাদের কুশল জানাবে, আর আমাদের সংবাদ ত রাখতে চাও না, তাই দিলাম না। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা তোমার মামী—

উত্তরে মুকুল মামীর কাছে অনেক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লিখিল—"মামী, কি জানি আমার পোড়া মন কি হয়েছে, কিছু ভাল লাগে না! জীবন কেমন দুর্ব্বহ ঠেকচে, মনে হয় মরণ হলেই বাঁচি! জীবনের এ অবসাদ বোধ হয় মরণেই ঘুচবে! আমি ছাড়া আর সকলেই ভাল আছে।"

পত্রে সুভদ্রার কোন উল্লেখ করে নাই দেখিয়া মুকুল মনে লজ্জিত হইয়া,পুনশ্চ দিয়া লিখিল, "সুভদ্রাকে চিঠি লিখতে বলিব—সে ভাল আছে—ইতি"

আপনার মুকুল।"

শিশু পড়িয়া গেলে সে যেমন নিজের অসাবধানতার কথা ভুলিয়া, যে স্থানে পড়িয়া যায় সেই স্থানটার উপর তার যত ক্রোধ জ্বলিয়া উঠে, তেমনি মানব-মন কোন অমঙ্গলের মূলে আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে এক সঙ্গে জড়িত দেখিলে,আত্মীয়কে ছাড়িয়া অনাত্মীয়ের উপরেই তাহার ক্রোধ জন্মায়। মুকুলের চিঠি পড়িয়া মামী বেশ বুঝিলেন, মুকুলের এই মানসিক কষ্টের তলে সুভদ্রার সংস্রব আছে।

তখন সুভদ্রার উপর তাঁহার চিত্ত একান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সুভদ্রা-ঘটিত কোন ব্যাপারে সুভদ্রাই যে একা দায়ী হইতে পারে না, ইহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভাগিনেয়ের উপর পত্রযোগে আদেশ করিলেন—"তুমি পত্রপাঠ বিনা প্রশ্নে সুভদ্রাকে বিদায় করিয়া দিবে। কেন কি জন্ত এ সব প্রশ্ন করিবে না।"

এতখানি হুকুম অন্য মামী তাঁর ভাগিনেয়ের উপর করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু এই মামীর যে সে জোর ছিল, একথা মামীর চেয়ে ভাগিনেয় বেশী বুঝিত। তাই দেবকুমার পত্র পাইয়া বড় মুস্কিলে পড়িল। সে সেই দিনই একটা জরুরী কাযের অছিলা করিয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে কলিকাতায় গেল।

দেবকুমারকে দেখিয়া মামী সব কথার আগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাকে বিদায় করে দিয়েচ ত?" সুভদ্রাই মুকুলের সুখ-শান্তির পথে অন্তরায় সিদ্ধান্ত করিয়া মামী আজ তার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিলেন না।

দেবকুমার ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বিদায় করে দেব?—আর, সে কি করেচে?"

মামী ভাগিনেয়ের উপর তীব্রদৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সে—কি করেচে?—তুমি জান না?—বোঝ না?—তা বুঝবে কেমন করে?—তুমি যে আজ অন্ধ!"

দেবকুমার বলিল, "মামীমা, যে ঘোর অপরাধী, সেও শাস্তি পাবার আগে তার অপরাধ কি জানতে পারে। সেটুকু করুণাও কি আপনার কাছে"—

মামী বাধা দিয়া বলিলেন, "তাকে বিদায় করে' দিতে তুমি কেন এত কাতর, তার উত্তর দাও ত আগে?"

"তার উত্তর—সে নিরাশ্রয়!"

মামী আবার তীব্র দৃষ্টির কশাঘাত করিয়া বলিলেন, "শুধু সে নিরাশ্রয় বলে'? আর কিছু কারণ নেই কি তার সঙ্গে?"

দেবকুমার গম্ভীর ভাবে বলিল, "আছে।—সে হচ্ছে—সেই নিরাশ্রয়ার আশ্রয় দিতে আমি বাধ্য—ধর্ম্মতঃ!"

মামী চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ধর্ম্মতঃ?"

দেবকুমার নত দৃষ্টিতে বলিল, "ধর্ম্মতঃ!"

মামা বিস্মিত আতঙ্কের ভয়ে বলিলেন, "ধর্ম্মতঃ কেন?—সত্যি করে বল—আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে!"

দেবকুমার কাতর দৃষ্টিতে মামীমার পানে চাহিয়া বলিল, "মামীমা!—জোর করে' 'সে কেন'র উত্তর কেড়ে নেবেন না—আমি বড় অসহায়!"

মামী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে থাক্! বড় ভাবিয়ে তুল্লে কিন্তু!" কিছুক্ষণ পরে বলিলেন —"সুভদ্রাকে যদি আমার কাছে এনে রাখি, তাতে কি তোমার অমত আছে?"

"নিরাপদ আশ্রয়ে যেখানে সে থাকে আমার আপত্তি নেই!"

এবার মামী কতকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে সেই বেশ!"

মুকুল যে অন্তরে অন্তরে শুকাইতেছিল, তাহা প্রথমে পিসির চোখে ধরা পড়িল। তিনি একদিন সস্নেহে বধূর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "হাঁ মা, মুখখানি আজকাল এমন শুকিয়ে থাকিস্ কেন?—আগে তো রাতদিন মুখে হাসি লেগে থাকত! কি হয়েচে মা, বল্ না!"

পিসির এই স্নেহবাক্যে মুকুলের একটা কথা মনে হইয়া বুকে ভারি বাজিল যে, তার বুকের ব্যথা তার স্বামীর আগে অপরের চোখে পড়িল! মুকুল বুকের ব্যথা চাপিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—"পিসিমা স্বপ্ন দেখচ নাকি? কৈ, মুখ শুকনো কবে দেখ্‌লে?" নিকটে সুভদ্রা ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ ভাই, আমি নাকি রাত দিন মুখ শু'কয়ে থাকি?"

পিসি সুভদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা,—বলত—ও মুখ শুকিয়ে থাকে না?"

সুভদ্রা একটু ম্লান হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পিসির কথায় সমর্থন করিল।

মুকুল সুভদ্রাকে বলিল, "কৈ তুমি ত আমাকে কখনো মুখ শুকনোর কথা বলনি।"

সুভদ্রা বলিল, "বল্‌তে গিয়ে কেমন বলতে পারিনি!"

মুকুল বলিল—"কেন?"

সুভদ্রা বলিল, "কি জানি!"

দুইদিন পরে মামীশাশুড়ীর ছেলে আসিয়া উপস্থিত। তিনি সুভদ্রাকে লইয়া যাইবার জন্য ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়া মুকুল প্রথমটা ভারি আশ্চর্য্য হইল। তারপর মামীর উপর রাগ হইল। সে দুঃখ করিয়া তাঁহাকে লিখিল, "যদি বা একজন সঙ্গী পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কোন্ অপরাধে তাকে এত শীঘ্র নিয়ে যেতে চাচ্চেন? আমি এবার থেকে চিঠি দিতে দেরী করব না।" যেন পত্র দিতে বিলম্ব করাতেই মুকুলের প্রতি মামীশাশুড়ী এই শাস্তি দিয়াছেন!

মামী মনে মনে বলিলেন—আবাগীর বেটি কিছু বোঝে না! পরে তিনি উত্তরে মুকুলকে লিখিলেন—"তুমি শীঘ্র সুভদ্রাকে পাঠিয়ে দেবে—আমি যা করি তোমার ভালর জন্যেই! এইটুকু মনে রেখে আমার উপর দুঃখ কোর না।"

অগত্যা সুভদ্রাকে যাইতে হইল। বিদায়ের সময় মুকুলের দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"দিদিকে তোর একেবারে ভুলে যাস্‌নে বোন।"

সুভদ্রা তরল কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে ভুলব দিদি!" মনে মনে বলিল—তোমার কাছে যে আমার সর্ব্বস্ব রইল।

দেবকুমার ষ্টেশনে উঠাইয়া দিতে সঙ্গে গেল। তাহার মামাতো ভাই টিকিট কিনিতে ষ্টেশনে গেলে নিরালা পাইয়া দেবকুমার ডাকিল, "সুভদ্রা!"

সুভদ্রা তাহার আর্দ্র চোখের ম্লান দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

দেবকুমার বলিল, "আজ বিদায়ের দিনে কোনো কথা কি বলবার নেই? একান্ত পরের মতন—চলে যাবে?"

সুভদ্রার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে কাতর কণ্ঠে বলিল, "আবার কেন?"

"হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা৷ বলে যাও—আমায় ক্ষমা করেচ।"

সুভদ্রা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল হলে!—তোমায় ক্ষমা করব আমি! আর আমার পাপের বোঝা ভারি কোরো না।"

দেবকুমার বলিল, "ক্ষমা করায় পাপ নেই সুভদ্রা!"

সুভদ্রা ভারি গলায় বলিল, "আমি সে কথা বলচি নে! ছোট কখন বড়কে ক্ষমা করতে পারে না।"

দেবকুমার বলিল, "তুমি ত আমাদের স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ স্বীকার কর না।"

সুভদ্রা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি বয়সে বড় তা'ত অস্বীকার করি নে।"

এমন সময়ে দেবকুমারের মামাতো ভাই টিকিট লইয়া আসিল। ট্রেণে উঠিবার পূর্ব্বে সুভদ্রা স্বামিপদে অশ্রুনেত্রে প্রণত হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমার যত অপরাধ ক্ষমা কোর।"

দেবকুমার যখন সুভদ্রাকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তার সমস্ত মুখখানা বিষাদে আচ্ছন্ন। সুভদ্রার জন্য মুকুলেরও প্রাণের ভিতরটা আজ বড় কাঁদিতেছিল। কিন্তু স্বামীর সে বিপন্ন ভাব প্রথমটা মুকুলের চোখে ভাল ঠেকল না—তাহার মনের মধ্যে কি যেন একটা ঈর্ষা-কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল। পরক্ষণেই মুকুল নিজের মনেই নিজেকে ধিক্কার দিল—ছিঃ, আমার কি মন! সে তখন স্বামীর বিষণ্ণতায় সহানুভূতি মিশাইয়া বলিল,—"উঠিয়ে দিয়ে এলে?"

দেবকুমার গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"হুঁ।"

সে অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মুকুল বিস্মিত হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "ও রকম কল্লে যে?"

দেবকুমার বিরক্তির ভাবে বলিল, "কি রকম আবার কল্লাম?"

মুকুল আর কোন প্রশ্ন না করিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, দেবকুমার বলিল, "যেও না, দাঁড়াও।" মুকুল তার অভিমানে ভরা দুই চক্ষুর সজল দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—"কি, বল।"

দেবকুমার ভাবিয়াছিল, মুকুলকে জিজ্ঞাসা করিবে সে সুভদ্রা ও তাহাকে জড়াইয়া কোন কথা মামীকে

লিখিয়াছে কি না। দেবকুমারের মনের ভিতরটা যদি সাদা থাকিত, তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, কিন্তু তাহার ত সে অবস্থা নহে। তাই সে চট্ করিয়া একটা মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া বলিল, "তুমি ভাব সুভদ্রা যতটা 'দিদি' 'দিদি' করত, ততটা সত্যি?"

মুকুল বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "কেন, কি হয়েচে?"

দেবকুমার বলিল, "সে যাবার জন্যে মামীমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিল আমি খবর পেয়েছি।"

কথাটা শুনিয়া মুকুলও মনে ব্যথা পাইল। বলিল, "সত্যি? তাই তুমি ষ্টেশন থেকে এসে অমন গম্ভীর হয়ে ছিলে? আমি ভেবেছিলাম আমার উপর কি জন্যে রাগ করেছ।"

দেবকুমার মুকুলের গালে একটা মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, "তোমার উপর রাগ? কখন করেচি?"

স্বামীর এই প্রণয়-অভিনয়ে মুকুলের চোখের এতক্ষণকার রুদ্ধ অভিমানের অশ্রু আনন্দে উথলিয়া উঠিল। এই ঘোর কপটতায় দেবকুমারের মনের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু তথাপি আপাততঃ রক্ষা পাইয়াছে ভাবিয়া সে জ্বালা সে নীরবে সহ্য করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুভদ্রা মামীকে বলিল, "মামীমা, আপনি আমাকে আনলেন, আর এই দেখুন দিদি দুঃখ করে চিঠি লিখচেন, আমি নাকি আপনাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছি আসবার জন্যে।"

মামী সুভদ্রার পত্রখানা লইয়া পড়িলেন, পরে হাসিয়া বলিলেন, "তার কথা ছেড়ে দাও; তার যা বুদ্ধি, কে হয়ত বলে থাকবে তাই বিশ্বাস করে বসেচে।"

সুভদ্রা বলিল, "মিছি মিছি কে আর একথা বলতে গেছে?"

মামী বলিলেন, "হয়ত দেবকুমার বলে থাকবে।"

"তাঁর লাভ?"

"তা সেই জানে।"

সুভদ্রার মনের ভিতরটা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। সে একটু বিমর্ষভাবে বলিল, "কিন্তু মামীমা, আপনি ত জানেন, আমার এতে কোনই দোষ নেই।"

মামী হঠাৎ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "যদি লিখেই থাক তাতে হয়েচে কি?"

সুভদ্রা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আমি ত মামীমা তা করিনি।"

মামী বলিলেন, "তা জানি। কিন্তু না লেখাটাই বরং তোমার দোষ হয়েচে।"

সুভদ্রা শঙ্কিত দৃষ্টিতে মামীর পানে চাহিয়া বলিল, "কেন মামীমা?"

মামী ঈষৎ ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন, "কেন? আমি এতদূর থেকে খবর পেলাম, আর তুমি সামনে থেকে কিছু টের পাওনি?"

সুভদ্রা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারচিনে মামীমা!"

মামীর মনের উত্তাপ আজিও সম্পূর্ণ নিবে নাই, তাই আজ সেই প্রসঙ্গক্রমে আবার তাহা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি, তোমাকে নিয়ে দেবকুমারের মনে কোন ভাবান্তর হয়েচে কি না?"

অকস্মাৎ এই প্রশ্নে সুভদ্রা ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অতি কষ্টে বলিল, "তাঁর মনের ভাব"—

সুভদ্রার আর কথা সরিল না দেখিয়া মামী সেটুকু পূরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন করে জানবে? এই ত।"

সুভদ্রা অপরাধীর মত করুণ দৃষ্টিতে মামীর পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি তাঁহার বুকে ব্যথা দিল, কিন্তু তিনি ভাবিলেন, আজ যখন কথা উঠিয়াছে, তখন মায়া মমতা নাই, সবটুকু জানিতে হইবে। বলিলেন, "আচ্ছা পরের মনের কথা না জানতে পার, নিজের টুকু?"

সুভদ্রা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মুখখানা পলকে সাদা হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, দিনের সবটুকু আলো যেন ঐ একটা

প্রশ্নের ফুৎকারে চকিতে কাঁপিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য কোন উত্তর দিবার তার সামর্থ্য রহিল না।

সুভদ্রার চোখে জল দেখিয়া মামী তাঁহার প্রকৃতিগত স্নেহের বশে এই স্বামি-প্রেমবঞ্চিতার অতৃপ্ত হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাটুকু স্মরণ করিয়া, তাহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরে কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "স্বামী যাই হোক্, তবু স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য কারুর চিন্তা মনে আস্‌তে দেওয়া পাপ—মহাপাপ।"

সুভদ্রার অশ্রুসিক্ত ম্লান মুখখানি পলকে রাঙা হইয়া উঠিল, সে অভিমান-ভরা-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মামীমা, সুভদ্রার আর যাই দোষ থাক, সে অসতী নয়।"

সুভদ্রার এই সতেজ উত্তরে মামী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন, ভাবান্তর যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে সেটা দেবকুমারের দিক হইতেই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সেইটাই ত ভয়ের কথা। মনে মনে দেকুমারের উপর আবার নূতন করিয়া বিরক্ত হইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ভাল লাগে ব'লে

ভালবাসি—
মিছে কথা সখি ;
কাছে আসি
ভাল লাগে ব'লে ;
কি নিরখি
ভুলিল এ চোখ,
যে কুহকী!
বোঝাব কি ছলে?
ও কনক-
কান্ত তনু তোর,
কি আলোক
করে বিকিরণ।
লাগে ঘোর
গোলাপী নেশায়
মুদে মোর
আসে দুনয়ন!

আঁখি ছায়,
বরিষার সম,
বেদনায়
ঘন সুনিবিড় ;
প্রাণ মম
কাঁপে থর-থর
অনুপম
লাবণ্য-অধীর!
দুটী কর
কমল পরশে,
ফুলশর
লাখে লাখ ছোটে,
মধুর সে
কুসুম-আঘাত,
প্রখর সে
বুকে এসে ফোটে।

ভালবাসি
কে বলিল সখি?
কাছে আসি
ভাল লাগে ব'লে ;

কি নিরখি
ভুলিল এ প্রাণ,
রে কুহকী !
বোঝাব কি ছলে ?
পেতে কাণ,
শুনি যবে তব
ছোটে গান
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ;
অভিনব
হরষ উছলে
অনুভব
করি শিরা দিয়া !

লীলাছলে
বাজাও কাঁকণ,
খেল জলে
লইয়া গাগরী ;
মোর মন
নেচে বেজে ওঠে,
সেইখন
শিহরি শিহরি।
গালে ফোটে
বসোরা গোলাপ,
রাঙা ঠোঁটে
পড়ে সুধা ঝরি ;
কালো ছাপ
এঁকে দিয়ে সেখা,
অনুতাপ
লজ্জাতে মরি !

ভালবাসা ?
কারে সখি কয় ?
আমি চাষা—
জানিনে সোয়াদ,
মনে হয়—
এই হবে বুঝি।
পাই ভয়
ঘটিল প্রমাদ !
সোজাসুজি—
ভাল লাগে জানি ;
বোঝাবুঝি
করিতে না চাই,
ওগো রাণী !
বড় কথা তুলে
হাসিখানি
মুখে যদি পাই।

যদি ভুলে,
কভু কয়ে থাকি
শ্রুতিমূলে—
ভালবাসি তোরে,
বুকে রাখি
নিবিড় সোহাগে
দিই ঢাকি
একান্ত আদরে ;
ভাল লাগে
ব'লে শুধু সখি,
অনুরাগে
কাছে আস বলে,
কি নিরখি
ভুলিল এ আঁখি,
রে কুহকী !
বোঝায় কি ছলে ?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

কালিদাসের সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয়

(উপসংহ

মহাকবি কালিদাসের রচিত কাব্যসাহিত্য অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের পাখীগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে যখন প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন রঘুবংশ কুমারসম্ভব বাদ দিলে চলিবে না। যে সকল পাখীর পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, এখানেও তাহাদের সহিত নূতন পরিচয়-লাভে আনন্দ পাওয়া যাইবে। সেই সারস-কলহংস-শিখী, সেই কপোত-পারাবত-শুক, সেই চক্রবাক-রাজহংস-পরভৃত, সেই গৃধ্র শ্যেন-কুররী পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হয়। আমরা মনে করি না যে, তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহার তুলিকায় ছবির পর ছবি পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি যখন বারম্বার বিহঙ্গপরিচয় নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই, নূতন নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া সেই পাখীগুলিকে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তখন তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই সমস্ত চিত্রের পরিচয় দিতে হইলে, আমাদেরও বারম্বার নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া পাখীগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। হয়ত এইরূপ নাড়াচাড়া করিবার ফলে কিছু কিছু নূতন তথ্যে উপনীত হইতে পারা যাইবে। যে সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশমার্গে "অস্তম্ভাং তোরণস্রজম্" সৃষ্টি করিতেছে, রঘুবংশের মধ্যেই অন্যত্র তাহাদিগকে পম্পাসরোবরে এবং গোদাবরীবক্ষে দেখিতে পাই। এই জলচর ও খেচর বিহঙ্গের পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এমন করিয়া শূন্যে মালাগাঁথার ছবি আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? কলহংসের গতি ও নিনাদ পুনরায় আমাদের সুখোৎপাদন করে। দ্বন্দ্বচর, অবিযুক্ত চক্রবাক-মিথুন, পম্পাসরোবরে উৎপলকেশর লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। রামচন্দ্র যখন যমুনা নদী দেখিতে পাইলেন, তখন দেখিলেন—যমুনা চক্রবাকবতী; যেন পৃথিবীর হেমভক্তিমতী বেণী বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে যে গোরোচনা কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাকের উল্লেখ পাইয়াছি, তাহার সহিত এই হেমভক্তিমতী চক্রবাকীর কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। চক্রবাকাঙ্কিত গঙ্গার শ্রী অতিক্রম করিয়া গৌরী বিরাজ করিতেছেন। রাজহংসের মদপটুনিনাদে সুরগজের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে; মানস-রাজহংসী সরোবরের সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখার উপর পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে নীত হইতেছে। কাদম্বসংসর্গবতী মানসগামিনী রাজহংস-পংক্তির ন্যায় গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দৃষ্ট হইতেছে। সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনির অনুকরণে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া প্রত্যুপদেশচ্ছলে রাজহংস গৌরীকে নিজের লীলাঞ্চিত গতি যেন শিখাইতেছে। দিকৃচক্রবাল সহসা ধূমাবৃত অথবা ধূলিসমাচ্ছন্ন হইলে মেঘভ্রমে পুলকিত রাজহংস মানসসরোবরে প্রয়াণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। শরৎকালে গঙ্গা হংসমালা শোভিতা; মরালের উল্লসিত কূজন যেন দেবতার আশীর্ব্বচন বলিয়া মনে হয়; সুরাঙ্গনা-প্রতিবিম্বিতা সুরধুনীর বক্ষে হিরণ্য-হংসাবলী কেলি করিতেছে। কুমার দেখিলেন, অমরাবতীর সুরসেবিত দীর্ঘিকার জল মত্তদিগ্‌গজমদে আবিল হইয়াছে, হিরণ্যহংসব্রজ সেই জল বর্জ্জন করিয়াছে। দীর্ঘিকার পদ্মপত্রান্তরালে যে সকল বিহঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে, অথবা তারস্বরে কূজন করিতেছে, সেই সকল উদকলোলবিহঙ্গ, "নীরপতত্রী", "কমলাকরালয়-বিহঙ্গ" চিত্রমধ্যে সুবিন্যস্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

শুধু চিত্রগুলি পাঠকের সম্মুখে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কাব্য হইতে সঙ্কলন করিয়া উপস্থাপিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে

হইবে যে, চিত্রগুলি স্ববাস্তব কি না। সারসের (crane) আকাশে উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পর্য্যবেক্ষক এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"During their migrations, these birds always fly in two lines, which in front meet in an acute angle, thus forming a figure somewhat resembling the Greek letter "gama" which, indeed, is said to have derived its shape from this very circumstance." (১)

ইনিও এই পাখীকে যেভাবে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছেন, তাহা অনেকটা কবিবর্ণিত তোরণমালার মত মনে হয়। কাদম্ব কলহংসের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। পাঠক গোরোচনা কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক দেখিয়াছেন; এখন হেমভক্তিমতী চক্রবাকী ও হিরণ্যহংসকে দেখিতেছেন। পুংপক্ষীর বর্ণ orange brown ও ruddy ochreous; স্ত্রী-পক্ষীর বর্ণ অপেক্ষাকৃত হীনাভ; তাই কবি তাহাকে কেবলমাত্র হিরণ্য অথবা হেমভক্তি আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে বর্ণের পার্থক্য এত অধিক যে, মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন—

"The plumage in both sexes varies considerably in depth of tint. Females are as a rule, duller in tint * * * the black collar is always wanting."

ঋতু সম্বন্ধেও কালিদাসের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই। কুমারসম্ভবে দেখিতে পাই যে, গৌরী তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পৎ সরোবরবক্ষে অত্যন্তহিমোৎকরানিলা রজনী অতিবাহিত করিবার সময় বিচ্ছিন্ন চক্রবাকমিথুনের প্রতি কৃপাবতী হইয়াছিলেন। শীতকালে সরোবরের পদ্ম তুষারপাতে বিক্ষত হইয়াছে; চক্রবাকমিথুন নিশীথে বিয়োগ-বিধুর হইয়া কালযাপন করিতেছে। বাস্তবিক এই যাযাবর বিহঙ্গ শীতকালে ভারতবর্ষের জলাশয়ে দৃষ্ট হয়। মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিতেছেন—

"The bird is a winter visitor to India, arriving about October, and leaving......... Northern India in April."

ইহারা উৎপলভুক্ বটে, কারণ ইহারা উদ্ভিজ্জাশী; কিন্তু শম্বুকাদিও ইহাদের ভক্ষ্য। ঋতুসংহারে হংসকে শরৎকালে দেখিয়াছি; কুমারসম্ভবেও বর্ণিত আছে—তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং। যাযাবর হাঁসগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শরদাগমে আসিয়া উপস্থিত হয়, এ কথা বিশদভাবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এস্থলে নূতন করিয়া আর কিছু না বলিলেও চলে।

"মত্তচকোরনেত্রা" ও "চকোরাক্ষি" শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পাখীটী পাওয়া গেল, সেটির কথা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। টীকাকার ডল্লনাচার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—রক্তাক্ষো বিষসূচক স্বনাম্না খ্যাতঃ। হেমাদ্রি বলেন—রক্তত্বাচ্চকোরস্য অক্ষিণীবাক্ষিণী যস্যাঃ সা। দেখা যাইতেছে, চকোরের রক্তচক্ষুই তাহার বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণ। ইংরাজ-বর্ণিত Partridge পর্য্যায়ভুক্ত এই পাখীর শারীরিক লক্ষণের মধ্যে চোখের রং কমলালেবুর মত (orange) অর্থাৎ রক্তাভ এবং চোখের পাতা রীতিমত লাল (২)।

চকোর (caccabis chucar) তিত্তির বিহঙ্গগণের অন্যতম; কিন্তু হারীত (crocopus chlorogaster) প্রভুদ-পর্য্যায়ভুক্ত। এই Green Pigeon এর বর্ণনা ডল্লন এইরূপ দিয়াছেন—হরিতপীতবর্ণ হরিতাষ ইতি লোকে। বর্ণ কতকটা সবুজ ও পীতের সংমিশ্রণ; সাধারণতঃ সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ফলশস্যাশী পাখীকে মরিচবনে পর্ব্বতের উপত্যকায় দেখিতে পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আর একটি নূতন পাখী পাওয়া যাইতেছে,—কঙ্ক। অমরকোষে আছে—লোহপৃষ্ঠস্তু কঙ্কঃ স্যাৎ। আচার্য্য

(১) Cassell's Book of Birds, by Thomas Rymer Jones, Vol IV, p. 89.

(২) The Game Birds of India and Asia, by F. Finn.

উল্লনমিশ্র এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"কঙ্ক: দীর্ঘচঞ্চুর্হাপ্রমাণঃ। উক্তঞ্চ—কঙ্ক: স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষক:। লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্" ইতি। আগাগোড়া বর্ণনা মিলাইয়া দেখা যায় যে, এই পাখী Heron বা Ardea পর্য্যায়ভুক্ত পক্ষিবিশেষ। ইহার পৃষ্ঠদেশ কতকটা লালচে—back, wings and tail reddish ash (Jerdon); ঘাড়ের কাছটা ferruginous red (Blanford)। পাখীটার বৈজ্ঞানিক নাম Ardea manillensis।

এই কঙ্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ দেখা যায়। যে যে কারণে আমরা ইহাকে Ardea পরিবারভুক্ত করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপতঃ উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে Vulturidæর মধ্যে গণ্য করেন, তাঁহারা এমন কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই বা যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই, যাহাতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Gustav Oppert যাদবের "বৈজয়ন্তী" সম্পাদন করিয়াছেন। যাদব বলিতেছেন,—

কঙ্কস্তু কর্কটস্কন্ধঃ পর্কটঃ কমলচ্ছদঃ
দীর্ঘপাদঃ প্রিয়াপত্যো লোহপৃষ্ঠশ্চ মল্লকঃ।

এখানেও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কঙ্কের বিশিষ্টতা এই যে, সে দীর্ঘপাদ এবং লোহপৃষ্ঠ। অতএব এ সম্বন্ধে অন্য অভিধানকারের সহিত যাদবের মতভেদ নাই। কিন্তু ইনি কঙ্কের যে কয়েকটী প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে Oppert করিতেছেন "kind of vulture" অর্থাৎ গৃধ্র-পর্য্যায়ভুক্ত। আপত্তি এই যে, vulture পর্য্যায়ভুক্ত কোনও পাখীকে বিশেষভাবে দীর্ঘচঞ্চু অথবা দীর্ঘপাদ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। বৈদিক সাহিত্যেও অধিকাংশ স্থলে কঙ্ক বলিতে বক বুঝায়। Roth-প্রণীত St Petersberg নামক বিরাট অভিধানে কঙ্ক অর্থে Reiher লেখা আছে। এই reiher শব্দ জর্ম্মাণ ভাষায় বক অর্থাৎ heronকে বুঝায়।

অমরকোষে "বকঃ কহ্বঃ" ও তাহার পাঠান্তর "বকঃ কঙ্কঃ" দেখিয়া আমাদের অনুমানই সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, যদিও শেষোক্ত পাঠান্তর সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। কহ্ব, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি যতগুলি বক-জাতীয় পাখীর বিষয় এপর্য্যন্ত আলোচনা করা গেল, তাহারা সকলেই Ardeidæ পরিবারের অন্তর্গত। পুরাকালে কঙ্কপত্র এদেশে শরশোভনরূপে ব্যবহৃত হইত, এইটি মনে রাখিলে নখপ্রভাভূষিত কঙ্কপত্রের তাৎপর্য্য ও সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। আধুনিক কালে কিন্তু বকজাতীয় অনেক পাখীর পালক পাশ্চাত্য সমাজে শরশোভন না হইয়া শিরোশোভনরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আচার্য্য উল্লন মিশ্রের মতে কঙ্ক প্রসহশ্রেণীভুক্ত। ইহারা মৎস্য ভেক প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

মদনভস্ম হইল; সমীরণ সেই কপোতকর্ব্বুর ভস্মরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। ভস্মপ্রসঙ্গে এই কপোতকর্ব্বুর বর্ণের পরিচয় বোধ করি পাঠককে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। এই কপোত আমাদের পুরাতন পরিচিত columbinæ পরিবারভুক্ত পাখী। আর হৈমবতী-মহাদেবের বিলাসকক্ষে যে পারাবতটি প্রবেশ করিল—

সুকান্তকান্তাভণিতানুকারং কূজন্তমাঘূর্ণিতরক্তনেত্রম্।
প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠং মুহুর্মুহুর্ন্যঞ্চিতচারুপুচ্ছম্।
বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগ্মমীষদ্দধানমানন্দগতিং মদেন
শুভ্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদমিতস্ততো মণ্ডলকৈশ্চরন্তম্।
রতিদ্বিতীয়েন মনোভবেন
হ্রদাৎ সুধায়াঃ প্রবিগাহ্যমানাৎ
তং বীক্ষ্য ফেনস্য চয়ং নবোত্থ-
মিবাভ্যনন্দৎ ক্ষণমিন্দুমৌলিঃ।

তাহাও এই পরিবারের অন্তর্গত। এখন পাঠক-মহাশয় মনোযোগ-সহকারে এই পারাবতের বর্ণনাটি পাঠ করিয়া দেখুন—

পারাবত মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ বিচরণকালে সুকান্ত-কান্তার ভণিত অনুকরণ করিয়া কূজন করিতেছে; তাহার রক্তনেত্র আঘূর্ণিত, কণ্ঠ স্ফীত, উন্নত ও বিনম্র

হইতেছিল, চাক্‌পুচ্ছ মুহুর্মুহুঃ সঙ্কুচিত হইতেছিল; পক্ষদ্বয় বিশৃঙ্খল, গতি হর্ষসূচক, 'বর্ণ শুভ্রাংশুর অথবা নবোত্থিত ফেনপুঞ্জের ন্যায় ধবল; পাদাগ্র জটাবিশিষ্ট। কবিবর্ণিত এই গৃহকপোতের ছবি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, তাহা বলা বাহুল্য। শুভ্রাংশুবর্ণ, অগ্রপাদ জটা-যুক্ত, আরক্তনেত্র, এই সমস্তই গৃহপালিত পারাবতের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই গৃহপালিত পারাবত প্রাচীন Rock Pigeonএর অর্ব্বাচীন সংস্করণ।

শ্যেন ও গৃধ্র সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে তাহা-দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে আকাশমার্গে উড়িতে দেখা যায়—বিভিন্নং ধ্বস্বিনাং বাণৈর্যথার্তমিব বিহ্বলম্

ররাস বিরসং ব্যোম শ্যেনপ্রতিরবচ্ছলাৎ।

পুনশ্চ,—

শিরাংসি বরযোধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতাঙ্কলম্

আদধানা ভৃশং পাদৈঃ শ্যেনা ব্যানশিরে নভঃ।

আরও,—

আধোরণানাং গজসংনিপাতে

শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ

হৃতান্যপি শ্যেননখাগ্রকোটি-

ব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ।

এবঞ্চ,—

সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্

অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী।

আবার,—

উন্মুখঃ সপদি লক্ষ্মণাগ্রজো বাণমাশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্

রক্ষসাং বলমপশ্যদম্বরে গৃধ্রপক্ষপবনেরিতধ্বজম্।

ব্যোমপথে গৃধ্র উড়িতেছে; কচিৎ ছিন্নমস্তক ভূপ-তিত হইবার পূর্ব্বে শ্যেননখর দ্বারা ধৃত হইতেছে; কচিৎ উড্ডীয়মান বিস্তৃতপক্ষ গৃধ্রের ছায়ায় অন্তরালে সৈন্যগণ চিরনিদ্রায় মগ্ন। শরনিপাতকালে ব্যোমপথ বিরস শ্যেনপ্রতিরবের ছলে নিনাদিত হইতেছে। গৃধ্র-পক্ষ-বিধূত সমীরণ কর্ত্তৃক রাক্ষস-সৈন্যধ্বজা আকাশে আন্দোলিত হইতেছে।

শ্যেন ও গৃধ্র উভয়েই Accipitres জাতিভুক্ত; শ্যেন Falconপরিবার ও গৃধ্র vulturidæ পরিবারের অন্তর্গত। উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্ট শারী-রিক লক্ষণের প্রভেদ এই যে, শ্যেনের মস্তক ও গলদেশ পতত্রাবৃত, কিন্তু গৃধ্রের তাহা নহে। এই falconidæর মধ্যে এক শ্রেণীর পাখী দেখা যায়, যাহারা বৈজ্ঞানিকের নিকটে Gypætus barbatus বা Bearded Vulture নামে পরিচিত। অতএব কোন কোন স্থলে শ্যেন গৃধ্রের নামান্তর হইতে পারে। মহাকবি বর্ণিত শ্যেনের ও গৃধ্রের আচরণে বুঝা যায় যে, উহারা উভয়েই শব-ভুক্ শকুনি। শ্যেনের রব যে বিরস বা অত্যন্ত কর্কশ, সে সম্বন্ধে কাহারও সাক্ষ্য লওয়া অনাবশ্যক। রঘু-বংশে শ্যেনপক্ষের রঙের বর্ণনা পাওয়া যায়, শ্যেন-পক্ষপরিধূসর * * *। অমরকোষে আছে, "ঈষৎ পাণ্ডুস্তু ধূসরঃ।" শব্দার্ণবে দেখা যায়—ধূসরস্তু সিতঃ পীত-লেশবান্ বকুলচ্ছবিঃ। আবার, ধূসরঃ স্তোকপাণ্ডুরঃ,—ইতি অভিধানরত্নমালা। দেখা যাইতেছে যে, ধূসর ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ অথবা পীতলেশবান্ সিতবর্ণকে বুঝায়। এই সিতবর্ণ যে নিছক শুভ্র বা শ্বেতবর্ণ নহে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি; কোথাও বা শ্বেতের সহিত পীত, কোথাও বা অন্য কোনও বর্ণ অল্পবিস্তর মিশিয়া যায়। শ্যেন-গৃধ্রের বর্ণনায় পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিৎ whitish, brownish, black-tipped, ferruginous, rufous প্রভৃতি আখ্যায় এই সিতবর্ণের তারতম্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিবর্ণিত বিহঙ্গগুলি সম্বন্ধে আপাততঃ আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। রঘুবংশে যে মঞ্জুবাক্ পিঞ্জরস্থ শুককে দেখিতে পাই; যে চাতককে নির্গ-লিতাম্বুগর্ভ শরদ্ঘন প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না; যে বর্হিকে আবাসবৃক্ষোন্মুখ হইয়া বনভূমিকে শ্যামায়মান করিতে দেখা যায়; এবং কুমারসম্ভবে অভিজাতবাক্ গৌরীর কণ্ঠস্বর যে অন্যপুষ্টার কণ্ঠস্বরকেও প্রতিকূল ও কর্কশ করিয়া তুলিয়াছে; ও চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায় কণ্ঠ পুংস্কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বর স্মরের বচন বলিয়া

মনে হয়; তাহাদের জাতি, বর্ণ ও প্রকৃতিগত অনেক কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার সহিত এই সকল বর্ণনার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। এমন কিছু নূতন কথাও আসিয়া পড়িতেছে না যে, আবার প্রসঙ্গক্রমে কিছু বলা আবশ্যক হয়।

শৃঙ্গারতিলকে একটি নূতন পাখী পাওয়া যায়;—একোহি খঞ্জনবরো নলিনীদলস্থঃ। এই যে পদ্মপত্রের উপর খঞ্জন পাখী রহিয়াছে, ইহার ইংরাজি নাম wagtail। জলাশয়ের নিকটে ইহারা প্রায়ই বিচরণ করে। মিঃ ওটস্ লিখিয়াছেন—

"They (The Wagtails) frequent open land, fields and the banks of rivers and ponds, some of the species of yellow Wagtails being only found on marshy land."

অতএব খঞ্জন যে নলিনীদলস্থ দৃষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

বটতলার পুঁথি

রাজা তুমি রাজপাট করি কোথা ন্যস্ত
দীন বেশে হেথা এসে নিলে বানপ্রস্থ ?
সহসা সুলভ হলে—ছিলে মহা দুর্লভ।
হলে জনরঞ্জন, হলে বহুবল্লভ।
সব জীবে সম দয়া, বুঝাইতে মর্ম্ম
আপনি আচরি তুমি শিখাইছ ধর্ম্ম।
ঘরে ঘরে ফিরি তুমি বিতরিছ মুক্তি!
ধন্য তোমার ওগো জীবে অনুরক্তি।
অমিতাভ-দ্রুমতল করিলে হে ধন্য
কোন মহানির্ব্বাণ লভিবার জন্য ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পত্র

ওগো,

একটা কথা তোমাকে না বলে' কিছুতেই থাকতে পারছি নে। ভেবেছিলাম, তোমার নিঠুরতাকে জব্দ করার জন্যে, কিছুদিনের মত তোমার সঙ্গে সব কারবারই উঠিয়ে দিব। তোমার গোপন অভিসারের সমস্ত ইঙ্গিতই কৃত্রিম উদাসীনের ন্যায় উপেক্ষা ক'রে, বহু-প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নিব।

হায়! সেকি যে কিছুতেই চলবার নয় গো! তাই কৃতসঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিয়ে আবার ছুটে আসতে হল।

যাক্! আসল কথাটাই ভুলে গেলাম! এমনি বটে। নইলে কি আর তোমার সঙ্গে সংসার পেতেছি!

কথাটা ভুললাম কেন গো! পণ্ডিতে হয় তো বলবেন—তাই যদি মনে করতে পার—তো, ভুলে গেলাম ব'লে গোল বাধাবার কোনই দরকার হবে না।

পণ্ডিত যা বলেন বলুন গে। আমার তাতে এখন কোনই কায নাই; তোমারও যে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে—এ কথা অন্তত আমার কাছে অগোচর! নইলে সত্যি সত্যিই কারবার উঠে যেত।

কেন ভুল্লাম জান গো? তোমার কাছে আসলেই আমি আসলটা ভুলে যাই।

লুকোচুরি খেল্‌তে খেল্‌তে,যে ব্যক্তি কোন প্রকারে, অন্তত চোখ বুঁজেও, গুঁড়িটাকে ছুঁয়ে ফেল্‌তে পারে, সে ওই গুঁড়িটাকে এম্‌নি নিবিড়ভাবে আপনার ব'লে জানে, যে ওইটেকে হারাণ'র ভয় তার আর থাকে না। তুমি অবশ্য চঞ্চল, কিন্তু তাই ব'লে কি ছোঁয়ায় মর্য্যাদা একেবারে লোপ পাবে গো? কিছুক্ষণের জন্য তাই তো আমি আসলটা ভুলি।

তুমি যখন ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে, নৃত্য-দোদুল ভঙ্গিমায় ঘু'রে ঘুরে বেড়াও, তোমার গতি-লহরী আমাকে মুগ্ধ ক'রে দেয়! তোমার সহজ বিনম্র ভঙ্গি তোমাকে ছাপিয়ে ওঠে, তোমাকে ঘুমিয়ে তোমার চলাটাই সজাগ হয়, আমি যে তাতেই ভুলি গো, আসল আমার হাত-ছাড়া হয়ে যায়!

এমন আরও কত উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু দিয়ে লাভ কি? আসল কথাটা হচ্ছে, নিবিড়তার মধ্যে যখন তোমার সন্ধান পাই, তখন যা বলব বলব ক'রে গুমরে মরেছি, সেই কথাটিই আমার বলা হয় না। তুমিই আসল, কি আসলই তুমি, তুমিই আমার কি আমিই তোমার, এসব "পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র" সন্ধানকারীদের বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

আসল কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, তাই আর তোমাকে আজ কিছু বলব না। যেদিন দুই আসল এক করে দেখব, সেদিন আবার একপত্তন বোঝাবুঝি হবে। আজ থাক্‌।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গমহিলার বদরিকাশ্রম-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮ই বৈশাখ—ভোর ৫টায় গোলাপ চটি ছাড়িয়া বেলা ৯টার সময় আমরা রুদ্রপ্রয়াগে পৌছিলাম। এই দুই মাইল পথ ভয়ানক চড়াই উৎরাই। এখানে পৌছিয়া দেখিলাম একটিও চটি খালি নাই, লোকে ভরিয়া গিয়াছে। এখানেও কালী-কমলীওয়ালার ধরমশালা আছে, আমরা তাহাতেই আড্ডা লইলাম। কত রকম কত দেশের যাত্রী সেই ধরমশালায় জমা হইয়াছে; সারি সারি রান্না করিতে বসিয়া গিয়াছে। যাত্রী আসিতেছে—রান্না করিতেছে, আহারাদি শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে—সেও এক অপরূপ দৃশ্য। আমরা একটি বারাণ্ডার এক অংশে স্থান পাইলাম। সেইখানে জিনিষ-পত্র সব রাখিয়া এবং একজন পাণ্ডাকে রাখিয়া আমরা সঙ্গমে স্নান করিতে যাইলাম।

প্রায় সিকি মাইল নিচে নামিয়া তবে সঙ্গমস্থান। খালি পাহাড়, পাথরে পাথরে পা রাখিয়া লাঠির উপর ভর দিয়া দিয়া আস্তে আস্তে নিচে নামিলাম। এসকল স্থানে লাঠি ছাড়িয়া এক পা চলা যায় না। নিচে নামিয়া সঙ্গমের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আবার দেখিলাম। কি ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া একদিক হইতে অলকানন্দা এবং অপর দিক হইতে মন্দাকিনী ছুটিয়া চলিয়াছেন! কি উত্তাল তরঙ্গ! ঠিক সমুদ্রের তরঙ্গের মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছেন, কুটা পড়িলে চূর্ণ হইয়া যায়। এখানে অলকানন্দার জল একটু ঘোলা, কিন্তু মন্দাকিনী স্বচ্ছ নীল, দুই দিক হইতে দুই ধারা আসিয়া পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে। এত গর্জ্জন যে তীরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়ানো শুনা যায় না। কাণের কাছে মুখ আনিয়া

পাওয়া মন্ত্র পাঠ করাইতে লাগিলেন। দেবপ্রয়াগ হইতে এখানে অনেক বেশী ঢেউ। সেখানে দুই একটা মাছ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এখানে সে সকল কিছুই নাই। জল শত শত হাত উচ্চে উঠিতেছে পড়িতেছে। কি ফেনময়! দেখিয়া দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, আপনার বলিতে যে যেখানে আছে সকলকে ডাকিয়া দেখাই যে ভগবানের কি অনন্তলীলা কি বিশ্ব রচনা!

সকল যাত্রীই পাথরের উপর বসিয়া ঘটি করিয়া জল তুলিয়া স্নান শেষ করিতে লাগিল। আমরাও তাহাই করিলাম। দুই একজন বলবান পুরুষ দেখিলাম হাঁটু জলে নামিয়া ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। স্নান দান করণীয় কার্য্য সকল শেষ করিয়া, উপরে উঠিয়া আমরা বিদুরের তপস্যার স্থান দেখিতে গেলাম। সঙ্গমস্থান হইতে সোজা একটি পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতে হয়। এখানে রুদ্রেশ্বর মহাদেব আছেন, তাই এইস্থানের নাম রুদ্রপ্রয়াগ। এই স্থানের সঙ্গম দেখিলে দেবাদিব মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তিই মনে হয়, যেন মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন।

ধরমশালায় ফিরিয়া আসিয়া একটু একটু সরবত ও কিছু প্যাড়া দিয়া জলযোগ সারিয়া, বেলা ৪টার সময় আমরা আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। ক্রমাগতই উপরে উঠিতেছি, কি ভয়ানক চড়াই, কি সঙ্কটময় পথ—এ পথের বর্ণনা হয় না। যে না দেখিয়াছে সে কখনও কল্পনাও করিতে পারে না। কিছু দুর উঠিবার পরই অলকানন্দা অদৃশ্য; বামদিক দিয়া মন্দাকিনী ঠিক নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিতেছেন দেখা গেল। আমরা কখনও পর্ব্বতশৃঙ্গে, কখনও একটু নিচে—এইরূপ ভাবে যাইতেছি। পাঁচ মাইল এইরূপ আসিবার পর "ছতলী চটি"—এইখানেই আজ রাত্রিতে থাকা হইবে স্থির হইল।

চটিতে আসিয়া সকলেই কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। আজ আমি অসুস্থ। রাত্রিতে কিছুই খাইলাম না, কম্বল ঢাকা দিয়া চুপচাপ শুইয়া রহিলাম। কিছুকাল পরে একদল যোধপুরী আসিয়া আমাদের চটিতেই উঠিল। নিজেদের বন্দবস্ত সব ঠিক করিয়া লইয়া এক প্রবীণা আমার কাছে আসিয়া বসিলেন এবং কত রকম গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শাশুড়ী বৌয়ে এই সব লোকজন লইয়া আসিয়াছেন, বাটির পুরুষেরা কেহই আসেন নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক গল্প করিলেন এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলাম, আজ আমি বড়ই অসুস্থ বোধ করিতেছি, আজ নয়, আবার যে দিন কোনও চটিতে দেখা হইবে সেই দিন নিমন্ত্রণ লইব। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ আলাপ হইয়া গেল এবং আমাকে তিনি দিদি বলিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে আমি আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলাম। তখন তাঁহার সংসারের অনেক সুখ দুঃখের কথা বলিলেন। তিনি এই বয়সে বিধবা হইয়াছেন, একটি মাত্র পুত্র, তাঁহারা যোধপুরের রাণার ঘরাণা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার সঙ্গিনীদের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই, সকলে আলুভাতে ভাত রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়া তাঁহারাও আমাদের সহিত গল্পে যোগ দিলেন। তাঁহাদের খাদ্য প্রস্তুত হইলে তাঁহারা উঠিয়া যাইলে আমরা শুইয়া পড়িলাম।

১৯শে—প্রভাত ৫টা। আমরা ছতলী চটী ছাড়িলাম। ক্রমেই উপরে উঠিতেছি। কখনও ভয়ানক 'চড়াই,' কখনও 'উৎরাই'—এইরূপ চলিতেছে। রাস্তার ভীষণতা ক্রমেই বাড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খানি গ্রাম দেখা যাইতেছে, সেই সেই স্থানের পথটা একটু ভাল। বামদিক দিক দিয়া মন্দাকিনী একই ভাবে চলিতেছেন। আমরা যতই উপরে উঠিতেছি, ততই গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।

এই রূপ ৪ মাইল আসিয়া 'রামপুর চটী'। কত উচ্চে আমরা—আর পাতালভেদিনী মন্দাকিনী, কিন্তু তাঁহার গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়াছে। এইখানে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইয়া আবার চলিলাম। কিছুদুর আসিয়া দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখি, এক পাহাড় হইতে প্রবল বেগে ঝরণার জল আসিয়া

পাতাল ভেদ করিয়া মন্দাকিনীর সহিত মিলিতেছে। সেও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এই স্থান হইতে আরও এক মাইল উপরে পর্ব্বত-শৃঙ্গে একটী ভগ্নস্তূপের ভিতর মহাদেব আছেন। মন্দিরটীর ভগ্নাবস্থা,বহুকালের পুরানো বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে বোধ হয় কোনও সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল, এক্ষণে এইরূপ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। আর একটু আগে একটী পর্ব্বত কুটীরে কোনও সাধুর চীর আসন অবধি রহিয়াছে, কিন্তু কেহই নাই। ইহার পার্শ্বেই আর একটী শৃঙ্গের গাত্রে একটী সুরঙ্গ গহ্বরের সম্মুখে একটু বাঁধানো দরজার মত, কিন্তু এত ছোট যে মাথা হেঁট করিয়া ভিতরে যাইতে হয়। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, ক্রমে অন্ধকারময় সুরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। কতদূর গিয়াছে; কিন্তু গহ্বরের ভিতর কোনও মহাত্মা ধ্যানমগ্ন আছেন কিনা তা জানি না। তবে এই স্থানটী দেখিলে মনে হয় যেন মনুষ্যের সমাগম আছে। আমরা আরও উপরে উঠিয়া, ঠিক অপর পার্শ্বে নামিতেই সম্মুখে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। একান্ত সমতল, এবং সবুজ ঘাসপূর্ণ উপত্যকা। এই পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে এত বড় প্রশস্ত ঘাসপূর্ণ জমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

এই স্থান হইতে কত উচ্চনীচ অসমতল পথ পার হইয়া আমরা অগস্ত্য আশ্রম দেখিতে যাইলাম। মহামুনি অগস্ত্য ও পরে ঋষ্যশৃঙ্গ এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য পুরাকালে কথা। কিন্তু এখানে সাধু মহাত্মাগণের আশ্রম ছিল তাহার সন্দেহ নাই; তাঁহাদের সিদ্ধাসন সকল রহিয়াছে। কি সুন্দর নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ স্থান! এইখানে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুষারে আবৃত দেখা যায়। এই বদরীর পথে চলিতে চলিতে এবং পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হইয়াছে যে, এই আশ্চর্য্য বিশ্বরচনা যাঁহার, না জানি তিনি কেমন! এই রাস্তা পরিস্কার করবার হাঙ্গামায় আজকাল এই সকল জঙ্গল ও ভগ্নস্তূপের ভিতর মানুষের আমদানি হইয়াছে। তাহারা কতকগুলি পাথরের নুড়ী জড় করিয়া যাত্রীদের কাছ হইতে পয়সা লইবার জন্য বড়ই বিরক্ত করে, ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না।

আশ্রম দেখিয়া আমরা উপরের দিকেই চলিতেছি। যতই উপরে উঠিতেছি, দেখিতেছি অসংখ্য ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে খাদ্যদ্রব্য চলিয়াছে। এই সকল পথে অন্য কোনও উপায়ে খাদ্যদ্রব্য যাইবার উপায় নাই, ছাগল ভেড়াই ভরসা। আর একটী ব্যাপার দেখিতেছি যে, এ দেশী লোকেরা এই সকল ঝরণা বা নদীর জলের প্রবল বেগের দ্বারা গম, যব প্রভৃতি পিষিয়া লইতেছে। এক একটি কাঠের ভেলার মত করিয়া জাঁতার তলায় যোগ করিয়াছে, তাহার জোরে তাহাদের হাতের তৈরী কল ঘুরিতেছে, উপরে শস্য পিষা হইয়া যাইতেছে।

এই স্থানের এক একটী পাহাড়, সুধু ছোট বড় গোল গোল নুড়ী ও মাটী মিশানো—দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে ইঁহারা এক সময়ে জলের ভিতরই ছিলেন। এখন মাথা তুলিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছেন। এই স্থানের এক একটা চড়াই এত ভয়ানক যে, উঠিবার সময় মনে হইতে লাগিল বুকের হাড় বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই সকল স্থানে দাণ্ডি ঝাপান কিছুই চলে না। আমরা একগাছি লাঠিতে ভর দিয়া এক পাথর হইতে অপর পাথরে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিলাম—সে এক রকম গড়াইতে গড়াইতে যাওয়া। এইরূপ করিয়া চলিয়া আমরা এক নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেই নদীও ঠিক এইভাবে লাঠিতে ভর দিয়া পাথারের উপর পা রাখিয়া রাখিয়া পার হইতে হইল। বড়ই কষ্টে আমরা এই নদী পার হইলাম। জল খুব বেশী নয়, এক হাঁটু, কিন্তু জলের ভিতর এক এক স্থানের পাথর সকল ভয়ানক পিছল। যদি পা কিম্বা লাঠি পিছলাইয়া যায়, তা হইলে পাথরে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গার সম্ভাবনা।

এই নদী পার হইয়া আবার একটী দড়ির ঝোলা, তবে পূর্ব্বের মত অত লম্বা বা ভয়ানক নয়।

এইটী পার হইয়া কিছু দূর গিয়া একটি চটী পাওয়া গেল। চটীর নাম চন্দ্রাপুরী। এবেলা এই খানেই স্নানাহার স্থির করা গেল। রান্না হইল কচু কাঁচকলার ঝোল, আর ভাত।

একটু বিশ্রাম করিয়া বিকালে ৫টায় আমরা এ চটী ছাড়িলাম। অল্প দূর আসিবার পরই হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা তখন অতি ভয়ানক স্থানে আসিয়াছি। ঝম্পানীরা আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, "ফুর্ত্তী করো ফুর্ত্তী করো পাথর গিরেগা।" অর্থাৎ আমরা যে পাহাড়ের গর্ভ দিয়া চলিতেছি, তাহার উপর হইতে ঝড়বৃষ্টির বেগে ছোট বড় পাথর সকল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িবে। পূর্ব্বের বৃষ্টিতে সেই পাহাড়ের এক অংশ এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং এখনও যে ভাবে আছে, দেখিলে বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়। একবারে রাস্তা পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া পাতালবাহিনী মন্দাকিনীর সহিত মিশিয়াছে। এক হাত মাত্র স্থান আছে, অতি কষ্টে অতি সাবধানে তাহার উপর পা রাখিয়া, একহাতে পাহাড় গাত্র ও এক হাতে লাঠি লইয়া সেই অতলগর্ভ খাদ পার হইলাম। ঝড়ের বেগে যদি কেহ নিচে পড়িয়া যায়, ত সেই মুহূর্ত্তেই তাহার চিহ্ন লোপ হইয়া যাইবে। উপর হইতে পাথর গড়াইয়া পড়িতেছে, ঝড়ের বেগে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে এখনি নিচে পড়িয়া যাইব। এইরূপ সব পথে ঝাপানীরা বা পাণ্ডারা কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। তবে তাহারা পিছু পিছু আসে (পাশে দাঁড়াইবার ত স্থান নাই) এবং ক্রমাগত সাবধান করিতে থাকে যে উপরে বা নিচের দিকে চাহিও না, তাহা হইলেই পড়িয়া যাইবে, খালি আপনার পায়ের উপর চোখ রাখিয়া চল।

এই অবস্থায় এইরূপ দুই মাইল পথ আমরা আসিলাম। এই দুই মাইল চড়াইও অতি ভয়ানক। এই ভয়ানক রাস্তা পার হইয়া সকলেই "জয় বদরী বিশাল লালকী জয়" বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সকলেই মনে করিল যেন এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। আরও এক মাইল পথ যাইতে হইল, সেও খুব খারাপ পথ, তবে এরূপ সাংঘাতিক পথ নয়। সে পথ পার হইয়া খুব বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটী চটীতে আসিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক জোরে বৃষ্টি আসিল। ওঃ—কি বৃষ্টি ও ঝড়!

রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গমের ধারে দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, ভগবানের রুদ্র-রূপই দেখিতেছি বটে। আর আজ যেন ভগবানের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি দেখিলাম। কি ভয়ানক স্থান, কি ভয়ানক জীবের অবস্থা, কি ভয়ানক দৃশ্য! এই সময়ে মনে হইল যে যাহাদের কাঁদিবার কেহ নাই, তাহারাই এ পথে আসিতে পারে; যাহাদের সব আছে তাহাদের আসা উচিত নয়। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে বদরী তীর্থ সাধু সন্ন্যাসীদের জন্যই—গৃহীর জন্য নয়। কথাটাও ঠিক। গৃহীরা এই সকল অবস্থার ভিতর পড়িলে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়েন। আমাদের সঙ্গীদের ভিতর অনেক সময়ে ঐ অবস্থা ঘটিত। এখানে আসিলে মৃত্যুকে সর্ব্বদাই সঙ্গ সঙ্গে দেখিতে হয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি যে আমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমি এবং আমার ভগিনীর কন্যা আমরা বাবা বদরীনাথকে বলিয়া আসিয়াছি যে, "আবার আমাদের লইয়া আসিও ঠাকুর, আবার আসিব, তোমার এই অনন্ত রূপ দেখিবার জন্য।" কিন্তু বাকী সকলেই বলিয়া আসিয়াছেন, "আর আসিব না বাবা! এরূপ ভয়ঙ্কর স্থান জানিলে কি আমাদের ছেলেরা আমাদের আসিতে দিত?"

এই চটীর নাম 'ভীমচটী'। আমি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া বসিয়া বসিয়া লিখিতেছি, সম্মুখে অনন্ত তুষার শ্রেণী দেখা যাইতেছে বৃষ্টিও প্রবল বেগে পড়িতেছে, নীচে মন্দাকিনীর গভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে—ঠিক যেন সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি অবিরাম

—তাহারই তরঙ্গভঙ্গ দেখিতেছি। আর পিছন হইতে সঙ্গিনীদের বিছানা পাতা লইয়া ঝগড়া চলিতেছে তাহাও শুনিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে দেখিতেছিও। সকলেই ঝড় বৃষ্টি পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত, সকলেই চাহেন যে চটীর যে স্থানটী একটু ভাল বা একটু ঢাকা, সেই স্থানটীতেই শুইবেন, কাযেই মধ্যে মধ্যে গোলযোগ হইত। বিছানা পাতা শেষ হইল আমার লেখাও শেষ হইল, বৃষ্টিও প্রায় থামিয়া আসিল; আমরাও দেখিতে বাহির হইলাম। এখানে মহাবীর ভীম কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এক হাতে গদা, অন্য হাতে যুদ্ধশঙ্খ, বনবেশধারী, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চীরপরিহিত। দেখিয়া চটীতে ফিরিলাম। আজ এইখানেই রাত্রি বাস। খাওয়া হইল—ছোলা ভাজা ও গুড়। আজ পথশ্রমে সকলেই কাতর, কেহই খাদ্য প্রস্তুত করিতে রাজী হইলেন না। আমাদের সঙ্গের চাকরগুলিও নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে চাহিল না; কাযেই সেই চটীতে যাহা পাওয়া গেল তাহাই খাইয়া শুইয়া পড়া গেল।

প্রথম প্রথম এই পথে চলিতে বড়ই কষ্ট হইত, শরীরও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই পথ চলা অভ্যাস হইয়া যাইতে লাগিল। বিশেষ ভয়ানক পথ না হইলে আর তত কষ্ট হইত না, এবং অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিলেই শ্রান্তি দূর হইয়া যাইত। কাল আমি যেরূপ অসুস্থ হইয়াছিলাম, বাড়ীতে হইলে হয়ত আমি দুই তিন দিন বিছানা হইতে উঠিতে পারিতাম না; কত পথ্যের দরকার হইত। কিন্তু এখানে সমস্ত দিনরাত্রির উপবাস ও ক্লান্ত অসুস্থ শরীর লইয়াই ভোরে বাহির হইলাম। এইরূপ কষ্টকর পথ ও ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া হাঁটিয়া চলিলাম, কৈ আর ত কিছুই হইল না, আপনিই সব ভাল হইয়া গেল। জানিনা জল হাওয়ার গুণে বা মনের বলে।

২০শে, ভোর ৪৷৷০ টা। আমরা ভীম চটী ছাড়িয়া বাহির হইলাম। রাত্রিতে খুব শীত বোধ হইয়াছিল, দার্জ্জিলিঙের নবেম্বরের শীতের মত। ক্রমেই উপরে উঠিতেছি। সকালেও আজ খুব শীত বোধ হইতেছে, হাত পা শীতে কনকন করিতেছে। রাস্তা ভয়ানক চড়াই, উঠিতে বুকে লাগিতেছে। একটু আসিয়াই দেখা গেল, কালিকার ঝড়বৃষ্টিতে পাহাড়ে রাত্রে এক প্রকাণ্ড ধ্বস নামিয়া গিয়াছে, রাস্তা নাই। সেই ধসা পাহাড়ের গা ধরিয়া, লাঠি পুঁতিয়া দিয়া দিয়া অতি সাবধানে সেই বারো চৌদ্দ হাত স্থান পার হইলাম। আরও একটু আসিয়া আবার আমরা দাঁড়াইলাম! দেখিলাম, এখানেও রাস্তা নাই, রাত্রে বৃষ্টিতে ঝরণা প্রবল হইয়া রাস্তা বন্ধ করিয়াছে, উপর হইতে প্রায় ১৪।১৫ হাত চওড়া হইয়া প্রবল বেগে গভীর গর্জ্জনে জল নিচে পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় পাথর সকল খসিয়া পড়িতেছে এবং নদীর মত আকারে বহিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া নিচে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিশিতেছে। মাথার উপর সহস্র সহস্র ধারা লইয়া সে পথ পার হওয়া গেল—নিচে জল উপরে জল।

এইবার গভীর জঙ্গল দেখা গেল। ক্রমেই সোজা খাড়াই। এক এক স্থানে এরূপ গভীর জঙ্গল যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই গভীর জঙ্গলে যুগ-যুগান্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, তাহার উপর পাতা সকল জড়াই যায় অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছে। অন্য শব্দ মাত্র নাই, কেবল পাতাল-ভেদিনী মন্দাকিনীর গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া যাইতেছে। এইরূপ তিন মাইল। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল যেখানে একটু কম, সেই স্থান হইতে অল্প আলো এবং তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। এই স্থানেই ভগবান তুঙ্গনাথের মন্দির। এই মন্দির এবং এই পাহাড় অগ্রন বরফে ঢাকা, এখনও যাত্রী যাইবার মত হয় নাই—অর্থাৎ বরফ বিন্দুমাত্রও গলে নাই। বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে তবে পাণ্ডারা বরফ কাটিয়া পথ তৈরী করে এবং মন্দিরের দরজাটুকু মাত্র কাটিয়া দর্শন করায়। আমাদের উপরে উঠিয়া দেখা হইল না। তাঁহার ভোগমূর্ত্তি—যাহা নীচে আছে—তাহাই দেখা হইল।

এখান হইতে আধ মাইল নিচে নামিয়া একটী চটী

পাওয়া গেল নাম, কুণ্ড চটী; এইখানে আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। কারণ ঝাপানীরা বলিতে লাগিল এইবার ভয়ানক চড়াই। আরও বলিল, এই ভয়ানক চড়াইয়ের একমাইল পর্য্যন্ত কোনও ঝরণা বা নদী নাই। সেটা আরও ভয়ানক। এই সকল পথে চলিতে চলিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই বুক শুকাইয়া যায়, জল নাই শুনিলেই ভয় হয়।

এইবার চড়াই আরম্ভ হইল। ওঃ কি ভয়ানক, ঠিক সোজা উঠিতেছি। এই পথে মানুষের হাত পড়ে নাই। কোথাও তিন হাত কোথাও আড়াই হাত প্রশস্ত পর্ব্বত গাত্র দিয়া চলিতে বা উঠিতে হইতেছে। মানুষ যতদূর পর্য্যন্ত পারিয়াছে করিয়াছে, যেখানে হাত চালাইবার উপায় নাই অগত্যা ছাড়িয়া দিয়াছে।

পাহাড়ের বুকে যখন উঠিয়াছি, তখন প্রথম সূর্য্যোদয় দেখা গেল। এখন বেলা ৮ টা। যতই উপরে উঠিতেছি ততই জঙ্গল কম। কিন্তু নানা রকম ফলের গাছ সকল দেখা গেল। আর দেখিলাম দয়াময়ের কি অনন্ত দয়া। এই জনশূন্য স্থানে জীবের কষ্ট নিবারণের জন্য অসংখ্য 'রাস্‌বেরি'র গাছে ফল সকল পাকিয়া রহিয়াছে। তৃষ্ণায় গলা ও বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে, সেই ফল তুলিয়া মুখে দিয়া চলিতেছি, কষ্ট ও তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে। এই স্থানের এইদৃশ্য দেখিয়া অমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনে হইল, দয়াময় এত দয়া তোমার, জীবের কষ্ট নিবারণের জন্য এই পথে তুমি অনন্ত অমৃত ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছ, আবার আরও সঙ্কটময় পথে চলিবার কষ্ট নিবারণের জন্য হাতের কাছে কাছে সুমিষ্ট ও তৃষ্ণা নিবারক ফল সকল তুলিয়া দিতেছ! অন্ধমায়াছন্ন জীব আমরা, এত দেখিয়াও তোমাকে ভুলিয়া যাই, বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারি না!

একটু আগে শীতে হাত বাঁকিয়া যাইতেছিল, কলমটা অবধি ধরিতে পারিতেছিলাম না, আর এখন এই চড়াইয়ে উঠিতে উঠিতে কাপড় সকল ঘামে ভিজিয়া যাইতেছে। নিচে চটিতে যখন বিশ্রাম করিতেছিলাম, তখন পাহাড়ের উপর দিয়া যাহারা যাইতেছিল, তাহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন কতকগুলি পুতুল সারি সারি চলিয়াছে; এবং ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া উহারা অত দূরে অত উপরে উঠিয়াছে! অমরা এখন প্রায় মাঝামাঝি আসিয়াছি; একখানা পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি ও লিখিয়া লইতেছি। আমার সামনে দিয়া অসংখ্য ছাগলের পিঠে খাদ্যদ্রব্য যাইতেছে। এইটুকু রাস্তায় যখন ছাগশ্রেণী চলিতেছে, তখন পথ একবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আর একটী বড়মজা দেখিতেছি—যাহারা ছাগল লইয়া যাইতেছে, তাহারা ঠিক পাখীর মত স্বরে শিস্ দিতে দিতে যাইতেছে। তাহাই শুনিয়া যে সকল ছাগল পিছনে পড়িয়াছে, তাহারা বন জঙ্গল ভেদ করিয়া ছুটিয়া দলে আসিতেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে বনের পাখীরাও ঐরূপ সুন্দর স্বরে শিস্ দিতেছে। পাখীরাই মানুষের দেখিয়া শিখিয়াছে কি মানুষেই পাখীদের নিকট শিখিয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু বড় সুন্দর, বড়ই আশ্চর্য্য লাগে। যাই উহারা শিস্ দিতে আরম্ভ করিল, আর চারিদিক হইতে অসংখ্য পাখীসকল বনভূমি প্লাবিত করিয়া ঐরূপ মিষ্টস্বরে গান ধরিল।

আবার চলিতেছি, আর উপরে সামনে বরফ ক্রমেই বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। মা কলনাদিনীর কলরবও একটু একটু শুনা যাইতেছে। উঃ—আজ আমরা এ কোথায় উঠিয়াছি! নিচে দিকে আর চাওয়া যায় না! ঠিক এই স্থানেই একটা সঙ্কটময় খাদ পার হইলাম। এই পথে চলিতেছি, আর কি যাত্রী কি এ দেশী লোক সকলেই বলিতেছে "জয় বদরী বিশাল লালকী জয়", "জয় কেদার নাথকী জয়—" আর মনে যেন আনন্দ ও শরীরে বল, আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে গরুড়ের নাম করিা শরীরের বল প্রার্থনা করিতেছে ও বিপদ হইতে রক্ষা কর বলিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে। এই পথে মধ্যে মধ্যে গরুড়ের মূর্ত্তি স্থপিত আছে।

আরও উপরে উঠিলাম, ঠিক সম্মুখে পাহাড়ের চূড়ায় এ কি দৃশ্য হঠাৎ খুলিয়া গেল। এ কি ধবলাকার অনন্ত তুষাররাশি আমাদের সম্মুখে অর্দ্ধ-

চন্দ্রাকারে দাঁড়াইয়া সূর্য্যালোকে জ্বলিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া কবিতার এই অংশটুকু মনে পড়িল—"তুষার ধবল শির ছেলেখেলা পৃথিবীর ভ্রুক্ষেপে যেন সব করিছে দর্শন।" যত দূর দেখা যাইতেছে, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অনন্ত তুষার রাশি! মনে হইল এ কি সৌন্দর্য্য তোমার কেদারনাথ! তাই কি তোমার রূপ ধবলাকার বলিয়া বর্ণিত? অলকানন্দা মন্দাকিনী তোমার শির হইতে জটাশ্রেণীর ন্যায় শত শত ধারায় বহিয়া চলিয়াছেন। এই স্থানে আসিয়া সকল যাত্রীরই মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল, সকলেই ভগবানের নাম লইয়া, কেহ কেহ গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত সকল যাত্রীই যেন তন্ময় ভাবে চলিতে লাগিলেন, কেহ কাহারও সহিত একটী কথাও কহিতেছিলেন না। সে কি দৃশ্য, কি ভাব, তাহার বর্ণনা হয় না। কোন কবিও পারেন কিনা সন্দেহ, আমরা ত অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক!

আরও কিছু দূর আসিয়া সম্মুখে এক বিপদ দেখা গেল। তখন প্রাণের ভয়ে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উপরের পাহাড় হইতে বড় পাথর সকল অনবরত যাত্রীদের উপর পড়িতে লাগিল। সকলেই প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। পাহাড়ীরা "মহাবীর কৃপা কর কৃপা কর" বলিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিল। স্তবস্তুতি দ্বারাই হউক, বা অনেক গোলমাল চীৎকার শুনিয়াই হউক, কিছুক্ষণ প্রস্তর বর্ষণের পর ঠাণ্ডা হইয়া মহাবীর চুপ করিলেন। তবে আমরা সেই পথ পার হইতে পারি। পাহাড়ীরা বলিল, "এই স্বরগ হ্যায় মা, বহুৎ তকলিপসে হিয়া আনে হোতা।"

আমরা গুপ্তকাশী আসিয়া পৌছিলাম। এখানে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর সঙ্গম-কুণ্ডে স্নান করিলাম। কুণ্ডের দুই দিকে দুইটী পিতলের মুখ দেওয়া আছে। একটী গরুর ও একটী হাতির মুখ। এই দুই মুখ দিয়া দুই ধারা আসিয়া একটী বাঁধানো পাথরের কুণ্ডের মধ্যে পড়িতেছে। জল কি ঠাণ্ডা, বরফ গলিয়া আসিতেছে কি না! ঠিক সামনের মন্দিরে বিশ্বনাথ ও রূপার গৌরী মূর্ত্তি। পাশের মন্দিরে অতি সুন্দর হাস্যময়ী গৌরী মূর্ত্তি ও গৌরীশঙ্কর মহাদেব আছেন। এই স্থানে আমরা তীর্থের করণীয় কায সকল শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

আজ খুব খাওয়া হইল—কড়াইয়ের ডালের খিচুড়ী ও আলু ছেঁচকি। আহারাদির শেষ হইলে সকলে একটু গল্প যুড়িলেন। আমি বাহিরে আসিয়া বসিয়া এই স্থানের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম। ঠিক সম্মুখে তুষারাবৃত পাহাড়। কি সুন্দর দেখাইতেছে! শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে—যতদূর দৃষ্টি চলে। ভীম চটী হইতে গুপ্তকাশী ছয়মাইল, ভোর ৪ টায় বাহির হইয়া আমরা ৯॥০ টায় এখানে পৌছিয়াছি।

এইবার বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। পথ, বাড়ী সমস্তই ক্রমে বরফে আবৃত হইয়া আসিতেছে—বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি, আর মনে হইতেছে, আগ্রা দিল্লী ইত্যাদি দেখিয়াছি, স্থানে স্থানে শিল্প কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যও হইয়াছি, কিন্তু সে সকল শিল্প ও সৌন্দর্য্য মানুষের হাতের তৈরী—তাহা এমন মহিমান্বিত নহে।

২১শে ভোর ৫টা।—আমরা গুপ্তকাশী ছাড়িলাম। চারি মাইল খালি উৎরাই, আধ মাইল অন্তর একটী একটী বড় বড় গ্রাম ও চটী, স্থানে স্থানে দেব-মন্দির। মন্দিরগুলির প্রায়ই ভগ্নাবস্থা। একটী মন্দিরে ললিতা দেবী আছেন, পাশেই নারায়ণের মন্দির। যতই নিচে নামিতেছি, ততই জঙ্গল বাড়িতেছে, কিন্তু বনেরও কি অপূর্ব্ব শোভা! কি সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, যেন বনভূমি আলো করিয়াছে। কত রকম কত রঙের ফুল, এই সকল ফুলের গন্ধে বন আমোদিত হইতেছে; কত রকম ফলের গাছে কত ফল ধরিয়াছে। এই ফল ফুলের শোভা দেখিতে দেখিতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ চারি মাইল আসিলাম। এইখানে একটু বিশ্রাম করা হইল, কারণ আবার চড়াই উঠিতে হইবে।

চড়াই আরম্ভ হইল, সেই ভয়ানক চড়াই। সকলেই একটু করিয়া উঠে, আর কেদারনাথের জয়ধ্বনি করে; আবার উঠে। একে ভয়ানক চড়াই, তায় বরফের উপর দিয়া

চলিতে হইতেছে, স্থানে স্থানে এত বরফ যে পা ঠিক রাখা যায় না। ঝাপানিরা "জয় কেদার,রাস্তা সিধা করো রসি ফেংকো, উঠা লেও" বলিতেছে, আবার খানিক জোরে চলিতেছে। তাহাদের তখনকার চেহারা ও মনের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে তাহাদের জন্য যেন সত্যই কেদারনাথ রাস্তা সিধা করিয়া দিতেছেন ও রসি ফেলিয়া তাহাদের উঠাইয়া লইতেছেন। ভগবানের উপর কি নির্ভর! আবার কখনও বলিতেছে, "বম্ পিয়ারে, লেও উড়ায়ে, আকাশ পথ, কেদার ধাম"—যেন ভালবাসা ও আবদার মিশানো প্রার্থনা। সেই ভয়ানক স্থানে সেই সময়ে তাহাদের মুখে এই সকল কথাগুলি শুনিলে মন যে কিরূপ হয় তাহা লিখিয়া বা বলিয়া বোঝানো যায় না। মনে হয় তাহারা যেন দেখিতেছে বুঝিতেছে যে কেদার তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন, বিপদ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন, তাহাদের কথা ও প্রার্থনা সকল শুনিতেছেন, ও ঠিক পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন অতএব ভয় বা ভাবনা কিসের? তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া সত্যই যাত্রীদের মনেও ভগবানের প্রতি নির্ভরতা আসে, সেই জন্যই এরূপ দুর্গম পথে যাত্রীরা চলিতে পারে। একটী গল্প বলি। আমাদের সঙ্গেই এক-দল পাঞ্জাবী যাইতেছিল। তাহাদের ভিতর একটী ১০ বৎসরের শিশু, সেও চলিয়াছে। যখন আর চড়াই উঠিতে পারিতেছে, না বরফে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছে, তখন অতি কাতরে তাহার পিতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে-'আউর সেকেগা নেই মা'—আর তাহার চোখে জল আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশী লোকেরা বলিতেছে, "ডর কেয়া বেটা, বল কেদারনাথকী—জয়।" সমস্ত যাত্রীই বলিতেছে—তাহা-দের সহিত বালকও সমস্বরে তাহাই বলিতেছে, এবং পরক্ষণেই খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া সেই চড়াই উঠিতেছে—মুখে হাসি দেখা যাইতেছে। ভগবানের নামের এতই শক্তি! দুই একবার এইরূপ দেখিবার পর আমি তাহাকে আমার ঝাপান ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, "বাবা, তুমি ইহাতে যাও আমি তোমার সঙ্গে চলিয়া যাইতেছি।" তাহার পিতা মাতা বা বালক কিছুতেই রাজী হইল না। বালক আমাকে বলিল, "আউর কুছ ডর নেহি মাতা, কেদার হামকো লে চলতে হেঁ, হাত পাকড়কে উঠাতে হে।" এই কথা বলিতে বলিতে হাসি মুখে বালক সেই ভয়ানক বরফ মণ্ডিত চড়াই ভাঙ্গিয়া আমাদের আগে আগে চলিয়া গেল। খালিমুখে বলিতেছে 'জয় কেদারনাথকী জয়'। কত-দূর হইতে তাহার এইস্বর শুনা যাইতে লাগিল। তখন আমার মনে হইল বালক ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছে আর তাহার ভয় বা কষ্ট কোথায়। এই বালকের সঙ্গ-লাভ হওয়াতে আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল ও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বহুদূর হইতে তাহার স্বর মাত্র আমার কাণে আসিতে লাগিল, আর আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতে ছিলাম না। এক এক বার মনে হইতে ছিল, আমার নারায়ণই এই বালক বেশে ভগবানের উপর কিরূপ ভাবে নির্ভর করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়া গেলেন।

ছোট বেলায় পড়িয়া ছিলাম, স্বামী কর্ত্তৃক নানা রূপে উৎপীড়িত হইয়া মীরাবাই গঙ্গায় দেহ বিসর্জ্জনের জন্য যাইতেছিলেন, পথে রাখাল বালকের বেশ ধরিয়া আমার শ্যামসুন্দর আসিয়া তাঁহাকে বলেন—"মরবি কেন মা, বৃন্দাবনে যা," বলিয়া সেই রাখাল বালক বেশেই নিজে তাঁহাকে বৃন্দাবনে পৌছিয়া দেন। সেই সময়ে আমার সেই কথাই মনে হইতে লাগিল। আমি আর পথ দেখিতে বা চলিতে পারিতে ছিলাম না, কাজেই ঝাপানে উঠিয়া বসিলাম। বাকী পথটার দৃশ্য ইত্যাদি কিরূপ দেখিয়াছি জানি না। দূর হইতে বালকের জয়ধ্বনি, আমার কাণে ক্রমে নূপুর ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। ঝাপান নামাইয়া ডাকাডাকি এবং গোলমালে চমকিয়া দেখিলাম, চটীতে আসিয়াছি। শুনিলাম দুই মাইল আসিয়াছি।

এই চটির নাম দুর্গাচটী। এখানে একটী দোলনা আছে, পাণ্ডারা বলিল ইহাতে ঝুল খাইতে হয়, অর্থাৎ

একটা পয়সা দাও। কিন্তু ঝুল খাইতে বেশ আনন্দ হয় বটে। আমাদের ভিতর দুই একজন অত উচ্চ দোলনায় উঠিতে ভয় পাইলেন, আমরা দুই একজন ঝুল খেলিয়া বেশ একটু আনন্দ লাভ করিলাম।

ঝুল খেলিয়া বিশ্রাম করিয়া আবার আমরা চলিলাম। রাস্তাটা তত খারাপ নয়। তুষারে মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। এইবার আমাদের তিন দিক বেষ্টন করিয়া অনন্ত তুষারশ্রেণী শোভা পাইতেছে—এ কি দৃশ্য! যতই উপরে উঠিতেছি, ততই যেন পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইতেছে। শীত খুব বেশী, রৌদ্রের আর দেখা নাই, মেঘে অন্ধকার—যেন দার্জ্জিলিঙের বর্ষার সময়ের মত বোধ হইতেছে। এই সকল পথে কত সাধু মহাত্মার ভগ্ন পার্ব্বত্য কুটীর, অর্দ্ধ-ভগ্ন গুহা সকল পড়িয়া রহিয়াছে। রাস্তা বাড়ানো এবং লোক-সমাগমের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের নিভৃত কুটীর ত্যাগ করিয়া আরও গভীর জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বাসের চিহ্ন সকল এখনও কুটীর গাত্রে রহিয়াছে। এক স্থানে দুই দিকে দুইটা প্রকাণ্ড গাছ এক জমলার্জ্জুনের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভিতর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইল, অন্য রাস্তা নাই। কোনও স্থানে প্রকাণ্ড তেজপাতার গাছ রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অশ্বথ গাছের ঝুরি নামার মত শত শত ডাল নিচে অবধি ঝুলিয়া ভূমে ঠেকিয়াছে। গুঁড়িটা তাহার এত মোটা যে ৫।৬ জন লোক হাতে হাতে ঘেরিয়া ধরিলে তবে ধরা যায়। জানি না কত যুগ যুগান্তর হইতে এই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। স্তূপাকারে শুকনো পাতা সকল পড়িয়া আছে। এক দিকে এইরূপ জঙ্গল, অন্য দিকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়া, দুই হাত মাত্র প্রশস্ত পথ, তাহার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। চারিদিকে গাছপালা লতাপাতা। পাহাড়ের গাত্র সমস্তই স্থানে স্থানে বরফ ঢাকা।

এইরূপ দেড় মাইল আসিয়া 'কাটা চটী'। আমরা এই চটীতেই থাকিব স্থির হইল। এইখানে স্নানাহার হইল। রান্না হইল কাঁচা কাঁচা ভাত আলু ভাতে এবং কাঁচা ঝোল।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়াই আজ বাহির হইয়া পড়া গেল, কারণ আজ সমস্ত দিনই মেঘ করিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। সকলেই আজ একটু তাড়াতাড়ি করিতেছে। নিচে নামিতেছি, নামিতে নামিতে একেবারে নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আর পথ নাই, নদী পার হইয়া যাইতে হইল। জল বেশী নয়, এক হাঁটু, কিন্তু কি ঠাণ্ডা! বরফ গলিয়া আসিতেছে কিনা! পা যেন কাটিয়া লইতে লাগিল। পাথরের উপর পা রাখিয়া লাঠির সাহায্যে সকলেই চলিতেছি। ক্রমে ক্রমে পা যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। কোনও রূপে নদী পার হওয়া গেল।

নদী পার হইয়া আসিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল যে কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম! পাহাড়ের চূড়ায় ছিলাম, একবারে পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। দুই মাইল নামিলাম। আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম, মেঘ ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, ডাকিতেছে, বৃষ্টি ত চলিতেছেই। বেলা পড়িয়া আসিতেছে, সকল যাত্রীই একটু মাথা রাখিবার মত স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুল মনে প্রাণপণে চলিয়াছে। সোজা পথ ত নয় যে ছুটিবে! মনে হইতেছে, বুকের হাড়গুলি বুঝি মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এইরূপ করিয়া নামিতে নামিতে বৃষ্টি জোরেই আসিয়া পড়িল! আমরাও একটী চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। খুব ভিজিয়াছি, গায়ে মাথায় জল লইয়া চলিয়া শীতে কাঁপিতেছি। চটীওয়ালা একখানি চেটাই পাতিয়া দিয়া একটু আগুন জ্বালিয়া দিল। কাপড় ছাড়িয়া আগুনের কাছে বসিয়া হাত পা সেঁকিতে সেঁকিতে গা একটু গরম হইল, তখন সকলের মুখে কথা বাহির হইতে লাগিল। এই চটীর নাম 'বলদ চটী'। এই চটীতে কিন্তু মাছির ভয়ানক উপদ্রব। এত বেশী মাছি যে দেখিলে ঘৃণা হয়। আমি লিখিতেছি, আর মাছিতে এত বিরক্ত করিতেছে যে ভুল হইয়া যাইতেছে। এখন বেলা ৬টা। মেঘে অন্ধকার,

আমার সঙ্গিনীরা সকলে আগুনের কাছে বসিয়া তাস খেলিতেছেন, আমি মধ্যে মধ্যে দেখিতেছি, হারজিত চলিতেছে।

৭॥০ টার পর খেলা ভাঙ্গিল। সেই আগুনটাকে বেশ করিয়া জ্বালিয়া দিয়া তাহার পাশে বসিয়া গল্প করিতে করিতে এবং গরম হইতে হইতে, তাহাতেই কয়েকখানি পাঁপর পোড়াইয়া ও একটু হালুয়া তৈরী করিয়া খাওয়া হইল। এবং যাহার যতগুলি গরম কাপড় আছে, সেই গুলি সব ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়া গেল।

সমস্ত রাত্রিই বৃষ্টি হইতে লাগিল। পাহাড়ের কোলে খোলা মাঠে পড়িয়া থাকা বই ত নয়, বৃষ্টি হইলে বড়ই কষ্টকর হয়। মাথার উপর একটু বুনো বাঁশ, ও তার উপর একটু বুনো ঘাসের ছাউনী, তিন দিক খোলা, পিছনের দিকে কতকগুলি আলগা পাথর সাজানো, এই ত চটী! আবার যাত্রী দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘর তৈরী করিয়া দিয়েছে। মেজেটা টিপিলে জল উঠিতেছে, চেটাই ও কম্বল ভিজিয়া যাইতেছে। তিন দিকেই বরফের পাহাড় ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, স্থানে স্থানে ঘাসের উপর বরফ জমিয়া রহিয়াছে। কি ভয়ানক শীত! সমস্ত রাত্রি সকলেই শীতে কাঁপিতে লাগিলাম, শীতে কাহারও ঘুম হইতেছিল না।

রাত্রি দুইটার সময় একটী বাঘ আসিয়া আমাদের একজনের পায়ের কাছে দাঁড়াইলেন। চটীওয়ালা 'শের শের' বলিয়া চীৎকার করিয়া পিতাপুত্রে লাঠি লইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন দেখিলাম। এই বরফ-পড়া বৃষ্টিতে তিনি বোধ হয় সমস্ত দিন নিজের কিছু ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তাই এতগুলি মনুষ্য দেখিয়া তাঁহার ক্ষুধার জোরটা কিছু বেশী হইয়াছিল। সকলে মিলিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠাতে বেচারা শুধু মুখেই ফিরিয়া গেল। আমার সঙ্গিনীদের ভিতর দুই একজন ত ভয়ে আধমরা গোছ হইয়া বাকী রাতটুকু কাটাইলেন, এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে বাঘে তাঁহাদের পা ধরিয়া টানিতেছে, কারণ তাঁহারা মধ্যে মধ্যে 'আউ, আউ' করিয়া চমকিয়া উঠিতেছিলেন। এত শীত যে মুখের ঢাকাও খোলা যাইতেছে না, বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিতেছে।

২২শে—ভোর ৫টা। আমরা কাটা চটী ছাড়িলাম। কি ভয়ানক শীত! কাল হইতে পাণ্ডাদের কাছে শুনিতেছি, এইবার যে পাঁচ মাইল চড়াই উঠিতে হইবে সে রাস্তা বড়ই ভয়ানক, তাহাতে বৃষ্টিতে পিছল হইয়া আছে। বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে এই একটু ভাল। আজ পাণ্ডারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। আগে আগে কতকগুলি সন্ন্যাসী কেদারের জয়ধ্বনি করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। আমি আজ চলিতে না পারিয়া ঝাপানে উঠিয়া বসিলাম। সমস্ত রাত্রি শীত ভোগ করিয়া ও ভিজা মাটিতে শুইয়া সকলেরই শরীর খারাপ বোধ হইতেছিল। খানিকটা উঠিবার পর অন্ধকারময় জঙ্গল দেখা গেল। তাহার ভিতর ঢুকিবার সময় আমার একজন ঝাপানীর পা পিছলাইয়া গেল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আবার আমার নারায়ণ আসিয়া আমার ঝাপান রক্ষা করিলেন (নচেৎ তৎক্ষণাৎ আমার চিহ্ন লোপ হইয়া যাইত)। সকল যাত্রীই "জয় কেদারনাথ স্বামীজিকী জয়" বলিয়া তাঁর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এখানে রাস্তা নাই, খালি পাহাড়ের গা দিয়া পথ করিয়া লইয়া চলিতে হইতেছে। এইরূপ দুই মাইল। মাঝে মাঝে ঝরণার জল পড়িতেছে—বড় দুর্গম পথ। একটী প্রকাণ্ড ঝরণা নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে। পার হইবার জন্য খান কয়েক কাষ্ঠ তাহার উপর ফেলিয়া একটু পুলের মত করিয়া রাখিয়াছে। কাঠগুলি কিছুতেই আটকান নাই, তাহার উপর পা রাখিলেই সেগুলি বেশ নড়িতে থাকে দুই পাশে ধরিবার বা আড়াল করিয়া রাখিবার কিছুই নাই। প্রায় একতলা সমান উঁচুতে ঐ রূপ ভাবে আলগা কাঠ ফেলিয়া রাখা আছে। সেই পাহাড়ের গা বহিয়া ঐ প্রকাণ্ড ঝরণা প্রবল বেগে নামিয়া নিচে দিয়া নদীর মত বহিয়া চলিয়াছে। নিচের দিকে চাহিলে, মাথা ঘুরিয়া যায়।

লাঠি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে সেই কাঠের পুল

পার হইলাম। এই সকল ভয়ানক দৃশ্য না দেখিলে কখনই কল্পনা করিতে পারা যায় না। দুই মাইল আসিলাম। এইখানে সকলেই একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া আবার চড়াই, ২ বা ২৷০ হাত প্রশস্ত মাত্র পথ পর্ব্বতগাত্র দিয়া চলিতেছি। দক্ষিণ দিকে অতলস্পর্শ খাদ, এবং যে স্থান দিয়া চলিতেছি, সেইটী পাহাড়ের গর্ভ। তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর সকল নানা আকারে বাহির হইয়া আছে। এক এক খানি প্রকাণ্ড পাথর উপর হইতে এরূপ ভাবে ঝুলিয়া আছে যে, মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া চলিলেই আঘাত পাইতে হইবে বা মস্তকটী চূর্ণ হইয়া যাইবে। কাযেই ঘাড় হেঁট করিয়া চলিতে হইতেছে। যদি একটু অন্যমনস্ক হওয়া যায়, তা হইলে ধাক্কা খাওয়া এবং একবারে খাদে নিক্ষিপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। আর যদি একখানি পাথর খসিয়া পড়ে ত সেই এক খানির আঘাতে শত শত লোক নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে পারে। স্থানে স্থানে ঝরণা প্রবল বেগে পড়িতেছে। তাহার জলে সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইতেছে। বাম দিকে পাহাড়, দক্ষিণ দিক দিয়া খাদ পর্য্যন্ত কি গভীর জঙ্গল চলিয়া গিয়াছে! স্থানে স্থানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। সর্ব্বদাই শত শত ঝরণার জল ঝরিয়া পাথরের গায়ে নানা আকারের শেওলা সকল জমিয়াছে।

এইরূপ দুই মাইল পথ আসিলাম। এই স্থানে একখানি চটী, নাম রামপুর। আরও উঠিতেছি। এই পথের স্থানে স্থানরে ভীষণতা দেখিলে আমার মত সর্ব্বত্যাগী লোকের শরীরও শিহরিয়া উঠে।

প্রায় দেড় মাইল এইরূপ ভয়ানক পথ অতিক্রম করিবার পর, আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল পথে আসিলাম। এই পথের ভীষণতাও কম, জঙ্গলও একটু কম। এই স্থান হইতে সূর্য্যোদয় দেখা গেল। তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল সূর্য্যালোকে কি অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গের উপর যেন কে একটী সিন্দুরের টিপ পরাইয়া দিল। সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পথের এই ভীষণতাও ভুলিয়া যাইতে হয়।

এই ভয়ঙ্কর পথ পার হইবার জন্য যাত্রীরা যখন "জয় কেদার, জয় কেদার" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে ভগবানকে ডাকিতে থাকে, সেও এক দেখিবার, অনুভব করিবার জিনিষ। ভগবদ্‌বল লাভ না করিলে মানুষ কোন কাযই করিতে পারে না। ভগবানকে, দেখিবার আশাতেই লোকে এই ভয়ঙ্কর পথ অতিক্রম করিতে পারে, নচেৎ এ পথে যে মানুষ আসিতে পারে তা মনে করাও যায় না। এতই ভয়ানক পথ।

সূর্য্যোদয় অনেকক্ষণ হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে শৃঙ্গ দিয়া চলিতেছি, সেটা এখনও অন্ধকার। শীতে কাঁপিতেছি, হাতের আঙ্গুলগুলা যেন ঠাণ্ডায় অসাড় হইয়া যাইতেছে, অথচ সামনে বরফের পাহাড় সূর্য্যালোকে ঝলিতেছে।

বেলা ১০৷৷ টায় আমরা 'ত্রিযুগী নারায়ণে' আসিয়া পৌছিলাম। এখানে স্নান দান ইত্যাদি করণীয় কার্য্য সকল সারা হইল। এই শীতে বরফের মধ্যে বরফজলে স্নানও হইল। আজ এইখানে তুলাভরা কোটটা পরিলাম; কিছুতেই শীত ভাঙ্গিতেছিল না। এইখানে নারায়ণের মন্দির আছে, মন্দিরের সামনে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ডে বড় বড় গাছের গুঁড়ি সকল জ্বালিতেছে, যাত্রীরা পয়সা দিয়া দিয়া গুঁড়ি কিনিয়া কিনিয়া আগুনে ফেলিতেছে। শুনিলাম এই অগ্নি তিন যুগ হইতে বর্ত্তমান আছেন। এই খানেই আজ রাত্রিতে থাকা স্থির হইল। সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, বেলা তিনটার সময় রান্না হইল—ভাত, খোসা শুদ্ধ মুগের ডাল ও একটী তরকারী; সুতরাং খুব খাওয়া হইল।

আজ আমরা যে স্থানে রহিয়াছি, তাহার চারি দিকেই তুষার মণ্ডিত পাহাড় কি সুন্দর দেখাইতেছে! কিন্তু খুব শীত। এই চটীতে আসিয়া সেই যোধপুর বাসিনীর সহিত আবার দেখা হইয়া গেল। সে আজ আর আমাকে কিছুতেই ছাড়িল না—বলিল নিমন্ত্রণ লইতেই হইবে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। কাযেই তাহার নিমন্ত্রণ লইতেই হইল। বলিলাম, "তীর্থ যাত্রীকে পথে কাহারও

কিছু খাইতে পাই বহিন।" সে বলিল, "অন্যের কথা আলাদা, আমরা যে ধর্ম্মভগিনী, ধর্ম্ম সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" বুঝিলাম তাঁহার কাছে যাইবার পথে জাতি-ভেদ নাই, ছোট বড় নাই, উঁচু নীচু নাই, সকলকেই এই রূপ গলাগলি ভাবে যাইতে হয়। এ পথে 'তোমার' 'আমার' এ সকল সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না। বদরীর পথ ভিন্ন এ শিক্ষা অন্য কোনও তীর্থে পাওয়া যায় না, তাই বদরীতীর্থ স্বর্গের দ্বার স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত।

ক্রমশঃ

শ্রীসুশীলা বসু।

সান্ত্বনা

উচ্ছ্বসিত চিত্তখানি আজকে ওগো কিসের লাগি—
কোন অজানা দুখের ব্যথায় থেকে থেকে উঠ্‌ছে জাগি!
অস্তগামী ভানুর কিরণ রক্তে আঁকা ছবির মত
রাঙিয়ে তোলে অন্তরে মোর তীব্র ব্যথার শতেক ক্ষত।

কোন্ বেদনার স্পর্শ পেয়ে বক্ষ আমার উঠ্‌ছে কাঁপি,
উচ্ছলিত অশ্রুধারা ঝরছে দুটি নয়ন ছাপি।
উদাস বায়ে জানায় কাঁদন ঝরাফুলের অফুট কুঁড়ি,
আমার প্রাণের গভীর বেদন সেই পবনে বেড়ায় ঘুরি।

জোছ্‌না রাতের সুধার ধারায়, তটিনীর ঐ করুণ তানে
নীপের বনে পিকের বোলে—নূতন করে বেদন আনে।
উল্লাসে আর সখীর সনে হাস্যতে যেন চিত্ত বাধে,
মর্ম্মখানি উঠছে কেঁপে একটা গোপন আর্ত্তনাদে।

রুদ্ধহৃদয় আজকে যেন গুমরে মরে ব্যর্থতাতে,
সিদ্ধি তাহার মিল্‌লনা হায় অদৃষ্টেরই বিষম ঘাতে।
বইতে যদি হইবে আমায় আনন্দহীন জীবন হেন—
ধ্রুবতারার মতন তুমি লক্ষ্য আমার রওগো যেন।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

হেমচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'নবজীবন' ও 'প্রচার'। দোঁহাবলী।

'নবজীবন'। ১২৯১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'নবজীবন' মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। উহার ইতিহাস সম্বন্ধে 'অক্ষয়চন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"সেই সময়ে কলিকাতায় কলুটোলায় বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাটরূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়া-মণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া পথিমধ্যে বর্দ্ধমান বিজয় করিয়া কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বাবু দাদা মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সরকারী অনুবাদক রাজ-

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদির পুরের ভট্ট মহাত্মা, কবিবর হেমচন্দ্র এবং কোন্নগরিয়া যোগেন্দ্রনাথ (চন্দ্র ?) ঘোষ—বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশব বাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের প্রিন্সিপাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটী তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবু ত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্যসেবার সভায় ধর্ম্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবার্টহলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের দোহাই ঝাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উলটা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়, ধর্ম্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। * * * বঙ্গের মহামহারথিগণ প্রায় সকলেই লিখিতে লাগিলেন।"

এই মহামহারথিগণের মধ্যে হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলির সাহিত্যকক্ষে নির্দ্দিষ্ট গতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যে অপূর্ব্ব মায়াবী উপন্যাসের এক অভিনব সাম্রাজ্য সৃজিত করিয়া বাঙ্গালীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই কাহার অলক্ষ্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, এক নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদার হিন্দুধর্ম্মের বিজ্ঞানেতিহাসসম্মত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুসন্ধানের যোগ্য।

পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত নানা পারিবারিক কারণ বশতঃ হেমচন্দ্র ইচ্ছাসত্ত্বেও 'নবজীবনে' অধিক লিখিতে পারেন নাই। 'নবজীবনে' তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়:—

সন ১২৯১, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা—শ্রাবণ—(১) মদন পূজা।

৩য় সংখ্যা—আশ্বিন—(২) হুতোম প্যাঁচার গান।

৬ষ্ঠ সংখ্যা—পৌষ—(৩) রীপণ উৎসব।

১২৯২, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা—অগ্রহায়ণ—(৪) হরিদ্বার।

১২৯৩—৯৪, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ—এই বর্ষদ্বয়ের লেখকগণের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে—কিন্তু উহাতে উল্লেখযোগ্য কোনও কবিতা প্রকাশিত হয় নাই।

'মদন পূজায়' কবি মদনের যথার্থ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন:

> চিনেছি এখন, মদন তোমায় অনঙ্গ কেবলি নাম।
> বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআস্, কুসুম লাবণ্য ঠাম,
> সুবাদ্য ঝঙ্কার, সঙ্গীত উচ্ছ্বাস বচন তুহারি মানি,
> হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর তুহারি পরাণ জানি;
> অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে, তুহু সে পরম প্রাণী।

'রিপণ উৎসবে'র বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'হরিদ্বার' শীর্ষক কবিতাটীর স্থানে স্থানে কবি পরে কিছু পরিবর্ত্তন করেন এবং সংশোধিত কবিতাটী ৪র্থ বর্ষের "মানসী"তে (কার্ত্তিক ১৩১৯) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'হুতোম প্যাঁচা'র গানের বিস্তৃততর পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

'হুতোম প্যাঁচা'র গান। 'হুতোম প্যাঁচার' গান বা কলির সহর কলিকাতা, ১২৯১ সালে আশ্বিন মাসে 'নবজীবনে' এবং পরে স্বতন্ত্র ভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। উহাতে হেমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না, শ্রীরসিক মোল্লা-বিরচিত বলিয়া লেখা ছিল। অক্ষয়চন্দ্র যথার্থ ই বলিয়াছেন যে এই "পদ্য সাধারণত রসের ভাষায় কলিকাতার পৃষ্ঠে কশাঘাত বটে, কিন্তু উহাতে

মৌকিক তিরস্কার অপেক্ষা খাঁটীর" পুরস্কারই অধিক আছে।" কবিতাটী হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর কোনও সংস্করণে এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, সেই জন্য উহা হইতে 'আসর বর্ণন' পালাটি সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা অক্ষয়চন্দ্রের উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করিব। আসরে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে 'নবীন পাঠকগণ যদি চিনিতে না পারেন, সেই জন্য আমরা তাঁহাদের কয়েক জনের আলেখ্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও বাক্যগুলির নাম পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিলাম।

এসো এসো সবার আগে ঠাকুর বাড়ার চাঁই,
ঝুলঝুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই।
পাথরঘাটায় রাজগীজারি "সার" মহারাজ নাম,
মুলী-আনায় জেঁকে গেছে হ্যাতলা ধরা থাম।
সিঁতির মাঠে কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত,
কুঞ্জ-মাঝে 'গ্রেটো' গহ্বর মাটীতে পর্ব্বত।
বংশ যশে, 'লেজিশলেটিভ' রংমহলে চড়ে
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথায় পগ্ গ নেড়ে।
মিষ্টি বোলে মিছরি ঘোটা সবটুকু সে ছাঁকা;
(যার) অভ্যুদয়ের ছায়া লেগে সহরখানা ঢাকা।
এসো এসো ভারত মাঝী কসে ধরো হাল,
বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েছ পাল।!

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে 'মিউজিক ডাক্তার'।*
'অর্ডার অফ সি আই ই, অ্যাণ্ড রাজা-কম;
'অর্ডার অফ লিওপোল্ড কিংডম বেলজিয়ম,'
'অর্ডার অফ ফ্রান্সে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া,'
'অর্ডার অফ ডলার ব্রোগ' ডেনমার্ক নিয়া,
'অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্সনী,
অর্ডার অফ মেলুসাইন মেরী লুসিগনানী,'
'অর্ডার অফ মলটা রোডস্ ক্রাঙ্ক সিভেলার,'
অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেন্টসেপলকার,'
'ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউসিং চাইনার,
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন এণ্ড সন,'
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল মেহেদিজি সুলতান,'
'অর্ডার অফ গুর্খা-তারা দিয়েছে নেপাল,
'শ্যামদেশের বসবামালা পারস্য সা-জাদা,
এর উপরে আরো কত এটসেটেরার গাদা॥
সত্যই এ সকলগুলি রাজশ্রীর হার,
সাক্ষী দেখো সব কেতাবের মলাটে বিস্তার॥
(এখন) সরো সরো ছোট বড় রাজা মহাশয়,
আসর নিতে 'আউলায় কজিন' হচ্চেন উদয়।

এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে,
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে?
স্বয়ংসিদ্ধ মহারাজা সহর শোভন,
যথা গিরি গোবর্দ্ধন গোকুলের ধন।
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি,
গঙ্গার উপমা আহা গঙ্গাই যেমনি।
সভাস্থলে টাউনহলে বক্তৃতার চোটে,
ভাদ্রে নদীর জলে ফেণা যেন ফোটে।
সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক,
খালি সে চুড়োটী নাই তিলক কৌলিক।
মাথার চুলের ভাঁজে খেলে জোয়ার ভাটা,
সমুখে বাগানো তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাটা।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই,
কাশী মক্কা পাশাপাশি কোন্ দিকে তাকাই।
এসো এসো মহারাজ আরো ঘেঁসে যাও:
আতর গোলাপ পাস্ লে-আও লে-আও।

এসো তো বণিকপতি এসো তো এবার,
করতো জাঁকায়ে বসে আসর গুল্‌জার।
বেটিবের সদাগর বেনেদের নাক,
কমলার কলকাটী সোণার মৌচাক।
দেশকুল-মুখোজ্জ্বল ব্যাপারে হুজুরি,
বাজারে গুহার হালে বড়ই জাহিরি।
বড় 'লকী' জাহ্নগীর দাঁত বাঁধা 'চ্যাপ,'
হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোণাচাপ।
এর কাছে আর যত ঝুটো পোখরাজ,
গিল্টি-সোণা দাগী চুনি রুকে মারে লাজ।
সহরে সবার কাছে শুনি এর নাম,
আক্‌বরী আসরফী যেন দরে দুনো দাম।
অল্পভাষী 'নোড্ডো হোম্মো' কাঁচামিঠে ঝাল
গরমে পচেনি আজো টাটকা আছে মাল॥
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাপ,
সাবাস ত্রিমূর্ত্তি লাহা * কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।

* রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

* মহারাজ দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ লাহা।

তার পর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে খাঁড়া অদ্ভুত 'নসীব'। *
জমিদারী মিণ্টে ঢালা আদোৎ 'মডেল',
বাঙ্গালার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল।
বয়েসে অনাদি-লিঙ্গ 'জরাসিন্ধ' বলে,
দাপোটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে॥
মাল্ আইনে তোদের মল রোখে হাইদর আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি।
গুষ্টী বহু বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌশলে মুহুরি।
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্রযুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম।

এইত গেলো কল্‌কাতা তোর কন্ধাপরার দল,
দেখবো এবার গোটাকত দিকপাল আসল।
দেখবো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাঁদের শিরে জ্বলে সোণার তারা।
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং ফিঙ্গের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজপাখী "রয়াল"।

আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানব্যাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, জ্যাঢ়ো শালকড়ি
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতা কর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেকুল-কাঁটা পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিম্ব
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই কিনিস।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অলঙ্কার।
দিক্‌পাল তোমার মত দেশে নাই আর।
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহরে রাজায়
কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়।

কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়?
পাঁও লাগে বাচস্পতি এসোতো সভায়।
জীয়ন্ত ভাষার কোষ পাণিনির মই
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই নহে টুলো কই।

স্মৃতি দরশনে বুদ্ধি তর্কের মার্জ্জার
মোক্ষমূলের ল্যাসেনের মুণ্ডের টোপর।
ব্যাকরণে ব্যোপদেব ভ্রাতুর মামাতো
সংস্কৃত বিদ্যা দাঁড়ে হরিবোলা কাকাতো
শিকাধারী খর্ব্বদেহ দর্শনে দুর্ব্বাসা
আলাপে তাদের শাঁস কিম্বা শশা খাসা।
পান্তা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়
এসো এসো বাচস্পতি পাঁও লাগে পায়।
অনেক তো নৈবিদ্যির ভাগ সরাতে জড়।
বলো তো জলুস কার সভার মাঝে বড়?

বলো তো সভার শোভা এবার কেমন
নমস্কার নমস্কার নগরের রতন।
ফুটেছ ব্রাহ্মণ কুলে আপনার বাদে,
বুকেতে বেঁধেছো 'চাপ' প্রকৃতির 'পাসে'।
থানের চাদর পরা থানধুতি যোটা
কালোমুখে জ্বলে আলো প্রতিভার ছটা।
নিজগুণে নিজপণে রাঢ়ে বঙ্গে মান
পৈতৃক মকরধ্বজে নহ অনুপান।
সাহেব করেছো বশ বিদ্যারসে তাজা
রাসে তব ভাসে কত কেদার-ধারী রাজা।
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন
শুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জ্জন।
মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী।
উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী॥
মজলিসেতে বাবুর পোষাক ঐটি কেলেঙ্কার
তবু হ্রাদে খাঁটি বাসে তুল্য কে তোমার?

এসো এসো তাহার পরে রেওয়ারেও সাজ
বন্দ্যাকুল চূড়ামণি মা'নাআরী আহাজ।
শুভ্রভুরু শুভ্র কেশ শুভ্র দাড়ি চেয়া
গিরীক ল্যাটিন ক্রিক ইংরিজি ফোয়ারা।
মাকাল বনের মাঝে পাকা আম্রফল
স্বধর্ম্ম তেয়াগী তবু স্বজাতির দল।
মিষ্টভাষী বঙ্গবন্ধী হৃদে মাখা চিনি
বয়েস খুঁজিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি।
ঝাপুরে ভুষুণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্ব্বত।

---

* জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

• রাংতা জরি চাকৃতি ঝারা নকিব ফুকার
বলোতো এমন ক্ষালো তোমাদের কার ? *

পথ ছাড়ো পথ ছাড়ো আসিছে এবার
গদাধর পাদপদ্মে মতি গতি যার।
তালপত্র তাম্রপত্র পুথিপত্র থোকা
বগলে পুট্‌লি বাঁধা কেতাবের পোকা
এসো মিত্র লালে লাল মজলিস জাকাও
কেদারা ঠেসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাসীতে দিগগজ মসনদ
খড়ি মাড় নাই খাপে—আধোয়া পসন্দ।
আচাঁর আমের সত্ত্ব কুলকুটো ভাজ
যখন যেদিকে হাত তাতে খড়িবাজ।
বাক্‌যুদ্ধে বাগ্মিতায় লেখার লড়ায়ে
রাজনীতি রচনায় সুর বাজখেয়ে।
ইংরিজি বিদ্যা বাগানে ফাষ্টরেট মালী
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যায় ডালি।
সকল বিদ্যার খই দুদ্ধি ভাজা খোলা
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গোঁজা শোলা।
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার
রাজার মাথায় চূড়ো তুলা কে উহার ? †

আসর জাকায়ে বসো তুমি অতঃপর
গাল জোড়া ফ্যাসা গোঁপ বুড়ো প্যাগম্বর।

চুচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের ননী আকারে পাঠান।
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞানগুড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালী শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজা কালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙালীর বাঘ।

তুমিও আসরে এসে বসো একবার
কলিতে কাঁসারী কুলে প্রভা জ্বলে যার। *
কণ্ঠে তুলসীর মালা দীনহীন বেশ
কাঁধেতে চাদর ফেলা পোষাকের শেষ।
সহরের দীন দুঃখী দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দু'হাত তোলে যখন সাক্ষাৎ
চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীর বাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এদের পাশে "ছাড়" বিধাতার,
কি হবে কোমর পেটী কে চায় চাপরাস্।
অনাথ তারক নামে পেয়েছো যে 'পাশ'
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার।

কবিতাটির শেষভাগে কবি লিখিয়াছিলেন :—

আসর বর্ণনা আজ ইপ আমার।
বড় বড় বুড়ো বুড়ো চুনে নিয়ু কটা
ফিরে আবার আসর নেবো মাথায় বেঁধে ফ্যাটা॥
গাইব তখন আবার শুনো গুণটা যেমন যার
আল্লা গৌর বলো এখন বেলা দুপুর পার।
শ্রীপাঠ কলকাতা তত্ত্বে অধ্যায় প্রথম
হুতোম প্যাচার গান নরম গরম॥"

---

* সাবাস হুজুক আজব সহরে শীর্ষক রহস্য কবিতায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই চিত্রের সহিত তাহার তুলনা করুন :—

কেহ বলে আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী সাদা চুক ঋষিটি যেমন॥
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো বৃদ্ধের নবীন।
খ্রীষ্টানের মুখপাৎ দেখানো সঙ্গিন॥
আমার পছন্দ অই খ্রীষ্ট ভেকধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট জিতি আর হারি॥

† সাবাস হুজুক আজব সহরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র দেখুন—

কোন জন বলে সাহেব ঐটী আমায় দাও॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্ত্তি বগলে যাহার।
এলেম্ ওয়া ডি এল মারা পছন্দ আমার॥

* তারকনাথ প্রামাণিক।


মহারাজ স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
(বুলবুলি পাগ, শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই)


মহারাজ স্তর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
সেকেলে কৃষ্ণের মত ধড়া পরা ঠিক



তারানাথ বাচস্পতি
(জীবন্ত ভাষার কোষ পাণিনির বই)



বিদ্যাসাগর
(ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্)



মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

(কালো মুখে জ্বলে আলো প্রতিভার ছটা)



রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(দাপুরে ভুষুণ্ডি বুড়ো সবেতে মহৎ)

কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক অশান্তি নিবন্ধন কবি আর ফ্যাটা বাঁধিয়া আসরে নামেন নাই।

'প্রচার।' যে সময়ে নবজীবন পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়েই (অর্থাৎ ১২৯১ সালে ১৫ই শ্রাবণ) বঙ্কিম চন্দ্র অক্ষয় চন্দ্রের "মহাদৃষ্টান্তের



ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র
(বগলে পুঁটুলি বাঁধা কেতাবের পোকা)

অনুগামী হইয়া" "সত্য, ধর্ম্ম, এবং আনন্দের প্রচারের জন্য" প্রচার নামক মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমে উক্ত পত্রের শিরোভাগে সম্পাদকের নাম থাকিত না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র পত্র সূচনায় লিখিয়াছিলেন, "সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেননা পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না।" পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সম্পাদক বলিয়া উল্লেখিত হইত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ংই উক্ত পত্রের যথার্থ সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গদর্শন বিলুপ্ত করিয়া নূতন মাসিকপত্র প্রচার করিবার কারণও পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন জাহাজ বানচাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।"

"প্রচারে" বঙ্কিমচন্দ্র সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় কৃষ্ণ-চরিত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রচারের আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল—১২ পেজী তিন ফর্ম্মা মাত্র। এই ক্ষুদ্র আকার করিবার জন্য সম্পাদক নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন:—

"যাহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থচিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত, এক মাসে ছয় ফর্ম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফর্ম্মার মাসিকপত্র লইয়া দুই একবার চক্ষু বুলাইয়া তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তারপর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিস্তারসপরিপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোষের নীচে পড়িয়া যায়। ক্ষরমান দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত করিতে থাকে। বুভুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার করিতে থাকে। এবং পরিশেষে তাহা বালকেরা অধিকৃত করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া, লেজ বাঁধিয়া দিয়া, ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয়—হেমবাবু রবীন্দ্র বাবু, নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্রবাবুর সমালোচন, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবন পথে উত্থানপূর্ব্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত কথাই নাই। উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা মাজা ঘসা প্রভৃতি নানাবিধ

সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সদ্গতি বটে এবং ছয় ফর্ম্মার স্থানে তিন ফর্ম্মা আদেশ করিয়া প্রচার যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না; গত্যন্তর ও-বেনের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফর্ম্মায় এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে বাপের পড়া হইতে পারে; এবং পাকশালের কার্য্য নির্ব্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে।"

অনুরুদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্র প্রচারেও কতকগুলি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৯১—সংসার।
৩য় সংখ্যা, আশ্বিন " —দেশলাইএর স্তব।
২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক ১২৯২—গঙ্গার স্তোত্র।
(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে)
৪র্থ খণ্ড ১১-১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন চৈত্র, ১২৯৫।
বন্দে মাতগঙ্গে—

কবি সংসারের নানাবিধ দুঃখ ক্লেশ অশান্তি ভোগ করিয়াও "সংসার" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন—

"আমারে চরণ তলে, মথিস যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস উদ্গার
সংসার তোরই ও মুখে চাহিয়ে থাকিব দুখে
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।
সংসার তোরই ও মুখে হেরিব আবার সুখে
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই?
আমি যার সে আমার এই বাক্য যবে সার
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই:
সংসার তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই।

'দেশলাইএর স্তব' একটি রহস্য কবিতা,—অক্ষয় চন্দ্রের মতে 'বিড়ম্বনা'—কারণ, বোধ হয়, উহা 'নব জীবনে' প্রকাশিত না হইয়া 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "প্রচারে" কবি দেশলাইএর রূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"যেন বা ডিপুটী সাটা একহারা চেহারা
মাথায় শালের বিঁড়ে রাগে প্রাণভরা।
শান্ত সভ্য অতি ধীর শুয়ে যতক্ষণ
গা ঘেঁস্‌লে চটে কাল গৌরাঙ্গ যেমন।"

'গঙ্গার স্তোত্রটি' হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে লিখিত। হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু নীলমণি কুমার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে উহা সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ব্ব এবং যথার্থই গঙ্গাতীরে বসিয়া সদ্য সদ্য (Extempore) রচিত হয়। ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র পূতসলিলা গঙ্গার যথার্থই একজন উপাসক ছিলেন। তাঁহার গঙ্গাবিষয়ক কবিতাগুলি সমস্তই অতি মধুর এবং সনাতন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক। অন্ততঃ হিন্দুর নিকট তদ্বিরচিত গঙ্গার মহিমা-গাথা চিরদিনই মধুর বলিয়া প্রতীত হইবে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দেবভাষায় যে উদাত্তস্বরে গঙ্গার মহিমা গাহিয়াছিলেন, সেই ধ্বনি "বন্দে মাতর্গঙ্গে" শীর্ষক কবিতার স্থানে স্থানে জাতীয় কবি হেমচন্দ্র তাঁহার অমর ভাষায় প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বজাতিকে মাতাইয়াছেন। এই কবিতার শেষভাগে কবি যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি আন্তরিকতাপূর্ণ!—

গঙ্গে অঙ্কে তব অন্তে কি স্থানে পাব দেহ মিলাব মাগো
তব পুণ্য তোয়ে।
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদচ্ছায়া তাপতপ্ত কায়া
ষড়রিপু রঙ্গে,
সর্ব্ব পাতক হরা গঙ্গে রুদ্রশেখরা স্বর্গসরিদ্বরা
লৈও মা সঙ্গে
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

এই চিরমধুর ধ্বনি সেদিনও আমরা হেমচন্দ্রের মানস সন্তান, আর্য্যগাথার স্বজাতিপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে শুনিয়াছি—

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি জাহ্নবি সুরধুনি কলকল্লোলিনি গঙ্গে :

গ্রন্থাবলী প্রকাশ। এই সময়ে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি হেমচন্দ্রের কাব্যের কিরূপ আদর হইয়াছিল পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়াছেন। কবিতাবলী ও বৃত্রসংহারের তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া এই সময়ে



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

নিঃশেষিতপ্রায় হয় এবং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী একত্রে প্রকাশিত হইবার অভাব অনুভূত হয়। ক্যানিং লাইব্রেরীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী, বহু সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৯১ সালে) হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করেন। উহাতে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ, এবং 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' নবপ্রকাশিত—'দেশলাইএর স্তব' 'সংসার' ও 'মদন পূজা' এই কবিতাত্রয় প্রকাশিত হয়। উহাতে হিন্দী হইতে হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত কতকগুলি দোঁহাও "দোঁহাবলী" নামে প্রকাশিত হয়। এই দোঁহাবলী রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"হেমচন্দ্রের বাড়ীতে বিখ্যাত মনীষী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার পরিচয় হয়। ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার পরিচয় করাইয়া দেন। একদিন কথায় কথায় —'তুলসীদাস' ও 'কবীরের' দোঁহার কথা উঠিল। আমি গোটাকয়েক দোঁহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। হেমচন্দ্র বলিলেন—"এগুলির ত বাঙ্গালা করিলে হয়।" আমি বলিলাম,—"হইবে না কেন? একটু চেষ্টা করিলেই হয়!" অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি যেন ফেরত ডাকে তুলসীদাসের ছাপা দোঁহাবলী সকল পাঠাইয়া দেন। সেই ঝোঁকেই যে কয়টা দোঁহার অনুবাদ হইয়াছিল, পরে আর হয় নাই। হেমচন্দ্র ঝোঁকের উপর সব লিখিতেন। যখন কিছু লিখিতে বসিতেন, তখন যেন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। ঝোঁক ছুটিলেই সব যাইত। তাঁহার বাড়ীতে, যে কত অসম্পূর্ণ কবিতা আমি দেখিয়াছি তাহা আর বলিতে পারি না। সে সব যে কোথায় গেল, কে জানে?"

এক একটি দোঁহার অনুবাদ অতি সুন্দর। আমাদের এই মতের সমর্থনে নিম্নে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কোয়লা কি ময়লা ছোটে, যও আগ করে পরবেশ।

সদ্‌গুরু যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়, উপদেশে যদি বসে মন।
সব মলা ঘুচে যায়, কালো অঙ্গারের গায় অগ্নি তায় প্রবেশে যখন॥

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

ভাব-ব্যঞ্জনা

(প্রোফেসর টি, এন, বাগচী)



ভিখারী ও ভিখারিণী

ভিখারী। বাবা, অন্ধ নাচারকে একটি পয়সা—

ভিখারিণী। দয়া করে এক মুঠো চাল—



মুচি। বাবু, এক পাটিমে হাপসুল লাগানে ছু আনা লাগেগা।

বাবু। দে না বাবা, কেন গোল করিস, চার পয়সা পাবি।



এক দুর্ব্বৃত্ত বীডন বাগানে ভদ্রলোকের পকেট মারিতেছে



নিশ্চিত

বঞ্চনা মোরে নারিবে করিতে বন্ধু আমার, দয়িত,
স্নেহ-উজ্জ্বল ক্ষণিক-দিঠির অভিলাষী আমি নহি ওঁ!
তুমি জান কত বেদনার বোঝা, কত মর্ম্মের দাহনি,
অভিমান-ভরে গোপন-অশ্রু—না-দেখার-পানে চাহনি,
কত রজনীর বৃথা-অভিলাষ—কত প্রভাতের পিয়াসা,
ব্যর্থ-দিনের কত অপমান—রজনীর লাগি কি আশা!
চিরকাল ধরি জঞ্জাল-জাল নিরবধি কত ঘিরিল —
ধীরে ধীরে মোর আশার তন্ত্রী একে একে কত ছিঁড়িল!

ঘন-ঘোর-মাঝে, প্রসাদের শিখা কখন তুলেছে শিহরি,
হিমানী-হিয়ার গোপন-অশ্রু সহজে নিয়েছে আহরি!
তার পরে পুন, যাহা ছিল তাই,বিরাট শূন্যে হাহাকার—
সে যে চঞ্চল, কভু এক পল থির থাকা তার বড় ভার!
তাই বলি বঁধু, ক্ষণিক পরশে আর না ভুলাতে পারিবে,
যতবার নিজে জয়ী বাখানিবে, ততবারই তুমি হারিবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

বিবাহের নিমন্ত্রণ

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ পাইয়া যোগেন্দ্র বাবুর মেয়ের বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছি। যথাসময়ে শোভা-যাত্রা করিয়া বর আসিলেন। যোগেন্দ্র বাবু স্বয়ং এবং তাঁহার সহকারী রূপে আমি ও আরও অনেকে বর ও বরযাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিবাহের সভায় লইয়া এলাম এবং যথাযোগ্যস্থানে সকলকে বসাইয়া স্রক্ চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যোগেন্দ্র বাবু সভায় আসিয়া সভাস্থ সকলের অনুমতিক্রমে বরকে সম্প্রদান-স্থানে লইয়া গেলেন। কন্যাকেও শোভন অশোভন নানা বস্ত্রালঙ্কার-ভারাবনত করিয়া সেখানে আনা হইল। বরকে অর্চ্চনার জন্য আলপনা-দেওয়া পীঁড়ির উপর বসান হইল। তাহার পর পুরোহিতের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সম্প্রদাতা এবং বরের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইল :—

সম্প্রদাতা। (বরকে) আপনি ভাল আছেন ?

বর। আমি ভাল আছি।

সম্প্র। (অর্চ্চনা করিয়া) আমার কন্যা অপরাজিতাকে শুভ-বিবাহের জন্যে দান করব, তাই এই গন্ধাদি দিয়ে আপনাকে বরত্বে বরণ করছি।

বর। আচ্ছা, বৃত হলাম।

সম্প্র। তবে যথাবিহিত বরকর্ম্ম করুন।

বর। যথাজ্ঞান করছি।

ইহার পরে বরকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া আর কতকগুলি আচার পালন করা হইল। পুরস্ত্রীরা মৃদু কর্ণমর্দ্দন, কোমল মুষ্টির আঘাত ও সরস বিদ্রূপাদি দ্বারা বরকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। প্রাচীনকালে এই আচারগুলি রাক্ষস-বিবাহের পরিশিষ্ট ছিল। এখন ব্রাহ্ম বিবাহেও (হালের নয়, মনুবিহিত) অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপে পুরস্ত্রীদের বরণ হইয়া গেলে বরকে আবার সম্প্রদান স্থানে আনা হইল এবং সেই আলপনা দেওয়া পীঁড়ির উপর বসান হইল।

সম্প্রদাতা। এই বিষ্টর গ্রহণ করুন।

বর। গ্রহণ করলাম।

(বিষ্টর লইয়া পায়ের নীচে রাখিলেন। এটা বোধ হয় কুশাসনের বিকল্প।)

সম্প্র। এই পা ধোবার জল নিন।

বর। নিলাম।

সম্প্র। এই অর্ঘ্য নিন।

বর। অর্ঘ্য নিলাম।

(এইরূপে আচমনীয় ও মধুপর্ক দেওয়া হইলে পর)

সম্প্রদাতা। এই সবস্ত্রা, সালঙ্কারা প্রজাপতি দেবতাকা, অর্চ্চিতা কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করছি।

বর। (কামস্তুতি পাঠ করিয়া) কামদাতা, কাম-প্রতিগ্রহীতা, কামের দ্বারা গ্রহণ করলাম।

এই রকম করিয়া দান গ্রহণ কার্য্য শেষ হইল।

তাহার পর আরও কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের পর বর কন্যাকে বলিলেন—"তুমি শ্বশুর,শাশুড়ী, ননদ, দেবর সকলের উপর সম্রাজ্ঞী হও।" বর ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার সময় "কনকাঞ্জলি" দিয়া মাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে তিনি মার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছেন। কিন্তু দাসীর পরিবর্ত্তে সম্রাজ্ঞী লইয়া গিয়া বাড়ীর সকলের উপর শাসনভার দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বর যে শান্তিভঙ্গের সূচনা করিলেন, সেটা বোধ হয় তখন বুঝিলেন না।

তারপর দম্পতীর হৃদয়ের ঐক্য প্রার্থনা করিয়া, পুরোহিত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বর বলিলেন—"এই যে তোমার হৃদয় তা আমার হোক, আর এই যে আমার হৃদয় তা তোমার হোক।"

এই মন্ত্রবলে বিবাহের আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন হইল। মন্ত্রবলে আমাদের দেশে অনেক অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে, সুতরাং বর মন্ত্রবলে কন্যার আত্মাকে অধিকার করিবেন এবং কন্যা বরের আত্মাকে অধিকার করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বলা বাহুল্য উপরের লিখিত কথাবার্ত্তাগুলি সব সংস্কৃত ভাষায় হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় নাকি ইহার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য রাখা যায় না। ভাষাটা যত দুর্ব্বোধ হইবে, পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য ততই বাড়িবে। পুরোহিতের গৌরবও সেই পরিমাণে বাড়িবে।

যাক; এই সব আমি বেশ মনোযোগ দিয়া দেখিলাম এবং যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য দান সামগ্রীর মত কন্যাটিও একটি দান সামগ্রী মাত্র। এই দান-প্রতিগ্রহের মধ্যে তাহার বলিবারও কোন কথা নাই, করিবারও কোন কায নাই। বরের দিকে সে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিল—পুরোহিতের আদেশে—লোকে বলিল সেটা শুভদৃষ্টি। শুভাশুভ তখন ত তাহার বুঝিবার সময় নয়, কিন্তু বরকে দেখিয়া তাহারা কোনও অনুভূতি হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা গেল না।

আধ্যাত্মিকতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বরের কামস্তুতি পাঠটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জিনিষ। কামস্তুতিটা এই—

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ
কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ
প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ
কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে।

আমি জানিতাম না যে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের মধ্যে এত কাম আছে!

আধিভৌতিক অংশে প্রধান জিনিষ বস্ত্র, অলঙ্কার, ধন রত্ন ইত্যাদি। এ সকলের প্রাচুর্য্যের অভাব ছিল না। পাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী; যোগেন্দ্র বাবুর অবস্থাও সচ্ছল। সুতরাং মেয়েটিকে ধনরত্ন-সমন্বিতা করিয়া বিদ্বান্ বরকে দান করা হইল। অনেকে বলিলেন, বিদ্বত্বের অনুপাতে ধনরত্নের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছে, এবং যোগেন্দ্র বাবুর পরম বিশ্বাস-ভাজন আত্মীয়েরা বলিলেন, এত ধনরত্ন দানের ইচ্ছাটা যোগেন্দ্র বাবুর মনে স্বতঃই উদিত হয় নাই—বরের এবং তস্য পিতার নাকি কিছু ইঙ্গিত ছিল। সে যাহাই হউক, সেকালের বিবাহে এসব ছিল না। মেয়েকে বা মেয়ের জ্ঞাতিদিগকে কিছু দিবার কথা মনুতে আছে, কিন্তু ছেলেকে বা ছেলের পিতাকে কিছু দিবার বিধি কিছু দেখা যায় না। ব্রাহ্ম বিবাহে (হালের নয়, মনুবিহিত) ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া অর্চ্চনা করিয়া, কাপড় পরাইয়া, মেয়েটিকে দান করিয়া দিবে, অন্য কিছু নেওয়া দেওয়ার কোন কথাই নাই। ঋষিদের বিবাহে বরের নিকট হইতেই এক যোড়া বা দুই যোড়া গোরু

ধর্ম্মতঃ লওয়া যাইতে পারিত। আসুর বিবাহে কিছু দেওয়ার বিধি আছে, কিন্তু সেটা কন্যার জ্ঞাতিকে এবং সাধ্যমত কন্যাকে, বরকে বা বরের পিতাকে নয়। দেওয়া নেওয়া থাকিলেই বিবাহটা আসুর হইয়া যায়—"আসুরো দ্রবিনাদানাৎ।" ভদ্রসমাজে সেটা গর্হিত। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বিশিষ্ট ভদ্র সমাজেও সেটা বেশ চলিয়া যাইতেছে। এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের চেয়ে অর্থশাস্ত্রের শাসনই খুব প্রবল।

কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের চেয়েও প্রবল প্রতাপ আর একটা শাস্ত্র আছে, জৈব-ধর্ম্মশাস্ত্র। যেখানে পূর্ব্বরাগ নাই, সেখানে জৈবধর্ম্মের অস্তিত্বই প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু পরে এটা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, বিবাহিত ব্যক্তিদের সমস্ত জীবনকে পবিত্র, উন্নত, সুখময়, আনন্দময় অথবা কলুষিত, নীচ, দুঃখময় ও নিরানন্দ করিয়া দেয়। এই জৈবধর্ম্ম ইতর জীবে অন্ধ প্রবৃত্তি মাত্র; এবং অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে উচ্চতর জীবে আসঙ্গলিপ্সা ও আসক্তি। ইহারই উপর শারীরিক, মানসিক ও অন্যবিধ সৌন্দর্য্য আরোপিত হইয়া মানুষের প্রণয়। এই প্রণয় শব্দটি বড় সার্থক, ইহা প্রকৃষ্টরূপে দুটি জীবকে "নীয়ে"—একত্র করে। যে দুইটি জীব এইরূপে নীত হয়, তাহারা অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে এক প্রাণীর মধ্যেই জীবকোষরূপে অবস্থিতি করিত। ইহাদের মধ্যে পুংস্ত্রী জাতি ছিল। এখনও উদ্ভিদের মধ্যে, এবং অতি নিম্নস্তরস্থ প্রাণীর মধ্যে আছে। ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে হইতে পৃথক-শরীর পুরুষ-ও-স্ত্রী হইল। পৃথক শরীর হইল বটে, কিন্তু আদিতে একত্র অবস্থানের জন্য পরস্পরের যে সঙ্গ ছিল, সেই সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের তেমনি ভাবেই থাকিল, বরং আরও প্রবল হইল। এই প্রবল আসঙ্গলিপ্সা বা আকর্ষণের ফলে নানারকম সৌন্দর্য্য জীব-শরীরে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের আরোপ হইয়া ব্যাপারটা আরও রমণীয় ও কমনীয় হইয়া উঠিল। জৈবধর্ম্ম তখন প্রণয় নামে অভিহিত হইয়া মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। আর কবি, চিত্রকর, ভাস্কর সকলে দেশে তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (১)

কবি-শিরোমণি চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে?"

ইহার আধ্যাত্মিক উত্তর কিছু আছে কি না, এবং যদি থাকে তাহা কি, জানি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উত্তরটা বোধ হয়, উপরে লিখিত অভিব্যক্তিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই। কিন্তু অপরিণামদর্শী প্রণয়ীর অসংযত প্রণয়ের ফল সম্বন্ধে চণ্ডীদাস যে বলিয়াছেন—"মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে।"—তাহাও অতিশয় যথার্থ।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

---

(১) If we bear in mind how extremely important a part this relation of the two sexes plays in the whole organic nature, in the life of plants, of animals and of man; how this mutual attraction of the sexes, love, is the mainspring of the most remarkable processes—in fact one of the chief mechanical causes of the highest development of life—we cannot too greatly emphasise this tracing of love to its source—the attractive force of two erotic cells * * consider the part that the flowers, the sexual organs of the flowering plants play in nature, or the exuberance of wonderful phenomena that sexual selection produces in animal life; on the momentous influence of love in the life of man. In every case the fusion of two cells is the sole motive power * * * Comparative evolution leads us clearly and indubitably to the first source of love—the affinity of two different erotic cells, the sperm-cells and ovum.

Evolution of Man, by Ernst Haeckel.

Looking backwards we can discern that sex love has evolved in fineness without losing in intensity. It has become more complicated, more subtle, more psychical, more lasting. Up through the animal kingdom we see a crude stimulus being replaced by the psychical fondness and that being adorned by æsthetic embroideries.

Sex, by Patrick Geddes and Arthur Thompson.

জাহানারার সমাধি

তৃণ শষ্পে আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ওই সমাধির তলে
হৃদয়ের যে মহিমা-হীরকের দ্যুতিসম জ্বলে,
বিশ্বপ্রেম আত্মত্যাগ গরিমার যে আলোকরাজে—
নাই নাই তুল্য তার সম্পদ এ ধরণীর মাঝে।

ঐহিক ঐশ্বর্য্য 'পরে ঘৃণা ভরে পরশি চরণ
প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে কারা-দুঃখ করিলে বরণ,
স্বেচ্ছায় বন্দিনী হয়ে সহি শত কঠোর যাতনা,
পিতৃসেবা-মহাব্রত আজীবন করিলে সাধনা।

শারদ জ্যোছনা সম করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি-ধারা
উজ্জ্বল করিয়াছিল সে নিশ্মম অন্ধকার কারা,
বন্দীকৃত সম্রাটের সংসারের দাবদগ্ধ প্রাণ,
শীতল করিলে দেবি, ভক্তি-প্রীতি-সুধা করি দান।

কুমারী জননী ওগো, দুঃখীজনে দিতে মাতৃস্নেহ,
পুণ্যভূমি তাই আজি তোমার এ মর্ত্ত্য মৃত্যুগেহ,
দেবের নির্ম্মাল্য সম ওগো সতী পবিত্রতাময়ী,
বিশ্বলোকে ধন্যা তুমি, পূজ্যা তুমি, মহীয়সী অয়ি!

শ্রীঅমিয়া দেবী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। হৃষীকেশ-সিরিজ নং ১। কলিকাতা ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত ও ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে "বেঙ্গল বুক কোম্পানি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২০০+ ১৸৴০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

এই গ্রন্থখানি পরলোকগত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনী-প্রসঙ্গ। বিভিন্ন লেখক রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, নলিনীরঞ্জন বাবু সেই সকল একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; তাহা ছাড়া নলিনী-বাবুর স্বলিখিত "রামেন্দ্র-কথা"ও ইহাতে আছে। যে সকল সাহিত্যরথিগণের রচনা এই গ্রন্থকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাঁহাদের নামের তালিকা দেখিলেই গ্রন্থগৌরব সম্যক্ বুঝা যাইবে—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিপিনবিহারী গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। গ্রন্থে পাঁচখানি হাফ্‌টোন চিত্র আছে, তন্মধ্যে মুখপাতের খানি রঙীন; ইহাতে রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফী পাশাপাশি দণ্ডায়মান। রামেন্দ্র বাবুর পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" রবীন্দ্র বাবুর স্বহস্তলিখিত যে অভিনন্দনপত্রখানি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহারও একখানি আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বশুদ্ধ গ্রন্থখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বলিতে হইবে। নলিনী বাবু ইহা সম্পাদন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বহিখানির কাগজ, ছাপা, ছবি, বাঁধাই সবই সুন্দর। বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতির ব্যয়াধিক্য বিবেচনা করিলে মূল্য ২৲ খুবই সুলভ হইয়াছে।

ঝুমিয়ার দেনা—শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। বোলপুর শান্তি-নিকেতন প্রেসে মুদ্রিত এবং শান্তি নিকেতন হইতে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

এখানি গল্পেরবহি। মোট সাতটি গল্প ইহাতে সন্নিবেশিত

হইয়াছে। কয়টি গল্পই বেশ সরস ও সুচিন্তিত, এবং আগাগোড়া সহজ ও চলিত কথায় গল্প বলার ভাষায় লিখিত। পড়িতে পড়িতে মনে হয় বুঝি বালকদিগের জন্যই ইহা রচিত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক তাহা নহে, ইহা সকলেরই পাঠোপযোগী হইয়াছে। সহজ গল্পের ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার বিষয়গুলি তেমন সহজ নহে। গ্রন্থকর্ত্রী এই গল্পগুলির ভিতর ধর্ম্ম. কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যানুরাগ, মানব-বৎসলতা, পরার্থপরতা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সংযম প্রভৃতি অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন,—ইহাই দুনিয়ার দেনা। গল্পচ্ছলে এরূপ সহজ কথায় ও সরল ভাষায় এ ধরণের পুস্তক আমরা আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কথা-সাহিত্যে এরূপ পুস্তকের বহু প্রয়োজন আছে। শিক্ষার বিষয়গুলি কঠিন হইলেও ভাষা ও রচনাসৌষ্ঠবে বহিখানি বালকদিগেরও মুখরোচক ও বোধগম্য হইবার পক্ষে উপযোগী হইয়াছে, বলা যায়। বালকদিগকে নিছক কতকগুলা কাল্পনিক বাজে আজগুবি আষাঢ়ে গল্প পড়ানর চেয়ে এরূপ কাযের গল্প শিক্ষা দেওয়ায় প্রভূত উপকার ও মঙ্গল আছে। রচয়িত্রীর এ শুভ চেষ্টা আমরা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয় মনে করি।

পুস্তকখানি স্বর্গীয়া বিদুষী সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্মৃতি-উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাদসা পিরু—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। কলিকাতা, ২২।৫ নং রামাপুকুর লেন, বি, পি, এম্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীবাদলচন্দ্র মজুমদার, ২৩নং রামাপুকুর লেন। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। দরিদ্রঘরের মেয়ে সুন্দরী ও গুণশালিনী হইলেও গর্ব্বিত ও মনুষ্যত্বহীন ধনীর গৃহে বিবাহিত হইলে সচরাচর যে অশান্তি ঘটিয়া থাকে, ইহাতে তাহারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র দেখানো হইয়াছে। গ্রন্থকার যে সুলেখক এবং সমাজতত্ত্বজ্ঞ,আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাইলাম। শুধু তাই নয়, সামাজিক উপন্যাস লিখিবার ক্ষমতাও তাঁর বেশ আছে। সমাজের ভিতরকার চরিত্র, ভাবভঙ্গি, চালচলন এমন খুঁটিনাটি করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা ও তাহা উপন্যাসের ভিতর দিয়া এমন যথাযথভাবে ফুটাইয়া তুলিতে কয়জন পারেন? সত্যেন্দ্র বাবু এরূপ সমাজ-চরিত্র চিত্রাঙ্কনে নিপুণহস্ত। উপন্যাসে পিরু বাদসা, ইন্দিরা ও লীলার চরিত্র—চরিত্রের মত চরিত্র। পাঠকগণ পিরু বাদসার চরিত্র পাঠে একদিকে যেমন অনেক শিক্ষালাভ করিবেন, অন্য দিকে তেমনি স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইবেন। তারপর বিন্দু ঝির চরিত্র-কাহিনী গ্রন্থকারের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলা যায়। ইহা এমন চিত্তাকর্ষক যে বারবার পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। এই বিন্দু ঝি এবং পিরু বাদসার চরিত্র-কাহিনী আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। আমরা পাঠকগণকে ইহা বিশেষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উপন্যাসে দুর্ব্বৃত্ত ও "আদুরে দুলাল" সরসীমোহন ও তাঁহার মনুষ্যত্ববিহীন ধনী পিতামাতার যে নারকীয় চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা খুব বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কোনখানে একটুও মাত্রা অতিক্রম করে নাই। গ্রন্থকারের ভাষা-সৌষ্ঠব ও রচনা-কৌশলে গ্রন্থখানি বড়ই সুপাঠ্য হইয়াছে। পাঠক-সমাজে উপন্যাসখানি আদরলাভ করিবে আমরা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

উইলিয়াম টেল বা সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন বি-এ সঙ্কলিত। কলিকাতা ২৫নং রায় বাগান ষ্ট্রীট, "ভারত মিহির" যন্ত্রে মুদ্রিত ও সিরাজগঞ্জ, ভারতী লাইব্রেরী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷৹

এই গ্রন্থখানি William Tell নামক একখানি ইংরাজী পুস্তকের সরল বঙ্গানুবাদ। এক সময়ে অষ্ট্রিয়া-রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা সুইজারল্যাণ্ড-বাসিদিগের উপর শাসনের নামে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন করিতেন এবং কিরূপ পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ উইলিয়ম টেল তাঁহার জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ডকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারই অপূর্ব্ব কাহিনী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। পাঠকগণ অষ্ট্রিয়ার শাসনকর্ত্তাদিগের লোমহর্ষণকারী অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে যেমন স্তম্ভিত হইবেন, তেমনই উৎপীড়িত সুইজারল্যাণ্ডবাসী ও বীরগণের শত্রুবর্গের প্রতি সদাশয়তাপ্রদর্শনের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন। পুস্তকখানি বেশ সহজ ও সরল ভাষায় এমন করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। বইখানি বালকদিগের বেশ পাঠোপযোগী হইয়াছে।

ভিখারিণী-শৈল। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৮।১ নং ফকীরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট, "কাত্যায়নী" প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম-এ, ও শ্রীযোগজীবন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬পেজি, ১১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸৹

ইহা একখানি ছোট উপন্যাস। বহিখানি পাঠকরিয়া

আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। আখ্যানভাগ নূতন না হইলেও, লেখার গুণে বেশ চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক হইয়াছে। গৃহস্থ সংসারে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কত স্বামী প্রথম-জীবনে কুসঙ্গে পড়িয়া জীবনটাকে নরকের অভিমুখে অগ্রসর করে, এবং তাহার ফলে কখনও কখনও পতিপ্রাণা অবলা স্ত্রীর উপর কত প্রকারের অযথা অমানুষিক নৃশংস আচরণ দেখাইয়া কত প্রকারের বিভ্রাট ও অশান্তি আনয়ন করে। তারপর ভাগ্যক্রমে সে মোহ ও ভ্রান্তি কাটিয়া গেলে, আত্মকৃত অপরাধের জন্য একান্ত অনুতপ্ত হইয়া আবার স্ত্রীকে আদর করিয়া গ্রহণ ও সংসারধর্ম্ম পালন করে। আলোচ্য উপন্যাসে তাহারই একটি সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করা হইয়াছে। নায়ক ও নায়িকা (সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালা) এবং আনুষঙ্গিক সকল চরিত্রই অল্পাধিক ভাবে বেশ ফুটিয়াছে। চরিত্রগুলির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, শৈল, রাণী এবং উষার চরিত্র আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিল।

পথ ও পাথেয়—শেখ ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রণীত। ১১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট "নববিভাকর" যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক মউল উদ্দীন হোসায়ন বি-এ, নূর লাইব্রেরী, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

ইহা একখানি মোসলমান ধর্ম্ম এবং নীতি ও কর্ত্তব্য বিষয়ক উপাদেয় উপদেশ-গ্রন্থ। গ্রন্থকার এই পুস্তকে কতিপয় মুসলমান মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের কাহিনী, তাঁহাদের সাধন প্রণালী এবং চিন্তা ও সাধনলব্ধ কতকগুলি অমৃতময় অমূল্য উক্তি বা উপদেশাবলী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। সত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও তপস্যা এবং সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এরূপ গ্রন্থ ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই পাঠ করিতে পারেন। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করিবার কাল আর নাই, থাকাও উচিত নয়, এজন্য আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার গ্রন্থের অবতরণিকায় অনেক আবশ্যক কথার অবতারণা করিয়াছেন, আমরা পাঠকগণকে তাহা বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি।

হাসি-পরিহাস। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত। ঢাকা, লক্ষ্মীবাজার, হেনা প্রেসে মুদ্রিত ও ৫৩৯ নং দয়াগঞ্জ রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১২ পেজি, ৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৹

পুস্তকখানি কতকগুলি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতার সমষ্টি; সুবিখ্যাত ব্যঙ্গরসকবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত ব্যঙ্গ কবিতার ভাব ও ছন্দানুকরণে লিখিত। অনুকরণে গ্রন্থকার কতদূর সফল হইয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। অনুকরণ কার্য্যটা অনেকে যতটা সহজ মনে করেন, আমরা ততটা সহজ মনে করি না। তাহা শক্তি ও সাধন-সাপেক্ষ। দুঃখের বিষয় আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। এরূপ নীরস ও ব্যর্থ ব্যঙ্গকবিতা সাহিত্যের বাজারে নিতান্তই অচল।

লহরী-কাব্য। কাজী আব্দার রেজাক শেরিকাবাদী প্রণীত। বিডন ষ্ট্রীট, ৮।২ নং কাশী ঘোষ লেন, "বিদ্যোদয়" প্রেসে মুদ্রিত; জেলা বৰ্দ্ধমান, কৈচর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্কাপ ১৬ পেজি, ৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ||৹

ইহা কবিতার বহি। রচয়িতা গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—"যখন আমি এই কাব্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করি, তখন আমার বয়স সতেরোর কিছু কম হইবে।" তার পরেও আবার লিখিয়াছেন—"এক্ষণে সবেমাত্র দুই বৎসর অতীত হইয়াছে।" সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু কবিতাগুলি অতি কষ্টেসৃষ্টে পাঠ করিয়া বুঝিলাম, বালক গ্রন্থকার এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া বালকত্ব বা ছেলেমিই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কবিতার কিছুই নাই।

বালগঙ্গাধর তিলকের তিরোভাব।—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। হাওড়া কর্ম্মযোগ প্রেসে মুদ্রিত; কলিকাতা, ২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট "ভাষা পরিষৎ" হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি, ১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ⁄১০

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লোকমান্য মহাত্মা তিলক মহারাজের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত। রচয়িতা কবিতার ভাষায় তাঁহার মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। কতকগুলি অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ বড় বড় কথার সমাবেশ না করিয়া, বেশ সরল ও সাদাসিধে ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে লিখিত হইলে, আমাদের বিশ্বাস ইহা অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইত।

পুস্তকের প্রথমেই তিলক মহারাজের একখানি সুন্দর ছবি দেওয়া হইয়াছে।

"কমলাকান্ত"।



পরলোকগত কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন

নেত্র-বহ্নি

পড়েছে বিকট ব্যাঘ্র বন্দুকের ঘায়,
শিকারী শাবকে তার বাঁধিছে শিকলে,
শক্তিহারা—রোষদৃপ্ত চক্ষে শুধু চায়—
নড়িবার ক্ষীণ চেষ্টা যায় যে বিফলে।

কি আকাঙ্ক্ষা, কি অতৃপ্তি জাগে বক্ষে তার,
কি বেদনা বেজে উঠে উষ্ণ তার প্রাণে!
দেখেনা তা বিজয়ীর তীব্র অহঙ্কার,
দৃষ্টি তার ডুবে যায় উল্লাসের বানে।

এ যেন রে নৃপতির বক্ষ হতে টানি
রাজপুত্রে ছেলেধরা লয়ে যায় জোরে!
এ যেন রে প্রহরীর কর দুটি বাঁধি
রত্নাগার সম্মুখেতে লুটে লয় চোরে।

হে নৃশংস, হে দাম্ভিক অভিমানী নর!
করুণার ক্ষীণ কণা যদি তুমি চাও,
ও আঁখির অভিশাপ অতি খরতর—
ভস্ম হবে—ধ্বংস হবে—যাও সরে যাও।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সাহিত্য-সমাচার

শোক-সংবাদ

(১) পরলোকগত দেবেন্দ্রনাথ সেন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেরাডুন শৈলাবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, ইদানী কয়েক বৎসর হইতে ওকালতী ত্যাগ করিয়া, স্বাস্থ্যলাভের আশায় নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে পর্য্যায়ক্রমে বসতি করিতেছিলেন।. দেরাডুনে অনেক দিন ছিলেন। কলিকাতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামক বিদ্যালয় তাঁহারই স্থাপিত; ঐ বিদ্যালয়ে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, কলিকাতায় আসিয়া বৎসরাধিক কাল অবস্থান করেন! পীড়িত হইয়া, পূজার পূর্ব্বে তিনি দেরাডুন চলিয়া যান, সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একটি আলোচনামূলক প্রবন্ধ আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিব ইচ্ছা আছে। কবিবরের একখানি চিত্র পূর্ব্বপৃষ্ঠায় আমরা মুদ্রিত করিলাম।

(২) পরলোকগত জে, ডি, অ্যাণ্ডার্সন

ভারতীয় সিভিলিয়ন, চট্টগ্রাম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ডক্টর জে, ডি, অ্যাণ্ডার্সন এম্‌.এ, ডি লিট্‌ মহাশয় পেন্সন লইয়া বিলাতে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্য তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ভারতীয় বহুভাষায়—বিশেষতঃ বঙ্গভাষায়—তিনি সম্যক্‌ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা" ও অন্যান্য বাঙ্গালা পুস্তকের অনুবাদও তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। লণ্ডনের Times পত্রিকায় Literary Supplementএ তিনি অনেক 'বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত "হাসির তোড়া" প্রকাশিত হইল, মূল্য ৸৹

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু প্রণীত "মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ" (জীবনী) প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৷৹

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



আগ্রাদুর্গশিখরে যোধাবাঈ।

(চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের সৌজন্যে)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১২শ বর্ষ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৭

২য় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

নবশিক্ষা-বিধান

"What India chiefly needs is not official encouragement and vicarious liberality of Government so much as public appreciation of what good and solid education is and by what means it can be supplied to the people at large."

Nature, October 23, 1919, p. 156.

গত কয়েক বৎসরব্যাপী "প্রলয়পয়োধি জলে" য়ুরোপের অনেক রাজা, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে মানবের অনেক আশা, আশঙ্কা ও সংস্কার ভাসিয়া গিয়াছে। তাই প্রলয়ান্তে পাশ্চাত্য জগতে reconstruction বা নূতন পত্তনের তাড়াহুড়ো পড়িয়া গিয়াছে। সমাজের নব-কলেবর গঠন কাজে শিক্ষাকেই করা হইতেছে প্রধান উপায়। পাশ্চাত্য জগদ্‌ব্যাপী প্রলয়ের ঢেউ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবাসীর গায়ে না লাগিয়া থাকিলেও, পরোক্ষে ধাক্কা দিয়াছে বড়ই ভীষণ। এই ধাক্কার চোটে স্বাভাবিক জড়তা অতিক্রম করিয়া আমাদের সমাজদেহ হাত পা আছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন আমরা যে ভাবে ছিলাম, সেই ভাবে আমাদিগকে ফেলিয়া রাখা, অথবা আমাদের থাকা, চলে না, এ কথা আমাদের অভিভাবক বৃটিশ জাতিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে যে হিসাবে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিতেছেন, তাহা আমাদের অনেকের কাছেই সুবিধাজনক মনে হইতেছে না। অভিভাবকের কাঁধে ভর করিয়া যতটা চলা যায়, ততটা চলিয়া তৃপ্ত থাকা আর সম্ভব নহে। কিন্তু কেহ কেহ যতটা বেগে ছুটিতে বলিতেছেন, বা ছুটাইতে চাহিতেছেন, ততটাও সম্ভব মনে হয় না। কেননা, এখন যে ছুটাছুটি দেখা যাইতেছে, তাহা ঐ ভীষণ ধাক্কার ফল। ধাক্কার জের মিটিয়া গেলে হয়ত আবার পুরুষপরম্পরাগত জড়তা আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে। এই জড়তা অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি না জন্মিলে,

ইচ্ছা থাকিলেও আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না। এই শক্তি লাভের জন্য রীতিমত কস্রৎ বা অভ্যাস চাই।

আমাদের অগ্রগমনের এক বাধা যেমন আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ জড়তা, আর এক বাধা বিদেশীয়গণের প্রতিযোগিতা। আমাদের প্রতি পদেই য়ুরোপীয়, মার্কিণ ও জাপানীগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে হইতেছে। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদিগকে 'জনাজাত' বুদ্ধি-শক্তিতে, ইচ্ছা-শক্তিতে, এবং ক্রিয়া-শক্তিতে য়ুরোপীয়গণের সমকক্ষ হইতে হইবে। এরূপ জনাজাত সমকক্ষতা লাভের একমাত্র উপায়—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার।

এখন জিজ্ঞাস্য, প্রকৃত শিক্ষা কি? কি প্রকার শিক্ষা আমাদিগকে জড়তামুক্ত এবং প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিবে? এইরূপ প্রশ্ন শুনিবামাত্র অনেকেই বলিয়া উঠিবেন, "রেখে দেও তোমার ওসব বড় কথা। অন্নচিন্তা চমৎকার। দেশের লোক আগে দুটা মোটা ভাত খাইয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লউক; তার পর দেখা যাইবে।" এই শ্রেণীর লোকের মতে, এখন কেবল এক-প্রকার শিক্ষার দিকে সকলের মনোনিবেশ করা উচিত। যাহা কিছু সম্বল আছে তাহা লইয়া এখন কেবল এক অর্থকরী হাতের কাজ শিক্ষার (technical education) ব্যবস্থা করা উচিত; বিশ্ববিদ্যালয়ের অকেজো বিজ্ঞান-দর্শনাদির শিক্ষা (pure science—science for its own sake) পোষাকি ব্যাপার; তাহা আপাতত বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি এই কথা ঠিক হইত, যদি পোষাকি উচ্চশিক্ষা মকুফ রাখিয়া অর্থকরী কাজ শিক্ষা দিলেই দেশের অন্নসমস্যার সমাধান হইত, তাহা হইলে গোলদীঘির ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন উচ্চরবে বলিতাম—প্রেসিডেন্সি কলেজ, য়ুনিভার্সিটি কলেজ উঠাইয়া দিয়া, সেই টাকাকড়ি ঘরবাড়ী অর্থকরী কাজ শিক্ষায় নিয়োজিত করা হউক। কিন্তু—

"টেনে ফেল বাহ্যবস্ত্র ছিঁড়ে ফেল কুশ"

করিলেই কি দেশের লোক পেট ভরা মাছ ভাত খাইয়া বসে ঘুম দিবার অবকাশ পাইবে? আমাদের বিশ্বাস, পাইবে না। কেন না সেখানে প্রতিযোগিতা ঘোরতর বাধা উপস্থিত করিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ধর, একটা টেক্‌নিকাল কলেজ করিয়া কতকগুলি যুবককে কোন একটা যন্ত্র তৈয়ার করিতে শিখান হইল। তারপর সেই যুবকেরা ধনী জুটাইয়া, সেই যন্ত্র তৈয়ারির কারখানা খুলিয়া, নিজেদের কারখানায় তৈয়ারি কতক-গুলি যন্ত্র বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইল। বাজারে যন্ত্রগুলি উপস্থিত হইবামাত্রই বিদেশীয় কারিগরের সহিত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইবে। বিদেশীয় কারিগরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া এদেশীয় কারিগরেরা পারিয়া উঠিবে কি? আমাদের বিশ্বাস, পারিবে না; হাতে প্রচুর মূলধন থাকিলেও পারিবে না। কেন না, বিদেশী কারিগরের পিছনে প্রচুরতর না হউক, আবশ্যক মূলধন ত আছেই; তাহা ছাড়া, তাহাদের পিছনে আছে তাহাদের দেশের বৈজ্ঞানিকের মাথা এবং রাষ্ট্রীয় বল। আমাদের দেশের কারিগর, বিদেশী ওস্তাদের কাছে একটা কিছু তৈয়ার করিতে শিখিয়া আসিয়া যখন সেই বস্তু তৈয়ারি করিয়া বাজারে পাঠাইবে, তখন বিদেশীয় ওস্তাদ কারিগরেরা অবশ্য বসিয়া থাকিবে না। তাহারা কি করিবে? তাহারা তাহাদের বৈজ্ঞানিক-গণের কাছে গিয়া বলিবে, "তোমরা ত সর্ব্বদাই নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টায় আছ। আমাদের এই যন্ত্রটি ভারতবর্ষের বাজারে আর চলে না। সেখানে দেশী জিনিষ উঠিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে বলিয়া দাও, যে প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই যন্ত্রের আদর, সেই প্রয়োজন-সাধক ইহা অপেক্ষা সুবিধাজনক, ইহা অপেক্ষা সস্তা আর কোনও যন্ত্র তৈয়ারি করিবার উপায় কি?" বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত। সুতরাং কারিগরের প্রার্থনা ব্যর্থ না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। তার পর, রাষ্ট্রীয় শক্তি সেই নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রকে ভারতের বাজারে ঠেলিয়া দিয়া, ক্রেতার সামনে

রাখিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিবে। সুতরাং এদেশীয় কারিগরের পারিয়া উঠার আশা কি,?

আমাদের দেশের অন্নকষ্ট দূর করিতে হইলেও অর্থকর বিজ্ঞানে (applied science) অভিজ্ঞ কারিগরের পিছনে একদল একনিষ্ঠ তথ্যান্বেষী বিজ্ঞান-সাধকের তথা রাষ্ট্রীয় বলের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের দুই অঙ্গ, সরকার (government) ও প্রজাসাধারণ। সরকারের শক্তি দেশী লোকের হাতে নাই; নব শাসনরীতি প্রচলিত হইলে সে শক্তির কতটা হিস্যা যে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণের হাতে আসিবে তাহা এখন অনুমান করা কঠিন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তির অপর অঙ্গ লোক-শক্তি জনসাধারণের নিজস্ব। দেশের হিতসাধন করিতে হইলে লোকশক্তিকে সমৃদ্ধ, সম্বদ্ধ, সম্বর্দ্ধিত, সংযত হইয়া লোকহিতকর কার্য্যে অবিরাম সচেষ্ট থাকিতে হইবে। লোকশক্তি এইরূপ সমৃদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত হইবে কিসে? প্রকৃত লোকশক্তি স্ফূর্ত্তি পাইবে লোকসাধারণ সুশিক্ষিত হইলে। সুশিক্ষা কাহাকে বলে? যে শিক্ষা মানুষকে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্ দান করে এবং সম্যক্-কর্ম্মা করিতে পারে, তাহাই সুশিক্ষা। অথবা যে চেষ্টা মানুষকে যথাযথ দেখিতে, যথাবিধি ভাবিতে, যথার্থ পথ বাছিতে এবং বাছাই করা পথে অশ্রান্তভাবে চলিতে সমর্থ করে, তাহাই সুশিক্ষা। যে দেশের লোক-সাধারণ এই প্রকারে শিক্ষিত, সে দেশে লোকশক্তি আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুশিক্ষার নানাপ্রকার যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রগুলিকে দুই অংশে বিভাগ করা যায়। একভাগ কাব্য ও ললিতকলা; আর একভাগ বিবিধ বিজ্ঞান। কাব্যের ও ললিতকলার অনুশীলনের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্তের দীনতা, সঙ্কীর্ণতা ও কৃপণতা দূর হয়। যাহার চিত্ত শুদ্ধ নহে, তাহার পক্ষে সম্যক্ দৃষ্টি সহজ নয়। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মাত্রেরই অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিদ্যার্থীর সম্যক্ দৃষ্টিশক্তির বিকাশসাধন। সম্যক্ দৃষ্টি অর্থ বাহ্য এবং আন্তর এই দুই প্রকার দৃষ্টিই বুঝিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকের তিনটি কাজ, বাহ্য বস্তুর যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ; পর্য্যবেক্ষিত, বস্তুর যথাযথ বর্ণনা; পর্য্যবেক্ষণের প্রমাণ অবলম্বনে যথারীতি সিদ্ধান্তস্থাপন। বাহ্য বস্তুর যথাযথ পর্য্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হইলে সম্যক্ বাহ্যদৃষ্টির বিকাশ হয়; এবং পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ প্রমাণ অবলম্বনে যথারীতি সিদ্ধান্ত স্থাপনে অভ্যস্ত হইলে অন্তর্দৃষ্টি স্ফূর্ত্তি পায়। যে কোন বিজ্ঞান যথাবিধি অনুশীলন করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যখন বিজ্ঞান মাত্রই শিক্ষার হিসাবে সমান কার্য্যকর, তখন দুই চারিটি বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই ত যথেষ্ট; সকলপ্রকার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া ফল কি? কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। কেননা বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন রকম এবং যোগ্যতাও বিভিন্ন রকম। সকল রকমের লোককে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হইলে, সকল প্রকার বিজ্ঞান শিক্ষারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহারা যথাসম্ভব বিভিন্ন বিজ্ঞান অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের, অশেষ কল্যাণের সূচনা করিতেছেন। কেননা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া পারিবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি লোকশক্তি সমৃদ্ধ না হইলে প্রকৃত লোকহিতসাধন সুকঠিন হয়, এবং লোকশক্তি সমৃদ্ধ করিতে হইলে যদি দেশের আপামর সাধারণকে সুশিক্ষিত করা দরকার হয়, তবে ব্যাপার বড়ই গুরুতর। এই বাঙ্গলায় প্রায় ৪ কোটি নরনারীর বাস। এই ৪ কোটি নরনারীকে যথারীতি দেখিতে, ভাবিতে, বাছিতে, কাজ করিতে শিখান কি সোজা কথা? আমাদের উত্তর, কাজটা সোজা না হউক, একবারে অসম্ভব নয়। সুশিক্ষা বলিলেই সকলস্থলে উচ্চশিক্ষা বুঝায় না।

শিক্ষার তিনটি স্তর—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং উচ্চ। প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীরই আবশ্যক; মাধ্যমিক শিক্ষাও অধিকাংশেরই আবশ্যক; এবং দেশের

সকল প্রকার অনুষ্ঠানের শিক্ষকের এবং নেতার কাজ চালাইবার জন্য অনেকগুলি উচ্চশিক্ষিত লোকেরও (aristocracy of talents) বিশেষ আবশ্যক!

অনেকে বলিতে পারেন, দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ এই সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; এবং তাহার ফলে লোকশক্তি যতটা উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর, ততটা হইয়াছে; অতঃপর শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকশক্তিও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যে হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, সেই হুড়াহুড়ির প্রয়োজন কি? উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে যাহারা সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাহারা জনাজাত শিক্ষিত সাহেব বা শিক্ষিত জাপানীর সমকক্ষ কি? যদি তা না হয়, তবে অবশ্য আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমষ্টিতেও য়ুরোপের, আমেরিকার বা জাপানের সমকক্ষ হইতে পারি না। আমাদের এই কথা কেহ স্বীকার করুন আর না করুন, আমাদের এদেশে এখন যে উচ্চ শিক্ষারীতি প্রচলিত, তাহা যে, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা-রীতি প্রচলিত ছিল তাহার নুকল মাত্র, এবং লণ্ডনের রীতি যে এখন অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে, একথা ত কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এদেশে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় সরকার যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তখন তাহার লক্ষ্য ছিল—নিম্নস্তরের রাজকর্ম্মচারী অর্থাৎ নকলনবীস তৈয়ারি করা। তার পর বিশ্ববিদ্যালয় যখন সৃষ্ট হইল, তখন তাহাকে পরীক্ষকের আকার দেওয়া হইল, শিক্ষকতাও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ একথা উত্থাপিতই হইল না। অতএব এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল বিদ্যালয় খোলা হইল, তাহাদের শিক্ষকগণের প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব্য হইল ছাত্রদিগকে 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' পরীক্ষার দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

শিক্ষাদান, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করান, এই দুই কাজের মধ্যে তফাৎ কি তাহা এখানে আলোচনা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে দেখিতে অভ্যাস করান, নিজে নিজে ভাবিতে অভ্যাস করান, এবং মনের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে অভ্যাস করান। এই প্রকার অভ্যাস অর্জ্জনই দীর্ঘকাল শিক্ষাধীন থাকার মুখ্য লাভ; কেননা এইপ্রকার অভ্যাস দৃঢ় করিয়া লইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে, সংসারযাত্রীর বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষার্থী যে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি এবারত শিক্ষা করে, সে এবারত সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়া তাহার গৌণলাভ। এই প্রকার তথ্যজ্ঞান জীবনযাত্রার কাজে আসিতে পারে, নাও পারে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার, বিচার করিবার অভ্যাস একবার হইয়া গেলে তাহা সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য কাজে আসিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নের লিখিত উত্তর আদায় করিতে গেলে পরীক্ষার্থী কতটা এবারত উদরস্থ করিয়াছে তাহারই পরখ হইতে পারে; পরীক্ষার্থীর দেখিবার, শুনিবার, বিচার করিবার অভ্যাস কেমনতর এবং কতটা দৃঢ় হইল তাহার ভালরকম পরখ করা সুকঠিন। যখন পরীক্ষা হইতে থাকে উদরস্থ বা কণ্ঠস্থ এবারতের, তখন অবশ্য শিক্ষারীতিও পরীক্ষামুখী হইয়া যায়। এই কারণে আমাদের দেশের শিক্ষা আগাগোড়াই পরীক্ষামুখী হইয়া গিয়াছিল। পরলোকগত স্যর আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার যখন বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন রীতি (বস্তু অবলম্বনে শিক্ষাদান), ও কিছু কিঞ্চিৎ প্রাণিবিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেড্‌লারের আমলে এই লেখকের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের সহিত কিছু সম্পর্ক ছিল। পেড্‌লারের সে চেষ্টা যে সফল হয় নাই, এ কথা সকলেই বোধ হয় জানেন। কেন সফল হয় নাই, তাহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, অভিভাবকগণের ঔদাসীন্য, স্থলবিশেষে বিরুদ্ধাচরণ। অনেক মুরব্বিলোক নব

শিক্ষারীতি লইয়া খুব ঠাট্টা তামাসা করিতেন, কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি তাহার ভিতরে একটা ঘোরতর দুরভিসন্ধি দেখিতে পাইতেন। দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষকগণের ঔদাসীন্য এবং অনভিজ্ঞতা। অভিভাবক এবং শিক্ষকগণের এই যে ঔদাসীন্য এবং জিনিষটীকে ভাল করিয়া বুঝিবার অসামর্থ্যের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যাইতে পারে না; ইহার জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে দায়ী, তাঁহারা যে রীতিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন সেই দুষ্ট শিক্ষারীতি। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ শিক্ষিত হইয়াছেন নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের লিখিত উত্তর দানের সামর্থ্য লাভের জন্য অর্দ্ধজীবন অপব্যয়িত করিয়া। সুতরাং তাঁহারা কিণ্ডারগার্টেনের মহিমা কেমন করিয়া বুঝিবেন? নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি বলে নাই বুঝুন, যাঁহারা ও জিনিষটার পাণ্ডা তাঁহাদের লেখা পড়িয়া বা কথা শুনিয়া বুঝিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। কারণ মনটা বিদ্যালয়ে পড়া পুথিলব্ধ এবারতে একরূপ বোঝাই। সেই এবারতগুলিও আবার ভাল করিয়া হজম হয় নাই; তাহা হইতে অনবরত গ্যাস উঠিতেছে। সুতরাং মনের মধ্যে যেটুকু খালি যায়গা আছে, তাহাও গ্যাসে বোঝাই। তার উপর মনের দরজা জানালা খুলিয়া রাখার অভ্যাস মোটেই নাই। যখন বা কোনও নূতন ভাবের হাওয়া তন্মধ্যে কোনও একটা গবাক্ষ ঠেলিয়া একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ঢুকিতে চায়, বাঁধা বুলিতে ও গ্যাসে ভরপূর মনের মধ্যে যায়গা না পাইয়া অমনি ফিরিয়া পালায়। পেড্‌লার প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগে যে নবরীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, সেই রীতির ভাগ্যে উপরিউক্ত দশা ঘটিয়াছিল। আমাদের বিদ্যার তহবীলে যে কিছু সঞ্চিত বুলি আছে, তাহার সহিত উহা খাপ খাইল না; আমাদের আলস্য, আমাদের অহমিকা আমাদিগকে এই নবরীতির গুণাগুণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচারের অবসর দিল না, কাজেই তাহা বর্জ্জিত হইয়া গেল।" কিণ্ডারগার্টেন রীতির শোচনীয় পরিণাম হিসাব করিলে সহজেই মনে হয়, অভিভাবক ও শিক্ষকগণের অর্থাৎ লোকমতের সহায়তা ব্যতিরেকে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার অসম্ভব। সুতরাং গাছের গোড়ায় জল না ঢালিয়া, আগায় জল ঢালার ব্যবস্থা —অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ীয় শিক্ষারীতির সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

শিশুশিক্ষার উৎকৃষ্ট রীতি, শিশুর হৃদয়ে সম্যক্ দৃষ্টিশক্তির বীজ বপনের উপায় যেমন বস্তু অবলম্বনে শিক্ষা (object lessons), যুবকের সম্যক্‌দৃষ্টি লাভের উৎকৃষ্ট রীতিও তেমনি বস্তু-অবলম্বনে শিক্ষা। কিন্তু উভয়শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে প্রভেদ এই, শিশু শিখিবে শিক্ষকদিগের দেখা শুনা জানা পুরাতন বস্তু নূতন করিয়া নিজের চোখে দেখিয়া নিজে চিনিয়া; আর যুবক শিখিবে শিক্ষকের পরিচালনের অধীনে অপরের অদেখা অজানা বস্তুর অনুসন্ধান অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা করিয়া। শিক্ষার্থী যুবকের পক্ষে মৌলিক গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু মানবজ্ঞান-ভাণ্ডারে নূতন কিছু যোগান নহে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইলে তাহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল এমন মনে করা যাইতে পারে না। শিক্ষার্থী যুবকের মৌলিক গবেষণার মুখ্য প্রয়োজন, শরীরপুষ্টির জন্য দৌড়াদৌড়ি করার মত, তাহার সম্যক দৃষ্টিশক্তি বিকশিত করিয়া দেওয়া। স্বাধীন অনুসন্ধানমুখী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা-পদবাচ্য এবং মৌলিক অনুসন্ধানমুখী শিক্ষা উচ্চশিক্ষা-পদবাচ্য।

এতক্ষণ যে কথাগুলি টানিয়া বুনিয়া কষ্টেসৃষ্টে বলিতে চেষ্টা করিলাম, তাহার অনেক কথা যদি কেহ সহজ সুন্দর ভাষায় বিবৃত দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে "শান্তিনিকেতন" নামক পত্রের প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলিতে এই বিষয়ে পূজ্যপাদ দেশগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। এখানে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিব:—

"শিক্ষার প্রকৃতক্ষেত্র সেইখানে যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যকাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে

হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্য্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কার্য্যে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে; সেই উৎস-ধারার নির্ঝরিণী-তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।" (বৈশাখ, ১৩২৬)

আমাদের শিক্ষা কেন ব্যর্থ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"ভাণ্ডার ঘর যেমন করিয়া আহার্য্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা কিছু পায়, হিসাব মিলাইয়া প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মত ভাড়া খাটিয়া বাহিরে বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়ি ও বাহিরে তেমন করিয়া ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়াও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝুলাইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল মুছিতেছে; তাহার একমাত্র আশা ভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিষ্ফল অভ্যাস আপন বেড়ার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পায় না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিৎ হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থাকে এইখানেই একপাশ হইতে আর এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া দৈবকৃপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা, এখন ভাবিতেছি ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে।" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত শিক্ষকে পরিণত করিয়া বেড়ার বাহিরে আনিবার যে প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে একথা সকলেই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ যে বিদ্যার উৎপাদন, এ কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র সকলকেই ভাল করিয়া ধরান হইয়াছে। বিদ্যার উৎপাদনের চেষ্টা বিদ্বানের সখের বস্তু নহে, নিত্যকর্ম্ম, এই মন্ত্রে শিক্ষক ছাত্র সকলকেই দীক্ষিত করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষকে পরিণত করিবার কতক ব্যবস্থা ১৯০৪ সালের আইনে ছিল। তারপর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস চ্যান্সেলার হয়েন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নবকলেবর গঠন আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি পূর্ব্ব তন্ত্রের শিক্ষাই দান করিতেন, সুতরাং ঐরূপ শিক্ষায় ব্যাপৃত কলেজের সঙ্গে খটাখটি উপস্থিত হইত। এই প্রতিযোগিতা-জনিত অশান্তি নিবারণের এবং মৌলিক অনুসন্ধানমুখী শিক্ষা রীতিমত প্রচলিত করিবার জন্য ১৯১৭ সালে দুইটি উচ্চশিক্ষাবিধায়ক সমিতি (Councils of Post Graduate Teaching in Arts and Sciences) গঠিত হয়। এই দুইটির একটি সমিতিতে সদস্য সংখ্যা এখন ১৬০ জন, আর একটিতে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০ জন। এই দুইটি সমিতিই বাঙ্গলার উচ্চ শিক্ষা বিধানের বিধাতা। এই দুইটি সমিতির সভাপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এই দুইটি সমিতির অন্তর্গত দুইটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আছে; সে দুইটির সভাপতিও স্যর আশুতোষ; অনেকগুলি অধ্যাপনা বিধায়ক সমিতি আছে, তাহাদের মধ্যেও প্রায় অধিকাংশেরই সভাপতি স্যর আশুতোষ। এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা, সমিতিগুলি নামে মাত্র কর্ত্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-বিধানের প্রকৃত বিধাতা স্যর আশুতোষ। নমুনা স্বরূপ

এই সকল সমিতির ও উপসমিতির কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে দুইটি মত উদ্ধৃত করিব। গত ভাদ্র সংখ্যা "প্রবাসী"তে লিখিত হইয়াছে—

"এই তিনটি দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটিতেই দেখা যাইতেছে যে সভাপতি আশুবাবু, পরে কৌন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মঞ্জুরী পাইবার পূর্ব্বানুভূতি বলে (in anticipation of the sanction of the Executive Committee) (১) বাহ্য পরীক্ষক নিযুক্ত করেন, (২) পরীক্ষক বোর্ড নিযুক্ত করেন, এবং ইহাও জানা কথা যে অধ্যাপক-নিয়োগও তিনি এই প্রকারে করেন। তাহা হইলে কৌন্সিল ও উহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যগণ আছেন কিসের জন্য? তাঁহাদের কি স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিত্ব এবং সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা বা সম্মান বোধ নাই?...বুদ্ধিমান বিদ্বান লোকদিগকে ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জনে সম্মত করা এবং তাঁহাদেরও তাহাতে সম্মত হওয়া যে একটা অতীব আশ্চর্য্য কীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" (৪৯৫ পৃঃ)

"প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় এখানে কৌন্সিলের ও কমিটির সভ্যগণের যে অপকীর্ত্তির ঘোষণা করিয়াছেন, "নায়ক" সম্পাদক মহাশয় তাহার নাম দিয়াছেন "কর্ত্তাভজা"। ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন "অভাব" মাত্র প্রকাশ করে; "কর্ত্তাভজা" বলিতে তার উপর কিছু কাজ বুঝায়। ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন না দিয়াও লোক "কর্ত্তাভজা" হইতে পারে। সে যাহাই হউক, কৌন্সিলের এবং কমিটির সদস্যরূপে এই লেখকও যে অনেক পরিমাণে কর্ত্তাভজার মত আচরণ করিয়া থাকে একথা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করে না, কেন না এটা সত্য কথা। কিন্তু কেন সে নিত্য এই "অপ"কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহার একটা কৈফিয়ত দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা হইবে। "কর্ত্তাভজা" হয় লোকে ভক্তি হেতু, ভয় হেতু, অথবা ভয়ভক্তি উভয় হেতু। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আশুতোষের সহিত কাজ করেন, তাঁহাদের ভক্তিভরে "ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন" বা আত্মনিবেদন করিবার দুইটি গুরুতর কারণ আছে। প্রথম কারণ, সার আশুতোষ স্বয়ং এমন বিভোর হইয়া কাজ করেন, যে, তিনি সহজেই অপরকে নিজের ভাবে বিভোর করিয়া তুলিতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার সহিত কাজ করিতে গেলে পদে পদে তাঁহার দূরদর্শিতার এত পরিচয় পাওয়া যায় যে, যেখানে তাঁহার মত আপাতত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, সেখানেও প্রতিবাদ করিয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে শঙ্কা হয়; মনে হয়, অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ আছে যাহার নিমিত্ত এরূপটী হওয়া চাই। এক কথায় বলিতে গেলে, সার আশুতোষ আপনি মাতিয়া সহযোগিগণকে মাতাইয়া তুলিতে পারেন; কাজে কাজেই তাঁহাদের অৰ্দ্ধবিকশিত ইংরেজী ব্যক্তিত্ব ভাসিয়া যায়, সহজ "কর্ত্তাভজা"র ভাব জাগিয়া উঠে। সকলের পক্ষেই যে এই অবস্থা বা দুরবস্থা হয় তাহা নহে। যদি তাই হইত, তবে বিরুদ্ধ সমালোচনার অপহৃত উপাদান যোগাইবার লোক জুটিত না। এই স্বয়ং মাতিয়া অপরকে মাতাইবার শক্তি ছাড়া সার আশুতোষের মত অতবড় ব্যবহারজীবী, অতবড় বিচারক, অতবড় বিদ্বানের আরও যে সকল গুণ থাকার কথা তাহা ত আছেই। এখানে সার আশুতোষের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। কেননা তিনি প্রায় সকল অধ্যাপনা-বিধায়ক সমিতির অধ্যক্ষ বসিয়া তাঁহাকে অনেকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন। এই লেখকের মতে বস্তুতই সার আশুতোষ সকলগুলি সমিতির অধ্যক্ষ হইবার যোগ্য;—শুধু যে তিনি বুদ্ধি বলে এবং হৃদয়ের বলে এরূপ যোগ্য তাহা নয়, তিনি বিদ্যাবলেও এই প্রকার যোগ্য। কিন্তু লোকে সে কথা না বুঝার কারণ, যাঁহারা আমাদের এখানে সচরাচর বিশেষজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা এক রকমের; এবং সার আশুতোষের বিদ্যাবত্তা আর এক রকমের। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষামুখী শিক্ষার গুণে এদেশে লোকে বিদ্যাবত্তা নিরূপণ করে সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাপ করিয়া—তাহা কত মণ, কত সের, কত ছটাক। এদেশে বিদ্যাবত্তা প্রকাশিত হয় এই প্রকার বোলে,

—"আমি ওসব জানি; আমি যাহা না জানি বলিয়া তুমি মনে কর, তাহা কিছু নয়, কিছু নয়" ইত্যাদি। সার আশুতোষের বিস্তাবত্তা, অন্য রকমের। তাঁহার বিস্তাবত্তার মহিমা সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; তাঁহার বিস্তাবত্তার মহিমা নির্ভর করে, অজ্ঞাত বিষয় জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এবং তজ্জন্য অকাতর পরিশ্রমশীলতায়। তাঁহার কথা, "তুমি মনে করছ আমি তোমার কথায় অমনি সায় দিব; সেটি হবে না। নিয়ে এস পুঁথিপত্র, পড়ে দেখি; তারপর যা হয় বলব।" এইরূপ বিস্তাবত্তা এদেশে এখন বিশেষ দুর্লভ; তাই সার আশুতোষ এত সর্দ্দারি চালাইতে সমর্থ।

আজ এই পর্য্যন্ত। এই লেখক কর্ম্মজীবনে শিক্ষা বা শিক্ষকতা ভিন্ন আর কোন কাজ করে নাই। সে যে শরৎকুমারের সঙ্গে পাথর কুড়াইয়াছে, সেও শিক্ষার সম্পর্কে; সে যে তক্ষশিলায় মাটি খুঁড়িয়াছে, সেও শিক্ষার উপলক্ষে। সুতরাং শিক্ষা বৈ অন্য বিষয় সে বুঝিতে পারে না। এদেশে দুইজন লোক আছেন, যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষাবিধানের জন্য বিশেষ সচেষ্ট। এই দুইজনের মধ্যে, একজন কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে সার আশুতোষ; আর একজন শান্তিনিকেতনে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ। এই দুই মহাপুরুষ যে মহৎ কার্য্যের উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহাকে "অজ্ঞানমেধযজ্ঞ" বলা যাইতে পারে। এই মহাযজ্ঞের অধ্বর্য্যু সার আশুতোষ; উদ্গাতা ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ। যাঁহাদের কথা দেশের লোকের কাণে পহুঁছে, তাঁহাদের অযাচিত এই যজ্ঞের হোতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত, কেননা তাঁহারাও ত এই পথেরই পথিক; আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে অজ্ঞান-মেধেরই ঋত্বিক্। যজ্ঞ সার্থক করিতে হইলে যজ্ঞশালা চাই, যজ্ঞবেদী চাই, বহু উপকরণ চাই। এ সকল সাজ সরঞ্জাম সম্ভার বিশ্ববিস্তালয়েই কতকটা আছে, এবং শান্তিনিকেতনে সঞ্চিত হইতেছে। সুতরাং ধন, জ্ঞান, বাণী—যাঁহার যাহা দিবার আছে, তাঁহার তাহা সুযোগ মত অকাতরে অযাচিত এই যজ্ঞে উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিস্তালয়ের বিশাল ক্ষেত্রে যদি কখনও কখনও রজোগুণের লীলা প্রকটিত হয়, তজ্জন্য সজ্জনের আত্মবিস্মৃত হইয়া তমোগুণের আশ্রয় করা, রাগদ্বেষে অভিভূত হওয়া, কর্ত্তব্য নহে। জগতে নিখুঁত কিছু নাই। মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া একটি মাত্র নিখুঁত পদার্থ (পরমেশ্বর) কল্পনা করিবার কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও একমত হইতে পারে নাই। খুঁতের ছুতায় ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা কি সঙ্গত?

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

ভিন্নরুচি

বরষায় ভিজে ছাগল বলিছে—
"হায়! —দুর্দ্দিন যাবে কবে?"
আমোদে মাতিয়া দর্দ্দুর বলে—
"আহা! —ক'দিন এমন রবে!"

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সরকার।

বলরামচন্দ্র

জিলা নদীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুর একখানি অতি প্রাচীন গ্রাম। এখানে না-হিন্দু-না-মুসলমান' নূতন ধরণের এবং নূতন রকমের একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে; এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলরামচন্দ্র নামে নীচ-কুলোদ্ভব একজন হাড়ী।

বলরাম তাহার প্রথম বয়সে স্থানীয় কোনও জমিদারের ঠাকুরবাড়ীতে চৌকিদার ছিল। কোন-সময়ে সেই ঠাকুরবাড়ীতে চুরি হইলে, জমিদার বাবু বলরামকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে প্রহার এবং অপ-মানের একশেষ করিয়া তাড়াইয়া দেন। এই অপমান বলরাম সহ্য করিতে না পারিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান হয় না।

বলরামের আত্মীয় স্বজনগণ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার অপেক্ষা করিয়া, অবশেষে সে হয় আত্মহত্যা করিয়াছে না হয় মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেল; ভুলিতে পারিল না কেবল একটী বালবিধবা ধীবর-কন্তা—সেই কেবল তাহার পুনরাগমন-প্রতীক্ষায় হতাশ-প্রাণে পথ পানে চাহিয়া থাকিল।

বলরাম গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার প্রায় ২০ বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন বহু শিষ্য সঙ্গে খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামে প্রবেশ করিল। বলরামের পরিধানে গৈরিক বসন, তাহার মাথায় একটী প্রকাণ্ড ঝুঁটি বাঁধা, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহার শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়া নাভিমূল স্পর্শ করিয়াছে। বলরাম করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে মাঝে মাঝে ভাবে বিভোর হইতেছে; তাহাকে দেখিয়া গ্রামে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

বলরাম শিষ্য সমভিব্যাহারে তাহার পৈতৃক বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু স্থানসঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত সেখানে তাহাদের সকলের স্থান না হওয়ায়, তাহার বাড়ীর অনতিদূরে নদীর ধারে জঙ্গলাকীর্ণ একটী ভাগাড় পড়িয়া ছিল, তথায় গিয়া বসিল।

বলরাম জানিত, ভরদ্বাজ' গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ জমিদার সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটুকুর ভূম্যধিকারী। বলরাম তাঁহার নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিল, "আমি আপনাদের সেই বলা হাড়ী। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; আপনি সেই ভরদ্বাজমুনির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য এই কলিকালে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। নদীর ধারে আপনার যে একটু জমি ভাগাড় অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই জমিটুকু আমাকে ভিক্ষা দিতে হইবে; আমি সেখানে আমার একটী আশ্রম প্রস্তুত করিব।"

জমিদার বাবু বলরামের বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জমি দিতে সম্মত হইলেন।

বলরাম তখন বলিল, "আপনি এই জমির বাবদ আমার নিকট কখনও খাজনা পাওয়ার দাবি করিতে পারিবেন না; আমি ভিক্ষুক, নিষ্করে এই জমিতে বাস করিব, আপনাকে কখনও খাজনা দিব না।"

জমিদার তাহাতেও কোন আপত্তি করিলেন না। বলরাম তখন হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার শিষ্য-গণকে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ করিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে সেখানে একটী আশ্রম নির্ম্মিত হইল।

বলরাম যখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে কিছুই লেখাপড়া জানিত না, মহামূর্খ ছিল। কিন্তু তাহার অজ্ঞাতবাসের কালে সে লেখাপড়া শিখিয়াছে; হিন্দুর ভাগবত, মুসলমানের কোরাণ এবং খৃষ্টানের

বাইবেলে তাহার অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞান জন্মিয়াছে। বলরামের শিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে মুচি এবং মুসলমান পর্য্যন্ত সকল জাতির লোকই ছিল। ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা গ্রামে আসিয়া যখন শুনিতে পাইল যে তাহাদের দীক্ষাগুরু জাতিতে একজন হাড়ী, তখন তাহাদের লজ্জা ও মনস্তাপের সীমা রহিল না। তাহারা তাহাদের যজ্ঞোপবীত লুকাইয়া ফেলিল, জাতি ভাঁড়াইয়া অন্ত জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল এবং এখান হইতে পলাইয়া যাওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সত্যের অপলাপ হইলে বলরাম বড় বিরক্ত হইত। তাহার ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা জাতি গোপন করিতেছে শুনিয়া বলরাম অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তাহাদের ডাকিয়া বলিল—"জাতিতে আমি হাড়ী সত্য, কিন্তু হাড়ী নয় কে? যাহার হাড় আছে সেই হাড়ী; মনুষ্য মাত্রেই হাড়ী। মৃত্যুর পর যখন তোমার দেহ আমার দেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিবে, তখন তোমার দেহের হাড় এবং আমার দেহের হাড় একই আকার ধারণ করিবে, কিছুই পার্থক্য থাকিবে না; এ অবস্থায় আমার শিষ্য হইয়াছ বলিয়া দুঃখিত হইবার কারণ কি?"

বলরামের কথায় তাহার অন্যান্য শিষ্যেরা সকলেই বাহবা দিল, কিন্তু সে কথায় ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া গোপনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল।

বলরাম সেই আখড়ায় শিষ্য সেবকগণ সহ বাস করিতে লাগিল। এই আখড়াতে কেহ কখন স্ত্রী-লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পাইত না। যে ব্যক্তি বিবাহ করে নাই, বা যাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, কিংবা যে স্ত্রীর মায়া ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তেমন ব্যক্তি ভিন্ন আখড়াধারী হইয়া এখানে বাস করার কাহারও অধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকের মধ্যে বর্ষীয়সী বিধবা ভিন্ন, যুবতী বা সধবাকে কখনও স্থান দেওয়া হইত না। স্ত্রী পুরুষের একত্রে বসা উঠা, বা পান-ভোজনাদি করা নিষিদ্ধ ছিল। বলরামের অজ্ঞাত-বাসকালে যে জেলের মেয়ে তাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছিল, তাহার নাম ছিল ব্রহ্ম; বলরাম ফিরিয়া আসার পর ব্রহ্ম তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম তাহাকে বলিয়াছিল—"একদিন তুমি আমাকে পতি-ভাবে বরণ করিয়াছিল। এখন যদি তুমি আমাকে মনে প্রাণে পিতাভাবে ভজনা করিতে পার, তাহা হইলে এ আখড়ায় তোমার স্থান হইবে। নতুবা তুমি যেখানে যে অবস্থায় আছ, সেখানে সেই ভাবে তোমাকে থাকিতে হইবে; আমার সহিত তোমার কোন দেখাসাক্ষাৎ হইবে না, বা আমার সম্মুখে তুমি কখনও উপস্থিত হইতে পাইবে না।"

বলরামের প্রস্তাবে ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়া আখড়াতে থাকিয়া গেল। অতঃপর ব্রহ্ম বলরামকে "পিতাপতি" বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং শিষ্যেরা তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত।

বলরাম দেশে ফিরিয়া আসার পর এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। শেষ জীবনে তাহার দেহখানি অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়ায় চলাফেরা করা তাহার দুঃসাধ্য হইয়াছিল। মৃত্যুকালে বলরাম তাহার শিষ্যগণকে ডাকিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ করিয়া যায় যে, তাহার জীবাত্মা এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গেলে, তাহার দেহখানি নষ্ট না করিয়া, যেন কোন কাযে লাগাইয়া দেওয়া হয়। মৃতদেহ কি কাযে লাগিতে পারে, শিষ্যেরা কেহই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ব্রহ্ম বলিল, "পিতাপতি, আপনার আদেশ পালন করিতে আমরা সকলেই প্রস্তুত, আপনার মৃতদেহ সম্বন্ধে যা করা অভিপ্রায় হয় আদেশ করুন।"

বলরাম। অনেকদিন আমি এই দেহখানি অতি যত্নে ধারণ করিয়া আছি। আমার মৃত্যুর পর তোমরা যদি এ দেহ পোড়াইয়া ফেল, ইহা ছাই হইয়া যাইবে; পুঁতিয়া ফেলিলে মাটি হইবে; এ দুইয়ের কিছুই না করিয়া, আমার ইচ্ছা, নগরের প্রান্তভাগে কোন নিভৃত-স্থানে আমার এই বিপুল দেহখানা রাখিয়া আসিলে শকুনি গৃধিনী কুকুর শৃগালে ইহা আহার করিয়া যদি

তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে আমার এ দেহধারণ করা সার্থক হইবে।"

শিষ্যেরা বলরামের আদেশ মত তাহার মৃতদেহ নদীর ধারে কোনও নিভৃত স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল, এবং কুকুর শৃগাল ও শকুনি গৃধিনীগণ মহা উল্লাসে তাহা ভক্ষণ করিয়াছিল।

বলরামের আসন, তাহার জুতা, খড়ম, হাতের প্রকাণ্ড একগাছি যষ্টি এবং একখানি চেয়ার আছে। ব্রহ্ম সেই আসন প্রতিদিন ফুল দিয়া সাজাইত; ভক্তিভরে জুতা খড়মের পূজা করিত। সেই ধীবরকন্যা ব্রহ্ম এখন জীবিত নাই।

প্রথম বয়সে ব্রহ্মের চরিত্রে যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু শেষ বয়সে তাহার চরিত্রে যেন মালামাটি কিছুই ছিল না। ব্রহ্ম পাড়া বেড়াইতে যাইয়া যদি দেখিত কাহারও সাংঘাতিক ব্যারাম হইয়াছে, বা কেহ কোন বিষয়ে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছি, ব্রহ্মের দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতেছে, ব্রহ্ম গলায় কাপড় দিয়া করযোড়ে দরবিগলিত নেত্রে বলরামের চরণ-পাদুকার নিকট সেই বিপন্ন বা পীড়িত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

কোন সময়ে বলরামের এই আখড়ার উপর চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু খাজনা বা ট্যাক্স দেওয়ায় বলরামের আদেশ না থাকায় ব্রহ্ম ট্যাক্স দিতে স্বীকার করিল না। ব্রহ্ম ঘর ছাড়িয়া গাছতলায় ছোট ছোট কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার ঘরে শিষ্যের দেওয়া চেয়ার বেঞ্চ শতরঞ্চ প্রভৃতি অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল; প্রতি তিন মাস অন্তর চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক এবং নিলাম বিক্রয় হয়; ব্রহ্ম সে দিকে ফিরিয়াও দেখে না।

এই সময়ে কক্‌সহেড্ নামে একজন উদার-প্রকৃতির ইংরাজ এই সবডিভিজানের মাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি ব্রহ্মের এই ত্যাগ-স্বীকারের কথা শুনিয়া তাহার আখড়ায় আসেন এবং ব্রহ্মের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ট্যাক্স মাপ দেন।

ব্রহ্ম সাহেবকে কোন কথা না বলিয়া, বলরামচন্দ্রের আসনের নিকট যাইয়া ভক্তিভরে উপাসনা করিল—"বলরামচন্দ্র হে, তোমার নিকট কি পাপ করিয়াছিলাম জানি না, তুমি ঘর হইতে আমাদের তাড়াইয়া দিয়াছিলে। আজ পাপ মোচন হইল দেখিয়া আবার আমাদের ঘরে আনিলে। প্রণাম তোমার চরণে, শত শত বার প্রণাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে পুলিশের দারোগা ছিল। সাহেব চৌকিদারী ট্যাক্স মাপ দিলেন, সেজন্য ব্রহ্ম সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায়, সাহেবকে ধন্যবাদ না দেওয়ায়, দারোগাবাবু অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মকে ডাকিয়া বলিলেন—"হুজুর তোমার ট্যাক্স মাপ দিলেন, তাঁহাকে সেলাম কর; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি আজ ঘর পাইলে, তাঁহাকে দুকথা বাইয়া জানাও।"

ব্রহ্ম উত্তর করিয়াছিল, "সাহেব তোমার হুজুর হইতে পারেন, আমার হুজুর হাড়িরাম; তিনিই আমাকে ঘর ছাড়া করিয়াছিলেন, তিনিই ঘরে উঠাইয়া দিলেন; ইহাতে তোমার সাহেবের কি?"

ব্রহ্মের কথায় সাহেব কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া, তাহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ টাকা তোমাকে কে দিল?"

ব্রহ্ম। বলরামচন্দ্র দিলেন, তোমার হাত দিয়া দিলেন। টাকাও তোমার নয়, দেওয়ার কর্ত্তাও তুমি নও।

ব্রহ্মের মৃত্যুর পর কয়েকজন অবস্থাপন্ন চেলা মিলিয়া সংকল্প করিল, যে ঘরে বলরামের আসন, তাহার চরণ-পাদুকা প্রভৃতি ছিল, তাহা খড়ের আটচালা ঘর, সে ঘর ভাঙ্গিয়া তাহারা ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা ঘর করিবে। এসম্বন্ধে চেলাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল, বলরাম কর্ত্তৃক যে ঘর

প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে যেখানে তাঁহার আসন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সেইখানেই থাকিবে, কখনই স্থানান্তরিত করা হইবে না। দুই দলের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া মহা তর্কাতর্কি এবং বাগ্‌যুদ্ধ চলার পর, যাহারা ঘর ভাঙ্গিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল তাহাদের মতই প্রবল হইল। তাহারা যখন ঘর হইতে বলরামের আসন (একখানা বড় কাঠের চৌকি) ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে যায়, সে সময় অপর দলের লোক মৃত্যুপণ করিয়া চৌকি চাপিয়া ধরিল। তখন উভয় দলের মধ্যে প্রকৃতই একটি লণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া গেল। যাহারা চৌকি স্থানান্তর করিতে দিবে না সংকল্প করিয়াছিল, তাহাদের মাথা ফাটাইয়া এবং খুন জখম করিয়া অপর দল চৌকি বাহির করিয়া লইয়া গেল।

যাহারা খুন জখম হইল, তাহাদের শরীরের আঘাত অপেক্ষা প্রাণের আঘাত বেশী লাগিল; তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে বুক ভিজাইয়া "বলরামচন্দ্র হে, তুমিই ইহার বিচার করিও" বলিয়া আখড়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে যথাসময়ে আটচালা ভাঙ্গিয়া সেখানে অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। বিপক্ষের দল আর এ আখড়ায় না আসিয়া, যে স্থানে বলরামের মৃতদেহ রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরে আর একটি আখড়া প্রস্তুত করিল। সে আখড়াটি এখন নাই। এখন মহোৎসব উপলক্ষে দুই দলের লোক পূর্ব্বের আখড়াতেই আসে; কিন্তু তাহাদের দলাদলি মিটে নাই। তাহারা সকলে একত্র জড় হইলেই তাহাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং গালিমন্দ হয়।

একদিন কোন একটি বৃদ্ধ চেলাকে আমি বলিয়াছিলাম, "মহোৎসবের সময় তোমরা মানভূম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি কতদূর দেশ হইতে এখানে আস কি কেবল ঝগড়া বিবাদ করিতে? তোমাদের সে ধর্ম্মভাব কোথায় গেল?" বৃদ্ধ উত্তর করিয়াছিল, "ধর্ম্মমন্দিরে যাইতে হইলে মাথা হেঁট করিয়া যাইতে হয়, তবে ধর্ম্ম হয়; বলরামচন্দ্রের যে ঘর ছিল তাহা খড়ের, নীচু ঘর, আমরা হেঁট মস্তকে সে ঘরে যাইয়া তাঁহার চরণ-পাদুকা পূজা করিতাম। এখন উঁচু মাথায় যাই, এখন আর আমাদের সে দীনভাব নাই। এখন আমাদের মনে অহংকার হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মভাবও ঘুচিয়া গিয়াছে।" লোকটা অশিক্ষিত হইলেও তাহার এ কথাটি বড় ভাল লাগিয়াছিল।

ব্রহ্ম যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন আখড়ার সম্ভ্রম ছিল; কত দূরদেশ হইতে কত লোক আখড়া দেখিতে আসিত; এখন আর আসে না। এখানে কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি না থাকিলেও, কেমন একটা পবিত্রভাব ছিল, ব্রহ্মের সঙ্গে সে পবিত্রভাবটুকু তিরোহিত হইয়াছে।

প্রায় ৬৫ বৎসর হইল বলরাম দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাহার শিষ্যদের মধ্যে তাহাকে দেখিয়াছে এমন লোক কেহই জীবিত নাই। যাহারা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহারা সকলেই অশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর লোক; এজন্য বলরামের ধর্ম্মমত কি ছিল, নিজেকে অবতার বলিয়া সে ঘোষণা করিয়াছিল কি না, এ বিষয় নির্ণয় করার আর কোন উপায় নাই। তবে চেলারা অনেক সময় অনেক মহাপুরুষকেই যে ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রোধ বা হিংসা বলরামের মনে কখনও উদয় হইত দেখা যায় নাই। তাহার শিষ্যেরা তাহাকে "দিন দুনিয়ার গড়নদার এবং সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার" বলিয়া প্রচার করিলে গ্রামস্থ সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহার প্রতি নানা রকমের নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। বলরাম গ্রামের মধ্যে বাহির হইলে লোকে তাহার গায়ে ধূলা দিত, ঢেলা মারিত এবং অকথ্য ভাষায় গালিমন্দ করিত। বলরাম অম্লান বদনে এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত।

বলরাম কখনও জাতিবিচার করে নাই। তাহার আখড়ায় উৎকৃষ্ট জাতি হইতে মুচি প্রভৃতি পর্য্যন্ত

সকলে একত্রে বসিয়া আহার করিত এবং এখনও তাহাই করিয়া থাকে। শ্রীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে একাসনে বসিয়া আহার করিলে, বা কোন নীচজাতি কোন উচ্চ জাতির মুখে অন্ন দিলে যেমন জাতি নষ্ট হয় না, সেইরূপ বলরামের আখড়ায় হিন্দু মুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করিলে বা মুচির রান্না অন্য জাতি খাইলে, দেশে ফিরিয়া গিয়া কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে হয় নাই।

ঔষধ সেবন করা বলরামের নিষেধ ছিল। সে বলিত, শরীর ধারণ করিলে পীড়া হইবে, আবার দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনা হইতে সে ব্যারাম আরাম হইয়া যাইবে; যখন যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে তখন তাহাকে শত ঔষধ সেবন করাইলেও তাহার জীবন রক্ষা পাইবে না।

বলরামের শিষ্যেরা তাহার এই কথামত, পীড়া হইলে আজ পর্যান্ত কোন ঔষধ সেবন করে না। তাহারা জল চিকিৎসা করে; যে পীড়াই হউক। দিনে ২।৩ বার স্নান করে, পান্তা ভাত খায়; আর দুইটি জালায় বলরামের অধরামৃত, চরণামৃত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঔষধের বদলে ভক্তিভরে সেই অমৃত পান করে, পীড়া আরোগ্য হয়। ব্রহ্মের চক্ষে ছানি পড়িয়া একবার সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বলরামচন্দ্রের অধরামৃত ও চরণামৃত পান করিয়া এবং তাহাই চক্ষে দিয়া তাহার ছানি কাটিয়া গিয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাকেই faith cure বলে।

বলরামের অসাধারণ রকম প্রেম ও উদারতা ছিল। যাহারা তাহার উপর অত্যাচার করিত জগাই মাধাইয়ের মত বলরাম তাহাদের আদর করিত, ভালবাসিত। তাহার অমায়িকতা ও ভালবাসার গুণে অবশেষে সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বলরামের শিষ্যেরা এক তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও প্রণাম করিত না এবং এখনও করে না।

কোনও ব্রাহ্মণ জমিদার একদিন কয়েকজন মোসাহেব সঙ্গে বৈঠকে বসিয়া খোসগল্প করিতেছিলেন, এমন সময় বলরামের একজন শিষ্য তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। একজন মোসাহেব জমিদারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখুন বাবু, বলা হাড়ীর চেলা ঐ ব্যাটার কি আস্পর্দ্ধা! আপনি ব্রাহ্মণ, তাতে জমিদার, আপনার সমুখ দিয়া চলিয়া গেল, আপনাকে একটা প্রণামও করিল না।"

বাবুর বড় রাগ হইল। তিনি বরকন্দাজ দ্বারা সেই চেলাকে ধরিয়া আনাইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। চেলা তাহাতে সম্মত হইল না। চেলা বলিল, "যে মাথা বলরামচন্দ্রের পাদপদ্মে নোয়াইয়াছি, তাহা আর কোথাও নোয়াইতে পারিব না।"

বাবুর হুকুম মত বরকন্দাজ তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। চেলা বলিতে লাগিল, "যত পার মার, কিন্তু মাথা আমি কখনই নোয়াব না।"

জমিদারের উদ্ধত প্রকৃতি, গরীব চেলার অকপট গুরুভক্তির নিকট পরাস্ত হইল। কোন মতেই তাহাকে প্রণাম করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহাকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন। চেলা ক্ষতবিক্ষত শরীরে বলরামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "অমুক বাবুকে আমি প্রণাম করিনি বলে' দেখন আমার কি দুর্দ্দশা করেছে! মেরে আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে; হাড়িরাম, (হিন্দুরা বলরামকে হাড়িরাম এবং মুসলমান ভক্তেরা হাড়ি আল্লা বলিয়া সম্বোধন করিত) আপনাকে এর বিচার করতে হবে।"

বলরাম চেলাটিকে পাশে বসাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল এবং অনেক প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেলার মন প্রবোধ মানিল না; সে পুনঃপুনঃ বলরামের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন বলরাম নিরুপায় হইয়া, বৈকালে তাহার বিচার করা হইবে বলিয়া, স্নান আহার করিবার জন্য তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

চেলা আশ্বস্তপ্রাণে বিদায় হইয়া স্নান আহার করিল, এবং বৈকালে "দিন দুনিয়ার মালিক, শিষ্টের পালক

এবং দুষ্টের দমনকর্ত্তা হাড়িরাম" সেই জমিদার বাবুর বিশেষ কোন শাস্তি বিধান করিবেন,' এই আশায় বসিয়া থাকিল।

বেলা অবসান হইয়াছে; বলরামচন্দ্র চারিদিকে শিষ্য লইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় চেলা বাইয়া করযোড়ে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"

চেলা। আজ্ঞে, আমার বিচার—

বলরাম ভুলিয়া গিয়াছিল, চেলাকে দেখিয়া এবং তাহার প্রার্থনা শুনিয়া সকল কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলরাম চেলাটিকে আবার নিকটে বসাইল এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "কোন্ সকালে তুমি মার খেয়েছ, এখনও পর্য্যন্ত তুমি তা ভুলতে পার নি।"

চেলা। আজ্ঞে, সর্ব্বাঙ্গে আমার যে বেদনা, তাতে কি আমার সে মার ভোলবার যো আছে! প্রভু, আমার এ মারের বিচার আপনাকে করতেই হবে।"

বলরাম। "তুমি ভিক্ষুক, কত সময় কত বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যাতায়াত করিতে হয়। বনের মধ্যে যদি তোমাকে বাঘে কামড়াত বা আঁচড়াত, তা হলে কি তুমি আমার কাছে এই রকম নালিশ করতে আসতে?

চেলা। তা কেন করব? কিন্তু আমাকে তো আর বাঘে কামড়ায় নি, বা বাঘে আঁচড়ায় নি—আমাকে মানুষে মেরেছে।

বলরাম কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "মানুষ কখন মানুষকে মারে? মানুষ ত সব একজনের সন্তান, পরস্পর তারা ভাই হয়; যে মানুষ হবে, সে কখনও মানুষকে ধরে মারবে'না। যে তোমাকে এমন গুরুতর প্রহার করেছে, তার গায়ে মানুষের চামড়া থাক্‌লেও তাকে মানুষ বলা যায় না, বাস্তবিক সে মানুষ নয়। নিশ্চয় জেনো সে বাঘ।"

বলরামের এই মহৎ বাক্যের তাৎপর্য্য তাহার শিষ্যেরা কেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল কি না জানি না, তবে এই ঘটনার পর তাহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে সেই জমিদার বাবুকে প্রকৃতই বাঘ জ্ঞান করিয়া, আর তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিত না।

অনেক দিন হইল স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট বলরামের কথাপ্রসঙ্গে তাহার চেলার এই মার খাওয়ার কথা আমি গল্প করিয়াছিলাম। রামতনু বাবু চেলার প্রতি বলরামের এই প্রবোধ বাক্য শুনিয়া বলেন, "যাঁহার মুখ দিয়া এপ্রকার মূল্যবান কথা বাহির হইতে পারে, তিনি নিশ্চয়ই একজন সাধু পুরুষ ছিলেন; তিনি নিজকে কখনই ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এ ঘোষণা নিশ্চয়ই তাঁহার চেলাদের।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পাখীর গান

জীবন-পাখী দোদুল শাখে
গাহিছে মৃদু গীতি,
'তুমি ও আমি' 'তুমি ও আমি'—
ধ্বনিছে শ্বাসে নিতি।
রজপুর প্রভঞ্জন, পাতিয়া কান
কেবল ঝগড়া বিশ্ব শুনি এ গান।
ভাব কোথায় গেল;

নাইকো দেরী থামিবে তান,—
অদূরে কালো রাতি;
'তুমি ও আমি' 'তুমি ও আমি'—
শুন রে প্রেমে মাতি।

দরবেশ।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যদু খানসামা ওরফে যাদবচন্দ্র দাস।

যদু খানসামা এখন ভবানীপুরে একটী দ্বিতল বাড়ীতে বাস করিতেছিল। বাড়ীটি ক্ষুদ্র এবং তাহা একটি অপ্রশস্ত রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল। সেই বাড়ীর নিম্নতলে বহির্ব্বাটীতে বসিবার একটি ঘর ছিল। ঐ ঘরের একধারে দুইখানি যোড়া তক্তপোষের উপর, একখানি অমল ধবল জাজিম দ্বারা আচ্ছাদিত একটি বিছানা সর্ব্বদা বিস্তৃত থাকিত; এবং তাহাতে সর্ব্বদা দুইটি তাকিয়া বালিশ শোভা পাইত। সেই ঘরের অন্যধারে কয়েকখানি চেয়ার ও একটি টেবিল ছিল। ভিতর বাটীতে নিম্নতলে তিনটি ও দ্বিতলে দুইটি কক্ষ ছিল। দ্বিতলের কামরাগুলির মধ্যে একটি শয়নগৃহ, অন্যটিতে বসিবার জন্য মেঝেতে বিস্তীর্ণ শয্যা ছিল।

এখন উপন্যাসে বিস্তৃত রূপবর্ণনা প্রথা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কিন্তু পাঠকগণের অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সেই অনাধুনিকী প্রথা অবলম্বন করিব। আমরা নাপিতকুলাবতংস এই যদু খানসামার রূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

ইহা কঠিন কার্য্য। কারণ যদু খানসামার শকুন্তলার ন্যায় কিসলয়রাগ অধর নাই, কোমল বিটপানুকারী বাহু নাই, অঙ্গে লোভনীয় কুসুমের ন্যায় যৌবন নাই, আমরা কি লইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব? যদু খানসামার লোললোচন এবং তাহাতে ততস্ততঃ প্রেরিত কটাক্ষ নাই, ফণিফণানিন্দিত কেশদাম এবং তাহাতে মনোমোহন বিন্যাস নাই, তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর এবং তাহাতে সুধাপূর্ণ সুহাসি নাই, মলয়সমীরণসঞ্চালিত বনগুল্মলতার ন্যায় দেহ এবং তাহাতে জ্যোৎস্নানিন্দিত লাবণ্য নাই,—হায় হায়! আমরা কি লইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব? তাহার ভ্রূতে ভ্রূকুটিলীলা নাই, নয়নকোণে বিদ্যুল্লীলা নাই, বক্ষে প্রেমান্দোলন নাই, পাদচারণে মরালনিন্দিত মধুর পারিপাট্য নাই, অবয়বে তরুণ প্রণয়তরঙ্গ নাই—আমরা কি লইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব?

তোমরা বলিবে, যদু খানসামা পুরুষ; তাহাতে কামিনীগণের কোমল কমনীয়তা কোথায় পাইবে? পুরুষের সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান কর, তোমার রূপবর্ণনা সার্থক হইবে।

এস, তাই করি।—তাহাতে পৌরুষের অনুসন্ধান করি। হায় হায়! কোথায় সেই দুর্গপ্রাকার সদৃশ অভেদ্য বিশালবক্ষ? কোথায় সেই শালকাণ্ডসম প্রকাণ্ড বাহু? কোথায় সেই তপনতাপনতুল্য তপ্ত কাঞ্চন? কোথায় সেই বিদ্যাদেবীর ক্রীড়াভূমির ন্যায় পৃথুল ললাট? সেই ললাটতলে অমোঘ আজ্ঞাসম কোথায় সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি? খগরাজ-নিন্দিত কোথায় সেই গর্ব্বস্ফীত নাসা? সেই নাসাতলে মূর্ত্তিমতী প্রতিভার ন্যায় কোথায় সেই কৃষ্ণশ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন অধরোষ্ঠ? নীরদনাদতুল্য কোথায় সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর? ভীমবর্ম্মসম কোথায় সেই বৃষস্কন্ধ? সেই ভূকম্পন সদৃশ গজগমন? যদু বেচারার এ সকল কিছুই ছিল না।

তাহার ছিল, নাগরা জুতার ন্যায় লম্বা ও বক্র মুখমণ্ডল। কিন্তু এই নাগরা জুতার সহিত তাহার মুখমণ্ডলের তুলনা করায়, তোমরা আপত্তি উত্থাপন করিতে পার। তোমরা জান যে এক্ষণে সে হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছে, অতএব তোমরা বলিবে যে, তত বড় একটা জমীদারীর ম্যানেজার বাবুর মুখের সহিত দেশীয় হেয় নাগরা জুতার তুলনা দেওয়া ভাল হয় নাই। থুড়ি! আমরা তবে সে মুখের সহিত ৫ অঙ্কের তুলনা করিব; কিন্তু সেই চন্দ্রবদনের সহিত চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও তুলনায়

যদি তোমাদের চিত্তভুষ্টি না হয়, তবে আমরা শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদের সহিত তাহার তুলনা করিব। যত্নর ললাট উচ্চ এবং বর্ত্তুলাকার; তাহার চিবুক লম্বা, এবং তাহা যেন তাহার তীক্ষ্ণ নাসিকাগ্রভাগকে চুম্বিত করিবার জন্য উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। যত্নর ললাট ও চিবুক এই দুইয়ের মধ্যভাগ নিম্ন। এই নিম্নভাগে যত্নর ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি, তীক্ষ্ণ নাসিকাটি এবং মুখবিবরটি সন্নিবেশিত ছিল। যত্নর অধরোষ্ঠ ছিল না; কেবল একটি মুখবিবর ছিল; এবং সেই বিবরমধ্যে ক্ষুদ্র মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দুই সারি শুভ্র ও সুমার্জ্জিত দন্ত ছিল। যত্ন প্রায়শঃ হাসিত না; কদাচিৎ দৈবক্রমে হাসিলে, তাহাতে তাহার মুখমণ্ডলের মাংসপেশী আকুঞ্চিত বা সম্প্রসারিত হইত না, কেবলমাত্র দৃঢ়বদ্ধ বদনবিবর ঈষৎ উদ্ভিন্ন হইয়া, তাহার শ্বেত দন্তশ্রেণী প্রকটিত করিত। কবিগণ কম্বুর সহিত সুকণ্ঠের তুলনা করিয়া থাকেন; যত্নর কম্বুকণ্ঠ ছিল না। তাহার কণ্ঠকে নাসিকাকণ্ঠ বলা যাইতে পারে; কারণ তাহার কণ্ঠের মধ্যভাগে, রন্ধ্রশূন্য নাসিকার ন্যায়, মাংসাস্থিময় একটা বিকট পদার্থ সর্ব্বদা উচ্চ হইয়া থাকিত। কণ্ঠ হইতে যত্নর দেহের সমুদয় অধোভাগ সর্ব্বদা কালো আলপাকার চাপকানে ও সাটিন জিনের পায়জামায় আচ্ছাদিত থাকিত, এজন্য আমরা তাহার বাহুর, তাহার বক্ষের, তাহার উদরের, তাহার উরুর এবং গুল্ফের বিস্তারিত বিবরণ দিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু বাহির হইতে অনুমান করা যাইতে পারিত যে, যত্নর অবয়বের কোন অংশ মেদমাংসভারে প্রপীড়িত নহে। তাহার করতল এবং অঙ্গুলিসকল তাহার দেহের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং পরিশুষ্ক; তাহাতে তীক্ষ্ণধার নখর থাকিলে শ্যেনপক্ষীর পদতলের সহিত তুলনা হইতে পারিত। নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, যমুনার নীল জলে ভাসমান কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায়, পদ্মপত্রস্থিত লুচির ন্যায়, উলুবনে জলপূর্ণ ডোবার ন্যায়, যত্নর শিরোপরিভাগে শুভ্র কেশদাম বেষ্টিত একখণ্ড টাক ছিল। এই টাকের মধ্যভাগে একটি অর্ব্বুদ ছিল। ঐ অর্ব্বুদে সাদরে হাত বুলাইয়া যত্নর মনোমোহিনী বলিত —"অন্য লোকের চেয়ে তোমার যে বেশী বুদ্ধি আছে, তা তোমার এইটিতে জমা থাকে।" তখন নিমীলিত নেত্রে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে যত্ন বলিত—"আরে—নাঃ।"

যত্নর ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটির এই বিশেষত্ব ছিল যে, তাহাতে কখনও তাহার হৃদয়ভাব প্রকাশ পাইত না; তাহা চিত্রার্পিত কৃষ্ণবর্ণ তারাদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইত।

কোথায়, কোন দেশে, কোন মহৎ বংশে যত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল না; লোকে কেবল জানিত যে সে নাপিতপুত্র। অধুনা যত্ন হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হওয়ায় লোকে এই জ্ঞানও হারাইয়াছিল।

আমরা বলিয়াছি যে যত্নর দেহ সর্ব্বদা চাপকান ও পায়জামাতে আচ্ছাদিত থাকিত। কেবল শয়নকালে রাত্রে সে ধুতি পরিধান করিত। বাহিরে কোনস্থানে যাইতে হইলে, যত্ন চাপকানের উপর চোগা এবং মাথার উপর কালো মকমলের গোল টুপি পরিত। তাহার বাসাটীতে কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সে যুক্ত করপুট উর্দ্ধে তুলিয়া, উদ্ভিন্ন মুখবিবর হইতে দন্তদুইটা ঈষৎ প্রকটিত করিয়া এবং তাহার বর্ত্তুল ললাট ঈষৎ আনত করিয়া তাহাকে নমস্কার করিত। কিন্তু কদাচ কাহারও সহিত দীর্ঘ বাক্যালাপ করিত না; একটি হাঁ বা একটী না দ্বারা তাহার কথোপকথন কার্য্য সম্পাদিত হইত। সে জানিত যে সে বিদ্যাহীন, লোকের সহিত কথা কহিলে তাহার বিদ্যাহীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সে অত্যন্ত নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলিতে পারিত। সে কখনও কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিত না; কেহ কখনও তাহাকে এক পেয়ালা চাও খাইতে দেখে নাই। সে দিবারাত্র মধ্যে কেবল মাত্র দুইটী তাম্বুল চর্ব্বণ করিত।

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ত্রিশ বৎসর বয়সে যত্ন ছয় টাকা বেতনে সামান্য ভৃত্যরূপে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরে তীক্ষ্ণ চতুরতার গুণে সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রধান খানসামা হইয়াছিল।

এই কার্য্যের জন্য সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট মাসিক বাইশ টাকা বেতন পাইত। তদ্ব্যতীত শ্যালকত্রয়ের নিকট হইতে সে মাসে মাসে পঞ্চ মুদ্রা প্রাপ্ত হইত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর, সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ভবানীপুরে আসিয়া লুকাইয়া ছিল; এবং গোঁফ দাড়ি কামাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিল। এক্ষণে সে শ্যালকত্রয়ের নিকট হইতে এক কালে পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং আশা পাইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কার্য্যোদ্ধারের পর, সে আরও দশ হাজার টাকা পাইবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যদু বৌবাজারে অন্য এক ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরের কার্য্য করিত। সেই বাটীতে তারা নাম্নী এক কুচরিত্রা যুবতী দাসীর কার্য্যে নিযুক্তা ছিল। তাহার হাবভাবময় যৌবনলীলা দেখিয়া যদুর মন, জীবনে সেই প্রথম বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে সে আপন জীবনতরী ভাসাইল। সে আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া প্রাণপণ সাধনায় তারাকে তুষ্ট করিল। কিন্তু গৃহস্থের বাটী প্রেমিক প্রেমিকার উপযুক্ত লীলাভূমি নহে; এজন্য তাহারা উভয়েই পদচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। এক বিগতযৌবনা বারবনিতার বাটীতে যদু একটি কুঠারি ভাড়া লইয়া, তথায় প্রণয়িণীকে প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং নিজে চাকুরীর সন্ধানে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারে প্রবিষ্ট হইল।

এই তারা এক্ষণে হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার-গৃহিণী হইয়া ভবানীপুরে যদুর বাসা বাটীতে বাস করিতেছিল। আর যে গতযৌবনা বারবনিতার বাসাবাটীতে তারা পূর্ব্বে বাস করিত, সেই এক্ষণে হরিহরপুরের জমীদারদিগের পুণ্যময়ী মাতা হইয়া ভবানীপুরের বৃহৎ বাটীতে থাকিয়া, রূপার কোশাকুশী লইয়া দেবারাধনা করিতেছিল; কালীঘাটে যাইয়া সোনার জবাফুলে কালীমাতার পদ বন্দনা করিতেছিল; মুর্শিদাবাদের গরদ পরিয়া ব্রুহাম চড়িয়া, গঙ্গাস্নান করিতেছিল! তোমরা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না;—তোমরা ত দেখিয়াছ, আমাদের এই পৃথিবীতে কত কুচরিত্রা আপনাকে সাধ্বী বলিয়া পরিচিতা করিয়াছে, কত পাপিষ্ঠা আপনাকে সাবিত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া মহা দর্প প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, যদু যে বাটীতে বাস করিত, তাহার দ্বিতলে দুইটি কক্ষ ছিল;—একটি শয়ন কক্ষ, অন্যটি বসিবার ঘর। বসিবার ঘরে ম্যানেজার-মহিষী সমাগতা পল্লিবাসিনীগণের সহিত সদালাপ করিতেন। আমরা যেদিনের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেইদিন দ্বিপ্রহরে সেই ঘরে কলকলভাষিণী কোন পল্লী-কামিনীর আবির্ভাব না হওয়ায়, আহারাদির পর যদু একটি বালিশে ঠেশ দিয়া, প্রিয়তমার বাক্যসুধা পান করিতেছিল।

তারা বলিল, "মাগী মাছের মত সাঁতার দিতে পারে; গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গার মাঝখানে ফেলে দিলেও ডোবে না, সোলার মত ভেসে ওঠে। মাগী এক হাঁটু জলে ডুবে যাবার ভান দেখিয়েছিল ভাল। সেই মিন্সেটা কি বোকা;—এটা ভানটা আর বুঝে উঠতে পারলে না; জানিনে মিন্সে কেমন করে ওকালতী করে! কিন্তু যা হোক, মিন্সে বোকামী করে বেশ লাভ করে নিলে। তুমি সকালবেলা বলছিলে যে কেদার বাবু তাকে একটা সোনার ঘড়ি ও চেন দিয়েছেন।"

যদু। সত্যিই দিয়েছেন।

তারা। শুনলাম, শেয়ালদার ডেপুটী বাবুর বাড়ীর কাছে লোকটা বাস করে; আর ডেপুটি বাবুর বাড়ীতে হামেসা আনাগোনা করে। আমি শুধু ভাবছি যে, মাগী কি করে জানলে যে ডেপুটি বাবুর পাড়ার উকিল ঠিক সেই দিন সেই সময় সেই ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে আসবে?

যদু। আমি আগে খবর দিয়েছিলাম।

তারা। তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। তুমি

বোধ হয় কোন কৌশলে খবরটা আগে জানতে পেরেছিলে ?

যদু। হ্যাঁ।

তারা যদুর আরও নিকটবর্ত্তিনী হইল ; এবং আপন অলক্তকরঞ্জিত করতল দ্বারা তাহার বর্ত্তুল ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "তোমার মত বুদ্ধি আমি কখনও দেখি নি। তোমার এই মাথাটিতে যে কত বুদ্ধি পোরা আছে; তার ঠিকানা নেই। তোমার বুদ্ধি না পেলে কেদার বাবু কিছুই করতে পারত না। তুমিই ফিকির করে সেই দিন জেনে এসেছিলে, যে রামতনু বাবুর গিন্নী কালীঘাটে আসবে ; আর আমাকে সেই কথা শিখিয়ে সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছিলে। সেই উকিল আর রামতনু বাবুর গিন্নী এখন ডেপুটী বাবুর পাড়াটা মাতিয়ে তুলবে। তুমি এত কায করছ, কেদার বাবু কেবল তোমাকে দশ হাজার টাকা দেবে ?

যদু। হ্যাঁ।

তারা। আর কিছু দেবে না ?

যদু। এখন ত কেবল দশ হাজার টাকা দেবার কথা আছে। পরে কৌশল করে আরও কিছু আদায় করতে হবে।

তারা। আমি যে এত কায করছি, আমাকে কিছু দেবে না ?

যদু। আমি কেদার বাবুকে বলব।

তারা। হ্যাগা ! এই যে দশ হাজার বলছ, সে কত টাকা ? তাতে কত ভরি সোণা হবে ? এবার কিন্তু আমার গোটটা ভেঙে তাতে আর দশ ভরি সোনা দিয়ে একটা মোটা বিছে গড়িয়ে দিতে হবে।

যদু। দেবো।

তারা। আর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভুতি দিদির মতন একখানা ভাল বারাণসী কাপড় কিনে দিতে হবে।

যদু। দেবো।

তারা। আর বারো মাস পরবার জন্যে যেমন খবা চেন দেবে বলেছিলে। আর, আটপউরে চুড়িগুলো ভেঙে ভাল করে গড়িয়ে দিও।

যদু। দেবো, সব দেবো, তুমি যা চাইবে সব দেবো।

তারা। আর দেখ, আমার নামে তুমি একখানা ছোটখাট বাড়ী কিনো,—পাঁচজনের সঙ্গে আর এক-বাড়ীতে থাকতে পারব না। বৌবাজারের সেই ঘরটিতে থাকতাম, আর পাঁজন এসে দরজা ঠেলত, আর তুমি আমার খাঁটি চরিত্রে সন্দেহ করতে। আলাদা বাড়ীতে থাকলে, তোমার আর কোনও সন্দেহ থাকবে না।

যদু। নাঃ।

তারা। তা হলে বাড়ী কিনবে ?

যদু। কিনব।

তারা। আমার নামে কিনবে ত ?

যদু। তোমার নামেই কিনব।

এই শুভ সংকল্পের কথা শুনিয়া, তারা আদরে যদুর টাকে এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বুদ্ধির সেই গোলকে হাত বুলাইয়া দিল ; তৎকালে সেই গোলকটি উজ্জ্বল হইয়া রাজমুকুটের মধ্যমণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এস ইত্যবসরে আমরা তারাকে একবার দেখিয়া লই। আমরা বৃদ্ধ ; আমরা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া করিয়া প্রত্যহ পৌরাণিকী ব্যভিচারিণীগণকে স্মরণ করিয়া মহাপাতক নাশ করিয়া থাকি।

তারা শ্যামাঙ্গিনী, হৃষ্টপুষ্টা, এবং ক্ষুদ্রদেহা। তাহার কপালটি ছোট, চক্ষু দুইটি ছোট, নাকটি ছোট, ঠোঁট দু'খানি ছোট,—কিন্তু সবই কামিনীজনসুলভ কমনীয়তায় পূর্ণ। তাহার সেই ক্ষুদ্র ললাট প্রসন্ন ও কুঞ্চিতালকদাম পরিবেষ্টিত ; তাহার সেই ক্ষুদ্র চক্ষু ঘন ও দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্মে সমাচ্ছন্ন ; তাহার সেই ক্ষুদ্র নাসিকা উন্নত এবং সুগঠিত ; তাহার সেই ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ সরস প্রবাল-প্রভা সদৃশ। নিবিড়নিতম্বিনী—তারার নধর দেহ, সুগোল বাহু ; তাহার করতল ও পদতল ক্ষুদ্র ও মাংসল। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তারা যুবতী ছিল ; দ্বাদশ বৎসর পরে, তাহার ত্রিংশ বৎসর বয়সে, এখনও সে যুবতী ; বুঝি বা আরও দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তাহার যৌবন অব্যাহত থাকিবে। এক

শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, তাঁহারা কখনও বৃদ্ধ হয় না; স্থিরযৌবনা তারা সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক।

তারা যদুর সেবায় সন্তুষ্টা হইয়া, যদুকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু সে ভালবাসার একটু 'কিন্তু' ছিল। চাকুরিয়া বাবু চাকরী ভালবাসেন বলিয়া কি উপরি পাওনা ভালবাসেন না? তারাও ঐরূপ দুই একটা উপরি পাওনার প্রত্যাশা করিত। আমাদের সুধীরনাথ তারার একটি উপরি পাওনা। ধূর্ত্ত যদুর সমস্ত ধূর্ত্ততা তারার প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া যাইত, তাই সে কখনও সুধীরনাথকে সন্দেহ করিবার অবসর পায় নাই। তারার আরও উপাসক ছিল। সুধীরনাথ ও অন্য উপাসকগণ কিরূপে তারার পূজা করিতে আসিত তাহা তোমরা এখনই দেখিতে পাইবে।

যদুর বুদ্ধির গোলকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বহির্দ্বারে একখানা শকটচক্রের শব্দ তারা কাণ পাতিয়া শুনিল। শুনিয়া সে যদুকে বলিল—"বোধ হয় মল্লিক গিন্নী আসছে। সেদিন তার সঙ্গে কালীঘাটে আলাপ হয়েছিল; তার স্বামী কোন্ আফিসের ক্যাসিয়ার। বলেছিল, আজ আমাদের বাসায় আসবে। তাই বুঝি এসেছে। এখনই চলে যাবে এখন। তুমি একটু বাইরের ঘরে গিয়ে ব'স।"

যদু তাহাই করিল।

তারা নিম্নে আসিয়া দেখিল যে বহির্দ্বারের নিকট একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার দ্বার রুদ্ধ। তারা গাড়ীর নিকটে আসিয়া, রুদ্ধদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল; এবং গাড়ীর ভিতর যে লোক ছিল, তাহার সহিত কি কথা কহিয়া একটু হাসিল। পরে, আমাদের পূর্ব্বকথিত বাহিরের ঘরে যদুর নিকট আসিয়া বলিল—'যা' বলেছিলাম, তাই। মল্লিক-গিন্নী এসেছে, কিন্তু গাড়ী থেকে নামতে চাচ্ছে না।"

যদু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? এতদূর এসে গাড়ী থেকে নামছে না কেন?"

তারা যদুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "বলছে ম্যানেজার বাবু রয়েছেন, যদি দেখতে পান, লজ্জায় মরে যাব। মাগী ভারি লাজুক।"

যদু তাড়াতাড়ি কালো আলপাকার চোগাটি গায়ে দিয়া এবং কালো মখমলের গোল টুপিটি মাথায় দিয়া বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি; শেয়ালদয়ে কায আছে। তুমি ওকে গাড়ী থেকে নামিয়ে উপরে নিয়ে যাও। আজ বাবুদের বাড়ীর দোল দুর্গোৎসবের গল্পগুলো খুব জাঁকাল করে ওকে শুনিও, বুঝেছ?"

তারা হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি।"

যদু চলিয়া গেল।

তারা বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, যদুর নিঃশব্দ পদক্ষেপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। ক্রমে দূর পথপ্রান্তে যদু অদৃশ্য হইল। তখন তারা চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার গাড়ীর নিকট আসিয়া তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিল—"ভু—উ—ভু।"

সুধীরনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল—"এই—এই—কি করে'—এই তাড়ালে?"

নবম পরিচ্ছেদ

শ্যালকত্রয় ও বিধুভূষণ গোস্বামী।

সন্ধ্যার পরে সুবাসিত উত্তরীয় দুলাইয়া, সুধীর টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিলে, কেদারনাথ বলিল, "ভাই, তোমাকে এত করে বোঝালাম, তবু তুমি এই সামান্য কয়েকটা দিনের জন্যে আর ঐটে বন্ধ করতে পারলে না। দেখছি তুমি একটা গোলযোগ ঘটাবে, আমাদের সব মতলব পণ্ড করে দেবে!"

সুধীর বলিল, "বড়দাদা!—এই—তুমিও ত, বড়-দাদা,—এই—ঐটে—এই—এখনও খাও।"

কেদার। আমি খাই রাত্রি দশটার পর। আমি খাই, শোবার ঘরে বসে দরজায় কপাট দিয়ে। আর তার পর আর কারুও সঙ্গে দেখা করিনে। আমার খাওয়া কাগে-কোকিলে জানতে পারে না। তুমি দিনের বেলায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও; ঐ ত খারাপ। রাস্তার

লোক যদি জানতে পারে, আমাদের সব মাটী হবে। মাতাল বলে তোমার বদনাম ঘটলে, আর সে কথা ডেপুটী বাবুর কাণে উঠলে, হরিহরপুরে জমীদারের বাবা এলেও, ডেপুটীবাবু আপন নাতনীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবে না।

সুধীর। তা হলে,—এই—আজ থেকে,—এই—ঘরে—এই—খিল দিয়ে খাব।

কেদার। তাতে এক বোতলের জায়গায় দু' বোতল খাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার কেবল অনুরোধ, রাস্তায় একটা কেলেঙ্কারী করে, লোকের কাছে বদনাম রটনা কোরো না। তা হলে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। অল্প দিন মধ্যে, বিনা পরিশ্রমে দুই কোটি টাকা হস্তগত করতে হলে, অতি সাবধানে চলতে হবে।

সুধীর। আমি—এই—খুব—এই সাবধানে চলব।

কেদার। দেখ, সাধারণ লোকের আছে সব চেয়ে বেশী আদর টাকার; তাদের কাছে দেখাতে হবে যে আমরা অগাধ ধনে ধনী, আর ধন খরচ করতেও পারি। কিন্তু ডেপুটি বাবুর কাছে শুধু ঐশ্বর্য্য দেখালে চলবে না; সে বিজ্ঞ বুড়ো শুধু ঐশ্বর্য্য দেখে ভুলবে না; তাহার কাছে যথেষ্ট গুণ দেখান চাই।

সুধী। আমার—এই—বি-এ পাসের—এই সার্টিফিকেট আছে—দেখাব।

কেদার। শুধু বিদ্যার দৌড় দেখালেই চলবে না; ডেপুটিবাবু চরিত্রের গুণ খুঁজবে। আবার ডেপুটিবাবুর নাতনীর কাছে, কেবল ঐশ্বর্য্য আর গুণ দেখালে চলবে না, তাকে চকচকে রূপও দেখান চাই। এই জন্যে তোমাকে সর্ব্বদা ভাল ভাল সাবান, ভাল ভাল খোসবো, আর ভাল ভাল তেল মাখতে হবে; সাহেব বাড়ীতে চুল কাটাতে হবে; রকম বেরকমের পোষাক পরিচ্ছদ পরতে হইবে; এবং ভাল ভাল জিনিষ খেয়ে দেহটা মাংসল করতে হবে।

সুধীর। আমি—এই—সবই ত করি। মাখম, ঘি, দুধ,—এই সব খাই। আর—এই—নাবার জলে—এই—দেবার জন্য—এই টয়লেট য়্যামোনিয়া, আর—এই গায়ে মাখবার জন্যে এই—ভেসুট্যাল ভিনোলিয়া—এই সব আর—এই কেরুলিন্ স্নো এই—সবই ত কিনেছি।

কেদার। তোমার চেহারাও আর সে চেহারা নেই। আর্শিতে দেখো, এখন আগেকার চেয়ে দশগুণ উজ্জ্বল হয়েছে।

সুধীর। এই—সত্যি—দাদা, আমার এই চেহারাটা—এই—খুব—এই—এমন সুন্দর কখনও দেখিনি।

কেদার। এখন খুব সাবধান, ভাই, এখন যেন কোন মাগীর কথায় ভুলো না।—মাগীরা কার্য্যোদ্ধার করতে কি না বলে? সাবধান!

যে কক্ষে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর উপরিউক্ত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল, কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে, তথায় মধ্যম অঘোরনাথ আসিয়া একটা আসনে উপবেশন করিয়াছিল। সে বলিল, "এই লোকে কথায় বলে, 'সাবধানের বিনাশ নেই।' আমি একবারে একের নম্বর হুঁসিয়ার হয়েছি। বাবা! কেল্লার দরজায় যে গোরা পাহারা! মাথায় একটি বদখেয়াল ঢোকবার যো নেই।"

কেদার। আরও দিন কতক চুপ করে থাকতে হবে। তার পর, টাকাটা একবার হস্তগত হলে হয়! তার পর যা ইচ্ছে কোর; দিনরাত ধরে, মনের মত দুশো মজা লুঠো।

অঘোর। বড়দা! আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আজ আমি একটা চাল চেলেছি।

কেদার। কি চাল?

অঘোর। বাবা! আমার এ কাঠবিড়ালীর চাল। ত্রেতাযুগে যখন লঙ্কার রাবণ সীতাহরণ করেছিল, তখন রামকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার জন্যে বানরেরা সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এক পুল বেঁধেছিল; সেই সময় এক কাঠবিড়ালী তাদের সাহায্য করেছিল; লেজে আধ তোলা বালি নিয়ে পুলের উপর লেজ ঝেড়ে দিয়েছিল। তোমা-

দের বড় বড় চালের উপর, আমার চালটা যেন কাঠ-বিড়ালীর আধ্‌ তোলা বালি।

কেদার। কিন্তু চালটা কি?

অঘোর। ঘটক বেটা কি চেঁচায়। বেটার কাছে কি আমি কথা কইতে পারি? বাবা! যেন ঢাকের কাছে টাম্‌টেমি!

কেদার। ঘটকের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?

অঘোর। গুপ্তবাবুর বাজারের কাছে রাস্তায়।

কেদার। সে তোমাকে কি বল্লে?

অঘোর। বেটা জিজ্ঞাসা করলে যে, আমরা দুই বড় ভাই, আমরা কি কখন উদ্বাহ করব না? বেটা বিবাহ বলে না, বলে উদ্বাহ। বাবা! বেটার কি গলার আওয়াজ! যেন বিশ্বেশ্বরের ষাঁড়।

কেদার। ঘটকের কথায় তুমি কি উত্তর দিলে?

অঘোর। আমি বল্লাম, বাবা! আমাদের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা; আমরা হাজার টাকা দামের ইষ্টাম্পো কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখে দেব যে আমরা ইহজীবনে কস্মিন কালে বিবাহ করব না।

কেদার। ঘটক সেখানে গিয়ে বলবে যে আমরা কখনও বিবাহ করব না। সুতরাং কখনও আমাদের সন্তানাদি হবার সম্ভব থাকবে না। অতএব ভবিষ্যতে সুধীরকুমার আর তার পুত্র পৌত্রাদিগণই নির্ব্বিবাদে সমস্ত অখণ্ড হরিহরপুর এষ্টেটের একমাত্র সত্বাধিকারী হবে। ডেপুটিবাবু মনে করবে যে কালক্রমে তার নাতিনীই, একলক্ষ টাকা আয়ের হরিহরপুর এষ্টেটের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবে। বাঃ এ একটা বেশ চাল বটে।

অঘোর। বাবা! এ যে তুমি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিয়ে বসলে। ওটা আমার চালই নয়; কবে কোন কালে, ডেপুটিবাবুর নাতিনী কিম্বা তাহার পুত্র পৌত্র হরিহরপুর এষ্টেটের সম্পূর্ণ মালিক হবে, তাতে আর, ডেপুটিবাবুর মন উঠত! তা আমার চালই নয়; আমার চাল কি, এখনও তোমাকে বলি নি।

কেদার। তবে বল শুনি।

অঘোর। আমি ঘটককে বল্লাম যে, "সুধীর ভায়ার বিবাহের আগে, আমরাও আমাদের জমীদারীর আপন আপন অংশ, রেজিষ্টারিকৃত দানপত্রের দ্বারা সুধীর ভায়াকে দান করব। এবং আমরা দুই জ্যেষ্ঠ ভাই, আমাদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে কাশীবাসী হয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ খাব।

কেদার। বাঃ বাঃ! বেশ কথা তুমি ঘটককে বলেছ। এ একটা চাল বটে। শুনে ঘটক কি বল্লে?

অঘোর। বলবে আর কি? বেটা একবারে চুপ হয়ে গেল।—যেন জোঁকের মুখে নুণ পড়ে গেল।

কেদার। চার দিকেই আমাদের কাযের বেশ সুবিধা হচ্ছে; চারদিক থেকেই সুসংবাদ পাচ্ছি। কিন্তু খরচ বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে আসবাব, পোষাক, হীরে, মুক্তো, সোণা, রূপো প্রায় তের হাজার টাকার কিনতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ হীরে মুক্তো অবশ্য নকল; রূপোর বাসনও বেশীর ভাগ পিতল ও তামার উপর গিল্‌টি করা। কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে, কতকগুলি আসল জিনিষও রাখতে হয়েছে; রূপোর বাসনেই পাঁচ হাজার টাকারও বেশী পড়ে গেছে। তার পর, যে রকম বড়মানুষী করা হচ্ছে, তাতেও মাসে মাসে পাঁচ ছ' হাজার টাকা খরচ হলে, এ ছ' মাসের মধ্যে আমাদের সমস্ত পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে বিলক্ষণ আশা আছে যে, ছ মাসের মধ্যেই, অর্থাৎ আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই শুভবিবাহ হয়ে যাবে।

অঘোর। দিদির সেই মুক্তোর মালাটা? বাবা! এক একটা মুক্তো যেন এক একটা কাশ্মীরী মটর! আমরা সেটা খুব লুকিয়েছিলাম। বাবা! বুড়ো সেটার জন্যে দিনকতক যে ছটফট করেছিল!—যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। বড়দাদা, সেই মালাটা তোমার কাছে আছে ত?

কেদার। আছে বৈকি? তা এখন খুব কাযে লাগবে।

সুধীর। সেই মালা থেকে—এই—আমাকে, বড়দাদা,—এই ছুটো মুক্তো খুলে দিতে হবে। এই —আমি—একজনকে দেবো বলেছি; সে তার—এই—নূতন—এই—নথে লাগাবে।

কেদার। মালাছড়াটা আপাততঃ বন্ধক রাখতে হবে;—বোধ হয় দশহাজার টাকা পাওয়া যাবে। এখন কেবল টাকা চাই; এখন টাকার অভাব হলে আমাদের কৌশল নষ্ট হয়ে যাবে। সুধীর ভাই, ডেপুটিবাবুর নাতিনীর সঙ্গে আগে তোমার শুভবিবাহটা হয়ে যাক, বুড়োর টাকাটা আমাদের হস্তগত হোক, তার পর যাকে ইচ্ছা তুমি দু হাতে মুক্তো বিলিও। কেবল ছুটো মাস, একটুখানি কষ্টস্বীকার করে, সকল অভাব সহ্য করতে হবে। দু'মাস সবুর কর ভাই।

অমর। বাবা! কথায় বলে, 'সবুরে মেওয়া ফলে।'

সুধীর। এই দুমাসে—এই—মানুষটা—এই—মুক্তো না পেলে—এই—যদি—এই—হাতছাড়া হয়ে যায়?—এই—তখন?

অঘোর। বাবা! দুই কোটি টাকা হস্তগত হলে, মানুষের চৌদ্দপুরুষ আমাদের তুড়িতে উঠবে, বসবে, নাচবে।

সেই কক্ষ মধ্যে একজন ভৃত্য প্রবেশ করায় ভ্রাতৃত্রয় আপন আপন বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, তাহার দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। সে বলিল, "হুজুর আটটা বেজে গিয়েছে। বামুনঠাকুরদের আপনাদের খাবার দেওয়ার কথা বলব কি? রসুই সব শেষ হয়েছে।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বাইরের লোক কেউ খাবে কি? কাকেও কি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?"

ভৃত্যদের প্রতি কেদারনাথের আদেশ ছিল যে, জিনিষ থেয়েচরে তিনি কোন লোককে আহারে কোন সুধীর। রিলে, ভৃত্যেরা তাহা স্মরণ করিয়া দুধ,—এই সব সুধামী ব্যবস্থা করিবে; এবং যথা-সময়ে উহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। এই সকল তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য তিনি যে আপনার মূল্যবান মস্তককে পীড়িত করিতে চান না, ইহা ভৃত্যগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

কেদারনাথের প্রশ্নে ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে! কাল পদ্মপুকুরের বিধুবাবুকে খেতে বলেছিলেন।"

কেদার। সে এসেছে কি?

ভৃত্য। আজ্ঞে হুজুর। তিনি চুপ করে' বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন।

কেদার। আচ্ছা, তাঁকে উপরে এই ঘরে ডেকে দে। আর ঠাকুরকে খাবার দিতে বল। চারটে আসন হবে।

প্রভুর আদেশ গ্রহণ করিয়া, ভৃত্য প্রস্থান করিল।

কেদারনাথ সুধীরের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সুধীর ভাই! তুমি ঐ কৌচখানায় বসো; তোমার মুখে এখনও খুব গন্ধ রয়েছে।"

সুধীর সরিয়া বসিল।

বিধুবাবু—বিধুভূষণ গোস্বামী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শিখা, গলায় তুলসীমালা, নাকে তিলক এবং মুখে হরিনাম। তিনি ঐ সকল সজ্জাহীন নির্লজ্জগণকে মহা অধার্ম্মিক মনে করিতেন; কিন্তু কেদার প্রভৃতির ঐরূপ সজ্জা না থাকিলেও, তাহাদের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তিনি তাহাদিগকে অধার্ম্মিক মনে করিতেন না। তাঁহার গায়ে নীল আলপাকার কোট, পরণে কল্কাপাড় ধুতি, পায়ে পম্পসু, এবং স্কন্ধে কোঁচান চাদর। তাহার দীর্ঘ দেহ, সজল চক্ষু এবং শ্যামবর্ণ। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছিল। কিরূপে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত সংসারে তাহা প্রচারিত ছিল না।

তাঁহাকে দেখিয়া, কেদারনাথ তাহার কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া বলিল, "আসুন আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক! নমস্কার! ওরে! তামাক নিয়ে আয়।"

বিধুবাবু বলিলেন, "হরি হে দীনবন্ধো! আজ

আপনারা তিন ভ্রাতাই অধিষ্ঠান রয়েছেন। নমস্কার, নমস্কার! আপনারা কেমন আছেন হুজুর?"

কেদার। "আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম ভালই আছি।

বিধু। দীনবন্ধু হরিই মূলাধার! আমরা উপলক্ষ মাত্র। তবে হুজুরদের শুভকামনা করে আমি প্রত্যহ দশটি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদন করে থাকি। হরি হে, তুমিই সত্য। আহা! আমার ইচ্ছা হয় যে হুজুরদের সঙ্গে একবার হরিহরপুর যাত্রা করি। নগরের নাম শুনে, আমার লালাস্রাব হয়; —হরিহরপুর!—আহা, পরম পবিত্র তীর্থ!

কেদার। আমাদের পক্ষে তাই বটে। একে ত জন্মস্থান; তার উপর পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি কলাপ, —দেব, দেবালয়, মন্দির! আমাদের শঙ্করদীঘির ঈশান কোণে সম্প্রতি আমাদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণী একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিধু। আহা! যেমন শিবের মত পুত্র, তেমনই তাঁদের গর্ভধারিণী, যেন সাক্ষাৎ শঙ্করী! আমি সেদিন তাঁর নামে পাঁচটি তুলসী পত্র উৎসর্গ করেছিলাম। আর গঙ্গাদেবীর পিতৃপুরুষের সাধ্য নেই, যে তাঁহার একগাছি কেশ স্পর্শ করে। হুজুর! আমার মন্ত্রপূত তুলসী পত্রের অমোঘ শক্তি! সেবার রাম বাড়ুর্য্যের ছেলের কলেরা হল; আমি বল্লাম, খরচ পত্র করে' ডাক্তার দেখান' কেন? আমাকে পাঁচসিকে দাও, আমি নারায়ণের মাথায় সচন্দন তুলসী পত্র চড়াব। বেটা নাস্তিক, তাতে রাজি হল না। ছেলেটা যমের বাড়ী গেল, খুব হল;—এত অধর্ম্ম কি ধরিত্রী দেবী সহ্য করতে পারেন?

রজতনির্ম্মিত বৃহৎ গড়গড়ায়, সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া, ভৃত্য তাহা বিধুবাবুর আসন পার্শ্বস্থ টীপয়ে রক্ষা করিল; এবং তাহার স্বর্ণরজতময় মুখনলটি বিধু বাবুর হস্তে প্রদান করিল।—কিন্তু, লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুজ্ঞা না পাওয়ায়, বনবাস কালে রামদত্ত ফল সকল আহার করেন নাই, হস্তে গ্রহণ করিয়া ছিলেন মাত্র, বিধুবাবুও তেমনই মুখনলটি হাতে ধরিয়াই রহিলেন, উহা মুখে উঠাইলেন না। দেখিয়া, কেদারনাথ বলিল, "খান, তামাক খান, আপনি কি তামাক খান না?"

বিধু। হুজুরের কাছে আমি মিথ্যা কথা বলব না;—তামাক আমি খাই।—দুনিয়ার মধ্যে ঐ একটা নেশা! কিন্তু হুজুরদের সম্মুখে আমি এ গোস্তাগি করতে পারব না।

কেদার। আমরা অনুমতি দিচ্ছি; কোন দোষ নেই; আপনি খান।

সুধীর। আমি—এই—চোখ বুজে রইছি—এই—কিছুই—এই-দেখতে পাব না।

অঘোর। আমি এই কাণে আঙ্গুল দিলাম,—ভড় ভড়্ গড়্ গড়্—শব্দ কিছুই শুনতে পাব না। বাবা! কাণের ভিতর যেন রাবণের চিতা জ্বলছে—পোঁ পোঁ!

বিধু। আপনারা যখন অনুমতি করছেন, আর অভয় দিচ্ছেন, তখন আমার খেতেই হবে। হরি হে! তুমিই সত্য।

বিধুবাবু ধূমপানে মন দিলেন। কেদারনাথ ও অঘোরনাথ নিজ নিজ চিন্তায় নিযুক্ত হইল। সুধীর তারার আদরের কথা ভাবিতে লাগিল। যখন সকলেই এইরূপে নিযুক্ত ছিল, তখন ভৃত্য আসিয়া তাহাদিগকে আহারের জন্য আহ্বান করিল। শুনিয়া কেদারনাথ বলিল, "চলুন বিধুবাবু, আহার করবেন, চলুন। আমাদের সামান্য আয়োজন। এ শুধু আপনাকে কষ্ট দেওয়া।"

ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া বিধুবাবু দেখিলেন যে গৃহচ্ছাদে চারিটি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, এবং দুই খানি বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে। তন্নিম্নে চারিটি সুদৃশ্য গালিচার আসন। আসনের সম্মুখে রজত নির্ম্মিত ভোজন পাত্র সকল নানাবিধ ভোজ্যে পূর্ণ রহিয়াছে! এমন ভোজনপাত্র, এত অগণ্য খাদ্যদ্রব্য, বিধুবাবু আপন দীর্ঘ জীবনকালমধ্যে কখনও একত্র অবলোকন করেন নাই। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি স্বর্গে দেবরাজের

ভোজনাগারে আসিয়াছেন। পলান্নের, পলাণ্ডু-সুবাসিত আমিষ ব্যঞ্জনের, এবং নানাবিধ মিষ্টান্নের সৌরভে, তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আহার করিতে বসিয়া তিনি বলিলেন, "হরি হে! এ কি ব্যাপার, হুজুর এত খাবার কি মানুষে খেতে পারে?"

কেদার। সামান্য আয়োজন! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

বিধুবাবু। (কাট্‌লেটে কামড় মারিয়া) দীনবন্ধো! কি মধুর পবিত্র খাদ্যই খাওয়া গেল! এটা কি হুজুর?

কেদার। ওটা কাট্‌লেট্।

বিধুবাবু। দীনবন্ধু হরি! এরেই কাট্‌লেট্ বলে? সাহেবেরা কাটলেট খায় বলেই বোধ হয়, অমন লাল চেহারা হ'য়ে উঠে। এই বাটিতে কি হুজুর?

কেদার। মাংসের কালিয়া।

বিধুবাবু। থাক্, ওটা আর খাব না। গোস্বামী ব্রাহ্মণ, গলায় হরিনামের মালা রয়েছে, মাংসটা খাওয়া উচিত হবে না। তার চেয়ে বরং আরও দুখানা কাট্‌লেট্ আনিতে বলুন।

কেদার। তা কাট্‌লেট্ খান; কিন্তু কালিয়াটাও খেতে হবে। আমাদের অনুরোধে আজকের মত খান। গঙ্গাজলে রান্না,—একদিন খেলে কোন দোষ হবে না।

বিধুবাবু। আমার অগাধ গঙ্গাভক্তি! গঙ্গাজলে সব শুচি হয়ে যায়। বিশেষতঃ হুজুর যখন অনুমতি করছেন এবং অভয় দিচ্ছেন, তখন এ দেবভোগ্য সামগ্রী না খেলেও পাপ। হরি হে দীনবন্ধো!

কেদার। খান খান, ওতে কিছু অধর্ম্ম হবে না। আর যদিই অধর্ম্ম হয়, আগামী কল্য না হয়, একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা যাবে।

অঘোর। দশটি সচন্দন তুলসীপত্র,—বাবা! যেন ধোবায় ক্ষার!—সব ময়লা কেটে যাবে।

বিধুবাবু। আমি একটা কথা নিবেদন করছিলাম, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, তবে বলি।

কেদার। কি কথা? বলুন না।

বিধুবাবু। বলছিলাম কি যে, এই আমার ইচ্ছে, যে আপনাদের পূজ্যপাদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর নামে দ্বাদশটি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদন করি। খরচ বেশী নয়; পাঁচটি টাকা হলেই দক্ষিণান্ত পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। হরি হে তুমিই সত্য!

কেদার। বেশ ত। মাতাঠাকুরাণীর কাছে তাঁর অভিপ্রায় জেনে, আজ রাত্রেই আপনাকে বলব। ঐ বাটীটায় যে আপনি হাত দিলেন না?

বিধুবাবু। হরি হে! ক্রমে। আগে এইটে সমাধা করি হুজুর। যখন প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, তখন ভাল করেই খাব—কিছু বাদ দেব না। আহা! কি সুধাপূর্ণ সামগ্রী সকলই খাচ্ছি;—যেন শচীর অধরামৃত।

অঘোর। এই সামান্য কালিয়ার এত সুখ্যাতি কেন?—বাবা! এ যেন ধান ভানতে মহীপালের গীত।

সুধীর। এই—মহীপালের নয়, মেজদাদা,—এই শিবের গীত।

দুঃখের বিষয়, ক্ষুদ্রোদর-নির্ম্মাতা বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া, অবশেষে বিধুবাবু আহার শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অহো কি পরিতাপ! কথিত আছে, মরিলে মানুষ দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু এরূপ উপাদেয় ভোজন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় বার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি বিধুবাবুর আহার শেষ করিতে হইয়াছিল; কারণ তাঁহার উদর মধ্যে অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছিল।—হে দামোদর! তোমার পরম ভক্ত বিধুবাবুর প্রতি তোমার এ কি অবিচার।

আচমনের পর, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, এবং হরিনামের সহিত পলাণ্ডু-সুবাসিত উদ্গার তুলিতে তুলিতে বিধুবাবু বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ধূমপানে রত হইলেন। কেদারনাথ তুলসীপত্র নিবেদনের জন্য পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইবার অছিলায় আপন শয়নকক্ষে প্রস্থান করিল। অঘোরনাথ সুসজ্জিত হইয়া গাড়ী চড়িয়া নিশীথ ভ্রমণে বাহির হইল। সুধীরনাথ সোফায়

বসিয়া সিগারেট খাইতে খাইতে তাহার দ্বিপ্রাহরিক আদরের কথা ভাবিতে লাগিল।

কেদারনাথকে বৈঠকখানা ঘরে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিধু বাবু বলিলেন, "হেউ! হরি হে! দ্বাদশটি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদনের কথাটি কি হুজুর পূজ্যপাদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেয়েছিলেন? পূজ্যপাদেশ্বরী কি অনুমতি করলেন?"

ভৃত্যপ্রদত্ত স্বর্ণখচিত একটি ক্ষুদ্র আলবোলায় ধূমপান করিতে করিতে কেদারনাথ কহিল, "মাতাঠাকুরাণীর কাছে গিয়েছিলাম; তিনি বল্লেন—"

বিধু বাবু সজল চক্ষু তুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লেন? হরি হে, হেউ! কি বল্লেন হুজুর?"

কেদারনাথ কহিল, "মাতাঠাকুরাণী তুলসীপত্র উৎসর্গের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সামান্য লোকের ন্যায় সামান্য কয়েকটা গাছের পাতা উৎসর্গ করা তাঁর শোভা পায় না। তাই তিনি বল্লেন যে, বারটি সোনার তুলসীপাতা বার আনা ওজনের সোনাতে প্রস্তুত করে' তাই যেন নিবেদন করা হয়।"

বিধু। আহা আহা! হেউ! যেমন পরমাত্মা পুত্র, তেমনই তাঁর পরমারাধ্যা গর্ভধারিণী! দীনবন্ধু! অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন পবিত্র তুলসী ভক্তি কখনও দেখি নি।"

কেদার। এখন পাকা সোণার ভরি চব্বিশ টাকা। তা হলে বার আনা পাকা সোনার দাম হয় আঠার টাকা; মজুরী দু' টাকা; এই কুড়ি টাকা। আর দক্ষিণা পাঁচ টাকা; মোট পঁচিশ টাকা। এই পঁচিশ টাকা মাতাঠাকুরাণী আপনাকে দিয়েছেন। এই নিন।

বিধু। (গ্রহণ করিয়া) হরি হে, তুমিই সত্য! আহা! পূজ্যপাদেশ্বরী কি ভক্তিময়ী! কি ভক্তি গদ্গদ্‌চিত্তা!

কেদারনাথ। তুলসীপত্রগুলি একটু কষ্ট স্বীকার করে আপনাকেই গড়িয়ে নিতে হবে।

বিধু। সে আর বলতে হবে না হুজুর। পরের জন্যেই এ নশ্বর দেহ উৎসর্গ করেছি! হরি হে! হেউ! আহারটা কিছু গুরুগম্ভীর রকম হয়ে গেছে। বিশেষতঃ এই তুলসীপত্র গড়ান আর কারও দ্বারা হবে না। এই কায যার তার দ্বারা হয় না; অন্তরে তুলসীভক্তি না থাকিলে, কেউ ও কায পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রহেলিকা

(ক্ষমা)

সুধান সম্রাট্ তাঁর সভাসদ সবে,
"মোর বক্ষে পদাঘাত করেছে যে জন,
কোন দণ্ড সে দুষ্টের উপযুক্ত হবে,
কহ মন্ত্রী, সেনাপতি, পারিষদগণ।"

অমনি কহিল সবে—ক্রোধ মূর্ত্তিমান—
"দাও তারে, জাঁহাপনা, দণ্ড সুকঠোর,
ছিঁড়ে আন মুণ্ড তার, রক্তে কর স্নান,
এ হেন দুর্ব্বৃত্ত যেবা নরাধম ঘোর!"

সবিনয়ে কহে মন্ত্রী, "হে প্রভু আমার,
ভূষণে সাজাও সেই চরণ যুগল;
শিশু-রাজপুত্র বিনা, তব বক্ষে আর
কে করিবে পদাঘাত? কার হেন বল?"

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা

প্রতিবৎসর মাঘমাসে প্রয়াগধামে স্মরণাতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নরনারী কল্প-বাস করিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ত্রিবেণী ক্ষেত্রের বিস্তৃত বেলাভূমির উপর একমাসকাল পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রামায়ণ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি পাঠ এবং ভজন পূজন জপ যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া তীর্থবাস করেন। রামায়ণ পাঠে আমরা অবগত হই যে, ত্রেতাযুগেও যখন প্রয়াগধামে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ছিল, সে সময়ও মাঘমাসে শমদমদয়ানিধান পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ তাপসগণ মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম-সমীপস্থ ত্রিবেণী-সঙ্গমে একত্র হইয়া প্রত্যহ তীর্থরাজে প্রাতঃস্নান করিতেন এবং বেণীমাধব অক্ষয়বটের পূজা করিতেন, এবং এই ঋষি-সমাজে হরিগুণ গান, ব্রহ্মনিরূপণ তত্ত্ববিচার ও জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা হইত।

সমগ্র মাঘমাস স্নান করিয়া ঋষিগণ আপন আপন আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ভক্তকবি তুলসীদাস হিন্দিতে সুমধুর ভাষায় এই দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা।
জিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা॥
তাপস শমদম দয়ানিধানা।
পরমারথ পথ পরম সুজানা।
মাঘ মকরগত রবি যব হোই।
তীরথ পতিহিঁ আও সব কোই।
দেব দনুজ কিন্নর নর শ্রেণী।
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী॥
পূজহিঁ মাধব পদ-জলজাতা।
পরশি অক্ষয় বট হর্ষিত গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
পরম রম্য মুনিবর-মন-ভাবন॥
তাঁহা হোই মুনি-ঋষয়-সমাজা।
জাঁহি যে মজ্জন তীরথ-রাজা॥
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উচ্ছাহা।
কহহিঁ পরস্পর হরিগুণ গাহা॥
ব্রহ্ম নিরূপণ ধর্ম্ম বিধি বরণহি তত্ত্ববিভাগ।
কহহিঁ ভক্তি ভগবন্তকী, সংযুত জ্ঞানবিরাগ॥
ইহী প্রকার ভরি মকর নহাহিঁ।
পুনি সব নিজ নিজ আশ্রম যাহিঁ॥
প্রতি সম্বৎ অস হোই অনন্দা।
মকর মজ্জি গমনহিঁ মুনিবৃন্দা॥

দ্বাদশ বৎসর অন্তর মাঘমাসে বিশেষ বিশেষ গ্রহ-রাশির সংযোগ হইলে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়।

কুম্ভমেলার পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাস।

পশ্চিমদেশবাসী পণ্ডিত দুর্গাদত্ত মহাশয় বিষ্ণুযাগাদি নানা পুরাণ হইতে "কুম্ভ পর্ব্বব্যবস্থা" নামক একটি সংস্কৃত পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকা হইতে নিম্নলিখিত পৌরাণিক বিবরণ সংগৃহীত হইল:—

উত্তরে হিমালয় পার্শ্বে ক্ষীরোদ সাগর। দেব ও দানবগণ মিলিত হইয়া অমৃতের নিমিত্ত এই সমুদ্র মন্থন-করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত হইলেন মন্থন দণ্ড। বাসুকি হইলেন রজ্জু। ভগবান বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে মন্দরপর্ব্বতকে ধারণ করিলেন। মন্থন করিতে করিতে প্রথমে উঠিল গরল,—সে গরল পান করিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হইলেন। সমুদ্র মন্থনে নানা রত্ন, পুষ্পক রথ, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, পারিজাত, কৌস্তুভ, সুরভী গাভী, লক্ষ্মী প্রভৃতি উত্থিত হইলেন। অবশেষে অমৃতপূর্ণ

মনোহর কুম্ভ হস্তে ধন্বন্তরি উঠিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবগণের ইঙ্গিতে অমৃতকুম্ভ লইয়া পলায়ন করিলে, দৈত্যগণ অমৃতকুম্ভের জন্য জয়ন্তের পশ্চাতে ছুটিল। দেবাসুরে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল! জয়ন্তের হস্ত হইতে কখনও অসুরগণ অমৃতকুম্ভ কাড়িয়া লয়, কখনও বা জয়ন্ত তাহাদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়েন। এইরূপে দেবমানের দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অবশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া, অমরগণকে অমৃত পান করাইলে বিবাদের অবসান হয়। দেবতাদের দ্বাদশ দিনে পৃথিবীর দ্বাদশ বৎসর। জয়ন্ত কুম্ভ লইয়া কাড়াকাড়ির সময়ে, মধ্যে মধ্যে স্থান বিশেষে (অর্থাৎ হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে) উক্ত কুম্ভ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় ঐ সকল স্থানে কুম্ভ হইতে বিশেষ বিশেষ যোগে অমৃত পতিত হইয়াছিল। মতান্তরে, স্বর্গেই নানাস্থানে কুম্ভ লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। জয়ন্ত ও দানবগণের অমৃতকুম্ভ লইয়া কাড়াকাড়ির সময় পৃথিবীর যে চারি স্থলে যে শুভযোগে অমৃত পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থলে সেই সেই যোগ উপস্থিত হইলে কুম্ভ মেলা হয়।

১। গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার, ২। প্রয়াগ, ৩। উজ্জয়িনী ৪। গোদাবরীতট (নাসিক) এই চারিস্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। ১৩২১ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়াছিল। ১৩২৪ সালের মাঘী অমাবস্যায় প্রয়াগে কুম্ভ হইল। আবার নাসিকে শ্রাবণ মাসে কুম্ভ মেলা হইল। নাসিকের মেলার নয় মাস পরেই বৈশাখমাসে উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হয়। প্রত্যেক স্থানে ঠিক দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

ইহাই হইল পুরাণ-বর্ণিত কুম্ভযোগ উৎপত্তির বিবরণ। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কুম্ভমেলার সময় সন্ন্যাসিগণের যে মহাসম্মিলনী হয়, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাহার প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধবিপ্লবে শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধ সদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতায় প্লাবিত হইলে, করুণাময় শ্রীশঙ্কর আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দিগ্বিজয় ব্যপদেশে আসিন্ধু-হিমালয় কর্ম্মভূমি ভারতখণ্ডে ভ্রমণ করিয়া, বেদবিরুদ্ধ ভ্রান্ত মতের নিরাস করিয়া, বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিমল জ্ঞানালোকে ভারতের সকল প্রদেশের অসংখ্য লোকেই তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া তিনি প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়কে চারি মঠের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। উত্তরে হিমাচলবক্ষে বদরীক্ষেত্রে যোশী মঠ, পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে শারদ মঠ, পূর্ব্বে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করিয়া, আচার্য্য ভারতখণ্ডের প্রদেশ সমূহ চারি ভাগে বিভাগ করিয়া, উক্ত চারিভাগ নিকটবর্ত্তী মঠের শাসনাধীন করিলেন। এই চারি মঠের অসংখ্য শাখামঠ স্থাপিত হইল। সকল মঠেই অধ্যাত্মজ্ঞানের পঠন-পাঠন, সাধন-ভজন চলিতে লাগিল। ভারতের চারিদিকেই বেদান্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই সকল মঠের সন্ন্যাসিগণ যাহাতে সময় সময় সম্মিলিত হইয়া আপন আপন গুরু, গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর ভাব বিনিময় ও মঠের উন্নতি কিরূপে হইবে, কিরূপে জনসমাজে তাঁহাদের তপস্যালব্ধ জ্ঞান প্রচারিত হইবে, কিরূপে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, কিরূপে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রচার হইবে, তত্তৎ বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ জন্য শঙ্করাচার্য্য শিষ্য-সম্প্রদায়কে আদেশ করিলেন যে, কুম্ভযোগ উপলক্ষে তাঁহারা হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক তীর্থে সম্মিলিত হইবেন।

বিগত ১৩২৪ সালের ২৯শে মাঘ অমাবস্যায় প্রয়াগধামে কুম্ভস্নান হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন ২৮শে মাঘ চতুর্দ্দশীর অবসানে অমাবস্যার প্রবৃত্তি। তৎসঙ্গে ব্যতিপাত যোগ থাকায় ঐ স্নানের মহিমা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। অনেকে ২৮শে মাঘ সন্ধ্যাকালে এবং

২৯শে মাঘ প্রাতঃকালে ছুইবার স্নান করিয়াছিলেন। মাঘী অমাবস্যার দিন কুম্ভযোগ ও কুম্ভ স্নান হইয়াছিল বটে, কিন্তু কুম্ভমেলা ও সাধুসমাগম আরম্ভ হইয়াছিল ২৯শে পৌষ উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন হইতে। অনেক সাধুসন্ন্যাসী তাহার পূর্ব্বেই দলে দলে আসিয়া আস্তানা করিয়াছিলেন। আর মেলা শেষ হইয়াছিল, ১৩ই ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমার দিন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন (২৯শে পৌষ), মাঘী অমাবস্যায় কুম্ভযোগের দিন (২৯শে মাঘ) এবং বসন্তপঞ্চমীর দিন (৩রা ফাল্গুন) সাধুসন্ন্যাসিগণ অতি সমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল ২৯শে মাঘ অমাবস্যার দিন। সেবার রেল কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধের জন্য গাড়ী সরবরাহ করিতে পারিবেন না বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট প্রয়াগের চতুর্দ্দিকস্থ রেলপথের প্রায় ৫০।৬০ মাইল দূর ষ্টেশন পর্য্যন্ত কুম্ভমেলার যাত্রিগণের জন্য রেলের টিকিট দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রয়াগে প্লেগের প্রাদুর্ভাব থাকায় যাত্রিগণকে প্রয়াগে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদিও নিখিল-ভারতীয় হিন্দু সভার এবং হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি ভারতের সকল সংবাদপত্র ও জনগণের আবেদন আন্দোলনে, গবর্ণমেণ্ট মেলার চারিদিন পূর্ব্ব হইতে রেলের টিকিট দেওয়ার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংবাদ অনেকেই জানিতে পারেন নাই। যাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাও অত্যধিক ভীড় ও প্লেগের ভয়ে যাইতে সাহসী হন নাই। তথাপি কুম্ভমেলার দিন প্রয়াগে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের বিস্তৃত (প্রায় ৭।৮ মাইল ব্যাপী) সৈকত এবং ঝুঁসির গঙ্গাতীর সেদিন জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কি মহান্ দৃশ্য! যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে যে হিন্দুজাতি আজিও বাঁচিয়া আছে এবং তাহাদের প্রাণে এক সূত্রে গ্রথিত। জানি না পৃথিবীতে আর কোনও মেলায় এরূপ জনসমাগম হয় কি না! হিমালয়ের তুষারাবৃত গুহাবাসী সন্ন্যাসী, দাক্ষিণাত্যের রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য, পঞ্জাবের উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী এবং শিখ সম্প্রদায়, বঙ্গের মহাপ্রভুর সেবক গৌড়ীয় বৈষ্ণব, আর দ্বারকায় রামানন্দী বৈষ্ণব, কাশীর দণ্ডীস্বামী, অযোধ্যার খাকী রামায়ৎ, কবিরপন্থী অলেখিয়া প্রভৃতি সকল প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের লক্ষপতি আখড়াধারী মোহান্ত হইতে কুটীরবাসী ও বৃক্ষতলবাসী কপর্দ্দকশূন্য সাধু সন্ন্যাসী, অতুল বিভবশালী স্বাধীন করদ রাজ্যের নরপতি, ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক নেতা, ইম্পীরিয়ল কাউন্সিলের সদস্য হইতে দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল শ্রেণীর হিন্দু একই উদ্দেশ্যে একই পবিত্র ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। এই সাধুসঙ্ঘে মহাপণ্ডিত আছেন, মহাযোগী, মহাধ্যানী, মহাকর্ম্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা, মহাসাধক ও সিদ্ধ পুরুষ আছেন। দেখিয়া মনে হইল এ যেন একটা নূতন জগতে আসিয়াছি। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে সেদিন সন্ন্যাস ও গৃহাশ্রমের অপূর্ব্ব মিলন দেখিলাম।

কুম্ভমেলায় সে বৎসর যাত্রিসংখ্যা কত হইয়াছিল কে তাহা নিরূপণ করিবে? সৈকতভূমি ৭।৮ বর্গমাইল। রাত্রি ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'যে দিকে ফিরাই আঁখি' লোকে লোকারণ্য। লোকস্রোতের অবিরাম গতি—নিরবচ্ছিন্ন ঘাত প্রতিঘাত। এই দলে দলে লোক স্নান করিতে যাইতেছে, আবার দলে দলে ফিরিতেছে—অনেকের মুখেই "সীতারাম" "সীতারাম", কিংবা "জয় শিব শম্ভু।"

এলাহাবাদের পাওনীয়র পত্র লিখিয়াছিলেন, মেলার কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন যে ঐ দিন প্রায় ২৫ লক্ষ লোক গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়াছিল। এই যে বিপুল জনসমাগম, তাহারা একই উদ্দেশ্যে একত্র হইয়াছে। কোনও আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, কোন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, কোন প্রদর্শনীর জন্য নহে। তাহারা একত্র হইয়াছে কেবল তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নানদানাদি করিবার জন্য, এবং নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি সাধুসঙ্ঘের দর্শন কামনায়। দেখিয়া মনে হইল, কে বলে ভারত বিচ্ছিন্ন, কে বলে ভারতে একতার

অভাব! কে বলে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় ও জাতিভেদ থাকায় ভারতে একতার অভাব! চাহিয়া দেখ, আসিন্ধু-হিমাচল কাশ্মীর হইতে চট্টগ্রাম, সিন্ধু, মারওয়াড়, রাজপুতানা—সমগ্র ভারতের হিন্দু শৈব বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দণ্ডী সকলের এই এক তীর্থ, এক গঙ্গা যমুনা, একই বেণীমাধব অক্ষয়বট—সকলেই একই উদ্দেশ্যে আজ গাহিতেছে স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ—একই উদ্দেশ্যে একই মহাতীর্থে অবগাহন করিতেছে। সকলেই আজ অনুভব করিতেছে যে, আমরা একই দেবের ও একই তীর্থের সেবক এবং এক মহাজাতির অন্তর্গত।

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

বাদলের দিনে

(গল্প)

ভাগীরথী তীরস্থ একটি ইষ্টকালয়ের বাতায়নসন্নিধানে দুইটি রমণী—একজন যুবতী, অপরা কিশোরী।

সমস্ত দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে, একটি বারও সূর্য্যদেবকে দেখা যায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া বাদলের বাতাস সাঁসাঁ করিয়া ঘরের ভিতর আসিতেছে।

ইহারা দুই বোন, কমলা ও বিমলা। কমলা বিবাহিতা, বয়স সতেরো; বিমলা এখনও কুমারী, কিন্তু আর অধিক দিন ইহাকে কুমারী রাখা চলে না, শীঘ্রই বিবাহ দিতে হইবে। ভগিনীদ্বয় স্থির দৃষ্টিতে ভাগীরথীর বিস্তৃত বক্ষের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। পরপার মেঘের জন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। জলের উপরও যেন মেঘ নামিয়া রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে কমলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিমলা মধুর হাসিয়া কহিল, "দিদি, রায় মশায়ের কথা ভাবছ?"

কমলা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল এবং ভগিনীর গালে একটি ঠোনা মারিয়া কহিল, "চুপ্‌, পোড়ারমুখী!"

বিমলা। সত্যি বল, আমার মাথা খাও।

কমলা অনেকক্ষণ পরে বলিল, "বুঝ্‌বি যখন হবে।"

বিমলা বিজয়োল্লাসে বলিল, "হাঁ দিদি, সত্যিই কি বাদলের দিনে প্রিয়জনের জন্তে বড় মন কেমন করে?"

কমলা। তুই কেমন করে জান্‌লি?

বিমলা। বইয়ে পড়েছি।

ক। সত্যিই, বোন।

বি। আচ্ছা দিদি, আজ যদি রায় মশায় আসেন?

ক। নাচি আর কি!

বি। বল, বড় আনন্দ হয় কি না?

ক। এলেই ত! তিনি পূজোর আগে বাড়ী আসবেন না লিখেছেন।

বি। এপথে নৌকায় সহরে ত যেতে পারেন?

ক। তা পারেন বটে, মাঝে মাঝে যানও। কিন্তু জমিদারেরা বাবাকে যে এখানে বদলি করেছেন, সে খবর এখনও তিনি পান নি।

বি। কেন? তুমি কি তাঁকে চিঠি লেখ নি?

ক। এই এক হপ্তা হল এসেছি, নূতন সংসার গোছাতে চিঠি লেখবার সময় পেলাম কোথা? খামও ছিল না। খাম আনিয়ে, কাল মোটে চিঠি লিখেছি। সে চিঠি কি তিনি এরই মধ্যে পেয়েছেন?

এই সময়ে এক বর্ষীয়সী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উভয়ে নিস্তব্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "তোরা দুজনায় বসে আছিস, এতটা বেলা হল কিছু খেলি নে; আজকে আর ঠাণ্ডার দিনে স্নান করিস নে।"

বিমলা কহিল, "মা, ঝি বাজার করে এসেছে?"

মাতা। না মা, নূতন ঝি, এক উনান কয়লা গুলো পুড়ে গেল। তা যাক্, তোরা খাবার খাবি আয়।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবা আজ ফিরতে পারবেন না?"

মাতা। আজ ফিরবেন না বলে গেছেন।

বি। চল, আমরা যাচ্ছি।

মাতা চলিয়া গেলেন, ভগিনীদ্বয়ও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

২

বৈকালে বৃষ্টি একটু কম পড়িল, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হইল না। বাদলের বাতাস পূর্ব্ববৎ বহিতে লাগিল। ভগিনীদ্বয় সেই ঘরে বসিয়া আছে। কমলা কার্পেট বুনিতেছে, আর এক-একবার সতৃষ্ণ নয়নে ভাগীরথীর বক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেছে। বিমলা একখানি উপন্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে বিমলা পুস্তকের একাংশ দিদিকে পড়িতে দিল। দি'দি দেখিল, বাদলের দিনে নায়িকা উদাস দৃষ্টিতে নদীর পানে চাহিয়া আছে, অকস্মাৎ নৌকাযোগে আসিয়া নায়ক তীরে নামিল, এইরূপ তাহাতে বর্ণিত আছে। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিমলা, আজ তুই ক্ষেপলি যে।"

বিমলা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "ক্ষেপেছি বটে, আজ আমার দি'দর নায়কও এমনি আসবে, তাই আজ দিদি নদীর পানে অমন করে চাইছে।"

কমলা সোহাগে বিমলার গলা টিপিয়া ধরিল। বিমলা বলিল, "দেখবে রায় মহাশয় আসেন কি না।"

কমলা আর থাকিতে পারিল না, কহিল, "আসেন যদি তোকে বক্শিশ দেবেন।"

বিমলা। কাকে দেবেন দেখতে পাবে।

এমন সময় বিমলা একবার নদীর পানে চাহিল। একখানি নৌকা তীরের দিকে আসিতেছে। নৌকার গলুইয়ের উপর একজন ভদ্রলোক। বিমলা ব্যস্ততার সহিত বলিল, "দিদি, ঐ দেখ রায় মশায়।" কমলা ভদ্রলোকটির আকারে নিজ স্বামীর সাদৃশ্য দেখিয়া লজ্জাবনতমুখী হইল। বিমলা বলিল, "দিদি, আমি নীচে যাই, মা বুঝি ঘুমুচ্ছেন।" কমলা আস্তে কহিল, "আচ্ছা।"

৩

বিমলা নীচে নামিয়াই ঝিকে ডাকিল। ঝি রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতেছিল, বিমলার ডাকে সে চমকাইয়া উঠিল। বিমলা কহিল, "ঝি, একবার ঘাটে যা ত, কৌশলে জেনে আয়, কার নৌকো লাগছে।"

ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বিমলা বলিল, "বোধ হচ্চে দিদির বর। কিন্তু এত দূর থেকে ঠিক ঠাওর পাচ্চিনে। খবর্দ্দার, স্পষ্ট কিছু বলিসনে, আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করলে পরিচয়ও দিস নে।"

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিমলা কহিল, "যা, যদি কৌশলে জেনে আসতে পারিস তবে সন্দেশ পাবি।" ঝি তখন চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আসিয়া কহিল, "কল্কাতার বিনোদ বাবু সহরে যাচ্ছেন। দুধ কেনবার জন্যে মাঝিরা নৌকো লাগিয়েছে।"

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া বিমলা খুব হাসিয়া লইল। ঝির নিকট কহিল, "আমাদের রায় মশায়ই এসেছেন বটে! আমরা এখানে আছি তা জানেন না, তুই তাঁকে কৌশলে নিয়ে আয়। মাকে জাগাস্ নে, একটু আমোদ করিতে হবে।" ঝি কহিল, "তাই নাকি, তবে আর কি!"

ঝি একটি কলসী লইয়া ঘাটে গেল। কয়েকজন মাঝি তখন গ্রামের ভিতর গিয়াছে; বাবু নৌকার মুখে বসিয়া আছেন। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গো বাবু, আপনারা কোথায় যাবেন?"

বাবু। সহর।

ঝি। এই বাদলায় বাতাসে নদীর উপর থাকলে অসুখ করবে। গ্রামের ভিতর যান।

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কার বাড়ী যাব ?

ঝি। আমাদের বাড়ী চলুন, বৈঠকখানায় থাকবেন। বাবু এখন বাড়ীতে নেই, গিন্নিমা কিছু বলবেন না।"

বিনোদ। না, একজন ভদ্রলোকের বাড়ী কি করে' যাব ?"

ঝি জল লইয়া ফিরিয়া গেল। পুনরায় আসিয়া বলিল, "গিন্নিমার বিশেষ অনুরোধ, একটু জল খেয়ে আসবেন। না গেলে তিনি বড়ই দুঃখ করবেন।"

বিনোদ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু বিশেষ দুঃখ করিবেন শুনিয়া উঠিলেন। একজন মাঝিকে বলিলেন, "এখনই আসছি আমি।"

ঘাটের উপরেই বাড়ী। বিনোদ বৈঠকখানাতে গিয়া বসিতেই খুব এক পশলা বৃষ্টি আসিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া ঝিকে বলিলেন, "বৃষ্টি এল, ফিরে যাব কি করে' ?"

ঝি তাঁহাকে হাত মুখ ধুইবার জল দিয়া কহিল, "এইখানেই থাকবেন গো।"

বাবু এ কথার ভাব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কোন কথাই কহিলেন না। ঝি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঝি আসিয়া বলিল, "আসুন, জলখাবার দেওয়া হয়েচে।" বিনোদ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এইখানেই আন।" ঝি হাসিয়া বলিল, "নাগো, তাতে দোষ নেই।"

বিনোদ মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিলেন। উপরকার ঘরে গিয়া দেখেন কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে, আর দুই তিনখানি থালার উপর বিবিধ প্রকারের মিষ্টান্ন ও ফল রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—"এ কি 'আরব্যোপন্যাসের ব্যাপার, না আমি স্বপ্ন দেখছি ?" মনে ভাবিলেন, নৌকাতেই আছি। ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া দেখিলেন, তিনি নিদ্রিত নহেন, জাগিয়া আছেন বটে। আবার ভয় হইল—ভাবিলেন, "এ কি আমার প্রাণ সংহারের ফন্দী ?" দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "খিদে আমার নেই, এখনি নৌকোয় ফিরে যেতে হবে।"

ঝি কহিল, "কোন ভয় নেই গো, যা পারেন তাই খান।"

বিনোদ বাবুর ভয় ও সন্দেহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তথাপি অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, বসিলেন। চারিদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত খাদ্যদ্রব্যগুলি গলাধঃকরণ করিতেছেন, এমন সময় পা টিপিয়া বিমলা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একখানি রুমাল দিয়া তাঁহার চোখ বাঁধাইয়া ধরিল। বিনোদ হঠাৎ লম্ফ দিয়া উঠিয়া চীৎকার করিলেন, "খুন কল্লে—রে !" তারপর সজোরে হাত ছাড়াইয়া—অবাক। ঝি ও বিমলা হাসিয়া আকুল। বিনোদ বাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন—"বিমলা, তুমি এখানে ?"

বিমলা। আমরা যে এখানে এসেছি গো।

বাবু। সকলে ?

বিমলা। হাঁ গো, সকলেই। তোমার যে 'সকল', সেও এসেছে ভয় নেই। দিদিও এসেছে, বিরহিণী এতক্ষণ গঙ্গার উপর চেয়ে বসে ছিল।" এই বলিয়া পাশের ঘর হইতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা দিদিকে টানিয়া লইয়া আসিল। কমলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "পোড়ার মুখী ছাড়।"

বিমলা। আমি ত এখন পোড়ারমুখী হব। আমি যা বল্লাম তা ত হল, এখন বকশিস দাও। বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "ছেড়োনা বিমলা, বকশিস আদায় কর।"

বিমলা। হাঁ গো, তোমাকেও বকশিস দিতে হবে। কিন্তু সে বকশিস পাবে ঝি, ওকে বড় কষ্ট করে তোমায় ভুলিয়ে আনতে হয়েছে।" এই বলিয়া বিমলা হাসিয়া উঠিল।

তাহার হাসির শব্দে বিমলার মাতাঠাকুরাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিরক্ত হইয়া, সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া "তোদের এত হাসি"——বলিয়াই, এক দৌড়।

বিমলা আর একবার হাসিয়া উঠিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

মান ও প্রাণ

গাঁয়ের মাঝে মনসাতলায় আজ
লোকের ভিড়ে বসেছে ঐ মেলা—
পাল্লা দিয়ে কুস্তি 'মালামো'তে
মল্লগণের তথায় আজি খেলা
এক ধারে ঐ পূর্ব্ব-পাড়ার দল
আস্ফালনে করছে কোলাহল ;
অন্য ধারে উত্তর-পাড়ার সবে
জুটেছে ঐ আজকে বিকাল বেলা ;—
গাঁয়ের ভিতর মনসাতলায় আজ
কাতার দিয়ে বেতর লোকের মেলা।

তাল ঠুকে সব দাঁড়ায় পালোয়ান,—
কাপড় তাদের মালকোচ্চা মারা ;
'চাপড় মারে হাতের পেশীর 'পরে
হাফর সমান হাঁফায় কেবল তারা।
দু-দু জনা লড়ে এক এক বারে,
সরে' পড়ে যে জন তাহে হারে,
জয়ী ডাকে বাকী সকল বীরে
নিস্ফলতায় আস্ফালিছে যারা।
কাতার দিয়ে গাঁয়ের যত লোকে
দাঁড়ায় সবে কাঠের পুতুলপারা।

হল্লা করে' লোক জমেছে যত,
মল্লেরা সব পড়ে তাদের গায়,
কেউ বা হাঁকে, "বা—বা—বলিহারী"
কেউবা বলে, "আহারে হায় হায়!"
পূর্ব্ব পাড়ার নাইক আশা কোনো—
লড়তে ভালো পারলে না এক জনো ;
উত্তরপাড়া জয়-গরবে ডাকে—
"জোয়ান মরদ কে আর আছিস আয়!"
জয়ী পাড়া গর্ব্বভরে ফুরে,
পূর্ব্বপাড়া কাঙাল চোখে চায়।

একটা ভাঙা পাচির 'পরে বসে'
ছিল নিতাই—পূর্ব্বপাড়ার লোক,
করছিল তার বুকটা দুরুদুরু,
ভঙ্গি নানান্ ধরছিল তার চোখ।
পূর্ব্বপাড়ার প্রত্যেকেরই সনে
প্রাণটা তাহার যুঝ্‌তেছিল রণে,
বলছিল আর মাঝে মাঝে ডেকে ডেকে—
"বেশ চলেছে—ছেড়না ভাই রোখ্—
আহা আহা—বাগিয়ে ধরো দাদা!
তাগ বুঝি যায়—সাম্‌লে নিও ঝোঁক!"

তিনটি বছর এমনি দিনে হায়,
একা নিতাই সবার সনে যুঝে'
হারিয়ে দিল উত্তর পাড়ার সবে ;
সকল মর্দ্দ কের্দ্দানী তার বুঝে।
ফিরলো তারা মুখটি করে চূণ,
মনে মনে গেয়ে তাহার গুণ ;
মুষড়ে গিয়ে দিন পনেরো ধরে'
রইল সবে লুকায়ে মুখ গুঁজে ;
নিতাইচাঁদের সমান পালোয়ান
মিলতনাক গ্রামটি গোটা খুঁজে।

আজকে রোগে কাহিল কায়া বড়,
ঠেল্‌লে পড়ে নিতাই পালোয়ান!
মাদুর ছেড়ে আসল সে যে হেথা
নিতান্ত তার প্রাণের বড় টান।
দুই চোখে তার ঝরে জলের ধারা,
তার সমুখে জিতলো উত্তর পাড়া!
থাক্‌তে বেঁচে, মন্‌সাতলায় আজি
পূর্ব্বপাড়ার থাকলনাক মান!
বুকের 'পরে দু'হাত চেপে বলে—
"হায় গো একি করলে ভগবান!"

লাফ দিয়ে সে সবার মাঝে কয়—
"এখনো এই নিতাই মরে নাই,
মরা-হাতী শ'লাখ টাকা দাম,
আঁস্‌বি কে, রে লড়্‌তে আমি চাই।"
বিজয়ী সব মল্লেরা কয়—"দাদা,
তোমাকে যে চেনে না সে গাধা;
মোড়ল তুমি পাগল হলে নাকি?
পায়ের ধুলো তোমার যেন পাই!
মা মনসা, রক্ষাকালী তোমা
সকাল সকাল ভাল করুন ভাই!"
দু-তিন জনে আনলে তারে টেনে—
দেহটি তার কর্‌ছে টলমল।
ভাইরা তাহার ধরে নে যায় বাড়ী;
দুঃখে ক্ষেভে চক্ষে বহে জল।
থেকে থেকে হাত ছাড়িয়ে কয়—
"মান হতে আর প্রাণটা বড় নয়,—
প্রাণ নিয়ে কি ধুয়ে ধুয়ে খাব—
তোরা আমায় ধরলি কেন বল?
এমনেই কি রইব বেঁচে আমি
হারলো যে রে পূর্ব্বপাড়ার দল!"

শ্রীকালিদাস রায়।

ভাষা-শিক্ষা

ভাষাই জ্ঞান-লাভের প্রধান উপায়। অন্য জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য না থাকিলেও, কেবল ভাষার জ্ঞানলাভে মনে যে কেবল অশেষ আনন্দ হয় তাহা নহে, ভাষা শিক্ষায় যে চেষ্টার প্রয়োজন সেই চেষ্টা দ্বারা মন সবল ও পুষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষা করিলে সেই সেই দেশের রীতিনীতি ও লোকের মনোভাব প্রভৃতিরও জ্ঞানলাভ হয়। জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৪৩৯ জন ছাত্র ইংরেজী, ১০৯ জন স্পেনীয়, ১০৫ জন চীন, ৯৬ জন ফ্রেঞ্চ, ৯৪ জন জর্ম্মান, ৫৮ জন রুশীয় এবং ৮ জন মঙ্গোলীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। জাপানের অন্যান্য নগরেও বিদেশের ভাষা-শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাত প্রায় সেইরূপ। ইউরোপের পণ্ডিতেরা এক একজন কুড়ি পঁচিশটা ভাষা জানেন। সর উইলিয়াস জোন্‌স ৪০টা ভাষা জানিতেন। উইলিয়ম্‌ কেরী ৩০টা ভারতবর্ষীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন। গ্লাডষ্টোনের জ্ঞাত ভাষার সংখ্যাও তাঁহাদেরই সদৃশ ছিল। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে নরোয়ের ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ফ্রেঞ্চ ও ইটালীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। গ্রীকে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে গ্রীক বলিত। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষায় "প্রভুর প্রার্থনা" আবৃত্তি করিতেছিলেন।

ভাষা-শিক্ষার প্রণালীও এক একজনের এক এক প্রকার। লর্ড ডফরিণ প্রথমে শিক্ষিতব্য ভাষার অভিধান লইয়া তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিতেন। একবার পাঠেই সমস্ত মুখস্ত হইত। তাহার পর তিনি সেই ভাষার পুস্তক পাঠ করিতেন। লর্ড মেকলে শিক্ষিতব্য ভাষায় বাইবেল ও ইংরেজী বাইবল এক সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতেন, এবং বলিতেন, এমন ভাষা নাই যাহা এই উপায়ে চারি মাসে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। বিশপ কপলষ্টোন বহু ভাষা জানিতেন। একদিন দেখিলাম, তিনি লিলণ্ডের এক লাইব্রেরীতে বসিয়া বাঙ্গালা একখানা বই পড়িতেছেন। ইহাতে আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত পুস্তক এবং আরও অনেক বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছেন এবং প্রায়ই বাঙ্গালা পড়িয়া থাকেন। তিনি ৭৫

বৎসর বয়সে প্রথমবার শিলঙে তিন সপ্তাহ থাকিয়া খাসিয়া ভাষা শিখিয়া সেই ভাষায় লিখিত এক সরমন্ পাঠ করিলেন। তাহার দুইদিন পরে চিরাপুঞ্জিতে এই সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনর গর্ডন সাহেবের সহিত আমার আলাপ হইল। গর্ডন বলিলেন, হয়ত আর কেহ সেই সরমন্ লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম, অন্য কেহ হইলে সেরূপ হয়ত ভাবিতাম, কিন্তু একজন বিশপ্ যে সেরূপ করিবেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সেই দিনই বিশপও চিরাপুঞ্জিতে পঁহুছিলেন। তিনি খাসিয়া শিখিয়াছেন শুনিয়া দলে দলে খাসিয়া খ্রীষ্টীয়ানেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি খাসিয়াতে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি তিন সপ্তাহে খাসিয়া ভাষা অধিগত করিয়াছেন বলিয়া ডেপুটি ম্যাজেষ্টেট রিটা সাহেব বড়ই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাহাতে বিশপ্ বলিলেন, "ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমাকে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। ভাষা আমার আপনা আপনি আয়ত্ত হইয়া যায়। আমি ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময়ে পথেই তামিল ভাষা শিখিয়াছিলাম।"

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই, সম্প্রতি-পরলোকগত জে, ডি, এণ্ডার্সনের নাম জানেন। তিনি এদেশে সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই নূতন একটা ভাষা শিখিয়া সেই ভাষায় পরীক্ষা দিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার পাইতেন। পেন্সন লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। তিনি যত বাঙ্গালা বই পড়িয়াছিলেন, অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী তা পড়েন নাই। ইটালীর মেলাংথন প্রায় একশত বিদেশী ভাষা জানিতেন। তিনি যে সেই সকল ভাষার কেবল সাহিত্যই জানিতেন তাহা নহে, সাহিত্যে প্রচলিত অপভাষাও জানিতেন। একবার তিনি ইংরেজী অপভাষায় জ্ঞান সম্বন্ধে বাইরণের সহিত টক্কর দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সাহিত্য-দর্পণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ সেন কবিরাজ ১৮টা ভাষা জানিতেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫।৩০টা ভাষা জানিতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বহু ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গ্রীক ও লাটিন হইতে উদ্ধৃত করিয়া যখন কিছু আবৃত্তি করিতেন, তখন মধ্যে মধ্যে ভুল হইত। ইদানীং ৺হরিনাথ দে বহুভাষা, এমন কি চীন ভাষাও, আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখনও কোন কোন বাঙ্গালী নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন, কিন্তু সংখ্যায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।

সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষত উত্তর ভারতবর্ষে, ভারতীয় এমন কোন একটা ভাষা প্রচলিত হইতে পারে কি না যাহা দ্বারা ভারতবাসিগণ পরস্পর মনোভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে। ইহার মীমাংসা কি হইয়াছে জানি না। কেহ বাঙ্গালা, কেহ হিন্দীকে সার্ব্বভৌম ভাষারূপে অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় ভাষাই নানারূপে অঙ্গহীন, অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতকগুলি উপাঙ্গ-বিশিষ্ট। সুতরাং ইহার একটাও সার্ব্বভৌম ভাষা হইবার উপযুক্ত নহে। যদি এই দুইটার মধ্য হইতেই নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দী বোধ হয় গ্রহণের অধিকতর যোগ্য, কেন না ইহাতে বাঙ্গালা অপেক্ষা বিভক্তির সংখ্যা অল্প। উত্তর ভারতে একটা ভাষা আছে তাহা বড়ই সুন্দর। তাহা খাসিয়া ভাষা। ইহার রীতি স্বাভাবিক ও সরল, ইংরেজীর মত। ইহাতে ব্যাকরণ নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে তাহা সামান্য লিঙ্গভেদ। বিভক্তিও মোটে চারি পাঁচটার অধিক নাই। এই ভাষার একটা বিশেষত্ব ও চমৎকারিত্ব এই যে, ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞাপক শব্দ সাধারণ। পুরুষ জানাইতে হইলে তাহার পূর্ব্বে উ এবং স্ত্রী জ্ঞাপন করিবার সময়ে পূর্ব্বে কা বসাইতে হয়। উ ব্রিউ, পুরুষ মানুষ; কা ব্রিউ, স্ত্রীলোক; উ কুলাই, ঘোড়া; কা কুলাই ঘুড়ী; উকসিউ কুকুর; কাক্‌সিউ কুকুরী। প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া পড়িলে তিন মাসে এই ভাষা শিখিতে পারা যায়। এই ভাষা সার্ব্বভৌমরূপে গৃহীত হইবার প্রত্যাখে ভারতবর্ষের সভ্যতাভিমানী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-বাসীর মধ্যে ঈর্ষা

জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাবে হিন্দুস্থানী আপত্তি করিবেন, হিন্দীর প্রস্তাবে বাঙ্গালীর আপত্তিও অবশ্যম্ভাবী।

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের বহির্ভূত কিছু শিক্ষা করিতে বাঙ্গালী বড়ই পরাঙ্‌মুখ। প্রতিবেশী আসামী বিহারী ও উড়িষ্যাবাসীর ভাষা বাধ্য না হইয়া স্বেচ্ছায় শিখিতেছেন এরূপ বাঙ্গালী ছাত্র সহস্রের মধ্যে একজনও আছেন কি না সন্দেহ। কোন কিছু শিক্ষা করিতে হইলেই যে মনের একটা ব্যায়াম হয়, এবং সেই ব্যায়ামের ফলে মন যে সবল হয়, এবং মন সবল করাই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা যেন বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছেন। জাপানের ছাত্রদিগকে দুই হাত দিয়াই লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়। একবার বঙ্গদেশের একজন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর দুই হাতে লিখিতে শিখিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে তুমুল প্রতিবাদ হইয়াছিল। আর একবার সংস্কৃত-পরীক্ষার্থীদিগের দেবনাগর অক্ষরে লিখিবার কথা হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধেও প্রবল কোলাহল উঠিয়াছিল।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

নূতন দৃষ্টি

(সত্যঘটনামূলক গল্প)

সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও কর্মদোষে আমাকে যাত্রার দল চালাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কেন যে আমি আমার পিতৃ-পিতামহের আচরিত আদর্শবৃত্তির পরিবর্ত্তে জীবিকার জন্য এই হেয় বৃত্তির আশ্রয় লইয়াছিলাম, পাঠকবর্গকে তাহার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিবার আমার কিছু নাই। তাই এইটুকুমাত্র শুনিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে যে, শৈশবেই আমার স্কন্ধে একটা ভূত চাপে, সেই ভূতটাই আমার জীবনের স্রোত এদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। এই ভূতটা অন্য আর কিছুই নহে, আমার অশৈশবের প্রিয়সঙ্গী উৎকট সঙ্গীতানুরাগ।

আমি যাত্রাদলের অধিকারী হইবার পর পূর্ণ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে ঐ কার্য্যে আমি যে কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসা-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করি নাই, এরূপ নহে। এক সময় আমার গানের বায়না লইয়া বাকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের রাজা জমিদারগণের মধ্যে পরস্পর বিষম রেষারেষি বাধিয়া যাইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, বাংলা দেশে ব্যানার্জ্জির দলই সকল দলের সেরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীং আর আমার দলের সেরূপ অবস্থা নাই। উপর্য্যুপরি কয়েকটি সাংসারিক দুর্ঘটনায় দলের অনেকটা অবনতি ঘটিয়া গিয়াছে।

এবার পূজার গানের জন্য পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে দুই তিনটি প্রস্তাব আসিল। কিন্তু কোনটাতেই আমার মন উঠিল না। কারণ কেহই পাঁচ শতের উপরে উঠিতেছেন না। এই বড় মরসুমটাতেই লাভের অবস্থা এরূপ শোচনীয় দেখিয়া মনটা যথার্থই কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। কি উপায়ে কোথায় টাকার পরিমাণটা আরও কিছু বাড়াইয়া তোলা যায়, তদ্বিষয়ে আমি আমার বাসায় বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সহসা কাহার পদশব্দে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। আমি চক্ষু তুলিতেই দেখিতে পাইলাম, কলিকাতার জনৈক দালাল ক্ষিপ্রপদে আমার বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিল। তার পর আমার দিকে চাহিয়াই হাসিমুখে

বলিল, "বড় যে নিবিষ্টমনে চিন্তা করিছিলেন; কিছু অন্যায় হ'ল নাকি ?"

দালাল মহাশয়ের এরূপ আকস্মিক শুভাগমনে কোনও কিছুর একটা সুখবর পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না না কিছু না, আপনি বসুন।"

তারপর দালাল আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এবার আপনার গানের বায়না কোথায় হল ?"

"এখনও কোন স্থানে ঠিক হয় নি।"

"বলেন কি ! পূজো যে এসে পড়ল।"

"তা' আর কি করব বলুন ?"

"অবশ্য কোথাও কথাবার্ত্তা চলছে ?"

"দুতিন যায়গায় চলছে বটে, কিন্তু কেউ ত পাঁচ শয়ের উপরে উঠছেন না।"

"সবগুলিই বুঝি পশ্চিমবঙ্গে ?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, আপনি এবার পূর্ব্ববঙ্গে যান না কেন ? সেখানে আপনার খুব সুবিধা হবে।"

যাত্রার দল লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত আমায় ঘটিয়া উঠে নাই। এই কয়বৎসর দোল দুর্গোৎসব, ঝুলন ও রাস প্রভৃতি পর্ব্বে কেবল পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানেই আমি ঘুরিয়াছি। নানা কারণে এতদিন আমার পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়া হয় নাই, তাই পূর্ব্ববঙ্গের নামে প্রকৃতই মনটা যেন বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পূর্ব্ববঙ্গের কোথায় ?"

"মৈমনসিংহ জেলায়।"

"কত টাকা দিতে পারবে ?"

"চার দিনের গানে আপনি নগদ ৬৫০ টাকা পাবেন, তা ছাড়া ঐ কদিনের খোরাকিও আপনাদের লাগবে না। বেশীর ভাগ আপনাদের যাবার ব্যয়ও তারা বহন করবে।"

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে আমি আনন্দে একেবারে আত্মহারা না হইলেও, উহার মাত্রাটা যে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিব না। তবে বাহিরের ভাবে তাহা প্রকাশ পাইতে না দিয়া সহজ স্বরে বলিলাম, "কাল সকালে আপনি সঠিক খবর পাবেন।"

দালাল বলিল, "আপনি স্বীকৃত হলে বায়নাস্বরূপ আপনাকে অগ্রিম একশো টাকা দেওয়া হবে। আপনি ঐ টাকার রসিদ আর একখানি চুক্তিনামা লিখে দেবেন। আচ্ছা, তবে এখন আসা যাক" বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল। ভদ্রতার খাতিরে তাহার সঙ্গে উঠিতে উঠিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মক্কেলটী জমিদার না কি ?"

"না, তিনি জমিদার নন; খুব বড়দরের মহাজন, প্রায় তিন চার লাখ টাকা কারবারে খাটে, জমিজমাও বিস্তর।"

"নাম কি তাঁর ?"

"ঈশ্বরচন্দ্র দাস।"

"কায়স্থ বুঝি ?"

"তা বটে !"

"কায়স্থ ত ?"

"আঃ ! তাতে আর সন্দেহের কি আছে ?"

২

পরদিন যথারীতি চুক্তিপত্র লেখা হইয়া গেল। দালাল তাহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত বায়নাস্বরূপ অগ্রিম একশত টাকা দিয়া আমার নিকট রসিদ লইল। তারপর সে বিদায় হইলে দলের ম্যানেজার বাবু আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "মশায়, নূতন যায়গায় যাচ্ছি, সুতরাং যাতে একটু সুনাম হয় তার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমি এখন অন্যত্র চল্লাম, দুদিন পরেই ফিরে আসব।"

দুইদিন পর ম্যানেজার ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম তিনি আর এক দল হইতে দুইটি ছেলেকে ভাগাইয়া আনিয়াছেন। দুইটি ছেলেরই চেহারা ভারি

সুন্দর। নাচগানেও নাকি খুব পরিপক্ক। উভয়েরই কয়েকটি করিয়া সোণা ও রূপার মেডেল আছে। ম্যানেজার বাবু মেডেলগুলি আনিয়া একে একে আমাকে দেখাইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে কয়েকটি ভাল ভাল পোষাকও ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ববঙ্গে রওনা হইলাম। পরদিবস প্রাতে গোয়ালন্দ পৌছিয়া আমাদিগকে ষ্টিমারে উঠিতে হইল। তারপর অপরাহ্ণ কালে আমরা গন্তব্যস্থানের ষ্টেশনে আসিয়া আসিয়া নামিলাম। ষ্টেশন ঘাটে বড় বড় কয়েকখানি নৌকাসহ বাড়ীর একজন কর্ম্মচারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা জিনিষপত্র সহ তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে ভগবান সহস্ররশ্মি দিবসের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য অস্তাচলের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার সায়ংকালীন রক্তবর্ণ রশ্মিজালের দীপ্তপ্রভায় যমুনার প্রশান্ত বক্ষ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নৌকাগুলি বিশালকায় যমুনার রক্তাভ বীচিমালার সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া চলিতে লাগিল। কিছুকাল পর নৌকাগুলি একটি ক্ষীণকায় নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। তাহার উভয় তীরের শস্যশ্যামল ভূখণ্ড অপূর্ব্ব শারদশ্রী ধারণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে শত শত শুভ্রবর্ণ কাশপুষ্প মৃদুমন্দ সমীর-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া শারদ-প্রকৃতিকে যেন সাদরে ব্যজন করিতেছিল। স্থানে স্থানে সরসীবক্ষে শত শত শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া হইয়া শারদ-প্রকৃতির মধুর হাস্যের মনোমদ অভিনয় করিতেছিল। স্থানে স্থানে আবার শৈবালদল সদ্যঃশুষ্ক ভূখণ্ডের উপর নিপতিত থাকিয়া শারদ সুষমাকে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গে আমি যেন শারদশ্রীর পূর্ণ বিকাশ উপলব্ধি করিলাম। নৌকার ছাপরের উপর বসিয়া প্রকৃতির এই অনুপম মধুরিমা উপভোগ করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি আন্দাজি একটার সময় নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। প্রেরিত লোকটি আমাকে বলিল, "বাবু, এখান হ'তে বাড়ী অদূর, দিনের বেলা হলে স্পষ্ট দেখা যেত। এখন একটু কষ্টস্বীকার করে বাড়ী গেলে মন্দ হয় না। আপনারা সহরে লোক, নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে অসুখ করতে পারে।"

তীর হইতে কে একজন গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "বৈদ্যনাথ এসেছ বুঝি ?"

আমাদের সঙ্গী লোকটি নৌকা হইতে উত্তর দিল, "হাঁ খুড়ো, আমরাই এসেছি। তোমরা নৌকা থেকে জিনিষগুলি তুলতে আরম্ভ কর।"

তারপর লোকটা আমার নিকট আসিয়া বলিল— "বাবু, আমাদের লোকজন সব এসে পড়েছে। এরা এখনি সব জিনিষ তুলে নেবে, একগাছি কুটোও আর আপনাদের এখানে পড়ে থাকবে না!"

তখন দলের কয়েকটি লোককে জিনিষপত্র গুছাইয়া দিবার জন্য নৌকায় রাখিয়া, আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম। ঘাট হইতে বাসায় আসিতে আমাদের দশ বার মিনিটমাত্র লাগিয়াছিল। বাসায় আসিয়া দেখিলাম—বাসাটি অস্থায়ী বন্দোবস্তে তৈরী হইলেও বেশ বাসোপযোগী হইয়াছে। অনেক রাজা জমীদারের বাড়ীও অস্থায়ী বন্দোবস্তে এরূপ বাসা হইতে দেখি নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে আমার বিছানা আসিয়া পৌছিল। ঘরের মধ্যে কতকগুলি তক্তপোষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার একটায় বিছানা ফেলিয়া একবার বাহিরে গেলাম। পশ্চিম দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দীর্ঘ একতালা দালান সমন্বিত দাস মহাশয়ের বিশাল বাসভবন দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দীর্ঘ দালানটির চতুষ্পার্শ্বে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টিনের ঘরগুলি দেখিয়া আমার মনে হইল, কতকগুলি বিরাটকায় দৈত্য যেন তাহাদের প্রিয় পুরীটিকে বেষ্টনপূর্ব্বক নিঝুমে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তারপর আমি শয্যায় আসিয়া শয়ন করিতেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রাতঃকালে যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন কতকটা বেলা হইয়া গিয়াছে। জানালার ফাঁকে ফাঁকে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণজাল ঘরের ভিতর প্রবেশ

করিয়াছে। তখনও সে কিরণজাল হইতে প্রাভাতিক রক্তিমা একেবারে বিদূরিত হয় নাই। আমি শয্যায় উঠিয়া বসিতেই আমাদের দলের পুরাতন লোক লক্ষ্মী দাস হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিতে লাগিল, "কর্ত্তা, সর্ব্বনাশ! আমরা যে একেবারে মুচির বাড়ী এসে পড়েছি! ঈশ্বর দাস যে জাতীতে মুচি!"

আমার ত শুনিয়াই চক্ষুস্থির। আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গেলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখে বাক্য সরিল না। তারপর তটস্থ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঈশ্বর দাস যে জাতিতে মুচি, তা জানলে কি করে?"

লক্ষ্মী দাস উত্তর করিল, "তা'তে আর কোনও সন্দেহ নেই কর্ত্তা! সকালে উঠে আমি নদীর ধারে গিয়েছিলাম। ফের্‌বার সময় পথে একজন বুড়ো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে বল্লে—ম'শায়! তোমার বাড়ী কোথায়? আমি উত্তর দিলাম, হাব্‌ড়ায়। সে একটু হেসে বল্লে, তবে বুঝি আপনারা মুচী বাড়ীর যাত্রাওয়ালা? আমি প্রথমটা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না, অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে আবার বল্লে, আপনারা ঈশ্বর মুচীর বাড়ী গান কর্‌তে আসেন নি? এবার প্রকৃত ব্যাপারের কতকটা আমার হৃদয়ঙ্গম হল, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, লোকটা কি তবে বড় কৃপণ? এবার সে হাহা করে হেসে বল্লে, আপনার ভুল হচ্চে, কৃপণ বলে তাকে আমি মুচী বল্‌ছিনে, প্রকৃতই সে মুচী, একেবারে চাম্‌ড়া-তোলা মুচী। আমি আর তার সঙ্গে বেশী কথা না কয়ে বরাবর ঈশ্বর দাসের বাড়ী চলে এলাম। যেই আমি তার পুজোর আঙ্গিনায় পা দিয়েছি, তখনই এক বেটা মুচী পুজোমণ্ডপ থেকে ছুটে এসে, এক বেটা ঢাকীর হাত থেকে হুঁকা টেনে নিয়ে তা'তে খুব জোরে এক দম্ কস্‌লো, তারপর এক দৌড়ে আবার পূজা মণ্ডপের ভিতর ঢুকে ধুপ্‌চি সাজাতে লাগ্‌ল। ঢাকীরা কিছু আগেই প্রভাতী বাজ্‌না শেষ করে আঙ্গিনায় বসে তামাক খাচ্ছিল। কর্ত্তা! এতেও আর কি কোন সন্দেহ থাক্‌তে পারে?"

লক্ষ্মী দাসের কথা শুনিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় আমি একেবারে মরিয়া গেলাম। মুহূর্ত্তে আমার মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। তখনই দলের ম্যানেজার বাবু ও আরও কয়েকটী লোককে ডাকিতে পাঠাইয়া, তাড়াতাড়ি আমি হাত মুখ ধুইয়া লইলাম। অবিলম্বে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা পরামর্শ করিতে বসিলাম। পরামর্শে স্থির হইল—এ বাড়ীতে কিছুতেই গান করা হইবে না;—ঈশ্বর দাসের নিকট এজন্য রীতিমত কৈফিয়ৎ চাহিতে হইবে;—আর যাহাতে সে 'সাকল্য' ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তখনই ঈশ্বর দাসের নিকট লোক প্রেরিত হইল। ১০ মিনিটের মধ্যে এ কথা দলের কাহারও কাণে উঠিতে বাকী থাকিল না। সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। দলের চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। তার পর মাথার বিপুল বাব্‌রি দোলাইয়া বজ্রনিনাদে বলিতে লাগিলেন—"সেই বদ্‌মাস্ দালালটাই যত অনিষ্টের গোড়া! সেই শালাই এই ছোটলোক বেটার কাছে টাকা খেয়ে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মিথ্যাবাদী শালাকে এখন এখানে পেলে ঠিক্ এক হাত জিব্ টেনে বা'র কর্‌তাম।"

অসময়ে চক্রবর্ত্তী ভায়ার এই বীররসের অবতারণা দেখিয়া অতি দুঃখেও আমাদের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইল। ম্যানেজার বাবু আপন মনে বলিতে লাগিলেন —"বেটা টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়? ঘাড় ধরে সব টাকা আদায় কর্‌ব। দেশে আইন আদালত আছে, খরচাশুদ্ধ সাকল্য টাকা দিতে হবে।"

ইত্যবসরে দলের একটী বালক দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিয়া গেল—"ঈশ্বর দাস আস্‌ছে!" আমরা অতি গম্ভীর ভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

৩

ঈশ্বর দাস ঘরে ঢুকিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদিগকে প্রণাম করিল। লোকটা প্রৌঢ় বয়স্ক, মাথার চুল অর্দ্ধেকের বেশী পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু দাঁতগুলি সবই সতেজে বর্ত্তমান। কৃষ্ণকায়, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ। গলায় মোটা কণ্ঠী মালা, কপালে তিলক, বাহুমূলে ও বক্ষে অনেকগুলি হরিনামের ছাপ। মাথায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত শিখাগুচ্ছ। আমাদের ঘরে কতকগুলি নূতন মাদুর দেওয়া ছিল, তাহার একটা স্বহস্তে টানিয়া লইয়া তাহাতে সে বসিল। তারপর ম্যানেজার বাবুর দিকে বিনম্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—"মশায়! আপনারা যখন কৃপা করে এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করেছেন, তখন এটা আপন বাড়ী বলেই মনে করবেন। কোনরূপ সঙ্কোচ না করে, যখন যা' প্রয়োজন হয় চেয়ে নেবেন। আমার লোকজন সর্ব্বদাই আপনাদের আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকবে।"

মনে মনে ভাবিলাম—"বেটা মুচি যে দেখ্‌ছি সাধুভাষা কয়!" ম্যানেজার বাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তা ত হল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার বাড়ী আমরা গান করতে পারব না। আপনার দালাল আমাদিকে জানিয়েছিল আপনি জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু এখানে এসে দেখ্‌ছি আপনি জাতিতে অতি হীন! আমাদের সঙ্গে এরকম প্রতারণা করে কি আপনার ভাল হবে?"

ম্যানেজার বাবুর এই কঠোর ভর্ৎসনায় ঈশ্বর দাসের বিশেষ কোনও ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না। বোধ হয় এজন্য সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সে অবিচলিত ভাবে বলিতে আরম্ভ করিল—

"মশায়! আমি যে জাতিতে অতি হীন, তা' অস্বীকার করবার যো নেই, আর সেই জন্যেই আপনাদের বাসাবাড়ী, নিজ বাড়ী ছেড়ে দূরে নূতন ভাবে তৈরি করে দিয়েছি। তারপর আমার বাড়ীর চা'ল, ডা'ল নুন, তেল খেতে যদি আপনাদের ঘৃণা হয়, আমি তার জন্যে টাকা দিব, আপনারা বাজার থেকে কিনে নেবেন। আমার বাড়ীর ইন্দারার জল ব্যবহার করতে যদি আপনাদের প্রবৃত্তি না হয়, আপনাদের জলাচরণী চাকরেরা নদী থেকে জল তুলে আনবে। যদি তা'তেও আপনারা অসুবিধা বোধ করেন, তবে নিজের খরচে সে সুবিধাও আমি করে দিব।"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, এ সকল সুবন্দোবস্তেও আপনার বাড়ী গান করবার সাধ্য আমাদের নেই। আপনার জাতির বাড়ী আমরা কখনও গান করি না। টাকায় বড়লোক হওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনদিন ভদ্রলোক হওয়া যায় না।"

মুচি বলিল, "আজ যদি আপনারা আমার বাড়ী গান না করে' চলে যান, তবে গ্রামের ভিতর আর আমার মুখ থাকবে না, ছোট বড় সকলেই আমাকে টিট্‌কারী দেবে।"

"সে কথা আপনার পূর্ব্বেই ভাবা উচিত ছিল। সে বিবেচনা পূর্ব্বে করলে আজ আমাদিকে এমন দুর্ভোগে পড়তে হত না, আপনারও গ্রামের ভিতর মুখ থাকত।"

"তবে কি আপনারা এখানে গান করবেন না বলে একবারে স্থির সংকল্প হয়ে বসেছেন?"

"তা' না বসে আর উপায় কি?"

মুচি তখন হতাশভাবে বলিল, "তবে দেখ্‌ছি, আপনাদিকে আর অনুরোধ করা বৃথা! এখন আপনাদের যা' ভাল বিবেচনা হয় করুন।"—এই বলিয়া ঈশ্বর দাস চুপ করিল। কিন্তু বিষাদে তাহার মুখমণ্ডল একেবারে কালী হইয়া গেল, সে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। আমি অন্তর্য্যামী না হইলেও এটুকু বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, অনুতাপে তাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

ম্যানেজার বাবু পুনরায় বলিলেন, "এখন আমরা কি করব? আইন মতে আপনি আমাদের সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। আমাদের সাকল্য টাকা চুকিয়ে দিন, আজই আমরা চলে যাই।"

ঈশ্বর দাস ব্যথিত স্বরে উত্তর করিল, "আমি ন্যায়-মতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য বটে, কিন্তু সব নয়। আপনারা আমার কাছে অর্দ্ধেক ক্ষতিপূরণ পেতে

পারেন। আমি অসঙ্গত বল্‌ছিনে, এরকম অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দেবার নিয়মই এই।"

ম্যানেজার বাবু বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "আপনার বুঝি ভদ্রলোকের ছেলেদিকে মধ্যে মধ্যে এই রকম ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করা বেশ অভ্যাস আছে?"

ঈশ্বর দাস একথার কোনও উত্তর না দিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম—লোকটা নিতান্ত নিকৃষ্ট জাতীয় হইলেও একেবারে নিরক্ষর নহে, সহিষ্ণুতাও বেশ আছে, ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেও মন্দ শিখে নাই।

৪

এই গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়ের যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল না খাইলেও নিকটবর্ত্তী দশখানি গ্রামের লোক যে তাঁহার নামে সর্ব্বদা থরহরি কম্পমান, তাহা আমাদের ম্যানেজার বাবু এই গ্রামে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই এই বিচক্ষণ লোকটি গোপনে আমাকে বলিলেন, "কর্ত্তা, চলুন না আমরা একবার জমিদার রায় মশায়ের কাছে যাই। ওঁকে ধর্‌লে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ ভাল রকম একটা বন্দোবস্ত হ'তে পারে। আর যদি নাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? আপাততঃ অর্দ্ধেক ত পাচ্ছি, আর অর্দ্ধেক না দিয়ে মুচীর পো যায় কোথা, তা' দেখব!"

পরামর্শটা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হইল। আমরা তখনই জমিদার বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হইলাম। জমিদার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কাছারী বাড়ীতে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমরা যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি আগ্রহের সহিত আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক বসাইলেন।

জমিদার মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশের কিছু ঊর্দ্ধে হইবে; স্থূলকায়, গৌরবর্ণ। তিনি আমাদের মুখে সমস্ত শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তারপর কঠোর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"কি! ছোটলোক বেটার এতদূর আস্পর্দ্ধা? সে জাত ভাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদিকে বাড়ীতে আনে? যার ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়, তার এ রকম দুঃসাহস দেখে রাগে আমার গা' জ্বলে যাচ্ছে। আর, একথা সে পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও কাউকে জান্‌তে দেয়নি, পাছে কেউ বা ভাংচি দেয়। বেটা বাইরে সাধুতার হাজার ছাপ মেরে চলে, কিন্তু হাড়ে হাড়ে ওর শয়তানি! আচ্ছা, এ শয়তানি এবার আমি বার্ কর্‌ছি।" তারপর তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনারা কিছু ভাববেন না,—সব টাকাই আমি ওর কাছ থেকে আদায় করে দেব।"

ম্যানেজার বাবু তখন কৃতজ্ঞভাবে বলিলেন, "সেই ভরসাতেই ত মশায়ের কাছে আসা।"

জমিদার মহাশয়ের বামদিকে স্বতন্ত্র আর একখানা তক্তপোষে বসিয়া এক বৃদ্ধ মুহুরী লিখিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সুতাবাঁধা চশমাযুক্ত চক্ষু দুইটি তুলিয়া জমিদার মহাশয়কে কহিলেন, "আজ্ঞে কর্ত্তা, ঈশ্বরদাসের অত আস্পর্দ্ধা হবে না। সে কর্ত্তাদিকে যমের মত ভয় করে চলে, কিন্তু ঐ যে ওর সেজো ছেলে,—কি নাম তার? গতবার ক্যাম্বেল থেকে ডাক্তারী পাশ করেছে, তারই এ সকল কারসাজী। ছোকরাটা একেবারে পাজীর পাঝাড়া। সব ছোটলোক বেটাদিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তাদের মধ্যে লেকচার দিয়ে বেড়ায়—জাত আবার কি? সব সমান! কর্ত্তা, ছোটলোক বেটাদের আস্পর্দ্ধা বড় বেড়ে উঠেছে।"

জমিদার রায় মহাশয় আরও রাগিয়া গেলেন। রাগে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে লাগিল, নেত্রযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি থামুন না সরকার মশায়। আমি সব বেটারই ভারিভুরি ভেঙ্গে দিচ্ছি।"

ম্যানেজার বাবু জমিদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি আমাদিকে কি করতে আদেশ করেন?"

জমিদার মহাশয় উত্তর দিলেন, "আপনারা কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ঈশ্বরকে

ডেকে এনে সাকুল্য টাকা আদায় করে দিই, আজই আপনারা চলে যান।"

তার পর তিনি আপন মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া, সেই বৃদ্ধ মুহুরীটির প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "আচ্ছা সরকার, আজ যদি এঁরা এখান থেকে এরকম ভাবে চলে যান, তবে তাতে কি গ্রামের কলঙ্ক হবে না?"

সরকার বলিলেন, "অবশ্যই হবে! গ্রামেরও কলঙ্ক আপনারও কলঙ্ক। গ্রাম ত আর ও বেটা মুচীর নয়, গ্রাম ত আপনার!"

"তাই আমি মনে করছি, পুজোর মধ্যে এঁরা আমার বাড়ীই গান করবেন। চার পালা গানে আমি ৩৫০৲ টাকা দেবো, বাকী ঐ মুচী বেটাকেই দিতে হবে। আর চার দিন এঁরা এখানেই মায়ের প্রসাদ পাবেন। এত লোক খাচ্ছে—এই কয়েকটী বিদেশী ভদ্রলোককে খেতে দিলে আমার ভাণ্ডার আর ফুরাবে না।"

সরকার বলিলেন, "এ ত আপনার অসীম অনুগ্রহ। আপনি ঐ মুচী বেটার ৩০০৲ টাকা বাঁচিয়ে দিলেন!"

তার পর রায় মহাশয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এ প্রস্তাবে আপনারা সম্মত?"

আমরা সম্মত হইলাম, কারণ মিছেমিছি ঈশ্বরদাসের নিকট হইতে টাকা নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

জমিদার মহাশয় আমাদের সম্মতি শুনিয়া তখনই চারি খানা গরুর গাড়ী, পাঁচ জন হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ, বারো জন লাঠিয়াল এবং ছয় জন ভৃত্য আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সঙ্গে লইবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল ম্যানেজার বাবুর আগ্রহেই সঙ্গে লইতে হইল। বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা এই ক্ষুদ্র অভিযান সহ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জমিদার মহাশয়ের বাড়ী আমাদের গানের বায়না হইয়াছে শুনিয়া দলের লোকগুলি যেন স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

জমিদার বাড়ীর ভৃত্যেরা যখন কোলাহল পূর্ব্বক আমাদের জিনিসপত্র দিয়া গাড়ী বোঝাই করিতেছিল, তখন ঈশ্বর দাসের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রায় দুই শত মুচী ভায়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বর দাসের কুটুম্ব। কতকগুলি নিকট কুটুম্ব, কতকগুলি দূর কুটুম্ব, কতকগুলি আবার কুটুম্বের কুটুম্ব তস্য কুটুম্ব। ইহারা সকলেই পূজা উপলক্ষে এখানে সমবেত হইয়াছে। ঈশ্বর দাসের বাড়ী এবার কুটুম্ববর্গের এক বিরাট সম্মিলন শুধু কলিকাতার যাত্রা গানের নামের গুণেই হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে আমাদের কার্য্যাবলী দেখিতেছিল। বাড়ীর বৌ এবং বয়স্কা মেয়েরা উঠানের বড় বড় খড়ের গাদির আড়ালে গা ঢাকা দিয়া পুনঃ পুনঃ উকি ঝুঁকি মারিতেছিল। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহারা এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কোনও মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিতেছিল না। তাহারা ভাবিতেছিল,—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! আজই আমাদের বাড়ী গানওয়ালারা আসিল, চার দিন আমাদের নাটমন্দিরে গান করিবে, তাহা না করিয়া ইহারা আবার এখনই চলিয়া যায় কেন? হায়! তাহারা যে মুচী, তাহাদের বাড়ীর মাটিও যে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণের স্পর্শ করিতে নাই, এ সামাজিক কূট রহস্য তাহারা বালক হইয়া কি বুঝিবে?

জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তোলা হইয়াছে। আমরা এখন রওনা হইবার উপক্রম করিব, এমন সময় রায় মহাশয়ের একজন ভৃত্য ঈশ্বর দাসের উদ্দেশে উচ্চরবে টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটী লোক সমস্বরে সে বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া প্রাঙ্গণস্থ জনমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। সহসা সেই জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে ভদ্রবেশধারী একটী যুবক চিৎকার করিয়া বলিল—"তোমাদের মুখের উপর পিসামহাশয়কে গালাগালি দিচ্ছে, আর তোমরা কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

তাই শুনছ? আজই গানওয়ালাদের চুক্তির সাকল্য টাকা দিয়ে, কলিকাতা-বিদায় করে দিই, জমিদার বাড়ী কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। গাড়ী আটক কর।" তারপর তাহারা ক্রুদ্ধভাবে গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিল।

তাহা দেখিয়া জমিদার বাড়ীর লাঠিয়াল এবং বরকন্দাজেরাও লাঠি উচু করিয়া ধরিল। তখন ক্রুদ্ধ জনসমবায় ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বর দাসের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল এবং লাঠি, সড়কী, দা, কুড়ল, খুন্তি, বাঁশের অগ্রভাগ, প্রভৃতি যে যাহা হাতের সামনে পাইল, তাহা লইয়াই জমিদারের লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিল।

আমি প্রমাদ গণিলাম! জমিদারবাড়ীর এই কয়েকটী লোক এই উত্তেজিত সশস্ত্র জনমণ্ডলীর সম্মুখে কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারিবে? প্রচণ্ড বাত্যামুখে শুষ্ক তৃণগুচ্ছের মত ইহাদের উড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা। মুহূর্ত্তে বুঝি প্রলয়কাণ্ড বাধে! এক ভয়াবহ ব্যাপারের আশঙ্কা করিয়া আমি আতঙ্কিত হইলাম।

অকস্মাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে "থাম"—এই আদেশ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর দাসের বিশাল দক্ষিণ বাহুখানি উত্থিত হইয়া জনমণ্ডলীকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। কেহই সে নিষেধের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ জনমণ্ডলী যে যাহার স্থানে দাঁড়াইয়া, বিষদন্তবিহীন ভুজঙ্গের মত গর্জ্জিতে লাগিল। তারপর ঈশ্বর দাস আমার নিকট আসিয়া আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিল—"রায় মশায়ের বাড়ী আপনাদের সুবিধা হয়েছে শুনে সুখী হয়েছি। আপনার লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ আনবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, আমার বাড়ীর কেউই আপনাদিগকে বাধা দিত না। তবে এইটীই আমার পক্ষে বড় মনস্তাপের কারণ হয়েছে যে; এতগুলি লোক দুপুর বেলায় আমার বাড়ী থেকে অভুক্ত চলে যায়, আর আমার বাড়ীতে রাশীকৃত জিনিষ মজুত থাকতেও আমি তাদের আতিথ্য করতে পারলাম না।" এই বলিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আমি লজ্জায় আর তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না।

৫

আজ জগন্মাতার মহানবমী পূজার দিন। সপ্তমী এবং অষ্টমী দুই রাত্রি আমরা রায় মহাশয়ের বাড়ী গান করিয়াছি। ঢাকা হইতে দুই দল ভাল কবিগানও আসিয়াছে। কলিকাতার নামজাদা এক কীর্ত্তনওয়ালীকেও বায়না করা হইয়াছিল; কিন্তু ষষ্ঠীর দিন বৈকালে হঠাৎ এক 'তার' আসে—"কীর্ত্তনওয়ালীর কলেরা হইয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রায় মহাশয় খুব বড় জমিদার। শুনিলাম তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক আয় লাখ টাকার উপর। এতবড় জমিদারের বাড়ী পূজার মধ্যে ভদ্রলোকের অশ্রাব্য কেবল দুইদল কবিওয়ালার গান হইবে, এ দুশ্চিন্তা দুই দিন পূর্ব্বে রায় মহাশয়কে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তিনি সপ্তমী পূজার দিন কাঁকুড়ালে এবং অতি সস্তায় আমাদিগকে পাইয়া একেবারে লুফিয়া লইলেন।

আজ সকাল হইতেই কি জন্য মনটা যেন বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না। ইহার কারণও কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মনে হইল, একবার নদীর ধার দিয়া বেড়াইয়া আসি। বেলাও তখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। যে দুইটী নূতন ছেলে আমাদের দলে আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এখনও ভালরূপ আলাপ করিতে পারি নাই, তাই ছেলে দুইটীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। তারপর বরাবর আমরা নদীর ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর হঠাৎ সম্মুখে একজন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমরা একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সন্ন্যাসীটী আমাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং আমরা পশ্চাৎ হইতে দেখিলাম—তাঁহার গায়ে একটী গৈরিক রঙের আলখেল্লা, তাহার উপর দিয়া একখানি গৈরিক রঙের মোটা চাদর জড়ান,

পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের জুতা, হাতে একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ। মাথার চুলগুলি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, কিন্তু এলোমেলো নহে, দুই দিকে সুবিন্যস্ত। চুলগুলির উপর প্রত্যহই যে কিছু কিছু যত্ন লওয়া হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হয়।

এই অর্দ্ধ ভোগী ও অর্দ্ধ ত্যাগী গোছের লোকটীকে দেখিয়া প্রথম প্রথম আমার মনটা যেন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। তারপর, সন্ন্যাসী একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ জীবন ভরিয়া এই চক্ষু দুইটী কম মানুষের মূর্ত্তি দেখে নাই, কিন্তু তাহাদের সম্মুখে এমন শান্ত, শিষ্ট, মধুর মূর্ত্তি এই প্রথম পড়িল। সন্ন্যাসীর আয়তোজ্জ্বল চক্ষু দুইটী হইতে ব্রহ্মচর্য্যের একটা দীপ্তচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। তাঁহার সমগ্র অবয়ব খানির উপর দিয়া একটা স্বর্গীয় আভা যেন ঢেউ খেলিয়া চলিতেছিল। আমি চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না, একান্ত অভিভূতের মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

প্রথম দর্শনে আমার মনের কোণে যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এখন একেবারে অপসৃত হইল। তখন সন্ন্যাসী একটু অগ্রসর হইয়া আমাকে স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি এই গ্রামের জমিদার মশায়ের বাড়ীর যাত্রা-ওয়ালা ?"

প্রশ্ন শুনিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। যাত্রাওয়ালাদের চেহারার মধ্যে সম্ভবতঃ এমন একটা কিছু বিশেষত্ব থাকে, যাহাতে প্রথম দর্শনেই তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা বলিয়া চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। যাহা হউক, আমি মৃদুস্বরে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি যাত্রাদলের অধিকারী ?"

এবারও আমি পূর্ব্ববৎ উত্তর প্রদান করিলাম।

ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল, নৌকার ভিতর হইতে মাঝিরা ডাকিয়া বলিল—"আসুন ঠাকুর, সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছে।" তরুণ সন্ন্যাসী নৌকায় উঠিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া আমাকে বলিলেন—"বোধ হয় আপনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমাকে মাঝিরা ঠিক্ সোজাসুজি ওপারে রেখে আস্‌বে। ফির্‌তে ও'দের এক ঘণ্টার বেশী লাগ্‌বে না, বেলাও বিস্তর আছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে নৌকায় উঠে পড়ুন। একটু আলাপ করা যাবে, বেশীর ভাগ নদীর উপর আপনার একটু বেড়ানও হবে।"

প্রথম হইতেই আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর এই প্রিয়দর্শন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীটীর সাদর আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সঙ্গী বালক দুইটীকে বাসায় ফিরিবার জন্য আদেশ দিয়া আমি নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

মাঝিরা বসিবার জন্য আমাদিগকে একখানি কম্বল পাতিয়া দিয়াছিল, আমরা উভয়ে তাহাতে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ আমাদের নীরবে কাটিয়া গেল, তারপর সন্ন্যাসী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা; মুচী বাড়ী গান কর্‌তে দোষ কি ?"

সহসা এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। তারপর নিজকে সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিলাম, "কেউ গায় না, এই যা' দোষ !"

"ও ! কেউ গায় না, এই দোষ ! আচ্ছা, বিশ বছর আগে যদি সকলেই জোট করে একযোগে দুর্গাপুজা ছেড়ে দিত, আর আজ তাই আপনি কর্‌তেন, তবে কি তা' আপনার কাছে দোষাবহ বলে মনে হত ?"

এই কূট প্রশ্নে প্রথমতঃ আমাকে কিঞ্চিৎ থতমত খাইতে হইল। পরক্ষণেই আমি সহজ স্বরে উত্তর দিলাম, "এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন ? আপনারা গৃহত্যাগী, আপনারা উচ্চ নীচ ভেদ না রেখেও চল্‌তে পারেন ; কিন্তু আমরা গৃহী, আমরা তা' পারি না।"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনারা দেখ্‌ছি একেবারে উল্টা বুঝেন। বরং আপনাদেরই তা' পারা

উচিত। আমরা গৃহত্যাগী, আমরা যদি উচ্চ নীচ ভেদ রেখে চলি, তাতে আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু ওতে আপনারা সামাজিক জীবনে নানা দিক থেকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, তা' কখনও ভেবে দেখেছেন কি ?"

"আবহমান কাল থেকে সমাজে যে রীতি চলে আসছে, তার অন্যথাচরণ কি সঙ্গত ?"

"ভুল কথা! আবহমান কাল থেকে সমাজে এ রীতি চলে আসে নি। আর, যথার্থই যদি আসত, তবুও তা বর্ত্তমানের বিচারে ন্যায়ানুগত বলে বিবেচিত না হলে, তার অন্যথাচরণ করা সঙ্গত হত বৈকি ?"

"কোন্‌টা অন্যায় আর কোন্‌টা ন্যায়, তা নির্দ্ধারণ করাও ত সহজ নয়।"

"তাই বলে একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া, অথবা তার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকাও বুদ্ধিমানের কার্য্য বলে মনে হয় না। আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরদাসের বাড়ী গান করলে তাতে আপনার জাতিপাত হবার কি আশঙ্কা ছিল ?"

"আমি জাত বাঁচাতে পারতাম বটে, কিন্তু লোক-নিন্দার হাত এড়াতে পারতাম না।"

"ঐখানেই ত আপনাদের দুর্ব্বলতা! আর এই দুর্ব্বলতা থেকেই সমাজে শত শত অন্যায় অবিচার অবাধে প্রশ্রয় পাচ্ছে। ঈশ্বরদাসের বাড়ী গান করলে আপনাকে তার হাতে খেতে হত না, তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না, শুধু একটু মেশামিশি! তাতেও আপনাদের আপত্তি ? ছি ছি! মানুষগুলিকে এমন করেই আপনারা অবজ্ঞা করে থাকেন ? যে দেশের আদর্শ মহাপুরুষেরা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গে পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের সত্তা প্রত্যক্ষ অনুভব করে তাদের সেবায় তৎপর থাকতেন, সেই দেশের লোকেরা কিনা আজ ভগবানের দৃশ্যমূর্ত্তি একশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে পদতলে পিষে মারছে! সেই অমৃতের পুত্রগণ আজ এদের দ্বারে কত লাঞ্ছিত! কত অপমানিত!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সন্ন্যাসী একটু থামিলেন। আমি যেন তাঁহাকে কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই সব ভুলিয়া গেলাম। তখন তাঁহার বিশাল চক্ষুর্দ্বয় জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল। আমি আর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না, দৃষ্টি অবনত করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সন্ন্যাসী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ঐ যে ঈশ্বরদাসের বাড়ী পুজো হচ্ছে, আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে ওখানে জগজ্জননীর আবির্ভাব হয় নি ? যদি তা' না পারেন, তবে এটা আপনার পক্ষে চরম ধৃষ্টতা যে, আপনি ওর আঙ্গিনায় বসতেও নিজেকে অশুচি মনে করবেন। আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন, যে উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ী আপনি গর্ব্বভরে চলে গিয়েছেন, মায়ের ভোগারতির সময় তিনি চেয়ারে বসে পাণ চিবুচ্ছিলেন, কাকেও শালা কাকেও হারামজাদা কাকেও বা বদমাস বলে গালাগালি দিচ্ছেন, বরকন্দাজ দিয়ে কারও কাণ মলিয়ে দিচ্ছেন, কাকেও বা পয়জার মারবার হুকুম করছেন। আর ঐ যে ঈশ্বরদাস, যে নিকৃষ্ট জাতি বলে নিন্দনীয়, তাকে দেখবেন, মায়ের ভোগারতির সময় গলায় কাপড় দিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার চক্ষু দিয়ে দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু পড়ছে, আনন্দে দেহে পুলক হচ্ছে, ভক্তিতে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে হয়ে মা মা বলে কাঁদছে—এতে কি আপনি মনে করবেন যে ঈশ্বরদাস মুচী বলে জগন্মাতা ওর বাড়ীর ওমুখো হবেন না, আর জমিদার মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে তাঁকে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে ?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সন্ন্যাসী আবার নীরব হইলেন। কিছুকাল পর পুনরায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আপনারা যতই কিছু বলুন না, আর যতই কিছু করুন না, সব আপনাদের নিষ্ফল হবে, যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা এই তথাকথিত ছোটলোকগুলির উপর থেকে ঘৃণার ভাব একেবারে মুছে না ফেলবেন; সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল নীতিই

আপনাদের অনীতি বা কুনীতি হয়ে দাঁড়াবে। যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা এই ছোটলোকগুলিকে সমদৃষ্টির মধ্যে না আনবেন, আপনাদের জাতীয় উন্নতির সকল উদ্যম ব্যর্থ হবে।"

সন্ন্যাসী নৌকা হইতে নামিবার পূর্ব্বে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তবে এখন আসি। আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম, মনে কিছু করবেন না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

এবার আমি ভাল করিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম—পূর্ব্বের সে উগ্রভাব এখন আর নাই, স্বাভাবিক প্রশান্ততায় মুখখানি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসী এক মুহূর্ত্তও আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। বরাবর বালুচরের পথ ধরিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আমি বিহ্বল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তারপর ঝাউবনের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইলে আমি চক্ষু ফিরাইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। তারপর কখন যে নৌকা এপারে আসিয়া লাগিয়াছে, তাহা মোটেই জানিতে পারি নাই; নৌকা ঘাটে লাগিলেও যখন আমি নৌকা হইতে নামিলাম না, তখন মাঝিরা ডাকিয়া বলিল—"বাবু! নৌকা লেগেছে।" মাঝিদের ডাকে আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি অমনই নৌকা হইতে নামিয়া বাসার দিকে চলিলাম।

৭

যখন বাসায় আসিয়া উঠিলাম, তখনও একটু বেলা আছে। ভগবান আদিত্য তখনও অস্তাচলের আড়ালে একেবারে গা'ঢাকা দেন নাই। আমি ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিক কেন আমরা নিম্নশ্রেণীকে এত ঘৃণা করি? কেন, তাহারাও ত মানুষ! তাঁহারাও ত এক জগন্মাতারই সন্তান। তখনই ইচ্ছা হইল, ঈশ্বরদাসের বাড়ী ছুটিয়া যাই। কিন্তু সে পথও আমি রাখি নাই। আমি যে তখন জমিদার মহশয়ের মুষ্টির মধ্যে! যাহা হউক, অতঃপর তাঁহার নিকট যাওয়াই সঙ্গত বোধ হইল। এক পা' দুই পা'- করিয়া ক্রমশঃ জমিদারবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর, কাছারী বাড়ীর কাছে জমিদার মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম তিনি তাঁহার কাছারী দালানের প্রাঙ্গণ দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্নের মত দেখা যাইতেছিল। সহসা তিনি আমাকে সম্মুখে দেখিয়া একটু যেন চমকিয়া উঠিলেন। তার পর একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আজ সেই নূতন পালাটা গাবেন না কি?"

"আজ্ঞে, সেটা শেষের দিনের জন্যে রেখেছি।"

"তা' বেশ! আজ তবে কি গাবেন?"

"আজ আর একটী পালা গাব।"

তার পর আমি আসল কথাটা পাড়িতে চেষ্টা করিলাম। নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম, "একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যদি অভয় দেন, তবে বলতে পারি।"

"আপনি অসঙ্কোচে বলতে পারেন।"

"কথাটা কিন্তু বড় অবৈধ রকমের হবে; তাই বলতে সাহস হচ্চে না।"

"আঃ! আপনি ভূমিকা রাখুন না, যা' বলবার থাকে বলে ফেলুন।"

"আমি এর পর ঈশ্বরদাসের বাড়ী গিয়ে গান করতে চাই।"—বলিয়াই আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, এইবার আমাকে জমিদার মহাশয়ের আরক্ত নেত্রের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বুঝিবা ভস্ম হইতে হয়!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তিন মণ বোঝা স্কন্ধ হইতে নামিয়া গেলে মানুষ যেমন একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে, রায় মহাশয়েরও তখন ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডলের সমস্ত উদ্বেগচিহ্ন ভোজবাজীর মত যেন কোথায় অদৃশ্য হইল। তাঁহার চিন্তাম্লান মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার ভাবনা-কুঞ্চিত ললাট দীপ্ত আভা ধারণ করিল, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"মুচীবাড়ীর চাল ডাল না খেলে বুঝি ঠাকুর মশায়ের পেট ভরছে না? আচ্ছা, কেন বলুন ত? এই এক বেলার মধ্যে আপনার এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হল কি করে?"

আমি বিনীত ভাবে কহিলাম, "আমি নিজে এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, ঈশ্বর দাসের বাড়ী গান করলে আমার জাতি নষ্ট হবার কোনও আশঙ্কা ছিল না; কেবল একটা সাময়িক উত্তেজনাবশেই তখন চলে এসেছি।"

"মুচীবাড়ী গান করলে তা'তে আপনার সম্মান থাকবে?"

"না থাকবার ত কোনও কারণ দেখছিনে। আমি ত আর চুরি, ডাকাতি বা বদমাইসি করতে যাচ্ছি না?"

"গান জমবে ত ভাল? সবই যে নিরেটের দল!"

"তা' আর কি করব?"

"আচ্ছা, আপনাকে যেতে শুধু অনুমতিই নয়, যা'তে এই সন্ধ্যা ৬টার ভিতর আপনারা রওনা হতে পারেন, তার বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি। আপনারা ৯টার মধ্যেই ওখানে গান আরম্ভ করতে পারবেন।"

জমিদার মহাশয় এমন আগ্রহের সহিত এবং সহজভাবে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, যাহাতে উহাকে পরিহাস বলিয়া কল্পনা করিয়া লইবার আদৌ অবসর থাকিল না। আমি তাঁহার উদারতা দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে না পরিয়া ছুটিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে গেলাম। তিনি—"আহা! করেন কি! করেন কি! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।" বলিতে বলিতে ত্রস্তভাবে কয়েক পা' পিছাইয়া গেলেন। তারপর আমি বলিলাম, "সন্ধ্যার পর আপনার বাড়ী যখন শত শত ইতর ভদ্র গান শুনতে আসবে, তখন তা'দের কি বলে বিদায় করবেন? তখন যে আপনাকে বড় লজ্জায় মধ্যে পড়তে হবে!"

জমিদার মহাশয় একটু অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, "সে ভাবনা আমার, এখন আপনি যাবার উদ্যোগ দেখুন গে।"

বাসায় আসিয়া দলের সকলকেই একথা জানাইলাম। তাহারা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর আমি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আপনাদের মধ্যে যা'র ঈশ্বরদাসের বাড়ী যেতে আপত্তি হবে, তিনি এখানে থাকতে পারেন। তবে আমার বিশ্বাস, আমি গেলে অন্য আর কারও কোন আপত্তি হবে না, হওয়াও উচিত নয়। কর্ম্মদোষে যাত্রাদলের অধিকারী হয়েছি বলে, কোনও দিন বংশোচিত সদাচার হ'তে ভ্রষ্ট হই নি। বিশেষতঃ জমিদার রায় মহাশয় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কাপ! তিনিও এতে সম্মতি দিয়েছেন।"

আমার কথায় কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না, সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া স্ব স্ব সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমাদের দলে একজন কুম্ভকার ছিল, ঢোলক বাজাইত, সেই চুপি চুপি পূর্ণ বিশ্বাসকে বলিল, "বিশ্বাস মশায়, তবে দেখছি শেষে মুচী বাড়ীই যেতে হল!"

৮

নবমী পূজার সন্ধ্যারতির সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরদাসের পূজামণ্ডপের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উচ্চরবে ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল। গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এদিকে আমাদের আসরের তিন পার্শ্বে তিন চারিশত মুচী ভায়া নগ্নগাত্রে গান শুনিতে বসিয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে দুই চারিজন মিলিয়া গান সম্বন্ধে আবার চুপি চুপি নানাপ্রকার অদ্ভুত জল্পনা কল্পনা করিতেছে।

পূর্ণ উদ্যমে গান চলিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় বাড়ীর পূর্ব্বদিক হইতে বহু লোকের কোলাহল কাণে আসিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভদ্রশ্রেণীর বালক যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকারের লোকের আকস্মিক সমাগমে

ঈশ্বর দাসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের মুখে শুনা গেল, তাহারা জমিদার বাটীতে গান শুনিতে গিয়াছিল, রায় মহাশয় তাহাদিগকে বলিয়াছেন, "আমার বাড়ীর গান আজ আমার প্রজা ঈশ্বর দাসের বাড়ী হচ্চে, আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা সেখানে যান। আমিও একটু পরে আসছি।"

তখন বাড়ীময় আনন্দের একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। মুচীভায়ারা সব বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ঈশ্বর দাস দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতর গেল এবং বড় বড় অনেকগুলি ধোঁলাই ফরাস আনিয়া পাতিয়া দিল। ভদ্রলোকেরা গান শুনিতে বসিলেন।

খুব উৎসাহের সহিত গান চলিতেছে, এমন সময় সত্য সত্যই রায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম। দর্শকবৃন্দ একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ঈশ্বর দাস ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তিনি তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া তুলিলেন। তাহা দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীর মধ্য হইতে হর্ষসূচক এক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। সকলের মুখেই এক নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ! সহস্র বৎসরের মধ্যে এ গ্রামে যাহা হয় নাই, আজ তাহাই হইল। বিশ্বজননীর ইচ্ছায় ঈশ্বর দাসের পূজাপ্রাঙ্গণে আজ উচ্চ নীচের এক অভাবনীয় মধুর সম্মিলন ঘটিয়া গেল।

রায় মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর দাসকে বলিলেন, "ঈশ্বর! তোমার বাড়ীর গান আমি জোর করে নিয়ে ভাল কায করি নি। যা হোক এজন্যে তুমি মনে কিছু করো না, আরও একদিন তোমার বাড়ী গান হবে। আমরা আধা আধি করে অধিকারী মহাশয়কে টাকা দিব।"

ঈশ্বর দাস বুক করে এবং হর্ষগদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর করিল, "নিয়েছিলেন বলেই ত অধমের কুটীরে পদধূলি পড়ল, নইলে এ সৌভাগ্য কি হত?"

গান শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে রায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ভৃত্যেরা যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া নিকটে আসিল। তিনি আসরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বলিলেন, "আপনারা কাল রাতে পুনর্ব্বার এখানে গান শুনতে আসিবেন। আমিও আসব।" তার পর তিনি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন।

আমার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। যে রায় মহাশয় একদিন পূর্ব্বে যাহার ছায়া স্পর্শ হইবার ভয়ে দশ হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন, তাহাকে আজ তিনি দুই হাত দিয়া স্পর্শ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিলেন না। কি আশ্চর্য্য! অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে! বড় কৌতূহল হইল, কিছুতেই তাহা দমন করিয়া রাখিতে পারিলাম না, সুতরাং তখন আলোক লক্ষ্য করিয়া পিছু পিছু ছুটিলাম।

স্থূলকায় জমিদার মহাশয়কে ধরিতে আমার অধিক সময় লাগিল না। যেই আমি তাঁহার প্রায় কাছাকাছি গিয়াছি, অমনই দুইজন ভৃত্য ত্রস্তভাবে যুগপৎ দুইটি লণ্ঠন আমার মুখের উপর ধরিল। জমিদার মহাশয় পশ্চাৎ ফিরিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চহাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—"ও! অধিকারী মহাশয়! কেন, এতরাত্রে যে পিছু নিয়েছেন? কোনও কুমতলব নাই ত?"

"তামাসা রাখুন রায় মশায়! প্রকৃত ব্যাপার কি সেটি খুলে বলতে হবে।"

"বড় কৌতূহল হয়েছে বুঝি?"

"আজ্ঞে, তা আর বলতে!"

তার পর "তবে শুনুন" বলিয়া তিনি আমার খুব নিকটে আসিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কাল শেষরাত্রে মহামায়া প্রত্যাদেশ করেছেন যে, 'ঈশ্বর দাসের বাড়ী গান হতে দাও, নইলে তোমার মঙ্গল হবে না।' এ প্রত্যাদেশ আমি পাইনি, অতখানি পুণ্যের জোর আমার নেই। যিনি নিত্য শিবপূজা না করে জলগ্রহণ করেন না, বার মাসে তেরটা ব্রত করেন, দিবসে কয়েক সহস্রবার ইষ্টমন্ত্র জপ না করে যিনি শয্যায় যান না, সেই পুণ্যশীলা রায়-

তুলে কিছু ফসল বাঁচিয়েছিলাম। যা আশা করে-ছিলাম তার সিকি পেয়েছিলাম। এ বৎসরটা একরকম ভালই গিয়েছে।

মহানন্দ বাবু। এই ক'বছরের অভিজ্ঞতায় মোটের উপর কি রকম বুঝছ?

আমি। সামান্য বেতনের চাকরীর তুলনায় ভালই বুঝছি। এতেও ব্যয় বাহুল্য করতে পারি নে, অল্প বেতনের চাকরীতেও পারতাম না। সামান্য চাকরীতে লাঞ্ছনা অনেক, এতে স্বাধীনতা আছে, এইটেই একটা খুব লাভ। তার উপর আশা করা যায়, এতে উন্নতি হতে পারে। চাকরীওয়ালারাও উন্নতির আশা করে, কিন্তু সামান্য চাকরীর আর উন্নতি কত? আর যে সামান্য উন্নতি হয়, তাও এত আস্তে আস্তে যে, সহিষ্ণুতা রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। আগে ছোট চাকরী থেকে বড় চাকরী কারো কারো হ'ত, সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম। এখন সব নিয়মবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সে রকম হওয়া আর এখন বড় একটা দেখা যায় না। চাকরীর আর একটা বড় দোষ এই যে, ভাল করে কাষ করলেই যে উন্নতি হয় তা নয়। প্রভুদের কৃপা-দৃষ্টি চাই, আর যা হলে কৃপাদৃষ্টি হয়, সকলে তা করতে পারে না। চাষবাসে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বিঘ্ন না ঘটলে, যেমন চেষ্টা পরিশ্রম করা যায় তেমনি ফল পাবার আশা করা যায়।

মহানন্দ বাবু। হ্যাঁ, আশা সফলও অনেক সময়েই হয়। আমার বিশ্বাস তুমি যেমন চেষ্টা করছ, পরিশ্রম করছ, তাতে তোমারও উন্নতি হবে। কোন কাষের আরম্ভেই কিছু আশার অনুরূপ ফল হয় না। আমি যখন এই ব্যবসা আরম্ভ করি, তখন আমার অত্যন্ত কষ্ট গিয়েছে। একবার এমন হয়েছিল যে, মূলধন ত সব গেলই, তার উপর অনেক ঋণ হয়ে পড়ল। আমি আর দাঁড়াতে পারি নে। মহাজনদের কাছে গিয়ে সব অবস্থা বুঝিয়ে বল্লাম। তাঁরা বুঝলেন যে আমি ব্যবসাতে অসাধুতা করি নি, আমার অনভিজ্ঞতার জন্যেই ক্ষতি হয়েছে। তখন তাঁরা দয়া করে আবার আমাকে ধারে মাল দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে ঋণ শোধ দিতে লাগলাম। তার পর লাভ লোকসান হতে হতে, এখন এক রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছি। প্রথম প্রথম তোমার অসুবিধা হতে পারে, কষ্ট হতে পারে, তার পর উন্নতি নিশ্চয়ই হবে। চাকরী না করে এ কাষ করেছ বলে অনুতাপ করতে হবে না নিশ্চয়ই।

এই সকল কথার পর আমি তাঁহার পুত্র লোকানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মহানন্দ বাবু বলিলেন, "লোকানন্দকে স্থানীয় ইস্কুলেই শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়ে নিজের ব্যবসাতে শিক্ষানবিশ করে রেখেছিলাম। তার পর ব্যবসাটার গোড়া থেকে সমস্ত তত্ত্ব ভাল করে শেখবার জন্যে একজন তুঁতের চাষীর সহকারী করে দিয়েছিলাম। সেখানে তুঁতের আর রেশম কীটের চাষ ভাল করে শিখে, তার বাধাবিঘ্নগুলো দেখে, স্থানীয় চাষীরা তার কি প্রতীকার করে জেনে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীটা কি তাই শেখবার জন্যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ রেশমের কাষের জন্যে বিখ্যাত। সেখানে তুঁতের চাষ থেকে রেশমের কাপড় তৈরী এবং তার ব্যবসা পর্য্যন্ত সব শিখে আসবে, এই রকম বন্দোবস্ত করে একজন বড় রেশমের কারবারীর কাছে শিক্ষানবিশ করে দিয়েছি। এক বৎসর হল সে গিয়েছে, আরও এক বৎসর থাকতে হবে। তার পর এসে আমার এই ব্যবসায় যোগ দেবে এবং ভবিষ্যতে নিজেই ব্যবসাটা চালাবে। ইস্কুল থেকে বেরিয়েই কেউ কোন ব্যবসা করতে পারে না। সকল ব্যবসাতেই শিক্ষানবিশি দরকার। তা না হলে ব্যবসা শিখবে কেমন করে? আর ব্যবসা না শিখে ব্যবসা করতে গিয়েই আমাদের দেশের এত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা মনে করি, বুদ্ধিবলেই সব কাষ করা যেতে পারে। সেটা আমাদের একটা মহাভ্রম। বুদ্ধিবলে আমরা সব বুঝতে পারি, কিন্তু বুঝে যখন কাষ করতে যাই, তখন দেখি কাষ করবার শক্তি নেই। জ্ঞানই শক্তি, কাষের জ্ঞান আমাদের নেই। ফলে কেউ কাষ আরম্ভ করে

ঠকে, কেউ কায আরম্ভই করতে পারে না। মোটের উপর কায হয় না—নিজেরও না দেশেরও না। 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময় দেশে যে ভদ্রলোকের এত দোকান পসার হল, আর উঠে গেল; তার যদি কোন কৈফিয়ৎ থাকে ত এই। আমাদের ভদ্রলোকেরা যা পারলেন না, তা অন্য লোকে করছে। বড় বাণিজ্য দেশে খুব কম থাকলেও, ছোট কারবার দোকান পসার অনেক আছে। এই সকল ছোটখাটো ব্যবসা যারা করে, তাদের ছেলেদের তারা নিজের কারবারে শিক্ষানবিস করে' রাখে, আর কায শেখা হলে প্রথমে তাদের নিজের তত্ত্বাবধানে কায করতে দেয়, তার পরে এই রূপে শিক্ষিত ছেলেরা স্বাধীনভাবে কায কর্ম্ম করে।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর, আহারাদি করিয়া সে দিনকার মত বিশ্রাম করা গেল। পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একটু বেড়াইতে যাইব মনে করিয়া বাহির হইতেছি, দেখি যে একটা ঘরে আনন্দময়ী, আর দুই তিনটি স্ত্রীলোক লইয়া রেশমের সূতা তৈয়ারি করিতেছেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঘরের মধ্যে গেলাম। আনন্দময়ী বেশ সপ্রতিভ ভাবে আমাকে ডাকিয়া লইয়া সূতা তৈয়ারি করার যন্ত্রগুলি সব দেখাইলেন। আর দুই তিনটি স্ত্রীলোক যে ছিল, তাহারা কোয়া হইতে সূতা বাহির করিয়া লাটাইয়ে জড়াইতেছে, আনন্দময়ী তাহাদের কাযও দেখাইয়া দেখাইয়া দিতেছেন, নিজেও চরকায় মাকুর জন্য নলী প্রস্তুত করিতেছেন। ঘরে একখানা ঠকঠকি তাঁতও (Shuttle loom) আছে। সে তাঁতখানায় আনন্দময়ী নিজে কাপড় বোনেন। আমাকে একটু কাপড় বুনিয়া দেখাইলেন।

এই সকল দেখিয়া, বেড়াইতে গেলাম। বেড়াইয়া আসিয়া আবার মহানন্দ বাবুর কাছে বসিলাম। তাঁহাকে আনন্দময়ীর সূতা তৈয়ারি করা ও কাপড় বোনার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এখানকার তাঁতিরা সাবেক ধরণের তাঁতেই কাপড় বুনত, এখনও অনেকে বোনে। তাদিকে নিয়েই আমার কারবার। আমি দেখলাম তাদিকে যদি ঠকঠকি তাঁতে কাপড় বুনতে শেখান যায়, তা'হলে তাদেরও সুবিধা আমারও সুবিধা। তাদিকে ঠকঠকি তাঁতের কথা বল্লাম, আর সাবেক ধরণের তাঁতের সঙ্গে তার প্রভেদটা বুঝিয়ে দিলাম; আরও বল্লাম যে যদি তাদের মধ্যে কেউ সে তাঁতে ভাল করে' কাপড় বুনতে শিখতে চায়, আমি তাকে শ্রীরামপুরের ইস্কুলে পাঠিয়ে শিখিয়ে আনতে পারি। শ্রীরামপুরে যেতে তারা কেউ রাজী হল না। অবশেষে আমিই শ্রীরামপুর থেকে একজন লোক আনালাম এবং একখানা শ্রীরামপুরী ঠকঠকি তাঁতও আনালাম, এনে এখানকার কয়েক জন তাঁতিকে শিখিয়ে নিলাম। সেই সময় আনন্দময়ীও সেই তাঁতে কাপড় বুনতে শেখে। আমি দেখলাম আনন্দময়ীর এতে বেশ ইচ্ছা আছে। আমিও তাকে উৎসাহ দিয়ে, ভাল করেই শেখবার বন্দোবস্ত করে দিলাম। এখন সে বয়ন-শিল্পের সব রকম বেশ শিখেছে। তুমি যে তাঁতখানা দেখেছ, সেই প্রথম তাঁত, যা' আমি শ্রীরামপুর থেকে আনিয়েছিলাম। এখন এখানকার তাঁতিদের মধ্যে অনেকেই ঐ তাঁতে কাপড় বোনে।"

আমি। আমাদের দেশের ভদ্রমহিলারা তাঁতে কাপড় বোনেন না, কিন্তু চরকায় সুতো কাটতেন। আসামের ভদ্রমহিলারা এখনও কাপড় বোনেন। আমাদের বালিকা পাঠশালায় লেস-বোনা আর কার্পেট বোনা শেখান হয়। আপনি যে এই তৃতীয় শ্রেণীর লেস আর কার্পেট বোনা না শিখিয়ে, সুতো তৈয়ের করা আর কাপড় বোনা শিখিয়েছেন এ আপনার কম প্রশংসার কথা নয়।

মহানন্দ বাবু। প্রশংসা অপ্রশংসার কথা আমি তত ধরি না; আমি দেখলাম, আমি নিজে এই ব্যবসা করি, আমার ছেলে এই ব্যবসা করবে। আমার মেয়েও এই ব্যবসা শিখে আমার ছেলের সাহায্য করুক। লেস বোনা কার্পেট বোনা শিখে আমাদের মত গৃহস্থের কোন উপকার হয় না, বরং খরচ বেড়ে যায়।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর কয়েকজন তাঁতি কাপড়

লইয়া আসিল। মহানন্দ বাবু তাহাদের সঙ্গে দেখা-পাওনার হিসাব করিয়া কাপড় লইলেন। আমি মহানন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানকার তাঁতির অবস্থা কেমন?" মহানন্দ বাবু বলিলেন, "অন্য জায়গার তুলনায় মন্দ নয়। এরা আগে স্থানীয় বাজার ছাড়া অনেক জায়গার বাজারের খবর রাখত না। মহাজনের কাছ থেকে নগদ টাকা বা সুতো নিয়ে আসত, আর মহাজন যে দাম দিত তাই এরা নিতে বাধ্য হত। এখন আমি এদের মধ্যে এক রকম সমবায় করে দিয়েছি। এদের জাতের যে পঞ্চায়ত আছে, যাতে এদের সমাজের কথার বিচার হয়, তাইতে এ বিষয়ের কথারও আলোচনা হয়। আলোচনা হয়ে সুতোর একটা উচ্চতম দাম আর কাপড়ের একটা নিম্নতম দাম অবধারিত হয়। সেই দামের চেয়ে বেশী দামে সুতো কিনবে না, আর কম দামে কাপড় বেচবে না। মহাজন যদি তাতে রাজী না হয়, আমি সেই দামে সুতো বেচি, আর কাপড় কিনি। আমি ক্ষতি স্বীকার করে এরকম করি তা নয়। বাজারের অবস্থা অনুসারে দাম ঠিক করি। তবে মহাজনেরা তাঁতির দুরবস্থার জন্যে যে সুবিধা পেয়ে বেশী লাভ করে, আমি তা করি না। তাঁতির দুরবস্থা আর বাজার দর—এই দুটোর মধ্যে রাজীনামাগোছ করে যথাসম্ভব অল্প লাভ রেখে তাদিকে সুতো দিই আর কাপড় নিই। এতে লাভ কম বেশী হয়, কিন্তু ক্ষতি হয় না। এর ব্যতিক্রম করলে এদের পঞ্চায়ত ব্যতিক্রমকারীর দণ্ড করে। এর উপকারিতা এরা এক রকম বেশ বুঝেছে। এদের এই সমবায়টা এক রকম জার্মান কার্টেলের মত।"

একজন তাঁতি বলিল, "আগে আমরা কেবল মহাজনকেই চিনতাম, অন্য কোন জায়গার বাজারের দর জানতাম না। এখন মহানন্দ বাবু যে সকল খবর আমাদিকে জানিয়ে দেন। আবশ্যক হলে সুতো কোয়া আনিয়ে দেন, কোন্ রকম কাপড়ের চাহিদা কি রকম তা বুঝিয়ে দেন, নমুনা আনিয়ে দেন। আগে আমরা কেবল ধুতি আর শাড়ীই বুনতাম, এখন কোটের কাপড়, সার্টের কাপড়, শীতের মোটা গায়ের কাপড়ও বুনি। মহানন্দ বাবু সকল রকমেই আমাদের খুব উপকার করেন। আগে মহাজনের দৌরাত্ম্যে আমাদের মধ্যে অনেকে তাঁত ছেড়ে মজুরি করত, চাকরী করত। এখন সকলে আবার তাঁত বুনছে। আর মহাজনের কাছে আগে আমাদের যত ধার ছিল, এখন তাও অনেক কমে আসছে।"

আমি (তাঁতিদের প্রতি)। ধার সম্বন্ধে তোমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্যবসার উন্নতি করতে যতটুকু ধারের আবশ্যক, ততটুকু ধার করতে পার, কিন্তু শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কাযের জন্যে ধার করা উচিত নয়, সেগুলি ব্যবসার লাভ থেকে করাই উচিত। ধার করা কখন কখন অত্যন্ত আবশ্যক হতে পারে, তা বলে সামান্য কারণে বা বিনা কারণে ধার করা উচিত নয়। ধার পাওয়া খুব সহজ হওয়াও সেই জন্যে উচিত নয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু দিয়ে একটা মূলধন করতে পার, আর আবশ্যক হলে সেই মূল থেকে অল্প সুদে ধার নিতে পার।

একজন তাঁতি। মহানন্দ বাবু আমাদিকে সে কথা বলেছেন, আমরাও সে চেষ্টা করচি। শুনেছি সরকার থেকে কোন কোন জায়গায় এই রকম হয়েছে।

আমি। হাঁ, অনেক জায়গায় হয়েছে। তোমরাও ইচ্ছা করলে সরকারী সাহায্য নিতে পার। কিন্তু আগে তোমরা প্রস্তুত হও, তারপর মহানন্দ বাবুকে বল্লে তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তোমাদের যে পঞ্চায়ত আছে, সেইটাকে আগে রেজিষ্টারী করে নাও। সেইটেই হলে মূল ভিত্তি। তা থেকে যে কেবল অল্পসুদে টাকা ধার পাওয়া যাবে তা নয়। তোমাদের ব্যবসায় উন্নতির জন্যে যা কিছু আবশ্যক, ক্রমে সবই হতে পারবে। তোমারা এখন যে ঠক্‌ঠকি তাঁতে কাপড় বুনচ, সেটা সাবেক তাঁতের চেয়ে ভাল তা বুঝতে পেরেছ। এর চেয়েও অনেক ভাল তাঁত আছে। তোমরা একজন

কাশী চল। তীর্থ করাও হবে, সেখানকার কাপড় বোনার ইস্কুল দেখাও হবে। দেখবে কত রকম কলে, কত রকম কাপড় বোনা হচ্ছে। কত ভদ্রলোকের ছেলে কাপড় বোনা শিখছে। তোমাদের পঞ্চায়ত থেকে তোমাদেরই একজনকে পাঠিয়ে, বেশ শিখিয়ে আনতে পারব। প্রতি বছর যদি একটি করে ছেলে পাঠাতে পার, তা হলে তোমাদের ব্যবসায়ের কত উন্নতি হবে।"

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

আঁধারের শিউলি

(উপন্যাস)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণের যোগ ছিন্ন হইলেও তোলা-ফুল ফুলদানীর জলে কিছু দিন তাজা থাকে, কিন্তু বেশীদিন পারে না। সুভদ্রা স্বামীর প্রেমে 'দাবী নাই' লিখিয়া দিয়া মামীর স্নেহে কিছুদিন বাহিরে তাজা রহিল, কিন্তু ভিতরে শুকাইয়া আসিতে লাগিল। যাতে তার হৃদয়ের আমূল শুষ্কতা—তার তিলে তিলে নীরবে মরণ—বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া না ফেলে সুভদ্রা তার জন্য সযত্নে চেষ্টা করিত।

এ চেষ্টায় সে সফলও হইয়াছিল, কতকটা তার স্বাভাবিক চাপা প্রকৃতির জন্য, আর কতকটা সাধারণ লোকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে। অপরের চোখে সুভদ্রা তেমনি আছে—হাসে খেলে কায করে। কিন্তু দরদীর মুখে নয় বুকের ভিতরেও আর এক যোড়া চোখ থাকে—দৃষ্টি সে চোখের সর্ব্বস্ব নয়, তার প্রাণ আছে। সেই চোখ দিয়া দরদী হাসিকান্নার আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়ান্তরের রহস্যটুকু নিমেষে ধরিয়া ফেলে। তাই সকলের চোখ এড়াইতে পারিলেও সুভদ্রা মামীর চোখে ধরা পড়িতে বাকী থাকিল না। তিনি সবই বুঝিতেন, তবু ভাল করিয়া মন বুঝিবার জন্য একদিন সুভদ্রাকে বুকের কাছে টানিয়া ডাকিলেন—"সুভী, একটা—"

সুভদ্রা দেখিল, মামীমার চোখ বেদনায় ম্লান হইয়া, পরক্ষণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ যেন মামীমার করুণা চোখের কোলে আসিয়া তার বুকের বেদনাকে ডাকিতেছেন! সুভদ্রা আনত মুখে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

"এখানে তোর বড় কষ্ট হচ্চে না, মা?"

সুভদ্রা বিস্মিত মুখে উত্তর করিল—"কষ্ট! কেন, কিসের মামীমা?"

"কিসের তা ঠিক ধরতে পাচ্ছি নে, কিন্তু কষ্ট যে হচ্চে তা বেশ বুঝ্চি।"

সুভদ্রা একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র। সেই ম্লান হাসির তলে যে কতখানি ব্যথা জমাট বাঁধিয়াছে তাহা মামী এক নিমেষে বুঝিয়া লইলেন। তিনি মায়ের মত স্নেহভরে, সখীর মত সমবেদনার সুরে, অতি সন্তর্পণে বলিলেন—"একবার দেখা করতে যাবি—মুকুলদের সঙ্গে?"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই মামী ভাবিলেন, মনের আবেগে এ কি বলিয়া ফেলিলাম!

সুভদ্রা বুঝিল, সাধ্বীর পবিত্রতা মামীকে আসল নামটি বলিতে দিল না। তিনি ঘুরাইয়া তাই বলিলেন 'মুকুলদের সঙ্গে।' দেশ কাল সমাজ সংস্কার এ সমস্তের বহু উর্দ্ধে যে উদার নীতি আছে, তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মামীমা যে তাহাকে পরপত্নী জানিয়াও

একথা বলিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সুভদ্রা ভালরকম বুঝিলেও, মামীমার কথায় কেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে ব্যথিত অভিমানের স্বরে বলিল, "না আমি কোথাও যেতে চাই নে মামীমা!"

শুনিয়া মামী ক্ষণকাল তৃপ্ত নয়নে সুভদ্রার পানে চাহিয়া বলিলেন, "সেই ভাল, কোথাও গিয়ে কাষ নেই।"

সুভদ্রা মনে মনে প্রশ্ন করিল—ভাল কার? আমার না মুকুলের?

কিন্তু সেই সঙ্গে হঠাৎ কি ভাবিয়া মামী সুভদ্রাকে বলিলেন, "পুরী যাবি?"

"তীর্থ করতে?"

"তাতে দোষ কি—বরং মন ভাল থাকবে?"

"বড় তীর্থ হারিয়ে কি মামীমা ছোট খাট তীর্থে মন বসবে?"—সুভদ্রার চোখের কোণে এক ঝলক হাসি যেন আগুনের ফিন্‌কি ছড়াইয়া দিল।

পলকের জন্য মামী অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ও মা! পুরী বড় তীর্থ নয়?"

সুভদ্রা বলিল—"আমার তীর্থের কাছে কেউ কিছু নয়!"

মামীর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি করবি মা, যেমন কপাল করে এসেছিলি। কত করে বল্লাম শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানাটা দে, তাও ত দিলিনে।"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। পড়িতে পড়িতে মামীর মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাকার চিঠি মামীমা?"

শুষ্ক মুখে মামী বলিলেন—"মুকুলের বড় অসুখ, আমায় যেতে লিখেচে। উনি থাকলে ভাল হ'ত, তা যাই হোক আমায় যেতেই হবে!"

সুভদ্রা ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"মামীমা, আমায় নিয়ে যাবেন?" মামী খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সুভদ্রার পানে চাহিয়া বলিলেন—"যাবে? চল!"

মামীর সঙ্গে সুভদ্রাকে দেখিয়া দেবকুমারের কেমন রাগ হইল। আবার ভালও লাগিল! মুকুলের পীড়া প্রথমটা খুবই ভয় দেখাইয়াছিল। কিন্তু আজ দুইদিন হইল সে ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। সুভদ্রাকে দেখিয়া মুকুল হাসিয়া বলিল—"কেমন জব্দ করেছি! চিঠি লিখিয়ে কত করে শীগ্‌গির যে পালিয়েছিলে, কেমন আবার টেনে এনেছি।"

"দিদি টেনে এনেছ, না টানে এসেছি?—কৈ আমায় তো কেউ আসতে লেখেনি!"

মুকুল বুঝিল সুভদ্রার অভিমান হইয়াছে। সেটাকে তরল করিয়া দিবার জন্য হাসিয়া বলিল—"তা তোমায় আসতে লিখবে কেন বল—তুমিত আর আইবুড়টি নও! আইবুড় শালীদেরই ভগিনীপতিদের কাছে আদর বেশী—বিশেষ এমন অবস্থায়।"

শরতের চলন্ত মেঘে জ্যোৎস্না রাত্রি যেমন মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া আবার উজ্জ্বলতা ফুটাইয়া তোলে, সুভদ্রার মুখের ভাবও সেইরূপ হইল। সুভদ্রা বলিল—"কিন্তু বোনের কাছে তো আর তা নয়—বোন কো লিখলে?"

"আমি ভাই মামীমার আসার কোন কথাই জানতাম না! যখন চিঠি লেখা হয় তখন আমি অজ্ঞান; আমার কি দোষ ভাই?"

সুভদ্রা হাসিয়া বলিল—"দোষ না থাকলেও দোষ দিতে ছাড়ব কেন—গুরুজনের পথেই চল্‌তে হয় ত!"

মুকুল কথাটা বুঝিল না, জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে?"

"তার মানে, তোমায় এখান থেকে নিয়ে গেলেন আমাকে মামীমা, কিন্তু তুমি দোষী করলে আমাকে, আমিও তাঁর পাল্‌টা দিলাম!"

মুকুল চোখ দুটা কপালে তুলিয়া বলিল—"ওঃ—এমন কথা?—তা এবার দেখা যাবে কত দিন থাক, তা হলেই বুঝব—সে বার কার দোষ ছিল।"

সুভদ্রা বলিল—"এবার তো দিদি থাকতে আসিনি, এবার মামীমার সঙ্গে এসেচি তোমায় দেখতে—তুমি একটু সেরে উঠলেই—"

মুকুল বলিয়া উঠিল—"কি, চলে যাবে ?—তার কম আর হবে কেন!—নাই আসতে—তা বেশ, আমিও যাতে রোগ শীগ্‌গির না সারে তাই করব!"

সুভদ্রা হাসিয়া বলিল—"কেন দিদি, আমি কি আঙুর আপেল বেদানা যে ভোগ করবার জন্যে বেশী দিন রোগে পড়ে থাকতে চাচ্চ ?"

মুকুল বলিল—"তা যাই হ'ক, শীগ্‌গির কিন্তু যেতে দিচ্চি নে।"

সুভদ্রা বলিল—"আমি ত আজই এসে আজই যাচ্চি নে, তার জন্যে এর মধ্যে ভাবনা কেন ?"

"না, আমি সেরে উঠলেও তোমায় কিছুদিন থাকতে হবে।"

সুভদ্রা হাসিয়া বলিল—"তোমার রাজ্যে এসেচি, তোমার হুকুম কি অমান্য করতে পারি !"

ইহার পর দুই দিন বেশ গেল, কিন্তু তৃতীয় দিনে পীড়া আবার প্রবল ভাবে দেখা দিল। চতুর্থ দিনে মুকুলের সংজ্ঞা লোপ পাইল। ক্রমে সে ভুল বকিতে লাগিল। বিকার অবস্থায় একবার মুকুল মামীশাশুড়ীকে সুভদ্রা জ্ঞানে তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল—"লক্ষ্মী বোনটি আমার, আমাদের ছেড়ে যাসনে—তুই না থাকলে আমার কিছু ভাল লাগে না, আর আর আমার মনে হয়, ওঁরও ইচ্ছে তুই থাকিস এখানে! লজ্জা কি ভাই, তোকে না ভালবেসে কি কেউ থাকতে পারে। তোকে আমি এত ভালবাসি, আর উনি ভালবাসবেন না ? তাই বলে ওঁকে খারাপ ভাবিস নে।"

প্রলাপের ঘোরে আরও বা কি বলিয়া ফেলে, তাই মামীশাশুড়ী বলিলেন—"মুকুল, আমি যে তোর মামীমা, কি সব ছেলেমানুষের কথা বলচিস্ মা !"

মুকুল প্রলাপের ঘোরে বলিল—"ওমা! তুমি সুভদ্রা নও ? এই সুভদ্রার মত দেখাচ্ছিল, এরি মধ্যে বদলে গেল—তুমি বহুরূপী।" বলিয়াই বিকারের ঘোরে হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে আসন্ন-মৃত্যুর বিকট উল্লাস যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মামীমা সুভদ্রার পানে চাহিয়া বলিলেন—"বড় সুবিধে বোধ করচি নে।"

সুভদ্রার মুখখানা ম্লান হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। অনেকক্ষণ পরে সুভদ্রা মামীকে বলিল—"হাঁ, মামীমা, কোন মোছলমান রাজা না নিজের জীবনের ভাগ দিয়ে তাঁর মরমর ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন, সত্যি ?"

সুভদ্রার এ প্রশ্নটা মামীমার নিকট একান্ত অসামায়িক ঠেকিল, তিনি ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"জানি নে ওসব বাছা। কেন, তা হলে কি হবে ?"

"না, জিজ্ঞেস কচ্চি।"

"আচ্ছা, এখন দেবকুমারকে জিজ্ঞেস করে এস দেখি কোন ওষুধটা দিতে হবে।"

সুভদ্রা যাইতে উদ্যত হইল মামী বলিলেন—"আচ্ছা আমিই যাচ্চি, তুমি একটু বোস।"

সুভদ্রা মুকুলের শিয়রে বসিয়া একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—"ভগবান তুমি যদি সত্যি একবার পিতার প্রার্থনায় তার জীবন-বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ দান ক'রে থাক, তবে আর একবার কৃপা করে এই অসার জীবনের বদলে এই মুমূর্ষুকে রক্ষা কর। শুনেচি প্রাণ ভরে কামনা করলে তুমি তা অপূর্ণ রাখ না—আমি আজ প্রাণ মন দিয়ে তোমায় ডাকচি ভগবান, আমায় নিরাশ করো না।"

মামীমা কখন যে ঘরে ঢুকিয়াছেন, কখন যে ঔষধ ঢালিয়াছেন সুভদ্রা তাহা জানিতে পারে নাই। হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া সুভদ্রা দেখিল, মামী ঔষধ লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সুভদ্রাকে চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া বলিলেন—"ওমা, তোমায় রুগীর কাছে বসিয়ে গেলাম, আর তুমি বসে বসে ঘুমের ধ্যান করচ ? নাও, সরো!"

সুভদ্রা বিনা প্রতিবাদে সরিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারিজনে পালা করিয়া রোগীকে শুশ্রূষা করিতে-

ছিলেন। মামীমা সুভদ্রাকে বলিলেন—"আমি দেবকুমার আর তাঁর পিসীকে উঠিয়ে দিইগে, তাঁরা এলে শুতে যেয়ো।"

দেবকুমার রোগীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সুভদ্রা মুকুলের পায়ের কাছে একটু আড় হইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সেবাক্লান্ত মুখের উপর বাতির আলো পড়িয়া মুখখানাকে করুণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। তখনও পিসী আসিয়া উপস্থিত হন নাই। পাছে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই জন্য সুভদ্রার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিবার কালে দেবকুমার নিতান্ত মোহের বশে যে কার্য্য করিয়া বসিল—তাহা কোন স্বামী যে তার 'অসন্নমৃত্যু' স্ত্রীর শয্যায় বসিয়া করিতে পারে তাহা দেবকুমারেরও ধারণা ছিল না। সেই কোমল ভীরু মৃদুস্পর্শে সুভদ্রা তড়িতাহতের ন্যায় চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। দেবকুমার আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল—"যাও, শোও গে, আর পিসিকে ডেকে দিয়ো।"

সুভদ্রা দুই চক্ষে মর্ম্মান্তিক দুঃখভরা তীব্র দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বিনা বাক্যে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন দেবকুমারের সম্মুখে বাহির হইতে সুভদ্রার যেন লজ্জা হইল। গত রাত্রের সে দুঃখের ভাবটা কিন্তু কাটিয়া গিয়া একটি সুখস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার অতৃপ্ত যৌবনের আকণ্ঠ পিপাসা গত রাত্রে এক নিমেষে যেন পরিতৃপ্তির আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া উঠিয়াছিল। নিদাঘ-বিশীর্ণ লতিকা যেমন বর্ষার প্রথম বারিপাতে লাবণ্যে উল্লাসিত হইয়া উঠে, তেমনি সুভদ্রার দেহ মন যেন এক নিমেষে সুখস্পর্শে উদ্ভাসিত উল্লাসিত হইয়া উঠিল। সুভদ্রা তার নিজের উপরে রাগ করিয়াও এ ভাব দমন করিতে পারিল না।

সেদিন মুকুলের অবস্থা আবার ভালর দিকে ফিরিয়াছিল; তাই সুভদ্রার এ ভাবান্তরটা কাহারও বিসদৃশ ঠেকিল না।

মুকুলের জন্য সুভদ্রা পথ্য তৈরি করিতেছিল। দেবকুমার কি একটা অছিলা করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সুভদ্রা মাথার আঁচলটা একটু টানিয়া দিয়া বলিল—"মামীমা দেখলে কি ভাববেন বল দেখি—না, এখান থেকে যাও।"

সে কথা কাণে না তুলিয়া দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কালকের কাণ্ডে বড় রাগ করেছ, না?"

সুভদ্রা ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিল—"রাগ করবার কায করলেই লোকে রাগ করে।"

"আমি কি সত্যিই রাগ করবার কায করেচি—সুভদ্রা?"

সুভদ্রা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে তুমিই জানো।" বলিয়া সুভদ্রা মুকুলের পথ্য লইয়া উঠিতে উদ্যত হইলে, দেবকুমার একবার চারিদিক চাহিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "না, তোমাকেই বলতে হবে—আমার দোষ হয়েছে কি না।"

আনন্দের বেদনায় ক্ষণকাল সুভদ্রা কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"না, আমায় এখানে থাকতে দিলে না—আমি কালই মামীমার ওখানে যাবার চেষ্টা দেখব।"

দেবকুমার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—"তা হলে তুমি বোঝ যে এখান থেকে চলে যাওয়াটা আমার সাজা।"

সুভদ্রা স্থিরকণ্ঠে বলিল—"অন্ততঃ যে পরিত্রাণ তা বুঝি।"

"আমি তোমার বিপদ, সুভদ্রা?"

"আমি তা কোন দিনই বলিনি—বরং তুমি আমার বিপদ-ত্রাতা একথা সকলে জানে, আর আমিও মানি।"

"আর যেটুকু সকলে জানেনা—তা কি তুমি জান না?"

সুভদ্রা এবার কাতরকণ্ঠে বলিল—"বারবার কেন সে কথা তোল?—যা সকলে জানেনা, যা তুমিও একদিন জানতে চাওনি, আবার তাকে নতুন করে জেনে কায কি?"

"সেই এক কথা।—মেয়েমানুষের বুকে ক্ষমা নেই

—তার স্বামী জন্যেও না ?" বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবকুমার ধীরপদে চলিয়া গেল।"

উনানের কাছে বসিয়া সুভদ্রা অনেকক্ষণ কাঁদিল। পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল—"ভগবান, পথ দেখিয়ে দাও।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুকুল বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। সকলেই চিকিৎসককে প্রশংসা করিতে লাগিল। সুভদ্রার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস যে, তাহার আবেগময়ী প্রার্থনার বলেই সে মুকুলকে মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে তাহার নিজের শরীরের অবস্থায়। সে বড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহার ছুটির দিন অদূরে উঁকি মারিতেছে। সে জীবনের আর সব সাধ ভাসাইয়া দিয়াছে, কেবল একটিকে এখনও বুকের মাঝে আঁকড়াইয়া আছে। সে চায়, তার ছুটির দিনে দুঃখের বোঝাটি যেন শ্বশুরগৃহে স্বামীর পায়ের কাছেই রাখিয়া যায়। এই জন্য যখন আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথা উঠিল, তখন সে মুকুলের শরণাপন্ন হইল—বলিল, "দিদি, মামীমাকে আর কিছু দিন থেকে যেতে বল না!" সুভদ্রার মুখে একথা শুনিয়া মুকুল ভারী খুসী হইল, কিন্তু নিজে মামীশাশুড়ীকে কিছু না বলিয়া সে স্বামীকে দেবকুমারকে বলিল। তাহার জানা ছিল, মামীর মত ফিরাইতে তাঁহার ভাগিনেয়টির মত আর কেহই পটু নহে। আবেদন শুনিয়া দেবকুমার বলিল—"মামীমা যে আর থাকবেন তা মনে হয় না। তা, তোমার ত আর মামীমার জন্যে সত্যি প্রাণ কাঁদচে না—তোমার আসল টানটা কোথায় তা বুঝি, তাকেই নয় থেকে যেতে বলনা!"

"মামীমা মত না দিলে সে কেমন করে থাকে? তুমি না হয় সেই মতটা করিয়ে দাও।"

"সে জন্যে আর আমি তাঁকে কি বলব—তুমিই বল। কিন্তু যাকে রাখতে চাও, তার থাকতে মত আছে তো?—না, নেই?"

মুকুল তখন সুভদ্রা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। শুনিয়া দেবকুমারের সমস্ত মনটা আনন্দে ভরিয়া উঠিল। বলিল—"তার যদি মত থাকে ত না হয় বলতে পারি!"

দেবকুমারের প্রস্তাবে মামী মনে মনে হাসিলেন। পরে বলিলেন—"তোমার বোধ হয় ইচ্ছে, সুভদ্রা আরও দিন কতক থেকে যায়?"

দেবকুমার মনে মনে মামীর উপর বিরক্ত হইল। বলিল—"আমার ইচ্ছে শুধু সুভদ্রা কেন আপনিও আরও দিন কতক থাকেন—"

"আর আমি যদি থাকতে একান্ত না পারি, তবে সুভদ্রাকে যেন রেখে যাই,—এই তো?"

দেবকুমারের কাণ দুটা লাল হইয়া উঠিল। বলিল—"না মামীমা কায নেই, আপনি আপনার সুভদ্রাকে—"

মামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমার—ও কথা বলো না, বরং ও রত্ন কুড়িয়ে এনেছ তুমি——ও তোমারই!"

রাগের বশে দেবকুমারের একবার ইচ্ছা হইল মামীর মুখের উপরেই বলে—"হাঁ, সত্যই ত আমারই।" কিন্তু পরক্ষণেই তাহার দুর্ব্বল অপরাধী চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। পরে মামীর দোষটা পরিপাক করিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"মামীমা, আপনি যে আমার গুরুজন এটা অনেক সময় ভুলে গিয়ে, যা তা বড্ড বলেন।"

মামী হাসিতে হাসিতে পাল্টা জবাব দিলেন—"আর তুমিও এখন আমি যে তোমার হিতার্থী তা অনেক সময় ভুলে গিয়ে, আমার ব্যাভারে মাঝে মাঝে রেগে যাও!—কিন্তু যাই ভাব তুমি, আমি বুলে দিচ্ছি—সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

দেবকুমার একান্ত সহজ সুরে বলিতে চেষ্টা করিল—"নিয়ে যাবেন, যাবেন—তাতে আর দুঃখ কি?"

"হাঁ একটুকু আছে বৈকি—ওকালতী করতে এসে জিততে পারলে না!"

দেবকুমার একটু কাষ্ঠহাসি হাসিল।

মামী সুভদ্রাকে বিরলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরা ত তোমায় রেখে যাবার জন্যে আমায় একান্ত ধরেচে। তুমি কি বল—আর দু'চার দিন থেকে যাবে ?"

সুভদ্রা তার ডাগর চোখে আনন্দের আলো ফুটাইয়া নীরব সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িল। মামী প্রথমটা সে ব্যাকুল বাসনাভরা দৃষ্টির সম্মুখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে মোহ কাটাইয়া সস্নেহে বলিলেন—"দূর পাগলী, পরের বাড়ী কখনো বেশী দিন থাকতে আছে ?"

সুভদ্রার মুখখানা চকিতে ম্লান হইয়া গেল। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তবে না হয় চলুন।"

আশাভঙ্গে মানুষের মনে যে কতখানি ব্যথা লাগে তা বুঝিয়াও মামী নিজের মনকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিলেন না। বলিলেন—"বেশ, আবার এক সময় এলেই হবে।"

সুভদ্রা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার বোধ হয়, মামীমা, এই শেষ আসা।"

মামী ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ও আবার কি কথা ?"

সুভদ্রা পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—"দেখে নেবেন ঠিক কি না।"

এবার মামী বিরক্তির ভরে বলিলেন—"আচ্ছা সে যা হবার হবে—কাল আমাদের যেতে হবে।"

সুভদ্রা মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।" তার পর কোনদিকে না চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। সুভদ্রার এ ব্যবহারে মামী প্রথমে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন—"ভালবেসে মরেছে !"

সে রাত্রে সুভদ্রার চোখে কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। অতীতের যত নিষ্ঠুর স্মৃতি এক নিমেষে জাগিয়া উঠিয়া তার হৃদয়মূলে দংশন করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে নিজের উপরই সুভদ্রার কেমন রাগ হইতেছিল—কেন সে তার নিজের ষোল আনা দাবী ছাড়িয়া দিয়া নিজের নারী-জীবনে ব্যর্থতার অভিসম্পাৎ বরণ করিয়া লইতে গেল ? যে ভিটায়, যার কাছে আমরণ থাকিবার তার ষোল আনা দাবী, আজ কি না সেখানে তাহাকে দুদিনের বেশী থাকিবার জন্য ভিখারীর মত প্রার্থনা করিয়াও বিফল হইতে হইল ! স্বামীর প্রেমে 'দাবী নাই' লিখিয়া দিয়াছে বলিয়া, মরণের দিনেও স্বামীর চরণ-প্রান্তে মরিবার ভাগ্যটুকুও সে হারাইয়া বসিয়াছে ! এত নিষ্ঠুর বিধাতা। সুভদ্রা ভাবিল, এত নিষ্ঠুরতা সে সহ্য করিবে না—কিছুতেই না। সে কালই আত্মপ্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুকুলের সেই আদরে ঢলঢল মুখখানা মনে পড়িয়া গেল। আর মনে পড়িল, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কায় রোগশীর্ণ পিতার মুখে একদিন যে অসহায় করুণ বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্ত্তে সুভদ্রার সঙ্কল্প খসিয়া পড়িল; সে মনে মনে বলিল—"না তা পারিব না, এ নিষ্ফল জীবনের স্রোত যেমন ইচ্ছা বহিয়া যাক্।"

এইবার হৃদয়ের উত্তেজনা বড় অভিমানে গলিয়া দুই চক্ষু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

পরদিন দেখা গেল, সুভদ্রার প্রবল জ্বর; মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

হঠাৎ সুভদ্রার প্রবল জ্বর হইয়াছে শুনিয়া মুকুল বরং খুসীই হইল। সে সুভদ্রাকে বলিল—"মামীমা থাকতে চাইছিলেন না, কিন্তু ভগবান আমাদের পক্ষে, এই দেখ না ঠিক যাবার দিনই তোমার জ্বর হল; তবু আর দু চারদিন একত্র থাকতে পারা যাবে।"

সুভদ্রা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শরীরের অসুস্থতায় বলিতে ভাল লাগিল না, শুধু রোগক্লিষ্টমুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কষ্ট হচ্ছে ?"

সুভদ্রা মুকুলের মুখপানে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া বলিল—"কষ্ট ?—না।" সুভদ্রা কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—"জ্বর কি খুব বেশী হয়েচে ?"

মুকুল হাসিয়া ফেলিল; বলিল—"বেশ জিজ্ঞেস

করেচ। জ্বর হল তোমার, আর বেশী হয়েচে কি না বলব আমি।"

"আমি কেমন বুঝতে পারচি নে, মাথার ভিতরটা কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েচে। আমার গা কি খুব গরম ?"

মুকুল বলিল—"উঃ যেন পুড়ে যাচ্ছে। তুমি কিছু বুঝতে পারচ না ?"

"এক একবার পাচ্চি।"

মুকুল জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ জ্বরটা কেন হল বল দেখি ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া সুভদ্রা বলিল—"বোধ হয় ঠাকুর এত দিনে অভাগীর কথা শুনতে পেলেন।"

মুকুল ব্যথিত স্বরে বলিল—"না ভাই, ওসব কথা বোল না, আমার বড় কষ্ট হয় শুনলে।"

সুভদ্রা বলিল, "আচ্ছা আর বলব না—কিন্তু দিদি, একটা কথা বলব, শুনবে ?"

"কি কথা ?"

"যদি এবারে সেরে উঠে কলকেতা যেতে হয়, তবে আমার শেষদিনে তোমরা দুজনে আমার দেখা দিতে যাবে।"

"আবার সেই কথা !"

সুভদ্রা মুকুলের হাতখানা নিজের জ্বরতপ্ত হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"বল, আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করবে বল।"

মুকুল ঈষৎ ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "এসব কথা বলচিস কেন ভাই ? এমন জ্বর ত সকলেরই হয়। আবার সেরেও যায়।"

"তাই ত আমার বড় ভয়, পাছে সেরে উঠি।"

"সেরে উঠলেই কি আর সত্যি সত্যি মামীমা নিয়ে যাবেন ?"

"দিদি, তোমাদের কাছে যদি মরতে পাই, তো আজীবন তোমাদের ছেড়ে থাকতে রাজী।"

মুকুল বলিল, "তুই ভাই আর জন্মে নিশ্চয়ই কেউ

"কেন দিদি, এজন্মে আপনার বলতে আপত্তি আছে ?"

মুকুল সুভদ্রার হাতখানা ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল, "তুই বড় দুষ্টু ! আমি কি তাই বলচি ?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মামী বলিলেন, "এই ওষুধটুকু খাও মা লক্ষ্মী আমার।"

সুভদ্রা অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"তুমি কে গা ?"

নিকটে মুকুল দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—"তুমি চিনতে পাচ্চ না ?—উনি যে মামীমা।"

সুভদ্রার চোখে মুখে একটা ভীতি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—"মামীমা, আমায় নিয়ে যেতে এসেচেন। আর দুটো দিন থেকে যেতে—"

মামী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "না মা, তোমায় এখন নিয়ে যাব না, ওষুধটা এনেচি খাও।"

সুভদ্রা বিস্মিত হইয়া বলিল—"ওষুধ ?"

"হাঁ মা, একটু হাঁ কর।"

"আমার অসুখ করেচে, নিয়ে যাবেন না, তা হলে ? ওষুধ দিন তবে।"

ঔষধ খাইয়া সুভদ্রা মামীর পানে করুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল—"আজ দিনটা থেকে গেলে হত না ? মরবার সময়টা একটু কাছে যেতে পাব না। চোখে দেখতে চাওয়াটা কি বড় অন্যায় হবে ?"

"কি বলচিস মা ? কাকে দেখতে চাস ?"

"ঐ যে আমাকে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল। আর আমার মুখ সেলাই করে দিলে—এ দেখ না !"

মামী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। মুকুল ম্লানমুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সুভদ্রা তাহাকে বলিল—"দিদি, বড় ঠকিয়েছি—কিছু মনে করিস নে।"

মুকুল বিষণ্ণমুখে মামীকে বলিল, "ভুল বকচে যে মামীমা !"

মামী বলিলেন, "দেবীকে একবার ডেকে আন।"

কথাটা সুভদ্রার কাণে গেল। বলিল—"দেবী কে গা ?"

মামী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া দেবকুমারকে ডাকিতে মুকুলকে সঙ্কেত করিলেন।

দেবকুমারকে দেখিয়া সুভদ্রা মামীকে বলিয়া উঠিল "উনি কেন এখানে! ওঁকে যেতে বলুন যেতে বলুন।"

দেবকুমার বলিল, "তুমি কেমন আছ দেখতে এসেচি সুভদ্রা।" দেবকুমারের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

সুভদ্রা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে গম্ভীর ভাবে বলিল, "জীবনে মানুষ ক'বার ভুল করে?"

দেবকুমার সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "দেখি হাতখানা!"

সুভদ্রা বলিল—"ডাক্তারি কর্‌বেন? হা হা, আমার রোগের ওষুধ আজও তৈরি হয় নি।"

দেবকুমার গাঢ় স্বরে বলিল, "তোমার শুশ্রূষায় মুকুল বেঁচেছে, আমি তোমাকে বাঁচাব।"

সহসা হতাশের স্বরে সুভদ্রা বলিয়া উঠিল, "তুমিও ডাক্তার বাবু আমায় এখানে মরতে দেবে না, এত নিষ্ঠুর!"

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেবকুমার দেখিল, নাড়ী বড় দুর্ব্বল, হার্টফেল করিবার খুব সম্ভাবনা। পাছে অধিক কথা বলিলে উত্তেজনা হয়, এইজন্য বলিল, "শরীর দুর্ব্বল, বেশী কথা ক'ওয়া ভাল নয়, একটু চুপ করে—"

সুভদ্রা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"চুপ করেই ত আছি।"

দেবকুমার মামীর দিকে চাহিয়া বলিল—"একেবারেই যে জ্ঞান নেই তা নয়, মাঝে মাঝে জ্ঞান হয়।"

মামী ম্লানমুখে উত্তর করিলেন, "হুঁ।" তার পর কি ভাবিয়া মুকুলকে লইয়া অন্য ঘরে গেলেন। বলিলেন, "মুকুল, অবস্থা বড় ভাল 'বোধ হচ্চে না। রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি করে নিতে বল। তুমি না হয় এদিকে একটু থাক, আমি সুভদ্রার কাছে আছি।"

মামী কিন্তু সুভদ্রার ঘরে গেলেন না। সুভদ্রা ও দেবকুমার সম্বন্ধে যে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ এতদিন তাঁহার মনের মধ্যে জাগিতেছিল, আজিকার এই অসম্বদ্ধ প্রলাপে তাহা যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এতদিন তিনি যে দুজনকে পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, আজ মৃত্যু এখন সেই দুজনের মাঝখানে চির ব্যবধান রচনা করিতে বসিল, তখন সত্যই তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, এবং চিরবিচ্ছেদের পূর্ব্বে দুইটি অতৃপ্ত হৃদয় যতক্ষণ পারে কাছাকাছি থাকে থাক, ভাবিয়া তিনি আর সে ঘরে ঢুকিলেন না। এজন্য সাধ্বীর পবিত্রতা তাঁকে ধিক্কার দিল, কিন্তু সমবেদনার অশ্রুজলে তাহা ভাসিয়া গেল।

* * * *

দেবকুমার ডাকিল, "সুভদ্রা!"

সুভদ্রা চোখ মেলিয়া দেখিল দেবকুমার একা বসিয়া। সুভদ্রার দুই চোখ দিয়া দুইটি ক্ষীণধারা গড়াইয়া পড়িল।

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় চিন্‌তে পার?"

অতৃপ্তনেত্রে স্বামীর পানে চাহিতে চাহিতে সুভদ্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হাঁ।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি আমি কে?"

সুভদ্রা অতি কষ্টে হাত বাড়াইয়া শয্যায় কি যেন খুঁজিতে লাগিল। স্বামীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

দেবকুমার ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তুমি নড়াচড়া করোনা, বড় কাহিল!"

সুভদ্রার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আর যদি সময় না পাই!" তারপর স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া অশ্রুজড়িত স্বরে কহিল—"আমায় ক্ষমা কোরো!"

দেবকুমার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ক্ষমা আমারই পাওয়া উচিত!"

সুভদ্রা স্বামীর পা দুখানা প্রাণের আবেগে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, আমি ও শুনতে চাইনে; বল ক্ষমা করলে?"

দেবকুমার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করবার দাবী যদি অপরাধীর থাকে—"

"ওগো, অতি বড় শত্রুকেও মরণ দিনে কেউ বিমুখ করে না—আর আমি তোমার—"

"থামলে কেন সুভদ্রা ?—বল বল—কি তুমি? আজ আর অন্ধকারে থাকতে চেও না।"

সুভদ্রা কাতর নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "আর কেন? থাক।"

ব্যথিত স্নেহভরে দেবকুমার পত্নীর শীর্ণ চিবুক স্পর্শ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আঁধারের শিউলি আমার, আঁধারেই ঝরে যেতে চাও?"

স্বামীর এ স্নেহের উচ্ছ্বাসে সুভদ্রার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল—তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। শেষে কেমন অস্থির হইয়া, কি করিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া স্বামীর হাতখানা সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

দেবকুমার ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"মামীমা—মামীমা!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুভদ্রা একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার কতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন বুক হইতে খালি করিয়া দিল। তার পর—তার পর—সব স্থির।

দেবকুমারের ভগ্নস্বরে মামীমা রুদ্ধশ্বাসে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া দেবকুমার পাগলের মত হইয়া বলিয়া উঠিল—"মামীমা, রইল না—রইল না—চলে গেল! একদিন তাকে বিদায় করে দিতে, বলেছিলেন, বুঝি তার মন দূর থেকে সে কথা শুনতে পেয়েছিল। আজ তাই নিজে থেকে চলে গেল মামীমা!"

দেবকুমারের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মামীমা দেবকুমারের হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "দেবী, অধীর হোসনে বাবা! আমায় আর অন্ধকারে রাখিসনে—সত্যি বল, ও কে?"

এমন সময়ে মুকুল ঘরে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। মামী সেখান হইতে সরিয়া যাইতেছিলেন, দেবকুমার তাঁহাকে নিষেধ করিল। দেবকুমার আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"মামীমা, মুকুলকে এ বাঁচাতে এসেছিল, বাঁচিয়ে দিয়ে চলে গেল।"

মুকুল সাশ্রুনয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেবকুমার পুনরায় বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল—"মামীমা, এই সতী সাধ্বীর উপর মনে মনে তুমি যে সন্দেহ করেছিলে, সেটুকু মন থেকে মুছে ফেল। কাশীতে সুভদ্রাকে আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করেছিলাম। আর সব কথা পরে বলবো—আগে পুড়িয়ে আসি।"—বলিয়া দেবকুমার সুভদ্রার শবদেহকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

সমাপ্ত।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বিশ্ব-প্রেম

দেখা তো পাবো না—তাই
নীল নবঘন মেঘেরে হৃদয়ে
জড়ায়ে ধরিতে চাই!
নয়নে নয়ন না পারি রাখিতে—
পদ্ম পলাশে প্রিয়
অধরে ছোঁয়াই—ভাবি তারে এই
তব আঁখি রমণীয়,
রাঙা কিংশুকে, নব কিশলয়ে
চরণের রাগ;
মানবের মুখে সব—সুখে দুখে—
পাই তব অনুরাগ!
এমনি করিয়া তোমার বলিয়া
জগতেরে বাসি ভালো;
কায়াতে মেলে না—তাই ছায়া রূপে
জীবন করেছি আলো।

শ্রীলীলা দেবী।

বিভিন্নদেশীয় বিবাহ প্রথা

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক প্রথা, আচার, ব্যবহার ও রীতিনীতির মধ্যে একটা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা আজ এসিয়া মাইনর, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার অধিবাসিগণের কথাই বলিব।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পৃথিবীর মধ্যে এই ভূখণ্ডই প্রাচীন ও মধ্য যুগের জাতি সমূহের প্রধান ক্রীড়াভূমি ছিল। সুতরাং এখানে আজও নানা জাতির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই দেশের অধিবাসীরা ইহুদী, মোসলমান এবং খৃষ্টান এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন ইয়েজেডিস্, ড্রুস (Druse) প্রভৃতি আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আছে। জাতি ও বাসস্থান ভেদে ইহাদের আচার ব্যবহারেরও প্রভেদ আছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথাও বিভিন্ন, কিন্তু কেবল একটি বিষয়ে ইহাদের সকলের মধ্যে একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে যৌতুক লইয়াই বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। যৌতুকই বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

ইহুদীদিগের মধ্যে কন্যার পিতা মাতা এই যৌতুক প্রদান করিয়া থাকেন। যদি পরবর্ত্তী বা ভবিষ্যজ্জীবনে কখনও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনাও না হয়, এবং স্বামী বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তবে তখন সেই যৌতুক ফিরাইয়া দিতে হয়। অনেকস্থলে এতদিন পরে যৌতুক ফিরাইয়া দেওয়া কষ্টসাধ্য হয় এবং সেই জন্যই ইহা বিবাহচ্ছেদ ব্যাপারে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের বিবাহের আইন কানুন বা বিধি ব্যবস্থা সকলের পক্ষে একরূপ নয়। পণ্ডিতগণ প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্য তাহাদের সভ্যতানুযায়ী প্রত্যেকের উপযোগী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা যখন বিবাহের চুক্তিপত্র সহি করে, তখনই উক্ত পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে একখানা "তালাক" পত্রের কাগজ ক্রয় করিয়া লইতে পারে। যে স্বামীর নিকট ঐরূপ কাগজ থাকে, সে স্ত্রীর উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে পারে এবং ইচ্ছামত তাহার শাসনাধীন থাকিতে স্ত্রীকে বাধ্য করিতে পারে। যদি কেহ বুঝিতে পারে যে তাহার স্ত্রী মনোমত হয় নাই, তাহা হইলে সে অতি সামান্য কারণে সহজেই—এমন কি খাদ্যদ্রব্য ভালরূপ রন্ধন করা হয় নাই এই অজুহাতেই—স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিতের নিকট হইতে "তালাক" পত্রের যে কাগজখানা সে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল, সেইখানা স্ত্রীর হাতে দিয়া অনায়াসে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারে। কিন্তু যৌতুকের দ্রব্যসামগ্রী ফিরাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত শুধু ইহাতেই বিবাহ বন্ধন আইনানুসারে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় না। তবে স্ত্রী যদি এমন কোন পাপ কার্য্য করে, যাহাতে তাহাদের উপর কোন কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারে, তাহা হইলে যৌতুক ফিরাইয়া না দিয়াও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে, কোন আপত্তি থাকে না।

ইহাদের মধ্যে কোন যুবকের অবিবাহিত থাকা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। এবং যে স্থলে কন্যাপক্ষ হইতে যৌতুক দেওয়ার প্রথা আছে, সে স্থলে দরিদ্রতা বিবাহ না হওয়ার পক্ষে একটা কারণ বলিয়া প্রদর্শিত হইতে পারে না।

কোন পরিবারের কন্যা অবিবাহিতা থাকা সমূহ অপমান ও লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্যই যদি কোন অনাথা বিধবার গৃহে অবিবাহিতা কন্যা থাকে, এবং কন্যার বিবাহ দিয়া এই অপমান ও লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ ও উদ্ধার পাইবার জন্য

সঙ্গতি বা উপায় না থাকে, তাহা হইলে সে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট যৌতুক সংগ্রহ করিবার জন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে বাগ্‌দান ক্রিয়া সম্পাদন জন্য একটি দিন ধার্য্য করা হয়। সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে বর ও কন্যা তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহ একত্র মিলিত হয়, এবং সেখানে বিবাহের চুক্তিপত্র লিখিবার জন্য একজন লেখক ও কখন কখন একজন পুরোহিতও উপস্থিত থাকেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে বরের পিতা ও কন্যার পিতা পরস্পর করমর্দ্দন করেন। এই করমর্দ্দনের সময়ে সাক্ষীস্বরূপ এমন কয়েকজন লোক উপস্থিত থাকেন যাঁহারা কোন পক্ষের সহিত কোনরূপ সম্পর্কিত নহেন। তার পর উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই বিবাহ প্রস্তাবে তাঁহাদের মত আছে কি না। যদি মত আছে বলিয়া উভয় পক্ষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে পাত্র তখন এক গেলাস মদ হাতে তুলিয়া লইয়া বলে, "হে প্রভো, তোমার মঙ্গলময় বিধানে আজ আমরা পবিত্র হইলাম, তোমার জয় হউক।" এইরূপে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবার পর সে একটুখানি মদ্য পান করিয়া গেলাসটি পাত্রীর হাতে তুলিয়া দেয়। ঠিক এই সময়ে কতকগুলি মৃৎপাত্র অথবা কাঁচের গেলাস আনিয়া মেঝের উপর আছড়িয়া ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার করা হয়, আর সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন "সৌভাগ্য, সৌভাগ্য!" এইরূপ কার্য্যদ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, যেমন এই ভগ্ন টুকরাগুলি আর কখনও জোড়া লাগিবে না, তেমনই এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ যুবক যুবতীর মধ্যে কোনদিন কখনও বিচ্ছেদ ঘটিবে না। আর ইহাও বিশ্বাস করে যে ভগ্ন টুকরা গুলির সংখ্যা যত অধিক হইবে, নবদম্পতীর সুখশান্তি ও সম্পদ তত বৃদ্ধি পাইবে। এইবার বাগ্‌দানে আবদ্ধ যুবক ও যুবতী তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে দুইটি ভগ্ন টুকরা পরস্পর গ্রহণ করে। ইহুদীদিগের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই টুকরাগুলি অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত রক্ষিত হয়। এবং এই বিবাহিত যুগলের যে কোন একজনের মৃত্যু ঘটিলে তাহার চোখের উপর ঐ টুকরাগুলি স্থাপন করা হয়। বিবাহের সময়ে উপহারাদি দেওয়ার প্রথা আছে, এবং এই উপলক্ষ্যে একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। পাছে কোন যাদুকর তাহার মন্ত্রশক্তিদ্বারা উহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করে, সেই ভয়ে বিবাহের পূর্ব্বে আটদিন পর্য্যন্ত বাগ্‌দানে আবদ্ধ যুবক যুবতীর কেহই আপন আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যায় না।

বাড়ীর বৃহৎ "হল" ঘরেই সাধারণতঃ বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে পাত্রের বন্ধু বান্ধবগণ তাহাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যায়। সেখানে বাইবেলের "আদিগ্রন্থে"র প্রথম অংশ পাঠ করা হয়। তার পর অপরাহ্ণে অথবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত বর ও কন্যা তাহাদের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও অতিথি অভ্যাগত সকলের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়, এবং সেখানে তাহাদের বিবাহের চুক্তিপত্র দেখাইতে হয়। পরে বর ও কন্যাকে পাশা পাশি দাঁড় করাইয়া উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কন্যার পিতামাতার হস্তস্থিত পাত্র হইতে কিছু শস্য লইয়া উহাদের উপরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে থাকে, "তোমরা ফললাভ কর ও তোমাদের বংশবৃদ্ধি হউক, তোমরা শান্তিলাভ কর।" তার পর তাহাদের মাথার উপরে একটি সুসজ্জিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট চাঁদোয়া খাটাইয়া দেওয়া হয়। এই চাঁদোয়াটির চারিকোণে চারিটি দণ্ড লাগানো থাকে এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সেই চারিটি দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। এইবার পাত্রীকে পাত্রের চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করান হয়, তার পর পাত্র পাত্রীকে হাত ধরিয়া চাঁদোয়ার চারিধারে ঘুরাইয়া লইয়া যায়, আর তখন নিমন্ত্রিতগণ অথবা তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ তাহাদের উপর শস্য নিক্ষেপ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত আশীর্ব্বচনেরই পুনরুক্তি করে।

অতঃপর পুরোহিত তাহাদের দুইজনের হাত ধরিয়া

একত্র মিলন করিয়া দিয়া, একখানা ওড়না অথবা শাল দ্বারা তাহাদের উভয়ের মস্তক আবৃত করিয়া দেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পুরোহিত এক গেলাস মদ্য লইয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া বর ও কন্যাকে কিছু মদ্য প্রদান করেন। বর কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের অঙ্গুরিটি কোন নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করে, এবং উহা বিশুদ্ধ স্বর্ণ নির্ম্মিত বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সে তখন উহা কন্যার তর্জ্জনীতে পরাইতে পরাইতে বলে "দেখ, এই অঙ্গুরী দ্বারা মোজেস ও ইজরাইলের বিধান মতে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইল।" ইহার পর বিবাহের চুক্তিপত্র পাঠ করা হইলে বর ও কন্যাকে শেষে আশীর্ব্বাদ করিয়া আবার মদ্য পান করা ও গেলাস ভাঙ্গা হয়। বিবাহের অঙ্গুরিটি সাধারণতঃ হস্তাকৃতি করিয়া গঠন করা হয়। এবং উহাতে হিব্রুভাষায় "সৌভাগ্য" কথাটি খোদিত থাকে।

এই সকল উৎসবের সময় গানের দল ভাড়া করিয়া আনা হয়। এবং সন্ধ্যাবেলাটা গান, বাজনা ও নাচ প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়।

এই ত গেল ইহুদীদিগের বিবাহ কথা। মোসলমানদিগের বিবাহ প্রথা আবার অন্যরূপ। এখানকার মোসলমান কৃষকদিগের মধ্যে সকলেই অল্প বয়সে বিবাহ করে। প্রত্যেক বালিকাই জানে যে এক দিন না একদিন তাহাকে পাত্রী বা বধূ সাজিতেই হইবে। এবং সেই জন্য সে সেলাইয়ের কার্য্য শিখিয়াই সেই উৎসবের দিনের জন্য সূচীশিল্প সমন্বিত নয়ন-মুগ্ধকর একটি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। সচরাচর উহা লোকের সাংসারিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে, বয়সের উপর নয়। ভবিষ্যতে দারিদ্র্যজনিত বাধা অতিক্রম করিবার উপায়ের সম্ভাবনা থাকিলেও দরিদ্রাবস্থায় লোকেরা অল্প বয়সে বিবাহ করিতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, যদি কোন যুবকের অবিবাহিত ভগিনী থাকে, তবে সে অন্য কোন যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া নিজে তৎ পরিবর্ত্তে (আমাদের বাঙ্গালা দেশেও এরূপ প্রথা আছে) উক্ত যুবকের ভগিনীকে বিবাহ করে। এরূপ স্থলে উভয় বিবাহই একই দিনে সম্পন্ন করিতে হয় এবং তাহাতেও একটি মাত্র ভোজ দিলেই চলে।

ইহুদীদিগের মত ইহাদেরও বিবাহের প্রধান অঙ্গ যৌতুক। নিতান্ত গরীবের ঘরে কন্যার মূল্য স্বরূপ এই এই যৌতুক আদায় করিয়া পিতা তাহা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করেন, কন্যার জন্য কোন প্রকার ভাবী সংস্থানের উপায় করিয়া রাখা হয় না। ইহারা কন্যাকে অতিশয় মূল্যবান ও আবশ্যক বস্তু বলিয়া মনে করে এবং কন্যার জন্মে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির আয় নিতান্ত অল্প, সে যাহা উপার্জ্জন করে গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয়েই তাহা ফুরাইয়া যায়, এক কপর্দ্দকও সে সঞ্চয় করিতে পারে না। সুতরাং বিবাহের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সে কখনও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু হয়ত সে তাহার কোন বন্ধু-কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। এরূপ অবস্থায় সে যৌতুকের দেয় টাকা কিস্তিবন্দী হিসাবে দিতে স্বীকার করে। এই টাকাটা কন্যার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় সম্পূর্ণ শোধ করিতে হয়। এক সময়ে একটি লোক ঐরূপ সর্ত্তে বিবাহ ঠিক করিয়া, পাত্রীর ছয় বৎসর বয়স হইতে প্রতি মাসে ৩ শিলিং ৪ পেন্স হিসাবে শোধ করিতে আরম্ভ করে। তার পর সেই বালিকার পিতা একবার গুরুতর রূপে পীড়িত হইলে সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল, কারণ যদি তার ভাবী শ্বশুর এবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে কন্যার ভ্রাতা তখন অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইবে এবং তখন তাহাকে আবার নূতন করিয়া কিস্তিবন্দীর টাকা দিতে হইবে।

বাগ্‌দানের পর, বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নানারূপ আমোদ প্রমোদ হয়। গ্রামে শস্য ছড়াইবার জন্য

যে বৃহৎ প্রাঙ্গণ থাকে, সেখানে অথবা বাড়ীর উঠানে খোলা জায়গায় প্রতিরাত্রে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সমবেত হইয়া নানা কৌতুকপূর্ণ বাক্য দ্বারা ও নৃত্যাদিতে মত্ত হইয়া প্রচুর আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করে। এক প্রকার নাচ হয়, তাহাকে "ভালুকনাচ" বলে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইহাতে যোগদান করে। একজন পুরুষ ভালুক সাজিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে অবস্থিত রমণী-মণ্ডলের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শূকরের ন্যায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিতে থাকে। তখন সজোরে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠে, আর সেই কৃত্রিম ভালুক তালে তালে পা ফেলিয়া রমণীমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয় এবং রমণীগণও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ধ্বনি করিয়া হাত তালি দিতে থাকে। এইরূপ অদ্ভুত নৃত্যদ্বারা ইহাই বুঝানো হয় যে ভালুকটি গ্রামে আসিয়া কন্যা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আর গ্রামের স্ত্রীলোকরা তাহার সেই কার্য্যে বাধা প্রদান করিল।

ইহাদের মধ্যে পুরুষেরাও সকলে মিলিয়া আর এক প্রকার নৃত্য করে, তাহাকে তাহাকে তরবারি নৃত্য বা তলোয়ার খেলা বলে। ইহাতে কতকগুলি পুরুষ তরবারি হস্তে নানাপ্রকার হাস্যোদ্দীপক ও বিকট ভঙ্গী



তরবারি-নৃত্য

দেখাইয়া ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে। এই প্রকার নাচের উদ্দেশ্য শুধু আমোদ করা নয়। উহারা বিশ্বাস করে যে এইরূপ তরবারি চালনা দ্বারা ভূত পেত্নী দিগকে ভয় দেখাইয়া বিতাড়িত করা হয়, এবং তাহারা বরকন্যার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না।

পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন করে। পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় তাহাকে একটি ওড়না দ্বারা আবৃত করিয়া সুসজ্জিত একটি উট বা অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করা হয়। এ সব দেশ পাহাড়ে পরিপূর্ণ এবং গ্রামগুলি এক একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাত্রের গ্রাম যে পাহাড়ে অবস্থিত, পাত্রীপক্ষের শোভাযাত্রা আস্তে আস্তে সেই



বিবাহের শোভাযাত্রা

পাত্রের অবস্থা ও পদমর্য্যাদা অনুসারে বিবাহে বহু সংখ্যক লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। একবার একটি বিবাহ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের একবেলা আহারের জন্য ১৬২টি মেষ হত্যা করা হইয়াছিল। ইহাতে বিবাহের নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা কত অধিক হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিবাহোৎসবের দিন প্রাতঃকালে বহুসংখ্যক যুবক একত্র হইয়া বাদ্য (ব্যাণ্ড) সহ শোভাযাত্রা করিয়া পাত্রীকে তাহার

পাহাড়ের চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে থাকে; আর এদিকে উৎসবের আমোদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ করা হয়; সমবেত ব্যক্তিগণ উচ্চধ্বনি করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজানো হয়।

তারপর পাত্রী এই জনতার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে। এইখানে সে তাহার

স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিয়া দিন অতিবাহিত করে, আর পাত্র ততক্ষণ অতিথি অভ্যাগতদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার পুরুষত্ব-ব্যঞ্জক ক্রীড়া ও কৌশলাদি প্রদর্শনে ব্যাপৃত অভ্যার্থনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ভোজনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের সম্মুখস্থিত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গেলে যখন বুঝা যায় সকলেরই উদর পূর্ত্তি হইয়াছে, কাহারও আর কিছু আহার করিবার শক্তি নাই, তখন



গ্রাম্য বিবাহ-সভা।

থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একটা ভোজের আয়োজন হয় এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহারের জন্য প্রস্তুত হন। তখন পাত্র একটি উচ্চস্থানে উপবেশন করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করে, আর কর্ম্মকর্ত্তা অন্যান্য লোকের সাহায্যে নিমন্ত্রিতদিগের পর্য্যবেক্ষণ ও আদর সকলের নিকট হইতে উপহার ও লৌকিকতা সংগ্রহ করা হয়। নিমন্ত্রিত হইলে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উপহার দেওয়া উহাদের সামাজিক প্রথা, এবং সে বাবদে কোন জিনিষ না দিয়া নগদ টাকাই দেওয়া হয়। উপহার সংগ্রহ করিবার সময়ে উপহার-দাতার বদান্যতার

উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিবার পর এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে তাহার নাম ও যত টাকা আদায় হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া ঘোষণা ও তাহার পরিবারবর্গের উদ্দেশে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করে। এইরূপে সকলের নিকট হইতে উপহার সংগ্রহ করা হইলে কর্ম্মকর্তা সে সংবাদ পাত্রকে জ্ঞাপন করেন। সে তখন উঠিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। সে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র ঢাক বাজাইয়া এবং বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তার আগমন ঘোষণা করা হয়, আর এদিকে কুমারীগণ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হস্তে পাত্রের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। গ্রামে উৎসব উপলক্ষে কোন বাড়ীই আলোকমালায় সজ্জিত করা হয় না, সেই জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রদীপ ও অতিরিক্ত পরিমাণে তৈল লইয়া আসে, কারণ পাত্র কখন আসিবে, কতক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। সে কখন আসিবে না আসিবে তাহা নিমন্ত্রিতের সংখ্যার উপর নির্ভর করে; সংখ্যা বেশী হইলে উপহার সংগ্রহ করিতে সময়ও বেশী লাগে। সুতরাং পাত্রেরও আসিতে বিলম্ব হয়। যদি বাহিরের লোকে আলো লইয়া না আসে তাহা হইলে বিবাহবাড়ী এমন অন্ধকার থাকে যে সেখানে কোন উৎসব ক্রিয়া হইতেছে কি না বুঝা যায় না এবং ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদও উপভোগ হয় না।

সাধারণতঃ প্রত্যেক কৃষকের গৃহে একটি ছোট মৃৎপাত্রে তৈল ও সলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালা হয়। এই রূপ প্রদীপের আলো খুব উজ্জ্বল হয় না। সূর্য্যাস্তের পর যখন বাহিরের চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন গৃহমধ্যস্থ প্রদীপের এই ক্ষীণ আলোকে মাত্র ইহা বুঝিতে পারা যায় যে এই কুটীরে কোন লোক বাস করে। নিদ্রার সময়ে একটি মাত্র আলোক তৈলটুকু নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকে। গৃহের অভ্যন্তরভাগ রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্যই শুধু ব্যবহৃত হয়। যত উৎসব সমস্তই খোলা জায়গায় দিনের আলোকেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হইয়া আসিলেই উৎসব শেষ হইয়া যায়। তখন সকলেই বিশ্রামের জন্য স্ব স্ব গৃহে গমন করে। কিন্তু বিবাহ উৎসবে কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। তখন নিমন্ত্রিতদিগের অভ্যর্থনা আমোদ প্রমোদ ও আহারাদির জন্য বিস্তৃত প্রাঙ্গণে লণ্ঠন ব্যবহার করা হয় এবং গৃহের অভ্যন্তরেও আগন্তুকদিগের সুবিধার নিমিত্ত প্রদীপ জ্বালানো হয়। বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত প্রত্যেকেই যথাযোগ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আসে। এই সময়ে সকলেই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মূল্যবান পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের যাহা কিছু সামান্য অলঙ্কারাদি আছে তাহা ব্যবহার করে।

গ্রাম্য বিবাহে উৎসবস্থলে কর্ম্মকর্তা একখানি তরোয়াল হস্তে দণ্ডায়মান থাকেন, আর পাত্র বিবাহের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কর্ম্মকর্তার দক্ষিণ দিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এদিকে আবার তাঁহাদের পশ্চাতে গোলাকার হইয়া একদল যুবক হাততালি দিয়া নাচিতে থাকে।

এদেশে মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণের অনেকেই একাধিক বিবাহ করে। কিন্তু ড্রুস নামক জাতির মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারা প্রত্যেকেই একটি মাত্র বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এবং স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। যুবকেরা সাধারণতঃ আঠারো বৎসর বয়সে ও বালিকারা চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ করে। বিবাহ উৎসবের জন্য অবধারিত দিবসের তিন দিন পূর্ব্বে পাত্র অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক দল সমবয়স্ক যুবক সঙ্গে লইয়া, যোদ্ধার বেশে পাত্রীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং পাত্রীর পিতার নিকট হইতে তাহাকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে দাবী করিয়া আনিতে চায়। পাত্রীর পিতাও সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিজের বাড়ীর সিঁড়ির কাছে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া

থাকেন এবং সেইখানে দাড়াইয়া বিবাহের চুক্তিপত্রে লিখিত সর্ত্তগুলিতে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এইবার যৌতুকের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাত্রীর নামে তাহা রাখিয়া দেওয়া হয়। পাত্রী অল্পক্ষণের জন্য মুখ আবৃত করিয়া তাহার জননী এবং স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজনের সহিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন কন্যার সমস্ত ভার মাতার উপর ন্যস্ত থাকে, এবং তিনি নিজ কন্যার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেন।

যুবক তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত ও প্রস্তুত কি না?" উত্তরে বালিকা বলে, "আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।" এই বলিয়া সে যুবককে তার স্বহস্তে প্রস্তুত পশমের কাব-করা খুব বড় একখানা রুমালে ঢাকা সিরিয়া দেশীয় একটি সুন্দর ছোরা উপহার দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বামী তাহাকে সকল প্রকার আপদ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং সে



তাতুর।

যদি তাহার কুমারী-জীবনে কোন অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, ভবিষ্যতে এরূপ প্রকাশ পায়, অথবা সে কখনও বিবাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কিংবা স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করে, তবে এই অস্ত্রের সাহায্যে স্বামী তাহার সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন।

ইহার পর উভয় পক্ষই গৃহে প্রবেশ করে। কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রী স্নানাগারে চলিয়া যায় এবং সেখানে সহচরীদিগের সহিত সারাদিন অতিবাহিত করে। এদিকে যুবকের দল অশ্বারোহণে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়ায় ও তাহাদের প্রিয় ক্রীড়াদিতে ব্যাপৃত থাকে। বৃদ্ধ বা অপেক্ষাকৃত বয়স্কেরা কন্যার পিতার গৃহে বসিয়া ধূমপান ও কাফিপান করে।

বিবাহের রাত্রিতে একদল স্ত্রীলোক পাত্রকে বিবাহ গৃহে লইয়া যায়। সেখানে পাত্রী সুবর্ণখচিত একটা আবরণে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। পাত্র সেই আবরণ মুক্ত করিয়া তাহাকে "তাঁতুর" নামক এক প্রকার অদ্ভুত রকমের একখানি অলঙ্কার উপহার দিয়া উহা তাহার মাথায় পরাইয়া দেয়। এই অলঙ্কারটি তাহার সারা জীবনই মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিবার কথা। যে মুহূর্ত্তে তার আবরণ উন্মোচন করা হয়, তৎক্ষণাৎ সঙ্গী সাথীরা অদ্ভুত স্বরে চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া গৃহান্তরে পলায়ন করে এবং সেখানেও কিয়ৎকাল তেমনই চেচামিচি করিতে থাকে।

বিবাহের সময়ে "তাঁতুর" এখনও ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বপ্রথামত এখন অনেকেই সারাজীবন উহা ব্যবহার করে না। "তাঁতুর" বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের একপ্রকার শিরোভূষণ। ইহার গঠন প্রণালী অদ্ভুত রকমের। ইহা অবস্থাভেদে ব্যবহৃত রৌপ্য বা টিন দ্বারা প্রস্তুত একটি নল বিশেষ। ইহার একপ্রান্ত মোটা এবং অপর প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সরু। সরু মুখের পরিধি অর্দ্ধ ইঞ্চি ও মোটা দিকের পরিধি তিন ইঞ্চি। এই এই মোটাদিকের মুখটা দেখিতে ঠিক ঢাকের তলার মত। এই অলঙ্কার বিবাহিতা রমণীগণের একটী বিশিষ্ট চিহ্ন। ইহা কুমারীদিগকে কখনও ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। যদিও দুই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুমারীদিগকে ইহা পরিধান করিতে দেখা যায়; কিন্তু সেখানেও তাহারা এমনই ভাবে উহা পরিধান করে, যে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা কুমারী, কিম্বা বিবাহিতা। তাঁতুরের ব্যবহার বা পরিধান প্রণালী এইরূপ। ইহার মোটা দিকটা একটি রেশম নির্ম্মিত গদির উপর স্থাপিত করিয়া মাথার উপর বসাইয়া, দুইটি লম্বা রেশমের দড়ি দিয়া মাথার সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, আর উহার সরু প্রান্তটি সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকায় উহা যেন আত্মরক্ষার একটি অস্ত্রস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। বন্ধন রজ্জু দুইটি এত দীর্ঘ থাকে যে, তাঁতুরটি মাথার সঙ্গে বাঁধিয়াও উহাদের দুইটি প্রান্ত ঝুলিয়া প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করে। এই লম্বিত প্রান্তদ্বয় রৌপ্য দ্বারা বাঁধান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক ভিন্ন ভিন্ন ধরণে উহা পরিধান করে। এবং যাহারা উহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি অবগত আছে, তাহারা দেখিলেই বুঝিতে পারে, কোন রমণীর কোন গ্রামে বাস। ইহা ব্যবহার করিতে তাহারা ক্রমে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময়েও খুলিয়া রাখে না। কিন্তু আজকাল ইহার ব্যবহার একরূপ উঠিয়া যাইতেছে। এখন প্রত্যেক ড্রুস পরিবারে এক একটি তাঁতুর কেবল বিবাহের সময়েই ব্যবহারের জন্য রাখা হয়।

মোসলমান সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহাদের মধ্যেও পুরুষগণ অন্য একটা ঘরে অথবা খোলা প্রাঙ্গণে তরবারি হস্তে নানাভঙ্গী করিয়া নৃত্য করে, এবং ইহারাও বিশ্বাস করে যে এইরূপ তরবারি পরিচালন দ্বারা তাহারা নবদম্পতীর ভবিষ্যৎ জীবন ভূত প্রেতাদির হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য নিরাপদ করিয়া রাখিতেছে। প্রত্যেক ড্রুসেরই তাহার স্ত্রীর উপর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এমন কি কেবল একটি মুখের কথায় দ্বারা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর সে তাহার এই অবাধ

স্বমতার প্রয়োগ করে না। বিশেষ কোনও গুরুতর কারণ না ঘটিলে কেহ স্ত্রীকে অত সহজে ত্যাগ করে না। যদি কোন স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হয়, তবে সে স্থলে মৃত্যুই তাহার একমাত্র শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে স্বামী কোনরূপ শাস্তি প্রদান না করিয়া, সে স্ত্রীকে বিবাহের সময়ে প্রদত্ত ছোরাসহ তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। সেখানে তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে শাস্তি প্রদান করে, কারণ তাহার দুশ্চরিত্রতাজনিত কলঙ্কের জন্য স্বামীর সম্মানের কোন হানি হয় না, যাহা কিছু নিন্দা অপবাদ ও কলঙ্ক সব তাহার পিতৃকুলেই বর্ত্তায়। কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, বংশের দোষেই স্ত্রীলোকেরা এরূপ স্খলিতচরিত্রা হয়। কিন্তু এই সকল কঠোর প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, এবং চরিত্রদোষের জন্য প্রায়ই কোন স্ত্রীলোককে আর প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয় না। সুখের বিষয়, এরূপ অনেক প্রথারই আজকাল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হইতেছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

সন্ন্যাসী

(গল্প)

২

ধান্যরোপণের সময় মৌংপে সপরিবারে স্বগৃহে পৌঁছিলেন। বিনাড়ম্বরে মৌংপে ক্ষেত্রের কর্ম্মে ব্রতী হইলেন এবং পত্নী গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। মৌংপে মনে করিলেন, "এত সুখী ত আমি কোনদিন ছিলাম না। চাষবাস করিয়া যে জীবনধারণ করে সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। চাকুরী ছাড়িয়া আমি স্বগৃহে আসিয়া কৃষিকর্ম্মে ব্রতী হইয়া খুব সুখী হইয়াছি।" মৌংপে যদি স্ত্রীর বিষন্ন বদন না দেখিতেন, তবে আরও সুখী হইতেন। দিন দিন তাঁর স্ত্রী কিন্তু অধিকতর বিষন্না হইতেছিলেন। কিন্তু যখন স্বহস্তরোপিত ধান্যগুলি ফলে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তখন যেন মৌংপে আর স্ত্রীর কাতর বদনে ক্ষুণ্ণ হইতেন না। তিনি বিবেচনা করিতেন, "কি সুন্দর! কি পবিত্র! এক্ষণে আমি নিরাপদ হইয়াছি।"

কিন্তু তথাপি মৌংপে সুদীর্ঘকাল এরূপ সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে সুবৃষ্টি হইল না—রৌদ্রে তাঁহার সাধের ধানগুলি শুকাইয়া গেল। যৎসামান্য ধান্য যাহা পাইলেন তাহাতে আর দিন চলিল না। সুখের দিনের অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহা একটী একটি করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের ক্লেশের সীমা রহিল না। তাহার উপর দেশে নিদারুণ জ্বর দেখা দিল। মৌংপে এবং তাঁহার পত্নী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজেরা অনাহারে থাকিয়া জ্বরে ভুগিয়া, পুত্রকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন।

কিন্তু একদিন প্রাতঃকালে পুত্র আহার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার জ্বর হইল; রাত্রিতে মনে হইল সে আর বাঁচিবে না। মাতা উদ্বেগে নৈরাশ্যে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার আর সম্বল ছিল না। মৌংপে বালকের অবস্থা দৃষ্টে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন। উভয়েই জানিতেন যে বড় ভীষণ জ্বর—রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই—এ জ্বরে অনেক সময়ে একদিনেই প্রাণ বহির্গত হয়। ঔষধ রীতিমত দিলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক চিকিৎসা করিলে হয়ত বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু চিকিৎসক বা ঔষধ কোথা

হইতে আইসে? যাহাদের উদরান্নেরই সংস্থান হয় না, তাহাদের পক্ষে এ সকল সংগ্রহের ক্ষমতা কোথায়?

কিন্তু মায়ের প্রাণ ত! তাই মা আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—"হায়, যদি একজন চিকিৎসক পাইতাম! কিন্তু টাকা কোথায়? আমাদের ঘরে যে একটি পয়সাও নাই।"

মৌংপে কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার পত্নী আবার বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি এ জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগ করে। সহরের ডাক্তারেরা কেবল কুইনাইন দেয়।"

মৌংপে বলিলেন—"দেখি আমি কুইনাইন পাই কি না।"

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কুইনাইন তুমি কোথায় পাইবে? পয়সা কোথায়? তুমি যে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছ! পৃথিবীতে আমাদের ত কোন বন্ধুবান্ধবও নাই।"

মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। মৌংপে বলিলেন—"দেখি, ভিক্ষা করিয়া কিছু পাই কি না।" মৌংপের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল—কিন্তু, তিনি ইহা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে কয়েক মাত্রা কুইনাইন না পাইলে তাঁহার পুত্রের দেহান্ত ঘটিবে! কিন্তু টাকা কোথায় পাইবেন? কুইনাইনের মূল্য কি প্রকারে দিবেন? তিনি গৃহ হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু যতই তাঁহার টাকার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে তিনি সহরে পৌঁছিলেন।

কি করিবেন? তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতগণের নিকট সিকিটা, দুয়ানিটা ভিক্ষা করিবেন? অসম্ভব। মৌংপে—যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—তিনি বন্ধুবান্ধবগণের নিকট ভিক্ষা করিবেন? তাহা ত হইতে পারে না! তবে? তিনি রাস্তায় ভিক্ষা করিবেন—পরিচয় দিবেন না। যাহাতে লোকে তাঁহাকে না চিনিতে পারে, তজ্জন্য তিনি উত্তরীয় দ্বারা মুখের খানিকটা ঢাকিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে অন্যান্য ভিক্ষুকের ন্যায় উপবেশন করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি যেন নিশ্চিন্ত রহিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই চিন্তা করিতে লাগিলেন—"পুত্রের জন্য দুই চারি আনা আমাকে ভিক্ষা করিতে হইতেছে। কেন? আমার জীবনে নিশ্চয়ই কোন ভুল হইয়াছে। আমি যদি দান কম করিতাম, পদত্যাগ না করিতাম, তবে আমার এই দুর্ভোগ হইত না। কিন্তু তাহা হইলে আমার নিজের পরকালের কার্য্য করা হইত না। স্ত্রী ও পুত্রকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইবে বলিয়া কি পরকালের চিন্তা করা অনুচিত? তথাপি স্ত্রী পুত্রকে ভরণপোষণ করা কর্ত্তব্য।"

মৌংপে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে কেহ যেন তাঁহার বুকের উপর অনেকগুলি প্রস্তর উঠাইয়া দিয়াছে। তিনি নিষ্কৃতির উপায় দেখিতেছিলেন না। তিনি যে কি জন্য মন্দিরের দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন তাহা বিস্মৃত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রসারিত হস্তে কি যেন পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। হস্তে একটি তাম্রমুদ্রা পড়িয়াছে। তিনি দেখিলেন যে ধনবতী এক রমণী মন্দির পার্শ্বে উপবিষ্টা সকল ভিক্ষুককেই দান করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, এই দয়াবতী মহিলার নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করি, তিনি আরও দিবেন। কিন্তু এক অদ্ভুত সঙ্কোচ তাঁহার হৃদয় রুদ্ধ করিল। "কেমন করিয়া ভিক্ষা করিব? আমি ত ভিক্ষা করিতে শিখি নাই! যাহা হউক, এ রমণী ফিরিয়া আসুন; সকল কথা বলিলে, তাঁহার দয়া হইবে।" কিন্তু এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তবুও সেই দয়াবতী মহিলা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অবশেষে মৌংপে মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিলেন—সেখানেও তিনি নাই। তিনি মন্দিরের অপর দ্বারের সিঁড়ি দিয়া মন্দির পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মৌংপে পূর্ব্বে যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু আশা নাই। এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি

যেন চক্ষুর সম্মুখে তাঁর মৃত পুত্রকে, রোরুদ্যমানা পত্নীকে দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন? কোথায় যাইবেন? হতাশ ভাবে তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার নিকটস্থ অন্য একটি ভিক্ষুকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এ ভিক্ষুক বৃদ্ধ।

ভিক্ষুক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে ত আর কোন দিন ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই! তুমি পূর্ব্বে কোথায় বসিতে?"

মৌংপে স্বল্প কথায় জবাব দিলেন, "কোন খানে নয়।"

"অবশ্য তুমি এখানে না হয় অন্যখানে বসিতে?"

মৌংপে মাথা নত করিয়া বলিলেন, "না।" ভিক্ষুক যেন বুঝিয়া বলিল, "ওঃ, তুমি নূতন আরম্ভ করিয়াছ, বুঝিয়াছি। দেখ, সকল ব্যবসার অপেক্ষা এই ব্যবসায়ের প্রারম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।"

"তোমরা কি ভিক্ষাকেও ব্যবসা বল?"

মৌংপে কি বলিতেছিলেন তাহা তাঁহার ঠিক ছিল না; তিনি যে যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, সেই যাতনা কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্যই তিনি অপর ভিক্ষুকের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! ইহা ব্যবসা নয় ত কি? ভিক্ষাবৃত্তি শিখিতে হয়।"

মৌংপে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভিক্ষুক বলিতে লাগিল, "দশ বার বৎসর পূর্ব্বে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন কি প্রকারে ভিক্ষা করিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম, যতই চাহিব, তত বেশী পাইব। পীড়িতা পত্নী ও নিজের উদরান্নের সংস্থান ভিক্ষাদ্বারাই করিতে হইত। আমি নিজেও পীড়িত ছিলাম, কায করিতে অশক্ত ছিলাম। আমি ভিক্ষা করিতে জানিতাম না। স্ত্রী অনাহারে মারা গেল। সহরে এইরূপই হইয়া থাকে। তবে পল্লীগ্রামে এরূপ হয় না। সকলকেই অবশ্য মরিতে হইবে, তাই সে মরিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের কোন হাত নাই। কিন্তু স্ত্রী মরিয়া গেলে, আমি পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলাম সকলের সম্মুখে আমি অনাহারে দেহত্যাগ করিব। কেহ আমাকে কিছু দিলেও আমি গ্রহণ করিব না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একক্ষণে একটীর পর একটি মুদ্রা আমার সম্মুখে পড়িতে লাগিল এবং সন্ধ্যাকালে আমি বহুদিন পরে তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। মনে হইতে লাগিল, আমি আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইতেছি। তার পর হইতে আর আমি অনাহারে নাই। ভিক্ষার প্রথা এইরূপ। তুমি কিছু চাঁহিও না, তোমার অভাব থাকিবে না।"

মৌংপে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কথায় কর্ণপাত করিতেছিলেন না, তিনি যেন তাঁহার পীড়িত পুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিতেছিলেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া তিনি আর একমুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। সন্ধ্যা হইতেছিল, অথচ তিনি একটী তাম্রমুদ্রা ব্যতীত কিছুই পান নাই। কিছু ত করিতেই হইবে। কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট তাঁহার ভিক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। কি করিবেন, বস্তুতঃ তাহা তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অব্যবস্থিত চিত্তে তিনি দৌড়াইতে লাগিলেন। সম্মুখেই মহাজনের দোকান—স্তরে স্তরে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা সাজান। পরক্ষণে তিনি যে কি করিলেন তাহা তাঁহার ঠিক রহিল না।

"চোর চোর" শব্দ তাহার কর্ণে গেল। পরক্ষণেই লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। দিনের বেলায় লোকজনের সম্মুখে চুরি! এ যে ডাকাতী অপেক্ষাও ভীষণ। তাঁহার উপর ক্রমাগত কিল, চড়, লাথি বর্ষণ হইতে লাগিল। মৌংপে মৃত্যু সন্নিকট বুঝিলেন, এমন সময় একজন তাঁহাকে চিনিতে পারিল—এ যে দরিদ্রের বন্ধু মৌংপে। এমন সময় একজন কনষ্টেবল আসিয়া তাঁহাকে থানায় লইয়া গেল। থানার দারোগা টেবিলে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন। কনেষ্টবলের দিকে না চাহিয়াই ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কনেষ্টবল সকল

ঘটনা বিবৃত করিল। "আশ্চর্য্য" বলিয়া দারোগা স্বার্থত্যাগীর দিকে চাহিলেন। মোংপে নীরবে শূন্যমনে চাহিয়া আছেন। দারোগা বলিল—"মোংপে তুমি? আপনি? বলুন! কি হইয়াছে আমাকে বলুন।" দারোগা কয়েকবার তাঁহার সম্মুখে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মোংপে সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। দারোগা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "কি হইয়াছে আমাকে বলুন।" তখন মোংপে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। দারোগা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন—দারোগা হইলেও, তাঁহার চক্ষে জল দেখা যাইতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যাহার স্ত্রী পুত্র আছে, তাহার এরূপ করা উচিত নহে। কিন্তু এক্ষণে তিরস্কারের সময় নহে। আপনার পুত্রের শুশ্রূষা এখনই করিতে হইবে। আপনি আজ এদেশ ত্যাগ করিতে পারিবেন না; কিন্তু আপনাকে মুক্ত করিব ও আপনার পুত্রের শুশ্রূষায় আমার ক্ষমতায় যাহা সম্ভব তাহা করা হইবে। আমি আপনার বাড়ী চিনি।"

মোংপে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু দারোগা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদের আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আপনাকে গারদ ঘরে যাইতে হইবে; তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কল্য প্রাতেই আপনি কারামুক্ত হইবেন।"

মোংপেকে অন্ধকার গারদ ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি একবার এক কথা অন্যবার অপর কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় সর্পভয় ছিল। সর্ব্বনাশ! এ কক্ষে যদি সাপ থাকে! অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল যে তিনি যেন আবার সেই মন্দিরে ভিক্ষার্থ গিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক যেন আবার তাঁহার নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছে। ভিক্ষুকের কথাগুলি তাঁহার পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। "তুমি কিছু চাহিও না— তাহা হইলেই তোমাকে দিবে; তোমার অভাব থাকিবে না।"

সত্যই ত, সত্যলাভ করিতে হইলে সব ত্যাগ করিতে হইবে। যখন কেহ নিজ আত্মাকেও ত্যাগ করে তখনই সে সত্যের সন্ধান পায়। তাইত, তাইত! দারোগা বলিলেন "যাহার স্ত্রী পুত্র আছে তাহার এরূপ করা উচিত নহে। সত্যই ত! সত্যই ত! আমার গণনায় যে ভুল হইয়াছে।"

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মোংপে মুক্তি পাইলেন না। দারোগার বিশেষ চেষ্টাতেই তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি কারাগার হইতে ভীতিবিহ্বল চিত্তে বাহির হইলেন। মনে করিতে লাগিলেন, সকলেই বুঝি তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। এই এক রাত্রিতে তাঁহার শরীরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সকলেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, সকলেই যেন তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছে। যখন তিনি স্বগৃহের দ্বারদেশে পৌঁছিলেন, তখন অস্থির চিত্তে দুরু দুরু বক্ষে ভাবিতে লাগিলেন গৃহে তাঁহার স্ত্রী কি করিতেছেন? পুত্র লইয়া হয়ত বসিয়া আছেন। হয়ত কেন নিশ্চয়ই। তথাপি আজ তিনি দৈন্য বিশেষ সঙ্কুচিত হইলেন না।

অত্যন্ত বৃদ্ধ জরাজীর্ণের ন্যায় তিনি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। দেখিলেন, পত্নী পুত্রকে দুধসাগু খাওয়াইতেছেন। মুহূর্ত্তকাল তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিলেন। বলিলেন— "তুমি আসিয়াছ? ওঃ আমি কত কষ্ট পাইয়াছি! কাল সন্ধ্যার সময় মনে হইল সব শেষ হইবে। তখন তোমার বন্ধু দারোগা মোংটক্ আসিলেন। সঙ্গে কুইনাইন। পরক্ষণেই তিনি চিকিৎসক সহ আসিলেন। তিনি মহাদেবের ন্যায় আমাদের সকল ক্লেশ-বিষ দূর করিলেন। কি দয়ালু!" বলিয়া তিনি পুত্রকে আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রীতি-বিস্ফারিত বদন

দেখিয়া মৌংপে মনে করিলেন যে তাহাকে বহুদিন তিনি এরূপ সুখী বা সুন্দরী দেখেন নাই।

মৌংপে উত্তর করিলেন না—তিনি পুত্রকে আদরও করিলেন না। তিনি দারুণ মনঃপীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে স্ত্রীপুত্র সহ এই গৃহই তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। পুত্র কাঁদিতেছে। মা আবার তাহাকে পথ্য দিতে দিতে বলিলেন, "জ্বর খুব অনেকক্ষণ ছিল না। এখন সে বড় দুর্ব্বল। দাঁড়াইবার ক্ষমতাও নাই। কিন্তু আর ভয় নাই।" মৌংপে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার আবার বোধ হইল যে স্ত্রীকে এত সুখী বা সুন্দরী তিনি আর দেখেন নাই। মৌংপে কোন কথাই কহিলেন না। তথাপি তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে এরূপ নিরুত্তর থাকা উচিত হইতেছে না। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি বড় ক্লান্ত হইয়াছেন, নিদ্রা যাইবেন। কেবল এই কথা বলিয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন। নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, স্ত্রী পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন। বহুদিন তিনি স্ত্রীকে গান গাহিতে শুনেন নাই।

গভীর রাত্রে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; চাঁদিনীর রাত্রি; জানালা দিয়া চন্দ্রের কিরণ আসিয়া গৃহ প্লাবিত করিতেছে। তাঁহার পত্নী, পুত্রকে বক্ষে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিতা রহিয়াছেন। পত্নী, পুত্র উভয়েরই মুখ হাস্যবিমণ্ডিত। বহুদিন তিনি তাঁহাদের মুখে এরূপ হাসি দেখেন নাই।

মৌংপে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। চন্দ্রের আলো কি মনোহর, কি স্নিগ্ধ! রাত্রি যেন ঠিক দিনের মত বোধ হইতেছে, অথচ উভয়ে কি প্রভেদ। আজ যেন তিনি দিব্যচক্ষে সব দেখিতেছেন। আশ্চর্য্য! ইতিপূর্ব্বে কি চন্দ্রালোকে তাঁহার পত্নী, পুত্র, গৃহ দেখেন নাই? তাঁহার নিকট যেন সব অপরিচিত বোধ হইতে লাগিল। পুত্র মায়ের বক্ষে মায়ের গলা জড়াইয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে—মাতা পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া প্রশান্তমনে নিদ্রিতা। এ দুইয়ের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই—এ দুইয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি? কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য হয়ত অন্যত্র স্থান আছে। তিনি দ্রুতবেগে শয্যা ত্যাগ করিয়া পত্নী পুত্রের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া, চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি গৃহ হইতে গৃহশূন্য স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস আরম্ভ হইল।

৩

মৌংপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর চারিবৎসর অতীত হইয়াছে। মৌলমিনের মঠে তিনি আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন। কিন্তু মৌংপে কি আকাঙ্ক্ষায় এরূপ করিতেছিলেন? তিনি কিসের জন্য এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছিলেন?

মৌংপে ক্লেশ হইতে মুক্তি চাহিতেছিলেন। তিনি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ চাহিতেছিলেন। কারণ অনিত্য সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করেন, তাঁহার জীবনই দুঃখময় হইয়া উঠে। যাহার নিকট জীবন কেবল দুঃখময়, সে কিছুই চায় না—কেবল চায় এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ। আর সেই কেবল এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, যে কেবল স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সংসার, অর্থ পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না, যে আমিত্ব ত্যাগ করে সেই এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। অবশ্যই তাঁহাকে এই আমিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে, আমিত্ব বর্জ্জন করিতে হইবে, আমিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে।

মৌংপে দিবারাত্রি তাহারই জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু জল যেরূপ নিম্নদিকে যাইতে যায়, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে তিনি যাহাদের আপন বলিতেন, আপন বলিয়া জানিতেন, তাহাদের কথা তিনি স্মরণ করিতেন। এবম্প্রকারে তিনি জীবনের প্রতি মমতা দেখাইতেন। কিন্তু জীবনের প্রতি মমতা প্রদর্শন, আর দুঃখের সহিত জড়িত থাকা একই কথা। অনেক সময়ে তিনি বৈরাগ্যসাগরে ভাসিতেন—ভাবিতেন,

অকূলের কাণ্ডারীকে বুঝি আর পাইবেন না। কিন্তু কে যেন তাঁহাকে বলিত "খোঁড় খোঁড়, আরও খুঁড়িতে খুঁড়িতে মিষ্ট জলের সন্ধান পাইবেই পাইবে।"

এক দিবস ভিক্ষাকালে তিনি মন্দিরপার্শ্বে সংস্র যাত্রী দেখিতে পাইলেন। বৈশাখ মাস, মেলার সময়—তাই মৌলমিনের তীর্থক্ষেত্রে যাত্রী সমবেত হইয়াছে। নিঃশব্দে মৌংপে একদল যাত্রীর নিকট হইতে অপর দলের নিকট ভিক্ষাপাত্রসহ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষার অভাব ছিল না। ভিক্ষা পাইলে ধন্যবাদ পর্য্যন্ত না দিয়া, চক্ষু নত করিয়া, মৌংপে অন্যদলের নিকট যাইতেছিলেন। ভিক্ষাপাত্র অর্দ্ধেক পূর্ণ হইয়াছে, আর যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই তাঁহার অন্তকার ভিক্ষা শেষ হয়। তিনি অন্য একদল যাত্রীর নিকট গেলেন।

"মা! এই ভিক্ষুটিকে আমি কিছু দিই।"—বালোচিত স্বরে কে যেন এই কথাগুলি বলিয়া উঠিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি এই সুপরিচিত স্বরে চমকিত হইলেন। চোখ মেলিয়া তিনি চাহিয়া দেখিয়া, পুনরায় চক্ষু নত করিলেন। তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই স্ত্রী, তাঁহার পুত্র, আর তাঁহার বন্ধু সেই দারোগা মোংটক্। তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে আর একটি শিশু।

আর একবার তিনি এই দিকে চাহিলেন। আপন পুত্রের জন্য প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। ভিক্ষাপাত্র দূর করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিবেন, কি সেই স্থান ত্যাগ করিবেন? কেহই কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কারণ, এই শীর্ণ মুণ্ডিতমস্তক বৃদ্ধ ভিক্ষু যে আকিয়াবের বিচারক, তাহা কেহই বলিতে পারিত না।

ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্র ভিক্ষাপাত্রে প্রচুর আহার্য্য দিতেছিল। মৌংপে শুনিলেন, তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন, "পুত্র! দানেও পরিমিত হওয়া আবশ্যক।" এ স্বরে তিরস্কার ছিল না, লোভ ছিল না। মৌংপে বুঝিতে পারিলেন। মোংটক বলিলেন, "প্রিয়তমে, উহাকে বাধা দিও না; আমাদের অভাব ত নাই, প্রচুর রহিয়াছে সন্ন্যাসীকে না দিব ত কাহাকে দিব?" মোংটক অগ্রসর হইয়া ক্রোড়স্থ সন্তানকে আদর করিলেন। স্নেহবিজড়িত স্বরে সন্তানের মাতাকে পত্নী সম্বোধনে আদর করিলেন। বালক দৌড়িয়া মোংটকের নিকটে আসিয়া বলিল, "আমাকেও আদর কর বাবা।" মোংটক এই সুসজ্জিত সুদর্শন বালককেও আদর করিতে লাগিলেন।

মৌংপের সেস্থান ত্যাগ করিবার শক্তি ছিল না। তাঁহাকে কিন্তু কেহই লক্ষ্য করিতেছিল না। তাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—সন্ন্যাসীর প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। ধীরে ধীরে তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতস্থ যে সকল গুহায় ভিক্ষুগণ ধ্যান করেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যস্থ একটি গুহায় প্রবেশ করিলেন। পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র গুহার বহির্দ্দেশে পড়িয়া রহিল। গুহাভ্যন্তর অন্ধকার, তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ জীবনভার আর বহন করিব না। এই পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি অনশনে দেহত্যাগ করিব।"

তৎপরে তিনি জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি মৃতবৎ সেই স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। দিন কাটিয়া গেল—রাত্রি আসিল। গুহা একেবারে অন্ধকার হইল। গুহার বহির্দ্দেশে সেই পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র চন্দ্রালোকে দেখা যাইতে লাগিল। পর্ব্বতস্থ বনভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্যাঘ্ররব মৌংপের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি দৃক্‌পাত করিলেন না। গহ্বরের সম্মুখস্থ বৃক্ষোপরি কি যেন নড়িতে লাগিল। হিংস্র পক্ষী চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু মৌংপে বিচলিত হইলেন না। হস্তিযূথ বনভূমি দলিত করিয়া অগ্রসর হইল, তথাপি মৌংপে লক্ষ্য করিলেন না। অবশেষে, গুহামধ্যস্থ পত্রোপরি সড়্ সড়্ শব্দ হইতে লাগিল, কে যেন উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মৌংপে এবার সঙ্কুচিত হইলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সর্প আসিয়াছে। তিনি পরক্ষণেই দেখিলেন যে চন্দ্রালোকে উজ্জ্বলিত গুহামুখে তাঁহার ভিক্ষাপাত্রের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড সর্প নড়িতেছে। সে ফণা ধরিল।

এবার তিনি সর্পটী কোন্ জাতীয় তাহা বুঝিতে পারিলেন—ব্রহ্মদেশে এরূপ বিষাক্ত সর্প আর নাই। সর্প পাত্রস্থ আহার্য্য খাইতে লাগিল। যে খাদ্য মৌংপের সুদর্শন, সুসজ্জিত পুত্র দিয়াছিল, এ সেই খাদ্য। অল্পক্ষণ পরেই সর্প আহারে বিরত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আর তাহাকে দেখা গেল না। কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মৌংপে তাঁহার অতি সন্নিকটে শব্দ অনুভব করিলেন। কি যেন শীতল একটা কিছু ধীরে ধীরে তাঁহার অনাবৃত পায়ে উঠিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে তাঁহার মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত উঠিল। মৌংপে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু সাহস পাইলেন না। এ-জাতীয় সর্প অত্যন্ত ভীষণ দংশন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ভয়ে তাঁহার চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইল; তথাপি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। সর্পটি তাঁহার স্কন্ধে বসিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; পরক্ষণেই সে তাহার মস্তকোত্তলন করিয়া তাঁহার অনাবৃত বক্ষে যেন ছোবল মারিবে মনে হইল। তথাপি তিনি নিশ্চল রহিলেন—কারণ, নড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত। সর্পের ফণা তাঁহারই সম্মুখে হেলিতে দুলিতে লাগিল। অবশেষে, সর্প পুনর্ব্বার তাঁহার ক্রোড়ে চুপ করিয়া রহিল, তাঁহার যুক্ত করের উপর তাহার আঠাল শরীর ভর দেওয়া থাকিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইল—মৌংপে ও সর্প উভয়েই নিশ্চল। কিন্তু এক্ষণে আর মৌংপের ভয় ছিল না; শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে আবার রক্ত চলাচল করিতে লাগিল। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্ক আবার প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। সর্পটী নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার ক্রোড় অধিকার করিয়াছিল। মৌংপে বহুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি এই দৃশ্যে নিজেকে অভ্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তিনি ইহাকে পরাজিত করিতে সমুৎসুক হইলেন। তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, "মানুষ কি নির্ব্বোধ! আমি যখন সম্মুখে পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া অনশনে স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করিব স্থির করিলাম, তখন এই জন্তুটী আমার আমার নিকটে আসিল। ইহাকে রক্ষাকর্ত্তা, সান্ত্বনার আনয়নকারী বলিয়া কোথায় অভ্যর্থনা করিব; তাহা না করিয়া আমার আমিত্বের প্রত্যেক স্নায়ু ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল! ইহা আমাদের অজ্ঞতার জন্যই ঘটিয়া থাকে। আমরা ভয়কে পরাজয় করিতে চেষ্টা করি; অথচ প্রত্যহ নূতন ভয়, নূতন চিন্তা আইসে! সকল ভয়ের মূলে না আসিলে মানুষ কি প্রকার শান্তি পাইবে? সকল আশঙ্কা দর্শন না করিলে কি প্রকার শান্তি পাইব? এই আমিত্ব অবশ্য নিরাশ করিতে হইবে। সকল ভয়ের মূলচ্ছেদ করিতে হইবে; সকল আশঙ্কার বীজ পদদলিত করিতে হইবে—তবেই শান্তি, নিরুপদ্রবতা, স্বাধীনতা আসিবে।"

পুনর্ব্বার তাঁহার মনে অনিত্য চিন্তা উদিত হইল। তিনি অধিকতর পরিস্ফুটভাবে সকল দ্রব্যের প্রবাহ দেখিতে পাইলেন, এই পৃথিবীর বাহিক প্রকৃতি নিরীক্ষণে সমর্থ হইলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে এই পৃথিবীই যদি অনিত্য হয়, ভ্রান্তিময় হয়, তবে এই আমিত্বও মোহময়, ইহা ভ্রান্তিরই ভ্রম ব্যতীত কিছুই নহে। মৌংপে প্রশান্তভাবে হাসিতে লাগিলেন। এতদিন অজ্ঞাত একটি অনাবিলতা তাঁহার আত্মাকে পরিপূর্ণ হইল। এই ক্লেশকর অনিত্য জানিতে পারিলে, এই পূতিগন্ধপূর্ণ দেহের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে, দেহ পরিত্যাগ অপেক্ষা আর কি সুখকর থাকিতে পারে? "আমার নিকট এই পৃথিবী কিছুই নহে" এই কথা পুনঃ পুনঃ নিজ আত্মাকে জানাইতে পারা অপেক্ষা আর সুখকর কি আছে? অকস্মাৎ মৌংপে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিলেন—তিনি ক্রোড়স্থিত সর্পসহ নিদ্রাভিভূত হইলেন। যে ব্যক্তি আমিত্ব পরিহার করিয়াছে, সে ক্রোড়ে সর্প লইয়াও নিশ্চিন্তে সুনিদ্রা ভোগ করিতে পারে।

মৌংপে স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে তিনি জাগ্রত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম চিন্তা হইল, তিনি কি জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছেন?

তিনি গুহার চতুর্দ্দিকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। "এই ত শুষ্ক পত্রগুলি রহিয়াছে, গুহাবহির্ভাগে ঐ ত ভিক্ষা পাত্র রহিয়াছে, আর আমার ক্রোড়ে সর্প নিদ্রা যাইতেছে।" তিনি যে মুহূর্ত্তে সর্পের প্রতি চাহিলেন, সর্পও সেই মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। ধীরে ধীরে সে পুনর্ব্বার মস্তকোত্তোলন করিল। বোধ হইল যে সর্পটি ফুলিয়া পড়িয়াছে। মৌংপে ভাবিতে লাগিলেন, সর্পটি কি বিষাক্ত? এক্ষণে সর্প তাঁহার মুখের দিকে জিভ বাহির করিতেছে। মৌংপে প্রশান্তচিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কথা বলিতে যে সময় লাগে, সর্পের দন্তগুলি তদপেক্ষা কম সময়ে আমার এই শরীরকে বিনষ্ট করিতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ কি? এই মুক্তি কি দেহান্ত নহে? ইহাতে ভীত হইবার কি আছে? যাহা মরিতে পারে, তাহা ত মরিয়া গিয়াছেই। আমি কি সৌভাগ্যবান! আমি জীবন্মুক্ত হইবার আস্বাদ জাগ্রতাবস্থায় ভোগ করিতেছি।

ধীরে প্রশান্ত চিত্তে তিনি সর্পটির উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যাহাকে সর্প মনে করিতেছিলেন, সে সর্প নহে—তাঁহার পুত্র, তাহারই সুদর্শন সুসজ্জিত পুত্র—পুত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। মৌংপে কিন্তু পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "এই যে আমার ঔরসজাত পুত্র, এ কোথা হইতে আসিতেছে, জানি না; কোথায় যাইবে তাহাও জানি না। তাঁহার এই চিন্তা করিবার সময়ে সে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। সে বিস্তৃতি পাইতে পাইতে অদৃশ্য হইল। গুহা কুয়াসাপূর্ণ আলোকে ভরিল এবং অকস্মাৎ পদ্মাসনাসীন উজ্জ্বল স্বর্গীয় বস্ত্র পরিহিত তথাগত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পদ্মাসন হইতে সমস্ত দেহই কুয়াসাপূর্ণ।

মৌংপে নির্ব্বিকার চিত্তে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য যে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না! কৈ, আমার ত আহ্লাদ হইতেছে না! কিন্তু আমি যে আমিত্ব ত্যাগ করিয়াছি! কিসে আশ্চর্য্যান্বিত হইব? কেন আহ্লাদিত হইব? এখানে আশ্চর্য্যান্বিত বা আহ্লাদিত হইবার পাত্র নাই।

তাঁহার এই চিন্তার সময় তথাগত বিলীন হইয়া গেলেন এবং মৌংপে দেখিতে পাইলেন যে, গুহামুখ দিয়া প্রভাতসূর্য্যের কিরণ তাঁহার শরীরে আসিয়া পড়িতেছে। তিনি তাঁহার ক্রোড়ের দিকে চাহিলেন—ক্রোড় শূন্য। মৌংপে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কি জাগ্রত আছেন, তাহা তিনি ঠিক যেন বুঝিতে পারিলেন না। বহির্দ্দেশে সেই ভিক্ষাপাত্র রহিয়াছে। ভাবিলেন—"এখানে কি জন্য বসিয়া আছি? গাত্রোত্থান করিয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইবার সময় আসিয়াছে!" কিন্তু তখনও নিজেকে নিদ্রাতুর বোধ করিতেছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া, ভিক্ষাপাত্র গ্রহণোদ্দেশ্যে ভিক্ষাপাত্র সন্নিকটে গমন করিলেন। তখনও ইহা আহার্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি নত হইয়া ভিক্ষাপাত্রস্থ আহার্য্যের আঘ্রাণ লইলেন—আহার্য্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল! তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই সর্প আহার্য্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সর্পে যাহা গ্রহণ করে, তাহাতে দুর্গন্ধ হয়।

তথাপি তিনি পুনর্ব্বার চিন্তাকুলিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি সযত্নে পাত্রস্থ সমুদায় আহার্য্য পরিষ্কারস্থানে নিক্ষেপ করিয়া, ভিক্ষাপাত্র হস্তে এবং নতবদনে ধীরপদে তাঁহার প্রাত্যহিক আহার ভিক্ষার্থ নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যে আমিত্ব পরিহার করিয়াছে সে মৃত্যুকেও আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহার জীবনের প্রতি স্পৃহাও নাই। ধীরভাবে এবং নির্ব্বিকার চিত্তে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে।

এইপ্রকারে মৌংপে প্রকৃত সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন।*

সমাপ্ত।

শ্রীভিক্ষু-সুদর্শন।

* ব্রহ্ম জর্ম্মাণ গল্প হইতে।

আশা

ওরে চঞ্চল পরাণ আমার—চির অশান্তিময়!
সর্ব্বনাশের দোলায় দুলিস্ তুচ্ছ করিয়া ভয়!"
নাহি গো তোমার আগুপিছু জ্ঞান—
মরণের মুখে নির্ভয়-প্রাণ,
বাধা-বিপত্তি মস্তকে ধরি ছুটিছ অসংশয়,
কাল-বৈশাখী কর্ণে তোমার ধ্বনিছে মহাপ্রলয়!

বন্ধন তোরে ছুঁতে নাহি পারে—সর্ব্ব-বাঁধন হারা!
নৃত্য করিছ মহা তাণ্ডবে ধূর্জ্জটি-দেব পারা।
সাগর-উর্ম্মি চক্ষে তোমার
কার আহ্বান আনে অনিবার?
রুদ্র তালেতে বাজে মৃদঙ্গ—বিশ্বেরে দেয় নাড়া,
শঙ্কিত-চিত ধরণীর 'পরে ঝরে অশনির ধারা।

ধরার ক্ষুদ্র সুখ-দুখগুলি চরণে করি' দলন,
ধাইয়াছ মহা ঝঞ্ঝার বেগে রে মোর রুদ্র রমণ!
কোন বাণী আজ নাহি পশে কাণে,
মাতিয়াছ কোন্ ভৈরব গানে,
বিষাণে ফুকারি' তুলিছ মন্ত্র তুচ্ছ-দুখ হরণ—
গর্জ্জন ঘন প্রকৃতির সনে দুর্জ্জয় সে মিলন!

কার ইঙ্গিতে ছুটেছ এমন মুক্তি-বিমানচারী?
দুর্ব্বোধ তোর অপরূপ লীলা, কিছুই বুঝিতে নারি!
বিজয়যাত্রা-সমাপন শেষে,
পঁহুছিবে কোন্ অজানার দেশে—
সর্ব্ব ক্লান্তি মোচন করিয়া ঝরিবে কি আঁখি-বারি?
বাঁধন-বিহীনে বাঁধন পরিবে অপূর্ব্ব ভয়হারী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

পত্র

ওগো,

আবার এলাম। শারদার চিরপিপাসিত মাতৃমনের উচ্ছ্সিত স্নেহ-লাবণ্যে, আজ, শরৎ-শ্রী উদ্ভাসিত। বিশ্বের বুক জুড়ে, কোন অদৃশ্য বৈরাগী আজ গান ধরেছে—

"দেবার খেলা এবার পেলি।"

তাই তোমাকে বলতে এলাম—এই তো ঠিক খেলা। নিখিল দারিদ্র্য মোচন ক'রে, সুবর্ণ-দর্ব্বী-ধারিণী অন্নপূর্ণার এইখানেই তো সার্থকতার অপরূপতা। এখানে জগত্তারিণী বল্লে কিছুই বলা হ'ল না—জগদ্ধাত্রীর পদ থেকে কোন মতেই নামান চ'লবে না। ধারণ মানে যে বেষ্টন গো! বিশ্বের সমস্ত অকল্যাণ থেকে যিনি বেষ্টন ক'রে আছেন, তিনিই তো ধাত্রী।

সেই চিরধাত্রীর পূজার দিনে তোমার কাছে ছুটে এলাম। কেন? আর 'কেন'তে কায নেই! পাণ্ডিত্যের ভাঁড়ামির ভারে সব কথাই ডুবে যাবে।

ওগো, এ উৎসবের দিনে, দুর্ব্বলের এ কাঁদুনি কেন গো? রক্তে যে সব ভেসে গেল, ডুবে গেল। মান, মর্য্যাদা, সবলের যা-কিছু সহায়, সম্পদ—সব যে সেই রুধির-প্লাবনে ভেসে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কতদূরে গেল? কে জানে! অন্নপূর্ণার নামে এ কি অত্যাচার? জগদ্ধাত্রীর জগতে উচ্চের কাছে নীচের কি এই প্রাপ্য?

"অমানিনা মানদেন"—

এ বাক্য কি এম্নি ক'রেই ব্যর্থ হ'ল গো?

আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে করে জান? পার্ব্বতীর কাছে গিয়ে, কেউ যদি সেই অনেক দিনের গানটা গায়

"যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা করালবদনী?"

আমার মনে হয়, তা হ'লে সমস্ত হিংসা-প্রবাহকে জগদ্ধাত্রীর করুণা-লোর মাতৃ-স্নেহ-ধারায় সিঞ্চিত করে দেয়!

সেই তো তোমার স্বরূপ-রূপ গো, যে রূপ দেখে নিতান্ত কাঙ্গালিনীর প্রাণও কেঁদে বলেছিল—

"আহিরিনী গোয়ালিনী
মুই কোন্ ছার—
পরাণ নিছিয়া দিছি
চরণে তোমার।"

পরাণের বলি যে দিয়েছে, সেই তো দেবার মর্য্যাদা রেখেছে। সেই তো চিরকালের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে বল্‌তে পারে—"দেবার খেলা এবার খেলি"

তোমার সাথে কথা কইতে বস্‌লে কত কথাই মনে পড়ে। কোন্ সেকালের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল, সেইটে বলেই আজকের মত ছুটি নেব—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

সমাজপতি

(সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির স্বর্গারোহণে)

আজকে তোমায় বিদায় দিতে কাঁদছে বুক,
পড়ছে মনে স্পষ্ট বাণী, হাস্য মুখ।
শ্লেষ যে তোমার ক্লেশ দিত না, নাশতো ভ্রম,
হুল মধুতে পূর্ণ তোমার মধুক্রম।

তোমার চিরদ্বেষ ছিল গো বিদ্বেষে,
সরলতার ঝরণা ছিল হৃদ্‌দেশে।
অনাদরেই আদর তুমি রাখতে হে,
হাস্য দিয়ে অশ্রু তুমি ঢাকতে হে।

পৌষ যে এত শীঘ্র যাবে জানতে না—
সোণার ধানের মরাই কি তাই বাঁধতে না?
তীক্ষ্ণ তোমার লিখন রবে গৌরবে—
বন্‌কেতকী কণ্টকে ও সৌরভে।

পড়ছে মনে চাঁদের হাট'সে সাহিত্যের—
সেই সে জ্ঞানের প্রেমের মিলন, দারিদ্র্যের,
সেই সে তোমার 'দ্বিজেন্দ্র' ও 'রামেন্দ্র',
দিল্‌দরিয়া প্রেমের কবি 'দেবেন্দ্র'।

কোথায় বাণীর কুঞ্জে তোমার সঙ্গীগণ
রচ্‌ছে স্বরগ্ আলিঙ্গনের সম্মিলন;
আমরা যখন ভরছি ধরা ক্রন্দনে—
তোমার রথ যে থামলো তখন নন্দনে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া পুনরায় সেই পাষাণ-পুরীর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, চত্বরের পর চত্বরে মোহাবিষ্টের মত ঘুরিতে ঘুরিতে আমার প্রাহ্ণ কখন মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌঁছিল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না—কেবলই সেই বহুকাল পরিত্যক্ত বিশাল বিচিত্র রাজপুরীর মধ্যে, স্বপ্নাভিহতের ন্যায় অক্লান্তভাবে সে দিন কত কথাই মনে আসিতেছিল তাহা আজ কি তেমন করিয়া গুছাইয়া বলিবার শক্তি আমার আছে? ভাবিতেছিলাম, কোথায় গেল আজ সে দিনের সেই হিমবৎ-বিন্ধ্য-বেষ্টিত বিশাল সাম্রাজ্য, কোথায় আজ সেই সাম্রাজ্যের কল্পনাতীত বলবীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, আর কোথায়ই বা সেই চতুরুদধিবীচিবিধৌত বিরাট সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর মোগলকুলতিলক শাহানশা আকবর! কিছুই আজ নাই—আছে কেবল মুসলমান ইতিহাস-লেখকের লিখিত জীর্ণ কয়খানি পুস্তকের কীটদষ্ট লুপ্তপ্রায় গুটিকয়েক পত্র, তাহাও আবার বাদবিতণ্ডা-বিতর্কের দুর্ভেদ্য জালে সমাচ্ছন্ন। আর আছে রাজপুতানার রক্তপাষাণ-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে হিন্দু ও মুসলমান স্থপতির কারুকৌশল, যাহা আজও সেদিনের শিক্ষা সভ্যতা বিলাস এবং বিভবের কথঞ্চিৎ সাক্ষ্যদান করিতেছে। অতীত গৌরবের এই লুপ্তাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি দেখিয়া যথার্থই দর্শকের মনে হইবে "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা:"—এবং এই ভারতবাসী কাহারও নয়নে যদি আজও অশ্রুর অবশেষ থাকে, তবে তাহা আপনি গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িবে, বাধা মানিবে না। কয়েক শত বর্ষমাত্র পূর্ব্বের গৌরব-চিহ্ন-গুলি যদি এরূপ ভাবে এই অল্পকাল মধ্যে ধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে, তবে মৌর্য্য, মিত্র, পাল ও গুপ্তের সকল মহিমা যে ধরণীর কুক্ষিগত হইয়া ধূলিজালের মধ্যে আজ লুপ্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

মোগল-মহিমার এই মহাশ্মশানের মধ্যে মুগ্ধনেত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মনে আসিতে লাগিল সেই দিনের কথা, পাণিপথের বিস্ময়দৃপ্ত বাবরের-বাহিনীর সম্মুখে সম্মিলিত রাজপুত সৈন্যের অধিনায়ক সংগ্রামের খর করবাল সূর্য্য-কিরণে যেদিন ঝলসিয়া উঠিয়াছিল। মহাকালের অবিরাম ঘূর্ণায়মান চক্রনেমির আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বাবর সে সংগ্রাম যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠার মধ্যে চির-বিশ্রাম লাভ করিলেন, নানারূপ পতন ও অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে, ভগবদারাধনার 'আজান' রবে স্খলিতপাদ হুমায়ুন যেদিন প্রাসাদশিখর হইতে পতিত হইয়া হিন্দুস্থানের সিংহাসন শূন্য করতঃ পরলোকে প্রয়াণ করিলেন, যে দিনে সেই শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিবার জন্য দ্বাদশবর্ষীয় বালক আকবর তাঁহার অভি-ভাবকের হাত ধরিয়া বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, আমার মনে পড়িতে লাগিল আবার সেই দিনের কথা। রাজপুত মোগলের সমরোল্লাস নিবৃত্ত হইয়াছে, রুধির-রঞ্জিত ফতেপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর আপক শস্যের শ্যামশোভায় হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছে, দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর আকবর পরিপূর্ণ যৌবনে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়া তাঁহার যশশ্চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণজালে আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন, ফতে-পুরের নীল নভস্তল ভেদ করিয়া রক্তপাষাণ-প্রাসাদের গর্ব্বিত গুম্বজ চতুর্দ্দিকে তাঁহার রাজমহিমা প্রচার করিতেছে, জেতাজিত বিদ্বেষ বহুপরিমাণে বিস্মৃত হইয়া হিন্দু-মোগলের মিলিত কণ্ঠ "দিল্লীশ্বরো বা জগ-দীশ্বরো বা" রবে তাঁহার স্তুতিগীতি ধ্বনিত করিতেছে।

সেই পরিত্যক্ত পাষাণ স্তূপের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপ কত চিত্রই আমার মানসনয়নের সম্মুখে যে উপস্থিত হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা কি করিতে পারি? অবশেষে মনে আসিল এই মহাগৌরবময় বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কথা। কি ছিল, আর ইন্দ্রজালের সৃষ্টির স্থায় পলকের মধ্যে তাহা কেমন করিয়া লুপ্ত হইয়া গেল! কি কুক্ষণে ভ্রাতার রুধির-কলুষিত করে আরংজীব রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, কি অশুভ লগ্নে পিতার অশ্রুকর্দ্দমের উপর দিয়া, শৃঙ্খলিত কারারুদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রগণের পিতৃশোকাতুর বক্ষের উপর পাদক্ষেপ করিতে করিতে তিনি সিংহাসনের পাদপীঠতলে পঁহুছিলেন—সে কথা ভাবিলে মনুষ্য মাত্রেই শিহরিয়া উঠে।

চিরস্থায়ী কিছুই নহে সত্য। মান্ধাতা, পৃথু, রঘু, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ কাহারই রাজ্য চিরকাল থাকে নাই। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, শ্রীহর্ষ সকলেরই সাম্রাজ্য একদিন না একদিন গিয়াছে। মিশর, গ্রীক ও রোমকের বিশাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। আরবের দীন্ দীন্ রব একদিন নিস্তব্ধ হইয়াছিল সত্য। কিন্তু আরংজীবের বিদ্বেষবুদ্ধি, বিচারকৃপণতা এবং হত্যা প্রভৃতি জঘন্য পাপে অকুণ্ঠা যেমন করিয়া বিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে পরিচালিত করিয়াছিল, ইতিহাস খুঁজিয়া আর একটি এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না। যে রাজপুতের অসিচালন-পটুতায় আকবর জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের বিজয়পতাকা কাবুল, কান্দাহার, বাহ্লিক প্রভৃতি প্রদেশের চিরতুষারাবৃত ভূমিতে দৃঢ় প্রোথিত হইয়াছে, সেই চির রাজভক্ত অম্বরপতি জয়সিংহ মাড়বারের অধীশ্বর যশোবন্ত আরংজীবেরই নৃশংসতায় ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। কপট সমাদরের সহিত আহূত অতিথি ছত্রপতি শিবাজীর কারাবরোধ-কাহিনী ইতিহাসে বর্ণিত। ঐরূপ আচরণ না করিয়া, বন্ধুভাবে ছত্রপতিকে গ্রহণ করিলে দাক্ষিণাত্যে সেই ছত্রপতিরই বাহুবলে আরংজীবের রাজছত্র বহুকালের জন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাঁহার রাজদণ্ড তিনি অবলীলায় পরিচালিত করিতে পারিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আশিষ্টের শাসন, সাধুজনের পরিপালন, প্রজাগণের প্রতি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পক্ষপাতশূন্য বিচার কেবলমাত্র ধর্ম্মানুমত এবং পারলৌকিক শুভপ্রদ যে তাহাই নহে, উহা রাজসিংহাসনের অচল ভিত্তি; এবং ঐ সকলের অভাবে বিস্তৃত সাম্রাজ্য, অপরাজেয় সৈন্যবল, রণদুর্ম্মদ সেনাপতি, সুদক্ষ মন্ত্রী এবং অফুরন্ত ধনভাণ্ডার—এ সমস্ত সত্ত্বেও জলবুদ্বুদের ন্যায় সিংহাসন কোথায় নিমেষের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তাঁহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তৈমুর-বংশধর শাজাহানের "তক্তে তাউস্," যাহার ধ্বংসবীজ আরংজীব স্বীয় হস্তেই বপন করিয়া গিয়াছিলেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে পঞ্চাশৎ বর্ষ অতিবাহিত হইতে না হইতেই সেই বিষবৃক্ষে ফল ধরিয়াছিল।

আকবরের ফতেপুর প্রসাদের অবশেষের মধ্যে এইরূপ কত কি চিন্তা করিতে করিতে দিবসের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে আগ্রায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমার সহযাত্রী ইংরাজ বন্ধুটি সেদিনও সেখানে থাকিবেন ঐরূপ জানাইলেন, কারণ সেই ফতেপুর কেল্লার অভ্যন্তরস্থ দুই একটি গৃহের ছবি আঁকিবার তাঁহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা তিনি তখনও পূর্ণ করিবার অবসর পান নাই। এপর্য্যন্ত যে সময়টুকু আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা সেই বিশাল পুরী চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিতেই ব্যয় হইয়া গেল। বন্ধুবরের ইচ্ছা যে আমিও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যাই, কেননা দিবাভাগ ছবি অঙ্কন কার্য্যে এবং দ্রষ্টব্য পদার্থ সকল দেখিতে দেখিতে কাটাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু নৈশ ভোজনের পর গল্প করিবার জন্য কেহ না থাকিলে সেই পরিত্যক্ত জনহীন বিশাল পাষাণপুরীর একদেশে ডাকবাংলার একটি কক্ষে একাকী সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত যাপন করা সহজ ব্যাপার নহে। যদিও ইংরাজ জাতি পুরুষানুক্রমে সাগরবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া বিজনবাস একরূপ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, পান

ভোজন শয়ন অধ্যয়ন পর্য্যটন (শিকার) প্রভৃতি দ্বারা দিবারাত্রির সমস্তগুলি দণ্ড মুহূর্ত্ত একরূপ করিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে, তথাপি ফতেপুরের এই পাষাণ পুরীতে নিঃসঙ্গবাস ইংরাজের পক্ষেও একটু কষ্টকর। আমার মিটিয়া ছিল;—ঠিক ভূতের ভয় না কারণেও, একদা বহুজনাকীর্ণ, বহুদীপালোকিত, নৃত্যগীতমুখরিত, গন্ধামোদিত ও অপূর্ব্বসুন্দরীগণপরিসেবিত, অধুনা পরিত্যক্ত নির্জ্জন পাষাণ-প্রাসাদের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র



ফতেপুর শিকৃরী—এই স্তম্ভের উপরে আকবরের সিংহাসন স্থাপিত ছিল।

নানাবিধ প্ররোচনা দ্বারা আমাকে প্রফুল্ল করিয়া আরও একটি দিনের জন্ম তথায় রাখিবার বহু চেষ্টাই তিনি করিলেন, কিন্তু আমি সম্মত হইলাম না। একরাত্রি তথায় বাস করিয়াই রাজপ্রাসাদে বাস করিবার ইচ্ছা কক্ষে অর্দ্ধরাত্রির পরে স্বীয় শয্যায় জাগ্রত হইলে দেহ মন অন্তরের মধ্যে যে কিরূপ করিতে থাকে তাহার কথঞ্চিৎ স্বাদ আমি পূর্ব্বরাত্রে পাইয়াছিলাম, তাই তাহার পুনরাস্বাদনের ইচ্ছা আমার কিছুতেই হইল না। বন্ধু-

প্রবরকে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ করিয়া আমি সেই দিনই চলিয়া আসিলাম। চলিয়া আসিবার আরও একটি কারণ ছিল—আমার গাইড মীর খাঁ আর সেখানে থাকিতে চাহিল না। তাহার ধারণা যে ফতেপুর ও শিক্রী এই উভয় গ্রামের লোকের মধ্যে অধিকাংশই চোর, চুরি করিতে আসিয়া বিশেষ কিছু না পাইলে তাহারা লোক খুন করিয়া রাখিয়া যায়—আমাদের নিকট চুরি করিবার মত বিশেষ কিছু ছিল না সুতরাং আমাদিগকে খুন করিবারই সম্ভাবনা বেশী; সেইজন্য সে বারম্বার সেস্থান হইতে চলিয়া আসিবার অনুরোধ আমাকে সনির্ব্বন্ধে জানাইতে লাগিল। দিল্লী দর্শনের ইচ্ছাও আমার মনে তখন প্রবল হইয়াছে, আগ্রায় আসিয়া তবে টুণ্ডুলা হইয়া আমাকে দিল্লীর পথে যাত্রা করিতে হইবে, সুতরাং আমি ইংরাজ সহযাত্রীকে তথায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া আসিতেই বাধ্য হইলাম।

মহাভারত-বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থ, পৃথ্বীরাজের পুরাতন দিল্লী, কুতব নির্ম্মিত সুবৃহৎ মীনার, তৈমুরলঙ্গ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত টোগলকাবাদ, শ্বেতমর্ম্মরবিনির্ম্মিত শাজাহানের নূতন রাজধানী, বহু হৃদয়বিদারী ব্যাপারের লীলাস্থল হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জন্য মন আমার একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং আমি সেই দিবস সন্ধ্যায় আগ্রায় আসিয়া, পর দিবসেই দিল্লী যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

"দুর্ভিক্ষের খাদ্য" প্রবন্ধের প্রতিবাদ

বিগত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "দুর্ভিক্ষের খাদ্য" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা দুইটি প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ, জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"গত পৌষ সংখ্যায় 'দুর্ভিক্ষের খাদ্য' নামক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় কেন্দুরি ও তেলাকুচা একই দ্রব্য মনে করিয়াছেন। কেন্দুরির চেহারা তেলাকুচার মতনই কিন্তু কেন্দুরি ও তেলাকুচা একই জিনিস নহে। কেন্দুরির আস্বাদ মিষ্ট আর তেলাকুচার আস্বাদ তিক্ত। তরকারির হিসাবে কেন্দুরি সুখাদ্য আর তেলাকুচা অখাদ্য। তেলাকুচাকে কেহ কখনও তরকারি রূপে ব্যবহার করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে তেলাকুচা ভিন্ন কেন্দুরিও জন্মে, অন্ততঃ পক্ষে আমি ময়মনসিংহে কেন্দুরি কিনিতে পাওয়া যায় দেখিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে তেলাকুচা হয়, আর গৃহস্থের বাড়ীতে কেন্দুরি জানিতে হইলে আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় লইতে হইবে। খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ আয়ুর্ব্বেদে যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে সে প্রণালীতে খাদ্য দ্রব্যের বিচার আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষমতার বাহিরে। সে যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ হইতে কেন্দুরি ও তেলাকুচার গুণাগুণ এস্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

"কেন্দুরি—ইহার অন্যতম সংস্কৃত নাম গোপালকর্কটী। ইহা মধুর রস, শীতল ও পিত্তনাশক ; এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, মেহ, দাহ ও শোষ রোগে উপকারক।

"তেলাকুচা—ইহার অন্যতম সংস্কৃত নাম বিম্বী। ইহা তিক্তমধুর রস, গুরুপাক, স্তম্ভনকারক, মলমূত্রাদির বিবন্ধ ও আধ্মানকারক এবং বাতপিত্ত রক্ত নাশক। ইত্যাদি।

"যাহাদের আগ্রহ আছে তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ জানিবার জন্য কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন কৃত 'দ্রব্য-

বর্দ্ধমান হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও কেন্দুরী ও তেঁলাকুচী সম্বন্ধে উক্ত প্রকার লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি আরও লিখিয়াছেন—

(১) "ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে কাঁকুড় বলে তাহাকেই পশ্চিমবঙ্গে ঝিঙে বলে। অন্য স্থানের কথা বলিতে পারি না, তবে, এই বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার ঝিঙে ও কাঁকুর সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।

(২) ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে ছাঁচি কুমড়া বলে, তাহাই পশ্চিমবঙ্গে খেঁড়ো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। কারণ এ দেশেও ছাঁচি কুমড়া, চাল কুমড়া বা জাত কুমড়া নামে একপ্রকার কুষ্মাণ্ড প্রায়ই প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে হইয়া থাকে। উহা কচি অবস্থায় তরকারী, খাইতে অতি উপাদেয়। উহা পাকিলে উহার উপর খড়ি দেওয়ার মত এক প্রকার পদার্থ হয়, সুতরাং উহার রং তখন সাদা হয়। তখন উহার শাঁস বাহির করিয়া কলাইয়ের ডাল বাটিয়া বড়ি দিলে অতি উত্তম বড়ি প্রস্তুত হয়। সেই বড়ি শীতকালে, এমন কি সকল সময়ই ভাতে, ঝালে, ঝোলে ও অম্বলে সব রকমেই খাওয়া চলে। আর খেঁড়ো—উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়, দেখিতে অনেকটা তরমুজের মত, তবে তরমুজ প্রায় গোলাকার হয়, কিন্তু খেঁড়ো লম্বাকৃতি। খেঁড়ো তরকারী ভিন্ন কাঁচা খাওয়া যায় না, এবং উহা বীরভূম ও বর্দ্ধমান ব্যতীত অন্য কোথাও কচিৎ পাওয়া যায়।"

গ্রন্থ-সমালোচনা

জহান্-আরা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। দি নরদার্ণ বুক ডিপো, ১৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৮৮পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অল্পদিনের মধ্যেই ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং এই পুস্তকগুলি যথেষ্ট খ্যাতিলাভও করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি জহান্-আরা নামে আর একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য ও কয়েকখানি হাফ্‌টোন চিত্র সমন্বিত।

জহান্-আরা সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ইংরাজীতেও ঠিক এই সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার যুগান্তকারী আওরংজেব গ্রন্থে এই সময়কার অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করাতে, জহান্-আরা সংক্রান্ত ইতিহাসানুমোদিত গ্রন্থ লেখা এখন সম্ভবপর হইয়াছে।

জহান্-আরা বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা কন্যা। যখন শাহজাহান্ দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা ছিলেন, তখন তিনি পিতার প্রিয়পাত্রী ছিলেন; পরন্তু যখন নির্ম্মম পুত্র আওরংজেব পিতাকে কারারুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তখনও এই কন্যা পিতাকে পরিত্যাগ করেন নাই। "ঘোর তিমিরগর্ভ হতাশ-সাগরে শাহজহান্ একমাত্র ক্ষুদ্র তরণী জহান্-আরাকে আশ্রয় করিয়া ভাসিয়াছিলেন।" ইচ্ছা করিলেই হয়ত, জহান্-আরা দুর্ভাগ্য পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, দিল্লীশ্বর ভ্রাতা আওরংজেবের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি তাহা করেন নাই। উৎপীড়িত পিতাকে সেবা-সান্ত্বনা দ্বারা এই দেববালা পিতার কথঞ্চিৎ ক্লেশ-নিবারণে বদ্ধপরিকরা হইয়া জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের অনন্ত ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ যে ভাবেই ইঁহাকে চিত্রিত করুন না কেন, অমূল্য পিতৃভক্তির এরূপ উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোন ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় না। ব্রজেন্দ্রবাবু এরূপ মহিলার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তকে শুধু এই নররূপিণী দেববালার ইতিহাস বিবৃত হয় নাই; সমসাময়িক ইতিহাস-সংক্রান্ত সকল ঘটনাই তিনি আলোচ্য গ্রন্থে যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শাহ্‌জাহানের ব্যাধি, ভ্রাতৃবিরোধ, পিতার কারাগার, ভ্রাতৃবিরোধের ফল, এই সকল ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে। সে হিসাবেও গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় এই গ্রন্থের একটি পাণ্ডিত্যোদ্দীপিত, সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

খোকার বই। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষাল প্রণীত। ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীসুবিনয় রায়, ইউ রায় এণ্ড সন্স, ১০০ নং গড়পার রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬পেজী, ৬৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥৵০

ইহা ছোট ছেলেদের জন্য সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত একখানি গল্পের বই। ছোট ছোট দশটি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বহিখানি ঠিক খোকার বই হইয়াছে বলিতে পারা যায় না, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদিগেরই উপযুক্ত হইয়াছে, বলা যায়। খোকার বই বলিতে আমরা বিবিধ বিচিত্র-চিত্র সম্বলিত অক্ষর-পরিচয়ের বহিই বুঝি। যাহা হউক বহিখানির লেখা ভাল, ভাষাও বেশ গল্পের মতন সহজবোধগম্য, কিন্তু আমরা ছোট ছেলেদের এরূপ একেবারে নীতিশিক্ষা-সম্পর্ক-হীন কতকগুলা বাজে অসার গল্পের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী নহি এবং তাহার কোন আবশ্যকতা ও উপকারিতা আছে বলিয়াও মনে করি করি না। এরূপ গল্প-লেখায় ও শিক্ষা দেওয়ায় কেবল শক্তির অপব্যয় বা অপব্যবহার বই আর কিছুই বলা যায় না। দুঃখের বিষয় আলোচ্য দশটি গল্পের কোনটিতেই আমরা ছেলেদের শিক্ষণীয় তেমন কিছুই দেখিলাম না। ছেলেরা গল্প পাঠে আমোদ ও আনন্দ পায় বটে, কিন্তু তাহার ভিতর সম্ভবমত ধর্ম্মনীতি ও কর্ত্তব্য শিক্ষার সুযোগ দান করিলে, গল্প পাঠ ও আমোদলাভের সার্থকতা হয়। লেখিকার লিখিবার শক্তি আছে, আশা করি তিনি ভবিষ্যতে নীতি ও কর্ত্তব্য শিক্ষামূলক গল্প লিখিয়া কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের প্রকৃত উপকার সাধন করিবেন।

গল্প-সংসৃষ্ট চিত্রগুলি অতি মনোরম হইয়াছে। বহিখানির কাগজ এবং ছাপাও খুব উৎকৃষ্ট।

প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত। কলিকাতা, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও গিরিধি, বায়গণ্ডা হইতে গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী ১৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য লিখিত নাই।

ইহা একখানি ছোট উপন্যাস। বহিখানির আখ্যানবস্তু—জনৈক স্বদেশানুরাগী স্বাধীনচেতা চরিত্রবান্ যুবক (রতিকান্ত) রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কিছুকাল কারাবাসের পর যখন ঘরে ফিরিল, তখন ঘরে-বাহিরে সকলেই যে তাহাকে একটা খুব ঘৃণা, বিরক্তি ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। কাহারও নিকট কোনরূপ প্রতিষ্ঠা বা সহানুভূতি না পাইয়া, ক্রমে মনঃকষ্টে ও অভিমানে জীবনে বীতরাগ হইয়া সে মনের বল হারাইল, অবশেষে মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া একদিন সকল অশান্তি ও জ্বালার অবসান করিল। হতভাগ্য আত্মঘাতী যুবক মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তার জননী ও 'অমিতা'কে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিল, বাহুল্য-ভয়ে আমরা আর এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠক সে মর্ম্মস্পর্শী করুণ আত্মনিবেদন-কাহিনী পুস্তকেই পাঠ করিবেন।

আখ্যানটি যথাসম্ভব নূতন রকম করিয়া, খুব সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হওয়ায় বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। স্থানে স্থানে চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। নায়ক রতিকান্তের চরিত্র আরও একটু ফুটাইলে যেন ভাল হইত। 'হরদাদা'র চিত্রটি মন্দ আঁকা হয় নাই। স্পষ্টভাষিণী মুখরা অমিতার চরিত্রাঙ্কন খুবই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অমিতা মুখরা হইলেও তাহার প্রতি কথাটির দাম আছে। পাঠকগণ বহিখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন।

পল্লীব্যথা (কবিতা-গ্রন্থ)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৯১।৫ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট "নববিভাকর" যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র রায় এম্-এ, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ডবলক্রাউন, ১৬ পেজি ১১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

ইহা একখানি কবিতার বই। আজকাল কবিতার বই বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি বা দেখিতে পাই, এখানি ঠিক সে জাতীয় নহে। ইহা আমাদের পল্লীমাতার সুখদুঃখের একখানি নিখুঁত চিত্র। পল্লীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা এবং দুঃখ দারিদ্র্য ও অত্যাচারের পবিত্র, মধুর এবং করুণ কাহিনী, চাষার ভাষায় কবিতাছন্দে লেখা, আমরা অধিক পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের উপেক্ষিতা ও পরিত্যক্তা পল্লীগুলির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, পল্লীর সুসন্তান তাঁহার "পল্লীব্যথা"য় অতি নিপুণ ও জলন্তভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কোন অবস্থায় কোনও কথাটিই বাদ পড়ে নাই। পল্লীর ভাষায় পল্লীর প্রত্যেক সুখদুঃখের কথাগুলি যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা যে ভাবুকের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসময় বেদনার গান নয়, প্রকৃত দরদীর গান, তা বাস্তবিক অনুভব করা যায়। দরদী কবি তাঁহার এই পল্লীগাথায়, "গাঁয়ের কান্না", "প্রেতের ছায়া" এবং "ঘরের মায়া" এই তিনটি চিত্রে ৩৩টি কবিতার ভিতর দিয়া অতি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাবে দেখাইয়াছেন, আমাদের সুজলা সুফলা সোণার পল্লী এক-

দিন কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে। কবির সেই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় করুণ ও সজীব কবিতাগুলি হইতে আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবিতাগুলি সত্য সত্যই প্রাণ ও প্রাণের বেদনাকে জাগাইয়া তোলে।

"গাঁয়ের কান্না" চিত্রে কবি বলিতেছেন :—

"উষার অরুণ রাগে ছিলে চারু সজীব তরুণ,
শ্যাম শোভা মহোৎসব, আঁখিযুগ মমতা-করুণ,
ছিল ধৈর্য্য অপ্রমেয়, ছিল শৌর্য্য, সাহস দুর্জ্জয়,
স্নেহশান্ত নীড়ে তব আর্ত্তপ্রাণ লভেছে অভয়।
রূপ ছিল, রস ছিল, ছিল গন্ধ, সুষমা অতুল,
তব গুল্মবল্লী মাঝে, হারাইত হৃদয়ের কূল।
আজি তুমি প্রেতছায়া, প্রাণহীন স্তিমিত নয়ন,
কণ্ঠমালা গাঁথিবারে কর নরকঙ্কাল চয়ন।"

তার পর পল্লীর "প্রেত ছায়ার" দৃশ্য ;—

গভীর আঁধার ঘেরা চারিধার, নিঝুম দিবস রাতি,
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈল বিহীনবাতি,
থম্ ধরে' আছে, পাতাটি কাঁপেনা, ছম্ ছম্ করে দেহ,
দেবতাবিহীন দেবালয় আজ, জনহীন সব গেহ।
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য, রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে, নিষ্ঠুর নির্ম্মম।"

ইহাই আজকাল আমাদের পল্লীগুলির অবস্থা।

এইত গেল দুঃখের চিত্র। তার পর, পাঠক সদানন্দ ও সরলপ্রাণ পল্লীকৃষক ও তাহার সুখের ঘর সংসারের একটু পরিচয় লউন,—

"ঘর ক'খানি খড়ে ছাওয়া, মাটির দেওয়াল চারিপাশে,
নাই বা হ'ল দালান কোঠা তাতে আমার কি যায় আসে?
পিঁড়ে আমার নেপা পোঁছা, সিন্দুর প'লে যায় গো তোলা
বাতায় গোঁজা দুলছে দেখ খোকামণির সোণার দোলা ;
দাওয়ার কোণে বাঁশের খুঁটি, তাতে খানিক কোষ্টা বাঁধা,
সকাল থেকে ছালায় ব'সে, দাঁড়খাকায় কেষ্টো দাদা।
জমীদারের পাওনা দিয়ে সোণার ধানে গোলা ভরা,
মুগ মুসুরি কেটে ঝেড়ে আছে ঘরে মজুত করা।
উঠান ভরা মাচান আছে, লাউ কুমড়ো কতই তাতে,
কনকরাঙা শাক বুনেছে, কনক আমার নিজের হাতে।
ক্ষেতে আছে উচ্ছে, পটল, আলু, বেগুন, থরে থরে,
সস্তা দরে বেচে আনাজ আমি কত সওদা ক'রে।
পুকুর জলেতেই মাগুর আর রুই কাতলা কত শত,
ছিপ্ দিয়ে কি 'খেপ্‌লা' ফেলে ধর আপন ইচ্ছামত।"

ইত্যাদি

বাহুল্য ভয়ে আর আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। যাঁহারা সহরে বাস করিবার টানে পল্লীবাস ত্যাগ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, এই বহিখানি তাঁহাদের পাঠ করা উচিত। পাঠক দেখিবেন, ইহা পল্লী কবির সখের কবিতা নয়, ইহাতে প্রাণ আছে, ভাব আছে এবং জানিবার ও ভাবিবার কথা আছে। 'সহুরে' সভ্যতা মান ও গর্ব্ব ভুলিয়া পাঠক একবার এই "বাঙ্গলা চাষা"দের সুখদুঃখ-বিজড়িত কাহিনীগুলি শুনিবেন কি?

পুস্তকের প্রচ্ছদপটের চিত্রখানি বেশ ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। কাগজ এবং ছাপাও ভাল।

কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ কথিত। কলিকাতা, ২৫ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ স্বরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পতরু পবলিসিং হাউস, চাঁদপুর ত্রিপুরা। ১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৶০

এই পুস্তিকা খানিতে স্বামী স্বরূপানন্দের কতকগুলি অমূল্য উপদেশবাক্য সংকলিত হইয়াছে। সকলগুলিই কাযের কথা এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী। যাঁহারা দেশের ও দশের সেবারূপ কর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক, তাঁহাদের পক্ষে এই জীবন্ত উপদেশ বাক্যগুলি মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে। যাঁহারা "মন্ত্রের সাধন" এর ন্যায় এই মহৎ কর্ম্মের সাধনে জীবন বা "শরীর পতন" এই সংকল্পবান্, এই অমোঘ জলন্ত উপদেশগুলি তাঁহাদিগকে সাফল্য দান করিবে। দেশের কল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে এই দুর্দ্দিনে সুপ্ত দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা ও চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই স্বামিজী এই জাগরণের সত্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। দেশের কল্যাণ-সাধনে ইহাই আদর্শ এবং গ্রহণীয়। এই ক্ষুদ্র বহিখানির বিস্তৃত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য কয়েকটি উপদেশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। দেশের অভাব লক্ষ্য ও অনুভব করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন "দেশ কি চায়? দেশ চায় মানুষ। যে মানুষ অশনি-আঘাতে নম্রশির হইয়া পড়িবেন না, যাঁহার তেজস্বিতা বিভীষিকা দেখিয়া ম্লান হইবে না, কামনা-কলুষে জীবন-সাধনকে যিনি বিসর্জ্জন দিবেন না,—দেশ চায় তেমন মানুষ। দেহ যাঁহার বজ্রের ন্যায়, বীর্য্য যাঁহার অপরিমেয়, মনুষ্যত্ব যাঁহার অভ্রভেদী, দেশ চায় তেমন মানুষ। দেশ চায় তাঁহাদের, যাঁহাদের স্বজাতি প্রীতির শান্তি সিঞ্চনে দুঃখদগ্ধ দেশের অনন্ত দুর্ভাগ্য ঘুচিবে, যাঁহাদের কর্ম্ম প্রেরণায় তোমরা আপন চিনিবে। দেশ চায় তোমাকে,—

জাগ্রত তোমাকে, কর্ম্মঠ তোমাকে,—তোমার তপস্যা চায়, পতিতের উত্থানলাভে তোমার আত্মোৎসর্গ চায়।" আর কি চায়? "অকপট হও, কাযই যদি করিতে হয় পুরুষের মত করিও; কথাই যদি বলিতে হয়, মানুষের মত বলিও। বুক ফুলাইয়া যদি প্রাণের কথা বলিতে না পার, তবে নিঃশব্দে থাকিও। দণ্ড পুরস্কারকে যদি অগ্রাহ্য করিতে না পার, কাযে হাত দিও না। কথায় অকপট হও, কার্য্যে অকপট হও। মিথ্যা বীরত্বে অথবা সাহসের ভাণে দিগ্বিজয় হয় না।" তারপর দেশনায়কের কথা;—"নেতা কে? বিশ্বের নেতৃত্ব যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমাদের, আমাদের মতই সাধারণ মানুষ; শুধু আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড চেষ্টার মধ্য দিয়া তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেন। পতিতোদ্ধার যাহার জীবনের ব্রত নয়, জনসেবার যূপকাষ্ঠে সকল স্বার্থকে যে বলি দেয় নাই, লাঞ্ছিতের বিরহ বয়ানে, নিরন্নের বিদগ্ধজঠরে, আহতের শোণিতস্রাবে নিজের অস্তিত্বকে যে জন সর্ব্বময় দেখে নাই, তাহাকে নেতা বলিয়া মানিব না।" ইত্যাদি।

সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখানো সম্ভবপর নয়। তাই আমরা আর উদ্ধৃত করিলাম না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ খাঁটি ও কাযের কথা প্রচারে কল্যাণ আছে। পাঠক সামান্য ছয়টি মাত্র পয়সা খরচ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এই গ্রন্থের যাবতীয় লভ্য ব্রহ্মচার্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হইবে। উদ্দেশ্য মহৎ।

"কমলাকান্ত।"

সাহিত্য-সমাচার

শোক সংবাদ।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র, সুপরিচিত "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিগত ১৭ই পৌষ বেলা ৩টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৩।৪ মাস হইতে তিনি পীড়িত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন—রোগ, বহুমূত্র জনিত কয়েক প্রকারের উপসর্গ। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫১ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি আজন্ম সাহিত্যসেবীই ছিলেন, তবে স্বদেশীর সময় হইতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে বক্তৃতা করিতেও দেখা যাইত। সুলেখক ও সদ্বক্তা বলিয়া তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র নিঃসন্তান। তাঁহার পত্নী ও বৃদ্ধা বিধবা মাতা জীবিতা। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, জননী পত্নীর জন্য সুরেশচন্দ্র বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমাদের দেশে কি এমন কোন প্রকাশক নাই, যিনি "সাহিত্য" খানির জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া, "সাহিত্য" চালাইয়া তাঁহার আয়ের কিয়দংশ সুরেশচন্দ্রের জননী পত্নীর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োগ করিতে পারেন? বঙ্কিমচন্দ্রের চারি বৎসরের "বঙ্গদর্শন" পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেও সুরেশচন্দ্র উদ্যোগী হইয়াছিলেন; আমরা শুনিয়াছি তাহার কিছু অংশ ছাপাও হইয়াছে; সেই আরব্ধ কার্য্য শেষ হইলেও কিছু অর্থসংস্থান হইতে পারিত, কারণ আমরা জানি যে বহুলোক বঙ্কিমের ঐ চারি খণ্ড "বঙ্গদর্শন" কিনিবার জন্য ব্যগ্র।

"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত" তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া প্রকাশিত হইল, মূল্য ৩৲

শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত "নন্দরাণী" উপন্যাস প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৫৲

১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড সমাপ্ত।